গীতা রসামৃত

সূচীপত্র

—— o ——

॥ শ্রীহরিঃ ॥

চিত্রসূচী

॥ শ্রীহরিঃ ॥

গীতা রসামৃত

বসুদেবসুতং দেবং কংসচাণূরমর্দনম্‌।
দেবকীপরমানন্দং কৃষ্ণং বন্দে জগদ্‌গুরুম্‌॥

সনাতন ধর্মের তিনটি শ্রেষ্ঠমার্গ (প্রস্থানত্রয়ী)—শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা, উপনিষদ্‌ ও ব্রহ্মসূত্র। শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা এই তিন প্রস্থানত্রয়ীর অন্যতম, মহাভারতের ভীষ্মপর্বের ১৮টি অধ্যায়ের (১৮-২৫) অন্তর্গত।

গীতা সম্বন্ধে বলা হয়েছে—

সর্বোপনিষদো গাবো দোগ্ধা গোপালনন্দনঃ।
পার্থো বৎসঃ সুধীর্ভোক্তা দুগ্ধং গীতামৃতং মহৎ॥

'উপনিষদ্‌ হচ্ছে সর্বশাস্ত্রের সার আর গীতা হচ্ছে উপনিষদের সারাৎসার। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গোপালরূপে এই গাভীরূপী উপনিষদ্‌ হতে এবং পার্থরূপী বৎস সামনে রেখে দুগ্ধরূপী গীতার নির্যাস সুধীজনকে (ভক্তজনে) বিলিয়ে দিয়েছেন।'

গীতার ৭০০টি শ্লোকের মধ্যে ধৃতরাষ্ট্রের—১, সঞ্জয়ের—৪১, অর্জুনের—৮৪ এবং অবশিষ্ট ৫৭৪টি শ্লোক স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ কথিত।

গীতাও শ্রীমদ্ভাগবত ও শ্রীচণ্ডীর মতো ষট সংবাদরূপে পরিবেশিত হয়েছে। কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবত বা শ্রীচণ্ডীর মতো গীতা শুরুতেই ষট প্রশ্ন এবং তার ব্যাখ্যা দিয়ে বিস্তৃত হয়নি। গীতায় অর্জুন কৃত দ্বাদশটি প্রশ্ন আছে সমগ্র গীতাব্যাপী এবং ভগবানও যেমন যেমন সংশয় এসেছে

তেমন তেমন তা নিরসন করেছেন।

সৃষ্টির আদিতে পরমাত্মার সংকল্প জাগে যে 'আমি সৃষ্টি করব', 'আমিই বহুরূপ ধারণ করব'। **'একৈবাহং বহুস্যাম প্রজাজেয়'**।

কিন্তু সৃষ্টি কেন ? **'সৃষ্টা তু লীলা কৈবল্যম্'**।

এ হচ্ছে পরমাত্মার সঙ্গে জীবাত্মার লীলাখেলা আর ভগবানের এই খেলায় জগৎ-সংসার, শরীরাদি হচ্ছে তাঁর খেলার সামগ্রী। জীবসকল কিন্তু এই প্রকৃত খেলা ভুলে, খেলার সামগ্রী অর্থাৎ শরীরাদিকে নিজস্ব ব্যক্তিগত সম্পত্তি মনে করে ভ্রান্ত ব্যবহারে প্রবৃত্ত হয় এবং ভগবৎ বিমুখ হয়ে পড়ে। জীব যাতে ঈশ্বরমুখী হয় এবং ভগবানের সঙ্গে তার নিত্য যোগ (সম্বন্ধ) খুঁজে পায় সেইজন্য যোগশাস্ত্ররূপী ভগবদ্গীতার আবির্ভাব। গীতায় তাই যোগের মাহাত্ম্য অনেক এবং একে যোগশাস্ত্র (ভগবানের সঙ্গে ভক্তর যুক্ত হওয়ার পথ) বলা হয়েছে।

তবে জীবাত্মা ও পরমাত্মার, ভক্ত ও ভগবানের, যোগী ও ঈশ্বরের পার্থক্য অনেক। ভগবানের যে জগৎসংসারের উৎপত্তি, স্থিতি, প্রলয় ইত্যাদির সামর্থ্য আছে, সে ক্ষমতা যোগীর থাকে না। ব্রহ্মসূত্র বলছেন ভক্ত **'জগৎ ব্যাপারবর্জম্'** (ব্রহ্মসূত্র. ৪।৪।১৯) অর্থাৎ যোগীর জগৎ সংসার নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা থাকে না। তাঁর ক্ষমতা হয় কেবল সংসারের ওপর বিজয়প্রাপ্তির, সংসারের অনুকূল-প্রতিকূল পরিস্থিতির প্রভাব তাঁর প্রতি না পড়ার ওপর।

গীতায় অর্জুন যুদ্ধ নিয়ে প্রশ্ন করেননি, তিনি তাঁর কল্যাণ প্রার্থনা করেছিলেন। ভগবান তাই শাস্ত্রাদিতে যতপ্রকার কল্যাণকর সাধন প্রণালী আছে যথা— কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ, ধ্যানযোগ, হঠযোগ, লয়যোগ, প্রাণায়াম, যজ্ঞ, দান, তপ ইত্যাদি সকল সাধন প্রণালীই গীতায় সংক্ষেপে অথচ পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বর্ণনা করেছেন। গীতায় কোথাও কাউকে সম্প্রদায় বা সাধনপথ **পরিবর্তনের** কথা বলা হয়নি, বলা হয়েছে **পরিমার্জনের** কথা ; তাই সাধকজগতে গীতা বিশেষভাবে সমাদৃত। তবে সমস্ত যোগ বা ভগবানের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার সকল সাধনের মধ্যে

'কর্মযোগ', 'জ্ঞানযোগ' ও 'ভক্তিযোগ'ই বিশেষভাবে প্রচলিত। তাই ভগবান গীতায় এই তিনটি যোগই মুখ্যরূপে বলেছেন। ভাগবতেও শ্রীকৃষ্ণ-উদ্ধব সংবাদে ভগবান বলেছেন—

যোগাস্ত্রয়ো ময়া প্রোক্তা নৃণাং শ্রেয়োবিধিৎসয়া।
জ্ঞানং কর্ম চ ভক্তিশ্চ নোপায়োন্যোঽস্তি কুত্রচিৎ॥ (ভাগবত ১১।২০।৬)

'নিজ কল্যাণকামী ব্যক্তিগণের জন্য আমি তিনটি যোগপথ বলেছি —জ্ঞানযোগ, কর্মযোগ ও ভক্তিযোগ। এই তিনটি ছাড়া কল্যাণ লাভের আর কোনো পথ নেই।'

এর মধ্যে যাঁর কর্মে অধিক রুচি ও আগ্রহ থাকে তিনি কর্মযোগের অধিকারী, যাঁর মধ্যে নিজেকে জানার আগ্রহ প্রবল তিনি জ্ঞানযোগের অধিকারী এবং যাঁর মধ্যে ভগবানে শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস বেশি তিনি ভক্তিযোগের অধিকারী। এই সকল যোগপন্থাই পরমাত্মা প্রাপ্তির পৃথক পৃথক সাধন এবং আর যা কিছু সাধন আছে সবই এই তিন সাধনার অন্তর্গত।

জ্ঞানযোগে বিবেকের (জানার) প্রাধান্য এবং ভক্তিযোগে শ্রদ্ধার (মানার) প্রাধান্য থাকে। প্রকৃতপক্ষে পরমাত্মাকে জানার ও মানার বিষয়ে জাগতিক কোনো উদাহরণই দেওয়া সম্ভব নয় ; কারণ জগৎকে জানার ও মানার ব্যাপারে মন ও বুদ্ধির সাহায্য নিতে হয় কিন্তু পরমাত্মাকে জানার ও মানার ব্যাপারে মন-বুদ্ধির কোনো ভূমিকাই নেই কারণ পরমাত্মার অনুভব স্ব-স্বরূপে হয়, মন-বুদ্ধির দ্বারা নয়।

যেমন একটি স্ত্রী ও পুরুষের বিবাহ পরস্পরকে জানলে বা কথা বললে হয় না, যখন তারা পরস্পরকে গ্রহণ করে তখনই বিবাহ সংঘটিত হয়, সেইরকম যখন স্বয়ং নিজে জড় সংস্কার পরিত্যাগ করে পরমাত্মাকে গ্রহণ করে তখনই যোগ সংঘটিত হয়, তাঁরা যুক্ত হন। কর্মযোগে সকল প্রাণীতে আত্মভাবই জড়ভাবকে পরিত্যাগ করায়। জ্ঞানযোগে স্বয়ংই স্বয়ংকে (আত্মস্বরূপ) জেনে জড়ভাব পরিত্যাগ করে এবং ভক্তিযোগে স্বয়ংই ভগবানের শরণাগত হয়ে জড়ভাব পরিত্যাগ করে।

গীতার প্রথম অধ্যায়টির নাম 'অর্জুনবিষাদযোগ' অর্থাৎ অর্জুনের

মোহর বর্ণনা। আসক্তিতে মোহর শুরু এবং আত্ম-উপলব্ধিতে মোহর অন্ত (মোক্ষসন্ন্যাসযোগ—অষ্টাদশ অধ্যায়), এই হচ্ছে গীতার বর্ণনা।

বস্তুত গীতা উপদেশের প্রারম্ভের বীজ হচ্ছে প্রথম অধ্যায়ের শেষ শ্লোকটি।

এবমুক্ত্বার্জুনঃ সংখ্যে রথোপস্থ উপাবিশৎ।
বিসৃজ্য সশরং চাপং শোকসংবিগ্নমানসঃ॥ (গীতা ১।৪৭)

'অতঃপর অর্জুন বিষাদযুক্তভাবে গাণ্ডীব ধনু পরিত্যাগ করে এবং যুদ্ধ না করার মনস্থ করে রথে উপবেশন করলেন।'

এই মোহজনিত অবস্থা থেকে অর্জুনের ক্রম উত্তরণ হয়েছে প্রতি অধ্যায়ে এবং তার পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়েছে অষ্টাদশ অধ্যায়ে। অর্জুনের পরের পর প্রশ্নের ধারাতেই তা বোঝা যায়।

যদিও সমগ্র গীতায় বিভিন্ন স্থানে অর্জুন মোট ২৯টি প্রশ্ন করেছেন, তবে আলোচ্য বইটিতে আমরা সেগুলি সংযোজিত করে মুখ্যরূপে ১২টি প্রশ্নের মাধ্যমে আলোচনা করব।

দ্বিতীয় থেকে নবম (ও আংশিক দশম) অধ্যায় অর্জুন শ্রীকৃষ্ণকে আটটি প্রশ্ন করেছেন তা মূলত কর্মজনিত সংশয় সম্বন্ধে।

দশম অধ্যায়ে বিভূতিযোগ ও একাদশ অধ্যায়ের বিশ্বরূপদর্শনযোগ মূলত শ্রদ্ধা ও বিস্ময়ভরা অর্জুনের আকুতি ও স্তুতি।

অর্জুনের পরবর্তী ৪টি প্রশ্ন (দ্বাদশ হতে অষ্টাদশ অধ্যায়) অনেক পরিণত এবং জ্ঞান ও ভক্তি পরিপ্লুত।

শেষ অধ্যায়ে এসে অর্জুনের প্রশ্ন সমাপ্ত, সংশয় তিরোহিত। তিনি বলেছেন—

নষ্টো মোহঃ স্মৃতির্লব্ধা ত্বৎপ্রসাদান্ময়াচ্যুত।
স্থিতোঽস্মি গতসন্দেহঃ করিষ্যে বচনং তব॥ (গীতা ১৮।৭৩)

'হে কৃষ্ণ! তোমার কৃপায় আমার মোহ দূর হয়েছে, আমি স্মৃতিজ্ঞান ফিরে পেয়েছি। আমি এখন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে তোমারই ইচ্ছায় কর্ম (আত্মসমর্পণ) করতে প্রস্তুত।

প্রথম প্রশ্ন

প্রথম অধ্যায়ে অর্জুনের মোহজনিত অভিব্যক্তি শুনে ভগবান দ্বিতীয় অধ্যায়ে সাংখ্যযোগ তথা কর্মযোগ (সমত্ব) সম্বন্ধে বিস্তৃত বর্ণনা করে বলেছেন—যখন তোমার বুদ্ধি মোহরূপ পঙ্ক ও শাস্ত্রাদি মতভেদের বিক্ষিপ্ততা অতিক্রম করবে তখন তুমি যোগপ্রাপ্ত হবে এবং তোমার বুদ্ধিও পরমাত্মায় অচলা হবে—

সমাধাবচলা বুদ্ধিস্তদা যোগমবাপ্স্যসি॥ (গীতা ২।৫৩)

তখন অর্জুনের সংশয় উপস্থিত হল যে, সাধক যোগপ্রাপ্ত বা স্থিতপ্রজ্ঞ হলে তাঁর লক্ষণ কী হবে ? তাঁর অন্যান্য গুণই বা কী ? তাঁর প্রশ্ন হল—

স্থিতপ্রজ্ঞস্য কা ভাষা সমাধিস্থস্য কেশব।
স্থিতধীঃ কিং প্রভাষেত কিমাসীত ব্রজেত কিম্॥ (গীতা ২।৫৪)

'অর্জুনের জিজ্ঞাসা—স্থিতপ্রজ্ঞর লক্ষণ কী ? তাঁরা কীভাবেই বা কথা বলেন ? কীভাবে থাকেন ? কীভাবেই বা চলেন ?'

এর উত্তর ভগবান দ্বিতীয় অধ্যায়ের বাকি ১৮টি শ্লোকে (শ্লোক ৫৫-৭২) দিয়েছেন।

স্থিতপ্রজ্ঞর লক্ষণ	শ্লোক ৫৫
স্থিতপ্রজ্ঞর ভাষা (ভাব)	শ্লোক ৫৬-৫৭
স্থিতপ্রজ্ঞর অবস্থান	শ্লোক ৫৮-৬৩
স্থিতপ্রজ্ঞর বিচরণ	শ্লোক ৬৪-৭২

স্থিতপ্রজ্ঞর লক্ষণ—(শ্লোক ৫৫)

প্রজহাতি যদা কামান্ সর্বান্ পার্থ মনোগতান্।
আত্মন্যেবাত্মনা তুষ্টঃ স্থিতপ্রজ্ঞস্তদোচ্যতে॥

(গীতা ২।৫৫)

'ভগবান অর্জুনের প্রশ্নের উত্তরে বলছেন যখন সাধক তাঁর সমস্ত মনোগত কামনা সম্পূর্ণভাবে পরিত্যাগ করে আপনাতে আপনি সন্তুষ্ট থাকেন, তখন তাঁকে স্থিতপ্রজ্ঞ বলে।'

জগতে দুই প্রকার ব্যক্তি আছে—স্থিরবুদ্ধিসম্পন্ন ও অস্থিরবুদ্ধিসম্পন্ন। অস্থির বুদ্ধিদের বর্ণনা করা হয়েছে দ্বিতীয় অধ্যায়ের একচল্লিশ থেকে চুয়াল্লিশ শ্লোক পর্যন্ত আর স্থির বুদ্ধিসম্পন্ন অর্থাৎ স্থিতপ্রজ্ঞদের সম্বন্ধে বলা হয়েছে এই প্রকরণের পঞ্চান্ন থেকে বাহাত্তর শ্লোক পর্যন্ত। সমত্ব প্রাপ্তির জন্য বুদ্ধির স্থিরতা অত্যন্ত প্রয়োজন। পাতঞ্জল যোগদর্শনে মনের স্থিরতার (চিত্তবৃত্তি নিরোধের) কথা বলা হয়েছে কিন্তু গীতায় **বুদ্ধির স্থিরতাকে (উদ্দেশ্যের দৃঢ়তা)** বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। মন স্থির হলে লৌকিক সিদ্ধি এবং বুদ্ধি স্থির হলে পারমার্থিক সিদ্ধি লাভ হয়। ভগবান তাই বলেছেন **'যোগস্থঃ কুরু কর্মাণি'** (গীতা ২।৪৮)। যোগস্থ বা সমত্ব হল যা কিছু কর্ম করা হয় তা পূর্ণ হোক বা না হোক তাতে সমভাব বা সমবুদ্ধি রাখা।

স্থিতপ্রজ্ঞর ভাষা (ভাব)—(শ্লোক ৫৬-৫৭)

দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ।
বীতরাগভয়ক্রোধঃ স্থিতধীর্মুনিরুচ্যতে॥
যঃ সর্বত্রানভিস্নেহস্তত্তৎ প্রাপ্য শুভাশুভম্।
নাভিনন্দতি ন দ্বেষ্টি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা॥

(গীতা ২।৫৬-৫৭)

'স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তি দুঃখে উদ্বেগহীন, সুখে বিগতস্পৃহ, ভয় ও ক্রোধ রহিত হন।

তিনি সর্ববিষয়ে আসক্তিশূন্য এবং শুভ-অশুভ প্রাপ্তিতে আনন্দিত ও অসন্তুষ্ট হন না।' (গীতা ২।৫৬-৫৭)

অর্জুন স্থিতপ্রজ্ঞর ভাষা অর্থাৎ তাঁরা কীভাবে কথা বলেন জিজ্ঞাসা করেছিলেন, ভগবান তার উত্তরে স্থিতপ্রজ্ঞর কী ভাব—তা বর্ণনা করেছেন। কর্মযোগী স্থিতপ্রজ্ঞ হন কারণ তাঁর মুখ্য লক্ষ্য হল অপরের হিতার্থে কর্ম করা, যার ফলে তাঁর কর্মফলে আসক্তি ও কর্মে মমতা জন্মায় না। কর্মে সর্বদা

অনাসক্ত থাকাই হল কর্মযোগীর সাধনা। তাই যোগী সুখ-দুঃখ, রাগ-ভয়-ক্রোধ আদি দ্বন্দ্বরহিত হন।

স্থিতপ্রজ্ঞর অবস্থান—(শ্লোক ৫৮-৬৩)

যদা সংহরতে চায়ং কূর্মোঽঙ্গানীব সর্বশঃ।
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেভ্যস্তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা॥
বিষয়া বিনিবর্তন্তে নিরাহারস্য দেহিনঃ।
রসবর্জং রসোঽপ্যস্য পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ততে॥
যততো হ্যপি কৌন্তেয় পুরুষস্য বিপশ্চিতঃ।
ইন্দ্রিয়াণি প্রমাথীনি হরন্তি প্রসভং মনঃ॥
তানি সর্বাণি সংযম্য যুক্ত আসীত মৎপরঃ।
বশে হি যস্যেন্দ্রিয়াণি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা॥
ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গস্তেষূপজায়তে।
সঙ্গাৎ সংজায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোঽভিজায়তে॥
ক্রোধাদ্ভবতি সম্মোহঃ সম্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ।
স্মৃতিভ্রংশাদ্ বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি॥

(গীতা ২।৫৮-৬৩)

'যেমন কচ্ছপ নিজ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে সর্বদিক থেকে সঙ্কুচিত করে রাখে, তেমনি কর্মযোগীও ইন্দ্রিয়াদির বিষয়সমূহ থেকে ইন্দ্রিয়গুলিকে সর্বতোভাবে সংহরণ করে নেন (অপসরণ করে নেন), ফলে তাঁর বুদ্ধি স্থিতপ্রজ্ঞ হয়।

অনাহারী (ইন্দ্রিয়গুলিকে বিষয় হতে প্রত্যাহারকারী) ব্যক্তির বিষয়ভোগ নিবৃত্ত হলেও (বিষয়)তৃষ্ণা নিবৃত্ত হয় না। কিন্তু পরমাত্মতত্ত্ব অনুভূত হলে স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তির বিষয়তৃষ্ণাও নিবৃত্ত হয় অর্থাৎ তাঁর সংসারে বিন্দুমাত্র আসক্তি থাকে না।

হে কুন্তীনন্দন ! (বিন্দুমাত্রও আসক্তি থাকলে) যত্নশীল বিবেকবান মানুষের প্রমথনশীল (চিত্তবিক্ষেপকারী) ইন্দ্রিয়গুলি তার চিত্তকে বলপূর্বক হরণ করে।

অতএব কর্মযোগী সাধক সমস্ত ইন্দ্রিয় সংযত করে যেন আমাতে চিত্ত

সমাহিত করে অবস্থান করেন ; কারণ যাঁর ইন্দ্রিয়গুলি সংযত, তাঁরই বুদ্ধি প্রতিষ্ঠিত (স্থিতপ্রজ্ঞ) বলা হয়।

বিষয়গুলি নিয়ে চিন্তা করলে সেগুলির প্রতি আসক্তি জন্মায়। আসক্তি থেকে উৎপন্ন হয় কামনা অর্থাৎ বিষয়ভোগের প্রতি আকাঙ্ক্ষা, তাতে বাধাপ্রাপ্ত হলে জন্মায় ক্রোধ।

ক্রোধ থেকে জন্ম নেয় সম্মোহ বা মূঢ়তা। মূঢ়তা থেকে হয় স্মৃতিভ্রংশ বা বুদ্ধিভ্রষ্ট। স্মৃতিভ্রষ্ট হলে বুদ্ধিনাশ হয় এবং বুদ্ধিনাশ হয়ে গেলে হয় মানুষের পতন বা বিনাশ।' (গীতা ২।৫৮-৬৩)

আটান্ন শ্লোকে ভগবান এখানে স্থিতপ্রজ্ঞ যোগীর লক্ষণকে কচ্ছপের সঙ্গে তুলনা করেছেন। কারণ কচ্ছপ যেমন বাইরের কোনো স্পর্শ পেলেই তার ছয়টি অঙ্গ (চার পা, লেজ ও মাথা) গুটিয়ে নেয় সেইরকম স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তিও বিষয় সংস্পর্শ দেখলে তার ছয় অঙ্গ (পঞ্চ ইন্দ্রিয় ও মন) প্রত্যাহার করে নেন। ইন্দ্রিয়গুলি নিজ নিজ বিষয় থেকে সর্বতোভাবে প্রত্যাহৃত হলে পরমাত্মতত্ত্ব স্বতঃসিদ্ধভাবে অনুভূত হয়, যা কোনো ক্রিয়া বা ত্যাগের ফল নয় কারণ এই তত্ত্ব নতুন উৎপন্ন হওয়ার মতন বস্তু নয়, ইহা স্বপ্রকাশ। যেমন সূর্য প্রকাশমান থাকলেও চোখ বন্ধ করলে সূর্যকে দেখা যায় না, কিন্তু চক্ষু উন্মীলন হলেই সূর্য দেখা যায় এবং এটির মধ্যে কোনো কার্য-কারণ সম্পর্ক নেই, সেই রকম ভোগ ইত্যাদির সঙ্গে সম্বন্ধরূপ আচ্ছাদন অপসারিত হলেই পরমাত্মতত্ত্বও স্বতঃই অনুভূত হয়।

ঊনষাট থেকে একষট্টি শ্লোকে ভগবান সংসারে আসক্তির কারণ ও তার থেকে নিবৃত্তির কথা বলেছেন। ভোগের অস্তিত্ব ও গুরুত্ব মেনে নিলে অন্তরে ভোগের জন্য যে সূক্ষ্ম আকর্ষণ, প্রিয়তা, ভালোবাসা তৈরি হয় তাকে বলে 'রস'। যতক্ষণ পর্যন্ত সংযোগজনিত সুখে ব্যক্তির 'রসবুদ্ধি' থাকে ততক্ষণ তার প্রকৃতি ও প্রকৃতির কার্যাদির (ক্রিয়া, পদার্থ ও ব্যক্তির) প্রতি পরাধীনতা বজায় থাকে। এমন অবস্থায় পরমাত্মার অলৌকিক রস প্রকটিত তো হয়ই না বরঞ্চ তাদের পরমাত্মা প্রাপ্তির দৃঢ়তাও থাকে না—**'ভোগৈশ্বর্যপ্রসক্তানাং তয়াপহৃতচেতসাম্'** (গীতা ২।৪৪)। তত্ত্ববোধ হলে এই রসবুদ্ধি শুকিয়ে যায় এবং আসক্তিরও নিবৃত্তি হয় তখন 'পরং

দ্রষ্ট্বা নিবর্ততে' (গীতা ২।৫৯)। তত্ত্ববোধ হওয়ার পূর্বেও বৈরাগ্য, সৎসঙ্গ, সাধুর কৃপা বা সঙ্গদ্বারাও রস নিবৃত্ত হতে পারে ; আবার কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ—এই তিন সাধনার সাহায্যেও বিনাশশীল ভোগের রস নিবৃত্ত হয়। কর্মযোগে সেবার রস, জ্ঞানযোগে তত্ত্ব অনুভবের রস এবং ভক্তিযোগে প্রেমের রস যেমন যেমন অনুভব হতে থাকে তেমন তেমন বিনাশশীল রস দূর হতে থাকে। রসবুদ্ধি থাকলে ভোগপ্রাপ্তি হলেই মানুষের চিত্ত চঞ্চল হয় এবং সে ভোগের বশীভূত হয়ে পড়ে, কিন্তু রসবুদ্ধি নিবৃত্ত মহাপুরুষদের চিত্তে ভোগ্যবস্তু প্রাপ্ত হলেও বিন্দুমাত্রও বিকার উৎপন্ন হয় না। তখন সে '**স শান্তিমাপ্নোতি ন কামাকামি**' (গীতা ২।৭০)। কিন্তু তত্ত্বজ্ঞ হওয়ার পূর্বে ইন্দ্রিয়সকল বিষয়গুলির সম্মুখীন হলে ভোগ্যপদার্থের প্রতি (নিজ সংস্কার বশে) আসক্ত হয় এবং অনেক সময় বিবেকবান ব্যক্তিদেরও ইন্দ্রিয় আপন বশে থাকে না। অনেক ঋষি-মুনিদের ক্ষেত্রেও এইরূপ চিত্তচাঞ্চল্য দেখা যায়। তাই ভগবান বলছেন—'**যততো হ্যপি কৌন্তেয় পুরুষস্য বিপশ্চিতঃ**' (গীতা ২।৬০)—তাই কখনো এরকম অহংকার করা উচিত নয় যে আমি জিতেন্দ্রিয় হয়ে গেছি।

নিজ সামর্থ্যের প্রতি অহংভাব সাধকের উন্নতির পথে বড় বাধক। তাই ভগবান বলছেন—'**যুক্ত আসীত মৎপরঃ**' অর্থাৎ ইন্দ্রিয় সংযমের কারণ হিসেবে নিজেকে না দেখে, ভগবৎ কৃপাকেই কারণ বলে মনে করো। মানব দেহলাভ, সাধনায় রুচি হওয়া, তাতে ব্যাপৃত থাকা এবং সিদ্ধিলাভ করা এসবই ভগবৎকৃপা—এই ভেবে ভগবৎপরায়ণ হলে সাধনায় সিদ্ধিলাভ হয়।

দুর্লভং ত্রয়ং এতৎ দৈবানুগ্রহ কারকম্।
মনুষ্যত্বং মুমুক্ষুত্বং মহাপুরুষসংশ্রয়ম্।।

ভগবান এই প্রকরণের শেষের দুই শ্লোকে অর্থাৎ বাষট্টি ও তেষট্টি শ্লোকে কাম, ক্রোধ ও লোভের কথা বলেছেন। কামনা হল রজোগুণ বৃত্তি, মোহ হল তমোগুণবৃত্তি ও ক্রোধ হল রজ ও তম গুণের মিশ্রণ। ক্রোধ তখনই হয় যখন কোথাও আসক্তি থাকে। যদি কখনো ন্যায়নীতির বিরুদ্ধাচরণকারীর প্রতি ক্রোধ হয় তবে বুঝতে হবে ন্যায়নীতির প্রতি

অনুরাগ আছে। যদি অপমান ও তিরস্কারীর ওপর ক্রোধ জন্মায় তাহলে বুঝতে হবে মান ও সম্মানের প্রতি অনুরাগ আছে। নিন্দাকারীর ওপর ক্রোধ হলে বুঝতে হবে প্রশংসার প্রতি আসক্তি আছে।

আর ভগবান বলেছেন **'ক্রোধাৎ ভবতি সম্মোহ'** অর্থাৎ ক্রোধ হতে সম্মোহ আসে অর্থাৎ মূঢ়তা চিত্তকে আচ্ছন্ন করে দেয়। প্রকৃতপক্ষে কাম, ক্রোধ, লোভ এবং মমতা—এই চারটি থেকেই সম্মোহ আসে।

কামনার সম্মোহ—এতে বিচার-বিবেচনা লোপ পায় এবং লোভের বশে মানুষ উপযুক্ত নয় এমন কাজও করে ফেলে।

ক্রোধের সম্মোহ—ক্রোধের সম্মোহে মানুষ তার প্রিয়জন ও পূজ্য-ব্যক্তিকে ভালো-মন্দ কথা বলে ফেলে আর অনুচিত কাজ করে বসে।

লোভের সম্মোহ—মানুষের সত্যাসত্য, ধর্মাধর্ম বিচার থাকে না এবং সে কপট ব্যবহার করে লোক ঠকায়।

মমতার সম্মোহ—এতে মানুষের ব্যবহারে সমতা (সমত্ব) নষ্ট হয় এবং সে পক্ষপাত দুষ্ট হয়ে পড়ে।

এখানে বিষয়চিন্তা থেকে আসক্তি, তার থেকে কামনা, তার থেকে ক্রোধ, ক্রমে সম্মোহ, তৎপরে স্মৃতিভ্রংশ, তারপরে বুদ্ধিনাশ এবং শেষে পতন—এই যে বৃত্তির ক্রম বলা হয়েছে তা হতে কিন্তু দেরি হয় না। অন্তরের সংস্কার বিদ্যুৎ প্রবাহের মতন এইসব বৃত্তি তৎক্ষণাৎ উৎপন্ন করে মানুষের পতন ঘটায়।

স্থিতপ্রজ্ঞর বিচরণ—(শ্লোক ৬৪-৭২)

রাগদ্বেষবিযুক্তৈস্তু বিষয়ানিন্দ্রিয়ৈশ্চরন্।
আত্মবশ্যৈর্বিধেয়াত্মা প্রসাদমধিগচ্ছতি॥
প্রসাদে সর্বদুঃখানাং হানিরস্যোপজায়তে।
প্রসন্নচেতসো হ্যাশু বুদ্ধিঃ পর্যবতিষ্ঠতে॥
নাস্তি বুদ্ধিরযুক্তস্য ন চাযুক্তস্য ভাবনা।
ন চাভাবয়তঃ শান্তিরশান্তস্য কুতঃ সুখম্॥
ইন্দ্রিয়াণাং হি চরতাং যন্মনোঽনুবিধীয়তে।

তদস্য হরতি প্রজ্ঞাং বায়ুর্নাবমিবাম্ভসি॥
তস্মাদ্ যস্য মহাবাহো নিগৃহীতানি সর্বশঃ।
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেভ্যস্তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা॥
যা নিশা সর্বভূতানাং তস্যাং জাগর্তি সংযমী।
যস্যাং জাগ্রতি ভূতানি সা নিশা পশ্যতো মুনেঃ॥
আপূর্যমাণমচলপ্রতিষ্ঠং সমুদ্রমাপঃ প্রবিশন্তি যদ্বৎ।
তদ্বৎ কামা যং প্রবিশন্তি সর্বে স শান্তিমাপ্নোতি ন কামকামী॥
বিহায় কামান্ যঃ সর্বান্ পুমাংশ্চরতি নিঃস্পৃহঃ।
নির্মমো নিরহঙ্কারঃ স শান্তিমধিগচ্ছতি॥
এষা ব্রাহ্মী স্থিতিঃ পার্থ নৈনাং প্রাপ্য বিমুহ্যতি।
স্থিত্বাস্যামন্তকালেঽপি ব্রহ্মনির্বাণমৃচ্ছতি॥

(গীতা ২।৬৪-৭২)

'কর্মযোগী সাধক চিত্ত নিজ বশীভূত এবং মন অনুরাগ ও বিদ্বেষমুক্ত হয়ে যদি ইন্দ্রিয়দ্বারা বিষয় উপভোগও করেন তবু তিনি প্রসন্নতা লাভ করেন।

সাধকের হৃদয়ে প্রসন্নতা জন্মালে শীঘ্রই তাঁর সমস্ত দুঃখ দূর হয়। এইরূপ প্রসন্ন হৃদয় সাধকের বুদ্ধি নিঃসন্দেহে পরমাত্মায় স্থিতিলাভ করে।

আর যারা সংযতচিত্ত নয় এইরূপ ব্যক্তির ব্যবসায়াত্মিকা (নিশ্চয়াত্মিকা) বুদ্ধি আসে না এবং বুদ্ধি নিশ্চয়াত্মিকা না হওয়াতে তাদের মধ্যে নিষ্কামভাব বা কর্তব্য-নিষ্ঠাও আসে না। নিষ্কামভাব না থাকলে শান্তি আসবে কীভাবে, আর শান্তি না আসলে সুখ কোথায়। (গীতা ২।৬৪-৬৬)

যেমন জলে ভাসমান নৌকাকে পবন (বায়ু) ইচ্ছেমতন নিয়ে যায়, সেইরকম নিজ নিজ বিষয়ে বিচরণশীল একটি ইন্দ্রিয়ও যখন মনকে বশীভূত করে নেয়, তখন সেই ইন্দ্রিয় প্রজ্ঞাকে (কর্তব্যপরায়ণতা, বিবেক) হরণ করে থাকে।

হে অর্জুন ! তাই যে ব্যক্তির ইন্দ্রিয়সমূহ ভোগ্যবিষয় থেকে সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাহৃত হয়েছে তাকেই স্থিতপ্রজ্ঞ বলে জানবে।

সমস্ত মানুষের পক্ষে যা অন্ধকারাচ্ছন্ন অর্থাৎ পরমাত্মা-বিমুখতা তাতে

সংযমী ব্যক্তি জাগরিত থাকেন এবং যাতে সাধারণ মানুষ জাগরিত থাকে (অর্থাৎ জাগতিক ভোগ সঞ্চয় করে) তা আত্মদর্শী মুনিগণ রাত্রিস্বরূপ (বিঘ্নস্বরূপ, অসার) মনে করেন।

আবার যেমন জলপূর্ণ সমুদ্রে নদনদীর জল মিশলেও তা অচলরূপে বিরাজ করে, তেমনি সংযমী মানুষের মধ্যেও যখন বিষয়সকল প্রবেশ করে তা বিলীন হয়ে যায়, তাঁর মধ্যে কোনো বিকার উৎপন্ন হয় না, তিনি পরমশান্তি লাভ করেন। যিনি ভোগবাসনা রাখেন তিনি শান্তি লাভ করেন না।

আর যিনি সমস্ত কামনা-বাসনা পরিত্যাগ করে নিঃস্পৃহ, মমতাশূন্য এবং অহংকাররহিত হয়ে বিচরণ করেন তিনিই শান্তি প্রাপ্ত হন।

একেই বলে ব্রাহ্মীস্থিতি (ব্রহ্মজ্ঞানে অবস্থিতি)। জীবের এই অবস্থা প্রাপ্ত হলে তিনি আর মোহগ্রস্ত হন না। মৃত্যুকালেও যদি কেউ এই অবস্থা লাভ করে তবে তিনি নির্বাণ লাভ করেন অর্থাৎ তাঁর ব্রহ্মপ্রাপ্তি হয়।' (গীতা ২।৬৭-৭২)

ভগবান এই প্রকরণে সংযমী সাধক ও অসংযমী ব্যক্তির কথা বলেছেন। আসক্তিসহ বিষয় ভোগ করলে পতন আর আসক্তি ত্যাগ করে বিষয়ভোগ করলে উন্নতি হয়। যিনি অসংযমী তার কখনো 'আমাকে পরমাত্মা প্রাপ্তি' করতেই হবে এইরূপ একনিষ্ঠতা থাকে না। সে কখনো সম্মান, কখনো সুখ ও আরাম, কখনো অর্থ আবার কখনো ভোগসুখাদি আকাঙ্ক্ষা করতেই থাকে আর তার মধ্যে এইরূপ নানা কামনা উৎপন্ন হতে থাকার ফলে তার বুদ্ধি একনিষ্ঠ হয় না। বুদ্ধি একনিষ্ঠ না হলে সে কর্তব্য-কর্ম থেকে বিচ্যুত হয় এবং তাই তার অশান্তির কারণ হয়। যার মন অশান্ত সে কখনো সুখী হতে পারে না। ভগবান বলছেন **'অশান্তস্য কুতঃ সুখম্'**।

মনে যখন কোনো বিষয়ের গুরুত্ব স্থান পায় তখন সেই বিষয় ভোগকারী ইন্দ্রিয় মনকে তার অনুগামী করে নেয় এবং মনে ভোগবুদ্ধি উৎপন্ন হয়। এই ভোগবুদ্ধিই সাধকের বুদ্ধি নাশ করে তার প্রজ্ঞা হরণ করে। ইন্দ্রিয়র সঙ্গে মনের যোগ যতক্ষণ না হয় ততক্ষণ ওই ইন্দ্রিয়র নিজ বিষয়েও কোনো জ্ঞান থাকে না— **'অধিষ্ঠায় মনশ্চায়ং বিষয়ানুপসেবতে'** (গীতা ১৫।৯)। এখানে

উদাহরণ দিয়ে বায়ুতাড়িত নৌকার কথা **'বায়ুর্নাবমিবাম্ভসি'** বলা হয়েছে। বায়ু নৌকাকে দুভাবে বিঘ্নিত করতে পারে—পথভ্রষ্ট করতে পারে বা ডুবিয়ে দিতে পারে। আবার বায়ুর ক্রিয়াকে নিজ অনুকূলে আনতে পারলে নৌকা নিজপথ থেকে তো বিচ্যুত হয়ই না উপরন্তু তা গন্তব্যস্থলে পৌঁছাতে সাহায্য করে। সেইরকম ইন্দ্রিয়ের অনুগামী হওয়া মন, বুদ্ধিকে দুইভাবে বিচলিত করে। এক, পরমাত্মা প্রাপ্তির ইচ্ছেকে দমিয়ে ভোগপ্রাপ্তির ইচ্ছার প্রকাশ ঘটায় অথবা অবৈধভোগে নিযুক্ত করে পতন ঘটায়। যাঁর মন ও ইন্দ্রিয় নিজ বশীভূত, সেই সাধকের মন বুদ্ধিকে বিচলিত করতে পারে না, বরং পরমাত্মার নিকট পৌঁছাতে সাহায্য করে। তাই **'প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা'** তাঁর পক্ষেই সম্ভব হয় যার ইন্দ্রিয় **'নিগৃহীতানি সর্বশঃ'** (গীতা ২।৬৮) অর্থাৎ যে সাধকের মন সাংসারিক ব্যবহারের সময় বা একান্তে চিন্তার সময়ে কোনো অবস্থাতেই ইন্দ্রিয়াদির ভোগ বা বিষয় চিন্তায় লিপ্ত হয় না। মন কোনো অবস্থাতেই বুদ্ধিকে অতিক্রম করতে সক্ষম না হওয়ার কারণ তাঁর মূল লক্ষ্য হল পরমাত্মাকে লাভ করা, ভোগ-বিলাস বা সম্পদ সংগ্রহ নয়।

ভগবান সংযমী ও অসংযমী (ভূতানি) সম্বন্ধে আরও একটি উদাহরণ দিয়ে বলেছেন—কিছু সাংসারিক ব্যক্তি রাত-দিন ভোগ এবং সম্পদসংগ্রহে ব্যস্ত থাকে, তারা সাংসারিক কাজে অত্যন্ত সাবধান ও নিপুণ, নানা বস্তু আবিষ্কার করে, লৌকিক বস্তুর প্রাপ্তি হলে নিজের উন্নতি হয়েছে বলে মনে করে, সাংসারিক বস্তুসমূহের প্রশংসা করে ইত্যাদি।

আবার কিছু সকামী ভক্ত সুখভোগ-এর উদ্দেশ্যে বড় বড় যাগযজ্ঞ করে, দেবতাদের পূজা অর্চনা করে, জপতপ করে কিন্তু এসবই হয় সুখভোগের উদ্দেশ্যে **'কামোপভোগপরমা এতাবদিতি নিশ্চিতাঃ'** (গীতা ১৬।১১), কখনোই নিজের কল্যাণের নিমিত্ত নয়। পারমার্থিক বিষয়ের দিকে তাঁদের বুদ্ধি যায় না কারণ তাদের দৃষ্টি সদাই **'যস্যাং জাগ্রতি ভূতানি'** (গীতা ২।৬৯) অর্থাৎ চিত্ত সদা বাসনা পরিপ্লুত।

কিন্তু তত্ত্বজ্ঞ, জীবন্মুক্ত মহাপুরুষ এবং সত্যকার সাধকের কাছে বিষয়-চিন্তা হল রাত্রি, অন্ধকারের মতো, যা সদা দৃষ্টির অন্তরালেই থাকে—**'সা নিশা**

পশ্যতো মুনেঃ'। তাঁদের দৃষ্টিতে ব্রহ্মলোক পর্যন্ত জগৎ বলে কিছু নেই। সংসারী ব্যক্তি কেবল রাত্রিই দেখেন, দিনকে দেখেন না যোগী কিন্তু দিন ও রাত উভয়ই দেখেন কিন্তু গ্রহণ করেন বাসনা ত্যাগ, গ্রহণ করেন অনাসক্তি—এই উভয়ের মধ্যে পার্থক্য।

যেমন বালক শুধু বাল্য অবস্থাই দেখেছে, যৌবন দেখেনি, বৃদ্ধাবস্থাও দেখেনি কিন্তু বৃদ্ধ ব্যক্তি বাল্য, যৌবন ও বৃদ্ধাবস্থা সবই দেখেছেন। যিনি অর্থসংগ্রহ করে জমিয়ে রাখেন তিনি অর্থত্যাগের মাহাত্ম্য জানেন না। তিনি একদর্শী। কিন্তু যিনি প্রাপ্ত অর্থ দান করেছেন, তিনি অর্থ জমাতেও জানেন আর ত্যাগ করতেও জানেন। তিনি বহুদর্শী। বক্তব্য হল সংসারে ব্যাপৃত ব্যক্তি সংসারের রহস্য বিষয়ে অজ্ঞ। আর যিনি সংসার থেকে পৃথক হওয়ার সাধনা করেন তিনি সংসার ও পরমাত্মা উভয়কেই জানতে পারেন, তিনি বহুজ্ঞ, তিনিই শান্তি প্রাপ্ত হন, ভোগাসক্ত ব্যক্তিরা নয়। ভগবান তাই বলেছেন **'স শান্তিমাপ্নোতি ন কামকামী'**।

সাধক যখন কামনারহিত হন, তখন তাঁর কাছে জগৎও চিন্ময় হয়ে ওঠে। তিনি সর্বত্রই দেখেন **'বাসুদেবঃ সর্বম্'** (গীতা ৭।১৯)। তাই ভগবান বলছেন স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তি সংসারের কামনা, স্পৃহা, মমত্ববোধ ও অহংবোধ পরিত্যাগ করায় শান্তিলাভ করেন।

অহংবোধ ও মমত্ববোধ ত্যাগের উপায়—

কর্মযোগের দৃষ্টিতে—কোনো কিছুই আমার নয়, আমার কোনো কিছুরই প্রয়োজন নেই। তিনি উপলব্ধি করেন তাঁর শরীরাদির সঙ্গে সংসারেরই অভিন্ন সম্পর্ক (আছে)। তাই শরীর (আমি) এবং নিজের (আমার) বলে মনে করা সকল বস্তু দ্বারা যা কিছু করা হয় তা তিনি শুধু জগতের হিতের জন্যই করে থাকেন।

সাংখ্যযোগের দৃষ্টিতে—আমি আছি নয়, শরীরটা আছে—এই উপলব্ধি করা। মনের ভাব আমির বদলে শরীরটা আছেতে স্থিত হলে অহংবোধ ও মমত্ববোধ দূর হয়।

ভক্তিযোগের দৃষ্টিতে—যাকে আমি বা আমার বলা হয় তা সবই প্রভুর।

তাঁর বস্তু প্রভু যেভাবে রাখেন তিনি সেইভাবে থাকেন। তার অনুভব হয় আমার বলে যে শরীর-মন-বুদ্ধি-ইন্দ্রিয়াদি—এ সমস্তই তাঁর এবং আমিও তাঁর।

এই তিন যোগসাধনের মূল উদ্দেশ্যই হল মোহ দূর করা।

সৎ এবং অসৎ ঠিকভাবে না জানাই হচ্ছে মোহ। অর্থাৎ আমি স্বয়ং সৎ হয়েও অসৎ-এর সঙ্গে একাত্মতা অনুভব করাই হল মোহ। অসৎ জানলেই অসৎ নিবৃত্ত হয় অর্থাৎ মোহ দূর হয়। অসৎকে জানলেও যদি মোহ নিবৃত্তি না হয় তবে বুঝতে হবে যে অসৎকে ঠিকভাবে জানা যায়নি, শোনা হয়েছে, শেখা হয়েছে মাত্র। শেখা জ্ঞান দ্বারা অসৎ নিবৃত্ত হয় না।

ভগবান দ্বিতীয় অধ্যায়ের অন্তিম শ্লোকে বলেছেন—ব্রহ্মস্থিতি হচ্ছে তত্ত্ব উপলব্ধি এবং এই স্থিতিতে সাধক আর কখনো মোহগ্রস্ত হন না '**নৈনাং প্রাপ্য বিমুহ্যতি**'।

ভগবান আরও বলছেন মৃত্যুকালেও যদি সাধক ব্রহ্মজ্ঞানে স্থিত হন তবে তিনি ব্রহ্মনির্বাণ প্রাপ্ত হন—'**স্থিত্বাস্যামন্তকালেঽপি ব্রহ্মনির্বাণমৃচ্ছতি**'।

ভগবান এই কথা গীতায় অন্য স্থানেও বলেছেন—

অন্তকালে চ মামেব স্মরন্ মুক্ত্বা কলেবরম্।
যঃ প্রয়াতি স মদ্ভাবং যাতি নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ।। (গীতা ৮।৫)

এখন একটি সংশয় আসতে পারে যে, সমস্ত জীবনে যে অনুভূতি হয়নি তা মৃত্যুকালে, যখন শরীর মন বিকল হয় সেই অবস্থায় তা লাভ করা কীভাবে সম্ভব ? এর উত্তর এই যে পরমাত্মা প্রাপ্তিতে বুদ্ধি, বিবেক অপেক্ষা দৃঢ়তা, লক্ষ্য ও শ্রদ্ধারই প্রয়োজন রয়েছে। সেই লক্ষ্য পূর্ব অভ্যাস, কোনো শুভ সংস্কারবশতই হোক অথবা ভগবানের বা কোনো সন্ত মহাপুরুষের অহৈতুকী কৃপাবশতই হোক, সংঘটিত হতে পারে।

———o———

দ্বিতীয় প্রশ্ন

অর্জুনের মোহজনিত বিষাদ প্রথম অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে। ভগবান তা দূর করার জন্য দ্বিতীয় অধ্যায়ে সাংখ্যযোগ (বা জ্ঞানযোগ) বর্ণনা করেছেন। এই অধ্যায়ে 'স্থিতপ্রজ্ঞের' অতি মহৎ অবস্থা শুনে অর্জুন জ্ঞান ও কর্ম সম্বন্ধে প্রশ্ন করেন। শ্রীকৃষ্ণ সমস্ত অধ্যায়ব্যাপী তাঁর উপদেশে বুদ্ধিকে নিশ্চয়াত্মিকা করতে বলেছেন আবার সমবুদ্ধিযুক্ত হয়ে যুদ্ধও করতে বলেছেন। ভগবান যুদ্ধের সম্বন্ধে বলেছেন— **'উত্তিষ্ঠ পরন্তপ'** (গীতা ২।৩), **'তস্মাদুত্তিষ্ঠ যুদ্ধায় কৃতনিশ্চয়ঃ'** (গীতা ২।৩৭)। আবার নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি সম্বন্ধে বলেছেন—**'যোগস্থঃ কুরু কর্মাণি'** (গীতা ২।৪৮)—কর্ম করতেই তোমার অধিকার, সমত্বে স্থিত হয়ে তুমি কর্ম করো। **'দূরেণ হ্যবরং কর্ম'** (গীতা ২।৪৯)—সকাম কর্ম বুদ্ধিযোগের থেকে তুচ্ছ। **'বুদ্ধৌ শরণমন্বিচ্ছ'** (গীতা ২।৪৯)—বুদ্ধিযোগের শরণ গ্রহণ করো। **'বুদ্ধিযুক্তো জহাতীহ উভে সুকৃতদুষ্কৃতে'** (গীতা ২।৫০)—সমত্ববুদ্ধিযুক্ত পুরুষের পাপ ও পুণ্য এ জন্মেই ত্যাগ হয়। **'তস্মাদ্ যোগায় যুজস্ব যোগঃ কর্মসু কৌশলম্'** (গীতা ২।৫০)—তুমি সমত্ব লাভের চেষ্টা করো, কেননা সমতাই কর্মের কৌশল।

ভগবান 'বুদ্ধিযোগ' (গীতা ২।৫০) দ্বারা সমত্বে স্থিত থেকে কর্মযোগের পালন করতে অর্থাৎ যুদ্ধে নিযুক্ত হতে বলেছেন কিন্তু অর্জুন এটির (সমত্ব বুদ্ধির) অর্থ জ্ঞান মনে করে ভ্রমবশত সংশয়ী হয়ে পড়েছেন। তাই তৃতীয় অধ্যায়ের শুরুতেই অর্জুন দ্বিতীয় প্রশ্ন করেছেন—

জ্যায়সী চেৎ কর্মণস্তে মতা বুদ্ধির্জনার্দন।
তৎ কিং কর্মণি ঘোরে মাং নিয়োজয়সি কেশব॥
ব্যামিশ্রেণেব বাক্যেন বুদ্ধিং মোহয়সীব মে।
তদেকং বদ নিশ্চিত্য যেন শ্রেয়োঽহমাপ্নুয়াম্॥ (গীতা ৩।১-২)

'হে জনার্দন! আপনি যদি বুদ্ধিকে (জ্ঞানকে) কর্ম হতে শ্রেষ্ঠ বলে মনে করেন তাহলে কেন আমাকে এই ঘোর কর্মে নিযুক্ত করছেন ?

আপনার এই দুরকম কথায় আমার বুদ্ধিভ্রংশ হচ্ছে। অতএব আপনি এমন কথা নিশ্চিত করে বলুন যাতে আমার সত্যকার কল্যাণ হয়।' (গীতা ৩।১-২)

ভগবান এই দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর তৃতীয় অধ্যায়ের ৩য় শ্লোক থেকে ৩৫তম শ্লোক পর্যন্ত বলেছেন।

কর্মযোগ ও জ্ঞানযোগের ভেদ	শ্লোক ৩—৮
কর্মবিধি—নিষ্কাম কর্ম (যজ্ঞ)	শ্লোক ৯—১৬
ভগবানের ও মহাপুরুষের কর্মনিষ্ঠা—লোকসংগ্রহ	শ্লোক ১৭—২৬
(ক) ভগবানের কর্মনিষ্ঠা	শ্লোক ২২-২৪
(খ) মহাপুরুষের কর্মনিষ্ঠা	শ্লোক ১৭-২১, ২৫-২৬
জ্ঞানী ও অজ্ঞব্যক্তির কর্মের ভেদ	শ্লোক ২৭-৩৫

কর্মযোগ ও জ্ঞানযোগের ভেদ—(শ্লোক ৩—৮)

লোকেঽস্মিন্ দ্বিবিধা নিষ্ঠা পুরা প্রোক্তা ময়ানঘ।
জ্ঞানযোগেন সাংখ্যানাং কর্মযোগেন যোগিনাম্॥
ন কর্মণামনারম্ভান্নৈষ্কর্ম্যং পুরুষোঽশ্নুতে।
ন চ সন্ন্যাসনাদেব সিদ্ধিং সমধিগচ্ছতি॥
ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্মকৃৎ।
কার্যতে হ্যবশঃ কর্ম সর্বঃ প্রকৃতিজৈর্গুণৈঃ॥
কর্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য য আস্তে মনসা স্মরন্।
ইন্দ্রিয়ার্থান্ বিমূঢ়াত্মা মিথ্যাচারঃ স উচ্যতে॥
যস্ত্বিন্দ্রিয়াণি মনসা নিয়ম্যারভতেঽর্জুন।
কর্মেন্দ্রিয়ৈঃ কর্মযোগমসক্তঃ স বিশিষ্যতে॥
নিয়তং কুরু কর্ম ত্বং কর্ম জ্যায়ো হ্যকর্মণঃ।
শরীরযাত্রাপি চ তে ন প্রসিদ্ধ্যেদকর্মণঃ॥

(গীতা ৩।৩—৮)

ভগবান বলছেন—'হে অর্জুন ! এই মনুষ্যলোকে দুই প্রকারের নিষ্ঠা আছে তা আমি আগেই বলেছি। জ্ঞানীদের নিষ্ঠা জ্ঞানযোগে আর যোগীদের নিষ্ঠা হল কর্মযোগে।

মানুষ কর্ম না করলেই যে নৈষ্কর্ম প্রাপ্ত হয় তাও নয় আবার কর্মত্যাগ করলেই যে সিদ্ধিলাভ হবে তাও নয়।

কোনো ব্যক্তিই কোনো অবস্থাতেই ক্ষণকালও কর্ম না করে থাকতে পারে না, কেননা প্রত্যেক প্রাণী তার প্রবৃত্তিজাত গুণে বশীভূত, সেই গুণই তাকে কর্ম করতে বাধ্য করায়।

যদি কেউ কর্মেন্দ্রিয়গুলিকে (অথবা সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলিকে) হঠতাপূর্বক রুদ্ধ করে মন দ্বারা বিষয়গুলি চিন্তা করে তবে সে মূঢ়, সে মিথ্যা আচরণকারী।

আর যিনি মনের দ্বারা ইন্দ্রিয়গুলিকে সংযম করে, অনাসক্ত হয়ে (অর্থাৎ নিষ্কাম ভাবে) কর্মেন্দ্রিয়র সাহায্যে কর্মানুষ্ঠান করেন, তিনিই শ্রেষ্ঠ।

তাই অর্জুন ! তুমি শাস্ত্রবিধিসম্মত কর্ম করো, কারণ কর্ম না করার থেকে কর্ম করা শ্রেষ্ঠ। আবার কর্ম না করলে শরীরও নির্বাহ করা যায় না।' (গীতা ২।৩-৮)

নিষ্ঠা সম্বন্ধে ভগবান অর্জুনের প্রশ্নের উত্তরে তৃতীয় অধ্যায়ের তৃতীয় শ্লোকে বলছেন, মানুষের দুই প্রকার নিষ্ঠা থাকে, সাংখ্যনিষ্ঠা ও যোগনিষ্ঠা (কর্মযোগ)—যা সাধকদের নিজ নিজ নিষ্ঠা। কিন্তু এ ছাড়াও আছে ভগবৎনিষ্ঠা—যা সমগ্র গীতায় বলা হয়েছে। সাংখ্যনিষ্ঠা ও যোগনিষ্ঠা সাধন-সাধ্য এবং সাধকের উপর নির্ভরশীল। কিন্তু ভগবৎনিষ্ঠা সাধন-সাধ্য নয়, তা একান্তই ভগবান ও তাঁর কৃপার উপর নির্ভরশীল। আর জীব ও জগৎকে কেন্দ্র করে প্রথম দুটি নিষ্ঠা হয়ে থাকে। সাংখ্যযোগী 'আমি সংসার থেকে পৃথক' —এইরূপ অনুভব করেন এবং জগৎ-সংসার থেকে সম্পর্ক ছেদ করে নিজস্বরূপে স্থিত হন। কর্মযোগী, শরীরাদি সংসারেরই অংশ বোধে, এ সবই সংসারের সেবায় ব্যয় করে জগৎ-সংসার থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করেন। ভগবৎনিষ্ঠার সাধক কিন্তু প্রারম্ভেই বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা সহকারে

ভগবানকে মেনে নিয়ে তাঁর শ্রীচরণে নিজেকে সমর্পণ করেন এবং পূর্ণরূপে শরণাগত হলেই তাঁর ঈশ্বরলাভ হয়।

কাউকে খারাপ বলে মনে না করলে, কারোর ক্ষতি না চাইলে, কারোর ক্ষতি না করলে 'কর্মযোগ' আরম্ভ হয়। আর আমার বলে কিছু নেই, আমার কিছু পাওয়ার নেই, আমার কিছু করার নেই—এই ভাব আসলে 'জ্ঞানযোগ' সাধনা আরম্ভ হয়।

কর্মের বিধি সম্বন্ধে ভগবান বলছেন যে, কর্মগুলি বাহ্যিকভাবে ত্যাগ করলেই সাংখ্যযোগীর সিদ্ধিলাভ বা নৈষ্কর্মসিদ্ধি প্রাপ্তি ঘটে না। সাংখ্যযোগীর সিদ্ধিলাভ হয় সম্পূর্ণরূপে কর্তৃত্বভাব (অহং) ত্যাগ করলে। সাংখ্যযোগে কর্ম করা যায় আবার এক সীমার পরে কর্মত্যাগও করা যায় কিন্তু কর্মযোগীর সিদ্ধিপ্রাপ্তির জন্য কর্ম করা অত্যাবশ্যক। কর্মযোগী সাধক কর্ম করেই নৈষ্কর্ম প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ তখন তার কর্মগুলি অকর্ম হয়ে যায়।

কর্ম কী ? সেই সম্বন্ধে ভগবান চতুর্থ থেকে অষ্টম শ্লোকে বলছেন—

'শরীরবাঙ্মনোভির্যৎ কর্ম প্রারভতে নরঃ' (গীতা ১৮।১৫) অর্থাৎ শারীরিক, মানসিক বা বাচিক আদি যে সমস্ত ক্রিয়া হয় তাদের সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপন করলেই তা কর্ম হয় এবং বন্ধনের কারণ হয়, অন্যথায় নয়। অনেক মানুষের বদ্ধমূল ধারণা যে সন্তান পালনপোষণ, জীবিকা নির্বাহ, ব্যবসা, চাকরি, অধ্যাপনা ইত্যাদিই কর্ম কিন্তু খাওয়াদাওয়া, শোওয়া-বসা, চিন্তা করা এগুলিকে তারা কর্ম বলে মনে করেন না। এটি এক মস্ত ভ্রান্তি, আসলে শরীর-নির্বাহ সম্পর্কীয় স্থূল-শরীরের ক্রিয়া, ঘুমানো বা চিন্তা করা ইত্যাদি সূক্ষ্ম-শরীরের ক্রিয়া এবং সমাধি ইত্যাদি কারণ-শরীরের ক্রিয়া—এ সমস্তই হল কর্ম। যতক্ষণ দেহে অহংবোধ আর মমত্ববোধ থাকে, ততক্ষণ পর্যন্ত এই তিন শরীর দ্বারা সম্পাদিত সমস্ত ক্রিয়ামাত্রই কর্ম। আর প্রকৃতির সঙ্গে (শরীরের প্রতি) এই একাত্মতা মেনে নেওয়ার ফলে তার কার্যসকল প্রকৃতিজাত গুণাদির অধীন হয়ে পড়ে **'কার্যতে হ্যবশঃ কর্ম'**। আর প্রকৃতির সমস্ত অবস্থার অতীত হলে হয় সহজ অবস্থা বা সহজ সমাধি। সহজাবস্থা হয় স্ব-স্বরূপের, যাতে বিন্দুমাত্র কর্ম নেই কর্মের কোনো সংস্কার পড়া সম্ভবও নয়।

সাংসারিক কর্ম, যাতে ভোগ হয় তা দুই প্রকারের হয়—বাহ্যভাবে ও মানসিকভাবে। আসক্তিপূর্বক বাহ্যভাবে ভোগ করা আর আসক্তিপূর্বক মানসিকভাবে ভোগের চিন্তা করা, উভয়েতেই অন্তঃকরণে একই সংস্কার পড়ে। কিন্তু মূঢ় বুদ্ধিসম্পন্ন (সদসৎ বিবেকরহিত) মানুষ প্রায়ই বাহ্য ইন্দ্রিয়াদির কর্ম হঠতাপূর্বক রুদ্ধ করে মনে মনে ওই ইন্দ্রিয়াদির দ্বারা ভোগ বিষয়সমূহ চিন্তা করে এবং নিজেকে ক্রিয়ারহিত বলে মনে করে। ভগবান এইরূপ ব্যক্তিকে মিথ্যাচারী বা মিথ্যা আচরণকারী বলে বলেছেন —**'মিথ্যাচারঃ স উচ্যতে'**। অর্জুনও মানসিক ভাব পরিবর্তন না করে বাহ্যিকভাবে কর্মত্যাগ করতে ইচ্ছুক হয়ে ভগবানকে জিজ্ঞাসা করছেন — আমাকে এই ঘোরকর্মে নিযুক্ত করছেন কেন ? ভগবান বলছেন—যে ব্যক্তি অহং-কর্তৃত্ববোধ, মমত্ব, আসক্তি, কামনা ইত্যাদি পরিত্যাগ না করে শুধু বাহ্যভাবে কর্মত্যাগ করে তার আচরণ মিথ্যা অর্থাৎ সাধকদের বাস্তবে কর্মকে পরিত্যাগ না করে কামনা-বাসনারহিত হয়ে তৎপরতাপূর্বক সেগুলি পালন করা উচিত।

সাংখ্যযোগী অহং অর্থাৎ কর্তৃত্ব-ভাব পরিত্যাগে সচেষ্ট হন এবং কর্মযোগী ফলের আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করে কর্মে নিয়োজিত হন। এই পরিস্থিতিতে জ্ঞানযোগ অপেক্ষা কর্মযোগই অধিক সুগম মনে হয়। নিজ স্বার্থ ত্যাগপূর্বক পর হিতার্থে কর্ম করলে স্বতঃই অসঙ্গতা আসে। যিনি নিজের কল্যাণের (সুখভোগের নয়) আকাঙ্ক্ষা করেন, যার স্বভাবে উদারতা আর হৃদয়ে করুণা থাকে অর্থাৎ অন্যের সুখে সুখী (আনন্দিত) এবং দুঃখে দুঃখী ভাব থাকে তিনিই কর্মযোগের অধিকারী আর সেই কর্মযোগীর কর্মবন্ধন সহজেই দূর হয় (গীতা ৫।৩)।

কর্মযোগের অধিকারী সাধক দুই প্রকারের হয়—

১) যাঁর মধ্যে কর্ম করার আগ্রহ, আসক্তি এবং রুচি আছে কিন্তু নিজ কল্যাণের ইচ্ছাই প্রধান, এইরূপ সাধকের নতুন নতুন কর্ম আরম্ভ (সেবামূলক কাজ) করার প্রয়োজন নেই। তাঁর শুধুমাত্র প্রাপ্ত পরিস্থিতিরই সদুপযোগ করা উচিত।

২) যাঁর মধ্যে নিজ কল্যাণের ইচ্ছা থেকেও সকলকে সেবা করার, সকলকে সুখী করার, সমাজ সংস্কারের ইচ্ছার আগ্রহ অধিক থাকে তিনি নতুন নতুন সেবামূলক কর্ম শুরু করতে পারেন। তবে নতুন কর্ম কেবলমাত্র তাঁর কর্ম করার আসক্তি মেটানোর জন্যই করা উচিত।

যেহেতু অর্জুনের মনে নিজ কল্যাণের জন্য ইচ্ছাই প্রধান ছিল (**যচ্ছ্রেয়ঃ স্যান্নিশ্চিতং ব্রূহি তন্মে**—(গীতা ২।৭), **যেন শ্রেয়োঽহমাপ্নুয়াম্**—(গীতা ৩।২)। তাই শ্রীকৃষ্ণ তাকে প্রাপ্ত পরিস্থিতির সদুপযোগ অর্থাৎ কর্মযোগ অবলম্বনপূর্বক ধর্মযুদ্ধই করতে বলেছেন।

ভগবান এই প্রকরণের শেষ শ্লোকে বলেছেন—'**কর্ম জ্যায়ো হ্যকর্মণঃ**' (গীতা ৩।৮) অর্থাৎ কর্ম করা, কর্ম না করার থেকে শ্রেষ্ঠ। কর্তব্যকর্মে অমনযোগী ব্যক্তি প্রমাদ, আলস্য, নিদ্রাদিতে নিজ অমূল্য সময় নষ্ট করে নিজ পতন ঘটায়। এই প্রসঙ্গে ভগবান আগেও বলেছেন—'**মা তে সঙ্গোঽস্ত্বকর্মণি**' (গীতা ২।৪৭) অর্থাৎ যেমন তোমার কর্মফলেচ্ছা না থাকে তেমনি আবার কর্ম না করাতেও যেন আসক্তি না হয় অর্থাৎ রজোগুণ দূর করো, তমোগুণ দূর করো। কর্ম সম্বন্ধে এই শ্লোকে আরও বলা হয়েছে—'**নিয়তং কুরু কর্ম ত্বম্**' অর্থাৎ শাস্ত্রবিধিসম্পন্ন নিয়ত কর্মই করবে যাতে সত্ত্বগুণ বৃদ্ধি পায়। শাস্ত্রবিধিসম্পন্ন বিহিত কর্ম হল ব্রত-উপবাস-উপাসনা ইত্যাদি। বিহিত কর্মের মধ্যে বর্ণ-আশ্রমের ক্ষেত্রে যা বিশেষরূপ নির্দিষ্ট করা হয়েছে সেটি হল '**নিয়ত কর্ম**'। যেমন ন্যায়ভাবে খাদ্যগ্রহণ, জীবিকা অনুযায়ী কাজ বা ব্যবসা, পথভ্রান্ত ব্যক্তিকে সঠিক পথের নির্দেশ দেওয়া ইত্যাদি।

বিহিত কর্মের পালন অপেক্ষাও নিষিদ্ধ কর্ম ত্যাগ যথা মিথ্যা না বলা, চুরি না করা, হিংসা না করা অপেক্ষাকৃত সহজ। আর নিষিদ্ধকর্ম ত্যাগ হলেই বিহিত কর্ম স্বাভাবিকভাবে হতে থাকে।

নিয়ত কর্ম হল প্রকৃতপক্ষে স্বধর্মই। ভগবান দ্বিতীয় অধ্যায়ে বলেছেন—'**স্বধর্মমপি চাবেক্ষ্য ন বিকম্পিতুমর্হসি**' (গীতা ২।৩১) অর্থাৎ স্বধর্ম থেকে বিচ্যুত হওয়া তোমার একেবারেই উচিত নয়। যদিও অর্জুনের

মতো দুর্যোধনেরও কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ হচ্ছে বর্ণ ও ধর্ম অনুযায়ী প্রাপ্ত কর্ম কিন্তু এরা অন্যায়ভাবে রাজ্য ছিনিয়ে নিতে চাইছে তাই এই যুদ্ধ তাদের পক্ষে নিয়ত বা ধর্মযুক্ত কর্ম নয়।

জ্ঞানযোগে যেমন বিবেক সহকারে সংসার থেকে বন্ধন ছিন্ন হয় তেমনি কর্মযোগের দ্বারা সঠিকভাবে কর্তব্যকর্ম পালন করলে সংসার থেকে সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করা যায়। তবে সাধকেরা প্রায়শই দুটি ভুল করে থাকেন। তাঁরা যত্ন সহকারে সাধনভজন করেন কিন্তু তা নিজেদের পছন্দমতো পরিস্থিতি, অনুকূলতা ও সুখবুদ্ধি বজায় রেখে করতে চান যা সাধনের অগ্রগতিতে বাধা সৃষ্টি করে। যে সাধক তত্ত্বপ্রাপ্তির পথে সুগমতার ইচ্ছা করেন তিনি প্রকৃতপক্ষে সুখেরই অনুরাগী, ভগবৎপ্রেমের নয়।

'মনস্বী কার্যার্থী ন গণয়তি দুঃখং ন চ সুখম্' (ভর্তৃহরিনীতিশতক)

আবার সাধক অনেক সময় শীঘ্র তত্ত্বপ্রাপ্তি চান। এই সব সাধকদের সহজভাবে ও শীঘ্রভাবে ভগবৎপ্রাপ্তির চেষ্টা থাকায় তাঁদের দৃষ্টি সাধনার দিকে না গিয়ে ফলের দিকে যায়। এর ফলে সাধনে বিঘ্ন ঘটে, কঠোরতা সহ্য করতে হয় এবং সাধ্যপ্রাপ্তিতেও বিলম্ব ঘটে।

উৎকণ্ঠা এক জিনিস ও শীঘ্র পাওয়ার আশা অন্য ব্যাপার। আসক্তিযুক্ত সাধক সাধনাতে সুখভোগ করেন, তত্ত্বপ্রাপ্তিতে বিলম্ব হলে ক্রোধান্বিত হন এবং সাধনার দোষ দেখেন। কিন্তু শ্রদ্ধা ও প্রেমযুক্ত সাধক সাধনে বিঘ্ন বা বিলম্ব হলে আর্তভাবে ক্রন্দন করেন এবং তাঁর উৎকণ্ঠা আরও বেড়ে যায়। তাঁর সাধনের ভাব আরও গাঢ় হয়।

তাই ভগবান অর্জুনকে সাবধান করে দিচ্ছেন এই বলে যে, সাধক যেন অনুকূল এবং সুখবুদ্ধি (যা সাধনের প্রধান বাধা) ত্যাগ করে তৎপরতার সঙ্গে কর্তব্যকর্মে মনোনিবেশ করেন।

কর্মবিধি—নিষ্কাম কর্ম (যজ্ঞ)—(শ্লোক ৯—১৬)

যজ্ঞার্থাৎ কর্মণোঽন্যত্র লোকোঽয়ং কর্মবন্ধনঃ।
তদর্থং কর্ম কৌন্তেয় মুক্তসঙ্গঃ সমাচর॥
সহযজ্ঞাঃ প্রজাঃ সৃষ্ট্বা পুরোবাচ প্রজাপতিঃ।

অনেন প্রসবিষ্যধ্বমেষ বোঽস্ত্বিষ্টকামধুক্॥
দেবান্ ভাবয়তানেন তে দেবা ভাবয়ন্তু বঃ।
পরস্পরং ভাবয়ন্তঃ শ্রেয়ঃ পরমবাপ্স্যথ॥
ইষ্টান্ ভোগান্ হি বো দেবা দাস্যন্তে যজ্ঞভাবিতাঃ।
তৈর্দত্তানপ্রদায়ৈভ্যো যো ভুঙ্ক্তে স্তেন এব সঃ॥
যজ্ঞশিষ্টাশিনঃ সন্তো মুচ্যন্তে সর্বকিল্বিষৈঃ।
ভুঞ্জতে তে ত্বঘং পাপা যে পচন্ত্যাত্মকারণাৎ॥
অন্নাদ্ ভবন্তি ভূতানি পর্জন্যাদন্নসম্ভবঃ।
যজ্ঞাদ্ ভবতি পর্জন্যো যজ্ঞঃ কর্মসমুদ্ভবঃ॥
কর্ম ব্রহ্মোদ্ভবং বিদ্ধি ব্রহ্মাক্ষরসমুদ্ভবম্।
তস্মাৎ সর্বগতং ব্রহ্ম নিত্যং যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতম্॥
এবং প্রবর্তিতং চক্রং নানুবর্তয়তীহ যঃ।
অঘায়ুরিন্দ্রিয়ারামো মোঘং পার্থ স জীবতি॥

(গীতা ৩।৯—১৬)

'যজ্ঞের (কর্তব্য পালনের) উদ্দেশ্যে করা কর্মগুলি ব্যতীত অন্য কর্ম (নিজের জন্য করা কর্ম) করলে মানুষ তাতে আবদ্ধ হয়। তাই আসক্তি বর্জিত হয়ে যজ্ঞের উদ্দেশ্যেই কর্তব্যকর্ম করা উচিত।

সৃষ্টির প্রারম্ভে প্রজাপতি ব্রহ্মা কর্তব্যকর্মের বিধানসহ প্রজা (মানুষ প্রমুখ) সৃষ্টি করেন এবং তাদের (প্রধানত মানুষকে) বলেন, তোমরা এই কর্তব্য রূপ যজ্ঞ দ্বারা সকলের সমৃদ্ধি করো এবং এই যজ্ঞই তোমাদের কর্তব্যপালনের অভিষ্ট সামগ্রী প্রদান করুক।

তোমার এই কর্তব্য (যজ্ঞ) দ্বারা দেবতাদের (সব প্রাণীকে) সংবর্ধনা (উন্নত) করো এবং দেবতাগণও তাঁদের কর্তব্য দ্বারা তোমাদের মানোন্নয়ন (সংবর্ধনা) করুন। এইভাবে পরস্পরের সংবর্ধনার দ্বারা তোমরা কল্যাণ প্রাপ্ত হবে।

যজ্ঞ দ্বারা পুষ্ট (সংবর্ধিত) দেবগণ (বিনা প্রার্থনাতেই) তোমাদের কর্তব্যকর্মের নিমিত্ত আবশ্যক সামগ্রী প্রদান করে যাবেন। কিন্তু যে ব্যক্তি কর্তব্যকর্মের এই সামগ্রী অন্যের সেবায় ব্যয় না করে স্বয়ং ভোগ

করে সে অবশ্যই তস্কর।

যজ্ঞাবশেষ (যোগ) অনুভবকারী শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণ সর্বপাপ থেকে মুক্ত হন। কিন্তু যারা নিজেদের জন্য কর্ম করেন তারা পাপী, তারা পাপরাশিই ভক্ষণ করে থাকেন।

সমস্ত প্রাণী উৎপন্ন হয় অন্ন থেকে, আর অন্ন উৎপন্ন হয় মেঘ (জল) থেকে, মেঘ জন্মায় যজ্ঞ থেকে এবং যজ্ঞ সম্ভব হয় নিষ্কাম কর্ম থেকে।

বেদ থেকে উৎপন্ন হয় কর্ম এবং বেদ প্রকটিত হয় পরব্রহ্ম থেকে। সেইজন্য সর্বব্যাপী পরমাত্মা যজ্ঞে (কর্তব্যকর্মে) নিত্য প্রতিষ্ঠিত।

যে ব্যক্তি ইহলোকে এই পরম্পরা দ্বারা অনুমোদিত সৃষ্টিচক্র অনুযায়ী চলে না, ইন্দ্রিয়াসক্ত সেই পাপাচারী বৃথাই জীবনধারণ করে।' (গীতা ৩।৯-১৬)

গীতা অনুযায়ী কর্তব্যকর্ম মাত্রই যজ্ঞ। যজ্ঞ, দান, তপস্যা, হোম, তীর্থভ্রমণ, ব্রত, বেদাধ্যয়ন ইত্যাদি সমস্ত শারীরিক, ব্যবহারিক ও পারমার্থিক ক্রিয়াগুলিই যজ্ঞ। কর্তব্য মনে করে চাকরি, ব্যবসা, অধ্যয়ন, অধ্যাপনা ইত্যাদি শাস্ত্রবিহিত কর্মগুলিও যজ্ঞ। আবার অপরের সুখের জন্য বা তাদের হিতের উদ্দেশ্যে যে কর্মগুলি করা হয় সেগুলি সবই যজ্ঞার্থ কর্ম।

প্রকৃতপক্ষে মানুষের স্থিতি হয় তার উদ্দেশ্য অনুযায়ী, ক্রিয়া অনুযায়ী নয়। যজ্ঞার্থ কর্ম করার কালে কর্মযোগীর স্থিতি, উদ্দেশ্য থাকে পরমাত্মার প্রতি, তাই কর্মের বৃত্তি সমাপ্ত হলেই তার সেই বৃত্তি পরমাত্মার দিকেই চলে যায়। আর নিজের জন্য কর্ম করলে সকাম ভাব থাকে এবং সকাম ভাব থাকলে নিষিদ্ধ কর্ম হওয়ার পূর্ণ সম্ভাবনা থাকে। যতপ্রকার সকাম বা নিষিদ্ধ কর্ম আছে বা যা কিছু সুখ-মান-অহংকার আরাম ইত্যাদির জন্য করা হয় সবই 'অন্যত্র কর্ম' ও বন্ধনকারী।

মানুষ সাধারণত কর্তব্যকর্ম করতে পরাঙ্মুখ হয় দুটি কারণে—(১) সে ফল কামনা করে কর্মে প্রবৃত্ত হয় কিন্তু যখন বলা হয় কামনা করা উচিত নয় তখন ভাবে তাহলে কর্ম করব কেন ? (২) কর্ম আরম্ভ করলে যখন দেখে তার ইচ্ছেমতন ফল হচ্ছে না তখন ভাবে উত্তম কর্ম করেও যদি বিপরীত ফল

হয় তবে কর্ম করব কেন ?

কর্মযোগীর কিন্তু কোনো কামনা থাকে না, তিনি কোনো বিনাশশীল ফলও আশা করেন না। তিনি সংসারের হিতার্থে কর্তব্যকর্ম করে যান মাত্র, তাই তাঁর কর্মে শৈথিল্য আসে না। মানুষ কর্ম করলে আবদ্ধ হয় না, অন্যত্র কর্ম করলেই আবদ্ধ হয়—তাই নিজের জন্য কিছু করা উচিত নয়। ব্রহ্মা প্রজা সৃষ্টি করে তার রক্ষায় সদা তৎপর থাকেন এবং সর্বদা প্রজার হিতের কথা চিন্তা করেন, সেইজন্য তাঁকে 'প্রজাপতি' বলা হয়। ব্রহ্মা সৃষ্টির আদিতেই মানুষকে নির্দেশ দেন—'তোমরা নিজেদের কর্তব্যপালন দ্বারা সবকিছুর বৃদ্ধিতে সাহায্য করো, তাহলে তোমরাও কর্তব্যকর্ম করার উপযোগী সামগ্রী পেতে থাকবে, তার কোনো অভাব হবে না। কর্মযোগী অপরের সেবা বা মঙ্গল বিধানের জন্য সদাই তৎপর থাকেন, তাই ব্রহ্মার বিধান অনুযায়ী তাঁর অন্যের সেবা করার সামগ্রী, সামর্থ্য ও শরীর-নির্বাহের বস্তুগুলোর কখনো অভাব হয় না। তিনি এসব সহজেই এবং পূর্ণমাত্রায় প্রাপ্ত হতে থাকেন, ইহাদের কখনই স্বল্পমাত্রায় প্রাপ্তি হয় না। ব্রহ্মার বিধান অলঙ্ঘনীয়।

সাংসারিক সম্পর্কজনিত ব্যক্তির কাছ থেকে কিছু আশা করা এবং তাদের ওপর অধিকার ফলানো মস্ত বড় ভুল। চিন্তা করা উচিত আমরা তাঁদের কাছে ঋণী এবং এই ঋণ পরিশোধের জন্যই আমাদের এইস্থানে জন্ম হয়েছে। এই ভাব নিয়ে সেবা সকলেরই করা উচিত, কিন্তু যারা আমাদের ওপর নির্ভরশীল সর্বাগ্রে তাদের সেবা করা কর্তব্য। সকলের প্রতি সেবামূলক ভাব রেখে নিজ কর্তব্য পালন করতে হয় তাতে অন্যর অধিকার রক্ষিত হয়, ইহাই কর্মযোগ। অন্যদিকে অন্যের কর্তব্য দেখার অধিকার আমাদের নেই। অন্যের কর্তব্যাদিতে লক্ষ রেখে নিজ অধিকার প্রয়োগের চেষ্টা করলে তা মহা পতনের কারণ হয়। বর্তমানে গৃহে, সমাজে যে অশান্তি তার মূল কারণ সকলেই নিজ কর্তব্যপালনে বিমুখ কিন্তু অধিকার রক্ষায় সচেষ্ট। সকলের প্রতি সেবারূপ কর্তব্যপালন করলে তা পরম কল্যাণকারী হয় এবং জগতের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করতে সাহায্য করে। যেমন কারোর গচ্ছিত জিনিস

ফেরত দিলে সেই বস্তু ও সেই ব্যক্তি উভয়ের সঙ্গেই সম্পর্ক ছিন্ন হয় এবং এই সম্পর্ক ছিন্নতাই চিন্ময়তার অনুভব করায়।

চুরাশি লক্ষ যোনির মধ্যে দেবতা, প্রাণী, বৃক্ষ সবই হল ভোগযোনি কেবল মানুষই কর্মযোনি। ব্রহ্মা মানুষকে দেবতার সঙ্গে পরস্পরের হিতের কথা বলেছেন, কিন্তু দেবতা অর্থে বুঝতে হবে যে চারবর্ণের মানুষ এবং তারা যদি পরস্পরের হিতের জন্য কর্ম করে তবে সকলেরই পরম কল্যাণ লাভ হবে। সম্পূর্ণ জগৎ এমনভাবে সৃষ্টি যে কোনো কিছুই (সে বস্তুই হোক বা ক্রিয়াই হোক) নিজের জন্য নয়, সবই অন্যের জন্য—**'ইদং ব্রহ্মণে ন মম'**। স্ত্রীঅঙ্গ পুরুষকে সুখপ্রদান করে, স্ত্রীলোককে নয়। পুরুষঅঙ্গ নারীকে সুখ প্রদান করে, পুরুষকে নয়। মায়ের দুধ শিশুর জন্য, নিজের জন্য নয়। শ্রোতা বক্তার কথা শোনার জন্য এবং বক্তা শ্রোতাকে শোনানোর জন্যই হয়, নিজের জন্য নয়। এজগতের সৃষ্টি ভোগের জন্য নয়, নিজেকে উদ্ধারের জন্য। নিজে সুখ গ্রহণ না করে অপরকে সুখ প্রদানই প্রধান কর্তব্য।

এখানে প্রশ্ন হল অন্যের ভালো করলেও সে যদি খারাপ করতে থাকে তবে কী হবে ? এর উত্তর হল, কারোর ভালো করলে তার খারাপ করার সামর্থ্যই থাকে না। কিন্তু যদি তেমন কিছু ঘটে তবে তার জন্য সে পরে দুঃখ পাবে বা অপর কেউ হাজির হয়ে তাকে নিবারণ করবে। **'পরস্পরং ভাবয়ন্তঃ'** গীতার শ্রেষ্ঠ উপদেশ, ইহা ব্রহ্মার বাণী, পরম মানবতার বাণী—ইহা অলঙ্ঘনীয়।

ভগবান বলছেন **'দেবা দাস্যন্তে যজ্ঞভাবিতাঃ'** অর্থাৎ নিষ্কামভাবে কর্তব্যকর্ম বা যজ্ঞরূপে কর্ম করলে দেবতারাও তার অধিকার হিসেবে মানুষকে প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী প্রদান করতে থাকেন। এ জগতে মানুষের সৃষ্টি ও পালন পিতামাতার কাছ থেকে, বিদ্যালাভ গুরুস্থানীয়দের থেকে, ঋষিগণ প্রদান করেন জ্ঞান, দেবগণ দেন কর্তব্য-পালনের বস্তুসমূহ ; পশুপক্ষী, বৃক্ষাদি অপরের সেবায় থাকে সদা তৎপর (যদিও এটা হয় স্বতঃই, বুদ্ধি বা বোধযুক্ত হয়ে নয়) এইভাবে মানুষের জীবন ঋণে ঋণময়। এই ঋণ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্যই পঞ্চযজ্ঞের বিধান (ঋষিযজ্ঞ, দেবযজ্ঞ,

ভূতযজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ ও মনুষ্যযজ্ঞ) এবং একমাত্র মানুষই পারে বুদ্ধিপূর্বক ঋণ পরিশোধ করতে, **'সর্বভূতহিতে রতাঃ'** হতে।

তবে সেবকের অনেক সময় এই ভুল হয় যে আমি সেবা করছি, আমি জিনিস প্রদান করছি, মনে এই ভাব আসা। আসলে মানুষের মনে এই ভাব থাকা উচিত যে যাকে সেবা করছি তার ঋণ পরিশোধ করছি, তার বস্তুই তাকে প্রদান করছি। নিজের গ্রহণ করার ভাব ত্যাগ করে দেবগণের মতো অপরকে সুখী করার ভাবই মানুষের একমাত্র কর্তব্য হওয়া উচিত।

যে ব্যক্তি অপরকে না দিয়ে নিজেই সমস্ত ভোগ করে, সে তো চোর বটেই পরন্তু যে ব্যক্তি অপরকে সেবা করে মান, যশ ইত্যাদি কিনতে চায় সেও অংশত চোর। এইরূপ ব্যক্তির অন্তঃকরণ কখনো শুদ্ধ ও শান্ত হয় না।

এই ব্যষ্টি (নিজের) শরীর কোনোভাবেই সমষ্টি জগৎ থেকে পৃথক নয় আর পৃথক হওয়া সম্ভবও নয়। সমষ্টির অংশকেই ব্যষ্টি বলে আর ব্যষ্টিকে (শরীরকে) নিজের বলে মনে করা আর সমষ্টিকে (জগৎকে) পৃথক ভাবাই হল রাগ-দ্বেষাদির মূল এবং এটিই হল অহংভাব বা আমিত্ব, যা বৈষম্য সৃষ্টি করে। কর্মযোগ পালন করলে এই সব রাগ-দ্বেষাদি সহজেই দূরীভূত হয় কারণ কর্মযোগীর এই ভাব থাকে যে, যা কিছু করেছি নিজের জন্য নয়, জগৎ-সংসারের জন্য। রাজা জনক কর্মযোগী ছিলেন, মহাভারতে জনক-ব্রাহ্মণ সংবাদে রাজা জনক বলছেন—

'আত্মাপি চায়ং ন মম সর্বা বা পৃথিবী মম।'

(মহাভারত, আশ্বমেধিকপর্ব ৩২।১১)

অর্থাৎ এই দেহটি আমার নয় অথবা সমগ্র সৃষ্টিই আমার দেহ।

তাৎপর্য এই যে হয় ব্যষ্টিদেহ (শরীরকে) আমার নয় ভাবা (জ্ঞানযোগ) অথবা সমষ্টি দেহ নিজের বলে ভাবা (কর্মযোগ)।

এখন বক্তব্য এই যে যদি প্রাপ্ত বস্তুসামগ্রী সবই অপরের সেবায় নিযুক্ত করা যায় তবে কর্মযোগীর জীবন নির্বাহ হবে কীভাবে ? আসলে কর্মযোগীর সমস্ত কর্ম অন্যের সেবার্থে হয়ে থাকে, তার অন্তরে জগতের কোনো কিছুরই প্রয়োজন বোধ থাকে না, তাই জগতেরই তাঁকে প্রয়োজন হয়। তাঁর জীবন-

নির্বাহের ব্যবস্থা জগৎ নিজেই করে দেয়। ত্রয়োদশ শ্লোকে ভগবান 'কর্মযোগী' ও 'ভোগী' সম্বন্ধে বলতে গিয়ে বলেছেন—**'যজ্ঞশিষ্টাশিনঃ সন্তো মুচ্যন্তে সর্বকিল্বিষৈঃ'** অর্থাৎ নিষ্কামভাবে কর্তব্যকর্ম করলে কর্ম শেষ হয়ে যায় কিন্তু তার মধ্যে যোগ অর্থাৎ সমতা রয়ে যায় আর এই সমত্ব অনুভব হলে তার সমস্ত কর্ম তা পাপ বা পুণ্যরূপেই হোক বা সঞ্চিত, প্রারব্ধ বা ক্রিয়মানরূপে হোক, বিলীন হয়ে যায়। আর ভোগীরা—**'ভুঞ্জতে তে ত্বঘং পাপা যে পচন্ত্যাত্মকারণাৎ'** অর্থাৎ নিজের জন্য স্বার্থ, কামনা, মমতা, আসক্তি সহকারে কর্ম করলে সে পাপী বলে গণ্য হয় আর তার অর্জিত পাপ চুরাশি লক্ষ যোনি বা নরকে ভোগ করলেও শেষ হয় না।

মনুষ্য জন্ম এমন এক অদ্ভুত কৃষিক্ষেত্র যেখানে পাপ বা পুণ্য—যে বীজই রোপণ করা হোক না কেন তা বহু জন্ম পর্যন্ত ফল দেয়। তাই সাধক রামপ্রসাদ গেয়েছেন—

মনরে ! কৃষিকাজ জানো না
এমন মানব জীবন রইলো পতিত
আবাদ করলে ফলতো সোনা।

তাই মানুষের শরীর, তার যোগ্যতা, পদ, অধিকার, বিদ্যা, বল ইত্যাদি যা কিছু আছে তা তার নিজের জন্য নয়, অন্যের সেবার জন্য ব্যয় করা উচিত এবং এটিই হল আমাদের ভারতীয় সংস্কৃতির মূল কথা।

পরবর্তী দুটি শ্লোকে (১৪, ১৫) ভগবান সৃষ্টিচক্রে যজ্ঞের প্রয়োজনীয়তা এই ভাবে বর্ণনা করেছেন। ভগবান বলেছেন—

অন্নাদ্ ভবন্তি ভূতানি—প্রাণী অন্নময়। যে প্রাণীর যা খাদ্য এবং যা গ্রহণ করলে শরীরের উৎপত্তি, পোষণ এবং পুষ্টি হয় তাই তার কাছে অন্ন।

অন্নাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে। অন্নেন জাতানি জীবন্তি॥

(তৈত্তিরীয় উপনিষদ্ ৩।২)

পর্যন্যাদন্নসম্ভবঃ—সমস্ত খাদ্যপদার্থের উৎপত্তি জল থেকে। ঘাস-পাতা, ফুল, ফল, সবজি সবই জল থেকে হয়। অন্ন, বস্ত্র, গৃহ আদি জীবন নির্বাহের সমস্ত বস্তুই স্থূল বা সূক্ষ্মরূপে জলের সঙ্গে সম্পর্কিত এবং বৃষ্টিপাত হল

জলের আধার। তাই বলা হয়েছে বৃষ্টির জন্যই অন্ন সম্ভব হয়।

যজ্ঞাদ্ ভবতি পর্জন্যো যজ্ঞঃ কর্মসমুদ্ভবঃ—গীতার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী যজ্ঞ শব্দটি প্রধানত কর্তব্যকর্মবাচক যাতে ত্যাগের প্রাধান্য থাকে। নিষ্কামভাবে করা ত্যাগমূলক সমস্ত লৌকিক ও শাস্ত্রীয় কর্মই হল যজ্ঞ। যজ্ঞ শব্দটি হোম, দান, পদ ইত্যাদি সমস্ত শাস্ত্রবিহিত কর্মও সূচিত করে। তবে সমস্ত কর্মের মধ্যেই কামনা, মমতা, আসক্তি, পক্ষপাতিত্ব, বৈষম্য, স্বার্থপরতা, অহং-অভিমান ইত্যাদি বিষের মতন বিদ্যমান থাকে। বৈদ্য যেমন বিভিন্ন তীব্র বিষকে শোধন করে ওষুধরূপে প্রদান করে, তখন তা অমৃতের ন্যায় কাজ করে কঠিন অসুখ দূর করে দেয়, সেইরকম কর্মেরও কামরূপ বিষাক্ত অংশ নষ্ট করে নিষ্কাম ভাব আর তখন সেই কর্মই অমৃতময় হয়ে জন্ম-মরণরূপ মহৎ রোগ দূর করে দেয়। এইরূপ **অমৃতময় নিষ্কাম কর্মকেই যজ্ঞ বলে।**

বৃহদারণ্যক উপনিষদে ব্রহ্মার একটি উপদেশ কথিত আছে। সৃষ্টির প্রারম্ভে ব্রহ্মা দেবতা, মানুষ ও অসুর—এই তিনপ্রকার সৃষ্টি করে তাদের এক অক্ষররূপী 'দ' উপদেশ দিয়েছিলেন। দেবতাদের নিকট ভোগসামগ্রীর আধিক্য থাকায় ও তারা ভোগপ্রধান হওয়ায় 'দ'-এর অর্থ ধরে নিলেন 'দম্য' অর্থাৎ দমন করো (ইন্দ্রিয় দমন)। মানুষেরা সাধারণত লোভী, তাদের সংগ্রহ প্রবৃত্তি বেশি, তাই তারা 'দ'-এর অর্থ করল 'দত্ত' অর্থাৎ 'দান করো' হিসাবে। অসুরেরা নিষ্ঠুর, অপরকে নির্যাতনের প্রবৃত্তি বেশি, তাই তারা 'দ'-এর অর্থ ধরে নিল 'দয়ধ্বম্' অর্থাৎ 'দয়া করো' বলে। এইরূপে দেবতা, মানুষ ও অসুর—তিনজনকে দেওয়া উপদেশই হল সংযম করা এবং নিজের কর্তব্যকর্ম দ্বারা অপরের হিত করা। বর্ষার সময় মেঘের যে 'দ-দ-দ' গর্জন তা আজও কর্তব্যকর্মরূপে ব্রহ্মার উপদেশ (দম্য, দত্ত, দয়ধ্বম্) স্মরণ করিয়ে দেয় (বৃহদারণ্যক ৫।২।১-৩)।

কিন্তু নিজের কর্তব্য-পালনে বৃষ্টি হওয়া কীরূপে সম্ভব ? বাক্য থেকে আচরণের প্রভাব বেশি। মানুষ নিজ কর্তব্যকর্ম পালন করলে প্রকৃতির নিয়ম পালন করা হয় এবং এতে **'দেবান্ ভাবয়তনেন'** অর্থাৎ দেবতারা সংবর্ধিত হন, সন্তুষ্ট হন। আর এর ফলে দেবতাদের ওপরও তার প্রভাব পড়ে

'তে দেবা ভাবয়ন্তু বঃ' অর্থাৎ মানুষ নিজ নিজ কর্তব্য পালন করলে দেবতারাও তাঁদের কর্তব্য পালনে উদ্বুদ্ধ হন, বৃষ্টিপাত করান।

কর্ম ব্রহ্মোদ্ভবং বিদ্ধি—ব্রহ্মপদ এখানে বেদের বাচক আর মানুষের কর্তব্যকর্ম পালনের জ্ঞান (বা যজ্ঞ) বেদই নির্দেশ করে—**'এবং বহুবিধা যজ্ঞা বিততা ব্রহ্মণো মুখে'** (গীতা ৪।৩২)।

ব্রহ্মাক্ষর সমুদ্ভবম্—পরমাত্মা থেকে বেদ প্রকটিত হয় তাই পরমাত্মাই এই সমস্ত কিছুর মূল। তাহলে সৃষ্টিচক্রের মূলসূত্র হচ্ছে—পরমাত্মা হতে বেদ প্রকটিত হয় এবং তা কর্তব্যপালনের নিয়মাবলি ব্যক্ত করে। মানুষ যদি সেই কর্তব্য বিধিপূর্বক পালন করে তবে সেই কর্তব্যপালন রূপ যজ্ঞ করার ফলে তা থেকে বৃষ্টি হয়। বর্ষা হলে অন্ন জন্মায় এবং তা প্রাণী সৃষ্টির মূল কারণ। এইভাবে প্রাণীদের মধ্যে একমাত্র মানুষই কর্তব্যরূপ যজ্ঞ করে সৃষ্টিচক্র অব্যাহত রাখে। তাই বলা হয়েছে **'সর্বগতং ব্রহ্ম নিত্যং যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতম্'**। মানুষ ছাড়া অন্য স্থাবর জঙ্গম প্রাণীদের দ্বারাও পরোপকার (যজ্ঞ) হয় কিন্তু তা স্বতঃই হতে থাকে কিন্তু একমাত্র মানুষই এমন, যে বুদ্ধি সহযোগে যজ্ঞ করতে পারে।

এখানে প্রশ্ন হতে পারে যে, যদি পরমাত্মা সর্বব্যাপী হন তাহলে তাঁকে কেবল যজ্ঞে নিত্য প্রতিষ্ঠিত বলা হচ্ছে কেন ? এর উত্তর এই যে পরমাত্মা সর্বত্র সমভাবে নিত্য বিদ্যমান হলেও যজ্ঞ হচ্ছে তাঁর উপলব্ধি স্থান। যেমন ভূমিতে সর্বত্র জল থাকলেও কূপাদিতে তা উপলব্ধ হয়, সর্বত্র নয়। পাইপে সর্বত্র জল থাকলেও একমাত্র কলের মুখেই বা ছিদ্র থেকেই তা পাওয়া যায়, অন্যত্র নয় ; সেইরকম যজ্ঞ ব্যতীত নিজের জন্য কর্ম করলে বা জড়ের (শরীরাদির) সঙ্গে নিজ সম্পর্ক মেনে নিলে সর্বব্যাপী পরমাত্মার প্রাপ্তিতে বাধা আসে, উপলব্ধি হয় না। সৃষ্টিচক্র অনুসারে নিজ কর্তব্যপালন করার দায় মানুষের। ভগবান এই প্রকরণ শেষ করেছেন সেইসব মানুষকে তিরস্কার করে যারা কর্তব্যপালন না করে সৃষ্টিচক্রে বাধা হয়ে ওঠে। জগৎ এবং শরীর (ব্যক্তি) দুটি বিজাতীয় বস্তু নয়। যেমন শরীরের সঙ্গে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গর সঙ্গে শরীরের সম্বন্ধ অবিচ্ছেদ্য, সেইরকম জগতের সঙ্গে

ব্যক্তির এবং ব্যক্তির সঙ্গে জগতের সম্বন্ধও অবিচ্ছেদ্য। কোনো ব্যক্তি যদি শরীরকে সংসার থেকে বিচ্ছিন্ন না ভাবে, অর্থাৎ জগতের অংশ ভাবে এবং শরীরের প্রতি বিশেষ কামনা, বাসনা, মমত্ব, অহং-কর্তৃত্ববোধ পরিত্যাগ করে নিজ কর্তব্য পালন করে তবে জগৎ স্বতঃই সুখী হয়। যেমন রথের চাকার একটি ক্ষুদ্র অংশও যদি ভেঙে যায় তবে তাতে সমস্ত রথটি ও আরোহীদের আঘাত লাগে, তেমনি যদি কোনো ব্যক্তি কামনাবাসনা যুক্ত করে কর্ম করে, তবে তা সৃষ্টিচক্রের সুষ্ঠু সঞ্চালনে বাধা উৎপাদন করে থাকে। ভগবান এইসব ব্যক্তিদের সম্বন্ধে বলছেন **'স্তেন এব সঃ'** (গীতা ৩।১২) অর্থাৎ তারা চোর, **'ভুঞ্জতে তে ত্বঘং পাপা'** (গীতা ৩।১৩) অর্থাৎ তারা পাপ ভক্ষণ করে, **'অঘায়ু ইন্দ্রিয়ারামঃ'** (গীতা ৩।১৬) অর্থাৎ এই ভোগাসক্ত ব্যক্তিদের জীবন পাপময় হয় ইত্যাদি।

ভগবানের ও মহাপুরুষের কর্মনিষ্ঠা—লোকসংগ্রহ (১৭-২৬)

আগের প্রকরণে ভগবান কর্তব্যে অবহেলাকারীদের বেঁচে থাকা অর্থহীন বলে জানিয়েছেন—**'মোঘং পার্থ স জীবতি'** (গীতা ৩।১৬)। আর এই প্রকরণে ভগবান বলছেন সিদ্ধ মহাপুরুষ যদি কর্তব্যকর্ম নাও করেন তবু তাঁর বেঁচে থাকা তো অর্থহীন নয়ই বরং তা পরম সার্থক।

(ক) ভগবানের কর্মনিষ্ঠা—(শ্লোক ২২-২৪)

ন মে পার্থাস্তি কর্তব্যং ত্রিষু লোকেষু কিঞ্চন।
নানবাপ্তমবাপ্তব্যং বর্ত এব চ কর্মণি॥
যদি হ্যহং ন বর্তেয়ং জাতু কর্মণ্যতন্দ্রিতঃ।
মম বর্ত্মানুবর্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্বশঃ॥
উৎসীদেয়ুরিমে লোকা ন কুর্যাং কর্ম চেদহম্‌।
সঙ্করস্য চ কর্তা স্যামুপহন্যামিমাঃ প্রজাঃ॥

(গীতা ৩।২২-২৪)

'ভগবান বলছেন—হে পার্থ ! ত্রিলোকে আমার কোনো কর্তব্য নেই আর কোনো প্রাপ্তিযোগ্য বস্তুই আমার অপ্রাপ্ত নেই। তবুও আমি কর্তব্যকর্মে ব্যাপৃত আছি।

আমি যদি সাবধানতাপূর্বক কর্ম না করি তবে সাধারণ মানুষ সর্বপ্রকারে আমার পথই অনুসরণ করবে।

আর এর ফলে মানবকুল পথভ্রষ্ট হবে এবং আমি বর্ণসংকরাদির হেতু এবং সমস্ত প্রজাদের বিনাশের কারণ হব।' (গীতা ৩।২২-২৪)

এই জগতের রচনা জীবমাত্রেরই উদ্ধারের জন্য হয়ে থাকে। পুণ্য কর্মের ফল স্বর্গবাস ও পাপকর্মের ফল নরকবাস ও চুরাশি লক্ষ জন্ম হয়ে থাকে। পুণ্য ও পাপ—এই দুইয়েরই উর্ধ্বে উঠে নিজ কল্যাণের জন্য কর্ম করাই হল মনুষ্যজন্মর সার্থকতা।

যদি কোনো কর্মের কথা বারে বারে স্মরণে আসে, তবে বুঝতে হবে সেই কর্মটি থেকে সম্পর্ক ছেদ হয়নি ; কর্মের প্রতি মমতা, আসক্তি রয়ে গেছে। আসক্তিরহিত হয়ে কর্তব্য পালন সম্বন্ধে ভগবান বলছেন—'**মম বর্ত্মানুবর্তন্তে মনুষ্যা পার্থ সর্বশঃ**' অর্থাৎ আমার পথ অনুসরণকারীগণই বাস্তবিক মনুষ্য নামের উপযুক্ত। যারা আমার আদর্শ না মেনে আলস্য ও প্রমাদবশত কর্তব্যকর্ম না করে শুধু অধিকার আকাঙ্ক্ষা করে, তারা আকৃতিগতভাবে মানুষ হলেও মনুষ্য পদবাচ্য নয়। জগৎ-সংসারে মানুষের কীভাবে থাকা উচিত তা জানাবার জন্যই ভগবান অবতাররূপে অবতরণ করেন। **জগৎসংসারে নিজের জন্য থাকা উচিত নয়—এই হল জগৎ-সংসারে থাকার বিদ্যা।**

নিজের জন্য কোনো কর্তব্যকর্ম না থাকলেও ভগবান অপরের হিতার্থে জন্মগ্রহণ করেন এবং সাধুজনের উদ্ধার, পাপীদের বিনাশ ও ধর্মস্থাপনের জন্য কর্ম করে থাকেন। গীতায় বলা হয়েছে—

পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥ (গীতা ৪।৮)

মহাভারতেও ভগবান উতঙ্ক ঋষিকে ত্রিলোক্যে তাঁর কর্তব্য সম্বন্ধে বলছেন—

ধর্মসংরক্ষণার্থায় ধর্মসংস্থাপনায় চ।
তৈস্তৈর্বেষৈশ্চ রূপৈশ্চ ত্রিষু লোকেষু ভার্গব॥

(মহাভারত, অশ্ব. ৫৪।১৩-১৪)

'আমি ধর্মের রক্ষা এবং স্থাপনার নিমিত্ত ত্রিলোক্যে নানা যোনিতে অবতার রূপ ধারণ করে সেইসব রূপ ও আকৃতি অনুসারে ব্যবহারও করি।'

ভগবান সর্বদা কর্তব্যপরায়ণ থাকেন, কখনো কর্তব্যচ্যুত হন না। সুতরাং ভগবৎপরায়ণ সাধকেরও কখনো কর্তব্যচ্যুত হওয়া উচিত নয়। কর্তব্যচ্যুত হলেই তিনি ভগবৎতত্ত্ব অনুভব থেকে বঞ্চিত হন। সর্বদা নিষ্কামভাবে কর্তব্যপরায়ণ হলে সাধকের ভগবৎতত্ত্বর অনুভব অতি সহজেই হওয়া সম্ভব।

(খ) মহাপুরুষের কর্মনিষ্ঠা—(শ্লোক ১৭-২১, ২৫-২৬)

যস্ত্বাত্মরতিরেব স্যাদাত্মতৃপ্তশ্চ মানবঃ।
আত্মন্যেব চ সন্তুষ্টস্তস্য কার্যং ন বিদ্যতে॥
নৈব তস্য কৃতেনার্থো নাকৃতেনেহ কশ্চন।
ন চাস্য সর্বভূতেষু কশ্চিদর্থব্যপাশ্রয়ঃ॥
তস্মাদসক্তঃ সততং কার্যং কর্ম সমাচর।
অসক্তো হ্যাচরন্ কর্ম পরমাপ্নোতি পূরুষঃ॥
কর্মণৈব হি সংসিদ্ধিমাস্থিতা জনকাদয়ঃ।
লোকসংগ্রহমেবাপি সংপশ্যন্ কর্তুমর্হসি॥
যদ্ যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ।
স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ততে॥

(গীতা ৩।১৭-২১)

সক্তাঃ কর্মণ্যবিদ্বাংসো যথা কুর্বন্তি ভারত।
কুর্যাদ্বিদ্বাংস্তথাসক্তশ্চিকীর্ষুর্লোকসংগ্রহম্ ॥
ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্মসঙ্গিনাম্।
জোষয়েৎ সর্বকর্মাণি বিদ্বান্ যুক্তঃ সমাচরন্॥

(গীতা ৩।২৫-২৬)

'যে ব্যক্তি নিজেতেই প্রীতি, নিজেতেই তৃপ্ত, নিজেতেই সন্তুষ্ট তাঁর কোনো কর্তব্য থাকে না।

সেই কর্মযোগে সিদ্ধ মহাপুরুষদের এই জগতে কর্মানুষ্ঠানের কোনো

প্রয়োজন নেই, কর্ম থেকে বিরত থাকারও প্রয়োজন নেই। প্রাণীদের সঙ্গেও তাঁর কোনো প্রকার স্বার্থের সম্পর্ক থাকে না।

তাই সর্বদা আসক্তিশূন্য হয়ে যথাযথভাবে কর্তব্যকর্ম পালন করা উচিত কারণ অনাসক্ত হয়ে কর্ম করলে মানুষ পরমাত্মাকে (মোক্ষ) লাভ করে।

রাজা জনকের মতো মহাত্মাগণও কর্ম দ্বারাই পরমসিদ্ধি লাভ করেছেন। তাই লোকসংগ্রহের দিকে দৃষ্টি রেখে সকলেরই নিষ্কামভাবে কর্ম করা উচিত।

শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যা যা আচরণ করেন, অন্যান্য সাধারণ ব্যক্তিগণও তাই অনুসরণ করে থাকে। তিনি যা কিছু প্রামাণ্য বলে ধরেন, সাধারণ মানুষেরা সেই অনুযায়ী আচরণ করে। (গীতা ৩।১৭-২১)

কর্মে আসক্ত অজ্ঞ ব্যক্তিরা যেমন কর্ম করে, আসক্তিবর্জিত জ্ঞানী ব্যক্তিগণেরও লোকসংগ্রহার্থে সেরূপ কর্ম করা উচিত।

তত্ত্বজ্ঞ মহাপুরুষগণ সর্বদা সতর্ক থেকে অনাসক্তভাবে কর্ম করবেন যাতে আসক্ত অজ্ঞ ব্যক্তিদের বুদ্ধিভ্রম না হয় এবং তাদেরও কর্মে প্রবৃত্তি হয়।' (গীতা ৩।২৫-২৬)

অনাসক্তভাবে কর্ম—কোনো ব্যক্তিরই সাংসারিক প্রীতি চিরকাল থাকতে পারে না। সাংসারিক বস্তুর প্রতি প্রীতি, তৃপ্তি এবং সন্তুষ্টির কেবল প্রতীতিই জন্মায় কিন্তু তা টিকে থাকে না। তবে বিনাশশীল বস্তুর ওপর আসক্তি আসে কেন ? মানুষ যখন আকাঙ্ক্ষাকৃত বস্তু (ধনাদি) প্রাপ্ত হয় তখন কামনা মিটে যায় এবং অন্য আকাঙ্ক্ষা আসার পূর্বে তার নিষ্কামভাব আসে। এই অবস্থায় সে নিষ্কামতার সুখ অনুভব করে। কিন্তু সেই সুখকে মানুষ ভুল করে সাংসারিক বস্তুপ্রাপ্তিজনিত সুখ বলে মনে করে এবং সেটিকেই প্রীতি, তৃপ্তি ও সন্তুষ্টি নামে অভিহিত করে। এখানে লক্ষণীয় হল এই যে, সাধক নিষ্কামতাকে সুখের মূল কারণ বলে মনে করেন এবং কামনাকে মনে করেন দুঃখের কারণ হিসাবে। অপরদিকে সংসারাসক্ত ব্যক্তিগণ বস্তুগুলি প্রাপ্তিকেই সুখ বলে মনে করেন এবং অপ্রাপ্তিকেই দুঃখ বলে মনে করেন। সংসারাসক্ত ব্যক্তিগণও যদি সাধকদের দৃষ্টিকোণ দিয়ে

দেখেন এবং তদনুসারে চিন্তা করেন তাহলে তারাও শীঘ্রই নিষ্কামতা লাভ করবেন।

সকাম ব্যক্তিদের কর্মযোগের অধিকারী বলা হয়েছে। **'কর্মযোগস্তু কামিনাম্'** (ভাগবত ১১।২০।৭)। সকাম ব্যক্তি কর্মযোগে রত হলে এঁদের প্রীতি ও তৃপ্তি সংসারের প্রতি না হয়ে আত্মস্বরূপের প্রতি প্রত্যক্ষভাবে হয়ে থাকে। সংসারে আসক্ত ব্যক্তির যখন কিছু পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা থাকে তখনই কর্ম করে থাকে, কিন্তু কর্মযোগী মহাপুরুষদের কোনো কিছুর পাওয়ার থাকে না তাই তাদের কর্মই বা কী থাকে ? অবশ্য **'তস্য কার্যং ন বিদ্যতে'** (গীতা ৩।১৭) পদটির মানে এই নয় যে এইসব মহাপুরুষের দ্বারা কোনো কর্ম হয় না। সাংসারিক কাজের জন্য কোনো তাগাদা না থাকলেও লোকসংগ্রহের জন্য তাঁদের দ্বারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে শাস্ত্রবিহিত কর্মাদি সম্পন্ন হয়ে থাকে।

কর্মযোগ সিদ্ধ মহাপুরুষদের সম্বন্ধে ভগবান বলছেন—জগতে তাঁদের কর্মানুষ্ঠানের কোনো প্রয়োজন নেই **'নৈব তস্য কৃতেনার্থো'**, কর্ম থেকে তাঁদের বিরত থাকারও কোনো প্রয়োজন নেই **'নাকৃতেনেহ কশ্চন'** এবং প্রাণীদের সঙ্গে তাঁদের স্বার্থেরও কোনো সম্পর্ক থাকে না **'ন চাস্য সর্বভূতেষু কশ্চিদর্থব্যপাশ্রয়ঃ'**।

মানুষের জাগতিক বস্তু পাওয়ার আকাঙ্ক্ষাই কাল হয়ে তার বন্ধনের কারণ হয়। সেই ইচ্ছা নিবৃত্তির জন্যই কর্তব্যকর্ম করার প্রয়োজন থাকে। সাধারণ মানুষ নিজ কামনা পূরণের জন্য কর্ম করে, কর্মযোগী নিজ কামনা নিবৃত্তের জন্য পরের হিতে কর্ম করেন আর কর্মযোগে সিদ্ধ মহাপুরুষদের কোনো কামনা না থাকায় তাঁদের কর্তব্যের প্রয়োজনীয়তাও থাকে না কিন্তু তাঁদের দ্বারা নিঃস্বার্থভাবে কৃত সকল কর্মই স্বতঃই সৃষ্টির হিতের জন্য হয়ে থাকে। জগৎ থেকে প্রাপ্ত বস্তু বা কর্মসামগ্রী কখনই ব্যষ্টির (নিজ শরীর) জন্য নয়, সমষ্টির (জগৎ-সংসারের) জন্য হয়ে থাকে। মানুষ ভুল করে ব্যষ্টির জন্য সমষ্টিকে ব্যবহার করে অশান্তি পায়, ঘোর শাস্তি ভোগ করে। কর্মযোগে সিদ্ধ মহাপুরুষ নিজেদের জন্য কথিত শরীর, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি, পদার্থ ইত্যাদি সবই জগৎ-সংসারের হিতের জন্য ব্যবহার করেন তাই তাঁদের দ্বারা

কৃত কর্মে নিজের কোনো প্রয়োজন না থাকলেও তাঁদের সকল কর্মই আদর্শস্বরূপ উত্তম কর্মে পরিগণিত হয়।

নিজের প্রয়োজনে কর্ম করলে কখনোই তা আদর্শ হয় না। যে সব ব্যক্তি শরীর, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি ইত্যাদির সঙ্গে নিজ সম্পর্ক আছে বলে মনে করেন তারা রজগুণী, তাই তারা নিজ আত্মগরিমার জন্য কর্ম করলেও কখনোই অপরের জন্য কর্ম করতে চান না। সেইরকম তমোগুণী পুরুষ আলস্য, প্রমাদাদিতে আসক্ত, তাই তারাও অপরের জন্য কর্ম করতে চান না। কিন্তু কর্মযোগ সিদ্ধ মহাপুরুষ সাত্বিক সুখেরও উর্ধ্বে, তাই তাঁদের সাত্বিক সুখেও প্রবৃত্তি থাকে না। শরীরাদির সঙ্গে বিন্দুমাত্র সম্পর্ক না থাকায় তাঁদের না থাকে আত্মগরিমা, না আলস্য বা আরামের প্রতি দৃষ্টি। তাঁদের জগতের কাছ থেকে না থাকে কিছু পাওয়ার ইচ্ছে, না প্রাণরক্ষার জন্য ব্যস্ততা বা মৃত্যুভয়। তাই তাঁদের দ্বারা নিষ্কামভাবে কর্তব্যকর্ম স্বতঃই হতে থাকে। একে সহজ-অবস্থা বলে।

উত্তমা সহজবস্থা মধ্যমা ধ্যানধারণা।
কনিষ্ঠা শাস্ত্রচিন্তা চ তীর্থযাত্রাঽধমাঽধমা॥

জীব যখন মনুষ্যজন্ম গ্রহণ করে, তখন সে শরীর, অর্থ, জমি, বাড়ি ইত্যাদি সামগ্রী পেয়ে থাকে জগৎ-সংসারে কর্ম করার জন্য। এগুলি সবই কিন্তু ইহলোক ত্যাগের সময় পরিত্যক্ত হয়। যেমন মানুষ কোনো জায়গায় (অফিসে) কাজ পেলে সে চেয়ার, টেবিল, কাগজপত্র ইত্যাদি অফিস থেকেই পায় অফিসের কাজের জন্য, নিজের বাড়ি নিয়ে যাওয়ার জন্য নয়। অফিসে কাজের বিনিময়ে সে বেতন পায় এবং নির্লোভ হয়ে ভালোভাবে কাজ করলে তার পদোন্নতি হয়। সেইরকম কেউ যদি জগৎ-সংসারের বস্তু দিয়ে সংসারের সেবা করে তার জগতের থেকে সম্পর্ক ছিন্ন হয় এবং বিনিময়ে সে শুভসংস্কার প্রাপ্ত হয় যা তাকে পরমাত্মা প্রাপ্তি করায়।

মেলার সময় স্বেচ্ছাসেবকরা কর্তব্য মনে করে যাত্রীদের সেবা করে, পরিবর্তে কিছু আশা করে না তাই তাদের মেলা অন্তে কোনো লাভ লোকসানের হিসেব থাকে না আর মেলার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায়।

কর্মযোগী সাধকও এইভাবে কাজ করবেন ; বস্তু, সম্মান, মর্যাদা কিছুর আশা না রেখে তিনি জগৎ-সংসারের সেবা করবেন ফলে জগৎ-সংসারের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন হবে।

কর্মযোগী কেবল নির্দিষ্ট কর্ম সম্পাদনকালেই নিজেকে কর্তা ভাবেন, অন্য সময় নয়। এ যেন নাটকের চরিত্রাভিনয়। নির্দিষ্ট ক্রিয়াটুকুর জন্য, নির্দিষ্ট সময়টুকুর জন্যই কর্তা সাজা, বাস্তবে নিজেকে তা মনে না করা। কর্মযোগী সংসারের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক—যেমন মা-বাবা, স্ত্রী-পুত্র, দাদা-বউদি ইত্যাদিদের সঙ্গে ওই ওই সম্পর্ক ততক্ষণই রাখেন বা তখনই কর্তা হন, যখন তার সামনে তাঁদের সেবা বা তাদের সম্বন্ধে তাঁর কর্তব্যকর্ম উপস্থিত হয়। তিনি স্ত্রীকে তখনই স্ত্রী হিসেবে মানবেন যখনই স্ত্রী হিসেবে তার সেবার (ভরণপোষণের) প্রয়োজন হবে, অন্য সময় নয়। অন্য সময় সে কারোর কন্যা, কারোর মা, বউদি, ননদ হতেই পারে। এইভাবে সংসারে সবার সেবা করার জন্যই সম্পর্ক রাখবে, আর সর্বদা অনাসক্ত হয়ে কর্ম করবে—

'অসক্তো হ্যাচরন্ কর্ম পরমাপ্নোতি পূরুষঃ।'

অনাসক্ত হয়ে কর্ম করলে পরমাত্মাকে (মোক্ষ) লাভ করা যায়। অন্যরা তাদের কর্তব্য ঠিকমতো পালন করছে কিনা দেখা কর্মযোগীর কর্তব্য নয়। নিজের মধ্যে কর্তৃত্বাভিমান হলেই অন্যের কর্তব্যের দিকে লক্ষ যায় এবং অন্যের কর্তব্যের দিকে দৃষ্টি দিলেই মানুষ নিজ কর্তব্যচ্যুত হয়। তাই কর্মযোগী অন্যের কর্তব্যের দিকে দৃষ্টি দেন না। এমনকি নিজ বর্ণ, আশ্রম, জাতি, সম্প্রদায়, ঘটনা, পরিস্থিতি এসবের উর্ধ্বে উঠে কর্মযোগী কর্ম করেন এবং এই সব মনে রাখেন না। তাই কর্মযোগীর কর্তৃত্বাভিমান স্বাভাবিকভাবেই দূর হয়।

লোকসংগ্রহ—পরবর্তী শ্লোকে ভগবান শ্রেষ্ঠপুরুষদের সতর্ক আচরণ ও তা কীভাবে অনুপ্রাণিত করে তা বলেছেন।

মানুষ মনে করে সাংসারিক বস্তুপ্রাপ্তির মতোই বোধহয় পরমাত্মাপ্রাপ্তিও কর্ম দ্বারা সম্ভব। যেমন কোনো উচ্চপদস্থ ব্যক্তির সঙ্গে দেখা

করতে গেলে অনেক পরিশ্রম করতে হয়, সেইরকম অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকর্তা ভগবানের সঙ্গে মিলিত হতে গেলে বোধহয় আরও বেশি পরিশ্রম (তপস্যাদি) করতে হবে। সাধকদের এটি একটি ভুল ধারণা। কর্ম দ্বারা বিনাশশীল বস্তু (জগৎ-সংসার) পাওয়া যায়, অবিনাশী বস্তু (পরমাত্মা) নয়, কারণ সমস্ত কর্মই সংঘটিত হয় বিনাশশীল বস্তু অর্থাৎ শরীর, ইন্দ্রিয়াদি মনের সাহায্যে আর এইসব বিনাশশীল বস্তুর সহায়তায় অবিনাশীকে পাওয়া যায় না। পরমাত্মা প্রাপ্তি তখনই সম্ভব হয় যখন বিনাশশীল পদার্থের আসক্তি সর্বতোভাবে শূন্য হয়ে যায়। পরমাত্মাপ্রাপ্তির তীব্র আকাঙ্ক্ষা থাকলে তবেই সংসারে আসক্তিশূন্য হওয়া যায় এবং তাকে পাওয়া যায়। ভগবৎপ্রাপ্তির বাসনা, আকাঙ্ক্ষার পথে জাগতিক ভোগ ও সংগ্রহেচ্ছাই কিন্তু সর্ব বড় বাধা, আর কোনো বাধা নেই। কর্মযোগ অতি প্রাচীন যোগ এবং জনকাদি অনেক রাজর্ষিরাই এই যোগে অর্থাৎ অনাসক্তভাবে কর্তব্যকর্ম করে পরমাত্মাকে লাভ করেছেন।

এখানে আমাদের বুঝতে হবে যে উদ্দেশ্য ও ফলেচ্ছা দুটি পৃথক। উদ্দেশ্য হল নিত্য-পরমাত্মাকে প্রাপ্ত করা আর ফলেচ্ছা হল অনিত্য বিনাশশীল জাগতিক বস্তু প্রাপ্ত করা। উদ্দেশ্য প্রাপ্তির নিমিত্ত কৃতকর্ম কখনোই সকাম (ফলেচ্ছাজনিত) হতে পারে না। আর নিষ্কাম পুরুষের (কর্মযোগীর) সকল কর্মই উদ্দেশ্যপ্রাপ্তির জন্য হয়, ফলেচ্ছার জন্য নয়।

কর্মযোগী—**'লোকসংগ্রহমেবাপি সংপশ্যন্ কর্তুমর্হসি'** অর্থাৎ নিষ্কামভাবে (যজ্ঞার্থ) লোকের সেবায় রত থাকেন। আর এই ভাবে কর্ম করলে **'কর্মণৈব হি সংসিদ্ধিম্'**—তাঁরা পরমসিদ্ধি লাভ করেন।

কোনো কর্তব্যই ছোট বা বড় হয় না আবার শুধুমাত্র লোক দেখানোর জন্য কর্তব্যপালন করলেও তা লোকসংগ্রহ হয় না। কেউ দেখুক বা না দেখুক ; কাজ ছোটই হোক বা বড়, পরের সেবায় কর্তব্যপালন করলে তবেই তা স্বাভাবিক লোকসংগ্রহ হয়। অরণ্যে ফুল ফুটলে সেটি শুষ্ক হয়ে পরে ঝরে যায়, কেউ তা লক্ষ করে না। কিন্তু সে তার সুগন্ধ দ্বারা চারদিক মোহিত করে দুর্গন্ধ নাশ করে। এই যে ক্ষুদ্র বনফুল সেও নিরবে তার সামর্থ্য অনুযায়ী

সেবা করে থাকে। কর্মকে গুরুত্ব দিয়ে দেখলে ঝাড়ু দেওয়া ছোট কাজ আর শাস্ত্র পাঠ বড় কাজ। কর্মফলকে গুরুত্ব দিয়ে দেখলে অল্পদানে কম পুণ্য ও বেশিদানে বেশি পুণ্য মনে হয়। কর্মের প্রাধান্য (আসক্তি) ও কর্মফলের প্রাধান্য (ফলেচ্ছা) ত্যাগপূর্বক কর্ম করলে সকল কর্মই সমান এবং উদ্দেশ্য সিদ্ধকারী (পরমাত্মা প্রাপ্তকারী) হয়ে থাকে।

পরের শ্লোকে ভগবান বলেছেন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির আচরণ অন্যান্যরাও অনুসরণ করে থাকেন—**'যদ্যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ'**। এখানে তিনিই শ্রেষ্ঠব্যক্তি যিনি জগৎসংসারকে (শরীর, মন, বুদ্ধি, আত্মীয়, সম্পত্তি আদিকে) এবং স্বয়ংকে (নিজ স্বরূপকে) জানেন। শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের 'ব্যষ্টি অহংকার' তো থাকেই না, তাঁদের 'সমষ্টি অহংকার'ও কেবলমাত্র ব্যবহারিক কারণেই হয়ে থাকে। তাঁদের আচরণের প্রভাব অন্য ব্যক্তিদের ওপর অত্যন্ত বেশি হয়। রেলগাড়ির চালকের মতন, সমাজের প্রধান ব্যক্তিদেরও বিশেষ দায়িত্ব থাকে। রেলগাড়িতে যারা ওঠে তারা শুয়ে বা বসে ভ্রমণ করতে পারে কিন্তু চালককে সর্বদাই সজাগ থাকতে হয়। সেইরকম শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদেরও চালকের মতন নিজ আচরণের ওপর বিশেষ নজর রাখা প্রয়োজন। বর্তমানে ভগবৎ সম্বন্ধীয় (পারমার্থিক) ভাবের বহু প্রচারকারী থাকা সত্ত্বেও তাদের উপদেশের প্রভাব খুব কম দেখা যায়। এর কারণ হল বক্তা যা বলেন প্রায়শই নিজে সেইরূপ আচরণ করেন না। তিনি যদি নিজে সেইরূপ আচরণ করেন, সেইমতো উপদেশ দেন, তবে সেইসব কথা বন্দুকের গুলির মতোই অব্যর্থ হয়ে থাকে। কিন্তু এর বিপরীতে, বিনা আচরণে উপদেশ দিলে তা কেবল বারুদভরা বন্দুকের মতোই শব্দ করে চুপ হয়ে যায়। তবে পারমার্থিক উপদেশ এইভাবে পুরোপুরি নষ্ট হয় না, শ্রোতার যদি শ্রদ্ধা থাকে তবে এইসব ভগবৎকথার প্রভাব অল্পবিস্তর তার ওপর অবশ্যই পড়বে।

এই প্রকরণের শেষে ভগবান তত্ত্বজ্ঞ মহাপুরুষ কীভাবে লোকসংগ্রহের জন্য কর্ম করেন তা বলেছেন। **'সক্তাঃ কর্মণ্যবিদ্বাংসো যথা কুর্বন্তি ভারত। কুর্যাদ্বিদ্বাংস্তথাসক্তশ্চিকীর্ষুর্লোকসংগ্রহম্॥'** (গীতা ৩।২৫)

এখানে 'সক্তাঃ', 'অবিদ্বাংসঃ' বলা হয়েছে সেই সব সংসারাসক্ত ব্যক্তিদের সম্বন্ধে যাদের শাস্ত্রবিহিত কর্মের প্রতি শ্রদ্ধা থাকলেও তাঁরা তত্ত্বজ্ঞও নন দুরাচারীও নন কিন্তু কামনা, বাসনা ও জাগতিক আসক্তির কারণে শুধু নিজের জন্যই কর্ম করে থাকেন। এই সব ব্যক্তিরা কখনো প্রমাদ, আলস্য ইত্যাদিতে ব্যাপৃত না হয়ে সাবধানতা ও তৎপরতাপূর্বক যথাযথ বিধি সহকারে কর্ম করে থাকেন যদিও তা সকাম কর্ম।

ভগবান এই রীতিকে আদর্শ বলে চিহ্নিত করে বলেছেন—**'কুর্যাৎ বিদ্বান্ তথা অসক্তঃ চিকীর্ষুঃ লোকসংগ্রহম্'**। এখানে তত্ত্বজ্ঞ মহাপুরুষদেরই অসক্তঃ, বিদ্বান বলা হয়েছে, যাদের মধ্যে থেকে কামনা, বাসনা, মমতা, আসক্তি, পক্ষপাতিত্ব, স্বার্থপরতা ইত্যাদি সর্বতোভাবে দূর হয়েছে আর তাই এই তত্ত্বজ্ঞ মহাপুরুষদের (আসক্তিশূন্য বিদ্বান ব্যক্তিদের) সমস্ত আচরণ স্বাভাবিকভাবেই নিষ্কাম হয়, যজ্ঞার্থেই হয়। কিন্তু ভগবান এখানে বলছেন সকাম ব্যক্তি যেরকম ফলপ্রাপ্তির আশায় সাবধানতা ও তৎপরতার সঙ্গে বিধিপূর্বক কর্তব্যকর্ম করে, ভোগী মানুষের ভোগে, মোহগ্রস্ত মানুষের স্বজনে, লোভী মানুষের অর্থে যেমন আসক্তি হয়, তেমনি শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিরাও লোকসংগ্রহে অর্থাৎ প্রাণীমাত্রেরই হিতে সেইরূপ অনুরাগপূর্বক কর্ম করবেন। তবে এই লোকসংগ্রহ কখনোই লোকদেখানো নয়, কেননা তত্ত্বজ্ঞর মধ্যে কখনো অভিমান থাকে না যে 'আমি লোকসংগ্রহ করছি'। তাঁরা কর্তব্যকর্ম করেন লোকসংগ্রহের জন্যই, নিজের জন্য নয়। সাধারণ লোককে উন্মার্গ (বিপথ) থেকে সরিয়ে সন্মার্গে (সৎপথে) নিয়ে আসাই হল 'লোকসংগ্রহ'। শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিরা যদিও লোকসংগ্রহে কাজ করেন কিন্তু কখনো সাধারণের মধ্যে অযথা বুদ্ধিভেদ করান না—**'ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্মসঙ্গীনাম্'**।

বুদ্ধিভেদের কিছু উদাহরণ—

১) অন্যদের নিজ নিজ কর্তব্যকর্মের প্রতি অশ্রদ্ধা উৎপাদন করানো। যেমন—তাদের উপদেশ দেওয়া যে কর্ম অতি নিকৃষ্ট, এতে জীব আবদ্ধ হয়, জ্ঞান অর্জন করো, ইত্যাদি ইত্যাদি।

২) জগতে সকলেই স্বার্থের জন্য কাজ করে, স্বার্থ ছাড়া কেউ থাকতে পারে না, আর ফলের আশা ছাড়া মানুষ কাজ করবেই বা কেন। সুতরাং নিষ্কামভাবে কর্তব্যকর্মও করা উচিত নয়।

৩) আবার সাধারণ লোককে বলা যে ফলের আশা করে কাজ করলে বারংবার জন্মগ্রহণ করতে হয় তাই কর্ম করা উচিত নয় ইত্যাদি উপদেশ।

এইভাবে বিভ্রান্তিমূলক উপদেশ দিলে আসক্তি ত্যাগ তো হয়ই না উল্টে শুভকর্মও পরিত্যক্ত হতে পারে। সকাম কার্য থেকে ক্রমে নিষ্কামতার দিকে যাওয়া বুদ্ধিভেদ নয় বরং এটাই বাস্তবিক পথ।

জ্ঞানী ও অজ্ঞব্যক্তির কর্মের ভেদ—(শ্লোক ২৭-৩৫)

ভগবান প্রথমে মোহান্ধ ব্যক্তিদের কথা বলে তারপরে এর থেকে উত্তরণের উপায় বলেছেন।

প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্মাণি সর্বশঃ।
অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্তাহমিতি মন্যতে॥
তত্ত্ববিত্তু মহাবাহো গুণকর্মবিভাগয়োঃ।
গুণা গুণেষু বর্তন্ত ইতি মত্বা ন সজ্জতে॥
প্রকৃতের্গুণসংমূঢ়াঃ সজ্জন্তে গুণকর্মসু।
তানকৃৎস্নবিদো মন্দান্ কৃৎস্নবিন্ন বিচালয়েৎ॥
ময়ি সর্বাণি কর্মাণি সন্ন্যস্যাধ্যাত্মচেতসা।
নিরাশীর্নির্মমো ভূত্বা যুধ্যস্ব বিগতজ্বরঃ॥
যে মে মতমিদং নিত্যমনুতিষ্ঠন্তি মানবাঃ।
শ্রদ্ধাবন্তোঽনসূয়ন্তো মুচ্যন্তে তেঽপি কর্মভিঃ॥
যে ত্বেতদভ্যসূয়ন্তো নানুতিষ্ঠন্তি মে মতম্।
সর্বজ্ঞানবিমূঢ়াংস্তান্ বিদ্ধি নষ্টানচেতসঃ॥
সদৃশং চেষ্টতে স্বস্যাঃ প্রকৃতের্জ্ঞানবানপি।
প্রকৃতিং যান্তি ভূতানি নিগ্রহঃ কিং করিষ্যতি॥
ইন্দ্রিয়স্যেন্দ্রিয়স্যার্থে রাগদ্বেষৌ ব্যবস্থিতৌ।
তয়োর্ন বশমাগচ্ছেৎ তৌ হ্যস্য পরিপন্থিনৌ॥

শ্রেয়ান্ স্বধর্মো বিগুণঃ পরধর্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।
স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্মো ভয়াবহঃ।।

(গীতা ৩।২৭-৩৫)

'সকল কর্ম সর্বতোভাবেই প্রকৃতির গুণগুলির দ্বারা সম্পন্ন হয়। কিন্তু অহংকারে মোহান্ধ ব্যক্তি মনে করে 'আমিই কর্তা'।

মহাপুরুষগণ গুণ ও কর্মবিভাগ তত্ত্বত জানেন, তাই তাঁরা গুণগুলি গুণেই আবর্তিত হয় এইরূপ মেনে আর সেগুলিতে আসক্ত হন না।

কিন্তু অজ্ঞব্যক্তিরা প্রকৃতিজনিত গুণে মোহান্ধ, তাই তাদের গুণে ও কর্মে আসক্তি থাকে। মহাপুরুষদের এদেরও কর্ম থেকে বিচলিত করা উচিত নয়।

সমস্ত কর্তব্যকর্ম বিবেকপূর্বক আমাতে অর্পণ করো এবং কামনা, মমতা ও সন্তাপ পরিত্যাগ করে যুদ্ধরূপ কর্তব্যকর্ম করো।

যে মানুষ দোষদৃষ্টিরহিত হয়ে শ্রদ্ধা সহকারে ভগবানের এই মত সর্বদা অনুসরণ করে, তিনি সমস্ত কর্মবন্ধন থেকে মুক্ত হন।

আর যে ব্যক্তি দোষদৃষ্টিবশত এই মত পালন না করে, সে সর্বজ্ঞান বিমূঢ় এবং বিবেকহীন, তাই তার পতন হয়।

সমস্ত প্রাণীই স্ব-প্রকৃতিকে অনুসরণ করে, জ্ঞানী ব্যক্তিও নিজ প্রকৃতি অনুযায়ী কাজ করার চেষ্টা করেন তাই নিগ্রহ করার জন্য জেদ কেন ?

প্রত্যেক ইন্দ্রিয়েরই নিজ নিজ বিষয় রাগ ও দ্বেষ বিষয়ে আগ্রহ থাকে। মানুষের এইগুলিতে বশীভূত হওয়া উচিত নয় কারণ এ দুটি পরমাত্মপথ লাভের পথে বিঘ্ন বা শত্রু।

উত্তমরূপে অনুষ্ঠিত পরধর্ম অপেক্ষা স্বল্পগুণবিশিষ্ট নিজ ধর্ম শ্রেষ্ঠ। স্বধর্মে মৃত্যুও কল্যাণকারী, কিন্তু পরধর্ম ভয়প্রদানকারী ও বিপজ্জনক।' (গীতা ৩।২৭-৩৫)

ভগবান এখানে জ্ঞানী ও মূঢ় ব্যক্তির পার্থক্য ও সাধকের প্রতি কর্মযোগের উপদেশ দিয়েছেন।

মূঢ়ব্যক্তি—অন্তরের একটি বৃত্তির নাম হল 'অহংকার'। স্বয়ং (স্বরূপ) হল সেই বৃত্তির জ্ঞাতা। কিন্তু ভ্রমবশত যে স্বয়ংকে এই বৃত্তির সঙ্গে একাত্ম করে নেয় সেই ব্যক্তিকে বিমূঢ়াত্মা বলে। আর যদিও সকল কর্ম প্রকৃতির গুণের দ্বারাই সংঘটিত হয় কিন্তু বিমূঢ়াত্মা ব্যক্তিগণ নিজেকে কোনো কোনো কর্মের কর্তা হিসাবে মেনে নেয় আর তার এই অহংকর্তৃত্ব বোধকেই নিজ স্বরূপ বলে মনে করে। যেমন সমুদ্র ছাড়া ঢেউ-এর কোনো পৃথক অস্তিত্ব নেই, তেমনি জগৎসংসার ছাড়া শরীরেরও কোনো পৃথক অস্তিত্ব নেই। কিন্তু অহংকারে বিমুগ্ধচিত্ত ব্যক্তি যখন শরীরকে 'আমি' (নিজ স্বরূপ) বলে মেনে নেয় তখন তার মধ্যে নানান কর্মের কর্তাভাব প্রকাশ পেতে থাকে এবং নানা কামনাও উৎপন্ন হয়। যেমন—আমার স্ত্রী, পুত্র, অর্থ আদি লাভ হোক, লোকে আমাকে শ্রদ্ধা ও সম্মান করুক, সবই আমার মতানুযায়ী চলুক ইত্যাদি, ইত্যাদি। তার এদিকে দৃষ্টিই যায় না যে শরীরকে নিজ স্বরূপ বলে মনে করে সে প্রথমই নিজেকে আবদ্ধ করেছে আবার এখন কামনাবাসনার দ্বারা বন্ধন দৃঢ়তর করে, নিজেকে বিপদের দিকে নিয়ে যাচ্ছে।

জ্ঞানীব্যক্তি—আগের শ্লোকে বর্ণিত হয়েছে **'অহংকার বিমূঢ়াত্মা'** (৩।২৭) (অহংকারে বিমুগ্ধচিত্ত) ব্যক্তিদের সম্বন্ধে। আর পরের শ্লোকে বলা হয়েছে **'তত্ত্ববিৎ'** (৩।২৮) অর্থাৎ যাঁরা অহংকারের মোহগ্রস্ত হন না তাদের সম্বন্ধে।

সত্ত্ব, রজ এবং তম—এই তিনটি প্রকৃতিজাত গুণ এবং শরীর, ইন্দ্রিয়াদি, মন, বুদ্ধি, পদার্থ এ সবই গুণময় এবং একে 'গুণবিভাগ' বলা হয় আর 'শরীরাদির' দ্বারা সংঘটিত ক্রিয়াকে বলা হয় 'কর্মবিভাগ'। অজ্ঞব্যক্তি যখন এই গুণবিভাগ ও কর্মবিভাগ-এর সঙ্গে নিজ সম্বন্ধ মেনে নেয়, তখন সে আবদ্ধ হয়।

রেলগাড়ির ইঞ্জিনের চলবার শক্তি আছে কিন্তু চালক সঞ্চালন না করা পর্যন্ত তা গন্তব্যস্থলে পৌঁছতে পারে না। চালক কিন্তু কখনই ইঞ্জিনের সঙ্গে একাত্মতা বোধ করে না। সেইরকমই শরীর-ইন্দ্রিয়-মন-বুদ্ধি—এই চারটি গুণময় এবং কর্মক্ষম, কিন্তু এক সর্বব্যাপী প্রকাশ চেতন যা এই গুণগুলির

থেকে নির্লিপ্ত ও সম্পর্কশূন্য, তাঁর থেকে সত্তা এবং স্ফূর্তি পেলে তবেই এরা কার্য করতে প্রস্তুত হয়। মহাপুরুষগণ এই গুণগুলির সঙ্গে একাত্মবোধ করেন না, এর থেকে নির্লিপ্ত থাকেন, কেননা তাঁরা বোঝেন এই সব গুণ প্রকৃতিজাত এবং গুণগুলি গুণগুলিতেই আবর্তিত হচ্ছে। সাধকেরাও এরূপ অনুভব করলে, তাঁরাও তত্ত্ববিৎ হন। পুরুষের (চেতনার) পরিবর্তনের স্বভাব নেই, কিন্তু প্রকৃতিতে পরিবর্তনের (ক্রিয়শীলতার) স্বভাব স্বতঃই বিদ্যমান। তাই পুরুষ যখন প্রকৃতির সঙ্গে একাত্মতা বোধ মেনে নেয় তখন তার মধ্যেও ক্রিয়াশীলতার অনুভব প্রকাশ পায়—**'কর্তাহমিতি মন্যতে'** (গীতা ৩।২৭)। পুরুষের যে পরিবর্তন নেই তা পুরুষের অসামর্থ্যের জন্য নয় বরং এটি তাঁর মাহাত্ম্য। তিনি সর্বদা একরস (আনন্দময়), একরূপ থাকেন। বরফের যেমন গরম হওয়ার স্বভাব নেই, পুরুষেরও সেইরূপ পরিবর্তন হওয়ার স্বভাব নেই। যতক্ষণ পুরুষ জগতের সঙ্গে সম্পর্ক মেনে থাকে ততক্ষণ সাধককে 'তত্ত্ববিৎ' বলা যায় না। কারণ জগৎ-সংসারের সঙ্গে সম্পর্ক রেখে কেউই তত্ত্ববিৎ হয় না, জগৎকে জানতে সক্ষম হয় না, জগৎ থেকে আলাদা হলেই তবে জগৎকে জানা যায়। আবার পরমাত্মা থেকে পৃথক হলেও পরমাত্মাকে জানা যায় না, পরমাত্মার সঙ্গে একাত্ম হলে তবেই পরমাত্মাকে জানা যায়।

জ্ঞানীব্যক্তিদের প্রতি ভগবানের উপদেশ—সত্ত্ব, রজ ও তমঃ—এই তিনটি গুণই মানুষের বন্ধনের কারণ। সুখ ও জ্ঞানের আসক্তি দ্বারা সত্ত্বগুণ, কর্মের আসক্তি দ্বারা রজগুণ এবং প্রমাদ, আলস্য ও নিদ্রা দ্বারা তমোগুণ মানুষকে আবদ্ধ রাখে। লৌকিক ও পারলৌকিক ভোগের কামনাবশত মানুষ পদার্থ ও কর্মে আসক্ত হয়। তারা এর ঊর্ধ্বে ওঠার কথা ভাবতেই পারে না। ভগবান তাই আগের শ্লোকগুলিতে এদের **'অবিদ্বাংসঃ'**, **'কর্মসঙ্গিনাম্'**, **'অজ্ঞানাম্'** ইত্যাদি বলে বর্ণনা করেছেন।

ভগবান এখানে অজ্ঞব্যক্তিদের **'অকৃৎস্নবিৎ'**ও (পূর্ণভাবে না জানা ব্যক্তি) বলেছেন কারণ তারা শাস্ত্রবিহিত কর্ম এবং তার বিধি ঠিকমতো জানলেও গুণ ও কর্মের তত্ত্বগুলিকে ঠিকমতো জানে না এবং সাংসারিক

ভোগ এবং সংগ্রহে লিপ্ত থাকে। তত্ত্বজ্ঞ মহাপুরুষগণ কর্মযোগীই হোন বা জ্ঞানযোগীই হোন—তাঁরা সকল কর্ম করলেও তাঁদের কর্ম বা পদার্থের সঙ্গে স্বতঃই কোনো সম্বন্ধ থাকে না। ভগবান এখানে তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিদের উপদেশ দিয়ে বলছেন যে যেহেতু জ্ঞানী ব্যক্তিরা গুণবিভাগ ও কর্মবিভাগ সম্পূর্ণরূপে জ্ঞাত আছেন এবং কামনাবাসনারহিত তাই তাঁরা যেন কখনো সকামভাবে শুভকর্মে নিযুক্ত অজ্ঞব্যক্তিদের শুভকর্ম থেকে বিচলিত না করেন। অর্থাৎ মহাপুরুষগণের আচরণ, বাণী বা ক্রিয়ায় যেন এমন কোনো ব্যাপার প্রকটিত না হয় যাতে ওই সকাম ব্যক্তিদের শাস্ত্রবিহিত শুভকর্মে অশ্রদ্ধা, অবিশ্বাস বা অরুচি জন্মায় এবং তারা এই সমস্ত শুভকর্ম পরিত্যাগ করে। অজ্ঞ ব্যক্তিদের মন শুধু সকামভাব থেকে সরিয়ে নেওয়া উচিত, শাস্ত্রবিধি অনুসারে কর্ম থেকে নয়। তাহলে জন্ম-মৃত্যুরূপী বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া সম্ভব।

অর্জুন প্রশ্ন করেছিলেন 'আমাকে এই ভয়ানক কর্মে কেন নিয়োগ করছেন ?' এর উত্তরে ভগবান বলেছেন—'আমার উদ্দেশ্য ভয়ানক কর্মে নিয়োগের জন্য নয়, আমার উদ্দেশ্য কর্ম হতে সম্বন্ধ ছেদ করানো।'

সাধকদের প্রতি ভগবানের উপদেশ—ভগবান পরের শ্লোকে কর্মের প্রসঙ্গে বলছেন, যে কর্ম দ্বারা মানুষ আবদ্ধ হয়ে পড়ে, সেই কর্ম দ্বারাই মানুষ মুক্ত হয়। ভগবান ত্রিংশ শ্লোকে বলছেন—**'ময়ি সর্বাণি কর্মাণি সন্ন্যস্য'** অর্থাৎ ভক্তিযোগ দ্বারা, **'অধ্যাত্মচেতসা'** অর্থাৎ জ্ঞানযোগের দ্বারা এবং **'নিরাশীর্নির্মমো ভূত্বা যুধ্যস্য বিগতজ্বরঃ'** অর্থাৎ কর্মযোগের দ্বারা মুক্তি লাভ হয়। 'অধ্যাত্মচেতসা' পদটি দ্বারা ভগবান বলছেন যে সাধক যে পথেই সাধনা করুন না কেন, তাঁর উদ্দেশ্য আধ্যাত্মিক হওয়া উচিত, লৌকিক নয়। আর আধ্যাত্মচিত্ত অর্থাৎ বিচারবিবেচনাযুক্ত হৃদয় দ্বারা সমস্ত কর্তব্যকর্ম ভগবানে অর্পণ করলে অর্থাৎ এদের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক না রাখলে কর্মগুলি বন্ধনকারক না হয়ে মুক্তিদায়ক হয়।

জগৎ-সংসারকে নিজের বলে দেখলে পতন হয় আর এদের নিজের বলে মনে না করলে অর্থাৎ এদের প্রতি মমত্বহীন হলে উত্থান হয়।

ভগবানে প্রকৃত অর্পণ তখনই সম্ভব যখন করণ (শরীর ইত্যাদি), উপকরণ (জাগতিক বস্তু), কর্ম ও স্বয়ং—এ সবই ভগবানের এই ধারণা বদ্ধমূল হয়। কিন্তু সাধকগণ প্রায়শ এই ভুল করেন যে উপকরণগুলি সবই ভগবানের এই ভাব রাখলেও করণ (শরীরাদি) ও স্বয়ংও যে ভগবানের সেই ভাব রাখেন না। এর ফলে তাঁদের অর্পণ সম্পূর্ণ হয় না। অর্পণ সম্পূর্ণ হলে সাধকের তখন আর না জগতের থেকে বা না ভগবানের কাছ থেকে কিছু চাওয়ার প্রয়োজন থাকে, তাঁর প্রয়োজন ভগবানই ব্যবস্থা করে দেন। ত্যাগের, অর্পণের মহিমা অসীম। কোনো বস্তুকে নিজের মনে করে ভগবানে অর্পণ করলে ভগবান কয়েকগুণ করে সেটি তাকে ফিরিয়ে দেন, যেমন বীজ বপন করলে সেটি কয়েকগুণ বৃদ্ধি হয়ে ফিরে আসে। বস্তু নিজের বলে মনে না করে যদি ভগবানকে অর্পণ করা হয় তবে ভগবান তার কাছে ঋণী হয়ে যান, সে ভগবানকে লাভ করে। এর মানে এই নয় যে অর্পণ করলে ভগবানের কোনো সাহায্য হয়, আসলে মানুষের প্রকৃত অর্পণের ভাবে ভগবান অত্যন্ত প্রসন্ন হন। যেমন একটি ছোট ছেলে মাটিতে পড়ে যাওয়া চাবি তার বাবাকে উঠিয়ে দিলে বাবা খুশি হন, যদিও ছেলেটি বাবার, অঙ্গনটিও বাবার এবং চাবিটিও বাবার। আসলে বাবা খুশি হন চাবিটি পাওয়ার জন্য নয়, বরং ছেলের প্রত্যার্পণের ভাব দেখে।

পদার্থগুলিতে গুরুত্ব দেওয়া, ইহাদের প্রাপ্তিতে নিজেকে কৃতার্থ মনে করাই প্রত্যার্পণের পথে সবচেয়ে বড় বাধা। ভগবান বলছেন **'নিরাশী-র্নির্মমো ভূত্বা যুধ্যস্য বিগতজ্বরঃ'** অর্থাৎ নতুন কোনো বস্তুর জন্য কামনা করো না, প্রাপ্ত বস্তুতে মমত্ব রেখো না আর বিনাশশীল বস্তুর নাশে সন্তাপ (শোক) করো না, ইহাই হল প্রকৃত অর্পণের ভাব।

কামনার পূর্তি ও নিবৃত্তি—এই দুটির জন্যই মানুষ কর্মে প্রবৃত্ত হতে পারে। সাধারণ মানুষ কর্মে প্রবৃত্ত হয় কামনা পূরণের জন্য, আর সাধক কর্মে প্রবৃত্ত হন কামনা নিবৃত্তির জন্য, আত্মশুদ্ধির জন্য—**'সঙ্গং ত্যক্ত্বা আত্মশুদ্ধয়ে'** (গীতা ৫।১১)।

ভগবানের মত মানা ও না মানার ফল—পরের দুটি শ্লোকে (৩১-৩২)

ভগবান তার মত (প্রকৃতির নিয়ম—ঋত) মানার ও না মানার ফল বলেছেন। যাঁরা তাঁর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কর্ম করেন তারা কর্মবন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে যান আর যারা এরূপ করে না তাদের পতন হয়। এর তাৎপর্য হল যে, মানুষ ভগবানকে মানুক বা না মানুক তাতে ভগবানের কোনো আগ্রহ নেই, কিন্তু তাঁর মত (সিদ্ধান্ত) অবশ্যই পালনীয় আর এটাই হল ভগবানের নির্দেশ। মানুষ যদি তা না করে তবে তার পতন অবশ্যম্ভাবী।

সাধক যদি ভগবানের মত মেনে চলেন এবং তাঁকে মান্য করেন তবে তিনি ভগবৎপ্রেম লাভ করেন, কিন্তু যদি তিনি কেবল ভগবানের মত মেনে চলেন তবে সংসার-বন্ধন থেকে মুক্তি লাভ করেন। **'প্রাপ্ত কোনো বস্তুই নিজের নয়'**—এই হল ভগবানের মত। শরীর, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি, প্রাণ, অর্থ, সম্পদ, পদার্থ এমনকি জগৎ-সংসার সবই প্রকৃতির কার্য। এইগুলি কারোর ব্যক্তিগত নয়, কেবল এগুলির ব্যবহারের অধিকারই ব্যক্তিগত। আবার সদগুণ, সদাচার, ত্যাগ, বৈরাগ্য, দয়া, ক্ষমা ইত্যাদিও ব্যক্তিগত নয় বরং এ সবই ভগবানের। এই সব নিজের বলে মনে করলে অভিমান বা অহং কর্তৃত্বভাব জন্মায় যা আসুরী-সম্পদের মূল কারণ। জাগতিক বস্তু যতই সংগৃহীত হোক না কেন তার দ্বারা কখনো পরিতৃপ্তি আসে না। তৃপ্তি বা পূর্ণতা কেবল নিজের প্রকৃত বস্তু (অর্থাৎ ভগবান) প্রাপ্ত হলেই হয় আর তখন অন্য কিছু পাওয়ার আকাঙ্ক্ষাও থাকে না। যেমন জগতের সমস্ত পুত্রবতী নারীই জননী, কিন্তু বালকদের যে কোনো মাকে পেলে আনন্দ হয় না, সে কেবল নিজের মাকেই খোঁজে, তাকে পেলেই সন্তুষ্ট। সেইরকম যতক্ষণ কামনাবাসনা থাকবে বুঝতে হবে প্রকৃতবস্তু পাওয়া হয়নি, যা পেলে সমস্ত কামনাবাসনার নিবৃত্তি হত।

যে সমস্ত ব্যক্তি ভগবানের মত অনুসরণ করে না এবং সমস্ত কর্মই আসক্তি ও দ্বেষপূর্বক করে তাদের ভগবান বলেছেন **'বিদ্ধি নষ্টান্ অচেতসঃ'** অর্থাৎ তাদের পতন অনিবার্য, মানে তারা জন্ম-মৃত্যু চক্রে আবদ্ধ থাকে।

স্বভাবের পার্থক্য ও প্রকৃতির বশ্যতা—ভগবান বলছেন 'প্রকৃতিং যান্তি ভূতানি' অর্থাৎ যত কর্ম করা হয় সবই স্বভাব ও সিদ্ধান্ত অনুযায়ী করা হয়।

স্বভাব দুই প্রকারের হয় রাগদ্বেষযুক্ত ও রাগদ্বেষরহিত। কোনো বন্ধুর পত্র পেলে সেটি অনুরাগের সঙ্গে লোকে পড়ে আর শত্রুর পত্র পেলে লোকে দ্বেষযুক্ত হয়ে পড়ে। আবার পথচলার সময় পথে কেউ কোনো বিজ্ঞাপন দেখলে রাগদ্বেষরহিত হয়ে পড়ে। এই সবই হয় তার স্বভাব অনুযায়ী। আবার গীতা, রামায়ণ আদি পাঠ সিদ্ধান্ত অনুসারে হয়। সিদ্ধান্ত তাকেই বলে যেটি শাস্ত্র এবং ভগবানের নির্দেশ অনুযায়ী হয়। শাস্ত্র ও ভগবানের নির্দেশ না থাকলে তাকে সিদ্ধান্ত বলে না। মনুষ্যজন্ম হয় পরমাত্মাকে লাভ করার জন্য, তাই পরমাত্মা প্রাপ্তির জন্য সকল কর্মও সিদ্ধান্ত অনুসারে হয়।

ভগবান যখন অবতাররূপে জন্মগ্রহণ করেন তখন তিনি নিজ প্রকৃতিকে (স্বভাবকে) বশীভূত করে যে যে যোনিতে জন্মগ্রহণ করেন, সেই সেই যোনীর স্বভাব অনুযায়ী কর্ম করেন। যেমন ভগবান যখন শ্রীরাম বা শ্রীকৃষ্ণরূপে বা মৎস্য, কূর্ম, বরাহাদি রূপে জন্মগ্রহণ করেন, তখন সেই সেই প্রকাশ অনুযায়ীই কর্ম করেন। এর তাৎপর্য এই যে ভগবানের অবতার দেহেও বর্ণ এবং যোনি অনুযায়ী স্বভাবের পার্থক্য থাকে কিন্তু বশ্যতা থাকে না। তাঁর সকল কর্মই রাগ-দ্বেষরহিত হয়। যে মহাপুরুষদের প্রকৃতি (জড়ত্ব) থেকে সম্পর্ক ছেদ হয়েছে, তাদেরও স্বভাবে পার্থক্য থাকলেও প্রকৃতির বশ্যতা থাকে না। এঁদের সকল কর্ম রাগ-দ্বেষরহিত এবং শাস্ত্রানুযায়ী হয়[১]।

কিন্তু যে মানুষের প্রকৃতির সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন হয়নি, যার স্বভাব অশুদ্ধ (রাগ-দ্বেষযুক্ত) তাদের স্বভাবে পার্থক্য ও বশ্যতা দুই থাকে। অর্থাৎ তারা নিজ সৃষ্ট স্বভাবের বশে বাধ্য হয় অর্থাৎ রাগ-দ্বেষযুক্ত হয়ে কর্ম করে। প্রকৃতপক্ষে রাগ এবং দ্বেষ ইন্দ্রিয়ে অবস্থিত থাকে না। মানুষের স্বভাবগত রাগ-দ্বেষ অনুযায়ী নিজ অনুকূল-প্রতিকূল ভাব প্রতিভাত হয় তাতেই সমস্ত

---

[১]জীবন্মুক্ত মহাপুরুষগণ শাস্ত্রমর্যাদাকে শ্রদ্ধা করেন। তাই শ্রাদ্ধে পিণ্ডদানের সময় পিতার হাত প্রত্যক্ষভাবে দেখলেও ভীষ্ম শাস্ত্রের নির্দেশানুযায়ী কুশের উপরেই পিণ্ডদান করেন (মহাভারত, অনুশাসনপর্ব, ৮৪।১৫।২০)।

যেমন কোনো গাড়ির নির্দিষ্ট গতিসীমা একশো মাইল হলে সেটি কখনোই এই গতি অতিক্রম করে না, সেইরকম মহাপুরুষ দ্বারাও সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধ কাজ বা শুদ্ধ প্রকৃতির বিপরীতে যাওয়ার চেষ্টাই থাকে না।

কৃপাসিন্ধু ভগবান শ্রীকৃষ্ণঃ

নবধা ভক্তি
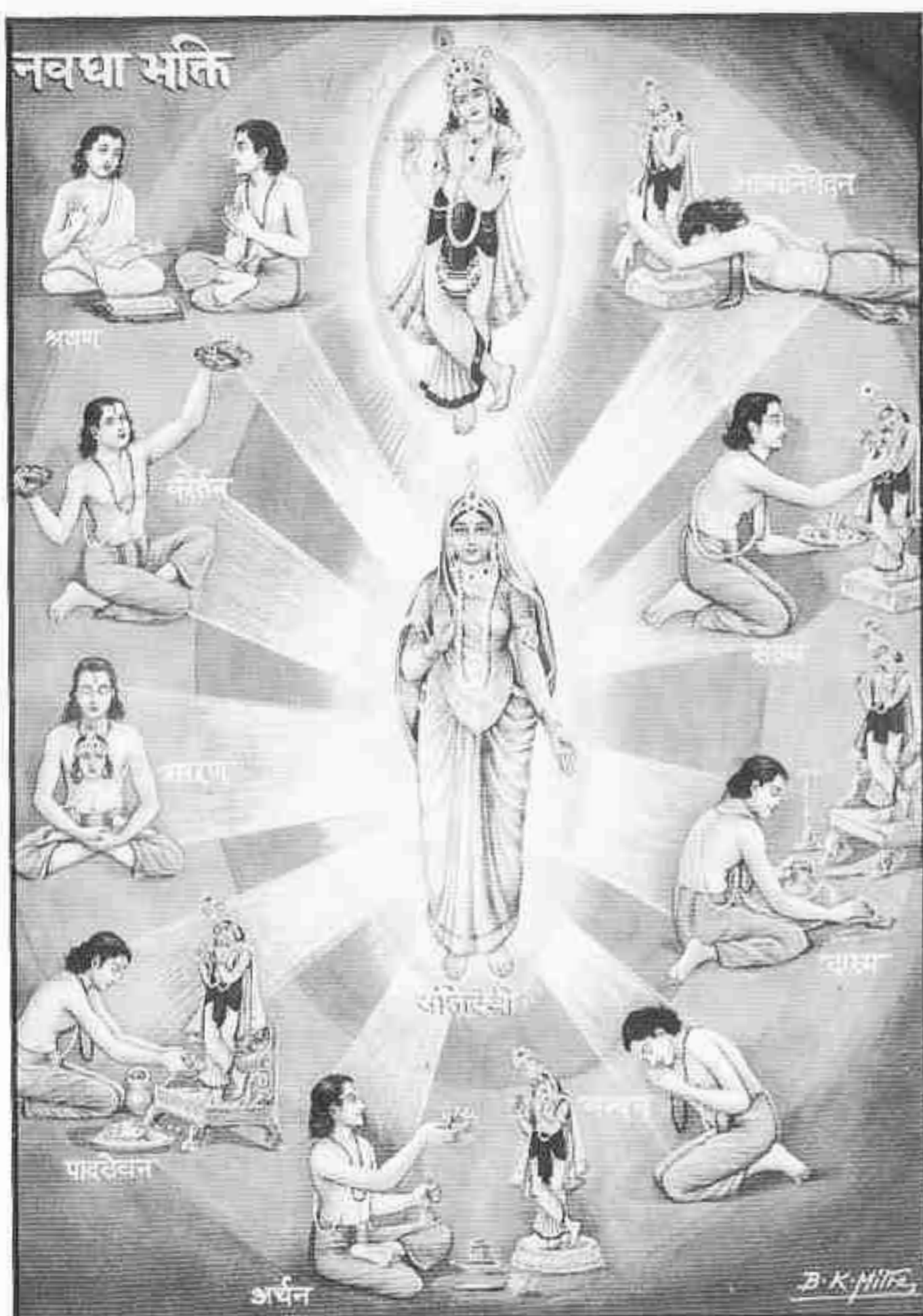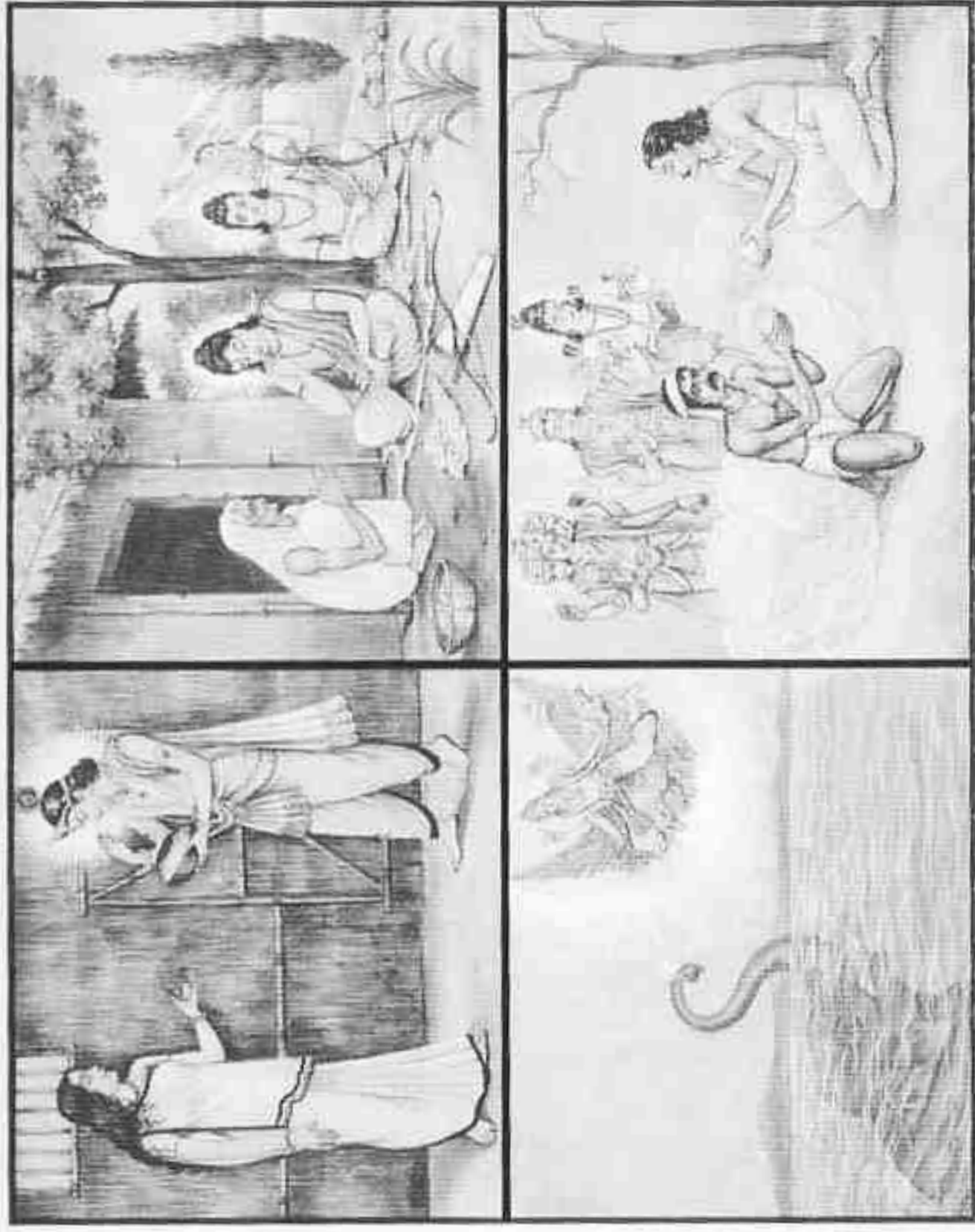
'পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং'—ভক্ত দ্রৌপদী, গজেন্দ্র, শবরী ও রন্তিদেব
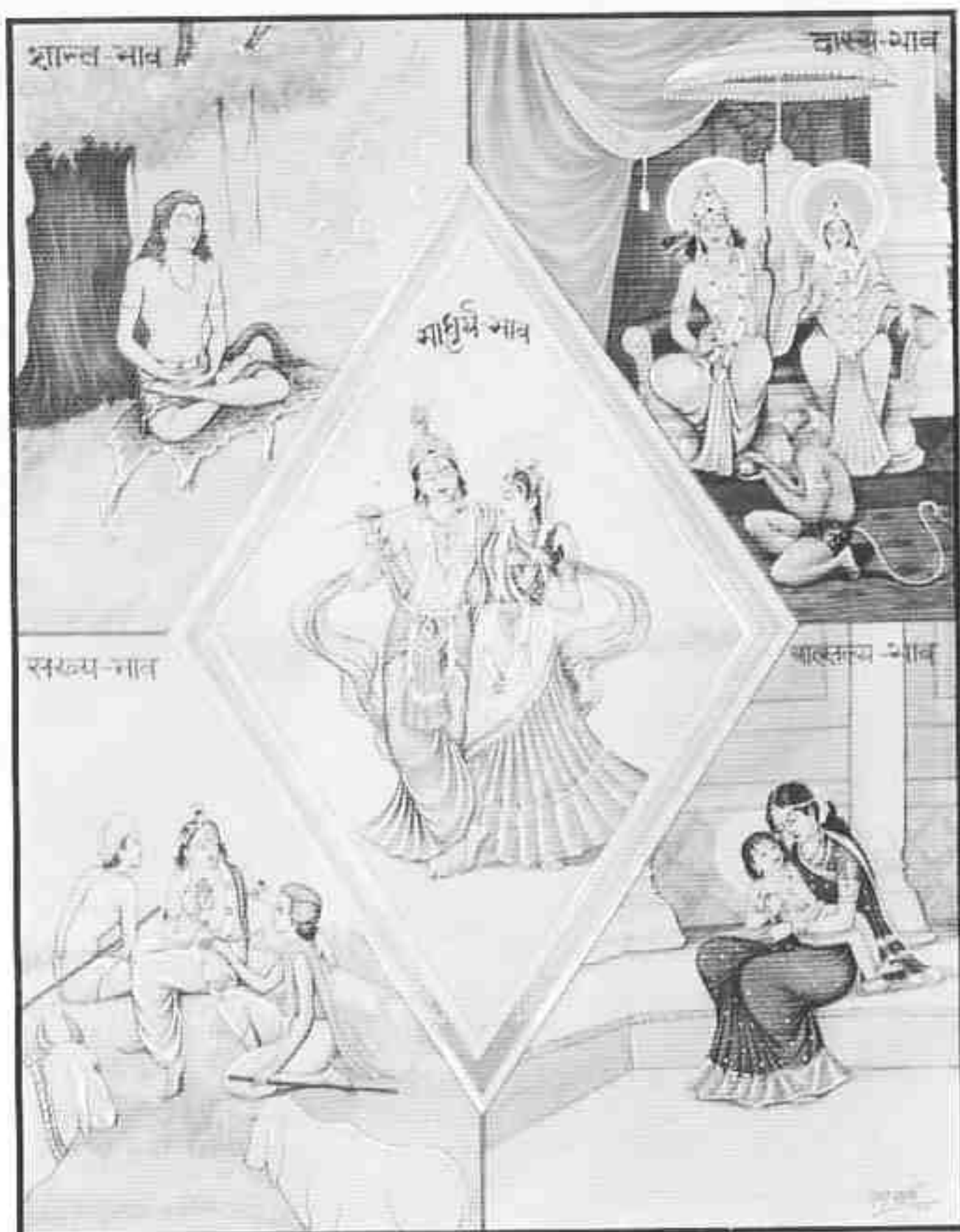
ভক্তির পঞ্চরস—শান্ত, সখ্য, দাস্য, বাৎসল্য ও মাধুর্য
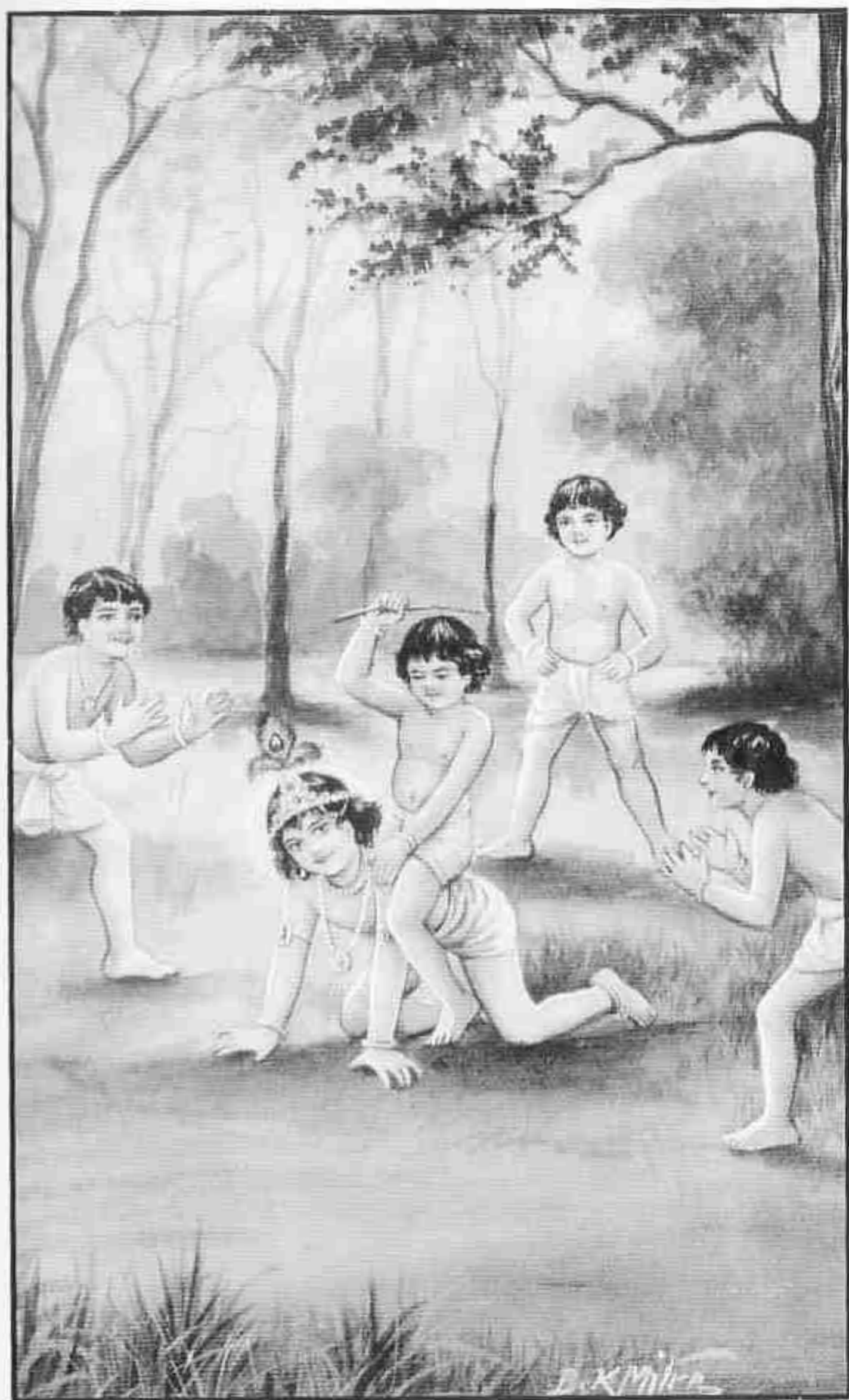
শ্রীকৃষ্ণের ক্রীড়া উপভোগ (ন্যায়প্রিয়তা)
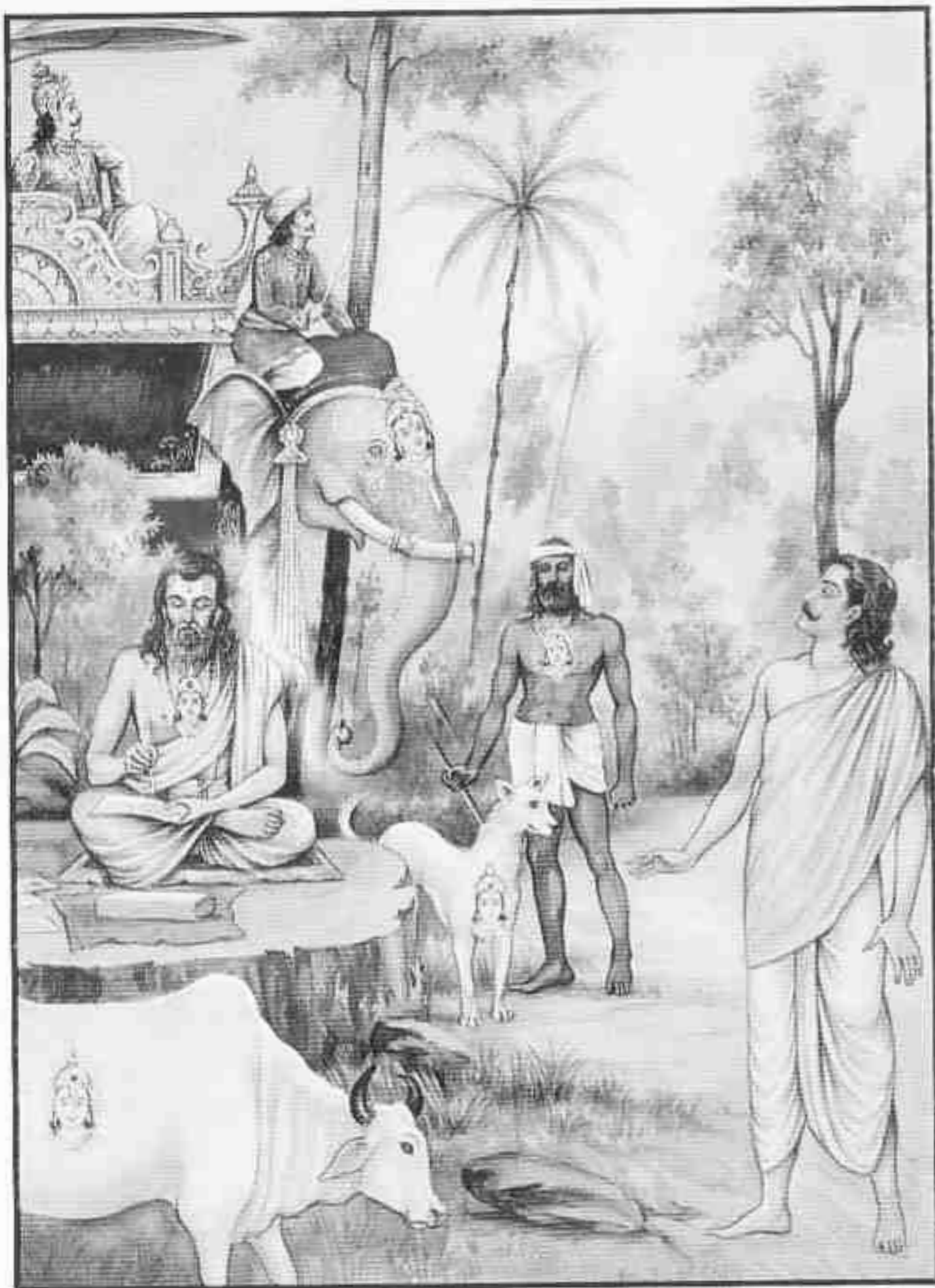
বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি .... পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ ।। (গীতা ৫।১৮)—সমদর্শিতা

মহারাস
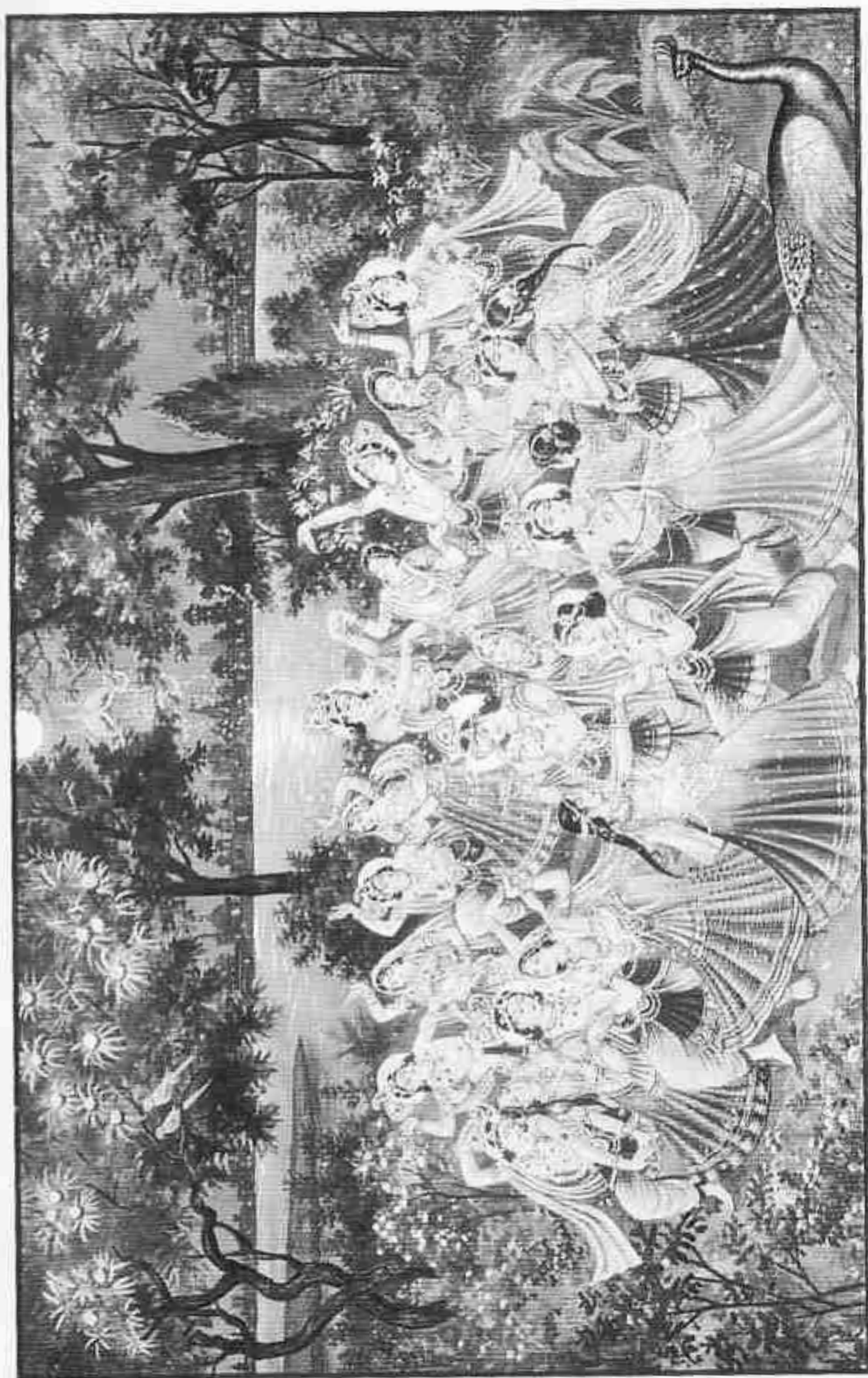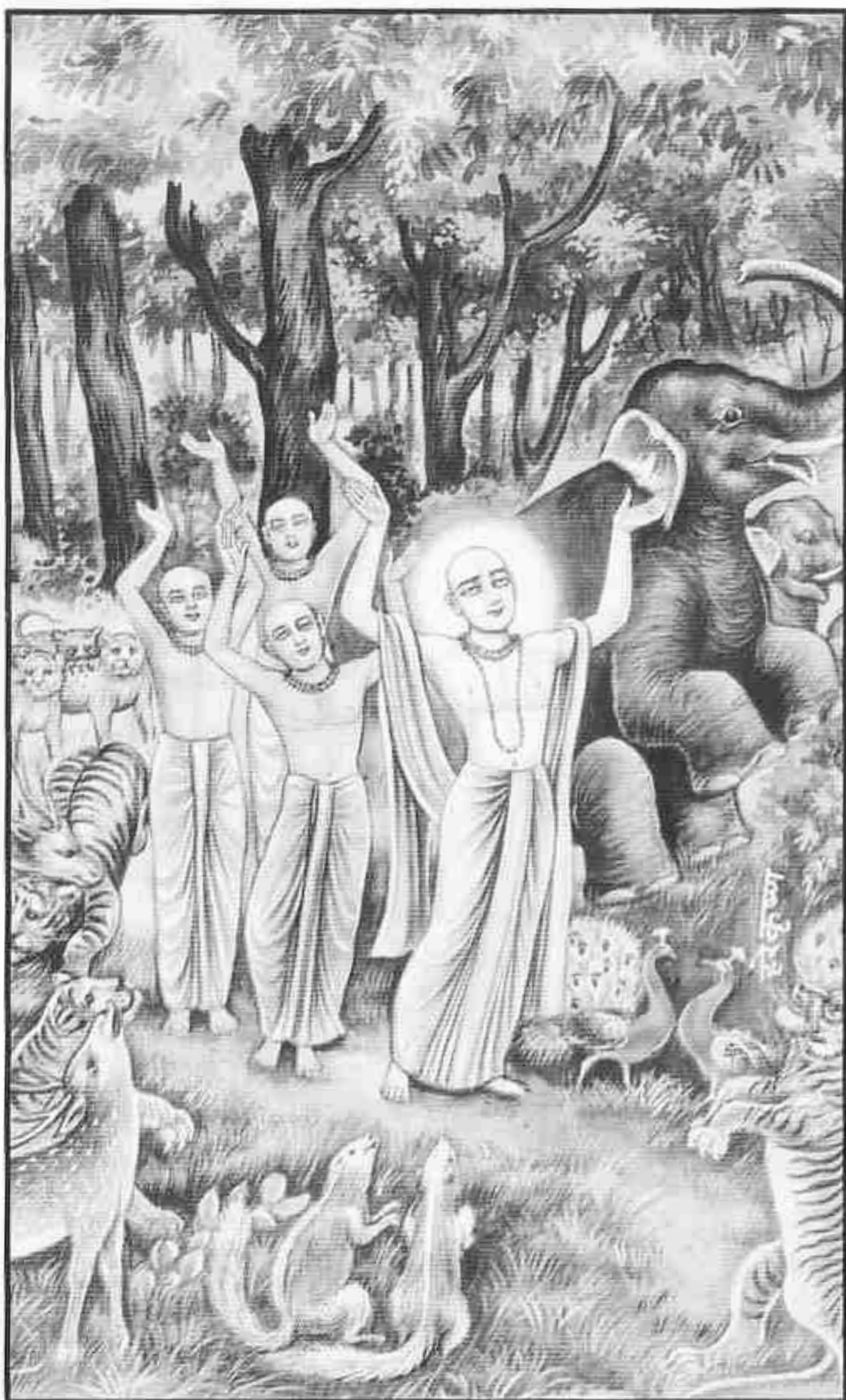
শ্রীশ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর কীর্তনের অলৌকিক প্রভাব

বস্তু প্রিয়-অপ্রিয় হয়ে ওঠে। রাগ এবং দ্বেষ প্রকৃতপক্ষে মেনে নেওয়া 'অহম্'-এ থাকে। আর নিজেকে শরীর বলে মেনে নেওয়া সম্পর্ককেই 'অহম্' বলা হয়।

কেউ কেউ মনে করেন যে রাগ-দ্বেষ অন্তঃকরণের ধর্ম এগুলি দূর করা যায় না। প্রকৃতপক্ষে এই রাগ-দ্বেষ কিন্তু অন্তঃকরণের ধর্ম নয় এগুলি আগন্তুক, বিকার—**'এতৎ ক্ষেত্রং সমাসেন সবিকারমুদাহৃতম্'** (গীতা ১৩।৬)। ভগবান একে মনোগত বলেছেন—**'কামান্ সর্বান্ পার্থ মনোগতান্'** (গীতা ২।৫৫)। অর্থাৎ কামনার মনে আগমন হয়, সর্বদা থাকে না। সাধক সাধন-ভজন করতে থাকলে অনুভব করেন যে রাগ-দ্বেষ উত্তরোত্তর স্তিমিত হচ্ছে আর সাধনে প্রেম জাগ্রত হলে সাধক রাগ-দ্বেষ হতে মুক্ত হয়। সৎসঙ্গ, ভজন, ধ্যান ইত্যাদিতে যদি রাগ বা অনুরাগ হয় তবে সংসারের প্রতি দ্বেষভাব আসে। আর যদি ভগবৎপ্রেম আসে তবে সংসারের প্রতি উপেক্ষা বা বৈরাগ্য আসে। সংসারের যে কোনো জিনিসের প্রতি আসক্তি হলে বিপরীত জিনিসের প্রতি দ্বেষ দেখা দেয়, কিন্তু ভগবৎ-প্রেম হলে সংসারের প্রতি দ্বেষ না হয়ে বৈরাগ্য ভাব আসে। আর বৈরাগ্য এলে সংসার থেকে সুখ পাওয়ার চিন্তা দূর হয়ে যায় এবং জগতের সেবা স্বাভাবিকভাবে হয়। রাগ-দ্বেষ দূর করার অব্যর্থ উপায় হল নিষ্কামভাবে জগৎ সংসারের সেবা করা। স্থূল-শরীর, সূক্ষ্ম-শরীর, কারণ-শরীর থেকে শুরু করে তথাকথিত অহং পর্যন্ত যা কিছু নিজের বলে মনে হয় সবই জগৎ সংসারের সেবায় লাগানো উচিত। যেন ভাব আসে **'ত্বদীয় বস্তু গোবিন্দ তুভ্যমেব সমর্পয়ে'**—প্রভু তোমার বস্তু তোমাকে নিবেদন করলাম।

অবশ্য সেবা প্রকৃতপক্ষে ভাব থেকে হয়, বস্তু থেকে নয়। বস্তুসামগ্রী প্রদান করলেই সেবা হয় না। দোকানদারও বস্তুসামগ্রী দিয়ে সেই সঙ্গে কিছু পাওয়ার আশা করে বলে তাতে পুণ্য হয় না। প্রজা রাজাকে কর দান করলেও সেবা হয় না, কাউকে দান করে পুণ্য হয়েছে বলে মনে করলে অথবা সে সুখী হয়েছে এই চিন্তা করলেও তা প্রকৃত সেবা নয়। বস্তুগুলোর প্রভাব সেবায় পড়লে সেবা হয় না। এর দ্বারা দান বা পুণ্যের কথা ভাবাও উচিত নয়,

বরং কিছু দিলে তা ভুলে যাওয়া উচিত। জগতে কিছু প্রাণী আছে দুঃখী, কিছু প্রাণী সুখী। দুঃখীদের দুঃখে দুঃখিত হওয়া ও সুখীদের সুখে সুখী হওয়াও সেবা। কারণ এতে দুঃখী ও সুখী—উভয় ব্যক্তিরই সুখ অনুভূত হয় এবং তারা ভরসা পায় যে তাদের কেউ সাথী আছে। সেবা করার অর্থ হল—সকলকে সুখী করা। **'মা কশ্চিদ্ দুঃখভাগ্ভবেৎ'** অর্থাৎ কারও যেন বিন্দুমাত্র দুঃখ না হয়—এই ভাব হলেই তিনি সকলকে সুখী করেন, সকলেরই প্রকৃত সেবা করেন।

অপরকে সুখ-দুঃখের কারণ মেনে নিলেই সুখ-দুঃখ হয়, রাগ-দ্বেষ জন্মায় অর্থাৎ যে সুখপ্রদান করে বলে মনে করা হয় তার প্রতি অনুরাগ এবং যে দুঃখ দেয় বলে মনে করা হয় তার প্রতি দ্বেষ জন্মায়। অন্তরে রাগ-দ্বেষ থাকার জন্যই জগৎ-সংসার ভগবৎস্বরূপ বলে প্রতীয়মান হয় না, জড় ও বিনাশশীল বলে প্রতীত হয়। রাগ-দ্বেষ না থাকলে সব কিছুই চিন্ময় পরমাত্মা **'বাসুদেবঃ সর্বম্'** (গীতা ৭।১৯)।

শাস্ত্রের সার কথা হল—

শ্রূয়তাং ধর্মসর্বস্বং শ্রুত্বা চৈবাবধার্যতাম্।
আত্মনঃ প্রতিকূলানি পরেষাং ন সমাচরেৎ॥

(পদ্মপুরাণ, সৃষ্টি. ১৯।৩৫৫-৫৬)

'হে মানব ! তোমরা ধর্মের সার শোনো এবং শুনে ধারণ করো যে, আমরা যা নিজের জন্য চাই না, তা অপরের প্রতি যেন না করি।'

স্বধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব—এই প্রকরণের শেষ শ্লোকে ভগবান বলেছেন **'শ্রেয়ান্ স্বধর্মো বিগুণঃ'** অর্থাৎ নিজ ধর্ম স্বল্পগুণ হলেও শ্রেষ্ঠ। বর্ণ, আশ্রম ইত্যাদি অনুযায়ী নিজ নিজ কর্তব্য নিঃস্বার্থভাবে পালন করাই হল স্বধর্ম। আস্তিক ব্যক্তি যাকে 'ধর্ম' বলে, সেটি প্রকৃতপক্ষে হল কর্তব্য। স্বধর্ম পালন ও নিজ কর্তব্য পালন একই ব্যাপার। মানুষের পক্ষে স্বধর্ম পালন করা সহজ ও স্বাভাবিক। মানুষের জন্ম হয় তার পূর্ব কর্ম অনুযায়ী এবং তার জন্ম ও স্বভাব অনুসারেই ভগবান তার কর্ম স্থির করেন—**'কর্মাণি প্রবিভক্তানি স্বভাব-প্রভবৈর্গুণৈঃ'** (গীতা ১৮।৪১)। নিজ নিজ কর্মপালন করলে মানুষ

কর্মবন্ধন থেকে মুক্তি লাভ করে অর্থাৎ তার কল্যাণ হয়।

এই শ্লোকে বলা হয়েছে **'পরধর্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ'** অর্থাৎ উত্তমরূপে অনুষ্ঠিত পরধর্মের থেকে স্বল্পগুণবিশিষ্ট নিজ ধর্ম শ্রেষ্ঠ। এখানে উল্লেখ্য যে বর্ণ, আশ্রম ইত্যাদি অনুযায়ী সকল মানুষেরই নিজ নিজ কর্তব্য (বা স্বধর্ম) কল্যাণপ্রদ হয়ে থাকে। নিজ কর্তব্যকর্ম অন্যদের কর্তব্যকর্ম থেকে কম গুণসম্পন্ন হলেও এই নিয়মের তারতম্য হয় না। যেমন ক্ষত্রিয়ের কর্তব্য (যুদ্ধাদি) ব্রাহ্মণের কর্তব্যের (শম, দম, তপ, ক্ষমা ইত্যাদি) থেকে অহিংসাদি গুণগুলি কম দেখায়। এখানে **'বিগুণঃ'** পদটির অর্থ এই যে অন্যের কর্তব্য থেকে নিজের কর্তব্যের গুণগুলি কম বলে মনে হলেও সেটি কল্যাণকারী হয়। সুতরাং কোনো অবস্থাতেই নিজ কর্তব্য পরিত্যাগ করা উচিত নয়। বাহ্যত কর্তব্যকর্মগুলি পৃথক অর্থাৎ কোনোটি ক্রূর বা কোনোটি সৌম্য বলে প্রতিভাত হলেও পরমাত্মাপ্রাপ্তির উদ্দেশ্যে তা একই ফল দিয়ে থাকে।

স্বধর্ম পালন সুখ-আরাম, ধন-সম্পত্তি, মান-যশ, সমাদর-সম্মান বা সুখ-দুঃখর দিকে দৃষ্টি রেখে করা যায় না, তা কেবল ভগবান বা শাস্ত্রের নির্দেশ মেনেই নিষ্কামভাবে পালন করতে হয়। তাই স্বধর্ম পালনকালে কেউ কোনো কষ্ট অনুভব করলেও তা উন্নতিকারক হয়ে ওঠে।

প্রকৃতপক্ষে একে কষ্ট না বলে তপস্যাই বলা যায় এবং স্বধর্ম পালনে তপস্যার চেয়েও শীঘ্র উন্নতি লাভ হয়। তপস্যা হয় নিজের জন্য ও কর্তব্য পালন হয় অন্যের জন্য। ভগবান আরও বলেছেন **'পরধর্মো ভয়াবহ'** অর্থাৎ পরধর্ম পালন আপাত সহজ বলে মনে হলেও এর পরিণাম ভয়াবহ হয়ে যায়। কিন্তু মানুষ যদি স্বার্থপরতা ত্যাগ করে পরহিতের জন্য স্বধর্মপালন করে তা সর্বদাই মঙ্গলকারক।

এখানে সাধারণ ধর্ম ও স্বাভাবিক ধর্ম বিচারসাপেক্ষ। মনের নিগ্রহ, ইন্দ্রিয়াদির দমন এগুলি সকলেরই স্বধর্ম এবং সকলেরই তা পালন করা উচিত। ব্রাহ্মণের পক্ষে ইহা 'স্বাভাবিক কর্মও' বটে কারণ এটি পালনে সাধারণত তার কোনো পরিশ্রম হয় না, কিন্তু অন্যাদের ইহা পালনে সামান্য হলেও পরিশ্রম হতে পারে। সকলের পক্ষে এই সব সাধারণ ধর্ম ভিন্ন, নিজ

নিজ সাধারণ ধর্ম (স্বধর্ম) পাপময় মনে হলেও তাতে প্রকৃতপক্ষে পাপ হয় না। শুধুমাত্র নিজের কর্তব্য মনে করে (স্বার্থ, দ্বেষ ইত্যাদি পরিত্যাগ-পূর্বক) শৌর্যবীর্য সহকারে যুদ্ধ করা ক্ষত্রিয়ের স্বাভাবিক ধর্ম হওয়ায় এটি পাপকার্য মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে এতে পাপ হয় না—**'স্বভাবনিয়তং কর্ম কুর্বন্নাপ্নোতি কিল্বিষম্'** (গীতা ১৮।৪৭)। স্বভাবজাত কর্তব্যকর্ম করলে কোনো পাপ হয় না। যে সাধকগণ পরমাত্মাকে লাভ করতে ইচ্ছুক তাদের কর্তব্যকর্ম করার সময় অর্থ-যশ-মান-মর্যাদা-শ্রদ্ধা-আরাম ইত্যাদি পাওয়ার ইচ্ছে জাগে না। এই সব না পেলেও তাঁরা চিন্তিত হন না আবার প্রারব্ধবশত এগুলি পেয়ে গেলেও তাতে তাঁরা আনন্দিত হন না। সংসারে পরাজয়, ক্ষতি, কষ্ট, অপমান ইত্যাদিতেও তাঁদের স্বাভাবিক প্রসন্নতা থাকে। অনুকূল-প্রতিকূল পরিস্থিতি তাঁদের কাছে সাধনসামগ্রী হয়ে ওঠে।

সাধন অবস্থা থেকেই কর্মযোগীদের প্রাণীদের হিত করার স্বভাব থাকায় তাঁরা **'সর্বভূতহিতে রতাঃ'** (গীতা ৫।২৫, ১২।৪) হয়ে ওঠেন। জ্ঞানী অবস্থাতেও তাঁদের কিছু করা, জানা বা পাওয়া বাকি না থাকলেও তাঁদের মধ্যে অন্যদের মঙ্গল করার স্বভাব থেকে যায়। অন্যের হিতের জন্য কাজ করতে করতে জগৎসংসারের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গেলেও তাঁরা স্বভাববশেই স্বতঃই অন্যের হিতসাধনা করে যান, তখন আর তাদের চেষ্টা করতে হয় না।

নিষ্কামভাবে অপরের হিতার্থে কর্ম করাকে (কর্মযোগ) স্বধর্ম বলে। স্বধর্মকেই গীতায় 'সহজ কর্ম', 'স্বকর্ম' এবং 'স্বভাবজ কর্ম' বলা হয়েছে।

ত্যাগ (কর্মযোগ), বোধ (জ্ঞানযোগ) এবং প্রেম (ভক্তিযোগ)—এই তিনটি স্বতঃসিদ্ধ হওয়ায় এগুলি সকলের স্বধর্ম। স্বধর্মে অভ্যাসের প্রয়োজনীয়তা নেই, কারণ অভ্যাস শরীরের সঙ্গে যুক্ত এবং শরীরের সঙ্গে সম্পর্কিত সব কিছুই পরধর্ম।

———o———

তৃতীয় প্রশ্ন

অর্জুনের দ্বিতীয় প্রশ্ন ছিল সংশয়মিশ্রিত। ভগবানের কথা অনুযায়ী কর্মে প্রবৃত্ত হবেন, না বুদ্ধিকে (জ্ঞানযোগকে) আশ্রয় করবেন। ভগবান তখন অর্জুনকে বুঝালেন বুদ্ধিকে আশ্রয় করা মানে জ্ঞানমার্গ অবলম্বন করে কর্মত্যাগ নয়। বুদ্ধিকে আশ্রয় করা হল বুদ্ধিকে সমত্ব ভাবে রেখে কর্ম করা। আর কর্মবিধি সম্বন্ধে কৃষ্ণ বলছেন যে, কর্ম করবে 'যজ্ঞার্থ' অর্থাৎ ত্যাগভাব সামনে রেখে। ভগবান এই প্রশ্নের উত্তর শেষ করেছিলেন এই বলে যে স্বধর্মই কল্যাণকারক এবং পরধর্ম ভয়াবহ।

অর্জুনের মনে তখন প্রশ্ন জাগলো যে—এই সব কথা জেনেও মানুষ কেন স্বধর্মে প্রবৃত্ত না হয়ে পরধর্মে প্রবৃত্ত হয়।

অর্জুনের তৃতীয় প্রশ্ন— (শ্লোক ৩৬)

অথ কেন প্রযুক্তোঽয়ং পাপং চরতি পূরুষঃ।
অনিচ্ছন্নপি বার্ষ্ণেয় বলাদিব নিয়োজিতঃ॥

(গীতা ৩।৩৬)

'হে বার্ষ্ণেয় ! মানুষ এসব জেনেও এবং অনিচ্ছা সত্ত্বেও কার দ্বারা বলপূর্বক আকর্ষিত হয়ে পাপাচরণ করে।'

ভগবান পরবর্তী ৭টি শ্লোকে এই প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন।

পাপের প্রবৃত্তির কারণ ৩৭-৪০
পাপ হতে নিবৃত্তির উপায় ৪১-৪৩

পাপে প্রবৃত্তির কারণ—(শ্লোক ৩৭-৪০)

কাম এষ ক্রোধ এষ রজোগুণসমুদ্ভবঃ।
মহাশনো মহাপাপ্মা বিদ্ধ্যেনমিহ বৈরিণম্॥
ধূমেনাব্রিয়তে বহ্নির্যথাদর্শো মলেন চ।
যথোল্বেনাবৃতো গর্ভস্তথা তেনেদমাবৃতম্॥

আবৃতং জ্ঞানমেতেন জ্ঞানিনো নিত্যবৈরিণা।
কামরূপেণ কৌন্তেয় দুষ্পূরেণানলেন চ॥
ইন্দ্রিয়াণি মনো বুদ্ধিরস্যাধিষ্ঠানমুচ্যতে।
এতৈর্বিমোহয়ত্যেষ জ্ঞানমাবৃত্য দেহিনম্॥

(গীতা ৩।৩৭-৪০)

'ভগবান বললেন—রজোগুণ হতে উৎপন্ন কামনা ও তার থেকে উদ্ভূত ক্রোধই হল পাপের কারণ। ইহা কিছুতেই তৃপ্ত হয় না এবং মহাপাপী। ইহাকেই তুমি নিত্য শত্রু বলে জানবে।

যেমন ধূম্র দ্বারা বহ্নি, ময়লা দ্বারা দর্পণ, জরায়ু দ্বারা গর্ভ আবৃত থাকে, সেইরূপ কামনার দ্বারাই জ্ঞান বা বিবেক আবৃত থাকে।

এই কামনা, বিবেকবান পুরুষের চিরশত্রু। অগ্নির ন্যায় দুষ্পূরণীয় এই কামনা মানুষের বিবেক-বুদ্ধি (জ্ঞান) আচ্ছন্ন করে রাখে।

ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি এই কামনার আশ্রয়স্থল। এইগুলিকে আশ্রয় করে কামনা দেহাভিমানী মানুষের জ্ঞানকে আবৃত করে মোহগ্রস্ত করে।' (গীতা ৩।৩৭-৪০)

ভগবান সাঁইত্রিশতম শ্লোকে বলেছেন রজোগুণ থেকে কাম উৎপন্ন হয় আর চতুর্দশ অধ্যায়ে বলেছেন **'রজো রাগাত্মকং বিদ্ধি তৃষ্ণাসঙ্গসমুদ্ভবম্'** (গীতা ১৪।৭)—তৃষ্ণা (কামনা) এবং আসক্তি থেকেই রজোগুণ উৎপন্ন হয়। এর তাৎপর্য হল জাগতিক বিষয়গুলিকে সুখদায়ক মনে করলে (যা রজোগুণ) কামনা উৎপন্ন হয় এবং পুনরায় এই কামনার প্রভাবে আসক্তি বৃদ্ধি পায়। এই রজোগুণ ও কামনা পরস্পরের বৃদ্ধি ততক্ষণ চলতেই থাকে যতক্ষণ পাপকর্ম হতে সর্বতোভাবে নিবৃত্তি না হয়। কামনা বাধাপ্রাপ্ত হলে কাম ক্রোধে পরিণত হয়। আবার বাধাপ্রদানকারী যদি শক্তিশালী হয় তবে তা ভয়ে পরিণত হয় এবং কামনার পূরণ হলে তার থেকে ভবিষ্যতের ভোগেচ্ছারূপী 'লোভ' উৎপন্ন হয়। সেইজন্য ভগবান বলেছেন **'বীতরাগভয়ক্রোধাঃ'** (গীতা ৪।১০) বা **'বিগতেচ্ছাভয়ক্রোধঃ'** (গীতা ৫।২৮)—কামনা ও তার থেকে উদ্ভূত ভয় এবং ক্রোধ ত্যাগ করবে। কামনা

বাস্তবে স্থায়ী হয় না। সেটি নিরন্তর মিটে যেতে থাকলেও মানুষ নতুন নতুন কামনার বশীভূত হয়। মানুষ যদি নতুন নতুন কামনার বশীভূত না হয় তাহলে পুরাতন কামনাগুলি হয় পূরণ হয়ে যাবে নয়তো পূরণ না হওয়ায় তা স্বাভাবিকভাবেই দূর হয়ে যাবে। কামনাকেই চার ভাগে ভাগ করে তা নির্বাপিত করতে হয়—

১) শরীর নির্বাহের জন্য আবশ্যক প্রত্যেকটি কামনা পূরণ করা উচিত কিন্তু কখনোই পূরণের সুখভোগ থাকা উচিত নয়। এই কামনার চারটি প্রকার থাকে—

ক) যে কামনার বর্তমানে উৎপত্তি হয়েছে।

খ) যেটি পূর্ণ করার প্রয়োজনীয় সামগ্রী এখনই পাওয়া সম্ভব।

গ) যেটি পূরণ না হলে বেঁচে থাকা অসম্ভব হয়ে ওঠে।

ঘ) যার পূর্তির দ্বারা নিজের বা অন্যের কারো ক্ষতি না হয়—যেমন ক্ষুধার সময় খাদ্য গ্রহণ করা।

২) যে কামনা ব্যক্তিগত ও ন্যায়সঙ্গত কিন্তু সামর্থ্যের বাইরে, সেগুলি ভগবানে সমর্পণ করে মিটিয়ে ফেলতে হয়।

—যেমন জগতে যাতে অন্যায় অত্যাচার না হয়, মনে এই কামনা হলে তা ভগবানকে সমর্পণ করতে হয় যাতে তা ভবিষ্যতে পূর্ণ হয় (ভগবান ইচ্ছা করলে)।

৩) যে কামনা ন্যায়সঙ্গত ও অপরের পক্ষে হিতকারী এবং যেটি পূর্ণ করা সম্ভব, সেটি পূর্ণ করা উচিত।—এতে অর্থাৎ অন্যের আকাঙ্ক্ষা পূরণ করলে নিজের কামনা ত্যাগের ক্ষমতা এসে যায়।

৪) উপরোক্ত তিন কামনা বাদে অন্যসব কামনা বিবেচনা দ্বারা মিটিয়ে ফেলতে হয়।

কিন্তু যদি সুখ পূরণের জন্য কোনো কামনা থাকে তবে তা জীবকে নিশ্চিতরূপে নিজ কর্তব্য থেকে এবং অবশ্যই নিজ স্বরূপ থেকে বিচ্যুত করে বিনাশশীল জগতের আবর্তে এনে ফেলে।

দুর্যোধন বলছেন—

জানামি ধর্মং ন চ মে প্রবৃত্তির্জানাম্যধর্মং ন চ মে নিবৃত্তিঃ॥
কেনাপি দেবেন হৃদি স্থিতেন যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি॥

(গর্গসংহিতা, মহাভারত, অশ্বমেধপর্ব ৫০।৩৬)

'আমি ধর্মকে জানি, তাতে আমার প্রবৃত্তি নেই, আমি অধর্মকেও জানি, কিন্তু তা থেকে আমি নিবৃত্ত হতে পারি না। আমার হৃদয়ে অবস্থিত কোনো এক দেবতা, আমাকে দিয়ে যা করান আমি সেইরূপই করে থাকি।'

দুর্যোধন কথিত এই 'দেব' প্রকৃতপক্ষে 'কাম' (ভোগ ও সম্পদ সংগ্রহের ইচ্ছা), যার ফলে মানুষ বিচারবিবেচনা প্রয়োগ করে ধর্মকে পালন বা অধর্মকে পরিত্যাগ করতে সক্ষম হয় না।[১]

কামনা ত্যাগের প্রধান উপায় হল 'কর্মযোগ' অর্থাৎ স্থূলশরীর ও পদার্থাদি দ্বারা অপরের সেবা করা, সূক্ষ্মশরীর দ্বারা পরহিত চিন্তা করা এবং কারণশরীর দ্বারা সুসংস্কার বা স্থৈর্য (স্থিরতা) করা, কিন্তু এদের থেকে যেন কোনোভাবেই সুখগ্রহণ না করা হয়। **কামনাময় চিত্তে কর্মযোগ সম্ভব নয়।**

পাতঞ্জল যোগদর্শনের ব্যাসভাষ্যে, চিত্তের বর্ণনা এইভাবে দিয়েছে—

'চিত্তনদী নাম, উভয়তো বাহিনী।
বহতি কল্যাণায়, বহতি পাপায় চ॥'

অর্থাৎ চিত্তরূপ নদী উভয়দিকে প্রবাহিত হয়—কখনো কল্যাণের পথে কখনো পাপের পথেও। পাতঞ্জল যোগদর্শনে আরও বলেছেন—**'যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ'** (১।২) অর্থাৎ চিত্তবৃত্তি নিরোধ করতে পারলে তবেই যোগস্থ হওয়া যায়। কিন্তু কামনাময় চিত্তকে নিরোধই বা করা যাবে কীভাবে ? তাই গীতা বলছে নিরোধের আগে কামনায় আবৃত চিত্তকে সাধনা দ্বারা শোধন করতে হবে।

পরবর্তী আটত্রিশতম শ্লোকে ভগবান সত্ত্ব-রজ-তমগুণ ভেদে কামনা কীরূপে বিবেককে আবৃত রাখে তা বলেছেন।

---

[১]যে কোনো শাস্ত্রনিষিদ্ধ কর্ম প্রারব্ধ (ভাগ্য) থেকে হয় না, হয় 'কামনা' থেকে। প্রারব্ধের থেকে ফল ভোগ করার জন্য কর্ম করার প্রবৃত্তি হলেও তাতে নিষিদ্ধ কর্ম করতে হয় না।

সত্ত্ব—যেমন অগ্নি ধূম্র দ্বারা আবৃত থাকে কিন্তু ফুঁ দিলে ধোঁয়া সরে যায় আর অগ্নি প্রকাশ পায়, সেইরকম সাত্ত্বিক ব্যক্তির কামনাবাসনা স্বল্প-আয়াসেই দূরীভূত হয়ে তার বিবেক জাগ্রত হয় এবং প্রবৃত্তি ভগবদ্মুখী অর্থাৎ স্বধর্মাভিমুখী হয়।

লালাবাবু ও অন্য মহাপুরুষদের আখ্যান—রাজা গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ বিশাল রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি মুর্শিদাবাদে কান্দির রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করা ছাড়াও পাইকপাড়া রাজবাটি ও তৎকালীন বঙ্গদেশের (ওয়ারেন হেস্টিংসের সমসাময়িক) বহু ভূখণ্ডের অধিকারী ছিলেন। তাঁর সম্পত্তির কোনো হিসাব ছিল না। শোনা যায় তার মাতৃশ্রাদ্ধে তিনি তৎকালীন অঙ্কের ২০ লক্ষাধিক টাকা ব্যয় করেন। তাঁর একমাত্র পৌত্র লালাবাবুর অন্নপ্রাশনের সময়ও তিনি সহস্র সহস্র নিমন্ত্রণপত্র সোনার পাতের উপর খোদাই করে বিলি করেন। লালাবাবুর প্রকৃত নাম শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র সিংহ। নানাভাষায় পণ্ডিত লালাবাবু ছোটবেলা থেকেই কোমল ও ধর্মপ্রাণ ছিলেন। এক কন্যাদায়গ্রস্ত দরিদ্র ব্রাহ্মণকে সহস্র মুদ্রা দান করে তিনি পিতার বিরাগভাজন হন এবং বর্ধমানে এসে কালেকটারে দেওয়ান পদে অধিষ্ঠিত হন। এক সময় পুরীর রাজা জগন্নাথ মন্দিরের কর ঠিক সময় না পাঠানোতে ব্রিটিশ সরকার মন্দিরটি নিলামের আদেশ জারি করেন। কিন্তু ধর্মপ্রাণ লালাবাবু জগন্নাথদেবের এই পবিত্র পীঠস্থানের অবমাননা বোধে তাঁর নিজ ক্ষমতা বলে এই নিলাম রোধ করে দেন। কৃতজ্ঞতা বোধে পুরীর রাজা এক বিস্তৃত অঞ্চল তাঁকে উপহার দেন। অদ্যাপি নবকলেবরের নিম্ববৃক্ষটি লালাবাবুর জমি হতেই গৃহীত হয়। জগন্নাথদেবের কৃপা লালাবাবুর অন্তরে ভক্তিবীজরূপে ধীরে ধীরে অঙ্কুরিত হয়।

পিতার দেহত্যাগের পর লালাবাবু রাজ্যভার গ্রহণ করেন। একদিন শিবিকা (ঘোড়াগাড়ি) করে জমিদারি মহল দর্শন করে ফেরার সময় তিনি এক বালিকার গলা শুনতে পেলেন। মেয়েটি কাছের পুকুরে কর্মরত একটি ধোপার মেয়ে। সন্ধেবেলায় শুকনো কলাপাতায় আগুন দিয়ে ময়লা কাপড় সিদ্ধ করার জন্য ভাটি চড়ানো হয়। মেয়েটি মাকে বলছে—

'মা সাঁঝ গেলো বাসনায় আগুন দিবিনি।'

কথাটি লালাবাবুর মনে ধক করে প্রবেশ করল। তাঁর মনের আবরণ সরে গেল। মনে হল সত্যিইতো, আমার জীবনসায়াহ্ন উপস্থিত অথচ আমি কামনা-বাসনার এই চাহিদাতে তো এখনও আগুন লাগিয়ে ভগবৎমুখী হতে পারিনি। ক্ষেত্র প্রস্তুতই ছিল, একটি বাক্যই স্ফুলিঙ্গরূপে কাজ করল।

'হরি ভজনের লাগি ধাম বৃন্দাবনে
চলিলেন মহারাজ আনন্দিত মনে॥'

রাজা লালাবাবু শিবিকা থেকে নেমে একবস্ত্রে বৃন্দাবন যাত্রা করলেন।

'পথে পথে ব্রজধামে
জয় শ্যাম রাধা নামে
মাধুকরী করি সদা আনন্দে।'

বৃন্দাবনে এক ভক্ত শেঠজি ছিলেন, বৃন্দাবনে তিনি একটি বিখ্যাত মন্দির নির্মাণ করেন। মন্দির নির্মাণের প্রাক্কালে কিছু জমির অধিগ্রহণ নিয়ে লালাবাবুর সঙ্গে শেঠজীর বিরোধ বাঁধে। বিষয়টি আদালত পর্যন্ত গড়ায়। পরিশেষে লালাবাবুর জয় হয়। শেঠজীর যথেষ্ট মনোকষ্ট হলেও তাঁর কিছু করার ছিল না। প্রভুর বিচিত্র লীলা ! এরপর থেকে লালাবাবু অনুভব করতে লাগলেন যে সাধন-ভজনে তিনি আগের মতন মনোনিবেশ করতে পারছেন না। কথাপ্রসঙ্গে বিষয়টি তিনি তাঁর গুরু মহারাজকে জানালেন। গুরু মহারাজ অনুভব করলেন যে শিষ্যটির দ্বারা কোনও ভক্তের প্রতি অপরাধ হয়েছে। তিনি লালাবাবুকে সেই ভক্তের গৃহে গিয়ে ভিক্ষা (মাধুকরী) করতে বললেন। লালাবাবু তাঁর গৃহে ভিক্ষা করতে গেলেন। তখন সে এক অপূর্ব দৃশ্য—

'কাঁদিল প্রহরী দ্বারী কেঁদে ওঠে ভাণ্ডারী
দেওয়ান কাঁদিয়া চুমে, পদধুলি পঙ্কে।
শেঠজি ছুটিয়া আসে বাঁধে তারে বাহুপাশে
নারীরা ফুঁপিয়া কাদে, ফুকারিয়া শঙ্কে॥'

লালাবাবুর মনে যৎকিঞ্চিত যে অভিমান ছিল তা ততক্ষণ দূর হয়ে গেছে, তিনি তখন অন্তর্সমাহিত, বাহ্যজগতে তাঁর দৃষ্টি নেই—

'লালাবাবু কন ভাই এ জঠরে ঠাই নাই
এক কটোরাতে চাই, শুধু এক মুষ্টি।
শেঠ কহে জুড়ি পানি আজ পরাজয় মানি
ইহলোকে পরলোকে, জিতে গেলে বৈরী।'

লালাবাবু মথুরার কৃষ্ণদাস বাবাজীর কাছে দীক্ষা গ্রহণ করেন। তিনি ৩০ বৎসর বয়সে সংসার ছেড়ে মাত্র ৪২ বৎসর বয়সে রাধারানীর পদকমলে শ্রীবৃন্দাবনধামে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

রূপ ও সনাতন গোস্বামী—সনাতন ও রূপ গোস্বামী তখন সুবে বাংলার নবাব, হুসেন শাহর প্রধানমন্ত্রী ও অর্থমন্ত্রী (দবীর খাস ও সাকর মল্লিক)। এক দুর্যোগপূর্ণ রাত্রে নবাব কোনো এক বিশেষ কারণে দুই ভাইকে তলব করেন। পালকি বেহারারা বরকন্দাজ সহ সন্তর্পণে তাঁদের রাজপ্রাসাদে নিয়ে যাচ্ছিলেন। পথে এক নগরবাসীর গৃহের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় জলের ছলাৎ ছলাৎ শব্দ শুনে বাড়ির শিশুপুত্রটি মাকে জিজ্ঞাসা করছে, মা রাস্তায় এ কীসের শব্দ। তখন মা বলছে বাবা এত রাত্রে, এই দুর্যোগে রাস্তার এই শব্দের কারণ হয় চোর, না হয় কুকুর, নয়তো রাজার গোলাম যাচ্ছে। এই কথাকটি রূপ-সনাতনের বুকে শেলের মতো বিদ্ধ হল, মন বৈরাগ্যে ভরে গেল। তারপরে চৈতন্য মহাপ্রভুর বৃন্দাবনের পথে গৌড়ের রামকেলি গ্রামে আগমন উপলক্ষে দুই ভাই তাঁর দর্শনে যান ও আত্মনিবেদন করে ধন্য হন।

গোস্বামী তুলসীদাসের জীবনে স্ত্রীর শ্লেষাত্মক বাক্য ও বিল্বমঙ্গলেরও বেশ্যার মুখে বিদ্রূপ বাক্য শুনে তাঁদের সংসার-বৈমুখ্য জাগে আর তাঁরা সংসার ত্যাগ করে ভক্তিরাজ্যের অতি উচ্চ শিখরে আরোহণ করেন।

রজ—যখন আয়না (আদর্শ) ধূলিদ্বারা আবৃত থাকে তা খুব সহজে অর্থাৎ ফুঁ দিয়ে পরিষ্কার করা যায় না। পরিষ্কার করতে হলে কাপড় দিয়ে ঘসে ঘসে পরিষ্কার করতে হয়। সেইরকম রজোগুণীর চিত্তের মল অর্থাৎ কামনা-বাসনা দূর করতে গেলে পরিশ্রম লাগে অর্থাৎ নিরন্তর সাধনা করে, জীবাত্মা শরীরের প্রতি একাত্ম হওয়ায় যে কামনার আবরণে আবৃত হয়, তা দূর করতে হয়।

ধ্রুব মহারাজ—ভাগবতের চতুর্থ স্কন্ধের অষ্টম অধ্যায়ে মৈত্রেয়-বিদুর সংবাদে ধ্রুব মহারাজের জন্মবৃত্তান্ত উল্লেখিত আছে। স্বায়ম্ভুব মনু ও শতরূপার দুইটি পুত্র প্রিয়ব্রত ও উত্তানপাদ। উত্তানপাদের দুই স্ত্রী সুনীতি ও সুরুচি এবং তাদের মধ্যে সুরুচিই তাঁর অধিক প্রিয়। সুনীতির ছেলের নামই ধ্রুব। পঞ্চবর্ষীয় ধ্রুব একবার পিতার কোলে উঠতে গিয়ে বিমাতার কাছে তীব্র ভর্ৎসনা খেয়ে মাকে এর কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। মা বললেন—বাছা ! আমি তোমার পিতার অপ্রিয় তাই উনি তোমার সঙ্গে এইরূপ ব্যবহার করলেন। যাইহোক তুমি যদি পরমপুরুষ হরিকে আরাধনা কর তবে তিনি এর প্রতিকার করবেন। ধ্রুব রজগুণসম্পন্ন ক্ষত্রিয়, তার মনে এর তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দিল। ধ্রুব তখন তপস্যা করতে যাত্রা করলেন। মহর্ষি নারদ ভাবলেন **'অহো তেজঃ ক্ষত্রিয়াণাং মানভঙ্গমমৃষ্যতাম্'** (ভাগবত ৪।৮।২৬)। অর্থাৎ অহো ! ক্ষত্রিয়ের কী প্রভাব। তারা কিছুতেই অপমান সহ্য করতে পারে না। তিনি তখন তাকে নিবৃত্ত করার চেষ্টা করলেন। কিন্তু ধ্রুব বললেন—**'তথাপি মেঽবিনীতস্য ক্ষাত্রং ঘোরমুপেয়ুষঃ'** (ভাগবত ৪।৮।৩৬) অর্থাৎ আপনার উপদেশ অতি উপাদেয় কিন্তু রজ আধিক্য এবং অদম্য ক্ষত্রিয় স্বভাববশত আমি অতি উদ্ধত এবং বিমাতার বাক্যে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হয়ে যাচ্ছে তাই আমি প্রতিকারের জন্য উদ্গ্রীব। আমার পূর্বপুরুষগণের বা অন্য কোনো ব্যক্তির পক্ষে যা পাওয়া কখনো সম্ভব হয়নি এইরূপ কিছু আমাকে পেতেই হবে। আপনি তদুপযোগী উত্তম পথ প্রাপ্তির উপদেশ প্রদান করুন।

তখন নারদ দ্বাদশ অক্ষরবিশিষ্ট **'ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়'**—এই মন্ত্রে দীক্ষিত করে তাকে হরি পূজার পদ্ধতি উপদেশ দান করেন। তখন ভক্ত ধ্রুবও **'সমাহিতঃ পর্যচরদৃষ্যাদেশেন পূরুষম্'** (ভাগবত ৪।৮।৭১) একাগ্র মনে ভগবান পুরুষোত্তমের আরাধনা করতে আরম্ভ করলেন। ছয় মাস ব্যাপী তীব্র আরাধনার পর ভগবান শ্রীহরি গরুড়ের পৃষ্ঠে আরোহণ করে ধ্রুবকে দর্শন দান করতে আগমন করলেন। ভগবানকে দর্শন করে ধ্রুব **'দৃগ্‌ভ্যাং প্রপশ্যন্ প্রপিবন্নিবার্ভকশ্চুম্বন্নিবাস্যেন ভুজৈরিবাশ্লিষন্'** (ভাগবত ৪।৯।৩)। অর্থাৎ ধ্রুব অধীর হয়ে উঠলেন, ভূতলে দণ্ডবৎ প্রণাম করলেন, নয়ন যুগল

দ্বারা তাঁর রূপ পান করতে লাগলেন, প্রণামকালে যেন মুখ দ্বারা চরণ চুম্বন করতে লাগলেন এবং বাহুদ্বারা পুনঃ পুনঃ বেষ্টনে তাঁর পাদপদ্ম আলিঙ্গন করতে লাগলেন।

ধ্রুবর প্রবল ইচ্ছা হল ভগবানকে স্তুতি করার কিন্তু পঞ্চম বর্ষীয় বালকের কীভাবে স্তুতি করতে হয় তা অজ্ঞাত। ভগবান তখন তাঁর সর্ববেদময় শঙ্খ দ্বারা তার কপোল স্পর্শ করাতেই ধ্রুবর মনে ভগবৎস্তুতি স্ফুরিত হল। ভাগবতের চতুর্থ অধ্যায়ের নবম স্কন্ধের ৬-১৭ শ্লোকে ধ্রুবর স্তুতি বর্ণিত আছে।

ভগবান ধ্রুবর স্তুতিতে সন্তুষ্ট হয়ে বরপ্রদান করে বললেন তুমি যে সঙ্কল্প অনুসারে তপস্যা করছ তা দ্বারা যদিও পরমপুরুষার্থ মঙ্গলময় ফলপ্রাপ্তি দুরূহ, তবুও আমি তা তোমার জন্য বিধান করছি। পিতার পরে তুমি ৩৬০০০ বৎসর ধর্মপথে রাজ্যপালন করে অন্তিমে আমার কথা চিন্তা করতে করতে আমারই লোক (ধ্রুবলোক) প্রাপ্ত হবে। ভগবান অন্তর্হিত হলেন। ধ্রুব কিন্তু **'প্রাপ্য সঙ্কল্পনির্বাণং নাতিপ্রীতোঽভ্যগাৎ পুরম্'** (ভাগবত ৪।৯।২৭) অর্থাৎ খুবই ক্ষুণ্ণ মনে পিতৃগৃহে গমন করলেন।

ঋষি মৈত্রেয় ধ্রুবর মনঃক্ষুণ্ণ হওয়ার কারণ বলছেন—

'নৈচ্ছন্মুক্তিপতের্মুক্তিং তস্মাত্তাপমুপেয়িবান্' (ভাগবত ৪।৯।২৯) অর্থাৎ তিনি মুক্তিপতি ভগবানের নিকট মুক্তি বা তদীয় অনুচরস্বরূপ পরমার্থ কামনা না করে রজগুণ আধিক্যবশত রাজসুখ প্রার্থনা করেছিলেন।

ধ্রুব মহারাজ ভাবছেন, দেখ আমার কী মন্দভাগ্য **'মন্দভাগ্যস্য পশ্যত'**, আমার প্রার্থনা যেন **'ব্যর্থং চিকিৎসেব গতায়ুষি'** অর্থাৎ মৃত ব্যক্তির চিকিৎসার ন্যায় ব্যর্থ। আমি পার্থিব জিনিস কামনা করে ভগবৎ সাধনায় রত হয়েছিলাম। যাই হোক, ধ্রুব পিতার রাজ্যে ফিরে গেলে মহারাজ তাকে দুহাত বাড়িয়ে গ্রহণ করলেন এবং রাজ্য প্রদান করে বাণপ্রস্থে প্রস্থান করলেন। ভাগবত ধ্রুবর প্রতি এই প্রীতির কারণ বলেছেন—

যস্য প্রসন্নো ভগবান্ গুণৈর্মৈত্র্যাদিভির্হরিঃ।
তস্মৈ নমন্তি ভূতানি নিম্নমাপ ইব স্বয়ম্॥ (ভাগবত ৪।৯।৪৭)

'জল যেমন সর্বদাই নিম্নাভিমুখী, সেইরকম ভগবান শ্রীহরি যাঁর সমত্ব, মৈত্রী গুণে প্রসন্ন হন, সকল প্রাণীবর্গ তাঁর নিকট আপনি নত হয়ে থাকে।'

এইভাবে বহুদিন সুশাসনে রাজত্ব করে অন্তিমকালে তাঁর ভগবৎকথাই স্মরণে এল এবং দেখলেন নন্দ ও সুনন্দ নামে ভগবানের অনুচর তাঁকে ধ্রুবলোকে নিয়ে যাওয়ার জন্য উপস্থিত। তখন ধ্রুব মহারাজ ভগবৎ কৃপায়–

তদোত্তানপদঃ পুত্রো দদর্শান্তকমাগতম্।
মৃত্যোর্মূর্দ্ধ্নি পদং দত্ত্বা আরুরোহাদ্ভুতং গৃহম্।। (ভাগবত ৪।১২।৩০)

'মৃত্যুর মস্তকে নিজ পাদদ্বয় স্থাপনপূর্বক সেই উত্তম বিমানে তিনি ধ্রুবলোক যাত্রা করলেন।'

তম—তমগুণসম্পন্ন লোকেদের আবার কামনাবাসনা দূর করতে গেলে উপযুক্ত কালের প্রতীক্ষা করতে হয়, সময় লাগে। আশু সাধনার দ্বারা তমগুণ অপসারণ সম্ভব নয়। যেমন গর্ভস্থ সন্তানের জন্ম কেবল নির্দিষ্ট সময়েই হয়, অন্য কোনো উপায়ে নয়, সেইরূপ তমগুণীরও বাসনা নিবৃত্তির জন্য অপেক্ষা করতে হয়। এই তিনটি গুণ ক্রম অনুযায়ী ১, ১০ ও ১০০-র মতো। এদের গুণগত অবস্থান ১০ গুণ করে হলেও, আসলে তমোগুণ (১) ও রজগুণ (১০) কাছাকাছি আর সত্ত্বগুণ (১০০) এদের থেকে অনেক দূরে।

অনধিকারী শিষ্য—একবার এক তত্ত্বজ্ঞ সাধুর কাছে এক অনধিকারী ব্যক্তি দীক্ষা নিতে এসেছে। গুরু তার সংস্কারে তমগুণের প্রাধান্য দেখে বললেন এখন নয় তোমার দীক্ষা পরে হবে। ব্যক্তিটি বারে বারে সাধুর কাছে আসে আর সাধু মহারাজও ফিরিয়ে দেন। অবশেষে একদিন ব্যক্তিটি সাধুকে বলল আজকে তবে আমার গৃহে ভিক্ষা নিন। সাধু মহারাজ রাজি হলেন। ব্যক্তিটির বাড়ি গিয়ে সাধুমহারাজ ভিক্ষার পাত্রটি বাড়িয়ে ভিক্ষা চাইলেন। লোকটি বলে, মহারাজ আপনার জন্য অনেক ভালো ভালো পরমান্ন, পুষ্পান্নাদির আয়োজন করেছি আপনার পাত্রটি পরিষ্কার নয় ওটিকে পরিষ্কার করে গ্রহণ করুন। সাধু বললেন না আমি এপাত্রেই ভিক্ষা নেব। লোকটি বলল, মহারাজ আপনার ভিক্ষাপাত্রটি ময়লায় ভর্তি, ওতে ভালো

জিনিস দিলে তার কোনো আস্বাদ পাবেন না। তখন সাধু বললেন—বাছা ! তোমাকে আমি এইজন্য দীক্ষা দিইনি। তোমার মন কামনাবাসনা কুটিলতায় পূর্ণ। এইরকম অপবিত্র চিত্তে ভগবানের নামে দীক্ষা দিলে তা প্রস্ফুটিত হত না। যতদিন পর্যন্ত না তোমার কামনার বেগ প্রশমিত হয় ততদিন তোমার সাধনায় মন বসবে না। অপেক্ষা করো।

যমলার্জুন—নলকুবর ও মণিগ্রীব কৈলাসপতি রুদ্রের কিঙ্কর ও তাঁর ধনভাণ্ডারী কুবেরের পুত্র। তাঁরা নব-বয়স, প্রচুর ধনসম্পদের আধিপত্য, রুদ্র-কিঙ্কর জনিত প্রভুত্ব এবং অবিবেকের মিলনে একেবারে মদান্ধ হয়ে যথেচ্ছ জীবন যাপন করতেন। শান্ত পরম পবিত্র শিব-তপোবন কৈলাসকেও ভেঙেচুরে প্রমোদকাননে পরিণত করার জন্য তাঁরা সচেষ্ট থাকতেন।

একবার নারদ ঋষি কৈলাসে শিব-সদনে হরি লীলাকীর্তন করতে করতে যাওয়ার সময় এই মদমত্ত দুই ভাইকে অপর-অপ্সরাগণের সঙ্গে কৈলাস-গঙ্গায় উন্মত্ত ও নগ্ন অবস্থায় জলবিহারে রত দেখলেন। ধনগর্বে গর্বিত ও মদিরাপানে মত্ত এই দুজন নারদের আগমনের প্রতি ভ্রূকুটি না করে অঙ্গভঙ্গী সহকারে ও বিকট চিৎকারে অপ্সরাগণকে আহ্বান করতে লাগলেন। নারদ দেখলেন এরা দেবযোনিজাত হয়েও ধনগর্বে গর্বিত এবং এই ধনগর্বই এদের মদিরাপান, বেশ্যাসক্তি, ঋষি অবমাননা প্রভৃতির সুযোগ দিয়েছে এবং অধিকার প্রদান করেছে। পরম ভাগবতোত্তম নারদ ঋষির হৃদয়ে কিন্তু এর ফলে ক্রোধ বা ক্ষোভ সৃষ্টি না হয়ে অন্তরে কৃপার উদয় হল। ভক্তচূড়ামণিদের হৃদয় সদাই পরানুগ্রহকাতর, তাই তিনি ভাবলেন এই বহির্মুখ মদমত্তদের কীভাবে উদ্ধার করা যাবে, কীভাবে এরা হরিভজনের অধিকার পাবে ? নলকুবের ও মণিগ্রীব মূঢ়, তমগুণে আচ্ছন্ন তাই তাদের উপযুক্ত সময় না আসা পর্যন্ত উন্নতি সম্ভব নয় অথচ ধনান্ধ হয়ে থাকলে কোনোক্রমেই তাদের বিবেক জাগ্রত হবে না। তাই তিনি নলকুবর ও মণিগ্রীবকে অভিশাপ দিতে মনস্থ করলেন যাতে তারা স্থাবর হয়ে জন্মগ্রহণ করে, নতুন কোনো পাপাচারে পতন না ডেকে এনে, নতুন মদান্ধতায় জড়িয়ে না পড়ে, পূর্ব পাপ স্খালন করে। কেননা নারদ জানেন—

বিদ্যামদঃ ধনমদস্তথা চাভিজনো মদঃ।
মদা এতৈরলিপ্তানাং ত এব চ সতাং দমাঃ॥ (বৈষ্ণবতোষণী ধৃত প্রাচিন)

"বিদ্যা, মদ ও ধন—ত্রিবিধভাবে মদ সৃষ্টি করে থাকে। আর এতে লিপ্ত না হলে এরাই 'দমরূপে' প্রকাশ পায়।"

দেবর্ষি নারদ এই ভ্রাতৃদ্বয়ের প্রতি অনুকম্পাবশত তাদের শাপপ্রদান করলেন—

অহোঽর্হতঃ স্থাবরতাং স্যাতাং নৈবং যথা পুনঃ।
স্মৃতিঃ স্যান্মৎ প্রসাদেন তত্রাপি মদনুগ্রহাৎ॥
বাসুদেবস্য সান্নিধ্যং লব্ধ্বা দিব্যশরচ্ছতে।
বৃত্তে স্বর্লোকতাং ভূয়ো লব্ধভক্তী ভবিষ্যতঃ॥ (ভাগবত ১০।১০।২১-২২)

নারদ অভিশাপ প্রদানের সময় চিন্তা করলেন বৃক্ষরূপে জন্মগ্রহণ করলে এদের আর ধনমদমত্তা হবে না। আমার অনুগ্রহে এরা পূর্বজন্ম বৃত্তান্ত সর্বদাই স্মরণে রাখবে। দেবপরিমাণ শতবর্ষে তাদের মূঢ়তা ক্ষয়প্রাপ্ত হলে স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সান্নিধ্যলাভ করে পুনরায় দেবদেহ ধারণ করবে এবং শ্রীগোবিন্দ চরণে ভক্তি লাভ করবে। নারদের অভিশাপে দুজনেই বৃন্দাবনে যমলার্জুনরূপে (যমজ বৃক্ষ) জন্মগ্রহণ করলেন। শ্রীভগবান তাঁর ভক্তের বাক্য রক্ষা করতে সর্বদাই সচেষ্ট। শ্রীকৃষ্ণের দামোদর লীলায়, মা যশোদা কর্তৃক তাঁকে উদুখলের সঙ্গে বন্ধনের সময় তাঁর ভক্তচূড়ামণি দেবর্ষি নারদের কথা মনে পড়ল। ঋষিগণ মন্ত্রার্থদ্রষ্টা ও মন্ত্রপ্রচারক। ভগবান দেখলেন যে ঋষিবাক্যের কদাপি অন্যথা হওয়া উচিত নয়। তাই শ্রীকৃষ্ণ তাঁর পরম পবিত্র দামোদর লীলায় স্থির করলেন নলকুবর ও মণিগ্রীবের উদ্ধারের সময় আগত। তিনি তাঁর কোমরের সঙ্গে বাঁধা উদুখলটিকে নিয়েই হামাগুড়ি দিতে লাগলেন। তখন উদুখলটি দিব্য পরিমাণ শতবর্ষ প্রাচিন অর্জুন গাছ দুটিতে আটকে তাদের উৎপাটিত করে দিল। বৃক্ষদ্বয় ভূপতিত হলে তার মধ্যে থেকে দুইজন অলৌকিক এবং জ্যোতির্ময় পুরুষ নির্গত হলেন। তাঁরা শ্রীকৃষ্ণস্তুতি করতে লাগলেন—

কৃষ্ণ কৃষ্ণ মহাযোগিং স্তমাদ্যঃ পুরুষঃ পরঃ।
ব্যক্তাব্যক্তমিদং বিশ্বং রূপং তে ব্রহ্মাণা বিদুঃ॥ (ভাগবত ১০।১০।২৯)

'হে কৃষ্ণ ! তুমি সর্বজগতের আদি, প্রকৃতির, ব্রহ্মাণ্ডের এবং সর্বজীবের অন্তর্যামী পুরুষ। তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিগণ এই কার্যকারণাত্মক জগৎকে তোমারই অধিষ্ঠানরূপে ধ্যান করেন।'

নমঃ পরমকল্যাণ নমঃ পরমমঙ্গল। বাসুদেবায় শান্তায় যদূনাং পতয়ে নমঃ॥
অনুজানীহি নৌ ভূমং স্তবানুচরকিঙ্করৌ। দর্শনং নৌ ভগবত ঋষেরাসীদনুগ্রহাৎ॥
বাণী গুণানুকথনে শ্রবণৌ কথায়াং হস্তৌ চ কর্মসু মনস্তব পাদয়োর্নঃ।
স্মৃত্যাং শিরস্তব নিবাসজগৎপ্রণামে দৃষ্টিঃ সত্যাং দর্শনেঽস্তু ভবত্তনূনাম্॥

(ভাগবত ১০।১০।৩৬-৩৮)

'হে কৃষ্ণ ! আপনার চরণে প্রণাম। আপনি স্বয়ং আনন্দস্বরূপ। আপনি গোপগণের পালনকর্তা। আপনার চরণে পুনঃ পুনঃ প্রণাম। হে পরমেশ্বর ! আমরা ভক্তচূড়ামণি দেবর্ষি নারদের দাসানুদাস। সেই পরমদয়ালু দেবর্ষি নারদের কৃপাতে আমরা মহাপরাধী হয়েও আপনার শ্রীচরণদর্শনে সমর্থ হয়েছি।

হে ভগবন্ ! আমাদের বাক্-ইন্দ্রিয় যেন সর্বদাই আপনার নাম-রূপ-গুণ-লীলাদিকথা বর্ণনায় এবং শ্রবণেন্দ্রিয় যেন উহা শ্রবণে নিযুক্ত থাকে। আমাদের কর্মেন্দ্রিয় যেন সতত আপনার সেবাকর্মে এবং মন যেন আপনার স্বরূপে মত্ত থাকে। আমাদের মস্তক যেন আপনার নিবাসস্বরূপ জগতের নিকট সর্বদা নত থাকে। আমাদের নয়নও যেন সর্বদা আপনার শ্রীবিগ্রহ এবং আপনার ভক্তচূড়ামণিগণের দর্শনে রত থাকে।'

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ঈষৎ হাস্যে বললেন—

সাধূনাং সমচিত্তানাং সুতরা মৎকৃতাত্মনাম্।
দর্শনান্নো ভবেদ্ বন্ধঃ পুংসোঽক্ষ্ণোঃ সবিতুর্যথা॥
তদ্ গচ্ছতং মৎপরমৌ নলকূবর সাদনম্।
সঞ্জাতো ময়ি ভাবো বামঙ্গিতঃ পরমোঽভবঃ॥

(ভাগবত ১০।১০।৪১-৪২)

'হে নলকুবর ও মণিগ্রীব ! যেমন সূর্যোদয় হলে নয়নের আঁধার দূর হয়, সেইরূপ মানাপমানে সমজ্ঞানবিশিষ্ট, আমাতে একনিষ্ঠ ভক্তগণের দর্শনেই মদান্ধ জীবমাত্রেরই অজ্ঞান আঁধার কেটে যায়। তোমাদের তমভাব দূর

হয়েছে এবং ভক্ত নারদের কৃপায় তোমাদের আমাতে রতি লাভ হয়েছে, তোমরা আমার কথা চিন্তা করতে করতে স্বস্থানে চলে যাও। তোমাদের আর পতনের ভয় নেই।'

এইভাবে মহৎকৃপা এলেও সময়কালেই তমগুণীদের বিবেক জাগ্রত হয়।

পরের উনচল্লিশ ও চল্লিশতম শ্লোকে ভগবান বলছেন, এই কামনা দুষ্পূরণীয় এবং বিবেকবান সাধকদের নিত্যশত্রু (জ্ঞানিনো নিত্যবৈরিণা)। অপ্রাপ্ত বস্তুর প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষাকে বলে 'কামনা'। হৃদয়ে যে সূক্ষ্ম কামনা অবদমিত থাকে তাকে বলে 'বাসনা'। জাগতিক বস্তুর প্রয়োজনীয়তাকে বলে 'স্পৃহা'। বস্তুগুলির প্রিয়ভাব নজরে আসাকে বলে 'আসক্তি'। বস্তুগুলির লাভ করার সম্ভাবনাকে বলে 'আশা' এবং অধিক পরিমাণে পাওয়ার আকাঙ্ক্ষাকে বলে 'লোভ' বা 'তৃষ্ণা'। এসকলই হল 'কাম'-এর বিভিন্ন রূপ এবং পারমার্থিক পথের বিরাট বাধাস্বরূপ। কামনার অনুকূল বস্তু সর্বদা ভোগ করতে থাকলে কামনা তৃপ্ত হয় না বরং উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং ক্রমে পাপকর্মে নিয়োজিত করে। আর এই কামনারূপী পাপকর্মের আশ্রয়স্থল হল ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি।

পাপ হতে নিবৃত্তির উপায়—(শ্লোক ৪১-৪৩)

ভগবান তৃতীয় অধ্যায়ের শেষ তিন শ্লোকে পাপ আচরণ হতে নিবৃত্ত হওয়ার উপায় বলেছেন।

তস্মাত্ত্বমিন্দ্রিয়াণ্যাদৌ নিয়ম্য ভরতর্ষভ।
পাপ্মানং প্রজহি হ্যেনং জ্ঞানবিজ্ঞাননাশনম্॥
ইন্দ্রিয়াণি পরাণ্যাহুরিন্দ্রিয়েভ্যঃ পরং মনঃ।
মনসস্তু পরা বুদ্ধির্যো বুদ্ধেঃ পরতস্তু সঃ॥
এবং বুদ্ধেঃ পরং বুদ্ধ্বা সংস্তভ্যাত্মানমাত্মনা।
জহি শত্রুং মহাবাহো কামরূপং দুরাসদম্॥

(গীতা ৩।৪১-৪৩)

'ভগবান বলছেন—হে অর্জুন সর্বপ্রথমে তুমি, ইন্দ্রিয়গুলিকে বশীভূত

করে জ্ঞান-বিজ্ঞান বিনাশী ঘোর পাপস্বরূপ এই কামকে (কামনা) সবলে বিনাশ করো।

ইন্দ্রিয়গুলি স্থূল শরীর অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ (বলবান ও অধিক প্রকাশক)। মন আবার ইন্দ্রিয় অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। মন থেকে শ্রেষ্ঠ হল বুদ্ধি এবং কামনা হল বুদ্ধির চেয়েও প্রবল।

এইভাবে কামনাকে বুদ্ধির চেয়েও বলবান জেনে নিজের আত্মশক্তি দ্বারাই একে বশীভূত করবে। এবং হে অর্জুন ! কামনারূপ দুর্জয় শত্রুকে অবশ্যই নাশ করবে।' (গীতা ৩।৪১-৪৩)

আগে বন্ধনের মূল তথা কামনার কথা বিস্তৃতভাবে বলার পর ভগবান উপরোক্ত তিনটি শ্লোকে কামনার স্থিতি ও কামনা ত্যাগের প্রকৃষ্ট উপায় বলেছেন। ভগবান কামনাকে 'অনলেন' (অগ্নির ন্যায়) ও দুষ্পূরেণ (যা পূরণ করা সম্ভব নয়) বলে বলেছেন। ভোগ্যপদার্থের নিত্য আহরণ দ্বারা কখনো কামনা পূরণ হয় না। যেমন যেমন ভোগ্যপদার্থ প্রাপ্ত হতে থাকে তেমন তেমন কামনাও বাড়তে থাকে। সাধনের পথে প্রধান বাধা হল সুখের আকাঙ্ক্ষা বা কামনা। ভোগের সুখ হল সংযোগজনিত আর সমাধি আদির সুখ হল বিয়োগজনিত। সংযোগজনিত সুখ গ্রহণ করে রজোগুণ-তমগুণসম্পন্ন লোকেরা তাদের পতন ঘটায়। তাই ভগবান বলেছেন '**ন তেষু রমতে বুধঃ**' (গীতা ৫।২২)। আর বিয়োগজনিত সুখ হয় সাত্ত্বিক ব্যক্তিদের এবং এই সাত্ত্বিক সুখের আসক্তিও পরমাত্মা প্রাপ্তির পথে বাধা প্রদান করে। এই বাধা '**সুখসঙ্গেন বধ্নাতি**' (গীতা ১৪।৬)।

কামনা সম্বন্ধে ভগবান বলেছেন এর অনুভূতি বা কর্মস্থান, শরীর (বা বিষয়), ইন্দ্রিয়াদি, মন ও বুদ্ধিতে হলেও অবস্থিতি কিন্তু আরও গভীরে অর্থাৎ 'অহং'-এ। আর এই অহং থেকে কামনা ত্যাগের কথা সর্বশাস্ত্রেই বলেছে।

শরীর বা বিষয়গুলি থেকে ইন্দ্রিয়সকল শ্রেষ্ঠ কারণ ইন্দ্রিয়গুলিতেই বিষয়সমূহের প্রকাশ ঘটে বা এদের দ্বারাই বিষয়জ্ঞান হয়। আবার ইন্দ্রিয়গুলি নিজ নিজ বিষয় সম্বন্ধে অবহিত হলেও অন্য ইন্দ্রিয়াদির জ্ঞাতব্য

বিষয় সম্বন্ধে জানে না। কিন্তু সমস্ত ইন্দ্রিয়ই ও তাদের অনুভূত বিষয় মনের গোচর। মনই ইন্দ্রিয়দের প্রকাশক। বুদ্ধি আবার মনের প্রকাশক। মন শান্ত না চঞ্চল, মন সুখী না দুঃখী তা বুদ্ধিই নির্ণয় করে। আবার ইন্দ্রিয়গুলি ঠিকমতো কাজ করছে কিনা এবং তাদের উপলব্ধ বিষয়গুলিও বুদ্ধি জানে। তাই বুদ্ধি হল মন, ইন্দ্রিয়াদি ও শরীর অপেক্ষাও শ্রেয়। কিন্তু বুদ্ধিরও কর্তা আছে তিনি হচ্ছেন স্বয়ং। স্বয়ং (নিজ স্বরূপ) হচ্ছে চেতন, নির্বিকার কিন্তু ইহা যখন জড়ের (প্রকৃতিজাত শরীরের) সঙ্গে তাদাত্ম্য করে নেয় তখন স্বরূপ শরীরের কর্তা হয়ে যায় এবং উৎপন্ন হয় 'অহম্'। এই অহম্-এর জড় অংশে প্রাধান্য থাকে সংসারের এবং চেতন অংশে প্রাধান্য থাকে পারমার্থিক প্রাপ্তির ইচ্ছার।

ভগবান অবশ্য এখানে সমষ্টি 'অহং'-এর কথা বলেননি, সেটা বলেছেন সপ্তম অধ্যায়ের প্রকৃতির বিভাগ সম্পর্কে বলার সময়—

'ভূমিরাপোহনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ ।
অহংকার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিঃ অষ্টধা ॥' (গীতা ৭।৪)

এই সমষ্টি বা ব্যষ্টি অহং পর্যন্ত সবই প্রকৃতির অংশ।

আর বর্তমানে উল্লিখিত এই ব্যষ্টি অহং-এ বাস করে কামনা বা ইচ্ছা। অহং-এরও পরে বিরাজ করেন পরমাত্মার অংশ সাক্ষাৎ 'স্বয়ং'—যিনি শরীর, ইন্দ্রিয়াদি, মন, বুদ্ধি ও অহং—এই সবেরও আশ্রয়, আধার প্রেরক, তিনিই শ্রেষ্ঠ, তিনিই বলবান ও প্রকাশক। কিন্তু জড়ের সংস্পর্শে এসে কামনা বা ইচ্ছার দুটি ভাগ হয়ে যায়—অহংএর জড়মুখী অংশে থাকে লৌকিক কামনা (ভোগ ও সম্পদ সংগ্রহের ইচ্ছা) এবং চেতন অংশে থাকে ভগবদ্মুখী পারমার্থিক কামনা। মানুষের চিত্তে দুই প্রকার ইচ্ছা থাকায় দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয় এবং যখন লৌকিক কামনা জাগ্রত হয়ে ওঠে তখন পারমার্থিক প্রাপ্তির ইচ্ছা অবদমিত হয়। আবার যখন পরমাত্মা প্রাপ্তির ইচ্ছা সুদৃঢ় হয় তখন দ্বন্দ্ব দূর হয়, ফলে সাধক সহজেই পরমাত্মা প্রাপ্ত হয়—**'নির্দ্বন্দ্বো হি মহাবাহো সুখং বন্ধাৎ প্রমুচ্যতে'** (গীতা ৫।৩)। সাধনপথের বাধা লৌকিক কামনা দূর করার কথা সর্ব শাস্ত্রেই বলেছে।

মহাভারতের শান্তিপর্বে মহর্ষি বেদব্যাস তাঁর পুত্র শুকদেবকে উপদেশ দিয়েছেন—

কামবন্ধনমেবৈকং নান্যদস্তীহ বন্ধনম্।
কামবন্ধনমুক্তো হি ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে।। (মহাভারত, শান্তিপর্ব ২৫১।৭)

'এই জগতে একমাত্র কামবন্ধনই বন্ধন, অন্য কোনো বন্ধন নেই। সুতরাং মানুষ সেই কামবন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে ব্রহ্মত্ব লাভ করতে পারে।'

মহর্ষি বেদব্যাস বলছেন—

নাকামো ম্রিয়তে জাতু ন তেন ন চ বৈ দ্বিজঃ।। (মহাভারত, শান্তিপর্ব ২৪৮।৩)

'কামনাশূন্য লোকের মৃত্যু হয় না আর নিষ্কাম ব্যক্তিই ব্রাহ্মণ।'

কঠোপনিষদের যমরাজ-নচিকেতা সংবাদ ও বৃহদারণ্যক উপনিষদে জনক-যাজ্ঞবল্ক্য সংবাদে আত্মজ্ঞান লাভের জন্য কামনা নাশ-এর কথা বলা হয়েছে।

যদা সর্বে প্রমুচ্যন্তে কামা যেঽস্য হৃদি শ্রিতাঃ।
অথ মর্ত্যোঽমৃতো ভবত্যত্র ব্রহ্ম সমশ্নুতে।।

(ক.উ. ২।৩।১৪, বৃ.উ. ৪।৪।৭)

'মানবের হৃদয়ে স্থিত কামনা যখন সমূলে নষ্ট হয়ে যায়, তখন মরণশীল মানুষ অমরত্ব লাভ করে এবং এটিই হল মনুষ্য দেহেই ব্রহ্মকে সম্যক্ অনুভব করা।'

ভাগবতের সপ্তম স্কন্ধে প্রহ্লাদ চরিত্রের বর্ণনা আছে। এই স্কন্ধের নবম অধ্যায় হিরণ্যকশিপু বধের পর ভক্ত প্রহ্লাদ ৭ম হতে ৫০তম অর্থাৎ ৪৩টি শ্লোকে বিষ্ণুস্তুতি করেছেন। ভগবান বিষ্ণু প্রহ্লাদের স্তব শুনে নৃসিংহ অবতার রূপে তাঁর হিরণ্যকশিপু বধের ক্রোধ সংবরণ করে অভিলাষিত বর দিতে চাইলে প্রহ্লাদ বলছেন—হে প্রভু, কামনাসঙ্গে আমি ভীত। মুমুক্ষু বলেই আপনার চরণাশ্রয় করেছি, আমাকে আর অন্য বর দিয়ে প্রলুব্ধ করবেন না—

বিমুঞ্চতি যদা কামান্ মানবো মনসি স্থিতান্।
তর্হ্যেব পুণ্ডরীকাক্ষ ভগবত্ত্বায় কল্পতে।। (ভাগবত ৭।১০।৯)

'মানব যখন সমস্ত কামনা পরিত্যাগ করেন, তখনই তিনি ভগবৎস্বরূপ প্রাপ্ত হন।'

বুদ্ধির থেকেও সূক্ষ্মতর 'অহম্'-এর জড়াভিমুখী অংশে স্থিত এই কামনাকে নাশ করার উপায় হল অহমের চেতনাভিমুখী অংশ দ্বারা একে সংযত করা। ষষ্ঠ অধ্যায়ে ভগবান একেই **'উদ্ধরেদাত্মনাত্মানম্'** ও **'যেনাত্মৈবাত্মনা জিতঃ'** দ্বারা উল্লেখ করেছেন। স্বয়ং-এর অনন্ত বল। তাঁর সত্তা অবলম্বন করেই বুদ্ধি, মন, ইন্দ্রিয়াদি সত্তাবান ও বলবান হয়ে থাকে। কিন্তু জড়ের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করে স্বয়ংই নিজ শক্তির কথা বিস্মৃত হয়। তাই স্বরূপকে সংসার অভিমুখী না করে পরমাত্মা অভিমুখী করতে হবে। পরমাত্মার সাহায্য নিয়ে তার বল বাড়াতে হবে। জড়ের প্রতি কামনাকে নাশ করার উপায় হল—

১) জাগতিক বস্তুগুলিকে গুরুত্ব না দেওয়া, কেননা এই গুরুত্বই কামনা পরিত্যাগ শক্ত করে দেয়।

২) নতুন কোনো কামনা না করা।

৩) কর্মযোগে রত হওয়া। কর্মযোগের দ্বারা অতি সহজেই এই কামনা নাশ করা। কর্মযোগী সাধক ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বা অতিবৃহৎ যে কোনো জাগতিক ক্রিয়াই অন্যের হিতার্থে করে যাবেন, নিজ কামনা পূরণের উদ্দেশ্যে নয়। তিনি নিজের জন্য কিছুই করেন না, কিছু চান না বা নিজের বলে কিছু মানেনও না, ফলে তাঁর কামনা সর্বতোভাবে নাশ হয় আর ঈশ্বরলাভের পরম উদ্দেশ্য সফল হয়।

———o———

চতুর্থ প্রশ্ন

ভগবান তৃতীয় অধ্যায়ে কর্মযোগ বিস্তৃতভাবে বলার পর চতুর্থ অধ্যায়ের প্রারম্ভে বললেন এই যোগ অতি প্রাচীন এবং এই উপদেশ প্রথমে তিনি সূর্যকে বলেন ও বংশপরম্পরাগতভাবে সেটি মনু ও ইক্ষ্বাকু দ্বারা প্রচলিত হয়। কালের ব্যবধানে এই কর্মযোগ বিলুপ্ত হওয়ায় তাঁর সেই উপদেশ পুনরায় তিনি অর্জুনকে জানাচ্ছেন।

অতঃপর অর্জুনের সরল প্রশ্ন—

অপরং ভবতো জন্ম পরং জন্ম বিবস্বতঃ।
কথমেতদ্বিজানীয়াং ত্বমাদৌ প্রোক্তবানিতি॥

(গীতা ৪।৪)

'আপনার জন্ম তো হয়েছে এখন (শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের সমসাময়িক ও সমবয়স্ক) আর সূর্যের জন্ম হয়েছে অনেক আগে অর্থাৎ কল্পের আদিতে। সুতরাং আমি কী করে বুঝব আপনি সূর্যকে কল্পের আদিতে এই যোগের কথা বলেছেন।'

ভগবান এই প্রশ্নের উত্তর সমগ্র চতুর্থ অধ্যায়ের ৩৮টি শ্লোকে (৫-৪২ শ্লোক) দিয়েছেন।

১. ভগবানের জন্মের দিব্যতা	শ্লোক ৫-৮
২. ভগবানের কর্মের দিব্যতা	শ্লোক ৯-১১, ১৩-১৫
৩. জীবের কর্মে আসক্তি	শ্লোক ১২
৪. কর্মের বিভাগ	শ্লোক ১৬-২২
৫. যজ্ঞের বিভাগ	শ্লোক ২৩-৩২
৬. তত্ত্বজ্ঞান লাভের উপায়	শ্লোক ৩৩-৩৯
৭. তত্ত্বজ্ঞানের অনধিকারী	শ্লোক ৪০
৮. কর্মযোগী	শ্লোক ৪১-৪২

এই অধ্যায়টির নাম জ্ঞানকর্মসন্ন্যাসযোগ হলেও ভগবান এখানে কর্মযোগের তত্ত্বের বিস্তৃত ব্যাখ্যা করেছেন এবং শেষে জ্ঞান ও কর্মযোগের সাম্যতা প্রতিপাদন করেছেন।

এখানে দুটি কথার নিগূঢ় অর্থ আলোচনা করা উচিত—ফলেচ্ছা ও উদ্দেশ্য।

ফলেচ্ছা—ইহা অনিত্য বস্তুর প্রতি আকর্ষণবশত হয়। ফলপ্রাপ্তির পর ইহা নষ্ট হয়ে যায়।

উদ্দেশ্য—ইহা নিত্যবস্তু বা পরমাত্মা প্রাপ্তির নিমিত্ত হয়।

কর্মযোগ—কর্মযোগের মূলকথা হল কর্তব্য পালন সর্বদা 'নিষ্কামভাবে' এবং 'পরহিতের' দৃষ্টি রেখে করা। কর্মযোগের দ্বারা যে নিষ্কাম কর্ম সম্পাদিত হয় তা ফলের কামনারহিত হলেও উদ্দেশ্যরহিত হয় না। উদ্দেশ্যরহিত কর্ম কেবল পাগলেরাই করে। কর্মযোগী যখন স্বার্থত্যাগ করে কেবলমাত্র জগৎহিতের জন্যই কর্ম করে তখন ভগবানের হিতৈষণী শক্তির সঙ্গে তাঁর বিশেষ ঐক্য হয় এবং তাঁর মধ্যে ভগবানেরই শক্তি কাজ করে, তার ফলে পরহিত সাধন সহজ হয় ও কোনো বাধার সম্মুখীন হতে হয় না।

কর্মযোগে পরাশ্রয়ের (অন্য কিছুর সাহায্যের) প্রয়োজনীয়তা নেই। কেবল পরিস্থিতি অনুযায়ী কর্ম করাকেই কর্মযোগ বা সেবা বলে। **কর্মযোগী পরিস্থিতির পরিবর্তনও করেন না বা তার সন্ধানও করেন না।** তিনি প্রাপ্ত পরিস্থিতি ভগবানের ইচ্ছা ভেবে তার সদ্ব্যবহার করেন মাত্র। কর্মযোগী অনুকূল পরিস্থিতিতে অপরের সেবা করেন এবং প্রতিকূল পরিস্থিতিতে দুঃখিতও হন না বা সুখের আকাঙ্ক্ষাও করেন না। তাই কর্মযোগী সহজেই কর্মবন্ধন থেকে মুক্ত হন। সেইজন্য কর্মযোগকে রহস্য বলা যেতে পারে, কারণ যে কর্মের দ্বারা মানুষের বন্ধন হয়, কর্মযোগে কর্ম করলে সেই কর্মদ্বারাই মানুষ মুক্ত হয়।

প্রাচীনকালে কর্মযোগে জ্ঞানসম্পন্ন রাজাগণ রাজ্যভোগে আসক্ত না হয়ে উত্তমরূপে রাজ্য পরিচালনা করতেন এবং প্রজাদেরও সেইরূপ আচরণ শেখাতেন। প্রজাদের হিতে তাঁদের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি থাকত। মহাকবি

কালিদাস সূর্যবংশীয় রাজাদের সম্বন্ধে বলছেন—

প্রজানামেব ভূত্যর্থং স তাভ্যো বলিমগ্রহীৎ।

সহস্রগুণমুৎস্রষ্টুমাদত্তে হি রসং রবিঃ॥ (রঘুবংশ. ১।১৮)

'এই রাজন্যবর্গ তাঁদের প্রজাদের মঙ্গলের জন্য সেইভাবেই কর গ্রহণ করতেন, যেমনভাবে সূর্য পৃথিবী থেকে জল গ্রহণ করে সহস্রগুণে বৃদ্ধি করে বৃষ্টিপাত রূপে তা আবার পৃথিবীতে ফিরিয়ে দেয়।'

একটি আখ্যান—ত্রেতাযুগে চক্রবেণ নামে এক রাজা ছিলেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত ধর্মাত্মা। রাজা-রানি রাজকোষ থেকে কোনো অর্থ নিজেদের জন্য খরচ করতেন না। প্রজাদের থেকে যে কর আদায় হত তা প্রজাহিতেই ব্যয় করতেন। তাদের জীবিকা নির্বাহ হত চাষ-আবাদ করে এবং তাঁরা অত্যন্ত সাধারণভাবে থাকতেন, মোটা কাপড় পরতেন ও সাধারণ খাওয়া-দাওয়া করতেন।

একবার রাজ্যে কোনো উৎসব উপলক্ষ্যে শহরের সমস্ত রমণীরা রানিমার কাছে এল। তারা সব ঐশ্বর্যপূর্ণ পোষাক পরে এসেছেন কিন্তু রানির পোশাক খুবই সাধাসিধা। সবাই রানিকে বলল—আপনি আমাদের প্রভু, আপনারও জাঁকজমকপূর্ণ পোশাকাদি পরা উচিত। কিন্তু আপনি অতি সাধারণ পোশাক পরিধান করে আছেন। রানি ছিলেন খুব ভালো মানুষ। রাত্রে রাজাকে সব কথা বললেন। রাজা বললেন—দেখো ! আমাদের চাষ-আবাদ করে চলে, প্রজাদের টাকা আমি নিজেদের জন্য ব্যয় করতে পারি না। যাইহোক, দেখি কিছু গহনার ব্যবস্থা করতে পারি কিনা।

পরদিন রাজা তাঁর এক ব্রাহ্মণ সভাসদকে বললেন—দেখো, আমি রাজা, প্রজাদের কর ছাড়াও অন্য রাজাদের করও গ্রহণ করি। তুমি লঙ্কেশ্বর রাবণের কাছে যাও আর বলো, রাজা চক্রবেন কর দিতে বলেছেন। আর কররূপে সোনা নিয়ে এসো।

সভাসদটি লঙ্কায় গেল আর রাবণকে বলল—মহারাজ চক্রবেণ আপনাকে কর দিতে বলেছেন। রাবণ অট্টহাসি করে বললেন—আরে, জগতে এমন কোনো মূর্খ আছে যে রাবণের কাছ থেকে কর চায়। তুমি এই

মুহূর্তে আমার সামনে থেকে দূর হও। সভাসদটি রাবণকে চিন্তা করতে বলে এবং পরের দিন আসব বলে চলে গেল।

রাত্রে রানি মন্দোদরীর সঙ্গে দেখা হতে রাবণ সবিস্তারে রাজা চক্রবেণের দূতের কথা বললেন। রানি অত্যন্ত পতিব্রতা ছিলেন ও চক্রবেণের প্রভাব জানতেন, তিনি বললেন মহারাজ ! কর না দিয়ে ভালো করেননি। রাবণ হাস্য করে বললেন, রানি তুমি বোধহয় আমার মহিমা জান না।

যাইহোক সকালে রানি মহারাজকে আটকালেন ও বললেন মহারাজ ! আমার সঙ্গে একটু আসুন। মন্দোদরী প্রত্যহ ছাদে পায়রাদের শষ্য দিতেন। সেদিন পায়রাদের শষ্য ছিটিয়ে তাদের উদ্দেশ্যে বললেন— মহারাজধিরাজ রাবণের দিব্যি, একটিও দানা কেউ আর খুঁটে খেও না। কিন্তু পায়রারা তা গ্রাহ্য না করে শষ্যদানা খেতে লাগল। রানি বললেন দেখলেন তো আপনার মহিমা। রাবণ বললেন—তুমি কি পাগল, এই ক্ষুদ্র পাখিগুলি কী বুঝবে আমার মহিমা। তখন মন্দোদরী পুনরায় পায়রাদের লক্ষ্য করে বললেন যদি একটি দানাও খুঁটে খাও তো রাজা চক্রবেণের দিব্যি। একথা বলা মাত্রই পায়রাগুলোর দানা খুঁটে খাওয়া বন্ধ হয়ে গেল। কিন্তু একটি পায়রা যেই খুঁটে খেতে গেল তার মাথাটি খসে পড়ল ; কারণ সেটি বধির ছিল, তাই মন্দোদরীর কথা শুনতে পায়নি। রাবণ কিন্তু অবিশ্বাস সহকারে চলে গেলেন।

পরদিন রাজসভাগৃহে চক্রবেণের সভাসদটি আবার উপস্থিত হয়ে বলল—মহারাজ কর দেওয়ার কথা কিছু বিবেচনা করলেন ? কর বাবদ কিন্তু আপনাকে সোনা দিতে হবে। রাবণ হেসে বললেন—তুমি কেমন লোক হে ? দেবতারা পর্যন্ত আমাকে দুবেলা নমস্কার করে, আর আমি কিনা তোমার রাজাকে কর দেব ? সভাসদটি তখন রাবণকে অনুরোধ করল—মহারাজ আপনি আমার সঙ্গে একবার সমুদ্রের ধারে আসুন। অকুতোভয় রাবণ সমুদ্রের ধারে গেলেন। সেখানে লোকটি বালির ওপর লঙ্কা নগরীর মতো একটি ছবি আঁকল আর চারিদিকে আঁকল চার তোরণ। রাবণ বললেন—বাঃ

লঙ্কা নগরী এইরকমই, তুমি তো বেশ কারিগর! তখন লোকটি 'মহারাজ চক্রবেণের দিব্যি' বলে বালিতে আঁকা একটি তোরণ ভেঙে দিল আর সঙ্গে সঙ্গে রাবণের লঙ্কানগরীর তোরণটিও ভেঙে গেল। তখন সে বলল, মহারাজ কর দেবেন কিনা বলুন, নাহলে আমি সমস্ত লঙ্কা নগরী চূর্ণবিচূর্ণ করে দেব। রাবণ এবার ভয় পেয়ে তার হাতদুটো ধরে বললেন আর কিছু বলতে হবে না, আমি কর দেব, সোনা দেব।

সভাসদটি রাবণের কাছ থেকে করস্বরূপ গৃহীত সোনা রাজাকে দিলেন ও রাজা রানিকে তা দিয়ে বললেন তোমার ইচ্ছেমতো গহনা গড়িয়ে নাও।

রানি জিজ্ঞাসা করলেন এত সোনা পেলে কোথা থেকে ? রাজা বললেন, রাবণ কর দিয়েছে। রানি শুনে আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করল রাবণ কেন কর দেবে। রাজা চক্রবেণ তখন অনুচরটিকে ডেকে সব বলতে বললেন। সব শুনে রানি অবাক, বুঝলেন রাজার কী প্রভাব, কর্মযোগের কী মহিমা! এর থেকে গহনা কখনোই বড় হতে পারে না। তিনি অনুচরটিকে সব সোনা দিয়ে বললেন রাবণকে সব ফিরিয়ে দাও, বলো মহারাজ চক্রবেণ আপনার কর গ্রহণ করেননি। এইভাবে কর্মযোগ পালন করায় পূর্বযুগে রাজারা জ্ঞান ও ভক্তি স্বতঃই প্রাপ্ত হতেন।

প্রাচীনকালে বড় বড় মুনি-ঋষিগণও জ্ঞান আহরণের জন্য তাঁদের কাছে যেতেন। শ্রীশুকদেব ব্রহ্মবিদ্যা আহরণের জন্য রাজা জনক-এর কাছে গিয়েছিলেন, আর ছান্দোগ্য উপনিষদে উল্লিখিত আছে ব্রহ্মবিদ্যার জন্য ছয়জন ঋষি একসঙ্গে রাজা অশ্বপতির কাছে গিয়েছিলেন। রাজার আদর্শে তাঁর রাজ্য কীরকম চলত এ বিষয়ে অশ্বপতি বলছেন—

ন মে স্তেনো জনপদে ন কদর্যো ন মদ্যপঃ।
নানাহিতাগ্নির্নাবিদ্বান্ন স্বৈরী স্বৈরিণী কুতঃ॥ (ছান্দোগ্য. ৫।১১।৫)

'আমার রাজ্যে কোনো চোর নেই, কোনো কৃপণ নেই, কেউ মদিরাসক্ত নয়, অগ্নিহোত্র করে না এমন কেউ নেই, কোনো মূর্খ নেই, পরদারগামী কোনো ব্যক্তিও নেই। তাহলে কুলটা নারী বা থাকবে কী করে'—এই হল কর্মযোগের মহিমা।

ভগবানের জন্মের দিব্যতা—(শ্লোক ৫-৮)

বহূনি মে ব্যতীতানি জন্মানি তব চার্জুন।
তান্যহং বেদ সর্বাণি ন ত্বং বেত্থ পরন্তপ॥
অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোঽপি সন্।
প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া॥
যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥

(গীতা ৪।৫-৮)

'ভগবান বলছেন—হে অর্জুন ! আমার ও তোমার বহু জন্ম অতীত হয়েছে। আমি সেসব কথা জানি কিন্তু তুমি তা জান না।

আমি জন্মরহিত, অবিনশ্বর এবং সমস্ত প্রাণীকুলের ঈশ্বর হওয়া সত্ত্বেও নিজ প্রকৃতিকে অধীন করে যোগমায়া দ্বারা আবির্ভূত হই।

যখনই ধর্মের গ্লানি এবং অধর্মের উত্থান হয় তখনই আমি অবতার রূপে প্রকট হই।

সাধু অর্থাৎ ভক্তগণকে রক্ষা, দুষ্কৃতি অর্থাৎ পাপকর্মকারীদের বিনাশ এবং ধর্মকে যথাযথ সংস্থাপনের নিমিত্তই আমি যুগে যুগে অবতাররূপে আবির্ভূত হই।' (গীতা ৪।৫-৮)

পঞ্চম শ্লোকে ভগবান সকল প্রাণীর জন্মের নিত্যতা বলে তাঁর পূর্বান্তরীয় জন্মের স্মৃতির কথা বলেছেন। ভগবান ও তাঁর অংশ জীবাত্মা হচ্ছে অনাদি ও নিত্য, এই কথা ভগবান দ্বিতীয় অধ্যায়েও বলেছেন '**সর্বে বয়মতঃ পরম্**' (গীতা ২।১২)। কিন্তু পূর্বজন্মের কথা জীব জানতে পারে না। কিছু কিছু ব্যক্তি কিছু সময়ের জন্য জাতিস্মর হয়ে পূর্বজন্মের কথা স্মরণ করতে পারেন, কিছু কিছু সাধক আবার সাধনা বলে সিদ্ধিলাভ করে (যুঞ্জান যোগী) নিজেদের বিগত কিছু জন্মের কথা জানতে পারেন, কিন্তু সমস্ত জন্মের নয়।

শিবকল্প ঋষি লোকনাথ ব্রহ্মচারীর জন্ম ১৭৩১ সালে ও তার প্রয়াণ হয়

১৮৯০ খ্রিস্টাব্দে। তার সুদীর্ঘ ১৬০ বছরের জীবনে তিনি পৃথিবীর বহুস্থানে তীর্থভ্রমণে গিয়েছেন ; এমনকি মক্কা, মদিনা, প্যালেস্টাইন পর্যন্তও ভ্রমণ করেছেন। মদিনার পথে মরুভূমির মধ্যে তিনি আবদুল গফফুর নামে এক মহাযোগী সাধুর (ফকির) দর্শন পান। সেই সাধুর বয়স তখন ৪০০ বৎসর। বয়সে প্রবীণ ও উচ্চ আধ্যাত্মিক জ্ঞানসম্পন্ন সেই ফকির লোকনাথ ব্রহ্মচারীর উচ্চাবস্থা দেখে অত্যন্ত প্রীত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন তোমার কয় জন্ম। লোকনাথ বাবা আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বললেন 'দুই' অর্থাৎ লোকনাথ বাবার গত জন্মের কথা মনে আছে। সেই ফকির আঙুল দিয়ে দেখালেন তিন অর্থাৎ সেই মহাসাধুর মনে আছে গত দুই জন্মের কথা।

ভগবান কিন্তু যুক্তযোগী।

বেদাহং সমতীতানি বর্তমানানি চার্জুন।

ভবিষ্যাণি চ ভূতানি মাং তু বেদ ন কশ্চন॥ (গীতা ৭।২৬)

ভগবান বিগত, বর্তমান ও ভবিষ্যতে যারা জন্মগ্রহণ করবে সবাইকে জানেন কিন্তু শ্রদ্ধা-ভক্তিশূন্য হওয়ায় অজ্ঞানতাবশত তাঁকে কেউ জানতে পারে না। পুনর্জন্মের বৃত্তান্ত মানুষের স্মরণে না থাকার প্রধান কারণ প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে যে, মানুষের জীবনে বিনাশশীল বস্তুর প্রতি মমতা ও আকর্ষণ। এর ফলে মানব জীবনে জ্ঞানের আবির্ভাব ঘটে না ও পুনর্জন্মের কথাও স্মরণে আসে না। অর্জুনেরও কামনা ছিল, তিনি বলেছেন **'যেষামর্থে কাঙ্ক্ষিতং নো রাজং ভোগাঃ সুখানি চ'** (গীতা ১।৩৩) অর্থাৎ যাদের জন্য আমাদের রাজ্য, ভোগ ও সুখের আকাঙ্ক্ষা তারাই এখানে যুদ্ধে সমাগত। শাস্ত্রে বাসনা ত্যাগের অনেক মহত্তের কথা বলা হয়েছে। সাংসারিক বস্তুতে মমত্ববোধ ও আসক্তিপূর্ণ কামনা না থাকাই হচ্ছে 'অপরিগ্রহ'।

পাতঞ্জল যোগশাস্ত্রে বলা হয়েছে—

'অপরিগ্রহস্থৈর্যে জন্মকথন্তাসংবোধঃ' (পা. যো. ২।৩৯)

অর্থাৎ অপরিগ্রহ দৃঢ় হলে পূর্বজন্মের জ্ঞান হয়।

ভগবানের পূর্বজন্মের কথা মনে থাকার কারণ কিন্তু ভিন্ন। তিনি

নিত্যযোগী এবং মায়াধীশ তাই প্রকৃতিকে অধীনস্ত করেই তিনি আবির্ভূত হন।

ষষ্ঠ শ্লোকে ভগবান অবতারকালে তাঁর বিভূতির কথা বলেছেন। অবতারকালে ভগবানের ঐশ্বর্য ও মাধুর্য দুই শক্তিই প্রকটিত হয়। কিন্তু যখন একটি প্রকাশিত হয় তখন অন্যটি সুপ্ত থাকে।

ঐশ্বর্যজ্ঞান প্রাধান্যে সঙ্কুচিত প্রীতি।
দেখিলে না মানে ঐশ্বর্য কেবলার রীতি॥
কেবলা শুদ্ধপ্রেম ভক্ত ঐশ্বর্য না জানে।
ঐশ্বর্য দেখিলে নিজ সম্বন্ধ না মানে॥ (চৈ. চ. ম. লীলা ১৯)

যেমন ব্রহ্মমোহনে ভগবানের মাধুর্যশক্তি দমিত হয়ে ঐশ্বর্যভাব প্রকাশ পেয়েছে, আর নরসিংহ অবতারে প্রহ্লাদের দর্শনে হিরণ্যকশিপুর ওপর স্থিত ঐশ্বর্যভাব দমিত হয়ে প্রহ্লাদের ওপর মাধুর্যভাব প্রকাশ পেয়েছে।

আবার ভগবানের সৌন্দর্যশক্তিও অসাধারণ, যাতে সমস্ত প্রাণীকুলও আকৃষ্ট হয়।

ভগবান যখন শ্রীবৃন্দাবন থেকে মথুরায় গেলেন তখন মথুরাবাসী রমণীগণ বলছেন—

গোপ্যস্তপঃ কিমচরন্ যদমুষ্য রূপং।
লাবণ্যসারমসমোর্ধ্বমনন্যসিদ্ধম্ ॥ (ভাগবত ১০।৪৪।১৪)

'গোপীরা কী এমন তপস্যা করেছিল যে তারা সর্বদা দুচক্ষুভরে তাঁর এই অপরূপ রূপমাধুরী পান করতেন।'

তাঁর দর্শনে কংসের সভায় মঞ্চস্থিত রাজপুরুষগণও তাদের চিত্ত হারিয়ে ফেলেন—

পিবন্ত ইব চক্ষুর্ভ্যাং লিহন্তং ইব জিহ্বয়া।
জিঘ্রন্ত ইব নাসাভ্যাং শ্লিষ্যন্ত ইব বাহুভিঃ॥ (ভাগবত ১০।৪৩।২১)

'চক্ষু দ্বারা যেন তাঁর রূপ পান করছিলেন, জিহ্বা দ্বারা রূপ লেহন করছিলেন, নাসিকা দ্বারা শরীরের গন্ধ শুকছিলেন এবং যেন বাহু দ্বারা তাঁর শরীর আকর্ষণ করে নিজ হৃদয়ে মিশিয়ে দিতে চাইছিলেন।'

ভাগবতের তৃতীয় অধ্যায়ের (৩।২।১২) বিদুরের প্রতি উদ্ধবের বাক্য উদ্ধৃত করে মহাপ্রভু রূপ গোস্বামীকে বলছেন—

কৃষ্ণের মধুর রূপ শুন সনাতন
যে রূপের এক কণ ডুবায় সর্ব ত্রিভুবন।
সর্বপ্রাণী করে আকর্ষণ॥ (চৈ. চ. ম. ম. ২১ অ)

ভগবান তাঁর অনন্ত ঐশ্বর্য, মাধুর্য, রূপ নিয়ে যখন অবতার গ্রহণ করেন তখন প্রকৃতি তো তাঁর বশে থাকেই (প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায়) স্বয়ং যোগমায়াও তার লীলায় সহায়তা করেন। রাসলীলা কালে—

ভগবানপি তা রাত্রিঃ শরদোৎফুল্লমল্লিকাঃ।
বীক্ষ্য রন্তুং মনশ্চক্রে যোগমায়ামুপাশ্রিতঃ॥ (ভাগবত ১০।২৯।১)

'সেই শরৎ পূর্ণিমার রাত্রে ভগবান তাঁর অন্তরঙ্গশক্তি যোগমায়ার সাহায্যে রাসলীলা করতে মনস্থ করলেন।'

সপ্তম ও অষ্টম শ্লোকে ভগবান তাঁর অবতাররূপে প্রকট হওয়ার কারণ বলেছেন। ভগবানের অবতার গ্রহণের অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গ কারণ আছে।

বহিরঙ্গ কারণ— ভগবান বলেছেন তাঁর অবতার ধারণ করার কারণ হল—**'ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে'** (গীতা ৪।৮) অর্থাৎ তাঁর আবির্ভাব তখনই হয় যখন সংসারে ধর্মের গ্লানি সৃষ্টি হয় এবং অধর্ম বৃদ্ধি পায়, যা মূলত বিনাশশীল বস্তু বা ব্যক্তির প্রতি মানুষের আকর্ষণের জন্য হয়। ধর্মের গ্লানি হলে মানুষের কর্মে সকামভাব প্রবল হয় আর অধর্ম বেশি বৃদ্ধি পেলে মানুষ কর্তব্যচ্যুত হয়ে নিষিদ্ধ আচরণ করে। কামনা থেকেই এই সকল অধর্ম, পাপ, অন্যায় ইত্যাদি উদ্ভূত হয়—

কাম এষ ক্রোধ এষ রজোগুণসমুদ্ভবঃ।
মহাশনো মহাপাপ্মা বিদ্ধ্যেনমিহ বৈরিণম্॥ (গীতা ৩।৩৭)

সুতরাং এই কাম নাশ করার জন্য এবং নিষ্কামভাবের প্রসারের জন্যই ভগবান অবতীর্ণ হন।

পরবর্তী শ্লোকে ভগবান তার অবতার গ্রহণ কালের কার্য বর্ণনা করেছেন। অবতাররূপে ভগবান সাধুদের পরিত্রাণ ও দুষ্কৃতিদের বিনাশ

করে পুনরায় ধর্ম সংস্থাপন করেন।

সাধু—সাধু কাকে বলে—**'সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্ব্যবসিতো হি সঃ'** (গীতা ৯।৩০)

যে অনন্যচিত্তে আমার ভজনা করে, সেই সাধু। তিনি ভগবানের নাম, রূপ, গুণ, প্রভাব, লীলা ইত্যাদি শ্রদ্ধাপূর্বক স্মরণ কীর্তন করেন এবং লোক সাধারণে প্রেমভক্তি প্রচার করেন। তাঁদের স্বভাবই হল অপরের মঙ্গল করা। সাধুব্যক্তির দ্বারাই ধর্মের প্রসার হয়। ব্রহ্মা প্রজা সৃষ্টি করে সৃষ্টির শুরুতেই বলেছেন—

সহযজ্ঞাঃ প্রজাঃ সৃষ্ট্বা পুরোবাচ প্রজাপতিঃ।
অনেন প্রসবিষ্যধ্বম্ এষ বোঽস্ত্বিষ্টকামধুক্‌॥ (গীতা ৩।১০)

'তোমরা এই যজ্ঞদ্বারাই বর্ধিত হও এবং যজ্ঞই তোমাদের অভিষ্ট ফল প্রদান করবে'—এই যজ্ঞ হল নিষ্কাম কর্ম, ইহাই হল ধর্ম।

সাধু ব্যক্তি জাগতিক পদার্থ অর্থাৎ শরীর, ধন-সম্পত্তি, মান-সম্মান ইত্যাদির প্রতি আকর্ষিত হন না, তাঁর সাধুত্ব তাঁর ভাবের জন্য। ভগবান সাধু ব্যক্তিগণের পরিত্রাণ করেন মানে তাঁদের জাগতিক সুখ বৃদ্ধি করেন তা নয়, তিনি তাঁদের ভাবকে রক্ষা করেন। আমরা ভাবি পুণ্যবান বা ভক্তর এত বিপদ কেন ? এটা আমাদের দৃষ্টিতে হয়, কারণ আমাদের ধারণা সাংসারিক বস্তুর অপ্রাচুর্যই দুঃখের কারণ। কিন্তু ভক্ত প্রতিকূল (জাগতিক দুঃখদায়ক) অবস্থাতে বিশেষভাবে প্রসন্ন হন, কেননা প্রতিকূল অবস্থা আধ্যাত্মিক উন্নতিতে যত সহায়ক হয় অনুকূল অবস্থা তত নয়। জাগতিক প্রাচুর্ব এবং তাতে অনুরাগ ও আসক্তিই হল পতনের কারণ যা প্রতিকূল অবস্থায় দূর হয়। ভগবানের ভক্তকে পরিত্রাণের অর্থ তার সাংসারিক প্রতিকূলতা দূর করে জাগতিক প্রাচুর্য দান করা নয়, তার ভক্তিভাব প্রচারে বাধা দূর করা।

দুষ্কৃতি—যে ব্যক্তি কামনার অতিবৃদ্ধির ফলে মিথ্যা, কপটাচার, ছল ইত্যাদিতে পূর্ণ ; যে নিরাপরাধ, সদগুণী, সদাচারী সাধুদের ওপর অত্যাচার করে, প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তির মাত্রা জানে না এবং যার বেদাদি শাস্ত্র ও ধর্মের বিরোধিতা করাই স্বভাব সেই হল দুষ্কৃতি। এদের দ্বারাই অধর্মের প্রচার ও

ধর্মের হানি হয়। তাই ভগবান অবতার রূপে জন্মগ্রহণ করে এদের বিনাশ করেন, কারণ তিনি '**ধর্মস্য প্রভুরচ্যুতঃ**' (মহাভারত, অ.প.)।

সাধু-মহাত্মাগণ ধর্ম সংস্থাপন করলেও দুষ্টের বিনাশ করেন না যা ভগবান নিজেই করে থাকেন। যেমন সাধারণভাবে ওষুধ দেওয়া, ব্যান্ডেজ করা বা ইঞ্জেকসন দেওয়া কম্পাউন্ডার বা নার্সরাই করে থাকে কিন্তু বড় বড় অপারেশন শল্যচিকিৎসকই করেন, আর কেউ নয়। তবে ভগবান কোনো জীবের প্রতিই দ্বেষভাব রাখেন না। ঈশ্বর প্রদত্ত অন্ন, জল, বায়ু, সূর্য যদি সাধু-দুষ্কৃতি নির্বিশেষে সকলের সমভাবে প্রয়োজন পূরণ করতে পারে, তাহলে ভগবানের উদারতা ও সমতা সম্বন্ধে বিশেষ আর কী বলা যাবে !

ভগবান '**সমোঽহং সর্বভূতেষু**' (গীতা ৯।২৯)। অর্থাৎ ভক্তদের পরিত্রাণ করায় ভগবানের যত কৃপা থাকে, তত কৃপাই তাঁর থাকে দুষ্কৃতিদের বিনাশ করায়। বিনাশ দ্বারা ভগবান তাদের শুদ্ধ ও পবিত্র করে তোলেন।

যে যে হতাশ্চক্রধরেণ রাজং স্ত্রৈলোক্যনাথেন জনার্দনেন।
তে তে গতা বিষ্ণুপুরীং প্রয়াতাঃ ক্রোধোঽপি দেবস্য বরেণ তুল্যঃ॥

(পাণ্ডবগীতা)

'ত্রৈলোক্যাধিপতি ভগবান জনার্দন দ্বারা যারা নিহত হয়েছে তারা সকলেই বিষ্ণুলোকে গমন করে। ভগবানের ক্রোধও বরদানের ন্যায় কল্যাণপ্রদ।'

আর ভগবানের অবতার 'ধর্মসংস্থাপন' অর্থাৎ নতুন ধর্ম প্রচার করতে নয়, ধর্মের প্রভাব ক্ষীণ হলে তাকে ভালোভাবে প্রতিষ্ঠা করতে। ভগবান অর্জুনকে বলছেন '**স এবায়ং ময়া তেঽদ্য যোগঃ প্রোক্তঃ পুরাতনঃ**' (গীতা ৪।৩) অর্থাৎ আমি তোমাকে সেই পুরাতন যোগই বলব আর এই সনাতন ধর্ম প্রতিষ্ঠার জন্য যুগে যুগে যেমন যেমন প্রয়োজন হয় ভগবান তেমন তেমন অবতাররূপ গ্রহণ করেন। ভগবানের এই অবতার কখনো বা কারক-পুরুষরূপেও হয়ে থাকে।

কারক-পুরুষ হচ্ছেন তিনি যিনি ভগবানকে প্রাপ্ত হয়েছেন আর ভগবৎধামে অবস্থান করেন কিন্তু ভগবৎকার্যের নিমিত্তই মনুষ্যরূপে

জন্মগ্রহণ করেন।

অন্তরঙ্গ কারণ—জগতে ভক্ত ও দুষ্কৃতি ছাড়াও প্রেমিক ভক্তও আছেন যাঁরা ভগবানের সঙ্গে ক্রীড়া করতে চান, তাঁর লীলা আস্বাদন করতে চান। ভগবানের অবতাররূপে আবির্ভাবের মূল কারণ হচ্ছে এই একান্তি ভক্তর সঙ্গে মিলন। কেননা ভগবান বলছেন—

মুহূর্তেনাপি সম্বহর্তুম্ হতবান দানবান বলান্
মন্তানাং বিনোদার্থ করোমি বিবিধা ক্রিয়া॥ (পদ্মপুরাণ)

অসুর নিধন উপলক্ষ মাত্র, তা মুহূর্তের ইচ্ছাতেই সম্ভব, কিন্তু ভগবানের অবতার গ্রহণ ভক্তদের সঙ্গে লীলার জন্যই হয়ে থাকে।

রাসলীলাতেও শুকদেব বলছেন—

অনুগ্রহায় ভক্তানাং মানুষং দেহমাস্থিতঃ।
ভজতে তাদৃশীঃ ক্রীড়া যাঃ শ্রুত্বা তৎপরো ভবেৎ॥ (ভাগবত ১০।৩৩।৩৭)

ভগবানের অবতার ভক্তানুগ্রহর জন্যই। তাঁর মানুষী তনুর সব লীলা ভক্তদের তাঁর দিকে আকর্ষিত করার জন্য।

মানুষের জন্ম ও ভগবানের অবতার-এর পার্থক্য—

জানার পার্থক্য—মানুষের ও ভগবানের অনেকবার জন্ম হলেও পূর্ব পূর্ব জন্মের কথা মানুষ জানে না কিন্তু ভগবান সবই জানেন।

জন্মে পার্থক্য—মানুষ জন্মগ্রহণ করে প্রকৃতির বশ হয়ে নিজ নিজ কৃত কর্মফল ভোগ ও ভোগান্তে পরমাত্মা প্রাপ্তির জন্য। কিন্তু ভগবান প্রকৃতিকে অধীনস্ত করে যোগমায়ার সাহায্যে স্বয়ং প্রকটিত হন।

কর্মে পার্থক্য—মানুষ বা সকল জীব নিজ কামনা পূরণ ও কর্মফল ভোগের জন্য জন্মগ্রহণ করে। ভগবান কেবলমাত্র জীবের কল্যাণের নিমিত্ত জন্মগ্রহণ করেন।

ভগবানের কর্মের দিব্যতা—(শ্লোক ৯-১১, ১৩-১৪)

অর্জুন ভগবানের জন্ম সম্বন্ধে প্রশ্ন করেছেন, কিন্তু ভগবান তাঁর দিব্য-জন্মর কথা বলে পরবর্তী ৪টি শ্লোকে তাঁর কর্মের দিব্যতা সম্বন্ধেও বলেছেন।

জন্ম কর্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ।
ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি সোঽর্জুন॥
বীতরাগভয়ক্রোধা মন্ময়া মামুপাশ্রিতাঃ।
বহবো জ্ঞানতপসা পূতা মদ্ভাবমাগতাঃ॥
যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।
মম বর্ত্মানুবর্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্বশঃ॥

(গীতা ৪।৯-১১)

চাতুর্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্মবিভাগশঃ।
তস্য কর্তারমপি মাং বিদ্ধ্যকর্তারমব্যয়ম্॥
ন মাং কর্মাণি লিম্পন্তি ন মে কর্মফলে স্পৃহা।
ইতি মাং যোঽভিজানাতি কর্মভির্ন স বধ্যতে॥

(গীতা ৪।১৩-১৪)

'আমার জন্ম ও কর্ম সবই দিব্য। যে এইভাবে আমাকে (অর্থাৎ আমার জন্ম ও কর্মর দিব্যতা) তত্ত্বত জানে (উপলব্ধি করে) বা দৃঢ়রূপে বিশ্বাস করে, সে আমাকেই প্রাপ্ত হয়ে আর পুনর্জন্ম গ্রহণ করে না।

আসক্তি, ভয় ও ক্রোধবর্জিত হয়ে তদ্‌গতচিত্তে আমার শরণাপন্ন হয়ে এবং জ্ঞানরূপ তপস্যা দ্বারা পবিত্র হয়ে অনেক ভক্তই আমার স্বরূপ প্রাপ্ত হয়েছেন।

যে ভক্ত যে-ভাবে আমার শরণাগত হয়, আমি তাকে সেইভাবে আশ্রয় দান করি। ভক্তর তাই আমার পথই অনুসরণ করা উচিত।' (গীতা ৪।৯-১১)

'গুণ ও কর্মর বিভাগ অনুসারে চার বর্ণ সৃষ্টি হয়েছে। ভগবান এই সৃষ্টির কর্তা হলেও তিনি অব্যয় ও অকর্তা।

কর্মফলের প্রতি তাঁর না আছে আসক্তি না তিনি এতে লিপ্ত হন। যে এইভাব উপলব্ধি করে, সেও কর্মবন্ধন থেকে মুক্ত হয়।' (গীতা ৪।১৩-১৪)

মানুষের কর্মে দিব্যতা—নবম ও দশম শ্লোকে ভগবান তাঁর জন্ম ও কর্মে

দিব্যতার অনুকরণে মনুষ্যের মধ্যে দিব্যতার বিকাশের কথা বলেছেন। ভগবানের লীলা কাহিনী শোনা, পড়া, স্মরণ করা ইত্যাদিতে মানুষের মন পবিত্র হয়ে ওঠে এবং তাদের অজ্ঞানতা দূর হয়ে যায়। এই হল ভগবানের অনুকরণে মানুষের দিব্যভাব। ভগবানের অবতার গ্রহণ যেমন স্বাভাবিকভাবে জীবের কল্যাণের জন্য হয় ও তাঁর কর্মে নির্লিপ্ততাও থাকে, সেইরকম ভগবানের লীলা পড়ে বা শুনে মানুষের মধ্যেও সকল জীবের প্রতি হিত চিন্তা এবং কর্মে নির্লিপ্ততার ভাব জাগরূক হয় এবং তাই হল ভগবানের জন্ম ও কর্মর তত্ত্ব জানা। আর ভগবানের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপিত হলে, জগৎ সংসারের সঙ্গে সম্পর্ক দূর হয়ে যায় এবং মানুষ জন্ম-মৃত্যু বন্ধন থেকে মুক্ত হয়।

ভগবান জগৎ হিতার্থে যেমন রূপ ধারণ করেন, তদনুযায়ী লীলা করেন।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ উতঙ্ক ঋষিকে বলছেন—

ধর্মসংরক্ষনার্থায় ধর্মসংস্থাপনায় চ।

তৈস্তৈর্বেষৈশ্চ রূপৈশ্চ ত্রিষু লোকেষু ভার্গব।। (মহাভারত, অ. প. ৫৪।১৩-১৪)

'ধর্মসংস্থাপন ও ধর্মরক্ষার জন্য যখন যখন যে যোনিতে আমি জন্মগ্রহণ করি, সেই সেই রূপ ও আকৃতি অনুসারে ব্যবহার করে থাকি।'

ভগবান একাদশ শ্লোকে তাঁর শরণাগত ভক্ত সম্পর্কে বলেছেন যে তিনি মনুষ্যকে তাঁর দিকে আকৃষ্ট করার জন্য লীলা করলেও যে ভক্ত যেভাবে তাঁর শরণাগত হয়, তিনি তাকে সেইভাবেই আশ্রয়দান করেন। অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের প্রভু ভগবান, তাঁর সৃষ্ট সাধারণ মানুষের ভাব অনুযায়ী ব্যবহার করেন, কী মহান তাঁর ঔদার্য, দয়া ও সমপ্রাণতা।

যদিও এখানে '**প্রপদ্যন্তে**' অর্থাৎ শরণাগত ভক্তর সম্বন্ধে বলা হয়েছে তবে ভগবান প্রাণীমাত্রেরই সুহৃদ (**সুহৃদং সর্বভূতানাং**— গীতা ৫।২৯)। তাই যারা হিংসা-দ্বেষ দ্বারাও তাঁর সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপন করে তাদেরও কল্যাণই হয়।

তাই যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক নিহত দুষ্ট শিশুপালের

শরীর থেকে নির্গত তেজ ভগবানে প্রবেশ করায় বিস্মিত হয়ে যুধিষ্ঠির নারদকে এ বিষয়ে প্রশ্ন করলে, নারদ বলছেন—

কামাদ্ দ্বেষাদ্ ভয়াৎ স্নেহাদ্ যথা ভক্ত্যেশ্বরে মনঃ।

আবেশ্য তদঘং হিত্বা বহবস্তদ্ গতিং গতাঃ॥ (ভাগবত ৭।১।২৯)

যে ব্যক্তি, কাম, হিংসা, ভয় ও স্নেহ দ্বারা ভগবানে মন নিয়োজিত করে তারও সমস্ত পাপ বিধৌত হয়। ভক্ত যেমন ভক্তি দ্বারা ভগবানকে লাভ করে, ভগবানের প্রতি দ্বেষভাব রাখলে সেও তেমনভাবেই ভগবানকে লাভ করে।

তাই মূলকথা হল ভগবানের সঙ্গে যে কোনোভাবে হোক সম্পর্ক রাখতে হবে। তবে বৈশাখ মাসে বা মাঘমাসে গঙ্গাস্নানের একই মাহাত্ম্য হলেও, বৈশাখের স্নানে যেরকম প্রসন্নতা আসে, সেরকম প্রসন্নতা মাঘমাসের স্নানে আসে না। সেইরকম ভক্তি ও প্রেম সহকারে ভগবানের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনে যে রকম আনন্দ লাভ হয়, হিংসা ও শত্রুতাপূর্বক সম্পর্ক স্থাপনে সেইরূপ হয় না। তবে ভগবান সব ভাবই গ্রহণ করেন। অর্জুনের ভগবানের প্রতি সখ্যভাব ছিল। তিনি তাঁকে সারথীরূপে চেয়েছিলেন তাই ভগবান তাঁর সারথী হলেন। ঋষি বিশ্বামিত্র ব্রহ্মজ্ঞ, তিনি ভগবানকে শিষ্যরূপে মনে করতেন, তাই রাম অবতারে ভগবান তাঁর শিষ্য হলেন। যশোদা, অনসূয়া তাঁকে পুত্ররূপে চেয়েছিলেন তাই ভগবান, শ্রীকৃষ্ণও দত্তাত্রেয়রূপে তাঁদের পুত্র হলেন।

ভগবানের সঙ্গে ভক্তরূপে সম্পর্ক স্থাপনের ফলে এই শিক্ষা নিতে হয় যে ভগবানের মতনই সাধকদেরও যে যেমন চায় তার সঙ্গে সেইভাবে সম্পর্ক স্থাপন করতে হবে কিন্তু পরিবর্তে কিছু আশা করা চলবে না, নির্লিপ্ত থাকতে হবে। সুপুত্র হওয়া, সুযোগ্য স্বামী হওয়া, শ্রেষ্ঠ ভ্রাতা হওয়া, অত্যুত্তম কর্মী হওয়া—এই হবে মানুষের জীবনের লক্ষ্য এবং তা হতে হবে নিরলসভাবে ও আশা না করে।

ভগবান তাই বলেছেন **'মম বর্ত্মানুবর্তন্তে'** অর্থাৎ ভক্তরা আমার পথ (বর্ত্ম) অনুসরণ করবেন। অভিমানরহিত হয়ে, নিঃস্বার্থভাবে অন্যের সেবা করলে ভগবানের পথ অনুসরণ করা হয় এবং অন্যের প্রতি মমতা

শীঘ্রই ভগবানের প্রতি প্রেমে রূপান্তরিত হয়। এই অহংকার ত্যাগ ও নিঃস্বার্থ ভাবই ভগবানের প্রতি ভক্তর শরণাগতির দোর খুলে দেয়। ভগবানের প্রতি দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মাধুর্য ভাবের কোনোটিই পরিপক্কতা পায় না যদি না শরণাগতির ভাব আসে। আর ভগবৎপ্রেম কোনো কর্মজনিত (সাধনা-জনিত) ফল নয়, ভগবানে শরণাগতি হলে প্রেম স্বতঃই উদ্ভূত হয়।

পূর্ববর্তী শ্লোকে ভগবান তাঁর দিব্য ভাব প্রাপ্ত হওয়ার সাধন সম্বন্ধেও বলেছেন যে সাধক হবেন বীতরাগ, ভয় ও ক্রোধবর্জিত এবং তাঁর জগৎ হবে ভগবৎময় অর্থাৎ তিনি হবেন পূর্ণ শরণাগত। গোপীগীতায় শ্রীশুকদেব বলছেন—

গতিস্মিতপ্রেক্ষণভাষণাদিষু প্রিয়াঃ প্রিয়স্য প্রতিরূঢ়মূর্তয়ঃ।

(ভাগবত ১০।৩০।৩)

নিজের প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণের চালচলন, হাস্যবিহাস ইত্যাদি অনুকরণের ফলে শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় গোপিনীগণ তাঁরই মতো হয়ে গিয়েছিলেন।

কেউ কেউ আবার 'জ্ঞান তপস্যা' অর্থাৎ ভগবানের দিব্যজন্ম ও দিব্যকর্ম মেনে অর্থাৎ ভগবানের এই ভাব যথা নির্লিপ্ততা জীবনে প্রতিফলিত করে ভগবানকে লাভ করেন।

প্রসঙ্গ শেষে ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ শ্লোকে ভগবান তাঁর এই সৃষ্টিকর্মেও দিব্যতার কথা বলেছেন। এই সৃষ্টি চতুর্বর্ণময় এবং তা হয় ঋত বা জগতের সৃষ্টির নিয়মানুসারে।

মানুষের মধ্যে যেমন ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র হয় কর্মফলজনিত গুণের প্রাধান্য অনুসারে, সেইরকম পাখিদের বিভাগ অনুসারে পায়রা, বাজ, চিল, কাক প্রভৃতি এবং বৃক্ষাদির মধ্যে অশ্বত্থ, নিম, তেঁতুল, বাবলা ইত্যাদিও গুণ অনুসারে হয়। দেবতা, পিতৃগণ ইহাদের এবং তদনুরূপ সমগ্র সৃষ্টির বিভাগও গুণানুসারে হয়।

ভগবান সৃষ্টিকর্তা হলেও তিনি 'অব্যয়' অর্থাৎ তাঁর কিছুই ব্যয় হয় না, তিনি একইরকম থাকেন, তিনি 'অকর্তা' অর্থাৎ তাঁর '**কর্তৃত্বাভিমান**' থাকে না, তাঁর '**ন মে কর্মফলে স্পৃহা**' অর্থাৎ '**ভোক্তৃত্বাভিমান**'ও থাকে না। এর

ফলে ভগবান **'ন মাং কর্মাণি লিম্পন্তি'** অর্থাৎ কোনো কর্মে আসক্ত হন না, তাঁর কর্মে বিষমভাব, পক্ষপাতিত্ব ইত্যাদিও থাকে না। ভগবান তাই বলেছেন সাধকদেরও অবশ্যই এই দুটি থেকে মুক্ত হতে হবে। সাধক যদি ফলেচ্ছা ত্যাগ করে শুধু অন্যের হিতার্থে কর্ম করে এবং তাঁর মধ্যে 'কর্তৃত্ব' ও 'ভোক্তৃত্ব' উভয়ই না থাকে তবে তাঁর স্বতঃসিদ্ধ মুক্তি হয়।

গীতায় কর্ম, ক্রিয়া ও লীলার পার্থক্য নিম্নরূপ—

কর্ম—যে কাজ কর্তৃত্বাভিমান নিয়ে এবং ফলের আশায় করা হয় তা হল কর্ম। সংসারে আবদ্ধ জীবসমুদায় এই ভাবনায় ভাবিত হয়ে কর্ম করে।

ক্রিয়া—যে কাজ কর্তৃত্বাভিমান ও ফলেচ্ছা ত্যাগপূর্বক করা হয়, সেগুলিকে বলা হয় ক্রিয়া। মুক্তপুরুষ দ্বারা ক্রিয়াই সংঘটিত হয় তাই তাঁদের মধ্যে ভগবৎসত্তা প্রকাশ পায়।

লীলা—যে কাজে কর্তৃত্বাভিমান ও ফলেচ্ছা তো থাকেই না উপরন্তু যা দিব্য এবং সর্বভূতের হিতের জন্য করা হয় তা হল লীলা। ভগবানের সকল কার্যই লীলা—**'লোকবত্তু লীলাকৈবল্যম্'** (ব্রহ্মসূত্র ২।১।৩৩)। তাঁর কার্য সাধারণ সাংসারিক জীবের ন্যায় মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে তা লীলাই।

দণ্ডী রাজার উপাখ্যান—দণ্ডীরাজার একটি ঘোড়া ছিল। ঘোড়াটি দিনের বেলায় ঘোটকী ও রাত্রে সুন্দরী স্ত্রীলোক হয়ে যেত। ঘোটকীটি রাজার খুব প্রিয় ছিল। লোকের মুখে এই কথা শুনে শ্রীকৃষ্ণ দণ্ডীরাজাকে এই ঘোড়াটি তাঁর কাছে পাঠিয়ে দিতে বললেন। এইরূপ আদেশে দণ্ডীরাজা খুব অপমানিত বোধ করলেন এবং ঘোড়াটি শ্রীকৃষ্ণকে দিতে অস্বীকার করলেন। তখন শ্রীকৃষ্ণ রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলেন। দণ্ডীরাজা প্রাণভয়ে সুভদ্রার শরণ নিলেন। পরে ভীম, যুধিষ্ঠির এবং ক্রমে ইন্দ্র, মহাদেবাদি সব দেবতাই দণ্ডীরাজার পক্ষে সহায়তার জন্য প্রস্তুত হলেন। সব দেবতাই শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে যুদ্ধ করতে সমবেত হলে জগৎ-সংসার, দেবতা আদি সকলেই চিন্তিত হলেন। কিন্তু এমন সময় অষ্টবজ্র[১] সম্মিলনের ফলে রাজার

[১]অষ্টবজ্র—বিষ্ণুর সুদর্শন, শিবের ত্রিশূল, বরুণের পাশ, ব্রহ্মার অক্ষ, যমের দণ্ড, ইন্দ্রের কুলিশ, কার্তিকের শক্তি এবং দুর্গার অসি।

ঘোড়া উর্বশী হয়ে স্বর্গে চলে গেলেন।

উর্বশী শাপভ্রষ্ট হয়ে এতদিন ঘোড়া হয়েছিলেন। কথা ছিল অষ্টবজ্র সম্মিলন হলে তাঁর মুক্তি হবে। উর্বশীর শাপমুক্তির সময় হয়ে এসেছিল, তাই শ্রীকৃষ্ণ অষ্টবজ্র সম্মিলনীর জন্য এই চতুরতা করেছিলেন। আগে জানা থাকলে অষ্টবজ্রসকল এইভাবে সম্মিলিত হত না আর উর্বশী উদ্ধারের খেলাও জমত না। জগতের যাবতীয় ঘটনা ও বৈচিত্র্য শুধু উর্বশী উদ্ধারের জন্য অর্থাৎ আমাদের ভগবানের দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য।

এ সমস্তই একটা খেলা চলছে। সমুদ্র থেকে মেঘ হয়। মেঘ বিচিত্র বর্ণ ও আকার ধারণ করে। সেই বৈচিত্র্য সত্ত্বেও সেই মেঘ থেকে বৃষ্টি হয় এবং বৃষ্টিরূপের সেই জল সমুদ্রে মেশে। যেখান থেকে উৎপত্তি সেখানেই লয়। মাঝখানে একটা খেলা হয়ে গেল।

আমরা আসক্ত বলে এবং সমস্ত জিনিসে নিজের স্বার্থ ও সুখের দৃষ্টিতে দেখি বলে, ঈশ্বরের এই লীলা বৈচিত্র্যের অন্তরালে যে মহান উদ্দেশ্য আছে তা অনুভব করতে পারি না।

এই প্রকরণের শেষ শ্লোকে ভগবান অর্জুনকেও কর্মযোগে রত হতে বলেছেন—

এবং জ্ঞাত্বা কৃতং কর্ম পূর্বৈরপি মুমুক্ষুভিঃ।
কুরু কর্মৈব তস্মাৎ ত্বং পূর্বৈঃ পূর্বতরং কৃতম্॥ (গীতা ৪।১৫)

পূর্ববর্তী মুমুক্ষুগণও এই কর্মযোগের মহিমা জেনে কর্ম করতেন, তাই অর্জুন! তুমিও পূর্ব পূর্বকালে মনীষীদের মতো কর্মযোগে রত হও।'

শাস্ত্রে অনেক সময় বলা হয় মুমুক্ষা জাগ্রত হলে কর্ম স্বতঃই ত্যাগ করা উচিত, কারণ মনুষ্য তখন কর্ম ত্যাগ করে জ্ঞানের অধিকারী হয়।

ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণ-উদ্ধব সংবাদে শ্রীকৃষ্ণ বলছেন—

তাবৎ কর্মাণি কুর্বীত ন নির্বিদ্যেত যাবতা।
মৎ কথা শ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্ন জায়তে॥ (ভাগবত ১১।২০।৯)

'কর্ম ততক্ষণই করা উচিত, যতক্ষণ বৈরাগ্য উদয় না হয় অথবা আমার (ভগবানের) বাক্যাদি শ্রবণে শ্রদ্ধা না উৎপন্ন হয়।'

কিন্তু ভগবান গীতায় বলেছেন মুমুক্ষু ব্যক্তিরাও কর্মযোগের তত্ত্ব জেনে কর্ম করে থাকেন তাই মুমুক্ষত্ব জাগ্রত হলেও কর্তব্যকর্ম করে যাওয়া উচিত। ভগবান তৃতীয় অধ্যায়ে রাজা জনক (২০ শ্লোকে), চতুর্থ অধ্যায়ে বিবস্বান, মনু, ইক্ষ্বাকু (১-২ শ্লোকে) আদির কথা বলে অর্জুনকেও কর্মযোগে রত হতে বলেছেন। **কর্মযোগের তত্ত্ব হল—যোগস্থ (অনাসক্ত) হয়ে কর্ম করা ও কর্মরত থেকে যোগস্থ (অনাসক্ত) হয়ে যাওয়া।** কর্ম করা (প্রবৃত্তি) ও কর্ম না করা (নিবৃত্তি) এই দুটিই হল প্রবৃত্তি (কর্ম করা)। যোগস্থ হল এই দুয়ের ঊর্ধ্বে পূর্ণ নিবৃত্তি। জ্ঞানযোগে প্রথমে কর্তৃত্বাভিমান ত্যাগ হয়ে পরে ফলেচ্ছা ত্যাগ আর কর্মযোগে প্রথমে ফলেচ্ছা ত্যাগ পরে হয় কর্মাভিমান ত্যাগ। কর্তৃত্বাভিমান ও ফলেচ্ছা থাকলেই কর্ম বন্ধনকারক হয়। উভয় ত্যাগের সহজ পথ হল কর্মযোগ। আত্মভিমান ত্যাগ করে কর্ম শুরু করো ও ফলেচ্ছা ত্যাগ করে কর্ম শেষ কর।

জীবের কর্মে আসক্তি—(শ্লোক ১২)

লোকে দিব্যকর্মে আকৃষ্ট না হয়ে কেন কর্মফলে আসক্ত হয়। ভগবান তার কারণ বলছেন—

কাঙ্ক্ষন্তঃ কর্মণাং সিদ্ধিং যজন্ত ইহ দেবতাঃ।
ক্ষিপ্রং হি মানুষে লোকে সিদ্ধির্ভবতি কর্মজা॥

(গীতা৪।১২)

'কর্মে সিদ্ধি (ফল) পাওয়ার জন্য মানুষ দেবতাদের আরাধনা করে, কারণ মনুষ্যলোকে কর্ম হতে শিঘ্রই ফল পাওয়া যায়।' (গীতা ৪।১২)

মনুষ্যলোক হল কর্মভূমি—'**কর্মানুবন্ধীনি মনুষ্যলোকে**' (গীতা ১৫।২)। এই মনুষ্যলোক ছাড়া আর সকল লোকই (স্বর্গ-নরকাদি) হল ভোগভূমি। মনুষ্যজন্মের কৃত ফলই ইহলোক বা পরলোকে ভোগ করতে হয়। আবার মনুষ্যলোকেও নতুন কর্ম করার অধিকার কেবল মানুষেরই আছে, পশু-পক্ষী আদির নয়। এই মনুষ্যলোকে আসক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিরাই সংখ্যাধিক '**কর্মসঙ্গিষু জায়তে**' (গীতা ১৪।১৫)। কামনাসম্পন্ন ব্যক্তিদের লক্ষ্য শীঘ্রপ্রাপ্ত ফলের দিকে হওয়ায় তারা যেমন ফলের আশায় কর্ম করে

তেমনি ফলদাতা দেবতাদেরও আরাধনা করে। কিন্তু ভগবান পিতার মতো আর দেবতারা দোকানদারের মতো। দোকানদার যেমন অর্থ না দিলে দ্রব্য দেয় না তেমনি বিধিপূর্বক কর্ম করে কামনা করলে, তবেই ফলদাতা দেবতাগণ কর্মফল প্রদান করেন। কিন্তু ভগবান হচ্ছেন পিতার মতন, কর্মব্যতীতই অর্থগ্রহণ বা দ্রব্য প্রদানের অধিকার তাঁর আছে। ভগবান বিনামূল্যেই সব কিছু প্রদান করেন, আবার ক্ষতিকারক মনে হলে দ্রব্য ফেরতও নিয়ে নেন। যেমন পিতা শিশুর হাতে দেশলাই, ছুরি বা অর্থাদি মূল্যবান সামগ্রী দেখলে তা সরিয়ে রাখেন। আবার দেবতারা তাঁদের উপাসকদের, বিধিপূর্বক উপাসনা সম্পন্ন হলেই হিতাহিত জ্ঞানরহিত হয়ে আকাঙ্ক্ষিত ফল দান করেন। কিন্তু পরমপিতা ভগবান ভক্তদের, তাঁর ইচ্ছাতেই পরম মঙ্গলময় বস্তু দান করেন যা তাদের আপাত রমণীয় (প্রেয়) মনে না হলেও অন্তিমে পরম উপকারী (শ্রেয়) হয়।

আর কর্ম করলেই যে অল্পবিস্তর সিদ্ধিলাভ হয় তা মানুষ প্রত্যক্ষ করে। তাই মানুষ মনে করে জাগতিক পদার্থের ন্যায় ভগবদ্প্রাপ্তিও কর্ম (তপ, ধ্যান, সমাধি ইত্যাদি) দ্বারা লাভ করা যায়। কিন্তু ভগবান কর্মজনিত প্রাপ্তব্য নন, ভগবৎপ্রাপ্তিতে জাগতিক বস্তুর নিয়ম খাটে না। ভগবদ্প্রাপ্তির সাধন হল কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগ—ইহার কোনোটিই কর্মের উপর নির্ভরশীল নয়।

কর্মের বিভাগ—(শ্লোক ১৬-২২)

ভগবান পরবর্তী সাতটি শ্লোকে কর্মের তত্ত্ব ব্যাখ্যা করেছেন—

কিং কর্ম কিমকর্মেতি কবয়োঽপ্যত্র মোহিতাঃ।
তত্তে কর্ম প্রবক্ষ্যামি যজ্‌ জ্ঞাত্বা মোক্ষ্যসেঽশুভাৎ॥
কর্মণো হ্যপি বোদ্ধব্যং বোদ্ধব্যঞ্চ বিকর্মণঃ।
অকর্মণশ্চ বোদ্ধব্যং গহনা কর্মণো গতিঃ॥
কর্মণ্যকর্ম যঃ পশ্যেদকর্মণি চ কর্ম যঃ।
স বুদ্ধিমান্‌ মনুষ্যেষু স যুক্তঃ কৃৎস্নকর্মকৃৎ॥
যস্য সর্বে সমারম্ভাঃ কামসঙ্কল্পবর্জিতাঃ।

জ্ঞানাগ্নিদগ্ধকর্মাণং তমাহুঃ পণ্ডিতং বুধাঃ॥
ত্যক্ত্বা কর্মফলাসঙ্গং নিত্যতৃপ্তো নিরাশ্রয়ঃ।
কর্মণ্যভিপ্রবৃত্তোঽপি নৈব কিঞ্চিৎ করোতি সঃ॥
নিরাশীর্যতচিত্তাত্মা ত্যক্তসর্বপরিগ্রহঃ।
শারীরং কেবলং কর্ম কুর্বন্নাপ্নোতি কিল্বিষম্॥
যদৃচ্ছালাভসন্তুষ্টো দ্বন্দ্বাতীতো বিমৎসরঃ।
সমঃ সিদ্ধাবসিদ্ধৌ চ কৃত্বাপি ন নিবধ্যতে॥

(গীতা ৪।১৬-২২)

'*কর্ম কী ও অকর্ম কাকে বলে*—ইহা বিদ্বান ব্যক্তিদেরও মোহগ্রস্ত করে। তাই আমি এই কর্মতত্ত্ব তোমাকে সম্যক্‌রূপে জানাচ্ছি, যা জানলে তুমি এই সংসার বন্ধন (অশুভ) থেকে মুক্ত হতে পারবে।

কর্মের তত্ত্ব, অকর্মের তত্ত্ব এবং বিকর্মের তত্ত্বও জানা উচিত, কেননা কর্মর গতি (তত্ত্ব) অতি দুর্জ্ঞেয়।

যে ব্যক্তি কর্মে অকর্ম এবং অকর্মে কর্ম দেখেন, তিনিই বুদ্ধিমান, যোগী এবং সর্বকর্মকারী।

যাঁর সমস্ত কর্মই সঙ্কল্প ও কামনাবর্জিত, যাঁর জ্ঞানরূপ অগ্নিতে সমস্ত কর্ম (অর্থাৎ কর্মফলের আবদ্ধ করার ক্ষমতা) ভস্মীভূত হয়েছে, সেই ব্যক্তিকে জ্ঞানীগণও পণ্ডিত বলে থাকেন।

যিনি কর্মের আকাঙ্ক্ষা ও কর্মফলে আসক্তি—উভয় ত্যাগ করেন এবং কারোর আশ্রয় গ্রহণ না করেও তৃপ্ত থাকেন তিনি কর্মে প্রবৃত্ত থাকলেও বাস্তবে কিছুই করেন না।

যিনি শরীর ও অন্তঃকরণকে সম্পূর্ণভাবে বশীভূত করেছেন এবং সর্বপ্রকার ভোগোপকরণ বর্জন করেছেন, সেই আশাশূন্য কর্মযোগী কেবল শরীর সম্বন্ধীয় কর্ম করলেও পাপভাগী হন না।

যে কর্মযোগী ফলাকাঙ্ক্ষা ব্যতিরেকে যা পাওয়া যায় তাতেই সন্তুষ্ট থাকেন, যিনি ঈর্ষারহিত দ্বন্দ্বের অতীত এবং সিদ্ধি-অসিদ্ধিতে সম—তিনি কর্ম করলেও তাতে আবদ্ধ হন না।' (গীতা ৪।১৬-২২)

ভগবান প্রথম দুটি শ্লোক অর্থাৎ ষোলো ও সতেরোতম শ্লোকে কর্ম ও অকর্ম তত্ত্ব ব্যাখ্যা করেছেন। সাধারণ মানুষ তার দেহ ও ইন্দ্রিয়াদির দ্বারা সাধিত ক্রিয়াগুলিকে কর্ম বলে। কিন্তু গীতায় ভগবান বলেছেন—**'শরীর বাঙ্‌মনোভির্যৎ কর্ম প্রারভতে নরঃ'** (গীতা ১৮।১৫) অর্থাৎ দেহ, বাক্ ছাড়াও মনের দ্বারা যে সমস্ত ক্রিয়া সংঘটিত হয় সে সকলই কর্ম। কিন্তু কর্মের সংজ্ঞা নির্ধারিত হয় তার ভাব অনুসারে। দেবীর উপাসনা স্বরূপত সাত্ত্বিক কর্ম। কিন্তু ওই উপাসনা যদি কামনার জন্য হয় তবে তা রাজসিক কর্মে পরিণত হয় এবং এই উপাসনা যদি অপরের ক্ষতি বা নিধনের উদ্দেশ্যে হয় তবে তা হয় তামসিক কর্ম।

(কর্মের বিভাগ)—কর্ম, অকর্ম ও বিকর্ম

কর্ম—শাস্ত্রবিহিত কর্ম সকামভাবে করলে তা হয় 'কর্ম'।

অকর্ম—কর্মত্যাগই অকর্ম নয়। মোহবশত কর্মত্যাগ হল তামসিক ত্যাগ। শারীরিক ক্লেশের ভয়ে কর্মত্যাগ হল রাজসিক ত্যাগ। ফলেচ্ছা এবং আসক্তি ত্যাগ করে কর্ম করলে তা হয় সাত্ত্বিক ত্যাগ। আসক্তি ও ফলেচ্ছা ত্যাগ করে কর্ম করলে সেটির দ্বারা স্বতঃই অপরের হিতসাধন হয় এবং সেটিই হয় 'অকর্ম'।

বিকর্ম—শাস্ত্রাদি বিহিত কর্ম বাদে সকল কর্মই 'বিকর্ম'। আবার শাস্ত্রবিহিত কর্মও যদি অপরের ক্ষতি বা দুঃখ-কষ্ট দেওয়ার জন্য করা হয় তবে তাও 'বিকর্ম' হয়। নিষিদ্ধ কর্মমাত্রই হল বিকর্ম। কামনাই হল মূল। কামনার জন্যই কর্ম হতে থাকে এবং কামনা বিশেষ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হলে কর্ম 'বিকর্ম' হয়। আর কামনা নাশ হলেই কর্ম অকর্ম হয়। কামনার প্রাধান্য বোঝাবার জন্য ভগবান ষোড়শ অধ্যায়ে আসুরী সম্পদ বর্ণনায় আটটি শ্লোকে (১৬-২৩) নয় বার 'কাম'-এর কথা বলেছেন যা আসুরী সম্পদের মূল।

আবার এই ধারণা যে, কর্ম করলে জগৎ-সংসারে এবং কর্ম না করলে পরমাত্মাতে প্রবৃত্তি হবে, এটা ভাবা একেবারেই ভুল। মানুষ যদি এই ভেবে ধ্যান-সমাধিতে লেগে যায়, তবে তাও হবে কর্ম করা।

ভগবান কর্মসাধ্য নন, তিনি কর্ম করা বা না করা দুয়েরই অতীত, তিনি

বিবেকসাধ্য। কর্মযোগ কর্ম নয়, এটি সেবা। সেবাতে ত্যাগের প্রাধান্য থাকে এবং এই সেবা ও ত্যাগ—এই দুই-ই কর্ম নয়, ইহা বিবেক।

আর এই বিবেক কোনো শুভকর্মর ফলস্বরূপ পাওয়া যায় না। আসক্তি ও অহংবোধ ত্যাগ হলেই বিবেক স্বতঃসিদ্ধ হয়। তখন সেবা ও ত্যাগরূপী 'কর্মযোগ', অসঙ্গ স্বরূপরূপী 'জ্ঞানযোগ' এবং ভগবানে নিত্যযুক্ততারূপী 'ভক্তিযোগ' আপনি প্রকাশ পায়। কিন্তু 'অহংবোধ' নিয়ে সাধন এবং সাধনের অভিমান যতক্ষণ বজায় থাকে ততক্ষণ অহংবোধ তো দূর হয়ই না বরং দৃঢ় হতে থাকে এবং মানুষের কর্মবন্ধনও দূর হয় না।

পরে আঠারোতম শ্লোকে ভগবান 'কর্মে অকর্ম' ও 'অকর্মে কর্ম' সম্পর্কে বলেছেন। কর্মে-অকর্ম ও অকর্মে-কর্ম হল নির্লিপ্ত হয়ে কর্ম করা এবং কর্মরত থেকে নির্লিপ্ত হওয়া অর্থাৎ **নিরহঙ্কার হয়ে কর্ম করা এবং কর্ম করে তাতে মমত্বহীন হওয়া।**

এখানে উল্লেখ্য যে, কাজ করা ও কাজ না করা দুইটিই জাগতিক, প্রবৃত্তিও জাগতিক নিবৃত্তিও তাই, অতএব তা কর্ম। আমার দ্বারাই এই কাজটি সম্ভব এই অহঙ্কার, কাজটি করে আমি এই ফল পাব এই কামনা, আমার কাজটি যেন অক্ষয় থাকে এই মমত্ব এবং কর্ম ত্যাগ করলে আমি এই মানসম্মান পাব ইত্যাদি ইচ্ছা পোষণ যার থাকে না তিনিই 'কর্মে-অকর্ম' দেখেন, আবার যিনি সদাই নির্লিপ্তভাবে থাকেন, কার্য করা বা না করাকে অপেক্ষা করেন না তিনিই 'অকর্মে-কর্ম' দেখেন।

কিন্তু নির্লিপ্তভাবে থাকলেও লোকসংগ্রহার্থে কর্ম করা উচিত তাই দ্বিতীয় অধ্যায়ে ভগবান বলেছেন **'যোগস্থঃ কুরু কর্মাণি'** (গীতা ২।৪৮) আর এখানে ভগবান বলছেন **'কৃত্বাপি ন নিবধ্যতে'** (গীতা ৪।২২) অর্থাৎ তিনি সমত্বে স্থিত হয়ে কর্ম করায় কর্মবন্ধনে আবদ্ধ হন না। এইরূপ ব্যক্তি যিনি কামনা-আসক্তিবর্জিত, ফলেচ্ছারহিত ভগবান বহুরূপে (পরবর্তী ১৯ থেকে ২২) তাঁর প্রশংসা করেছেন।

১) তিনি মনুষ্যদের মধ্যে বুদ্ধিমান, জ্ঞানীদের মধ্যেও পণ্ডিত কারণ জ্ঞানাগ্নি তাঁর কর্মসকল ভস্মীভূত করে, ভগবান বলেছেন—**'তমাহুঃ পণ্ডিতং**

বুধা' (গীতা ৪।১৯)। অর্থাৎ জ্ঞানীদেরও তিনি পণ্ডিত—

গৃহেষু পণ্ডিতাঃ কেচিৎ কেচিন্মূর্খেষু পণ্ডিতাঃ।
সভায়াং পণ্ডিতাঃ কেচিৎ কেচিৎ পণ্ডিতপণ্ডিতাঃ॥

২) তিনি সদাই যোগী তাই তাকে 'যুক্তঃ' বলেছেন।

৩) তিনি 'কৃৎস্নকর্মকৃত' অর্থাৎ তাঁর কিছু করার বাকি থাকে না।

৪) তিনি ঈর্ষারহিত, দ্বন্দ্বাতীত এবং সিদ্ধি-অসিদ্ধিতে সম থাকেন তাই কোনো কর্ম করলেও তাতে আবদ্ধ হন না।

যজ্ঞের বিভাগ—(শ্লোক ২৩-৩২)

ভগবান যজ্ঞ সম্বন্ধে পূর্বেই বলেছেন—

'যজ্ঞার্থাৎ কর্মণোঽন্যত্র লোকোঽয়ং কর্মবন্ধনঃ' (শ্লোক ৯)।

'যজ্ঞ (কর্তব্য পালন) ব্যতীত অন্য কর্ম (নিজের জন্য করা কর্ম) বন্ধনের কারণ হয়।' (গীতা ৩।৯)

এখানে পরবর্তী ১০টি শ্লোকে বারো প্রকার যজ্ঞ সাধনের কথা বলেছেন যা কামনারহিত এবং ফলেচ্ছা ত্যাগপূর্বক শুধু লোকহিতার্থে করলে কর্মে অকর্মে হয় এবং মানুষ কর্মবন্ধন থেকে মুক্তি পায়—**'এবং জ্ঞাত্বা বিমোক্ষসে'** (গীতা ৪।৩২) অর্থাৎ মোক্ষ লাভ করেন।

গতসঙ্গস্য মুক্তস্য জ্ঞানাবস্থিতচেতসঃ।
যজ্ঞায়াচরতঃ কর্ম সমগ্রং প্রবিলীয়তে॥
(১)ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্ম হবির্ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণা হুতম্।
ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যং ব্রহ্মকর্মসমাধিনা॥
(২)দৈবমেবাপরে যজ্ঞং যোগিনঃ পর্যুপাসতে।
(৩)ব্রহ্মাগ্নাবপরে যজ্ঞং যজ্ঞেনৈবোপজুহ্বতি॥
শ্রোত্রাদীনীন্দ্রিয়াণ্যন্যে (৪)সংযমাগ্নিষু জুহ্বতি।
শব্দাদীন্ বিষয়ানন্য (৫)ইন্দ্রিয়াগ্নিষু জুহ্বতি॥
সর্বাণীন্দ্রিয়কর্মাণি প্রাণকর্মাণি চাপরে।
(৬)আত্মসংযমযোগাগ্নৌ জুহ্বতি জ্ঞানদীপিতে॥

---

(১)-(৯)উল্লিখিত দ্বাদশ যজ্ঞ।

[৭]দ্রব্যযজ্ঞা[৮]স্তপোযজ্ঞা [৯]যোগযজ্ঞাস্তথাপরে।
[১০]স্বাধ্যায়জ্ঞানযজ্ঞাশ্চ যতয়ঃ সংশিতব্রতাঃ॥
অপানে জুহ্বতি প্রাণং প্রাণেঽপানং তথাপরে।
প্রাণাপানগতী রুদ্ধ্বা [১১]প্রাণায়ামপরায়ণাঃ॥
অপরে [১২]নিয়তাহারাঃ প্রাণান্ প্রাণেষু জুহ্বতি।
সর্বেঽপ্যেতে যজ্ঞবিদো যজ্ঞক্ষপিতকল্মষাঃ॥
যজ্ঞশিষ্টামৃতভুজো যান্তি ব্রহ্ম সনাতনম্।
নায়ং লোকোঽস্ত্যযজ্ঞস্য কুতোঽন্যঃ কুরুসত্তম॥
এবং বহুবিধা যজ্ঞা বিততা ব্রহ্মণো মুখে।
কর্মজান্ বিদ্ধি তান্ সর্বানেবং জ্ঞাত্বা বিমোক্ষ্যসে॥

(গীতা ৪।২৩-৩২)

'যিনি সম্পূর্ণরূপে ফলাসক্তিরহিত, রাগ-দ্বেষ হতে মুক্ত, যাঁর বুদ্ধি (বা জ্ঞান) স্বরূপে স্থিত, তিনি যদি যজ্ঞার্থে কর্ম করেন তবে তাঁর সমস্ত কর্ম ফলসহ বিলীন হয়ে যায়।

যিনি যজ্ঞ-অর্পণে ব্রহ্ম, ঘৃতাদিতে ব্রহ্ম দেখেন, যিনি ব্রহ্মরূপ কর্তার দ্বারা ব্রহ্মরূপ অগ্নিতে আহুতি প্রদানরূপ ক্রিয়াতেও ব্রহ্ম দেখেন, তাঁর ব্রহ্মেই কর্ম-সমাধি হয়েছে অর্থাৎ তিনি ব্রহ্মই প্রাপ্ত হন।

কোনো যোগী ভগবদর্পণরূপ দৈব যজ্ঞানুষ্ঠান করেন আবার কোনো যোগী বিচার দ্বারা জীবাত্মাকে ব্রহ্মরূপ অগ্নিতে নিবেদন করে যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন।

আবার কোনো যোগী চক্ষু-কর্ণ ইন্দ্রিয়াদিকে সংযমরূপ অগ্নিতে আহুতি দেন এবং অন্য যোগিগণ শব্দাদি বিষয়গুলিকে ইন্দ্রিয়রূপ অগ্নিতে আহুতি দেন।

কিছু যোগিগণ সমস্ত ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়াগুলি ও প্রাণের ক্রিয়াগুলি আত্মসংযমরূপ জ্ঞানাগ্নিতে আহুতি প্রদান করেন।

আবার কোনো কোনো যোগী দ্রব্যসম্বন্ধীয় যজ্ঞ, কেউ তপোযজ্ঞ, কেউ

---

[৭]-[১২]উল্লিখিত দ্বাদশ যজ্ঞ।

যাগযজ্ঞ আবার কেউ স্বাধ্যায়রূপ জ্ঞানযজ্ঞ করে থাকেন।

কোনো যোগী প্রাণায়াম পরায়ণ হয়ে প্রাণকে অপানে আহুতি দেন এবং তারপর প্রাণ ও অপানের গতি রুদ্ধ করেন এবং শেষে অপানকে প্রাণে আহুতি দেন।

অন্য কিছু যোগী পরিমিত আহার দ্বারা প্রাণকে প্রাণেই আহুতি দেন। এই সব সাধক যজ্ঞাদির দ্বারা পাপনাশ করেন এবং তাঁরাই যজ্ঞাদির জ্ঞাতা।

হে অর্জুন ! যজ্ঞাবশিষ্ট অভিলাষী ব্যক্তি সনাতন পরব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন। আর যাঁরা যজ্ঞ করেন না তাদের ইহলোক তো সুখদায়ক নয়ই, অতএব পরলোক কী করে সুখদায়ী হবে।

এইরূপ আরও বহুবিধ যজ্ঞের কথা বেদে বিস্তারিতভাবে বলা হয়েছে সে সবই কর্মজনিত। যে এই সকল জেনে যজ্ঞ করে সে কর্মবন্ধন থেকে মুক্তিলাভ করে।' (গীতা ৪।২৩-৩২)

এই অধ্যায়ের নবম শ্লোকে ভগবান বলেছেন—**তাঁর জন্ম ও কর্ম দিব্য। জন্ম দিব্য কেবল ভগবানেই হওয়া সম্ভব, তবে যদি মানুষ চায় তবে ভগবানের মতো তার কর্মও সে দিব্য করতে পারে।** আর যজ্ঞার্থ কর্মই এই পথ। চতুর্দশ শ্লোকে ভগবান তাঁর কর্মে দিব্যতার কারণ জানিয়ে বলেছেন, কর্মে তাঁর কোনো স্পৃহা নেই তাই কর্ম তাকে লিপ্ত করে না বা কর্মগুলি অকর্ম হয়ে যায়। পঞ্চদশ শ্লোকে ভগবান বলেছেন মুমুক্ষু ব্যক্তিগণও এইরূপ জেনে কর্ম করেন। সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শ্লোকে ভগবান বলেছেন কর্ম, অকর্ম ও বিকর্ম কর্মের তিনটি তত্ত্বই জানা উচিত, আবার অষ্টাদশ শ্লোকে ভগবান কর্মের তত্ত্ব অর্থাৎ অকর্ম বা নির্লিপ্ততার কথাই বিস্তৃতভাবে বলেছেন। গভীরভাবে চিন্তা করলে দেখা যায়, মানুষ আসক্তি সহকারে বা কিছু পাওয়ার আশায় বা কর্তৃত্ববোধ সহকারে যা কিছু কর্ম করে তাই তার বন্ধনের কারণ হয়।

জ্ঞানযোগী— অহংবোধের (আমি ভাবের) অভাব। যাঁর, শরীর হতে নিজ সত্তার পৃথকবোধ থাকে তিনিই জ্ঞানযোগী।

কর্মযোগী—মমত্ববোধের (আমার ভাবের) অভাব। এই সাধকের ভাব

থাকে কিছুই আমার নয়, কিছুতেই আমার প্রয়োজন নেই। তাঁর ফলেচ্ছা না থাকায়, তাঁর কর্তৃত্ববোধও থাকে না। তিনি আসক্তিবর্জিত হওয়ার ফলে তার কর্ম সঞ্চয় হয় না, তিনি কর্মবন্ধন থেকে মুক্ত হন। তখন তিনি **'নৈব কিঞ্চিৎ করোমি'** (গীতা ৪।২০) অর্থাৎ তাঁর কর্ম করা হয় না এবং তিনি **'কৃত্বা অপি ন নিবধ্যতে'** (গীতা ৪।২২) অর্থাৎ তিনি বদ্ধও হন না। কর্মযোগীর মমত্ববোধ দূর হলে অহংবোধ দূর হয়। আর জ্ঞানযোগীর অহংবোধ দূর হলে স্বতঃই মমত্ববোধ দূর হয়।

এখানে ইঞ্জিন চলা ও গাড়ি চলাকে কামনা-বাসনার সৃষ্টি ও কর্মভোগের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে।

১) ইঞ্জিন ও গাড়ি দুই চলল না মানে গাড়ি গ্যারেজেই আছে—এতে বাসনাও নেই, কর্মভোগও নেই—জড় পদার্থ।

২) ইঞ্জিন চলল কিন্তু গাড়ি চলছে না—এটা যেন বাসনা হচ্ছে কিন্তু কর্মভোগ হচ্ছে না।

গীতার কথায় **'রসবর্জং রসঃ অপি অস্য'** (গীতা ২।৫৯)—এটা যেন তমোগুণসম্পন্ন মূঢ়ব্যক্তি যার কর্মফল তৈরি হচ্ছে, অথচ ভোগ হচ্ছে না, জমছে, সঞ্চয় হচ্ছে।

৩) ইঞ্জিনও চলছে এবং গাড়িও চলছে। এতে কামনা-বাসনাও আসছে এবং কর্মভোগও হচ্ছে। এটা হয় রজোগুণসম্পন্ন ব্যক্তিদের, যারা জগৎ-সংসারে আসক্ত এবং তার ফলে তারা কর্মবন্ধনে আবদ্ধ হয়। তাদের সম্বন্ধে ভগবান বলেছেন—

'গতাগতং কামকামা লভন্তে' (গীতা ৯।২১)। অর্থাৎ তারা জন্ম-মৃত্যুর অধীন, জন্ম-মৃত্যু চক্রে বারংবার যাওয়া-আসা করে।

৪) ইঞ্জিন চলছে না কিন্তু ঢালুরাস্তা দিয়ে গাড়ি চলছে। অর্থাৎ কামনা-বাসনা উৎপত্তি হচ্ছে না কিন্তু পুরোনো কর্মফল ভোগ হয়ে যাচ্ছে। এটা হচ্ছে সত্ত্বগুণীদের সাধনার পথ। এর পরিপক্ক অবস্থা অর্থাৎ নিষ্কাম ও পরহিত কর্মই শ্রেষ্ঠ অবস্থা, যাকে পণ্ডিতগণও 'পণ্ডিতাঃ' বলে থাকেন। তিনি **'কৃত্বাপি ন নিবধ্যতে'** (গীতা ৪।২২) অর্থাৎ কর্ম করলেও আবদ্ধ হন না

এবং তাঁর কর্মফল **'সমগ্রং প্রবিলীয়তে'** (গীতা ৪।২৩) পুণ্যরূপে তাঁর সমগ্র কর্ম ফলসহ লোপ পায়। এই কর্মযোগে সিদ্ধ ব্যক্তি অবশ্যই কোনো গ্রন্থ, গুরু বা অপর সাধনের সাহায্য ছাড়াই নিজের মধ্যে তত্ত্বজ্ঞান অনুভব করেন।

'তৎ স্বয়ং যোগসংসিদ্ধঃ কালেনাত্মনি বিন্দতি' (গীতা ৪।৩৮)।

যজ্ঞের বিভাগ—দ্বাদশ যজ্ঞ বা অকর্মের বর্ণনা।

হোমযজ্ঞ—যদি হোমরূপ যজ্ঞে অর্পণ বা শ্রুব, শ্রুবাদি পাত্র ও তিল, যব, ঘৃতাদিকে ব্রহ্ম বলে মনে করা হয়, আবার যিনি আহুতি দেন তিনি, যে অগ্নিতে আহুতি দেওয়া হয় সেই অগ্নি আর আহুতিরূপী ক্রিয়াকেও যদি ব্রহ্ম বলে মনে করা হয়, তবে তাঁর সকল কর্মেই ব্রহ্মশুদ্ধি হয়। তাঁর এই ব্রহ্মরূপ কর্ম-সমাধি হওয়ায় ব্রহ্মপ্রাপ্তি ঘটে।

দৈবযজ্ঞ—নিষ্কাম সাধক যাঁরা সংসাররূপ ব্রহ্মের সেবার জন্য ক্রিয়া ও পদার্থে অনাসক্ত হয়ে, মমত্ববুদ্ধি ও কামনা না রেখে লোক-সংগ্রহরূপী যজ্ঞের উদ্দেশ্যে কর্তব্যকর্মরূপ যজ্ঞ করেন তাঁরাই দৈবযজ্ঞকারী।

ব্রহ্মযজ্ঞ—কোনো কোনো যোগী বিচারবিবেচনাপূর্বক জড় হতে সর্বতোভাবে বিমুখ হন অর্থাৎ জড় হতে চেতনের তাদাত্ম্য দূর করে পরমাত্মায় লীন হওয়ার সাধনারূপ যজ্ঞ করেন তাঁরা ব্রহ্মযজ্ঞী।

সংযমযজ্ঞ—কোনো যোগী তাঁর পঞ্চইন্দ্রিয় (চক্ষু-কর্ণ-জিহ্বা-নাসিকা-ত্বক) নিজ নিজ বিষয়ে প্রবৃত্ত না করিয়ে সংযমরূপ যজ্ঞ করেন।

ইন্দ্রিয়যজ্ঞ—আবার কোনো যোগী পঞ্চ বিষয়কে (রূপ-শব্দ-রস-গন্ধ-স্পর্শ) ইন্দ্রিয়রূপ যজ্ঞে আহুতি দেন অর্থাৎ এগুলিকে ভগবৎকাজে ব্যবহৃত করেন, যাতে এগুলির প্রতি অনুরাগ ও আসক্তি দূর হয়।

সমাধিযজ্ঞ—কোনো কোনো যোগী চিত্তবৃত্তি নিরোধ করে তাঁদের দশ ইন্দ্রিয় (পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়) এবং মন, বুদ্ধি ও প্রাণের ক্রিয়াগুলি রুদ্ধ করে সমাধিতে স্থিত হন। তখন এক সচ্চিদানন্দ পরমাত্মার জ্ঞানই শুধু থাকে।

দ্রব্যযজ্ঞ—সংসারের হিতার্থে কূপ, পুকুর, মন্দির, ধর্মশালা আদি

নির্মাণ, অভাবগ্রস্ত লোকেদের অন্ন-জল-বস্ত্র-ঔষধ-পুস্তকাদি বিতরণকে দ্রব্যযজ্ঞ বলে। তিনটি শরীর (স্থূল-সূক্ষ্ম-কারণ) সহ সমস্ত পদার্থগুলি নিজের বলে মনে না করে অপরের সেবায় নিঃস্বার্থভাবে নিয়োগই হল দ্রব্যযজ্ঞ।

তপোযজ্ঞ—'দ্বন্দ্ব সহনম্ তপঃ'। নিজ স্বধর্ম (কর্তব্য) পালনে যে সমস্ত প্রতিকূলতা বা বাধা আসে তা প্রসন্নতার সঙ্গে সহ্য করাই হল 'তপযজ্ঞ'। অত্যন্ত প্রতিকূল অবস্থা যদি প্রসন্নভাবে গ্রহণ করা যায় তবে অন্য কোনো তপস্যাই তার সমকক্ষ হয় না।

সমস্ত আবর্জনা যদি কোথাও পড়ে থাকে তবে তা পরিবেশ দূষণ ঘটায়। আবার ওই আবর্জনাই যদি শোধন করে শস্যক্ষেত্রে ফেলা হয় তবে তা উত্তম সারের কাজ করে। আমরা ভোগে আসক্ত থাকায় অনুকূল অবস্থাকে কামনা করি, তা ভালো লাগে এবং প্রতিকূল অবস্থা খারাপ লাগে এই চিন্তাই হল পরিবেশ দূষণ কেননা অনুকূলের কামনা শুভ সংস্কারকে দূষিত করে।

কিন্তু সাধক যদি প্রতিকূল অবস্থাতেও অটল থেকে প্রসন্ন মনে কর্তব্য পালন করেন তবে এই প্রতিকূল পরিস্থিতিই সার হয়ে উত্তম ফল দান করে এবং সেটিই সব থেকে বড় তপস্যা হয়ে ওঠে এবং অতি শীঘ্র সিদ্ধি প্রদান করে।

যোগযজ্ঞ—'সমত্বং যোগ উচ্যতে' (গীতা ২।৪৮) অর্থাৎ অন্তকরণের সমতাই হচ্ছে যোগ। যোগী সাধক কার্যে পূর্তি-অপূর্তি, ফলের প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তি, অনুকূল-প্রতিকূল পরিস্থিতি আদর-অবহেলায় সম থাকেন অর্থাৎ তার চিত্তে রাগ-দ্বেষ, সুখ-দুঃখ, হর্ষ-শোক আদি হয় না। এইভাবে সম থাকাই হল 'যোগযজ্ঞ'।

স্বাধ্যায় জ্ঞানযজ্ঞ—লোকহিতের জন্য গীতা, ভাগবত, বেদ-উপনিষদ্ প্রভৃতি মননপূর্বক পঠন-পাঠনই হল স্বাধ্যায় যজ্ঞ।

প্রাণযজ্ঞ—প্রাণবায়ুর স্থান হৃদয় ও অপান বায়ুর স্থান হল গুহ্যে (নীচে)। ক্রিয়া যোগী প্রথমে প্রশ্বাস বায়ু দ্বারা শ্বাস নেওয়ার সময় প্রাণকে নীচে অপান বায়ুতে লীন করেন (পূরক)। তৎপরে প্রাণ ও অপান—দুইয়ের গতি রুদ্ধ

করেন (কুম্ভক) এবং শেষে নিশ্বাস ত্যাগের সময় অপান বায়ুকে ঊর্ধ্বে প্রাণবায়ুতে লীন করে শ্বাসত্যাগ করেন (রেচক)। পরমাত্মা প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে নিষ্কামভাবে এইরূপ প্রাণায়াম করাই হল 'প্রাণযজ্ঞ'।

স্তম্ভবৃত্তি প্রাণয়াম যজ্ঞ—নিয়মিত ও পরিমিত আহারকারী সাধক প্রাণকে প্রাণে ও অপানকে অপানে আহুতি দেন। এর অর্থ হল প্রাণ ও অপানকে নিজ নিজ স্থানে রুদ্ধ রাখা, শ্বাস গ্রহণও নয় ছাড়াও নয়। এই প্রাণায়ামরূপ যজ্ঞ করলে চিত্তবৃত্তিগুলি সহজেই শান্ত হয় এবং পরমাত্মা প্রাপ্তি সহজ হয়।

ভগবান এই অধ্যায়ের ষোড়শ থেকে বাইশতম শ্লোক পর্যন্ত কর্মতত্ত্ব (কর্মে অকর্ম) বর্ণনা করেছেন। কর্মতত্ত্ব হল কর্ম করেও তাতে আবদ্ধ না হওয়া। এই সাধনার একটি পথ হল যজ্ঞার্থে কর্ম করা। প্রথম আটটি শ্লোকে (২৪-৩০) দ্বাদশটি যজ্ঞের বর্ণনা করা হয়েছে।

পরের দুই শ্লোকে (৩১-৩২) ভগবান বলেছেন পূর্ব বর্ণিত যজ্ঞে কর্মের ফল ভোগ করতে হয় না '**যজ্ঞায়াচরতঃ কর্ম সমগ্রং প্রবিলীয়তে**' (গীতা ৪।২৩)। অন্যের হিতার্থে করা কর্মই হল 'কর্তব্যকর্ম' আর কর্তব্যকর্মই অনাসক্তভাবে করলে তা যজ্ঞ হয়ে ওঠে।

ভগবান যজ্ঞ সম্বন্ধে বলছেন '**যজ্ঞশিষ্টামৃতভুজো**' অর্থাৎ যজ্ঞ করলে বা নিষ্কামভাবে অন্যকে সুখী করলে অমৃতের অনুভূতি হয়। এই অমৃত বা অমরত্ব অনুভবকারী ব্যক্তি সনাতন পরব্রহ্ম প্রাপ্ত হন।

আবার পরের শ্লোকে ভগবান বলছেন, এই দ্বাদশ যজ্ঞ বা বেদে বর্ণিত অন্য যজ্ঞসকল সবই 'কর্মজান্' অর্থাৎ কর্মজনিত মানে শরীর, বাক্ ও মন দ্বারা কৃত হয়। তবে এই কর্মও যদি পরহিতার্থে ও নির্লিপ্তভাবে পালন করা হয় তবে তা যজ্ঞ হয় এবং তাতে কর্মবন্ধন ছিন্ন করে মুক্তিলাভ করা যায়।

ভগবান নিজের সম্বন্ধেও আগে একই কথা বলেছেন—'**ন মাং কর্মাণি লিম্পন্তি ন মে কর্মফলে স্পৃহা**' (গীতা ৪।১৪) অর্থাৎ তিনি কর্মেও অনাসক্ত কর্মফলেও অনাসক্ত। যজ্ঞার্থে কর্ম করলে জগতের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন বা কর্মবন্ধন থেকে মুক্তি হয় আর এই যজ্ঞার্থ কর্ম যদি ভগবানের জন্য করা হয় তবে প্রেমভক্তি লাভ হয়।

তত্ত্বজ্ঞান লাভের উপায়—(শ্লোক ৩৩-৩৯)

চতুর্থ অধ্যায়ে কর্মতত্ত্ব বিস্তৃতভাবে বলার পরে অধ্যায় শেষে আলাদাভাবে জ্ঞানীদের, সংশয়চিত্ত ব্যক্তিদের ও কর্মযোগীদের তত্ত্বজ্ঞান লাভের উপায় সম্বন্ধে বলেছেন।

শ্রেয়ান্ দ্রব্যময়াদ্ যজ্ঞাজ্ জ্ঞানযজ্ঞঃ পরন্তপ।
সর্বং কর্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে॥
তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ॥
যজ্ জ্ঞাত্বা ন পুনর্মোহমেবং যাস্যসি পাণ্ডব।
যেন ভূতান্যশেষেণ দ্রক্ষ্যস্যাত্মন্যথো ময়ি॥
অপি চেদসি পাপেভ্যঃ সর্বেভ্যঃ পাপকৃত্তমঃ।
সর্বং জ্ঞানপ্লবেনৈব বৃজিনং সন্তরিষ্যসি॥
যথৈধাংসি সমিদ্ধোঽগ্নির্ভস্মসাৎ কুরুতেঽর্জুন।
জ্ঞানাগ্নিঃ সর্বকর্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা॥
ন হি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহ বিদ্যতে।
তৎ স্বয়ং যোগসংসিদ্ধঃ কালেনাত্মনি বিন্দতি॥
শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানং তৎপরঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ।
জ্ঞানং লব্ধা পরাং শান্তিমচিরেণাধিগচ্ছতি॥

(গীতা ৪।৩৩-৩৯)

'হে অর্জুন ! দ্রব্যময় যজ্ঞ হতে জ্ঞানযজ্ঞ শ্রেষ্ঠ। কারণ সমস্ত কর্ম এবং পদার্থই জ্ঞানে (তত্ত্বজ্ঞানে) বিলীন হয়।

সেই তত্ত্বজ্ঞান তত্ত্বদর্শী মহাপুরুষদের কাছে গিয়ে অবগত হতে হয়। তাঁদের সাষ্টাঙ্গে প্রণাম, সেবা দ্বারা সন্তুষ্ট ও সরলতাপূর্বক প্রশ্ন করলে, সেই তত্ত্বদর্শী জ্ঞানী মহাপুরুষ তত্ত্বজ্ঞান প্রদান করেন।

হে অর্জুন ! তত্ত্বজ্ঞান অনুভব করলে আর কেউ মোহগ্রস্ত হয় না। তত্ত্বজ্ঞান লাভকারী ব্যক্তি প্রথমে সর্ব প্রাণীকে নিজের মধ্যে পরে আমার (সচ্চিদানন্দময় পরমাত্মায়) মধ্যে দেখতে সক্ষম হয়।

যদি কেউ সর্বাধিক পাপীর থেকেও অধিক পাপী হয়, তাহলেও সে জ্ঞানরূপ নৌকার সাহায্যে নিঃসন্দেহে সমস্ত পাপ-সমুদ্র পার হয়ে যায়।

হে অর্জুন ! প্রজ্বলিত অগ্নি যেরূপ অগ্নি সৃষ্টিকারী সমগ্র ইন্ধনকেই সম্পূর্ণভাবে ভস্মীভূত করে সেইরকম জ্ঞানরূপ অগ্নিও কর্মসমূহকে সম্পূর্ণভাবে ভস্মীভূত করে দেয়।

এই মনুষ্যলোকে নিঃসন্দেহে জ্ঞানের সমান পবিত্র আর কোনো সাধন নেই। যে যোগীর যোগ যথাযথ সিদ্ধ হয়েছে, সেই কর্মযোগী অবশ্যই এই তত্ত্বজ্ঞানকে নিজেই নিজের মধ্যে লাভ করেন।

যিনি জিতেন্দ্রিয় এবং সাধনপরায়ণ এইরূপ শ্রদ্ধাবান ব্যক্তি আত্মজ্ঞান লাভ করে অচিরে পরমশান্তি লাভ করেন।' (গীতা ৪।৩৩-৩৯)

ভগবান পূর্ব প্রকরণে দ্বাদশ যজ্ঞের কথা বলেছেন যেগুলি সকলই কর্মজনিত। এই প্রকরণের তেত্রিশতম শ্লোকে বলছেন এই যজ্ঞসকল কেবল কর্মজনিতই নয়, এগুলি দ্রব্যময়ও বটে অর্থাৎ নিষ্ঠা থাকলেও এইসব যজ্ঞে দ্রব্যেরই প্রাচুর্য। এইসব যজ্ঞের থেকেও জ্ঞানযজ্ঞ, যাতে বিবেক ও বিচারের প্রাধান্য থাকে তা শ্রেষ্ঠ। তবে ভগবান বলেছেন সব দ্রব্যময় যজ্ঞই জ্ঞানযজ্ঞে বিলীন হয়, অর্থাৎ দ্রব্যময় যজ্ঞ সম্পন্ন করেই তবে জ্ঞানযজ্ঞর পথ সুগম হয়।

অন্তকরণে জ্ঞানপ্রাপ্তির পথে তিনটি দোষ থাকে—

মল—(সঞ্চিত পাপ), **বিক্ষেপ** (চিত্ত-চাঞ্চল্য) ও **আবরণ** (অজ্ঞান)। পরহিতার্থে আসক্তিহীন ভাবে জগতের সেবা করলে প্রথমোক্ত দুটি দোষ —মল ও বিক্ষেপ দূর হয়, কিন্তু অজ্ঞান দূর করতে গেলে জ্ঞানের আবশ্যকতা হয়। শাস্ত্রাদিতে জ্ঞানপ্রাপ্তির জন্য আটটি অন্তরঙ্গ সাধনের কথা বলা হয়েছে—

(১) বিবেক (২) বৈরাগ্য (৩) ষট্ সম্পত্তি (৪) মুমুক্ষত্ব (৫) শ্রবণ (৬) মনন (৭) নিদিধ্যাসন (৮) তত্ত্বপদার্থসংশোধন (তত্ত্বজ্ঞান)।

বিবেক—সৎ-অসৎকে পৃথকভাবে জানার নাম হল বিবেক।

বৈরাগ্য—সৎ-অসৎকে পৃথকভাবে জেনে অসৎকে পরিত্যাগ করা অর্থাৎ সংসারের প্রতি বিমুখতাই হল বৈরাগ্য।

ষট্ সম্পত্তি—

১) **শম**—বিষয়গুলি থেকে মনকে সরিয়ে নেওয়া শম।

২) দম—বিষয়গুলি থেকে ইন্দ্রিয় সরিয়ে নেওয়া দম।

৩) শ্রদ্ধা—শাস্ত্রাদিতে প্রত্যক্ষের চেয়ে বেশি বিশ্বাস হল শ্রদ্ধা।

৪) উপরতি—বৃত্তিসমূহের সংসার বৈমুখ্য হল উপরতি।

৫) তিতিক্ষা—শীত-গ্রীষ্মাদি দ্বন্দ্ব সহ্য করাই হল তিতিক্ষা।[১]

৬) সমাধান—অন্তঃকরণে কোনো প্রশ্ন (শঙ্কা) না থাকাই সমাধান।

মুমুক্ষুত্ব—ইহা জাগ্রত হলে জাগতিক বস্তুসমূহ ও কর্ম স্বরূপত ত্যাগ করতে ইচ্ছা হয় এবং সাধন লাভের জন্য গুরুর কাছে যায়।

শ্রবণ—গুরুর নিকট শাস্ত্র শুনে তার অর্থ উপলব্ধি বা ধারণ করাই হল শ্রবণ।

মনন—যুক্তি ও বিচার দ্বারা পরমাত্মা মনন করা হল মনন।

নিদিধ্যাসন—জগৎসত্তা মেনে নেওয়া এবং পরমাত্মাতত্ত্বর অস্তিত্ব না মানাকে বলে বিপরীত তত্ত্ব। আর এই বিপরীত তত্ত্ব ত্যাগ করাই হল নিদিধ্যাসন।

তত্ত্ব সাক্ষাৎকার বা পরমাত্মা উপলব্ধি—প্রকৃতিজাত সমস্ত ক্রিয়া ও পদার্থের সঙ্গে সম্পূর্ণভাবে সম্পর্ক ছিন্ন হলে তত্ত্বজ্ঞান উপলব্ধি হয়। যিনি সাংসারিক ভোগ ও বিষয়ে সম্পৃক্ত থাকেন তিনি শাস্ত্র শ্রবণ করলেও মনন হয় বিষয়ের, নিদিধ্যাসন হয় ধন-সম্পদের এবং সাক্ষাৎকার হয় দুঃখের। কর্মযোগ মুমুক্ষা অবধি নিয়ে যায় আর গুরুকৃপায় তত্ত্বসাক্ষাৎকার লাভ করা যায়। গুরুর কাছে যখন যাবে—

আদৌ স্ববর্ণাশ্রমবর্ণিতাঃ ক্রিয়াঃ কৃত্বা সমাসাদিতশুদ্ধমানসঃ।
সমাপ্য তৎপূর্বমুপাত্তসাধনঃ সমাশ্রয়েৎ সদ্‌গুরুমাত্মলব্ধয়ে॥

(আঃ রামায়ণ, উত্তরকাণ্ড ৫।৭)

'প্রথমে নিজ বর্ণ ও নিজ আশ্রমের জন্য শাস্ত্রবর্ণিত ক্রিয়াগুলি যথাযথ পালন দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হলে, পরে ওই ক্রিয়াগুলি ত্যাগ করতে হয় এবং তৎপরে শম-দমাদি সাধনসম্পন্ন হয়ে আত্মজ্ঞান প্রাপ্তির নিমিত্ত সদ্‌গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করতে হয়।'

---

[১]সহনং সর্বদুঃখম্ অপ্রতিকারপূর্বম্ চিন্তাবিলাপরহিতং সা তিতিক্ষা নিগদ্যতে।

মুমুক্ষু কীভাবে গুরুর শরণাগত হয়—

তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্।

(মুণ্ডক. ১।২।১২)

'সেই জিজ্ঞাসু সাধক জ্ঞানপ্রাপ্তির নিমিত্ত, সমিধ (যজ্ঞ কাষ্ঠ) হাতে নিয়ে, বিনয়াবনত হয়ে বেদ শাস্ত্রের জ্ঞাতা ও ব্রহ্মজ্ঞানী গুরুর নিকট যান।'

ভগবান গীতায় এই প্রকরণের চৌত্রিশতম শ্লোকে বলেছেন কীভাবে গুরু এই তত্ত্বজ্ঞান প্রদান করেন। প্রথমে 'প্রণিপাতেন' অর্থাৎ গুরুর কাছে গিয়ে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করবে। গুরুর কাছে নম্র ও বিনয়ী থাকবে, সেবা করবে—**'নীচবৎ সেবেত সদ্‌গুরুম্'**। শরীর ও বস্তু ইত্যাদি সবই তাঁকে সমর্পণ করবে, তাঁর অধীন হয়ে থাকবে। 'সেবয়া' অর্থ হল তাঁর আদর্শ ও জীবনধারা অনুযায়ী জীবন গঠন করা। 'পরিপ্রশ্নেন' হল শুধুমাত্র জানার জন্য জিজ্ঞাসু হয়ে সরলতার সঙ্গে বিনম্রভাবে প্রশ্ন করবে, নিজ পাণ্ডিত্য জাহির করার জন্য নয়। আমি কে ? সংসার কী ? বন্ধন কাকে বলে ? মোক্ষ কী ? পরমাত্মা কীরূপে অনুভব হয় ? সাধনায় বিঘ্ন কী ? ইত্যাদি প্রশ্ন যেমন যেমন সন্দেহ হয় সেই তদনুযায়ী জিজ্ঞাসা করবে।

শিষ্যের এইরূপ জিজ্ঞাসু ও বিনম্র ভাবের কারণ হল তাতে মহাপুরুষের মনেও এক বিশেষ ভাবের ও প্রীতির উৎপত্তি হয় আর শিষ্যের মধ্যে যদি এই শ্রদ্ধালু ভাব না থাকে তবে জ্ঞানোপদেশ দিলেও শিষ্য তা ধারণ করতে পারে না। তাই পরবর্তী শ্লোকে ভগবান বলেছেন শ্রদ্ধাব্যতীত উপদেশ পেলেও জ্ঞানলাভ হয় না। **'শ্রুত্বাপ্যেনং বেদ ন চৈব কশ্চিৎ'** (গীতা ২।২৯)।

তত্ত্বজ্ঞানের মাহাত্ম্য—ভগবান পঁয়ত্রিশতম শ্লোকে বলছেন তত্ত্বজ্ঞান লাভ হলে জগতের প্রতি 'আমি' ও 'আমার' ভাব চলে যায় এবং পুনরায় মোহ উৎপন্ন হবার প্রশ্ন থাকে না। জগৎ জীবের অন্তর্গত এবং জীব পরমাত্মার অন্তর্গত। তাই সাধক প্রথমে সকল প্রাণী এবং জগৎকে নিজের মধ্যে দেখেন **'দ্রক্ষ্যস্যাত্মনি'** এবং জ্ঞান পরিপক্ক হয়ে পরমাত্ম জ্ঞান লাভ হলে নিজেকে পরমাত্মার মধ্যে দেখেন **'অথো ময়ী'**। লৌকিক নিষ্ঠা (কর্মযোগ ও জ্ঞানযোগ) দ্বারা আত্মজ্ঞানে স্বরূপানন্দ ও অলৌকিক নিষ্ঠায় (ভক্তিযোগে) পরমাত্মানন্দ লাভ হয় এবং সর্বত্র **'বাসুদেবঃ সর্বম্'** অনুভূত হয়।

পরের ছত্রিশতম শ্লোকে বলছেন জ্ঞান এমনই একটি সাধন যা সমস্ত পাপীকে পাপরূপ জগৎসংসার থেকে পার করায়। পুরোনো পাপ তত বাধা নয় যা নতুন পাপে হয়। তত্ত্বজ্ঞান লাভে জগৎ ও শরীরের প্রতি আসক্তি ত্যাগ হলে পুরোনো পাপ ও নতুন পাপ থেকে সর্বতোভাবে সম্পর্ক ছিন্ন হয়— **'মূলাভাবে কুতঃ শাখাঃ'**। আর সাঁইত্রিশতম শ্লোকে বলছেন যেমন অগ্নি ইন্ধনসমূহকে সম্পূর্ণভাবে ভস্মীভূত করে, সেইরকম তত্ত্বজ্ঞানও সম্পূর্ণভাবে সকল কর্মসমূহ নাশ করে।

সঞ্চিত কর্ম—তত্ত্বজ্ঞান লাভ হলে অজ্ঞানতা দূর হয়। আর তাতে আশ্রয় করে থাকা বহু বহু জন্মের সঞ্চিত কর্ম অচিরেই বিনষ্ট হয়।

ক্রিয়মান কর্ম—তত্ত্বজ্ঞান লাভে কর্তৃত্বাভিমান থাকে না। ফলে সমস্ত ক্রিয়মান কর্মই অকর্ম হয়ে যায়, ফলে কোনো ক্রিয়মান কর্মই ফলদায়ক হয় না।

প্রারব্ধ কর্ম—তত্ত্বজ্ঞান লাভ হলে ভোক্তৃত্ব ভাবও থাকে না। ফলে প্রারব্ধ কর্মর সৃষ্ট অনুকূল-প্রতিকূল পরিস্থিতির কোনো প্রভাব তাঁর ওপর পড়ে না অর্থাৎ তিনি সুখী বা দুঃখী হন না। এইভাবে তত্ত্বজ্ঞান লাভ হলে সঞ্চিত, প্রারব্ধ ও ক্রিয়মাণ এই তিন কর্মর সঙ্গেই তাঁর কোনো সম্পর্ক থাকে না।

ভগবান বলছেন জ্ঞানের সদৃশ পবিত্র আর কিছুই নেই কেননা তত্ত্বজ্ঞান পরমপবিত্র পরমাত্মার অনুভব করায়, যা **'পবিত্রানাং পবিত্রং চ'** (বিষ্ণু-সহস্রনাম ১০) অর্থাৎ সকল পবিত্রেরও পবিত্র।

তত্ত্বজ্ঞানের অধিকারী—ভগবান পরবর্তী একচল্লিশতম শ্লোকে বলেছেন —তত্ত্বজ্ঞান লাভ হলে সংশয় ছিন্ন হয় **'জ্ঞানসংছিন্নসংশয়ম্'** আর এখানে উনচল্লিশতম শ্লোকে বলছেন **'শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানম্'** অর্থাৎ শ্রদ্ধা হলে জ্ঞান লাভ হয় এবং সংশয়ও ছিন্ন হয়। পরমাত্মাতে, মহাপুরুষে, ধর্মে ও শাস্ত্রে প্রত্যক্ষবৎ বিশ্বাসকে শ্রদ্ধা বলে। তবে শ্রদ্ধার ভাব কম থাকলেও কেউ কেউ যদি ভ্রমবশত নিজেকে পূর্ণ শ্রদ্ধাযুক্ত মনে করতে পারে, তাই ভগবান সত্যিকার শ্রদ্ধাবান সাধক সম্বন্ধে বলেছেন, তিনি হন 'সংযতেন্দ্রিয়' ও 'তৎপর'। শ্রদ্ধাবান সাধকের ইন্দ্রিয়াদি সম্পূর্ণ নিজ বশীভূত থাকে এবং

তিনি একাগ্রভাবে তাঁরই সাধনায় ব্যাপৃত থাকেন। এইরূপ শ্রদ্ধাযুক্ত ব্যক্তি পরমশান্তি লাভ করেন অর্থাৎ ভগবানকে লাভ করে জন্ম-মৃত্যুরূপ সংসার থেকে মুক্তি পান।

তত্ত্বজ্ঞানের অনধিকারী—(শ্লোক ৪০)

অজ্ঞশ্চাশ্রদ্দধানশ্চ সংশয়াত্মা বিনশ্যতি।
নায়ং লোকোঽস্তি ন পরো ন সুখং সংশয়াত্মনঃ॥ (গীতা ৪।৪০)

'অজ্ঞ (বিবেকবোধহীন) এবং শ্রদ্ধাবর্জিত সংশয়াকুল ব্যক্তির পতন হয়। এরূপ সংশয়াকুল ব্যক্তির ইহলোক-পরলোক নেই এবং সুখও নেই।'

ভগবান বলছেন **'অজ্ঞশ্চাশ্রদ্দধানশ্চ সংশয়াত্মা বিনশ্যতি'** অর্থাৎ জ্ঞানলাভে তারাই অনধিকারী যারা অজ্ঞ বা যাদের বিবেকবোধ জাগ্রত হয়নি, যারা শ্রদ্ধাহীন মানে যাদের যতটা বিবেক জাগ্রত হয়েছে তাতে গুরুত্ব দেয় না এবং যারা সংশয়াত্মা অর্থাৎ যাদের বুদ্ধি শিক্ষারহিত ও অন্যর বাক্যের মর্যাদা দেয় না। এর তাৎপর্য হল সংশয়াত্মা ব্যক্তির জ্ঞান (বিবেচনা) ও শ্রদ্ধা কোনোটাই নেই অর্থাৎ তারা নিজেরাও জানে না এবং অন্যর কথাও মানে না।

সংশয়াত্মা ব্যক্তির সম্বন্ধে বলা হয়—

কিছু শ্রদ্ধা কিছু দুষ্টভাব কিছু সংশয় কিছু জ্ঞান।
ঘরেরও থাকে না ঘাটেরও নয় ধোপার গাধা সমান॥

কর্মযোগী—(শ্লোক ৪১-৪২)

ভগবান এতক্ষণ জ্ঞান প্রাপ্তির জন্য তত্ত্বদর্শীর নিকট শিক্ষাগ্রহণ এবং জ্ঞানই সর্বোত্তম বর্ণনা করে আবার শেষের দুই শ্লোকে কর্মযোগের মাধ্যমেই তত্ত্বজ্ঞান লাভের কথা বলেছেন।

যোগসন্ন্যস্তকর্মাণং জ্ঞানসংছিন্নসংশয়ম্।
আত্মবন্তং ন কর্মাণি নিবধ্নন্তি ধনঞ্জয়॥
তস্মাদজ্ঞানসম্ভূতং হৃৎস্থং জ্ঞানাসিনাত্মনঃ।
ছিত্ত্বৈনং সংশয়ং যোগমাতিষ্ঠোত্তিষ্ঠ ভারত॥

(গীতা ৪।৪১-৪২)

'হে ধনঞ্জয় ! যোগ (সমতা) দ্বারা যাঁর সমস্ত কর্ম হতে সম্পর্ক ছিন্ন হয়েছে এবং আত্মজ্ঞান দ্বারা যাঁর সকল সংশয় নাশ হয়েছে, এইরূপ স্বরূপ-

পরায়ণ ব্যক্তিকে কর্ম আবদ্ধ করতে পারে না।

হৃদয়স্থিত এই অজ্ঞান হতে উৎপন্ন নিজ সংশয়কে জ্ঞানরূপ খড়্গ দ্বারা ছিন্ন করে সমত্বে স্থিত হও এবং যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হও।' (গীতা ৪।৪১-৪২)

চতুর্থ অধ্যায়ে কর্মযোগ ও জ্ঞানযোগ বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করে অধ্যায় শেষে এসে ভগবান কর্মযোগের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করে বলছেন—

'তৎ স্বয়ং যোগসংসিদ্ধঃ কালেনাত্মনি বিন্দতি' (গীতা ৪।৩৮)।

কর্মযোগী যোগসংসিদ্ধ হলে অন্য কোনো সাধন ছাড়াই সেই তত্ত্বজ্ঞান তৎক্ষণাৎ আপনিই প্রাপ্ত হন।

কর্মযোগের প্রধান বিষয় হল নিজের জন্য কিছু না করে সমস্ত কর্ম জগতের হিতার্থে করা। এইরূপ করলে সমস্ত বস্তুসামগ্রী ও ক্রিয়াশক্তি —দুইই জগৎ প্রবাহের জন্য ব্যয়িত হয় আর নিজের জন্য উচ্চ সংস্কার থাকে যা যোগপ্রাপ্তির পথ সুগম করে। কর্ম ও ফল—এই দুয়ের প্রতি আসক্তির জন্যই 'যোগ' অনুভূত হয় না। কর্মের দ্বারা স্বরূপের পাওয়ার কিছু নেই এই বোধ হল 'কর্মবিজ্ঞান'। আর কর্মবিজ্ঞান সাধিত হলে কর্মের প্রতি আসক্তি ও কর্মফল থেকে সম্বন্ধ স্বতঃই ছিন্ন হয়ে যায় এবং পরমাত্মার প্রতি নিজ স্বাভাবিক নিত্যসম্পর্ক অনুভূত হয় যাকে 'যোগবিজ্ঞান' বা 'যোগসংসিদ্ধ' বলা হয়। **'যোগসন্ন্যস্তকর্ম'** হল যোগের বা সমত্বের দ্বারা সমস্ত কর্ম হতে সম্পর্ক ছিন্ন করা। ক্রিয়া এবং পদার্থগুলি নিজস্ব এবং নিজের জন্য মনে করাই হল অজ্ঞানতা এবং এই অজ্ঞানতা দূর হলেই অন্তকরণের সংশয় দূর হয়। সংশয় দূর হলে কর্মজ্ঞান উপলব্ধি হয় যে নিজের জন্য কিছু করার প্রয়োজনীয়তা নেই।

তৃতীয় অধ্যায়ে ভগবান কর্মযোগের আচরণ করার এবং চতুর্থ অধ্যায়ে কর্মযোগ-তত্ত্বর কথা বিশেষভাবে বলেছেন। কর্মতত্ত্ব ঠিকভাবে জেনে কর্ম করলে সেই কর্মই আর বন্ধনের কারণ না হয়ে মুক্তিপ্রদ হয়ে ওঠে—

'যজ্জ্ঞাত্বা মোক্ষসেঽশুভাৎ' (গীতা ৪।১৬)।

অর্জুন ধনুর্বান ত্যাগ করে রথে বসে পড়েছিলেন **'রথোপস্থ উপাবিশৎ'** (গীতা ১।৪৭) এবং বলছিলেন যে যুদ্ধ করবেন না **'ন যোৎস্য ইতি**

গোবিন্দমুক্তা তূষ্ণীং বভূব হ' (গীতা ২।৯)। ভগবান তখন কর্মতত্ত্ব বিস্তৃত বর্ণনা করে অর্জুনকে বলছেন '**যোগমাতিষ্ঠোত্তিষ্ঠ ভারত**' (গীতা ৪।৪২) অর্থাৎ যোগস্থ হয়ে (কর্মতত্ত্ব জেনে) যুদ্ধ করো।

প্রকৃতি দ্বারা জগতে দিনরাত কত কর্মই না সংঘটিত হচ্ছে কিন্তু তাদের প্রতি আমাদের অনুরাগ ও আসক্তি না থাকায় তাদের প্রতি আমরা আকর্ষিত হই না ও সেই সব কর্মদ্বারা আবদ্ধও হই না, ওতে আমরা নির্লিপ্ত থাকি। যে যে কর্মে আমাদের অনুরাগ ও আসক্তি থাকে সেই সেই কর্মদ্বারাই আমরা আবদ্ধ হই। আবার যখন সমস্ত কর্মের প্রতি রাগ-দ্বেষ দূরীভূত হয় অর্থাৎ 'সমত্ববোধ' জাগ্রত হয় তখন কর্মের সঙ্গে আর সম্পর্ক স্থাপিত হয় না অর্থাৎ কর্ম করলেও মানুষ কর্মবন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে যায়।

তাই ভগবান সততই সমত্বে থাকার কথা বলেছেন। গীতায় সমত্বের স্থান অনেক উচ্চে—

'**সমত্বং যোগ উচ্চতে**' (গীতা ২।৪৮) অর্থাৎ সমত্বকেই যোগ বলে আর '**যোগস্থঃ কুরু কর্মাণি**' (গীতা ২।৪৮) অর্থাৎ যোগস্থ হয়েই কর্ম করতে হবে ইত্যাদি। এইভাবে চতুর্থ অধ্যায়ে ভগবান তত্ত্বজ্ঞান লাভের উপায় হিসাবে জ্ঞানযোগের শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করে, পরে কর্মযোগের অধিক শ্রেষ্ঠত্ব জানিয়ে অধ্যায় শেষ করেছেন যোগস্থ হয়ে যুদ্ধ করার উপদেশ দিয়ে।

———o———

পঞ্চম প্রশ্ন

ভগবান সমগ্র চতুর্থ অধ্যায়ে জ্ঞানযোগ ও কর্মযোগ উভয়েরই প্রশংসা করায়, অর্জুন দ্বিধান্বিত চিত্তে পঞ্চম অধ্যায়ের শুরুতেই প্রশ্ন করছেন—

সন্ন্যাসং কর্মণাং কৃষ্ণ পুনর্যোগঞ্চ শংসসি।
যচ্ছ্রেয় এতয়োরেকং তন্মে ব্রূহি সুনিশ্চিতম্॥
(গীতা ৫।১)

'অর্জুন বললেন—হে কৃষ্ণ! আপনি স্বরূপত কর্ম ত্যাগ করতে বলেছেন, আবার কর্মযোগেরও প্রশংসা করেছেন। সুতরাং এই দুই সাধনের মধ্যে যেটি নিশ্চিতভাবে কল্যাণকারী, আমাকে সেটি বলে দিন।'

অর্জুনের মনে প্রধানত নিজ কল্যাণেরই আকাঙ্ক্ষা ছিল। তাই তিনি কৃষ্ণকে বারংবার বলেছেন—

যচ্ছ্রেয়ঃ স্যান্নিশ্চিতং ব্রূহি তন্মে
শিষ্যস্তেহহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্॥ (গীতা ২।৭)

তদেকং বদ নিশ্চিত্য যেন শ্রেয়োঽহমাপ্নুয়াম্ (গীতা ৩।২)

যে সাধকদের বৈরাগ্য তীব্র হয়নি, তাদের কল্যাণের আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হলে তারাও কর্মযোগের অধিকারী হতে পারে।

প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায়ে অর্জুন বলেছেন তিনি এই রাজ্য বা সুখভোগ এমনকি ত্রিলোকের আধিপত্যও কামনা করেন না। পরে অর্জুন আবার বলেছেন তাঁর যে ভোগবিলাস বা রাজ্যলাভে সম্পূর্ণ অনীহা তা নয়, তবে তিনি যুদ্ধে কুটুম্বদের বধ করে বিজয়ী হয়ে রাজ্যলাভ করতে চান না। আবার বলেছেন গুরুজনদের বধ করে রাজ্যভোগ করা উচিত নয়। অর্জুনের হৃদয়ে ভোগের সম্পূর্ণ বৈরাগ্য আসেনি অথচ তার নিজ কল্যাণের ইচ্ছা বর্তমান, সেইজন্য তিনি কর্মযোগের অধিকারী। ভগবান ভাগবতেও শ্রীকৃষ্ণ-উদ্ধব

সংবাদে এই চিরন্তন প্রশ্নের উত্তরও বিশেষ ব্যাখ্যা সহ বর্ণনা করেছেন—

যোগাস্ত্রয়ো ময়া প্রোক্তা নৃণাং শ্রেয়োবিধিৎসয়া।
জ্ঞানং কর্ম চ ভক্তিশ্চ নোপায়োঽন্যোঽস্তি কুত্রচিৎ॥

(ভাগবত ১১।২০।৬)

'হে উদ্ধব মানবের মঙ্গল বিধানার্থে আমি জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তি—এই তিন যোগের কথা বলেছি। ইহা ব্যতীত লোকমঙ্গলের আর অন্য কোনো উপায় নেই।'

অধিকার ও অবস্থাভেদ অনুসারে ভাগবতে তিনটি পথের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

নির্বিণ্নানাং জ্ঞানযোগো ন্যাসিনামিহ কর্মসু।
তেস্বনির্বিণ্নচিত্তানাং কর্মযোগস্তু কামিনাম্॥
যদৃচ্ছয়া মৎকথাদৌ জাতশ্রদ্ধস্তু যঃ পুমান্।
ন নির্বিণ্নো নাতিসক্তো ভক্তিযোঽস্য সিদ্ধিঃ॥
তাবৎ কর্মাণি কুর্বীত ন নির্বিদ্যেত যাবতা।
মৎ কথাশ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্ন জায়তে॥

(ভাগবত ১১।২০।৭-৯)

কর্মে বিরক্ত হয়ে যাঁরা কর্মত্যাগ করেন তাঁদের জ্ঞানযোগ, কর্মে বিরক্ত হননি এবং কামনাও নষ্ট হয়নি তাঁদের কর্মযোগ এবং কর্মে বিরক্ত হননি অথচ কামনাসক্তও নহেন কিন্তু আমার কথাদিতে যাঁদের শ্রদ্ধা আছে তাঁদের ভক্তিযোগ অতি সুখপ্রদ হয়।

এই কর্মাধিকার প্রসঙ্গে কর্মের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শিত হয়েছে। যে পর্যন্ত না অন্তঃকরণ শুদ্ধ হয় ততক্ষণ পর্যন্ত কর্মাচরণ কর্তব্য। আবার অন্তঃকরণ শুদ্ধ হলেও যে পর্যন্ত না নির্বেদ আসে বা শ্রদ্ধা জাগ্রত না হয় তাবৎ পর্যন্ত কর্ম কখনই পরিত্যাজ্য নয়। যখন পূর্ণ নির্বেদ আসে তখন জাগে জ্ঞানের অধিকার। আবার পূর্ণ নির্বেদ আসার আগে মহৎ কৃপাবশত শ্রদ্ধা জাগ্রত হলে মানুষ ভক্তিযোগের অধিকারী হয়। গীতায়ও এই প্রশ্নের উত্তর ভগবান দিয়েছেন পঞ্চম অধ্যায়ের ২৮টি শ্লোক ও ষষ্ঠ অধ্যায়ের ৩২টি শ্লোক অর্থাৎ

মোট ৬০টি শ্লোকে। ভগবান এই দুই অধ্যায়ে কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ, ধ্যানযোগ ও ভক্তিযোগের বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যা করেছেন।

	পঞ্চম	ষষ্ঠ
১. জ্ঞান ও কর্মযোগের সাম্যতা	শ্লোক ৪, ৫	
২. কর্মযোগ— শ্রেষ্ঠত্ব ও লক্ষণ	শ্লোক ২-৩, ৬-৭	
— সাধন ও মহিমা	শ্লোক ১১-১২,	১-৯
৩. জ্ঞানযোগীর সাধন	শ্লোক ৮, ৯, ১৩-১৬	
জ্ঞানযোগীর লক্ষণ	শ্লোক ১৭-২৬	
৪. ধ্যানের পদ্ধতি—		
বহিরঙ্গ সাধন	শ্লোক ২৭-২৮,	১০-১৩
অন্তরঙ্গ সাধন	শ্লোক ১৪-১৫,	১৮-২০
৫. ধ্যানযোগীর আচার		১৬-১৭
৬. ধ্যানযোগীর সঙ্কল্প ত্যাগের উপায়		২৪-২৬
৭. ধ্যানযোগীর সাধনার ফল		২৭-২৮
৮. ধ্যানরত সাংখ্যযোগী		২৯
৯. ধ্যানরত ভক্তিযোগী		৩০-৩২
১০. ভক্তিযোগী	শ্লোক ১০, ২৯	

জ্ঞান ও কর্মযোগের সাম্যতা—(শ্লোক ৪, ৫)

সাংখ্যযোগৌ পৃথগ্বালাঃ প্রবদন্তি ন পণ্ডিতাঃ।
একমপ্যাস্থিতঃ সম্যগুভয়োর্বিন্দতে ফলম্॥
যৎ সাংখ্যৈঃ প্রাপ্যতে স্থানং তদ্‌যোগৈরপি গম্যতে।
একং সাংখ্যঞ্চ যোগঞ্চ যঃ পশ্যতি স পশ্যতি॥

(গীতা ৫।৪-৫)

'নির্বোধ ব্যক্তিগণ সন্ন্যাস ও কর্মযোগকে পৃথক ফল প্রদানকারী বলে থাকেন, কিন্তু পণ্ডিতরা এরূপ বলেন না। কারণ এই দুটি সাধনের মধ্যে একটি সাধনেও সম্যকভাবে স্থিত হলে উভয়েরই ফলস্বরূপ সেই পরমাত্মাকেই প্রাপ্ত হয়।

জ্ঞানযোগিগণ যে পরমধাম লাভ করেন, কর্মযোগিগণও সেই ধাম প্রাপ্ত হন। যে ব্যক্তি জ্ঞানযোগ ও কর্মযোগকে ফলরূপে অভিন্ন দেখেন তিনিই যথার্থদর্শী।' (গীতা ৫।৪-৫)

ভগবান সমগ্র সাধনারই অন্তিম ফল বলেছেন সংসারে অনাসক্তি ও পরমাত্মা প্রাপ্তি।

ভাগবতে ভগবান কপিল মাতা দেবহূতিকে বলছেন—

এতাবানেব যোগেন সমগ্রেনেহ যোগিনঃ।
যুজ্যতেঽভিমতো হ্যর্থো যদসঙ্গস্তু কৃৎস্নশঃ॥ (ভাগবত ৩।৩২।২৭)

যোগিগণের সমগ্র যোগসাধনার একমাত্র অভীষ্ট ফল হচ্ছে—সংসারে সম্পূর্ণভাবে আসক্তিরহিত হয়ে যাওয়া। কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ প্রভৃতি সকল যোগের দ্বারাই সেই এক অসঙ্গরূপ ফল লাভ হয়। **কোনো সাধনায় পূর্ণতা পেলেই বাঁচার আশা, মৃত্যুর ভয়, কিছু পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা ও কিছু করার আসক্তি—এই চারটিই পুরোপুরি দূর হয়ে যায়।** এই শরীর বিনাশশীল, সর্বক্ষণ ক্ষয়প্রাপ্ত হচ্ছে তাই এই শরীরের মৃত্যুভয় থাকতে পারে না। আবার স্বরূপ নিত্য বিরাজমান, তাঁর আবার বাঁচার ইচ্ছে কীভাবে হবে। তবে স্বরূপ যখন শরীরের সঙ্গে একাত্ম হয়, তখন তার বাঁচার ইচ্ছা, মৃত্যুভয় জন্মায়—জ্ঞানযোগ অর্থাৎ বিবেক দ্বারা এই দুইয়ের নাশ করতে হয়।

আবার পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা তারই হয় যার কোনো অভাব থাকে। স্বরূপ নিত্য ভাবময় তাতে কোনো অভাব থাকতে পারে না। পাওয়ার ইচ্ছা না থাকলে ক্রিয়াতেও আসক্তি হয় না। পাওয়ার ইচ্ছে ও করার আসক্তি—এই দুটিই কর্মযোগ দ্বারা দূর হয়।

শরীরকে জগৎ-সংসারের সেবায় নিয়োগ করাই হল 'কর্মযোগ' আর শরীরকে নিজের থেকে পৃথক অনুভব করাই হল 'জ্ঞানযোগ'। উভয় সাধনারই পরিণাম হল এক অর্থাৎ জগৎ-সংসারের থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করে স্ব-স্বরূপে স্থিতিলাভ করা। ভাগবতে কৃষ্ণ-উদ্ধব সংবাদে শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে কর্মযোগকে পৃথক সাধনা বলেও জানিয়েছেন।

স্বধর্মস্থো যজন্ যজ্ঞৈরনাশীঃ কাম উদ্ভব।

ন যাতি স্বর্গনরকৌ যদ্যন্যন্ন সমাচরেৎ॥ (ভাগবত ১১।২০।১০)

যিনি স্বধর্মে স্থিত হয়ে, কোনো ভোগ কামনা না করে নিজ কর্তব্য-কর্ম দ্বারা ভগবদ্‌পূজা করেন এবং সকামভাবে কোনো কর্ম করেন না, তিনি স্বর্গ বা নরক কোনো লোকই লাভ করেন না অর্থাৎ কর্মবন্ধন থেকে মুক্ত হন।

অস্মিঁন্ লোকে বর্তমানঃ স্বধর্মোস্থোঽনঘঃ শুচিঃ।

জ্ঞানং বিশুদ্ধমাপ্নোতি মদ্ভক্তিং বা যদৃচ্ছয়া॥ (ভাগবত ১১।২০।১১)

আবার স্বধর্মে স্থিত সেই কর্মযোগী ইহলোকে সর্বপ্রকারে কর্তব্য-কর্ম করেও পাপ-পুণ্য থেকে মুক্ত হয়ে অনায়াসে তত্ত্বজ্ঞান বা পরাভক্তি (পরম প্রেম) লাভ করেন। অর্থাৎ কর্মযোগ দ্বারা জ্ঞান লাভও হতে পারে অথবা পৃথকভাবে সাধ্যজ্ঞান বা সাধ্য-ভক্তি (পরমপ্রেম)ও লাভ হতে পারে।

কর্মযোগ—শ্রেষ্ঠত্ব ও লক্ষণ—(শ্লোক ২-৩, ৬-৭)

সন্ন্যাসঃ কর্মযোগশ্চ নিঃশ্রেয়সকরাবুভৌ।
তয়োস্তু কর্মসন্ন্যাসাৎ কর্মযোগো বিশিষ্যতে॥
জ্ঞেয়ঃ স নিত্যসন্ন্যাসী যো ন দ্বেষ্টি ন কাঙ্ক্ষতি।
নির্দ্বন্দ্বো হি মহাবাহো সুখং বন্ধাৎ প্রমুচ্যতে॥

(গীতা ৫।২-৩)

সন্ন্যাসস্তু মহাবাহো দুঃখমাপ্তুমযোগতঃ।
যোগযুক্তো মুনির্ব্রহ্ম নচিরেণাধিগচ্ছতি॥
যোগযুক্তো বিশুদ্ধাত্মা বিজিতাত্মা জিতেন্দ্রিয়ঃ।
সর্বভূতাত্মভূতাত্মা কুর্বন্নপি ন লিপ্যতে॥

(গীতা ৫।৬-৭)

'ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন—কর্মসন্ন্যাস এবং কর্মযোগ এই দুটিই পরম কল্যাণকর। কিন্তু উভয়ের মধ্যে কর্মসন্ন্যাস থেকে কর্মযোগ সাধন সহজ হওয়ায় শ্রেষ্ঠ।

যিনি কারোর প্রতি দ্বেষ করেন না এবং কোনো কিছু আকাঙ্ক্ষা করেন না, সেই কর্মযোগীকে নিত্যসন্ন্যাসী বলে জানবে। কারণ রাগ-দ্বেষাদির

দ্বন্দ্বরহিত ব্যক্তি অনায়াসে সংসার বন্ধন থেকে মুক্ত হন।' (গীতা ৫।২-৩)

কর্মযোগ ব্যতিরেকে সন্ন্যাস অর্থাৎ মন, ইন্দ্রিয় এবং শরীর দ্বারা কৃত সমস্ত কর্মে কর্তৃত্ব ত্যাগ করা কঠিন হয়। ভগবৎস্বরূপ মননকারী কর্মযোগী শীঘ্রই পরব্রহ্ম পরমাত্মাকে লাভ করেন।

যাঁর মন বশীভূত, যিনি জিতেন্দ্রিয়, বিশুদ্ধচিত্ত এবং সর্বপ্রাণীর আত্মারূপ পরমাত্মাই যাঁর আত্মাস্বরূপ সেই কর্মযোগী কর্ম করলেও তাতে লিপ্ত হন না। (গীতা ৫।৬-৭)

কর্মযোগ ও সাংখ্যযোগ—

১) **কর্মযোগই বীজ**—ভগবান বলছেন সাংখ্যযোগ ও কর্মযোগ উভয়ই কল্যাণকর কিন্তু তার মধ্যে 'কর্মযোগ বিশিষ্যতে' অর্থাৎ কর্মযোগই শ্রেষ্ঠ। সাংখ্যযোগে কর্মযোগের প্রয়োজন হয় কিন্তু কর্মযোগে সাংখ্যযোগের প্রয়োজনীয়তা থাকে না। কর্মযোগ ব্যতীত সাংখ্যযোগের সাধন হওয়া কঠিন, কিন্তু কর্মযোগী নিজেই অতি শীঘ্র ব্রহ্মলাভ করতে সমর্থ হন। যেহেতু কর্মযোগের অনুষ্ঠান পালন না করে সাংখ্যযোগ পালন করা কঠিন তাই সাংখ্যযোগের সাধক প্রথমে কর্মযোগী পরে সন্ন্যাসী (সাংখ্যযোগী) কিন্তু কর্মযোগী প্রথম থেকেই সন্ন্যাসী।

২) **অহং ত্যাগ**—কর্মযোগীর অহং (ব্যক্তিত্ব) শীঘ্র এবং সহজেই নাশ হয়। কিন্তু সাংখ্যযোগীর 'অহং' সাধনার উচ্চাবস্থাতেও টিকে থাকে। আমি সেবক এই ভাব থাকায় কর্মযোগীর অহং সেব্যের সেবায় লেগে যায় কিন্তু 'আমি মুমুক্ষু' এই ভাব থাকায় জ্ঞানীর অহং সহজে তার সঙ্গ ছাড়ে না। কর্মযোগী নিজের হিতার্থে কিছু না করে কেবলমাত্র অপরের হিতার্থে করেন, কিন্তু জ্ঞানযোগী কেবল নিজের হিতার্থে কর্ম করেন তাই তাঁর 'অহম্' বহুদূর পর্যন্ত সঙ্গে থেকে যায়।

৩) **আসক্তি ত্যাগ**—জ্ঞানযোগের সাধনা হল জগতের নিত্যতার অভাব বোধ করা এবং কর্মযোগের প্রধান বিষয় হল আসক্তির অভাব বোধ করার সাধনা। জ্ঞানযোগীর পক্ষে কোনো বস্তুকে মায়া মনে করে ত্যাগ করা অত্যন্ত কঠিন কিন্তু কর্মযোগীর পক্ষে অন্যের প্রয়োজনে সেটি ত্যাগ করা সহজ।

যেমন, যদি কারো কাছে একটি কম্বল থাকে তবে বিচারপূর্বক ইহা ক্ষণভঙ্গুর, অনিত্য ইত্যাদি ভেবে পরিত্যাগ করা বিশেষ সহজ নয় যতটা সহজ সেটি অন্যের প্রয়োজন আছে বলে ত্যাগ করা। আবার অসৎ বস্তুকে অসৎ বলে জানলেই তাতে আসক্তির নিবৃত্তি হয় না। যেমন চলচ্চিত্রে দৃশ্যমান বস্তুগুলি বাস্তবিক নয় এইরূপ জানলেও তাতে আসক্তি জন্মায়। যদি আসক্তি না থাকে তবে পদার্থের সত্তা মানলেও তাতে আসক্তি জন্মায় না। তাই সাধকের প্রধান কাজ হল বস্তুর প্রতি আসক্তি দূর করা, সত্তার অভাব (বা অস্তিত্ব) বোধ করা নয়, যা কর্মযোগ দ্বারা সহজে সম্ভব।

৪) **কর্তৃত্ব ও ভোক্তৃত্ব**—এই নিয়েই জগৎ-সংসার। সাংখ্যযোগী ও কর্মযোগী সাধক উভয়েই সংসার থেকে সম্পর্ক ছেদন করতে চান, তাই উভয় যোগীরই কর্তৃত্ব ও ভোর্ক্তৃত্বরহিত হতে হয়। সাংখ্যযোগী তীব্র বৈরাগ্য ও তীক্ষ্ণবুদ্ধির সংযোগে 'কর্তৃত্ব' ত্যাগ করে, সংসার বন্ধন থেকে মুক্ত হন। কিন্তু বৈরাগ্যর তীব্রতা বা তীক্ষ্ণ বুদ্ধি না থাকা সত্ত্বেও কর্মযোগী অন্যের হিতার্থে কর্ম করে তার ভোক্তৃত্ব বা কিছু পাওয়ার আশা ত্যাগ করে মুক্তিলাভ করেন।

'কর্তৃত্ব' ত্যাগ হলেই ভোক্তৃত্ব ত্যাগ হয় আর ভোর্ক্তৃত্ব ত্যাগ হলেই কর্তৃত্ব ত্যাগ হয়। তাই সাংখ্যযোগী ও কর্মযোগী সাধনার অন্তে একই সাধ্য বস্তু অর্থাৎ পরমাত্মাকে লাভ করেন।

কর্মযোগের উৎকর্ষতা—

১) কর্মযোগী কেবল লোকসংগ্রহের জন্য কর্ম করেন—**'লোক-সংগ্রহমবাপি সংপশ্যন্ কর্তুমর্হসি'** (গীতা ৩।২০)। লোকসংগ্রহের অর্থ হচ্ছে নিঃস্বার্থভাবে অন্যের হিতার্থে কর্ম করা যাতে জনসাধারণ কুপথ থেকে সুপথে চালিত হয়। গীতা এই কর্মযোগকেই 'যজ্ঞার্থ কর্ম' বলেছেন। নিজের জন্য কর্ম করলেই জীব বদ্ধ হয়—**'যজ্ঞার্থাৎ কর্মণোঽন্যত্র লোকোঽয়ং কর্মবন্ধনঃ'** (গীতা ৩।৯)। কর্মযোগী যেহেতু নিঃস্বার্থভাবে কেবলমাত্র অপরের হিতার্থে কর্ম করে তাই সে সহজেই কর্মবন্ধন থেকে মুক্ত হয়। **'যজ্ঞায়াচরতঃ কর্ম সমগ্রং প্রবিলীয়তে'** (গীতা ৪।২৩) কর্মযোগকে এই

জন্যই শ্রেষ্ঠ বলা হয়েছে।

২) প্রাপ্ত পরিস্থিতির সদুপযোগ করাকেই কর্মযোগ বলে। যে কোনো পরিস্থিতিতেই যে কোনো ব্যক্তি যে কোনো বর্ণ, আশ্রম বা সম্প্রদায়েরই হোন না, কর্মযোগের সাধন করতে পারেন। তাই ভগবান অর্জুনকে যুদ্ধের মতো ঘোরালো পরিস্থিতিতেও কর্মযোগ পালনের উপদেশ দিয়েছেন। জ্ঞানযোগের পরিবেশ সৃষ্টি অথবা সিদ্ধ মহাপুরুষের সাক্ষাৎ লাভ বা শ্রদ্ধা সহকারে তাঁর নিকট বাস সকলের পক্ষে সহজ নয়। কিন্তু পরিস্থিতি অনুযায়ী কর্ম করা, যেখানে লাভের আশা ত্যাগ করতে হয়—তা সকলের পক্ষেই সম্ভব। তবে কর্মযোগী কেবল সেবা করার মানসেই সকলকে আপন করেন কিন্তু নিজের স্বার্থের জন্য কাউকে আপন বলে মনে করেন না।

৩) ন দ্বেষ্টি—কর্মযোগীর উদ্দেশ্য কিন্তু সকলকে সুখী করা ও কেবল সেবা করা নয়। কর্মযোগী কোনো প্রাণী, বস্তু, পরিস্থিতি বা সিদ্ধান্ত ইত্যাদিতে রাগ বা দ্বেষও করেন না **'যো ন দ্বেষ্টি ন কাঙ্ক্ষতি'**। যাঁর প্রতি কর্মযোগীর বিন্দুমাত্র দ্বেষও উৎপন্ন হয়, কর্মযোগীর সর্বপ্রথম তারই সেবা করা উচিত।

৪) নির্দ্বন্দ্ব—ভগবান বলছেন দ্বন্দ্বরহিত ব্যক্তি অনায়াসে সংসার বন্ধন থেকে মুক্ত হন। **'নির্দ্বন্দ্বো হি মহাবাহো সুখং বন্ধাৎ প্রমুচ্যতে'**। দ্বন্দ্বরহিত হওয়ার অর্থ রাগ-দ্বেষ দূর হওয়া। আর রাগ-দ্বেষ দূর করার প্রধান উপায় হল এরূপ বিচার করা যে অনুকূল-প্রতিকূল পরিস্থিতি ইচ্ছা-অনিচ্ছার অপেক্ষা রাখে না। নিজের আকাঙ্ক্ষায় অনুকূল পরিস্থিতির উদ্ভব তথা না চাইলে প্রতিকূল পরিস্থিতির তিরোভাব কখনোই সম্ভব নয়। এই সব পরিস্থিতি আসে-যায় নিজ প্রারব্ধর ফল অনুসারে। বর্তমান কর্মানুসারে নয়। সুতরাং এদের আসা-যাওয়ার প্রতি আকাঙ্ক্ষা করে কী লাভ ? অনুকূল অবস্থার প্রতি আসক্তি ও প্রতিকূল অবস্থার প্রতি দ্বেষ হয় কেবল নিজের ভ্রমে। আর এইরূপ চিন্তা করলেই মনের ভ্রম দূর হবে এবং অনুকূল-প্রতিকূল অবস্থার প্রতি রাগ-দ্বেষ সম্পূর্ণ তিরোহিত হবে। কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ এবং ভক্তিযোগ এই তিন যোগেই নির্দ্বন্দ্ব হওয়া অত্যন্ত আবশ্যক। সংসারের সঙ্গে

সম্পর্ক ছেদ বা লিপ্ততার অভাবকেই সন্ন্যাস বলে এবং কর্মযোগীর রাগ-দ্বেষ না থাকায় সংসারে লিপ্ততার ভাবও থাকে না। সুতরাং কর্মযোগী নিত্যসন্ন্যাসী।

৫) কর্মযোগ সকাম হয় না। কর্মযোগী প্রাণীমাত্রেরই হিতের জন্য কাজ করেন। তবে কর্মযোগীর অন্যের ভালো করার চেয়ে নিজের দোষ ত্যাগ করা বেশি প্রয়োজন। লোকের ভালো করলে শুধুমাত্র সমাজের এক অংশের উপকার হয় আর নিজে দোষরহিত হলে সমগ্র বিশ্বের হিত হয়। ভালো কাজ করলেও যদি হৃদয়ের কুভাব দূর না হয় তাহলে অহঙ্কার জন্মায় যা আসুরী সম্পদের মূল। 'আমি ভালো কাজ করছি' এই অহঙ্কার খারাপ কাজের থেকেও ভয়ঙ্কর, কারণ এই ভাবটি 'আমিত্বের' মধ্যে বাসা বাঁধে। যা তার জন্ম-জন্মান্তরের সাথী হয়ে থাকে। সেইজন্য কুভাবরহিত মহাপুরুষ যদি হিমালয়ের একান্ত গুহাতেও অবস্থান করেন, তাহলেও তাঁর দ্বারা বিশ্বের বহু কল্যাণ সাধিত হয়।

কর্মযোগের লক্ষণ—ভগবান ৭ম শ্লোকে কর্মযোগীর লক্ষণ বর্ণনা করেছেন। কর্মযোগী হন জিতেন্দ্রিয়, বিশুদ্ধ আত্মা, বিজিতাত্মা ও সর্বভূতাত্মা।

জিতেন্দ্রিয়— কর্মযোগী জিতেন্দ্রিয় হবেন অর্থাৎ তাঁর ইন্দ্রিয়াদি নিজ-নিজ বিষয় সম্পৃক্ত রাগ-দ্বেষ থেকে মুক্ত থাকবে। রাগ-দ্বেষরহিত হওয়ায় ইন্দ্রিয়াদির আর মনকে বিচলিত করার শক্তি থাকে না। সাধক তখন ইন্দ্রিয়াদিকে সংযত করে ইচ্ছানুকূল কাজে লাগাতে পারেন।

মনুস্মৃতিতে জিতেন্দ্রিয় সম্বন্ধে বলা হয়েছে—

শ্রুত্বা স্পৃষ্ট্বা চ দৃষ্ট্বা চ ভুক্ত্বা ঘ্রাত্বা চ যো নরঃ।
ন হৃষ্যতি গ্লায়তি বা স বিজ্ঞেয়ো জিতেন্দ্রিয়ঃ॥ (মনুস্মৃতি ২।৯৮)

'যে ব্যক্তি শুনে, স্পর্শ করে, দেখে, খেয়ে এবং ঘ্রাণ নিয়ে কখনো প্রসন্ন বা খিন্ন হন না, তাঁকেই জিতেন্দ্রিয় বলে জানবে।'

কর্মযোগীর কর্মের সঙ্গে নিবিড় সম্বন্ধ থাকে, তারা অন্যকে সেবার ভাব নিয়ে কর্ম করেন, তাই তাদের ইন্দ্রিয়গুলি বশে রাখা অত্যন্ত জরুরি।

ইন্দ্রিয়গুলি বশে না থাকলে কর্মযোগের সাধনায় অগ্রগতি হওয়া খুবই কঠিন।

বিশুদ্ধ আত্মা—সাংসারিক পদার্থে গুরুত্ব দেওয়া হলেই অন্তঃকরণে মালিন্য আসে। যেখানেই সাংসারিক পদার্থে গুরুত্ব সেখানেই কামনা, আর যখন এইসব পদার্থে গুরুত্ব দেওয়া হয় না তখনই মানুষ নিষ্কাম হয়। আর পরমাত্মাপ্রাপ্তির উদ্দেশ্য দৃঢ় হলে কর্মযোগীর অন্তঃকরণ যত শীঘ্র এবং যেমনভাবে শুদ্ধ হয় আর অন্য কোনো সাধনপথে সেরূপ হওয়া সুকঠিন।

বিজিত আত্মা—কর্মযোগে শরীরে সুখ আরাম ত্যাগ অত্যন্ত প্রয়োজন। শরীরে আলস্য-প্রমাদ আসলে, কর্মযোগের অনুষ্ঠান সম্ভব হয় না। তাই ভগবান শরীর বশে রাখার কথা বলেছেন।

সর্বভূত আত্মভূতাত্মা—কর্মযোগীর সমস্ত প্রাণীজগতের সঙ্গে একাত্মতা অনুভূত হয়। যেমন শরীরের এক অংশে আঘাত লাগলে অন্য সব অঙ্গ তার সেবায় এগিয়ে আসে এবং তা হয় সহজভাবে, অহঙ্কার ব্যতিরেকে, কৃতজ্ঞতার আশা না করে এবং স্বতঃস্ফূর্তভাবে, সেইরকম কর্মযোগীও সেবা করার জন্য কোনো প্রাণীকে পৃথক মনে করেন না, সবাইকে নিজ অঙ্গ বলে মনে করে সেবা করেন। তবে শরীরের বিভিন্ন অঙ্গের ব্যবহার বিভিন্ন হলেও যেমন প্রত্যেক অঙ্গের প্রতি অন্য অঙ্গদের নিজভাব থাকে, সেইরকম কর্মযোগীও মর্যাদা অনুযায়ী বিভিন্ন প্রাণীর প্রতি বিভিন্ন ব্যবহার করলেও সকলের প্রতি তাঁর একাত্মভাবের কখনো অভাব হয় না।

যোগযুক্তঃ—জিতেন্দ্রিয়, বিশুদ্ধাত্মা, বিজিতাত্মা এবং সর্বভূতাত্ম-ভূতাত্মা—এই চারটি লক্ষণযুক্ত কর্মযোগীই 'যোগযুক্তঃ'। কর্মযোগী যোগযুক্ত হলে তাঁর মধ্যে অন্যান্য ভাবও পরিস্ফুট হয়।

১) **উদারতা**—আমাদের যা কিছু আছে তা আমাদের নিজস্ব নয়—এইরূপ ভেবে সেগুলিকে অন্যের সেবায় লাগানোই উদারতা। এই ভাব জাগলে জগৎ—সংসার, পদার্থ আদির সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ হয়ে যায়।

২) **নির্লিপ্ততা**—কর্মযোগী সদাই নির্লিপ্ত থাকেন। তিনি কর্ম করার সময় তো নির্লিপ্ত থাকেনই, যখন কর্ম করেন না তখনো নির্লিপ্ত থাকেন।

'কর্মণ্যকর্ম যঃ পশ্যেদকর্মণি চ কর্ম যঃ' (গীতা ৪।১৮) তিনি কর্মে অকর্ম দেখেন এবং অকর্মে কর্ম দেখেন। অর্থাৎ কর্মযোগীর প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি দুইই নির্লিপ্তিমূলক, শুধু জগতের মঙ্গলের জন্য হয়ে থাকে। তার কর্ম করার বা না করারও কোনো প্রয়োজন থাকে না। 'নৈব তস্য কৃতেনার্থো নাকৃতেনেহ কশ্চন' (গীতা ৩।১৮) কর্মযোগে সিদ্ধ মহাপুরুষদের এই সংসারে কর্মানুষ্ঠানেরও কোনো প্রয়োজন নেই বা কর্ম থেকে বিরত থাকারও কোনো প্রয়োজন নেই। তাঁরা সদাই নির্লিপ্ত থাকেন।

৩) **উদ্দেশ্য ও রুচির অভিন্নতা**—সাধনায় স্বাভাবিক প্রবৃত্তি না হওয়ার কারণ উদ্দেশ্য ও রুচির ভিন্নতা। সাধারণত মানুষের চিত্ত কখনো কখনো বিবেক দ্বারা পরিচালিত হয়ে পরমাত্মা প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে রত হলেও তাদের রুচি স্বভাব দ্বারা পরিচালিত হওয়ায় তারা সংসারের দিকে আকৃষ্ট হয়। কিন্তু কর্মযোগীর চিত্তে সাংসারিক পদার্থের গুরুত্ব বা তাদের প্রতি আসক্তি থাকে না, তাই প্রায়ই তাদের উদ্দেশ্য বা রুচির সংঘর্ষ হয় না। উদ্দেশ্য ও রুচি এক হলে সাধনা শক্তি পায়। যোগযুক্তঃ পদটি কর্মযোগীর জন্য ব্যবহৃত, যাদের উদ্দেশ্য ও রুচি অভিন্ন এবং তা পরমাত্মার প্রতিই নিবদ্ধ রয়েছে।

কর্মযোগ—সাধন ও মহিমা—(শ্লোক ১১-১২, ১-৯)

কায়েন মনসা বুদ্ধ্যা কেবলৈরিন্দ্রিয়ৈরপি।
যোগিনঃ কর্ম কুর্বন্তি সঙ্গং ত্যক্ত্বাত্মশুদ্ধয়ে॥
যুক্তঃ কর্মফলং ত্যক্ত্বা শান্তিমাপ্নোতি নৈষ্ঠিকীম্।
অযুক্তঃ কামকারেণ ফলে সক্তো নিবধ্যতে॥

(গীতা ৫।১১-১২)

অনাশ্রিতঃ কর্মফলং কার্যং কর্ম করোতি যঃ।
স সন্ন্যাসী চ যোগী চ ন নিরগ্নির্ন চাক্রিয়ঃ॥
যং সন্ন্যাসমিতি প্রাহুর্যোগং তং বিদ্ধি পাণ্ডব।
ন হ্যসন্ন্যস্তসঙ্কল্পো যোগী ভবতি কশ্চন॥
আরুরুক্ষোর্মুনের্যোগং কর্ম কারণমুচ্যতে।
যোগারূঢ়স্য তস্যৈব শমঃ কারণমুচ্যতে॥

যদা হি নেন্দ্রিয়ার্থেষু ন কর্মস্বনুষজ্জতে।
সর্বসঙ্কল্পসন্ন্যাসী যোগারূঢ়স্তদোচ্যতে॥
উদ্ধরেদাত্মনাত্মানং নাত্মানমবসাদয়েৎ।
আত্মৈব হ্যাত্মনো বন্ধুরাত্মৈব রিপুরাত্মনঃ॥
বন্ধুরাত্মাত্মনস্তস্য যেনাত্মৈবাত্মনা জিতঃ।
অনাত্মনস্তু শত্রুত্বে বর্তেতাত্মৈব শত্রুবৎ॥
জিতাত্মনঃ প্রশান্তস্য পরমাত্মা সমাহিতঃ।
শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু তথা মানাপমানয়োঃ॥
জ্ঞানবিজ্ঞানতৃপ্তাত্মা কূটস্থো বিজিতেন্দ্রিয়ঃ।
যুক্ত ইত্যুচ্যতে যোগী সমলোষ্টাশ্মকাঞ্চনঃ॥
সুহৃন্মিত্রার্যুদাসীনমধ্যস্থদ্বেষ্যবন্ধুষু।
সাধুষ্বপি চ পাপেষু সমবুদ্ধির্বিশিষ্যতে॥

(গীতা ৬।১-৯)

'কর্মযোগী আসক্তি ত্যাগ করে মমতারহিত হয়ে ইন্দ্রিয়-শরীর-মন-বুদ্ধি সহযোগে অন্তঃকরণ শুদ্ধির জন্য কর্ম করেন।

যেহেতু কর্মফল ত্যাগ করে তিনি কর্ম করেন, তাই তিনি নৈষ্ঠিকী শান্তি (মোক্ষ) প্রাপ্ত হন। কিন্তু সকাম ব্যক্তি কামনাবশত কর্ম করার ফলে আসক্ত হয়ে বন্ধন দশা প্রাপ্ত হয়'। (গীতা ৫।১১-১২)

ভগবান কর্মযোগের শ্রেষ্ঠতা জানানোর জন্য বলছেন—

'কর্মফলের আশ্রয় না নিয়ে যে কর্তব্যকর্ম করে সেই সন্ন্যাসী এবং সেই যোগী। অগ্নি অর্থাৎ যজ্ঞাদি ত্যাগ করে সন্ন্যাসী বা কর্মত্যাগ করে যোগী হওয়া যায় না।

যা সন্ন্যাস তাই যোগ। সঙ্কল্প ত্যাগ না করলে কেহই যোগী হতে পারে না।

যোগ সাধনের পথে কর্মসাধনই পথ আর যোগস্থ হয়ে গেলে শম বা চিত্তের শান্তিই পরমাত্মা প্রাপ্তির উপায়।

যে ইন্দ্রিয়ভোগ বা কর্মে আসক্ত হয় না, সেই সব সঙ্কল্পত্যাগী সাধককে যোগারূঢ় বা যোগস্থ বলে।

নিজের দ্বারা নিজেকে উদ্ধার করতে হয় এবং দেখতে হয় যাতে নিজের পতন না হয়। কারণ সকলেই নিজেই নিজের বন্ধু এবং নিজেই নিজের শত্রু।

যে নিজেই নিজেকে জয় করেছে সে নিজেই নিজের বন্ধু আর যে নিজেকে জয় করতে পারেনি, সে অনাত্মার আত্মা হয়ে নিজ শত্রুতা সাধন করে।

যিনি নিজেকে জয় করেছেন যিনি শীত-গ্রীষ্ম (অনুকূল-প্রতিকূল), সুখ-দুঃখ এবং মান-অপমানে নির্বিকার ও প্রশান্ত থাকেন তিনি পরমাত্মাকে লাভ করেন।

যাঁর অন্তঃকরণ জ্ঞান-বিজ্ঞান দ্বারা পরিতৃপ্ত, যিনি কুটের (কামারের বেদীর) ন্যায় নির্বিকার, যিনি জিতেন্দ্রিয়, এবং মাটির ডেলা, পাথর ও সুবর্ণে সমবুদ্ধিসম্পন্ন—এইরূপ যোগীকে যুক্ত (যোগস্থ বা যোগারূঢ়) বলে।

সমবুদ্ধিসম্পন্নদের মধ্যে যিনি সুহৃদ, মিত্র, শত্রু, উদাসীন, মধ্যস্থ, দ্বেষ্য, আত্মীয়গণ, সাধু আচরণকারী এবং পাপাচরণকারীদের প্রতি সমবুদ্ধিসম্পন্ন তিনিই শ্রেষ্ঠ।' (গীতা ৬।১-৯)

ফলত্যাগ ও আসক্তিত্যাগ—পঞ্চম অধ্যায়ের ১১ এবং ১২ শ্লোকে ভগবান কর্মযোগীর সাধনের প্রণালী বলেছেন। কর্মযোগ কখনো সকাম হয় না, আর সকাম ব্যক্তি সর্বদা কামনাবশত কর্ম করে, ফলে আসক্ত হয় এবং বন্ধন দশা প্রাপ্ত হয়। **'ফলে সক্তো নিবধ্যতে'** (গীতা ৫।১২)।

কর্মযোগী **'কর্ম ফলং ত্যক্ত্বা'** অর্থাৎ কর্মফল (কর্মফলের আশা বা কামনা) ত্যাগ করে কীভাবে কাজ করেন ? তিনি করেন **'সঙ্গং ত্যক্ত্বা আত্মশুদ্ধয়ে'** (গীতা ৫।১১)। অর্থাৎ তিনি আসক্তি ত্যাগ করে এবং আত্মশুদ্ধির জন্যই কাজ করেন। তিনি শরীর, মন ও বুদ্ধিদ্বারাই কর্ম করলেও এগুলিতে আসক্তি রাখেন না, মমত্ব রাখেন না বা এগুলিকে এদের নিজের বলেও মনে করেন না।

সমষ্টি ও ব্যষ্টির মধ্যে কোনো ভেদ নেই, তাদের সম্পর্ক নিত্য।

পাশ্চাত্য মতে কণা কণা অণু (অর্থাৎ ব্যষ্টি) মিলে সমষ্টি অর্থাৎ এই জগৎ সংসারকে সৃষ্টি করেছে। কিন্তু হিন্দুশাস্ত্র বলে সমষ্টি ও ব্যষ্টি সত্তা সবই এক অখণ্ড সত্তা, আর আমাদের বুদ্ধিই তাকে খণ্ড খণ্ড করেছে। ভক্ত কখনো সত্তাকে বিভক্ত করে না, খণ্ড-বৃহৎ-সবার মধ্যেই সে চিন্ময় সত্তার রূপ দেখে। যেহেতু ব্যষ্টি কখনো সমষ্টি থেকে পৃথক নয় তাই শরীর ইত্যাদির সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করলেই জগৎ-সংসারের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করা হয় ফলে বারে বারে সংসারে ফিরে আসতে হয়। যেমন একটি মেয়ের সঙ্গে বিবাহ হলে শ্বশুর-শাশুড়ি আদি সকলের সঙ্গেই স্বতঃই সম্পর্ক স্থাপিত হয়, সেইরকম জগৎ-সংসারের কোনো বস্তুর (শরীর ইত্যাদির) সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপিত হলে অর্থাৎ সেটিকে নিজের বলে মেনে নিলে, জগৎ-সংসারের সঙ্গে সম্পর্ক আপনিই স্থাপিত হয়।

কর্মযোগী তাই শরীরের প্রতি আসক্ত না হয়ে নিষ্কাম কর্ম করে থাকেন যাতে অপরের হিতকর্ম করেও মনে কোনো অহংভাব প্রকাশ না পায়। আবার অহংভাব প্রকাশ না পেলেও যদি অভিষ্ট কর্ম করার ফলে বা কাউকে সাহায্য করে বা তার মনস্কামনা পূর্ণ করায় নিজের মনে প্রসন্নতা আসে তবে তাও নিজ শরীর, মন, বুদ্ধির প্রতি মমত্ববোধ প্রমাণ করে। তাই কর্মযোগী কখনো শরীরের প্রতি মমত্ববোধ বা অহংভাব নিয়ে কর্ম করেন না ফলে কর্মফলেও আসক্ত হন না।

ষষ্ঠ অধ্যায়ের এই দুই শ্লোকে ভগবান কর্মফলের আশ্রয় এবং সংকল্প ত্যাগের কথা বলেছেন।

কর্মফল চার প্রকারের—

ক্রিয়মান কর্মের—দৃষ্ট কর্মফল (তৎক্ষণাৎ প্রাপ্ত হওয়া) ও অদৃষ্ট কর্মফল (যা সঞ্চিতরূপে জমা পড়ে)।

প্রারব্ধ কর্মের—প্রাপ্ত কর্মফল (যা বর্তমানে শরীর, জাতি, বর্ণ, সম্পত্তি, অনুকূল-প্রতিকূল পরিস্থিতি রূপে প্রাপ্ত) ও অপ্রাপ্ত কর্মফল (প্রারব্ধ কর্মের ফল যা অনুকূল-প্রতিকূল পরিস্থিতিরূপে ভবিষ্যতে ঘটতে পারে)।

কর্মযোগীর কর্মফল ত্যাগের অর্থ, দৃষ্ট বা প্রাপ্ত কর্মফলে আগ্রহ ও

মমত্ববোধ না রাখা অথবা পাওয়া গেলেও তাতে সুখী বা দুঃখী অথবা প্রসন্ন-অপ্রসন্ন না হওয়া। সেইরকম অদৃষ্ট ও অপ্রাপ্ত কর্মফলের ওপর আশা করে বসে না থাকা বা ইচ্ছে না করা যে দুঃখ দূর হোক এবং সুখ আসুক।

এই বিধি অনুসারে কর্তব্যকর্ম করলে পুরাতন আসক্তি নাশ পায় আর নিঃস্বার্থভাবে পরহিতের জন্য কর্ম করলে নতুন আসক্তি উৎপন্ন হয় না এবং কর্মের বেগও নাশ হয়।

এখানে আলোচ্য, ভগবান বলছেন যোগারূঢ় হতে গেলে কর্ম করা আবশ্যক এবং কর্ম করেই জনকাদি পরমতত্ত্ব প্রাপ্ত হয়েছেন। আমরা জানি পার্বতী, মনু-শতরূপা, ধ্রুব আদি সকলেই জপ-ধ্যান-সৎসঙ্গ, স্বাধ্যায়-শ্রবণ-মননাদি তপস্যাদি কর্ম দ্বারা ভগবৎ প্রাপ্ত হয়ে গেছেন।

আবার ভগবান এও বলেছেন—

নাহং বেদৈর্ন তপসা ন দানেন ন চেজ্যয়া।
শক্য এবং বিধো দ্রষ্টুং দৃষ্টবানসি মাং যথা॥ (গীতা ১১।৫৩)

'আমাকে বেদের দ্বারা, তপস্যা দ্বারা, দান বা যজ্ঞরূপ কোনো ক্রিয়া দ্বারাই পাওয়া সম্ভব নয়।'

তাহলে এই দুই ভাবের সামঞ্জস্য রক্ষা কীরূপে সম্ভব ? আসলে পরমাত্মাকে সাধনের জোরে (বিনিময়ে) পাওয়া সম্ভব নয়, কারণ প্রকৃতির সঙ্গে সম্পৃক্ত সমস্ত পদার্থ এক করলেও চিন্ময় পরমাত্মার বিন্দুমাত্র সমকক্ষ হতে পারে না। আর কর্ম দ্বারা অর্থাৎ সাধনার দ্বারাই যদি তাঁকে পাওয়া যেত তবে তিনি কর্মের থেকে কমদামী প্রমাণিত হতেন। আসলে ভগবানকে কর্মের দ্বারা পাওয়া যায় না, তিনি কোনো কর্মের ফল নন। পরমাত্মা সমস্ত দেশ, কাল, বস্তু, ব্যক্তি, ঘটনা, পরিস্থিতি ইত্যাদিতে সদাসর্বদা বর্তমান। পরমাত্মা হতে কখনো কোনো ব্যক্তি পৃথক ছিল না, নেই, হবে না বা হওয়া সম্ভবও নয়। কিন্তু শরীর-ইন্দ্রিয়-মন-বুদ্ধি-পদার্থ আদিতে অহংকার ও মমত্বপূর্বক নিজ সম্পর্ক রাখতে গিয়ে আমরা পরমাত্মা থেকে বিমুখ হয়ে যাই। বাস্তবিক আমরা (স্বয়ং) নিজের পরমাত্মাকে না মেনে যা নিজের নয় সেই ইন্দ্রিয়-শরীর-পদার্থাদি জড় পদার্থকে নিজের বলে মেনে নিই। সাধনার

তাৎপর্য হল জড়পদার্থের সঙ্গে জীব যে অহৈতুক সম্পর্ক স্থাপন করে তা দূর করা। যে কর্মের দ্বারা বিনাশশীল পদার্থের প্রতি আসক্তি জন্মায়, সেই কর্মই নিষ্কামভাবে লোকহিতার্থে ও পরমাত্মপ্রাপ্তির নিমিত্ত করলে তা ঈশ্বরলাভে সহায়ক হয়। ইহাই কর্মযোগের মূলতত্ত্ব। ভগবান কর্মযোগ সম্বন্ধে তৃতীয় ও চতুর্থ অধ্যায়ে বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করেছেন।

কর্মযোগী ও সন্ন্যাসী—ষষ্ঠ অধ্যায়ের প্রথম নয়টি শ্লোকে ভগবান কর্মযোগ সম্বন্ধে আরো বিস্তৃতভাবে বলেছেন। স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ— এই তিনটি শরীরই কর্মফল দ্বারা প্রাপ্ত। **স্থূল শরীর** দ্বারা কৃত সমস্ত কর্ম ও পদার্থগুলিকে জগতের মনে করে তাদেরই সেবায় ব্যয় করা, **সূক্ষ্ম শরীর** দ্বারা সবার মঙ্গল চিন্তা, কীভাবে সবাই সুখী হবে, কীভাবে উদ্ধার পাবে এই চিন্তা করা এবং **কারণ শরীর** দিয়ে সংস্কার ও সমাধির দ্বারা প্রাপ্ত সমস্ত ফল জগৎ হিতার্থে সমর্পণ করা—ইহাই হল কর্মযোগ। এই তিনটি শরীরের সঙ্গেই জগতের অভিন্নতা আছে আর এদের আশ্রয় ত্যাগ না করলে অর্থাৎ এদের ওপর মমত্ব ও অহংবোধ রাখলে জগতের সঙ্গেই সম্পর্ক স্থাপিত হয় ও মানুষ জন্ম-মৃত্যুর আবরণে ঘুরতে থাকে। শরীর ও জগৎ-সংসারের প্রতি অহংবোধ ও মমত্ব আমরা কর্মফল দ্বারা প্রাপ্ত হই না, এটা স্বয়ং (বা জীবাত্মা যা পরমাত্মার অংশ) নিজেই তাদাত্ম্যভাবের ফলে প্রাপ্ত হয়। বাল্যাবস্থায় আমি বালক ও খেলনাগুলো আমার, যুবাবস্থায় আমি যুবক ও অর্থাদি আমার ইত্যাদি যে সম্বন্ধ তা স্বয়ং নিজেই স্থাপন করে। সেইজন্য কর্মফল অর্থাৎ শরীর, বস্তু ইত্যাদি বজায় থাকলেও তার আশ্রয় সহজেই বর্জন করা যায়।

অসন্ন্যস্তসঙ্কল্প—মনে যে সব স্ফুরণ হয় অর্থাৎ নানা ব্যাপার যা যা স্মরণে আসে, তার মধ্যে যেটিতে মন আবদ্ধ হয়, তার সঙ্গেই প্রিয় বা অপ্রিয় সম্পর্ক স্থাপিত হয়, সেটিকে বলা হয় সঙ্কল্প। ভগবান বলছেন এই সঙ্কল্প ত্যাগ না করলে কোনো প্রকারের মানুষ যোগী হতে পারে না, সে ভোগীই হয়ে থাকে। গীতার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সাধক যত অভ্যাসই করুক, গিরিগুহায়

বাস করুক বা সমাধি করুক, যদি অনিত্য বস্তুর সঙ্গে সম্পর্ক রাখে তবে তাকে যোগী বলা যায় না।

আরুরুক্ষো ও যোগারূঢ়—ভগবান ষষ্ঠ অধ্যায়ের তৃতীয় ও চতুর্থ শ্লোকে কর্মযোগের সাধনা ও যোগস্থের কথা বলেছেন।

যোগে আরূঢ় হতে ইচ্ছুক ব্যক্তির নিষ্কাম কর্ম করাই মূল সাধনা, কেননা ফল প্রাপ্তিতে সাধকের সমতা আছে কি না, তার কী প্রভাব পড়ে—তা তখনই বোঝা যাবে যখন সে কর্ম করে। অর্থাৎ কর্ম করার সময় যদি তার মধ্যে সমত্বের ভাব থাকে, অনুরাগ বা বিদ্বেষ না হয় তখন সেই কর্মই তার যোগের কারণ হয়ে ওঠে। আর যোগারূঢ় সিদ্ধ সাধকের পক্ষে শান্তিই হচ্ছে পরমাত্মা প্রাপ্তির কারণ। মানুষ অনিত্যর (শরীর, জাগতিক বস্তুর) সঙ্গে সম্পর্ক স্থায়ী করতে চায় আর তা পেলে হারাবার ভয় হয় ও হারালে অশান্তি উৎপন্ন হয়। কিন্তু তার শরীরাদি সকল বস্তু যখন জগতের সেবাতেই নিযুক্ত হয় তখন অনিত্য বস্তু ত্যাগে স্বাভাবিক শান্তি পাওয়া যায়। কিন্তু সাধক যদি সেই শান্তি থেকে সুখ আহরণ করতে থাকে তবে সে সেই সুখেই আটকে পড়ে। তাই ভগবান যোগারূঢ় সিদ্ধদেরও ওই শান্তিতে অনুরাগ বা সুখবোধ করতে নিষেধ করেছেন। তখন এই শান্তিই পরমাত্মা প্রাপ্তিতে কারণ হবে।

ইন্দ্রিয়ে আসক্তি ও কর্মে আসক্তি—যোগারূঢ়র অধিকারী যে সব সাধকের ইন্দ্রিয়াদি তার প্রারব্ধ কর্ম অনুসারে প্রাপ্ত শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ—এই পাঁচটি বিষয় এবং অনুকূল বস্তু, ব্যক্তি, পরিস্থিতি ইত্যাদি ভোগবুদ্ধি সহকারে ভোগ করেন না এবং তিনি এগুলি এমনি আসা-যাওয়া করে এবং অনিত্য এই বোধে নির্লিপ্ত থাকেন তিনিই 'যোগারূঢ়' হতে পারেন।

ইন্দ্রিয়াদির ভোগে আসক্ত না হওয়ার উপায় হল—

১) এর থেকে ইচ্ছাপূরণের সুখ গ্রহণ না করা। সুখগ্রহণ করলে মানুষের ইন্দ্রিয়ভোগে আসক্তি বৃদ্ধি পায়। তাই সাধকদের উচিত অনুকূল বস্তু আদি পাওয়ার আশা না করা এবং বিনা ইচ্ছায়ও যদি অনুকূল বস্তু পাওয়া যায় তবে তাতে প্রসন্ন না হওয়া। এরূপ হলে ইন্দ্রিয়ভোগে আসক্তি আসে না।

২) মানুষ প্রথমে আকাঙ্ক্ষার বস্তুর প্রয়োজন অনুভব করে ও পরে সেই বস্তু পেলে তার অধীন হয়ে যায়। অনুকূল পরিস্থিতিতে সন্তুষ্ট হওয়ার অর্থ হল নিজের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করা। কারণ সেটি পেতে থাকলে তার স্বভাব খারাপ হয়ে যায় এবং বারংবার সুখভোগের আকাঙ্ক্ষা জাগতে থাকে যা তার জন্ম-মৃত্যুর কারণ হয়ে থাকে। এটি ত্যাগ করলে যোগারূঢ় হওয়া যায়।

৩) এই চিন্তা করা যে জীবন নির্বাহের অতিরিক্ত যে সমস্ত অনুকূল বস্তু আমাদের কাছে আছে সেগুলি আমাদের নয়। সেগুলি কার আমাদের জানা নেই কিন্তু যখন কোনো অভাবগ্রস্ত প্রাণী আমাদের গোচরে আসে, সেই সামগ্রীগুলি তার মনে করে তাকেই দিয়ে দেওয়া উচিত। মনে করতে হয় যে জীবন-নির্বাহের যে অতিরিক্ত বস্তু আমাদের কাছে ছিল তার ঋণ থেকে মুক্ত হলাম। এরূপ হলে ভোগে বা সঞ্চয়ে মানুষের আসক্তি থাকে না।

কর্মস্বনুষজ্যতে—ইন্দ্রিয়র বিষয়ে যেমন অনাসক্ত থাকা উচিত তেমনি কর্মেও আসক্ত হওয়া উচিত নয়। ঠিকভাবে কর্ম করলে তাতে একপ্রকার সুখবোধ উৎপন্ন হয় এবং কর্ম ঠিকমতো না হলে একপ্রকার দুঃখবোধ উৎপন্ন হয়। এই সুখ-দুঃখ বোধই হল কর্মের আসক্তি। আবার মানুষের যেমন কর্মে আসক্তি সেইরকম কর্ম না করারও আসক্তি হয়। প্রথমটি রাজসিক ও পরেরটি তামসিক বৃত্তি। এই উভয় বৃত্তিই ত্যাগ করা উচিত।

কর্মে প্রবণতা—ফলেচ্ছা না থাকলেও মানুষের কর্মের প্রতি এক স্বতন্ত্র প্রবণতা থাকে। ভগবানের জন্য বা অন্যের জন্য কর্ম করলে এই প্রবণতা বা আসক্তি দূর হয়। এই প্রসঙ্গে দ্বাদশ অধ্যায় উল্লেখ্য।

এই অধ্যায়ে ভক্তিযোগে ভগবান উচ্চস্তরের সাধকের ক্রম বর্ণনা করেছেন। শ্রেষ্ঠ হচ্ছে মদ্‌গতচিত্ত শরণাগত ভক্ত, পরে একান্তি ভক্তর কথা বলে অতঃপর অভ্যাস যোগের দ্বারা ভগবানের নাম, গুণ শ্রবণ, কীর্তন আদি সাধনা করতে বলেছেন। কিন্তু অন্তরে কর্মের প্রবণতা থাকলে অভ্যাসে মন লাগে না। ভগবান তাই পরবর্তী শ্লোকে কর্মের প্রবণতা দূর করার জন্য তাঁর নিমিত্তই কর্ম করতে বলেছেন—

অভ্যাসেঽপ্যসমর্থোঽসি মৎকর্মপরমো ভব। (গীতা ১২।১০)

অর্থাৎ যদি ভগবত চিন্তার অভ্যাসেও অসমর্থ হয় তবে আমাকেই পরম আশ্রয় মনে করে নিঃস্বার্থভাবে ও কোনো আকাঙ্ক্ষা না করে যজ্ঞ-দান-তপস্যামূলক কর্ম করলে তাও ভগবদার্থে কর্ম অর্থাৎ মৎ কর্ম হবে এবং তাতেও আমাকেই প্রাপ্ত হবে।

কর্মযোগী তাঁর কর্ম জগৎ-হিতার্থে করবেন, এতে তাঁর কর্ম-প্রবণতা কমে তিনি যোগারূঢ় হতে পারবেন।

সর্বসঙ্কল্পসন্ন্যাসী—আমাদের মনে যত স্ফূরণ হয় তার প্রত্যেকটি থেকে আমাদের সুখ বা দুঃখের চিন্তা অনুভূত হয়। এই সুখ বা দুঃখের চিন্তায় লিপ্ত হলে সেটি সঙ্কল্পে পরিণত হয়। এই সঙ্কল্পই অনুকূল পরিস্থিতিতে সুখবোধ ও প্রতিকূল পরিস্থিতিতে দুঃখবোধ অনুভূত করায়। দুই প্রকার সঙ্কল্পই বন্ধনের কারণ। এইসব সঙ্কল্প নিজস্বরূপবোধে সাহায্য করে না, ভগবানে মনোনিবেশ বা প্রীতি জন্মাতে দেয় না, অন্যকে সেবার প্রেরণা বা নিজ জনের সব কার্যেই বাধাস্বরূপ হয়ে দাঁড়ায়। এর দ্বারা শুধু ক্ষতিই হয়ে থাকে। কিন্তু মনে উঠতে থাকা স্ফূরণগুলিকে যদি লালন না করা হয় তবে তা সঙ্কল্পর রূপ ধারণ না করে আপনিই নষ্ট হয়ে যায়। স্ফূরণ হলে মানুষের তত ক্ষতি বা পতন হয় না তবে তাতে সময় নষ্ট হয় তাই স্ফূরণগুলিও পরিত্যাজ্য। তবে সাধকের সঙ্কল্প অবশ্যই পরিত্যাগ করা উচিত।

সঙ্কল্প ত্যাগের উপায় হল—

১) মনুষ্য জন্ম প্রাণীদের মধ্যে শেষ জন্ম। তাই এই অমূল্য মনুষ্য জন্ম নিরর্থক কাজে নষ্ট করা উচিত নয়, এই চিন্তা করে সঙ্কল্প ত্যাগ করা উচিত।

২) কর্মযোগের সাধক নিজ কর্তব্যকর্ম নিষ্কামভাবে পালন করেন। কর্তব্যকর্ম কেবল বর্তমানের জন্যই করা হয়, অতীত বা ভবিষ্যতের জন্য নয়। তাই সদা সঙ্কল্প-বিকল্প (যা অতীত এবং ভবিষ্যতকে নিয়ে) ত্যাগ করে সাধকের নিরাসক্ত হয়ে কর্তব্যকর্ম করা উচিত।

তস্মাদসক্তঃ সততং কার্যং কর্ম সমাচর।
অসক্তো হ্যাচরন্ কর্ম পরমাপ্নোতি পূরুষঃ।। (গীতা ৩।১৯)

৩) ভক্তিযোগের সাধকও এইভাবে সঙ্কল্প-বিকল্প ত্যাগ করে নিত্য ভগবদ্ চিন্তায় মগ্ন থাকেন।

ষষ্ঠ অধ্যায়ের পঞ্চম ও ষষ্ঠ শ্লোকে ভগবান পরমাত্মা প্রাপ্তিতে স্বয়ংই মূল সে কথা বলেছেন।

স্বরূপের দ্বারাই স্বরূপের উদ্ধার—এর তাৎপর্য হল যে শরীর, ইন্দ্রিয়াদি, মন, বুদ্ধি, প্রাণ ও আমিত্বর প্রভাব থেকে নিজ দ্বারা নিজেকে মুক্ত করা। স্বয়ং (জীবাত্মা) তাদাত্ম্যবশতই (শরীরকে আমি মনে করে) এদের সঙ্গে সম্পর্কিত হয়। এর ফলে সে এদের অত্যন্ত প্রয়োজনীয় মনে করে এবং তাদের অধীনস্ত হয়ে যায়। যেমন কারোর অর্থপ্রাপ্তি হয়েছে, পদোন্নতি হয়েছে, অধিকার প্রাপ্ত হয়েছে তখন সে নিজেকে অনেক বড় ও শ্রেষ্ঠ বলে মনে করে। এখানে বিচার করতে হবে যে স্বয়ং বড় হয়েছে না অর্থ, পদ, অধিকার দ্বারা বড় হয়েছে। স্বয়ং একরূপ থাকলেও সে এই সব প্রাকৃত বস্তুর অধীন হয়ে নিজের পতন ঘটায় অথচ এই পতনকেও সে নিজের উন্নতি বলে মনে করে এবং অধীন হয়েও সে নিজেকে স্বাধীন বলে মনে করে।

এখানে প্রশ্ন এই যে ঈশ্বর, সাধুপুরুষ, গুরু, শাস্ত্র এরা চিরহৈতেষী তবে এদের দ্বারা উদ্ধার সম্ভব নয় কেন ? উল্লেখ্য এই যে, যুগে যুগে ভগবানের অনেক অবতার আবির্ভূত হয়েছেন, নানা সাধুপুরুষ জন্মগ্রহণ করেছেন, নানা শাস্ত্র উপদিষ্ট হয়েছে কিন্তু আমাদের উদ্ধার সম্ভব হয়নি। এর কারণ হল ঈশ্বর, সাধুপুরুষ তখনই আমাদের উদ্ধার করতে পারেন যখন তাঁদের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা আসবে এবং তা করতে হবে আমাদের নিজেদেরই। যাঁরা তাঁদের শরণাগত হয়েছেন, তাঁদের বচন মেনে চলেছেন তাঁরাই উদ্ধার প্রাপ্ত হয়েছেন। স্বয়ংই জগৎ-সংসারের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করে এর বিপরীতে যাওয়ায় নিজ পতন ঘটিয়েছে। সাধারণত এই সম্পর্কগুলি স্বতঃই পরিত্যক্ত হয়, কিন্তু স্বয়ংই তখন আবার নিত্যনতুন সম্পর্ক পাতিয়ে বসে। শরীরের বালক অবস্থায় সে নিজেকে বালক ভাবে, আর শরীরের বালক অবস্থা ত্যাগ হলে সে নিজেকে যুবক ভাবে। যদি স্বয়ং নতুন নতুন সম্পর্ক স্থাপন না করে তবে পুরোনো সম্পর্ক পরিত্যাগের ফলে সে নিজের উদ্ধার নিজেই করতে পারে।

ষষ্ঠ অধ্যায়ের পঞ্চম শ্লোকে ভগবান দুবার আত্মার সম্বন্ধে বলেছেন, **'আত্মা এব হি আত্মনঃ বন্ধুঃ'** আর **'আত্মা এব রিপুঃ আত্মনঃ'** অর্থাৎ

প্রকৃতির কার্যাদির সঙ্গে আত্মার বিন্দুমাত্র সম্পর্ক স্থাপিত হলেই আত্মা আত্মার শত্রু হয়ে যায় এবং কোনো সম্পর্ক না রাখলে আত্মাই আত্মার বন্ধু হয়ে যায়।

যোগারূঢ় সাধকের সমতা—পরবর্তী তিন শ্লোকে (ষষ্ঠ অধ্যায়ের ৭ম, ৮ম ও ৯ম শ্লোকে) ভগবান পরিস্থিতি, পদার্থ ও ব্যক্তির প্রতি যোগারূঢ় ব্যক্তির আচরণের কথা বলেছেন।

পরিস্থিতি—যোগারূঢ় ব্যক্তি দ্বন্দ্ববিমুক্ত কেননা তিনি **'জিতাত্মনঃ'** অর্থাৎ শরীর-ইন্দ্রিয়াদি প্রাকৃত পদার্থের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করেন না বা ওদের নিজেদের সহায়কও ভাবেন না। তাঁরা সম থাকায় শীত-উষ্ণ অর্থাৎ প্রারব্ধজনিত অনুকূল-প্রতিকূল পরিস্থিতি এবং সুখ-দুঃখ অর্থাৎ কর্মজনিত অনুকূল-প্রতিকূল পরিস্থিতিতে নির্বিকার থাকেন। এই সব হল দৈবেচ্ছাকৃত প্রারব্ধের ফল।

আর পরেচ্ছাকৃত প্রারব্ধ যথা মান-অপমান তাতেও যোগারূঢ় সাধক নির্বিকার থাকেন, প্রশান্ত থাকেন। কেউ যদি মানসম্মান করে সাধক মনে করেন না যে এ তার গুণের জন্য বা ভালোত্বের জন্য, তিনি মনে করেন এটা যিনি প্রশংসা করছেন তাঁর ভদ্রতা, উদারতা। অপরের ভদ্রতাকে নিজের গুণ মনে করা সততার অভাব। আবার কেউ যদি অপমান করে বুঝতে হবে যে, সে বেচারী আমার পাপের ফল প্রদান করে আমাকে শুদ্ধ করতে এসেছে। কিন্তু সম্মানকে নিজের গুণ ও অপমানকে অন্যের দোষ হিসেবে দেখলে সাধক প্রশান্ত থাকতে পারেন না। প্রশান্ত চিত্ত ব্যক্তি সততই পরমাত্মা প্রাপ্ত হন। তাই গীতায় ভগবান বলেছেন—**'ইহৈব তৈর্জিতঃ সর্গো যেষাং সাম্যে স্থিতং মনঃ'** (গীতা ৫।১৯)। যাঁর মন সমভাবে অবস্থিত, তিনি জীবিত অবস্থাতেই জগৎ জয় করেছেন।

বস্তু—সমত্ববুদ্ধি সাধকের অন্তঃকরণ জ্ঞান-বিজ্ঞান দ্বারা[১] পরিতৃপ্ত তাই তিনি মাটির ঢেলা, পাথর ও সোনাকে সমান ভাবে দেখেন।

ব্যক্তি—আবার যোগারূঢ় ব্যক্তি সমস্ত মানুষের প্রতিও সমভাবাপন্ন হন।

---

[১]কর্তব্য-কর্ম করার শিক্ষা হল জ্ঞান ও সমস্ত কিছুতে সম থাকা বিজ্ঞান।

নবম শ্লোকে ভগবান নয় প্রকার ব্যক্তির প্রতিই সম-ভাবের কথা বলেছেন—

সুহৃদ— যে ব্যক্তি কোনো কারণ ব্যতিরেকে সকলের হিত চায় এবং মঙ্গল করার স্বভাবসম্পন্ন তিনি 'সুহৃদ'।

মিত্র—যে ব্যক্তি উপকারের পরিবর্তে প্রত্যুপকার করে সে হচ্ছে মিত্র।

অরি— বিনা কারণে সুহৃদ যেমন উপকার করে, সেইরকম অকারণে অপরের অনিষ্ট করা যার স্বভাব তিনি 'অরি'।

দ্বেষ্য—যে নিজ স্বার্থসিদ্ধির জন্য বা বিশেষ কারণে অন্যের অনিষ্ট করে তিনি 'দ্বেষ্য'।

মধ্যস্থ—দুপক্ষের বিবাদে যিনি উভয়ের মঙ্গল চান এবং বিবাদ মেটানোর চেষ্টা করেন তিনি মধ্যস্থ।

উদাসীন—দুপক্ষের বিবাদে যিনি পক্ষপাতিত্ব করেন না বা নিজে থেকে কিছু বলেনও না তিনি উদাসীন।

বন্ধুসু—সখ্যতা।

সাধুস্বপি চ পাপেষু—শ্রেষ্ঠ আচরণকারী ও পাপাচরণকারীদের সঙ্গে ব্যবহারে পার্থক্য থাকতেই পারে এবং থাকাই উচিত কিন্তু তাদের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষায়, তাদের দুঃখের সময় সাহায্য করায় যোগারূঢ় ব্যক্তি কোনো বিষমভাব বা পার্থক্য করেন না। 'সবার মধ্যে এক পরমাত্মা বিদ্যমান' যখন এইরূপ ভাব স্বয়ং-এ (নিজের মধ্যে) আসে, তখন আপন-পর বর্জিত হয়ে তাঁর আচরণের দ্বারা সকলের সুখ সম্পাদিত হয়।

যেমন ভগবান সমস্ত প্রাণীর সুহৃদ **'সুহৃদং সর্বভূতানাম্'** (গীতা ৫।২৯), সেইরকম সিদ্ধযোগীও সর্ব প্রাণীর সুহৃদ হয়ে ওঠেন—**'সুহৃদঃ সর্বদেহিনাম্'** (শ্রীমদ্ভাগবত ৩।২৫।২১)।

জগতে আচরণেরই প্রাধান্য থাকে এবং আচরণ দ্বারাই মানুষের পরীক্ষা হয়। শ্রেষ্ঠ আচরণকারীদের প্রতি সদ্‌ভাব হওয়া সহজ, কিন্তু পাপাচরণ-কারীদের প্রতি সদ্‌ভাব হওয়া কঠিন, তাই এখানে বলা হয়েছে যে পাপাচরণকারীদের প্রতিও যার সমবুদ্ধি থাকে তিনিই শ্রেষ্ঠ **'সমবুদ্ধি র্বিশিষ্যতে'**। যোগারূঢ় ব্যক্তিদের যে সবার প্রতি সমবুদ্ধি হয় তা সকলের

বোধগম্য নয়, কিন্তু সাধকদের সেটিই প্রধান ব্যাপার। কারণ সাধক 'নিজ দৃষ্টিতে নিজেকে দেখে থাকেন', নিজেকে নিজে উদ্ধার করেন **'উদ্ধরেদাত্মনাত্মানাং'** (গীতা ৬।৫)। তিনি জানেন অন্যের আচরণের দিকে দৃষ্টি রাখলে দৃষ্টি তমসাচ্ছন্ন হয়ে যায়, তাই অপরের ভালো-মন্দর দিকে দৃষ্টি না দিয়ে তিনি তাদের পরমাত্মাময় প্রকৃত স্বরূপের দিকে দৃষ্টি রাখেন, তাই তিনি সকলের প্রতি সমবুদ্ধি হন।

অন্যের অশুদ্ধ আচরণের দিকে নজর দিলে আমাদের বুদ্ধিও মন্দ (অশুদ্ধ) হয়ে যায় ও পতন ডেকে আনে। আমরা এত প্রচেষ্টা সত্ত্বেও কেন সাধনায় সাফল্য লাভ করি না, তাই ভাবি। আসল কথা হল আমরা ভালো হওয়ার চেষ্টা করলেও মন্দবুদ্ধি ত্যাগ করি না ফলে আমাদের অংশত ভালো বুদ্ধিই মন্দবুদ্ধিকে শক্তি যোগায় এবং ভালোত্বের অহংকার আমাদের গ্রাস করে। কিন্তু যখন মন্দবুদ্ধি ত্যাগ হয় অর্থাৎ আমরা সমত্বে স্থিত হই তখন সৃষ্টিচক্রের দ্বারাই আমাদের জীবিকা নির্বাহ হতে থাকে, আমরা জগতের আশ্রয় থেকে মুক্ত হয়ে স্বতঃসিদ্ধ সমত্ব প্রাপ্ত হই, কৃতকৃত্য হই, জীবন্মুক্ত হই।

গীতার দৃষ্টিতে তাই যদি সমত্ব এসে যায় তবে আর কোনো লক্ষণের প্রয়োজন নেই, তার সংসার বিজয়প্রাপ্ত হয়েছে—**'ইহৈব তৈর্জিতঃ সর্গো যেষাং সাম্যে স্থিতং মনঃ'** (গীতা ৫।১৯)। গীতায় যোগ হল সমতা—**'সমত্বং যোগ উচ্যতে'** (গীতা ২।৪৮)। ভাগবতে প্রহ্লাদ বলছেন—**'সমত্বমারাধনমচ্যুতস্য'** (ভাগবত ১।১৭।৯০) সমতাই ভগবানের আরাধনা।

জ্ঞানযোগীর সাধন—(শ্লোক ৮-৯, ১৩-১৬)

> নৈব কিঞ্চিৎ করোমীতি যুক্তো মন্যেত তত্ত্ববিৎ।
> পশ্যন্ শৃণ্বন্ স্পৃশন্ জিঘ্রন্ অশ্নন গচ্ছন্ স্বপন্ শ্বসন্॥
> প্রলপন্ বিসৃজন্ গৃহ্নন্ উন্মিষন্ নিমিষন্নপি।
> ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেষু বর্তন্ত ইতি ধারয়ন্॥
>
> (গীতা ৫।৮-৯)

> সর্বকর্মাণি মনসা সন্ন্যস্যাস্তে সুখং বশী।

নবদ্বারে পুরে দেহী নৈব কুর্বন্ ন কারয়ন্॥
ন কর্তৃত্বং ন কর্মাণি লোকস্য সৃজতি প্রভুঃ।
ন কর্মফলসংযোগং স্বভাবস্তু প্রবর্ততে॥
নাদত্তে কস্যচিৎ পাপং ন চৈব সুকৃতং বিভুঃ।
অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানং তেন মুহ্যন্তি জন্তবঃ॥
জ্ঞানেন তু তদজ্ঞানং যেষাং নাশিতমাত্মনঃ।
তেষামাদিত্যবজ্জ্ঞানং প্রকাশয়তি তৎপরম্॥

(গীতা ৫।১৩-১৬)

'তত্ত্বসম্পন্ন সাংখ্যযোগিগণ দেখা, শোনা, স্পর্শ করা, ঘ্রাণ নেওয়া, খাওয়া, চলা, গ্রহণ করা, বলা, ত্যাগ করা, শয়ন করা, শ্বাস গ্রহণ করা, চক্ষু খোলা ও বন্ধ করা—এই সকল কাজ করা সত্ত্বেও মনে করেন যে ইন্দ্রিয়ই ইন্দ্রিয় সকলের কাজ করে, আমি (স্বয়ং) কিছু করি না। (গীতা ৫।৮-৯)

সাংখ্যযোগযুক্ত ব্যক্তি নবদ্বারবিশিষ্ট শরীরে অবস্থান করলেও সমস্ত কর্ম বিবেকপূর্বক এবং মানসিকভাবে ত্যাগ করে পরমসুখে বাস করেন, কারণ তিনি উপলব্ধি করেন যে, তিনি কিছু করেন না বা করান না।

তিনি এও উপলব্ধি করেন যে পরমেশ্বর মানুষের কর্তৃত্বভাব, কর্ম এবং কর্মফলের সঙ্গে কোনো সংযোগ সৃষ্টি করেন না। এ সবই ব্যষ্টিগত স্বভাবের দ্বারাই আবর্তিত হয়।

সর্বব্যাপী পরমাত্মা, কারও পাপকর্ম বা কারও পুণ্যকর্ম গ্রহণ করেন না। এসব অজ্ঞানের দ্বারা আবৃত থাকা মোহগ্রস্ত জীবের হয়ে থাকে।

কিন্তু যিনি নিজ জ্ঞানের (বিবেকের) সাহায্যে অজ্ঞানকে দূর করেছেন, তাঁর সেই জ্ঞান সূর্যের প্রভার ন্যায় পরমতত্ত্ব পরমাত্মাকে প্রকাশিত করে। (গীতা ৫।১৩-১৬)

জ্ঞানযোগীর কর্মে অকর্ম— ভগবান অষ্টম-নবম শ্লোকে সাংখ্য-যোগীকে 'তত্ত্ববিৎ' বলেছেন অর্থাৎ তিনি নিজেতে অর্থাৎ স্বরূপে কখনো কর্তার ভাব দেখেন না। ক্রিয়ার তাৎপর্য হল—পরিবর্তন। পরিবর্তনরূপ ক্রিয়া প্রকৃতিতেই হয় কারণ প্রকৃতি সর্বক্ষণ ক্রিয়াশীল আর স্বয়ং ক্রিয়ারহিত ও

কর্তৃত্বভাবরহিত। স্বপ্ন থেকে জাগরিত হলে যেমন মানুষ স্বপ্নের সঙ্গে আর কোনো সম্পর্ক রাখে না, তেমনি তত্ত্ববিৎ মহাপুরুষও শরীরাদি ক্রিয়ার সঙ্গে কোনো সম্পর্ক (কর্তাভাব) রাখেন না। আসলে স্বরূপে কখনই কর্তৃত্ব আসে না কিন্তু প্রকৃতির সঙ্গে তাদাত্ম্য মেনে নেওয়ার ফলেই, সাধারণ জীব—যার মধ্যে মানা ও না-মানার সামর্থ্য ও স্বাধীনতা আছে, সে প্রকৃতির কার্যে নিজের কর্তৃত্ব মেনে নেয়। যেমন এক ব্যক্তি চলন্ত গাড়িতে বসলে তার নিজের চলা না হলেও চলা হয়ে যায় এবং গাড়িতে চড়ে থাকায় তার পক্ষে থেমে থাকাও সম্ভব নয়, সেইরকম ক্রিয়াশীল প্রকৃতির কার্যরূপ স্থূল, সূক্ষ্ম বা কারণ যে কোনো অবয়বের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করলে, স্বরূপ স্বতঃই কোনো কর্ম না করলেও ওই শরীরের দ্বারা কৃতকর্মের কর্তা না হয়ে থাকতে পারে না। প্রকৃতপক্ষে পরমাত্মার যে শক্তি দ্বারা জগতের সমষ্টিগত ক্রিয়াগুলি হয়, সেই শক্তিদ্বারাই ব্যষ্টি শরীরের ক্রিয়াও সাধিত হয়। কিন্তু জীব এই সমষ্টির ক্ষুদ্র অংশের (ব্যষ্টির) সঙ্গে নিজ সম্পর্ক স্থাপন করে ব্যষ্টির কিছু কিছু ক্রিয়াকে নিজের বলে মনে করে। যেমন শরীরের বালক থেকে যুবক হওয়া, কালো চুল সাদা হওয়া, খাদ্যদ্রব্য হজম হওয়া বা দাঁত পড়ে যাওয়া, শরীর সবল অথবা দুর্বল হওয়া ইত্যাদিকে স্বাভাবিকভাবে (নিজে নিজেই) প্রকৃতির দ্বারাই সংঘটিত হয় বলে মনে করে এবং কেউ তাতে নিজ কর্তৃত্ব আরোপ করে না। কিন্তু শরীরের অন্য কিছু কিছু কার্যে মানুষ নিজ কর্তৃত্ব আরোপ করে প্রকৃতির বন্ধনে আবদ্ধ হয়। যতক্ষণ এতটুকু কর্তাবোধও থাকে ততক্ষণ তাকে কেবল সাধকই বলা হয় আর অহং-কর্তৃত্ববোধ সর্বতোভাবে লুপ্ত হলে স্বতঃই স্বরূপের অনুভব হয় তখন তাকে তত্ত্ববিৎ মহাপুরুষ বলা হয়।

ভগবান এই দুটি শ্লোকে জ্ঞানেন্দ্রিয়, কর্মেন্দ্রিয়, অন্তঃকরণ, প্রাণ ও উপপ্রাণ দ্বারা মনুষ্যকৃত ১৩টি কর্মের কথা বলেছেন যাতে কর্তাভাব আরোপ করা উচিত নয়।

জ্ঞানেন্দ্রিয়—দেখা, শোনা, ঘ্রাণ নেওয়া, স্পর্শ করা ও খাওয়া। (এই কর্মসকল নেত্র, কর্ণ, নাসিকা, ত্বক ও জিহ্বা দ্বারা হয়)।

কর্মেন্দ্রিয়—চলা, গ্রহণ করা, বলা ও মল-মূত্রাদি ত্যাগ (এইগুলি পদ, হস্ত, বাক্, উপস্থ ও পায়ু দ্বারা হয়)।

শোওয়া—এটি অন্তঃকরণের অন্তর্গত মন-বুদ্ধি দ্বারা সম্পন্ন হয়।

প্রাণ—শ্বাসগ্রহণ ক্রিয়া।

উপপ্রাণ—চক্ষু খোলা ও বন্ধ করা (কূর্ম নামক উপপ্রাণ)।

মনুষ্যকৃত সব কয়টি কর্মই শরীর, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি, প্রাণ দ্বারা সংঘটিত হয়, স্ব-স্বরূপের দ্বারা নয়। এই ক্রিয়াগুলির মধ্যে কতকগুলিকে মানুষ নিজকৃত ভাবে না, স্বাভাবিক মনে করে, যেমন শ্বাসগ্রহণ বা চোখ খোলা, বন্ধ করা ইত্যাদি ; কিন্তু যে সমস্ত ক্রিয়াগুলিকেই স্বাভাবিক মনে করে এবং কোনো কিছুতেই নিজ কর্তৃত্ব বোধ আরোপ করে না তাকেই তত্ত্ববিৎ বলা হয়।

সাংখ্যযোগীর সাধন-ভাব—ভগবান ত্রয়োদশ শ্লোকে বলেছেন যে এই তত্ত্ববিৎ ব্যক্তি নবদ্বারবিশিষ্ট শরীরে অবস্থান করেও পরম সুখে বাস করে **'সুখেন বশী'**।

শরীরকে নবদ্বারযুক্ত পুর বলা হয়েছে কারণ এই শরীর নয়টি দ্বারবিশিষ্ট —দুটি কান, দুটি চক্ষু, দুটি নাসিকা ছিদ্র ও একটি মুখগহ্বর ওপরের অংশে ও উপস্থ এবং পায়ু নিম্নাংশে। আর শরীরকে পুর অর্থাৎ নগর বলা হয়েছে, কারণ নগর এবং নগরে অবস্থানকারী ব্যক্তি যেমন পৃথক, সেইরকম শরীর এবং শরীরে স্থিত জীবাত্মা এই দুইই পৃথক। আর সাংখ্যযোগী সম্পর্কে ভগবান বলছেন তিনি বশী অর্থাৎ ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি এদের ওপর তাঁর কোনো মমতা বা আসক্তি না থাকায় এরা তাঁর বশে থাকে। আর যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষের শরীর, ইন্দ্রিয়াদির সঙ্গে প্রয়োজন বোধ থাকে ততক্ষণ সে 'অবশ' অর্থাৎ প্রকৃতির বশে থাকে—**'কার্যতে হ্যবশঃ কর্ম সর্ব প্রকৃতিজৈর্গুণৈঃ'** (গীতা ৩।৫)। আর সাংখ্যযোগী যেহেতু ইন্দ্রিয়াদিকে নিজের বশে রাখেন তাই তিনি—**'নৈব কুর্বন্ন কারয়ন্'** অর্থাৎ কিছু করেন না বা করানও না—তাঁর কর্তৃত্বও নেই, কারয়িতৃত্বও নেই।

ভগবানের কর্ম—

সাংখ্যযোগী ভগবানের মতোই কর্মে নির্লিপ্ত থাকেন। ভগবান সৃষ্টি

রচনা করেন তাই চতুর্দশ-পঞ্চদশ শ্লোকে তাঁকে কখনো 'প্রভু', কখনো 'বিভু' এই সম্বোধন করা হয়েছে। আর ভগবান সৃষ্টি করলেও মনুষ্যের কর্ম, কর্তৃত্ব ও কর্মফল ভোগ কিছু নির্দিষ্ট করেন না। **'ন কর্মানি'** পদের অর্থ হল ভগবান কোনো বিধান দেন না যে জীবকে শুভ বা অশুভ কর্ম করতে হবে। মানুষ কর্ম করতে স্বতঃই স্বাধীন। আর **'ন কর্তৃত্বং'** অর্থাৎ কোনো কর্মের কর্তৃত্বভাবও ভগবানের সৃষ্ট নয়। সমস্ত কর্মই প্রকৃতি দ্বারা হচ্ছে—এটা সমষ্টি জগতে তো বটেই, ব্যষ্টি জগতেও অর্থাৎ শরীর-ইন্দ্রিয়াদির ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। কিন্তু মানুষ অজ্ঞতাবশত প্রকৃতির সঙ্গে তাদাত্ম্য করে প্রকৃতি দ্বারা কৃত কর্মের কর্তা হয়ে বসে—**'অহংকারবিমূঢ়াত্মা কর্তাহমিতি মন্যতে'** (গীতা ৩।২৭)।

আবার জীব যেমন কর্ম করে সেইরকম ফল ভোগ করে। যদিও কর্ম জড় হওয়ায় কর্মফলের বিধান ভগবানই করেন—**'লভতে চ ততঃ কামান্ময়ৈব বিহিতান্ হি তান্'** (গীতা ৭।২২)। কিন্তু জীব অজ্ঞানতাবশত কর্মফলের প্রতি আসক্তিবশত অনুকূল-প্রতিকূল পরিস্থিতিতে সুখী বা দুঃখী হয় এবং তার ফলে কর্মফলের সঙ্গে নিজের সম্পর্ক স্থাপন করে বসে। ভগবান বলেছেন—**'মা কর্মফলহেতুর্ভূর্মা তে'** (গীতা ২।৪৭) অর্থাৎ কর্মফলের হেতু বা নিমিত্ত হয়ো না অর্থাৎ কর্ম করলে কর্তৃত্ব ও মমত্বভাব রেখো না। ভগবান বলছেন কর্ম, কর্তৃত্বভাব ও কর্মফলের সঙ্গে সম্বন্ধ ভগবান প্রদান করেন না, ইহা ব্যক্তিগত স্বভাবের দ্বারাই হয় **'স্বভাবস্তু প্রবর্ততে'**। আর এই স্বভাব ব্যষ্টিবাচক ও মনুষ্যের নিজসৃষ্টি। যতক্ষণ এই স্বভাবের সঙ্গে জীব সম্পর্ক রাখে অর্থাৎ সুখে উচ্ছ্বাস ও দুঃখে বিচলিত বোধ করে, ততক্ষণ তার পরাধীনতা বজায় থাকে। এগুলি জীবেরই সৃষ্টি তাই এগুলি ত্যাগ করে এর থেকে নির্লিপ্ততা অনুভব করতে সে সক্ষম।

যখন সাধক বিবেকের সহায়তায় বোধ করতে সক্ষম হন যে এই শরীর 'আমি' নই এবং পরিবর্তনশীল প্রকৃতির কিছুই 'আমার' নয় তখন তার অজ্ঞানতা দূর হয়। যেমন সূর্য উদয় হলে নতুন কোনো বস্তু নির্মিত হয় না, কেবল অন্ধকারে আবৃত বস্তুই প্রকাশিত হয়ে পরিলক্ষিত হয়, সেইরকম এই

অজ্ঞানতা বা বিবেকহীনতা দূর হয়ে গেলে স্বতঃপ্রকাশিত স্বরূপ বা পরমাত্মাতত্ত্ব অনুভূত হয়।

ভগবান এখানে বিবেকহীন ব্যক্তিকে তিরস্কার করে পশুর সঙ্গে তুলনা করেছেন '**তেন মুহ্যন্তি জন্তবঃ**'।

প্রাচীন শ্লোকে আছে—

আহারনিদ্রাভয়মৈথুনানি সমানি চৈতানি নৃণাং পশূনাম্।
জ্ঞানং নরাণাম্ অধিকো বিশেষো জ্ঞানেন হীনাঃ পশুভিঃ সমানাঃ॥

(চাণক্যনীতি ১৭।১৭)

আহার, নিদ্রা, ভয় ও মৈথুন—মানুষ ও পশুর মধ্যে এগুলি সমভাবে থাকে। মানুষের বিশেষত্ব এই যে, তার মধ্যে বিবেক (বিবেচনা) থাকে। বিবেকহীন মানুষ পশুর সমান।

নিজেকে কর্তা মনে করা ও কর্মফলের হেতু হয়ে সুখ-দুঃখ অনুভব করাই হল বিবেকহীনতার পরিচয়।

শ্রুতিতে আছে ভগবান যার ঊর্ধ্বগতি চান, তার দ্বারা শুভকর্ম করান আর যার অধোগতি চান তার দ্বারা অশুভ কর্ম করান।

এষ হ্যেব সাধু কর্ম কারয়তি তং যমেভ্যো লোকেভ্য উন্নিনীষত এষ হ্যেবাসাধু কর্ম কারয়তি তং যমধো নিনীষতে॥

(কৌষীতকিব্রাহ্মণ উপনিষদ্ ৩।৮)

এর ব্যাখ্যা হচ্ছে মানুষ কর্ম থেকে নিবৃত্ত থাকতে পারে না এবং স্বভাবতই তাকে কর্মফল ভোগ করতে হয়। কর্মফল ভোগের জন্য পরিবেশ অবশ্য ভগবান সৃষ্টি করে দেন কিন্তু মানুষ মূঢ়তাবশত এই কর্ম ও কর্মফলের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করে অর্থাৎ এদের নিমিত্ত হয়ে বসে, কর্তা হয়ে বসে এবং এর ফলে প্রকৃতির বন্ধনে আবদ্ধ হয়।

ভগবান মানুষকে প্রেরণা, পরিবেশ ও বুদ্ধি প্রদান করেন, তার দ্বারা শুভাশুভ কর্ম করিয়ে তাকে ঊর্ধ্বগতি ও অধোগতি লাভ করানোর জন্য নয়, কৃপা করে তার প্রারব্ধ কর্মফল ভোগ করিয়ে এবং তাকে শুদ্ধ করে প্রেমদানের উপযোগী করে তোলার জন্য।

ভক্তিযোগী ও কর্মযোগীর অর্ঘ ভগবান কিভাবে গ্রহণ করেন তা গীতায় অন্যত্র বলেছেন। এখানে সাধারণ জীবের সম্বন্ধে বলা হয়েছে।

ভক্তিযোগী সাধকের অর্ঘ—

পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি।

তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামি প্রযতাত্মনঃ।। (গীতা ৯।২৬)

'যদি ভক্ত আমাকে ভক্তিভাবে পত্র, পুষ্প, ফল ও জলও অর্পণ করে তবে আমি সেই প্রেমিক ভক্তের ভক্তিপূর্বক প্রদত্ত পত্র-পুষ্পাদি প্রীতিপূর্বক ভক্ষণ করে থাকি।'

কর্মযোগী সাধকের অর্ঘ—

ভোক্তারং যজ্ঞতপসাং সর্বলোকমহেশ্বরম্।

সুহৃদং সর্বভূতানাং জ্ঞাত্বা মাং শান্তিমৃচ্ছতি।। (গীতা ৫।২৯)

'আমি সাধকের যজ্ঞ ও তপস্যার ভোক্তা এবং সকলের সুহৃদ, কর্মযোগী সাধক এই জেনে শান্তি লাভ করে।'

সাধারণ জীবের অর্ঘ—ভগবান সাধারণ জীবকে পঞ্চম অধ্যায়ের পঞ্চদশ শ্লোকে বলেছেন 'কস্যচিৎ' যার অর্থ, যে নিজেকে কর্তা ও ভোক্তা মনে করে কর্ম করে, তার শুভ বা অশুভ কোনো কর্মের ফলই ভগবান গ্রহণ করেন না।

'নাদত্তে কস্যচিৎ পাপং ন চৈব সুকৃতং বিভুঃ।' (গীতা ৫।১৫)

জ্ঞানযোগীর লক্ষণ—(শ্লোক ১৭-২৬)

পরের দশটি শ্লোকে ভগবান জ্ঞানযোগীর অনুপম স্থিতির বিষয় জানাচ্ছেন—

তদ্‌বুদ্ধয়স্তদাত্মানস্তন্নিষ্ঠাস্তৎপরায়ণাঃ ।
গচ্ছন্ত্যপুনরাবৃত্তিং জ্ঞাননির্ধূতকল্মষাঃ।।
বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি।
শুনি চৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ।।
ইহৈব তৈর্জিতঃ সর্গো যেষাং সাম্যে স্থিতং মনঃ।
নির্দোষং হি সমং ব্রহ্ম তস্মাদ্‌ব্রহ্মণি তে স্থিতাঃ।।

ন প্রহৃষ্যেৎ প্রিয়ং প্রাপ্য নোদ্বিজেৎ প্রাপ্য চাপ্রিয়ম্।
স্থিরবুদ্ধিরসংমূঢ়ো ব্রহ্মবিদ্‌ব্রহ্মণি স্থিতঃ॥
বাহ্যস্পর্শেষ্বসক্তাত্মা বিন্দত্যাত্মনি যৎ সুখম্।
স ব্রহ্মযোগযুক্তাত্মা সুখমক্ষয়মশ্নুতে॥
যে হি সংস্পর্শজা ভোগা দুঃখযোনয় এব তে।
আদ্যন্তবন্তঃ কৌন্তেয় ন তেষু রমতে বুধঃ॥
শক্নোতীহৈব যঃ সোঢুং প্রাক্ শরীরবিমোক্ষণাৎ।
কামক্রোধোদ্ভবং বেগং স যুক্তঃ স সুখী নরঃ॥
যোঽন্তঃসুখোঽন্তরারামস্তথান্তর্জ্যোতিরেব যঃ।
স যোগী ব্রহ্মনির্বাণং ব্রহ্মভূতোঽধিগচ্ছতি॥
লভন্তে ব্রহ্মনির্বাণমৃষয়ঃ ক্ষীণকল্মষাঃ।
ছিন্নদ্বৈধা যতাত্মানঃ সর্বভূতহিতে রতাঃ॥
কামক্রোধবিযুক্তানাং যতীনাং যতচেতসাম্।
অভিতো ব্রহ্মনির্বাণং বর্ততে বিদিতাত্মনাম্॥

(গীতা ৫।১৭-২৬)

'পরমাত্মাপরায়ণ জ্ঞানী সাধকের বুদ্ধি তাঁর প্রতি নিবিষ্ট, মন তাঁর দিকে ধাবিত, তাঁর পরমাত্মাতেই স্থিতি, এই জ্ঞানের দ্বারা পাপরহিত হওয়ার ফলে তাঁর পুনরাবৃত্তি হয় না তিনি পরমগতি প্রাপ্ত হন।

জ্ঞানী মহাপুরুষগণ বিদ্যা-বিনয়যুক্ত ব্রাহ্মণ ও চণ্ডালে, গাভী, হস্তি ও সারমেয়তে সমরূপ পরমাত্মাই দর্শন করেন।

যাঁর অন্তঃকরণ সমত্বে স্থিত, তিনি জীবিতাবস্থাতেই সমস্ত জগৎ জয় করে থাকেন। ব্রহ্ম নির্দোষ ও সম, সেইজন্য তিনি ব্রহ্মেই স্থিত থাকেন।

তিনি প্রিয়লাভে আনন্দিত হন না, অপ্রিয় প্রাপ্তিতে উদ্বিগ্ন হন না, স্থিরবুদ্ধিসম্পন্ন, মূঢ়তারহিত এবং ব্রহ্মবিৎ হওয়ায় ব্রহ্মতেই স্থিত থাকেন।

যে জ্ঞানী সাধক বাহ্যবিষয়ে অনাসক্ত, অন্তঃকরণে আত্মানন্দময়, তিনি ব্রহ্মে অভিন্ন চিত্ত হয়ে অক্ষয় আনন্দ অনুভব করেন।

জ্ঞানী ব্যক্তি উপলব্ধি করেন যে, ইন্দ্রিয় ও বিষয় সংযোগে উৎপন্ন সমস্ত

সুখভোগই সকল প্রকারের দুঃখের উৎপত্তির হেতু। সেগুলি আদি-অন্ত বিশিষ্ট অর্থাৎ স্বল্পস্থায়ী, তাই তিনি এতে রত হন না।

যে সাধক মরণের পূর্বেই কাম-ক্রোধ হতে উৎপন্ন বেগ সহ্য করতে সমর্থ হন, তিনিই যোগী এবং সুখী।

যে সাধক কেবল পরমাত্মাতেই সুখ দেখেন, পরমাত্মাতেই রত এবং যার আত্মজ্ঞান সদা জাগ্রত, তিনি ব্রহ্মে স্থিতি অনুভব করায় নির্বাণ ব্রহ্ম প্রাপ্ত হন।

যে সাধকের মন-বুদ্ধি-ইন্দ্রিয়াদি নিজের বশীভূত, যিনি সর্বভূত হিতে রত, যাঁর সমস্ত দোষ দূর হয়েছে, যিনি সংশয়শুন্য, সেই ব্রহ্মবেত্তা পুরুষ নির্বাণ ব্রহ্ম প্রাপ্ত হন।

জ্ঞানযোগী হন আত্মদর্শী, সংযতচিত্ত এবং কাম-ক্রোধ বর্জিত, তাই দেহ থাকাকালীন বা দেহত্যাগের পরেও সর্বত্রই তাঁদের উপলব্ধি হয় নির্বাণ ব্রহ্ম।' (গীতা ৫।১৭-২৬)

এই দশটি শ্লোকে ভগবান জ্ঞানমার্গের অর্থাৎ সাংখ্যযোগীর লক্ষণ প্রসঙ্গে বলেছেন যে তাঁদের কাছে সমগ্র জগৎই সমত্বময়, তাঁরা ইন্দ্রিয়াসক্ত নন এবং আত্মানন্দে মগ্ন থাকেন।

জ্ঞানী ব্যক্তির প্রথম লক্ষণ হল সমত্বভাব—

সমত্বভাব—ভগবান প্রথম চারটি শ্লোকে (১৮-২০) সমত্ব সম্বন্ধে বলে, সমত্বের উদাহরণ দিয়ে বলছেন যে সেই মহাত্মার বিদ্বান ও বিনয়ী ব্রাহ্মণ, গরু, হাতি, কুকুর ও চণ্ডালে সমদৃষ্টি থাকে। এখানে সমদৃষ্টি মানে সমব্যবহার নয়, কেননা সকলের উপযোগিতা ভিন্ন। যেমন বিদ্যা-বিনয়সম্পন্ন ব্রাহ্মণকেই পূজা করা সম্ভব—চণ্ডালকে নয়, গরুরই দুধ খাওয়া হয়—হাতির নয়। আবার হাতির পিঠেই চড়া হয়—কুকুরের নয়। তাহলে এখানে সমদৃষ্টির অর্থ কী । সমদৃষ্টির তাৎপর্য হচ্ছে আমরা যেমন নিজ অঙ্গপ্রত্যঙ্গর (হাত, পা, মাথা, গুহ্যাদি) প্রতি সমদৃষ্টি রেখেও ব্যবহারিক কাজে আলাদা ভাব রাখি, সেইরকম সকলের প্রতি সমদৃষ্টি রেখেও ব্যবহারে ভিন্নতা রাখা উচিত। আমরা মাথা ঠেকিয়ে বা হাত দিয়ে প্রণাম করি কিন্তু

গায়ে পা লাগলে ক্ষমা চাই। গুহ্যে হাত লাগলে হাত ধুয়ে থাকি কিন্তু হাতে হাত লাগলে নয়। হাতের আঙুলের মধ্যেও ব্যবহারের পার্থক্য থাকে। কাউকে তর্জনী দেখানো ও বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখানোর পার্থক্য আছে। নাক ও মুখেরও উপযোগিতার ও ব্যবহারিক পার্থক্য থাকে। একটির দ্বারা শ্বাস-প্রশ্বাস নিয়ে থাকি অন্যটি দিয়ে খাদ্যপদার্থ গ্রহণ করি।

এতসব ব্যবহারিক পার্থক্য থাকলেও আত্মীয়তার কোনো পার্থক্য থাকে না। নিজ শরীরের যে কোনো অঙ্গের কষ্ট দূর করার জন্য যেমন অন্য অঙ্গর স্বাভাবিক প্রচেষ্টা থাকে, সেইরূপ মহাপুরুষদেরও অন্য প্রাণীর দুঃখ দূর করার স্বাভাবিক প্রচেষ্টা থাকে। তাঁদের অন্তঃকরণে রাগ-দ্বেষ, মমতা, আসক্তি, অভিমান আদির সর্বতো অভাব থাকায়, সকল প্রাণীর প্রতি ব্যবহারে পার্থক্য থাকলেও ভালোবাসা, হিতচিন্তা, দয়া বা আত্মীয়তার কোনো পার্থক্য থাকে না।

শঙ্করাচার্য বলেছেন—**'ভাবাদ্বৈতং সদা কুর্যাৎ ক্রিয়াদ্বৈতং ন কুত্রচিৎ'** (তত্ত্বোপদেশ)। ভাবে সর্বদাই অদ্বৈত (সমভাব) থাকবে ; কিন্তু ক্রিয়াতে (ব্যবহারে) কখন অদ্বৈত থাকবে না।

ভাবে সমদর্শীতা গীতায় একটি অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাধনা, যা পরমাত্মারই সাক্ষাৎ স্বরূপ। ভগবান সকল মহাপুরুষকেই সমদর্শী বা সমবুদ্ধি বলেছেন যেমন—**সমবুদ্ধির্বিশিষ্যতে** (গীতা ৬।৯), **সর্বত্র সমদর্শনঃ** (গীতা ৬।২৯), **সর্বত্র সমবুদ্ধয়ঃ** (গীতা ১২।৪), **সমং সর্বেষু ভূতেষু** (গীতা ১৩।২৭), **সমং পশ্যন্ হি সর্বত্র** (গীতা ১৩।২৮)।

ভগবান বলেছেন—যাঁর মন সমত্বে স্থিত হয়, তিনি জীবিতাবস্থাতেই জগতে বিজয় লাভ করেন **'ইহৈব তৈর্জিতঃ সর্গো যেষাং সাম্যে স্থিতং মনঃ'** (গীতা ৫।১৯)। যিনি সমদর্শী তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ যোগী **'আত্মৌপম্যেন সর্বত্র .... স যোগী পরমো মতঃ'** (গীতা ৬।৩২)। যিনি সবার হিতে প্রীতি অনুভব করেন তিনি ঈশ্বরকে লাভ করেন **'তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব সর্বভূতহিতেরতাঃ'** (গীতা ১২।৪)। এখানে সর্বভূতে প্রীতিসম্পন্ন ব্যক্তির ঈশ্বর লাভের কথা বলা হয়েছে কারণ ভগবানও সর্বজনের সুহৃদ্।

'সুহৃদং সর্বভূতানাম্' (গীতা ৫।২৯)। সূর্য যেমন সকলকে সমানভাবে প্রকাশিত করে, হাওয়া যেমন সমানভাবে সকলকে শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণের সুযোগ দেয়, জল সকলের পিপাসা মেটায়, পৃথিবী সকলকে সমানভাবে স্থান দেয়, অর্থাৎ ভগবানের রচিত সকল বস্তুই যেমন সকলকে সমানভাবে সেবা করে, সেইরকম মহাপুরুষও সর্বপ্রাণীতে সমান প্রীতি রাখেন।

আসলে যতক্ষণ মনে অভিমান থাকে, মমত্ববোধ থাকে ততক্ষণ সমত্ববোধ আসে না, আসা সম্ভব নয়। সমত্ব মানে সমানভাব, সমান ব্যবহার নয়। সমভাব ভগবদসত্ত্বার দিকে নিয়ে যায় আর সমব্যবহার পতন ঘটায়। সমব্যবহার যমের আর এক নাম, মৃত্যুর নাম। কারণ এর ব্যবহারে কোনো অসমতা নেই। মহাত্মাই হোক বা পাষণ্ডই হোক, অথবা মানুষ, দেবতা, পশু হোক ; সবারই এক পরিণতি মৃত্যু। তাই যমের আর এক নাম 'সমবর্তী' (সমান ব্যবহারকারী)। সুতরাং যারা অধিকার ভেদ না রেখে দেহে সমব্যবহার করে তারাও যমরাজ।

সমত্বের ভাব হবে—

> সর্বে ভবন্তু সুখিনঃ সর্বে সন্তু নিরাময়াঃ।
> সর্বে ভদ্রাণি পশ্যন্তু মা কশ্চিদ্ দুঃখভাগ্ ভবেৎ॥

কিন্তু যার মনে জাগতিক কামনাগুলি থাকে, সেই ব্যক্তি যদি অন্য ব্যক্তি, রাজ্য ইত্যাদির ওপর জয়লাভও করে তবে প্রকৃতপক্ষে সে তাদের অধীনই হয়ে থাকে। কামনার পূর্তি না হলে মানুষ সেই সেই বিষয়ে পরাধীনতা অনুভবপূর্বক তাদের বাসনা করে আর কামনা পূর্তি হয়ে গেলে তখন তার এমন বুদ্ধিভ্রংশ হয় যে সে ওইগুলির পরাধীন হলেও তা অনুভব করে না বরং নিজেকে আরো স্বাধীন, শক্তিশালী ভাবে। কিন্তু মানুষ যখন রাগ-দ্বেষ-কামনা-অসমতা ত্যাগ করতে পারে তখন তার মন ও বুদ্ধিতে স্বতঃ সমত্ববোধ জাগে আর তখন সে **'ইহৈব তৈর্জিতঃ সর্গো'** অর্থাৎ জীবিতাবস্থাতেই এই জগৎ জয় করে অর্থাৎ জগৎ-সংসারের পাশ থেকে মুক্ত হয়।

প্রিয় ও অপ্রিয়ের জ্ঞান হওয়া দোষের নয়, কিন্তু এদের প্রাপ্তিতে বা

অপ্রাপ্তিতে আনন্দ বা দুঃখের ভাব আসাই হল দোষের। প্রিয় ও অপ্রিয় জ্ঞান হয় অন্তঃকরণের, যার আনন্দ বা দুঃখ অনুভব করে কর্তা। **অহংভাবে বা মমত্বভাবে মোহগ্রস্থ অন্তঃকরণসম্পন্ন পুরুষই 'আমি কর্তা' এরূপ মনে করে আনন্দিত বা উদ্বিগ্ন হয়।** যার মোহ অপসারিত তিনিই তত্ত্ববেত্তা। তাঁর স্বরূপ জ্ঞান হয়েছে তাই প্রকৃতির কার্যে তাঁর কর্তাভাব থাকে না। এই জ্ঞান হয় করণ-নিরপেক্ষ অর্থাৎ এতে শরীর, ইন্দ্রিয়াদি, মন, বুদ্ধির কোনো প্রয়োজন হয় না। এই স্বয়ং-এর জ্ঞান (নিজ সত্ত্বার জ্ঞান) স্বয়ং-এর দ্বারাই হয় এবং ইহা উপলব্ধির বিষয় হওয়ায় ইহাতে কোনো সন্দিগ্ধতা বা বিপরীত ভাবনা আসে না। ইহা জ্ঞাতা, জ্ঞান ও জ্ঞেয়র ত্রিপুটি রহিত কারণ ব্রহ্মকে যিনি জানেন তিনি ব্রহ্মের সঙ্গে অভিন্ন হয়ে যান **'ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মৈব ভবতি'** (মুঃ ৩।২।৯), **'ব্রহ্মৈব সন্ ব্রহ্মাপ্যেতি'** (বৃঃ ৪।৪।৬)। বাইরের পদার্থের সংযোগ দ্বারা যে সুখ হয় তাকে বলে 'রাজস সুখ'। আর বাইরের পদার্থের প্রতি আসক্তি দূর হলে অন্তকরণে যে সুখ অনুভূত হয়ে তাকে বলে 'সাত্ত্বিক সুখ'। রাজসিক সুখ ত্যাগ না করলে সাত্ত্বিক সুখ অনুভব করা যায় না। আবার সাধক যতক্ষণ সাত্ত্বিক সুখও অনুভব করেন ততক্ষণ তার মধ্যে সূক্ষ্ম অহংবোধ যেমন 'আমি সুখী', 'আমি জ্ঞানী' ইত্যাদি রয়ে যায়। যখন সাধক এই সাত্ত্বিক সুখেও রমণ করেন না তখন তাঁর অহংবোধ সর্বতোভাবে দূর হয়ে যায় এবং তখন তিনি পরমাত্মস্বরূপ এক অবিনাশী সুখ অনুভব করেন, একেই গীতায় **আত্যন্তিক সুখ** (৬।২১), **অত্যন্ত সুখ** (৬।২৮), **ঐকান্তিক সুখ** (১৪।২৭) ইত্যাদি নামে অভিহিত করা হয়েছে।

ইন্দ্রিয় সুখ বর্জিত—(২১-২৩)

জ্ঞানী ব্যক্তির দ্বিতীয় লক্ষণ হল তাঁরা জগৎ-সংসারের সুখ হতে উপরত। একুশতম শ্লোকে ভগবান প্রথমে **'বাহ্যস্পর্শেষ্বসক্তাত্মা'** অর্থাৎ শরীর-সংসার ইত্যাদির থেকে নিজেকে সর্বতোভাবে পৃথক অনুভব করার কথা বলেছেন আর তারপর বলেছেন **'ব্রহ্মযোগযুক্তাত্মা'** অর্থাৎ পরমাত্মতত্ত্বর সঙ্গে নিজেকে সর্বভাবে এক ও অভিন্ন ভাবা। পরমাত্মতত্ত্বে সম্পূর্ণভাবে এক না হলে নিজ সত্ত্বা ও নিজ ব্যক্তিত্ব সর্বতোভাবে দূর হয় না।

আর পরমাত্মতত্ত্বের সঙ্গে এক অনুভূত হলে সাধকের পরমাত্মতত্ত্বে এক স্বাভাবিক আকর্ষণ জন্মায় তাকে বলে প্রেম, যাতে কখনো ভাটা পড়ে না, দিন দিন বেড়েই চলে।

বিবেকবান মানুষ বিচার করেন যে জগতের দুঃখ, শোক সমস্তই সংযোগজনিত অর্থাৎ রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ ও স্পর্শ ইত্যাদি বিষয়গুলিতে আসক্তিবশতই হয়। তাই সাধক শাস্ত্রনিষিদ্ধ ভোগে তো কখনই লিপ্ত হন না, শাস্ত্রবিহিত ভোগও পরমাত্মাপ্রাপ্তির পথে বাধাস্বরূপ মনে করে তাও তিনি পরিত্যাগ করেন। ভোগী ব্যক্তির দুঃখ সম্পর্কে 'পতঞ্জলী' বলেছেন—

পরিণামতাপসংস্কারদুঃখৈর্গুণবৃত্তিবিরোধাচ্চ দুঃখমেব সর্বং বিবেকিনঃ।

(যোগদর্শন ২।১৫)

সমস্ত রকম ভোগেই পরিণাম দুঃখ, তাপ দুঃখ, সংস্কার দুঃখ ও বৃত্তি বিরোধী দুঃখ থাকায় বিবেকবান ব্যক্তি সবরকম ভোগই পরিত্যাগ করেন।

পরিণাম দুঃখ—সমস্ত বিষয়ভোগই আরম্ভে সুখাবহ মনে হলেও তা দুঃখই প্রদান করে কারণ ভোগের ফলে তার শক্তি হ্রাস পায় ও ভোগ্য পদার্থের নাশ হয়। ইহাকে বলে পরিণাম দুঃখ।

তাপ দুঃখ—নিজ অপেক্ষা অপরের বেশি ভোগ্যসামগ্রী দেখলে বা নিজ ইচ্ছানুযায়ী পূর্ণভোগ না হলে বা অন্তরে ভোগবাসনা থাকলেও ভোগ করার সামর্থ্য না থাকায় হৃদয়ে যে সন্তাপ হয় তাকে বলে তাপ দুঃখ।

সংস্কার দুঃখ—ভোগের সমাপ্তি ঘটলে, মানুষ সেই ভোগগুলিকে স্মরণ করে যে দুঃখ পায় তাকে বলে সংস্কার দুঃখ।

গুণবৃত্তি নিরোধ—ভোগের রুচি হওয়ায় মন সেগুলিকে ভোগ করতে ইচ্ছে করে, কিন্তু বিবেকের প্রভাবে বুদ্ধি তাকে নিরোধ করে। যেমন সৎসঙ্গ করার সময় তামসিক বৃত্তির জন্য নিদ্রা আসে কিন্তু সাত্ত্বিক বুদ্ধি বলে, এমন সৎসঙ্গ আর পাবে না এখন নিদ্রা যাওয়া ঠিক হবে না। এই হল 'গুণবৃত্তি নিরোধ'। এর জন্য সাধকের খুব দুঃখ হয়। আসলে যেগুলিতে সুখ আছে বলে বিশ্বাস, প্রকৃতপক্ষে তাতে সুখের লেশমাত্র নেই, তাই বিবেকবান ব্যক্তিগণ সেই ভোগে রত হন না, তার অধীন হন না।

আর মনুষ্যদেহ থাকতেই যিনি কাম-ক্রোধের বেগ সহ্য করেন তিনি যোগী, তিনিই সুখী।

পরমাত্মপরায়ণতা—(১৭,২৪-২৬)

জ্ঞানী ব্যক্তির তৃতীয় লক্ষণ তিনি নির্বাণ (শান্ত) ব্রহ্ম প্রাপ্ত হন। আত্মদর্শী জ্ঞানীব্যক্তি প্রকৃতিজাত বাহ্যপদার্থের লিপ্ত হন না। তিনি কেবল স্বরূপ-সম্পর্কিত পরমাত্মা হতেই নিত্য সুখ অনুভব করেন। তাই তিনি '**অন্তঃসুখ**'। তাঁর ব্যবহারিক জীবনও কেবল পরমাত্মতত্ত্বের সঙ্গেই সম্পর্কিত তাই তিনি '**অন্তরারাম**'। আর পরমাত্মতত্ত্বের জ্ঞান যা সর্ব জগৎ-সংসারের প্রকাশক তা তাঁর মধ্যে সর্বদা জাগ্রত থাকে, তাই তিনি '**অন্তর্জ্যোতিঃ**'। সাংখ্যযোগের সিদ্ধিতে ব্যক্তিত্বের অভিমান ত্যাগই হল মূল সাধনা। এই অভিমান ত্যাগ হলেই তিনি সর্বভূতে সমান প্রীতি অনুভব করেন তাই তিনি '**সর্বভূতহিতে রতাঃ**'।

প্রকৃতির সঙ্গে কোনোরূপ সম্পর্ক মেনে নেওয়াই দোষের এবং যেহেতু তিনি শরীর, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধির কার্যে নির্বিকার থাকেন তাই তিনি 'ক্ষীণ-কল্মষাঃ'। ঋষ ধাতুর অর্থ হল জ্ঞান। আর যেহেতু তিনি জ্ঞানকে অর্থাৎ বিবেককে প্রশ্রয় দেন তাই তিনি 'ঋষি'। সাধনার দ্বারা কাম-ক্রোধ কমে যায় সাধকেরা ক্রমেই এইরূপ অনুভব করতে থাকেন এবং সেটি অবশেষে লোপও পায়। সাধনকারীর অনুভব হয়—(১) কাম-ক্রোধাদি দোষগুলি আগে যত তাড়াতাড়ি আসত এখন আর অত তাড়াতাড়ি আসে না। (২) আগের মতো বেগেও আসে না এবং (৩) আগের মতো স্থায়ীও হয় না। আবার কখনো সাধকের এমনও মনে হয় যে—(১) কাম-ক্রোধের বেগ আগের থেকে বেশি। তার কারণ হল—

১. সাধনার দ্বারা ভোগাসক্তি কমতে থাকলেও তার পূর্ণাবস্থা এখনো প্রাপ্ত হয়নি।

২. অন্তঃকরণ শুদ্ধ হওয়ায় অল্প কাম-ক্রোধও সাধকের বেশি মনে হয়।

৩. কেউ নীতি বহির্ভূত কর্ম করলে সাধকের মনে আঘাত লাগে এবং

তা জমতে থাকে এবং শেষে ভেতরের ক্রোধ একসঙ্গে বেরিয়ে আসে। এতে অন্যব্যক্তিরা আশ্চর্য হয়ে ভাবে তিনি কেন এত রেগে গেলেন।

প্রকৃতির সঙ্গে সম্পর্ক সর্বতোভাবে পরিত্যক্ত হলে, মহাপুরুষদের মন স্বতঃই বশীভূত হয়। এই মহাপুরুষদের 'বিদিতাত্মানম্' বলে। দেহে থাকাকালীন বা বিদেহী অবস্থায় তিনি সর্বদাই নির্বাণ ব্রহ্মে স্থিত থাকেন।

ধ্যানযোগ—

ভগবান এখানে বলছেন ধ্যানযোগও সাধকগণকে স্বতন্ত্রভাবে তাঁরই প্রাপ্তি করায়। যে তত্ত্ব জ্ঞানযোগী ও কর্মযোগী লাভ করে সেই তত্ত্ব ধ্যানযোগীও প্রাপ্ত হন। ধ্যান, জপ, সৎসঙ্গ ও স্বাধ্যায় সকল সাধনের পক্ষেই উপযোগী ও আবশ্যক।

ধ্যানের পদ্ধতি—বহিরঙ্গ সাধন (শ্লোক ২৭-২৮, ১০-১৩)

স্পর্শান্ কৃত্বা বহির্বাহ্যাংশ্চক্ষুশ্চৈবান্তরে ভ্রুবোঃ।
প্রাণাপানৌ সমৌ কৃত্বা নাসাভ্যন্তরচারিণৌ।।
যতেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধির্মুনির্মোক্ষপরায়ণঃ।
বিগতেচ্ছাভয়ক্রোধো যঃ সদা মুক্ত এব সঃ।।

(গীতা ৫।২৭-২৮)

যোগী যুঞ্জীত সততমাত্মানং রহসি স্থিতঃ।
একাকী যতচিত্তাত্মা নিরাশীরপরিগ্রহঃ।।
শুচৌ দেশে প্রতিষ্ঠাপ্য স্থিরমাসনমাত্মনঃ।
নাত্যুচ্ছ্রিতং নাতিনীচং চৈলাজিনকুশোত্তরম্।।
তত্রৈকাগ্রং মনঃ কৃত্বা যতচিত্তেন্দ্রিয়ক্রিয়ঃ।
উপবিশ্যাসনে যুঞ্জ্যাদ্ যোগমাত্মবিশুদ্ধয়ে।।
সমং কায়শিরোগ্রীবং ধারয়ন্নচলং স্থিরঃ।
সংপ্রেক্ষ্য নাসিকাগ্রং স্বং দিশশ্চানবলোকয়ন্।।

(গীতা ৬।১০-১৩)

'ধ্যানযোগী বাহ্যবিষয় সকল বাইরেই পরিত্যাগ করে চক্ষুর দৃষ্টি ভ্রূমধ্যে স্থাপন করে, প্রাণ ও অপান বায়ুকে সমান রেখে, মন-বুদ্ধি-ইন্দ্রিয়াদি বশে রেখে ইচ্ছা-ভয়-ক্রোধ থেকে মুক্ত—এরূপ মোক্ষপরায়ণ যোগী সর্বদাই মুক্ত। (গীতা ৫।২৭-২৮)

ভোগবুদ্ধিতে সংগ্রহহীন, আকাঙ্ক্ষারহিত, সংযতচিত্ত ও সংযতদেহ যোগী একাকী নির্জন স্থানে স্থিত হয়ে সর্বদা মনকে পরমাত্মায় স্থির রাখবেন।

পবিত্র স্থানে ক্রমশ কুশ, মৃগচর্ম তার ওপর বস্ত্রাবৃত আসন স্থাপন করবে। আসনটি যেন অতি উচ্চ বা নীচে স্থাপন না করা হয়।

যোগী আসনে উপবেশন করে, চিত্ত ও ইন্দ্রিয়াদির ক্রিয়াকে বশীভূত করে এবং মনকে একাগ্র করে অন্তঃকরণ শুদ্ধির জন্য যোগাভ্যাস করেন।

তিনি শরীর, মস্তক ও গ্রীবাকে সোজা নিশ্চলভাবে রেখে এবং অন্যদিকে না তাকিয়ে নাসিকার অগ্রভাগে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে ধ্যানে রত থাকেন।' (গীতা ৬।১০-১৩)

প্রাণাপানৌ সমৌ কৃত্বা—এখানে ভগবান বলছেন প্রাণ বায়ু (যা বহির্গত হয় এবং দীর্ঘ গতি) ও অপান বায়ু (যা গ্রহণ করা হয় এবং লঘু গতি) এই দুটির গতি প্রাণায়াম দ্বারা সমান হলে স্বাভাবিক ভাবেই পরমাত্মার চিন্তা এসে যায়।

যতেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধিঃ—ইন্দ্রিয়াদির জ্ঞানে সংযোগের প্রভাব ও বুদ্ধির জ্ঞানে পরিণামের প্রভাব থাকে। যার মনে বুদ্ধির প্রভাব থাকে তার পরিণামের দিকে দৃষ্টি থাকায় সে সুখভোগ ত্যাগ করতে সমর্থ হয়—**'ন তেষু রমতে বুধঃ'** (গীতা ৫।২২)।

ভগবান বলেছেন পবিত্র স্থানে আসন পাতবে কিন্তু তা যেন অতি উচ্চ বা নীচ স্থানে না হয়। পবিত্র স্থান হল স্বাভাবিক শুদ্ধ স্থান যেমন গঙ্গা বা নদী তীর, বনাঞ্চল, তুলসী, আমলকী, বটবৃক্ষের সন্নিকটে অথবা শুদ্ধ করে নেওয়া স্থান। আর আসন হবে প্রথমে কুশ, তারপর মৃগচর্ম ও সবার ওপর শুদ্ধ সুতীর কাপড় বিছিয়ে। ভগবানের বরাহ অবতারের লোম থেকে উৎপন্ন বলে কুশকে পবিত্র বলে মানা হয়। এইভাবে আসনে উপবেশন করে কোমর, মস্তক ও গ্রীবা যেন সমান ও এক সরলরেখায় থাকে এবং মন

ভ্রূযুগলের মধ্যে নিবদ্ধ রেখে স্থিরভাবে ধ্যান করতে হবে। ধ্যানের সময় পদ্মাসন, সিদ্ধাসনের কোনো বাধ্যবাধকতা নেই কিন্তু কোমর, গ্রীবা এবং মস্তক যেন অবশ্যই একসূত্রে সমান থাকে।

ধ্যানের পদ্ধতি—অন্তরঙ্গ সাধন (শ্লোক ১৪-১৫, ১৮-২০)

প্রশান্তাত্মা বিগতভীর্ব্রহ্মচারিব্রতে স্থিতঃ।
মনঃ সংযম্য মচ্চিত্তো যুক্ত আসীত মৎপরঃ॥
যুঞ্জন্নেবং সদাত্মানং যোগী নিয়তমানসঃ।
শান্তিং নির্বাণপরমাং মৎসংস্থামধিগচ্ছতি॥

(গীতা ৬।১৪-১৫)

যদা বিনিয়তং চিত্তমাত্মন্যেবাবতিষ্ঠতে।
নিঃস্পৃহঃ সর্বকামেভ্যো যুক্ত ইত্যুচ্যতে তদা॥
যথা দীপো নিবাতস্থো নেঙ্গতে সোপমা স্মৃতা।
যোগিনো যতচিত্তস্য যুঞ্জতো যোগমাত্মনঃ॥
যত্রোপরমতে চিত্তং নিরুদ্ধং যোগসেবয়া।
যত্র চৈবাত্মনাত্মানং পশ্যন্নাত্মনি তুষ্যতি॥

(গীতা ৬।১৮-২০)

'ধ্যানযোগী প্রশান্ত-চিত্ত, ভয়হীন, ব্রহ্মচর্যপরায়ণ, মন সংযম করে এবং ভগবানে চিত্ত নির্দিষ্ট করে ভগবৎপরায়ণ হয়ে স্থিত হন।

মন নিয়ন্ত্রণকারী যোগী মনকে সর্বদা পরমাত্মায় স্থিত করে নির্বাণরূপ পরমশান্তি প্রাপ্ত হন। (গীতা ৬।১৪-১৫)

বশীভূত চিত্ত যখন স্বরূপে অবস্থিত হয় এবং যোগী সর্বদা কামনাশূন্য হন, তখন তাঁকে যোগসিদ্ধ বলে।

আলোর শিখা যেমন বায়ুশূন্য স্থানে স্পন্দনরহিত হয়ে থাকে, যোগাভ্যাসকারী সংযত চিত্ত যোগীর চিত্তও সেইরূপ স্থির থাকে।

যোগাভ্যাস করলে নিরুদ্ধ চিত্ত যে অবস্থায় উপরত হয়, সেই অবস্থায় স্বরূপে নিজেকে দেখে যোগী নিজেতেই পরিতুষ্টি লাভ করেন। (গীতা ৬।১৮-২০)

পূর্ব প্রকরণের দশম শ্লোকে ভগবান ধ্যানযোগীদের সাধনের কিছু পথ নির্দেশ করেছেন।

ধ্যানযোগী **'চিত্তবৃত্তি নিরোধরূপ'** যোগের সাধন দ্বারা সংসার-বিমুখ হয়ে পরমাত্মাতে নিবিষ্ট হয়ে পড়েন। প্রথম সাধনা 'অপরিগ্রহঃ' অর্থাৎ নিজের সুখবুদ্ধিতে কিছুই সংগ্রহ না করা। তারপর 'নিরাশীঃ' অর্থাৎ ইচ্ছা রহিত হওয়া। ভগবান এখানে 'অপরিগ্রহঃ' অর্থাৎ বাহ্যিক ভোগ্য পদার্থ পরিত্যাগ ও আর নিরাশী অর্থাৎ ভোগ ও সংগ্রহর আকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগের কথা বলেছেন।

যতচিত্তাত্মা—অর্থাৎ তৃতীয় সাধন হচ্ছে অন্তকরণসহ শরীরকে বশীভূত রাখা। এগুলি বশে আনার উপায় হল আসক্তি সহকারে নতুন কোনো কাজ না করা। কারণ আসক্তিপূর্বক কর্মে প্রবৃত্ত হলে শরীর আরাম-আয়েসে, ইন্দ্রিয়াদি ভোগে, মন ভোগ চিন্তায় অথবা ব্যর্থ চিন্তায় প্রবৃত্ত হয়। তিনিই হন যোগী যাঁর ধ্যেয় এবং লক্ষ্য শুধুমাত্র পরমাত্মাতে মিলিত হওয়ার জন্য, সিদ্ধি বা ভোগপ্রাপ্তি লাভের আশায় নয়।

ধ্যানযোগী হন একাকী অর্থাৎ নিঃসঙ্গ, তাঁর কোনো সহায়ক থাকবে না। কোনো সাহায্যকারী থাকলে আসক্তিবশত তার কথা স্মরণ হতে থাকবে এবং তাতে মন ভগবানে নিবদ্ধ হতে অন্তরায়ের সৃষ্টি হতে পারে। তিনি **'আত্মানাং সততং যুঞ্জীত'** অর্থাৎ মনকে সর্বদা ভগবানে নিযুক্ত রাখেন। ধ্যানের সময়তো তিনি ভগবানের চিন্তায় ডুবে থাকবেনই, ব্যবহারিক কাজের সময়ও ভগবানকে মনন করবেন। কার্যাদির সময় ভগবানের মনন করলে ধ্যানের সময় ভগবৎচিন্তা করা সহজ হয় আর ধ্যানের সময় একাগ্রতা থাকলে কার্যাদির সময়ও ভগবানের চিন্তন-মনন হতে থাকে। অর্থাৎ উভয় সময় করা ধ্যান একটি অপরটির পরিপূরক হয়ে থাকে। তবে ধ্যানের সময় কখনই জগৎ-সংসারের চিন্তা মনে আনবে না।

বর্তমান প্রকরণেও ভগবান ধ্যানযোগের আরো সাধনের কথা বলেছেন—

ধ্যানযোগী হন **'বিগত ভীঃ'** অর্থাৎ ভয়বর্জিত। মানুষ যখন শরীরের

প্রতি 'আমি' ও 'আমার' ভাব ত্যাগ করে তখন তার কোনো ভয় থাকে না। তার চিত্তবৃত্তি পরমাত্মমুখী হওয়ায় সে জানে তার কল্যাণ হবেই এবং মৃত্যুকেও সে আনন্দের সঙ্গে মেনে নেয়, কারণ এতেও সে তার কল্যাণ দেখে।

ধ্যানযোগী **'ব্রহ্মচারিব্রতে স্থিতঃ'** থাকেন অর্থাৎ কেবল বীর্যর ক্ষয়ই নয়, তিনি ব্রহ্মচারীদের মতন সংযত ও নিয়ন্ত্রিত জীবন যাপন করেন। পঞ্চবিষয়ে অর্থাৎ রূপ-রস-গন্ধ-শব্দ-স্পর্শ এবং যশ-মান-আরাম থেকে দূরে থাকেন। কোনো অবস্থাতে, কোনো পরিস্থিতিতে, কোনো কারণেই বিন্দুমাত্র সুখবুদ্ধি সহকারে বিষয়গুলিকে সেবন করেন না—তা সে ধ্যানের সময়েই হোক বা সাংসারিক ব্যবহারের সময়েই হোক।

তিনি সর্বদা 'ভগবানে যুক্ত' থাকেন। **'যুঞ্জন্নেবং সদাত্মানং'** কথাটি দুবার বলা হয়েছে অর্থাৎ তিনি সর্বদা সতর্ক থাকেন যেন ধ্যানের সময় বা জগতে সাংসারিক ব্যবহারের সময় উভয়তেই ভগবানে মন নিবিষ্ট থাকে। এতে একে অপরের সহায়ক হয়। এর তাৎপর্য হল ধ্যানের সময় ভগবানে মন নিবিষ্ট তো থাকবেই আর সাংসারিক কাজের সময়ও ভগবানে মন থাকলে ধ্যানের সময় তা দৃঢ় হয়।

ধ্যানযোগী হন **'মৎপর'** অর্থাৎ ভগবদ্‌পরায়ণ হয়েই আসনে বসে ধ্যান করেন। তাঁর উদ্দেশ্য, লক্ষ্য, ধ্যেয় শুধু ভগবানেই হয়, জাগতিক কামনা-বাসনা-স্পৃহা-মমতার প্রতি নয়।

'নিয়তমানসঃ' অর্থাৎ তাঁর মন বশীভূত। ঈশ্বর-লাভের একমাত্র উদ্দেশ্য থাকায় তাঁর মনের ওপর জোর থাকে। জগৎ-সংসারের প্রতি আসক্তি বা সম্পর্ক থাকলে মন নিয়ন্ত্রিত হতে পারে না।

ভগবান ধ্যানযোগীর সাধনার দুটি স্তরের কথা বলেছেন। **'বিনিয়তং চিত্তম্'** ও **'নিঃস্পৃহ সর্বকামেভ্যো'**। প্রথমটি হল চিত্ত যখন সম্পূর্ণরূপে বশ হয় তখন তা নিজস্বরূপে স্থিতি লাভ করে **'আত্মন্যেবাবতিষ্ঠতে'**। আর পরেরটি হল যখন তার কোনো পদার্থে বা ভোগে আকাঙ্ক্ষা থাকে না, সর্ব কামনা-বাসনা রহিত হয়ে যায়, তখন তিনি হন **যুক্ত ইত্যুচ্যতে** অর্থাৎ যোগী।

চিত্তের পাঁচটি অবস্থা—মূঢ়, ক্ষিপ্ত, বিক্ষিপ্ত, একাগ্র ও নিরুদ্ধ। এর মধ্যে মূঢ় ও ক্ষিপ্ত বৃত্তিসম্পন্ন ব্যক্তি ধ্যানযোগের অধিকারী হতে পারে না। যাদের চিত্ত কখনো কখনো স্বরূপে স্থিত হয়, কখনো হয় না তারা 'বিক্ষিপ্ত চিত্ত' এবং এরাই যোগের অধিকারী। চিত্তবৃত্তি একাগ্র হলে 'সবিকল্প সমাধি' হয় তাকে 'স্বরূপ স্থিতি' বলে। আর একাগ্র বৃত্তির পরে যখন চিত্ত 'নিরুদ্ধ' অবস্থা প্রাপ্ত হয় তখন 'নির্বিকল্প সমাধি' হয় তাকে 'যোগ' বলা হয়েছে। এই উভয় সমাধিই সবীজ সমাধিঃ **'তা এব সবীজঃ সমাধিঃ'** (যোগদর্শন ১।৪৬)। তবে নির্বিকল্প যোগ, যাকে নির্বিচার সমাধিও বলে তা যখন নির্মল হয়ে যায় তখন তাতে বিবেকজ্ঞান প্রকটিত হয়।

'নির্বিচারবৈশারদ্যেহধ্যাত্মপ্রসাদঃ' (যোগদর্শন ১।৪৭)

নির্বিচার সমাধি অত্যন্ত নির্মল হলে পরে অধ্যাত্মপ্রসাদ লাভ হয়। তখন তাঁর মধ্যে বিবেকজ্ঞান প্রস্ফুটিত হয় এবং তা বিবেকখ্যাতি পর্যন্ত নিয়ে যায়।

'যোগাঙ্গ অনুষ্ঠানাৎ অশুদ্ধিক্ষয়ে জ্ঞানদীপ্তিরাবিবেকখ্যাতেঃ।'

(যোগদর্শন ২।২৮)

যোগাঙ্গ অনুষ্ঠানের ফলে অশুদ্ধির নাশ হয়ে তাতে জ্ঞানের প্রকাশ পায় যা বিবেকখ্যাতি (আত্মসাক্ষাৎকার) পর্যন্ত নিয়ে যায়। আত্মা যে সবকিছু থেকে ভিন্ন অর্থাৎ বুদ্ধি, অহংকার, ইন্দ্রিয় থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন তা যোগী প্রত্যক্ষভাবে উপলব্ধি করেন।

প্রকৃতি ও পুরুষের প্রকৃত স্বরূপের জ্ঞান হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সাধকের সকল গুণে ও তাদের কার্যে আসক্তি সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হয়ে যায়। তখন চিত্তে কোনো বৃত্তিই থাকে না। এইটিই সকলবৃত্তি নিরোধরূপ 'নির্বীজ সমাধি'।

'তস্যাপি নিরোধে সর্বনিরোধান্নির্বীজঃ সমাধিঃ'। (যোগদর্শন ১।৫১)

এই অবস্থায় সংস্কারের বীজটি পর্যন্ত সম্পূর্ণভাবে ভস্ম হয়ে যায়। এটি হল নির্বীজ সমাধি বা কৈবল্য সমাধি। পাতঞ্জল যোগে অন্তিম শ্লোকে কৈবল্য সমাধি সম্বন্ধে বলা হয়েছে—

পুরুষার্থ শূন্যানাং গুণানাং প্রতিপ্রসবঃ কৈবল্যং স্বরূপ প্রতিষ্ঠা বা চিতিশক্তেরিতি॥ (যোগদর্শন ৪।৩৪)

পুরুষকে (আত্মাকে) ভোগ ও অপবর্গ (মুক্তি) প্রদান করার জন্যই গুণসমূহের প্রবৃত্তি। এই কার্য সম্পাদনের জন্যই গুণ, বুদ্ধি, অহংকার, তন্মাত্র, মন, ইন্দ্রিয়াদিতে পরিণত হয়ে পুরুষকে এই ভোগ করিয়ে, অপবর্গ (মুক্তি) প্রদান করে। তখন তার (গুণের) কোনো কর্ম বাকি থাকে না অর্থাৎ পুরুষ কৈবল্য প্রাপ্ত হন, নির্গুণ হন। গুণের সঙ্গে পুরুষের অনাদিসিদ্ধ ও অবিদ্যাকৃত সংযোগ ছিন্ন হওয়ায় পুরুষ নিজ স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হন। এই হল পুরুষের প্রকৃতি সংসর্গ ত্যাগ বা আত্মচৈতন্যে প্রতিষ্ঠিত হওয়া।

'তদভাবাৎ সংযোগাভাবো হানং তদ্‌দৃশেঃ কৈবল্যম্' (যোগদর্শন ২।২৫)

ধ্যানযোগীর আচার (শ্লোক ১৬-১৭)

নাত্যশ্নতস্তু যোগোঽস্তি ন চৈকান্তমনশ্নতঃ।
ন চাতি স্বপ্নশীলস্য জাগ্রতো নৈব চার্জুন॥
যুক্তাহারবিহারস্য যুক্তচেষ্টস্য কর্মসু।
যুক্তস্বপ্নাববোধস্য যোগো ভবতি দুঃখহা॥

(গীতা ৬।১৬-১৭)

ভগবান বলছেন—'হে অর্জুন, যারা অত্যধিক ভোজন করেন বা অনাহারী থাকেন, যারা অতিশয় নিদ্রালু বা অতি জাগরণশীল তাদের দ্বারা যোগসিদ্ধ হয় না।

যাঁরা যথাবিধি আহার ও বিহার করেন, যথাবিধি নিদ্রিত ও জাগরিত থাকেন এবং কর্মে যথাযথ চেষ্টা করেন তারাই দুঃখনাশক যোগসিদ্ধি লাভ করেন।' (গীতা ৬।১৬-১৭)

ভোগ ও যোগের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য আছে। সংযোগজনিত সুখই হচ্ছে ভোগ আর অসতের সঙ্গে সংযোগ দূর হলে যে সুখ তা হয় যোগ। কিন্তু মানুষের দৃষ্টি বিয়োগের দিকে না গিয়ে সংযোগের দিকে যায় তার ফলে সে ভোগকে সত্যিকারের সুখ বলে মনে করে।

এখানে ভগবান ধ্যানযোগীদের জন্য পরিমিত আহার-বিহার, পরিমিত

কর্ম, পরিমিত শয়ন ও পরিমিত জাগরণ—এই চারটি বিষয়ে যুক্ত থাকার কথা বলেছেন যা তাদের দুঃখনাশক হয়। এই সূত্র সমস্ত সাধকদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। মানুষ তার কর্মফল অনুসারে 'অর্থ-সম্পদ' ও 'আয়ু' প্রাপ্ত হয়ে থাকে। এখানে উল্লিখিত যে, চারটি ক্রিয়ার মধ্যে দুটিতে ব্যয় ও দুটি ক্রিয়ায় আয় হয়ে থাকে।

ব্যয়—আহার-বিহার করলে অর্থ সম্পদের ব্যয় ও শয়নে আয়ুর ব্যয় হয়ে থাকে।

আয়—জাগরণের সময় উপার্জনের জন্য কর্ম করলে পার্থিব সম্পদের উন্নতি আর জাগরণের সময় ভগবৎসাধনায় রত থাকলে সাধকের আধ্যাত্মিক উন্নতি হয়।

আমাদের কোনোরকম উন্নতি করতে হলে তাই ব্যয় কমিয়ে আয় বাড়াতে হবে। অর্থাৎ আহার-বিহারের সময় কমিয়ে উপার্জনমুখী কর্ম বেশি করা এবং শয়নের সময় কমিয়ে জাগরণের সময় বাড়ানো অর্থাৎ বেশি সাধন করা। এই হল যোগের পথ। এর মধ্যেও আবার সম্পদ অর্জনের চেয়ে বেশি নজর দেওয়া উচিত আধ্যাত্মিক উন্নতির দিকে।

সংক্ষেপে এর অর্থ হল জীবিকা অর্জন সম্বন্ধীয় কর্ম করার সময় ভগবানকে স্মরণে রাখবে আবার শয়ন করার সময়ও ভগবৎচিন্তা করতে করতে শোবে।

ধ্যানযোগীর সংকল্প ত্যাগের উপায়—(শ্লোক ২৪-২৬)

সঙ্কল্পপ্রভবান্ কামান্ ত্যক্ত্বা সর্বানশেষতঃ।
মনসৈবেন্দ্রিয়গ্রামং বিনিয়ম্য সমন্ততঃ॥
শনৈঃ শনৈরুপরমেদ্বুদ্ধ্যা ধৃতিগৃহীতয়া।
আত্মসংস্থং মনঃ কৃত্বা ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েৎ॥
যতো যতো নিশ্চরতি মনশ্চঞ্চলমস্থিরম্।
ততস্ততো নিয়ম্যৈতদাত্মন্যেব বশং নয়েৎ॥

(গীতা ৬।২৪-২৬)

'ধ্যানযোগী সঙ্কল্পজাত সমস্ত কামনাকে সর্বতোভাবে ত্যাগ করে এবং

মনের দ্বারা ইন্দ্রিয়গুলিকে বিষয়সমূহ হতে নিবৃত্ত করেন।

তিনি ধৈর্যযুক্ত বুদ্ধি দ্বারা জগৎ হতে নিবৃত্ত হন এবং তারপরে পরমাত্মাস্বরূপে মন ও বুদ্ধিকে সম্যকভাবে স্থাপন করে আর অন্য কিছু চিন্তা করেন না।

এই সময় অস্থির ও চঞ্চল মন যে যে বিষয়ে বিচরণ করে, সেই সেই বিষয় হতে তাকে প্রত্যাহার করে কেবল পরমাত্মাতেই নিবিষ্ট করবে।' (গীতা ৬। ২৪-২৬)

মানুষের মনে জাগতিক বস্তু, ব্যক্তি, দেশ, কাল, পরিস্থিতি যে স্ফুরণ আনে সেটিই সঙ্কল্পে পরিণত হলে বন্ধনকারক হয়। স্ফুরণ হল দর্পণের মতো যাতে প্রতিবিম্ব স্থায়ী হয় না আর সঙ্কল্প হল ক্যামেরার লেন্সের মতো যাতে প্রতিবিম্ব স্থায়ীভাবে থাকে। তাই সাধককে সতর্ক থাকতে হয় যে, যদি স্ফুরণের স্ফুলিঙ্গও থাকে তবে তা যেন সঙ্কল্পে পরিণত না হয়। আর সঙ্কল্পগুলির থেকেই এরূপ উচিত, আর এরূপ হওয়া উচিত নয়—এই প্রত্যয়ের উৎপত্তি হলে তার থেকে কামনার উৎপত্তি হয়, তাই এটি সর্বতোভাবে ত্যাগ করা উচিত। ভগবান এখানে **'অশেষতঃ'** বলেছেন, তার তাৎপর্য হল যে, কামনার বীজও (সুখ সংস্কার) যেন না থাকে, কেননা একটিমাত্র বীজ হতে মাইলের পর মাইল জঙ্গল সৃষ্টি হয়। তাই বীজরূপেও কামনাকে ত্যাগ করা উচিত।

শনৈঃ শনৈরুপরমেৎ—ভগবান বলছেন এই ত্যাগ করার জন্য তাড়াহুড়া করার দরকার নেই, ধীরে ধীরে উপেক্ষা করতে হবে, ক্রমে বিষয় থেকে উদাসীন হবে এবং শেষে একেবারে বিরত হবে। এখানে কামনাকে উপেক্ষা এবং বিষয় হতে উদাসীন ও পরে বিরত থাকার কথা বলা হয়েছে। এইরূপ বলার তাৎপর্য হল, কোনো বস্তু ত্যাগ করলে, সেই ত্যাজ্য বস্তুতে অংশত দ্বেষভাব আসতে পারে কিন্তু বিরত থাকার অর্থ হল সঙ্কল্পের সঙ্গে যেন অনুরাগও না আসে, দ্বেষভাবও না আসে অর্থাৎ এগুলি থেকে যথার্থভাবে সম্পূর্ণরূপে বিমুখ হতে হবে।

তত্ত্বলাভের জন্য আকাঙ্ক্ষী ধ্যানযোগী সাধককে সতর্ক করে ভগবান

বলেছেন যে ধ্যানযোগের সাধক অভ্যাস করতে করতে সিদ্ধিপ্রাপ্ত না হলেও যেন ধৈর্যহারা না হন। সিদ্ধিপ্রাপ্ত হলে যেমন আপনিই ধৈর্য প্রাপ্ত হয়, তেমনি সিদ্ধিপ্রাপ্ত না হলেও যেন ধৈর্য বজায় থাকে, বছরের পর বছর কাটুক, শরীর নষ্ট হয় হোক কিন্তু তত্ত্বপ্রাপ্তির প্রচেষ্টা যেন বজায় থাকে।

ইহাসনে শুষ্যতু মে শরীরম্ ত্বগস্থিমাংসং প্রলয়শ্চ যাতু।
অপ্রাপ্য বোধং বহুকল্পদুর্লভং নৈবাসনাৎ কায়মিদং চলিষ্যতি॥

এই আসনে বসে আমার শরীর শুষ্ক হয়ে যাক, হাড়, মাংস, অস্থি, চর্ম পর্যন্ত নষ্ট হয়ে যাক, কিন্তু বহুকল্পদুর্লভ বোধপ্রাপ্ত না করে এই আসন থেকে এই দেহ নড়বে না। মনে রাখতে হবে যে এর চেয়ে বড় কোনো কাজই নেই। আর এইভাবে বুদ্ধিকে বশীভূত করতে হবে যাতে মান-মর্যাদা, আরাম-আয়েসের জন্য জগতের প্রতি যেসব গুরুত্ব প্রতীয়মান হয় সেগুলি যেন মন থেকে সরে যায় অর্থাৎ বুদ্ধি দ্বারা সেইগুলি থেকে বিরত থাকতে হবে।

এখানে মন-ইন্দ্রিয়াদির থেকে বিরত থাকার তাৎপর্য হল, পরমাত্মতত্ত্ব কখনো মন দ্বারা ধারণ করা যায় না। কেনোপনিষদে প্রশ্ন-উত্তর ছলে ইহা ব্যাখ্যাত হয়েছে—**'যন্মনা ন মনুতে যেনাহুর্মনো মতম্'** (কেনোপনিষদ্ ১।৬)

অর্থাৎ মন এবং সমস্ত অন্তঃকরণ দিয়ে মনন করলেও যাঁহাকে জানা যায় না, পরন্তু যাঁহা দ্বারা মন আদি সমস্ত অন্তঃকরণই প্রকাশিত তিনিই ব্রহ্ম।

যেমন সূর্যের কারণেই প্রদীপ, বিদ্যুৎ আদি প্রকাশ পায়। তবে ইহারা সূর্যকে প্রকাশ করবে কী করে ? সেইরকম মন-বুদ্ধি-ইন্দ্রিয়াদি সবই পরমাত্মারই শক্তি তাই এদের দ্বারা তাঁকে জানা যায় না, বরং পরমাত্মাকে জানতে হলে এদের প্রতি বিমুখ হওয়ারই প্রয়োজন।

'ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েৎ'-এর অর্থ কেবল 'জগতের চিন্তা থেকে নিবৃত্ত হবে' তা নয় বরং সর্বস্থানে এক পরমাত্মাই বিদ্যমান এইরূপে দৃঢ় নিশ্চয় হয়ে আর কোনো কিছু ভাবনা রাখবে না।

ভাগবতেও শ্রীকৃষ্ণ-উদ্ধব সংবাদে ভগবান বলছেন—

সর্বং ব্রহ্মাত্মকং তস্য বিদ্যয়াঽঽত্মমনীষয়া।
পরিপশ্যন্নুপরমেৎ সর্বতো মুক্তসংশয়ঃ॥ (ভাগবত ১১।২৯।১৮)

এই প্রকার মন-বাক্য-শরীর দ্বারা ধ্যানরত সাধকের সর্বত্রই ব্রহ্মময় হয়ে যায়। তখন তিনি সংশয়রহিত হয়ে পরমাত্মাকে সর্বত্র অনুভব করে সমুদয় বস্তু হতে উপরত হন।

এখানে **'শনৈঃ শনৈঃ' 'উপরমেত'** বলা হয়েছে যার অর্থ এই নিবৃত্তি জোর করে বা তাড়াহুড়ো করে নয়। কারণ জন্মজন্মান্তরের সংস্কার তাড়াহুড়া করলে দূর হয় না। অতি ব্যস্ততা চাঞ্চল্যকে আকড়ে ধরে, স্থায়ী করে, কিন্তু 'শনৈঃ শনৈঃ' চাঞ্চল্য নাশ করে। এই চাঞ্চল্য নাশ কীভাবে করবে ? **'আত্মন্যেব বশং নয়েৎ'** অর্থাৎ নিজেকে পরমাত্মায় নিবেশ করবে।

পরমাত্মাতে মন নিবিষ্ট করার পথ হল—

১) মন যে যে বিষয়ে আকর্ষিত হয়, অর্থাৎ ব্যক্তি, বস্তু, পরিস্থিতির দিকে ধাবিত হয় সেই সেই বিষয়ে থেকে মনকে ধীরে ধীরে প্রত্যাহার করে নিয়ে, নিজ ধ্যেয় পরমাত্মাতে নিবিষ্ট করবে। আর যেমন যেমন মন ধাবিত হতে থাকবে তেমন তেমন মনকে পরমাত্মার দিকে ফিরিয়ে আনবে।

২) মন যেখানে যাক, সেখানেই পরমাত্মা দেখবে। এইভাবে মন পরমাত্মায় নিবিষ্ট করবে।

৩) সাধনার সময় জগতের নানা কথা মনে পড়ে, তখন সাধক শঙ্কিত হয় এই ভেবে যে আগে এরকম হত না অথচ এখন পরমাত্মার কথা চিন্তার সময় এত কথা মনে আসছে কেন ? এতে শঙ্কার কোনো কারণ নেই, কারণ সাংসারিক কাজে ব্যস্ত থাকলে অনেক সময় সঞ্চিত সংস্কার বের হতে পারে না, তা সাধনের সময়ে বের হতে থাকে। মলিনতা বের হয়ে আসায় চিত্ত পরিষ্কার হয়ে যায়।

৪) সাধকের ভগবৎচিন্তা কঠিন বোধ হয় যখন তিনি নিজেকে সংসারের অংশ ভেবে ভগবৎচিন্তা করেন। তাঁর জগৎচিন্তাও থাকে আর ভগবৎচিন্তাও থাকে। সাধকের উচিত ভগবানের হয়ে ভগবৎচিন্তা করা **'দেবং ভূত্বা দেবং যজেৎ'**।

৫) ধ্যান করার সময় যেন সাধকের মনে কোনো কাজ জমা না থাকে। অমুক কাজ করতে হবে, অমুক স্থানে যেতে হবে, অমুক ব্যক্তির সঙ্গে দেখা

করতে হবে ইত্যাদি কাজের আকর্ষণে, ধ্যান নিবিষ্ট হয় না। ধ্যানে বসার সময় সংসারের কাজ ভুলে চিত্তকে শান্ত করে ধ্যানে বসতে হয়।

ধ্যানযোগীর সাধনার ফল (শ্লোক ২৭-২৮)

প্রশান্তমনসং হ্যেনং যোগিনং সুখমুত্তমম্।
উপৈতি শান্তরজসং ব্রহ্মভূতমকল্মষম্॥
যুঞ্জন্নেবং সদাত্মানং যোগী বিগতকল্মষঃ।
সুখেন ব্রহ্মসংস্পর্শমত্যন্তং সুখমশ্নুতে॥

(গীতা ৬।২৭,২৮)

'যাঁর সমস্ত পাপ দূর হয়েছে, রজোগুণ বা মন সর্বতোভাবে শান্ত হয়েছে, এইরূপ ব্রহ্মস্বরূপ যোগী নিশ্চিতভাবে উত্তম সাত্ত্বিক সুখ অনুভব করেন।

নিজ মন সর্বদা পরমাত্মায় সমাহিত থাকায় এই নিষ্পাপ যোগী সহজেই ব্রহ্মপ্রাপ্তিরূপ নিরতিশয় সুখ প্রাপ্ত হন।' (গীতা ৬।২৭-২৮)

এখানে সিদ্ধ যোগীকে **'অকল্মষঃ'** বলা হয়েছে অর্থাৎ তার মধ্যেকার প্রমাদ, মোহ, অপ্রবৃত্তি আদি তমোগুণ নষ্ট হয়েছে। তাকে **'শান্তরজসং'** বলা হয়েছে অর্থাৎ তাঁর মধ্যেকার লোভ, প্রবৃত্তি, নতুন কর্মে উদ্যম, অশান্তি, স্পৃহা আদি রজোগুণও শান্ত হচ্ছে বা নষ্ট হয়েছে।

কিন্তু ধ্যানযোগী যতক্ষণ মনকে নিজের বলে মনে করেন, ততক্ষণ সাত্ত্বিক বৃত্তি থাকায় মনকে অভ্যাস দ্বারা শান্ত করার চেষ্টা করলেও তা প্রশান্ত বা সর্বতোভাবে শান্ত হয় না। কিন্তু যোগী যখন মন থেকে উপরত (নিবৃত্ত) হন অর্থাৎ মনকে নিজের বলে মনে করেন না, তার সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছেদ করেন, তখন তাঁর মনে রাগ-দ্বেষ না থাকায় সেটি স্বাভাবিকভাবেই শান্ত হয়ে যায়, তিনি স্বয়ং স্বরূপে দৃঢ়ভাবে স্থিত হন, কোনো অভ্যাস লাগে না। তাঁর ব্রহ্মের সঙ্গে যে অভিন্নতা হয় তাতে আমি ভাবের সংস্কার থাকে না এবং ইহাই সুখপূর্বক ব্রহ্মসাযুজ্য। এখানে **'সুখমুপৈতি'** অর্থে বলা হয়েছে যে, ধ্যানযোগী সবকিছু থেকে উপরত হন, তাঁর উত্তম সুখের খোঁজ করতে হয় না, তার জন্য উদ্যোগ, পরিশ্রম করতে হয় না, তিনি স্বতঃস্বাভাবিক

ভাবেই সেই উত্তম-সুখ লাভ করেন।

ধ্যানরত সাংখ্যযোগী (শ্লোক ২৯)

সর্বভূতস্থমাত্মানং সর্বভূতানি চাত্মনি।
ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্বত্র সমদর্শনঃ॥

(গীতা ৬।২৯)

'নিজ স্বরূপ দর্শনকারী এবং ধ্যানযোগে যুক্তচিত্ত সাংখ্যযোগী নিজ স্বরূপকে সর্বভূতে এবং সর্বভূতকে নিজ স্বরূপে দর্শন করেন।' (গীতা ৬।২৯)

এখানে '**সর্বভূতস্থমাত্মানম্**' অর্থাৎ যিনি সর্বপ্রাণীতে নিজ আত্মা অর্থাৎ সত্যস্বরূপকে অবস্থিত দেখেন। সাধারণ মানুষ যেমন শরীরের প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে 'আমি'কেই পূর্ণরূপে দেখে, তেমনি সমদর্শী ব্যক্তি সকল প্রাণীতেই নিজ স্বরূপকে স্থিত দেখেন।

ধ্যানরত ভক্তিযোগী—(শ্লোক ৩০-৩২)

যো মাং পশ্যতি সর্বত্র সর্বং চ ময়ি পশ্যতি।
তস্যাহং ন প্রণশ্যামি স চ মে ন প্রণশ্যতি॥
সর্বভূতস্থিতং যো মাং ভজত্যেকত্বমাস্থিতঃ।
সর্বথা বর্তমানোঽপি স যোগী ময়ি বর্ততে॥
আত্মৌপম্যেন সর্বত্র সমং পশ্যতি যোঽর্জুন।
সুখং বা যদি বা দুঃখং স যোগী পরমো মতঃ॥

(গীতা ৬।৩০-৩২)

'যে ভক্ত সবার মধ্যে আমাকে দেখেন এবং আমার মধ্যে সবকিছু দর্শন করেন, তাঁর কাছে আমি অদৃশ্য হই না এবং তিনি আমার কাছে অদৃশ্য হন না।

আমার মধ্যে একাত্মভাবে স্থিত যে ভক্তিযোগী সমস্ত প্রাণীতে স্থিত আমার ভজনা করেন, তিনি সর্বপ্রকারের আচরণ করলেও, আমার মধ্যেই ব্যবহার করেন অর্থাৎ সর্বদা আমাতেই অবস্থান করেন।

হে অর্জুন ! যে ভক্ত আত্মসাদৃশ্যে সর্বত্র সমদর্শী এবং সুখ ও

দুঃখকে সমরূপে দেখেন, তাকেই পরম যোগী বলে মনে করা হয়।' (গীতা ৬।২৯-৩২)

ধ্যানী সাংখ্যযোগীদের সম্বন্ধে ভগবান আত্মজ্ঞানের কথা বলেছেন আর ভক্তিযোগীদের বিষয়ে বলতে গিয়ে ভগবান পরমাত্মজ্ঞানের কথা বলেছেন। **'যো মাং পশ্যতি সর্বত্র'** পদটির ভাব হল, যে আমাকে সবার মধ্যে দেখে এবং নিজের মধ্যেও দেখে। আর **'সর্বং চ ময়ি পশ্যতি'** হল সকলকে আমার মধ্যে দেখে এবং নিজেকেও আমার মধ্যে দেখে। সাধনার প্রথম স্তরে সাধক পরমাত্মাকে দূরে দেখে, ক্রমে কাছে দেখে, পরে নিজের মধ্যে দেখে এবং শেষে শুধু পরমাত্মাকেই দেখে।

কর্মযোগী পরমাত্মাকে কাছে দেখেন এবং অন্যের মধ্যে দেখেন, **জ্ঞানযোগী** পরমাত্মাকে নিজের মধ্যে দেখেন এবং **ভক্তিযোগী** কেবল তাঁকেই সর্বত্র দর্শন করেন।

ভক্ত সমস্ত দেশ, কাল, বস্তু, ব্যক্তি, পশুপক্ষী, দেবতা, যক্ষ, রাক্ষস, পদার্থ, পরিস্থিতি প্রভৃতি সবেতেই ভগবান দর্শন করেন। **'যাঁহা যাঁহা নেত্র পড়ে তাঁহা কৃষ্ণ স্ফুরে'** আর এই সমদর্শনের স্বাভাবিক ক্রিয়া হল যেমন সাধারণ প্রাণীর নিজ শরীরের প্রতি আরামের ও স্বাচ্ছন্দ্যের স্বাভাবিক প্রচেষ্টা থাকে, মহাপুরুষদেরও তেমনি অন্য সমস্ত শরীরের আরামের প্রতি স্বাভাবিক চেষ্টা থাকে।

সর্বত্র বলার অর্থ তিনি বর্ণ-আশ্রম-দেশ-সম্প্রদায় বা পশু-পক্ষী, বৃক্ষ-লতা, স্থাবর-জঙ্গম সমস্ত কিছুকেই সমভাবে সুখী করতে চেষ্টা করেন বা তাদের দুঃখ দূর করার স্বাভাবিক উদ্যোগ নেন।

এখানে উল্লেখ্য এই যে, শাস্ত্র-মর্যাদা অনুযায়ী জগতের সকল প্রাণীতে স্পর্শ-অস্পর্শ, উচ্চ-নীচ ভেদ মেনেও মহাপুরুষদের তাদের প্রতি প্রিয়তা বা হিতৈষিতার কখনো কোনো ঘাটতি হয় না। যেমন দেহাসক্ত অজ্ঞানী ব্যক্তি দেহে পীড়া হলে সেটি দূর করতে বা কষ্ট নিবারণ করতে তৎপর থাকে, সেইরকম মহাপুরুষদেরও অপরের দুঃখ দূর করে তাদের সুখী করতে স্বাভাবিক প্রচেষ্টা ও তৎপরতা থাকে। তাঁদের মনে এই অভিমান কখনো

আসে না যে আমি প্রাণীদের দুঃখ দূর করছি বা অপরকে সুখী করছি। অপরের দুঃখ দূরীকরণে তিনি নিজের কোনো বিশেষত্ব খুঁজে পান না। তাঁর স্বভাবই হয় অপরের দুঃখ দূর করে তাদের সুখী করা।

যে মহাপুরুষের অন্তকরণে বোধের উদয় হয়েছে, তিনি নিজের দেহ-পীড়া সহ্য করতে পারেন বা উপেক্ষা করতে পারেন কিন্তু অপরের দুঃখ বা কষ্ট সহ্য করার শক্তি তাঁর থাকে না। এটা বিষমভাব নয় এটা হল সমতার জন্মদাতা, সমত্ব লাভের উপায়। সাধকের সাধন অবস্থায় এই বৈষম্য ভাবের উদয় হয় এবং সিদ্ধাবস্থায় এটিই তাঁর স্বাভাবিক প্রবৃত্তি হয়ে যায়। স্বাভাবিক প্রবৃত্তি হয় কেন ? না তিনি সমস্ত বস্তু, যোগ্যতা, সামর্থ্য— সব নিজের মনে না করে ভগবানেরই বলে মনে করেন এবং ভগবানের বস্তু ভগবানকেই সেবারূপে অর্পণ করেন। '**ত্বদীয়ং বস্তু গোবিন্দ তুভ্যমেব সমর্পয়ে**'।

চোখ ও পায়ের পার্থক্য হল একটি জ্ঞানেন্দ্রিয় ও অপরটি কর্মেন্দ্রিয়, একটিতে দেখে অপরটিতে চলে ; কিন্তু অঙ্গ হিসাবে তারা একই শরীরের। পায়ে কাঁটা ফুটলে চোখে জল আসে আর চোখে বালি পড়লে পা টলমল করে। যখন মানুষের সকল প্রাণীতে একইরকম ভাবনা আসে তখনই সে যথার্থ সাধক।

ভক্তিযোগী—(শ্লোক ১০, ২৯)

ব্রহ্মণ্যাধায় কর্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা করোতি যঃ।
লিপ্যতে ন স পাপেন পদ্মপত্রমিবাম্ভসা॥

ভোক্তারং যজ্ঞতপসাং সর্বলোকমহেশ্বরম্‌।
সুহৃদং সর্বভূতানাং জ্ঞাত্বা মাং শান্তিমৃচ্ছতি॥

(গীতা ৫।১০, ২৯)

'যে ভক্তিযোগী আসক্তি ত্যাগ করে সমস্ত কর্ম পরমাত্মায় অর্পণ করেন, তিনি পদ্মপাতায় জলের মতন পাপে লিপ্ত হন না। (গীতা ৫।১০)

ভক্তগণ ভগবানকে সকল যজ্ঞ ও তপস্যার ভোক্তা, সর্বলোকের মহেশ্বর এবং সকল প্রাণীর সুহৃদ জেনে শান্তি লাভ করেন।' (গীতা ৫।২৯)

———o———

ষষ্ঠ প্রশ্ন

পঞ্চম প্রশ্নের উত্তরে ভগবান সমগ্র পঞ্চম অধ্যায় ও ষষ্ঠ অধ্যায়ের কিয়দংশে কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ, ধ্যানযোগ ও ভক্তিযোগ বিস্তৃতভাবে বলেছেন। কিন্তু ধ্যানযোগেও সমত্বপ্রাপ্তি হয় জেনে অর্জুনের মনে আবার সংশয় জাগে এবং তাঁর পরবর্তী প্রশ্ন (শ্লোক ৩৩-৩৪)

যোঽয়ং যোগস্ত্বয়া প্রোক্তঃ সাম্যেন মধুসূদন।
এতস্যাহং ন পশ্যামি চঞ্চলত্বাৎ স্থিতিং স্থিরাম্॥
চঞ্চলং হি মনঃ কৃষ্ণ প্রমাথি বলবৎ দৃঢ়ম্।
তস্যাহং নিগ্রহং মন্যে বায়োরিব সুদুষ্করম্॥

(গীতা ৬।৩৩-৩৪)

'অর্জুন জিজ্ঞাসা করলেন—হে মধুসূদন ! আপনি সমত্বরূপ যে যোগের কথা বললেন, মন চঞ্চল হওয়ায় এই যোগে স্থিতিলাভ করা আমার খুব কঠিন বলে মনে হয়।

হে কৃষ্ণ ! মন কেবল চঞ্চলই নয়, ইহা ইন্দ্রিয় বিক্ষোভকারী, দৃঢ় এবং বলবান। একে নিরোধ করা, বায়ুকে আবদ্ধ করার মতোই দুষ্কর।' (গীতা ৬।৩৩-৩৪)

অর্জুনের প্রশ্নের উত্তর ভগবান পরবর্তী দুই শ্লোকে দিয়েছেন।

ভগবান বলছেন—(শ্লোক ৩৫-৩৬)

অসংশয়ং মহাবাহো মনো দুর্নিগ্রহং চলম্।
অভ্যাসেন তু কৌন্তেয় বৈরাগ্যেণ চ গৃহ্যতে॥
অসংযতাত্মনা যোগো দুষ্প্রাপ ইতি মে মতিঃ।
বশ্যাত্মনা তু যততা শক্যোঽবাপ্তুমুপায়তঃ॥

(গীতা ৬।৩৫-৩৬)

'হে অর্জুন ! সত্যই মন খুব চঞ্চল আর একে নিরোধ করাও অত্যন্ত কঠিন। অভ্যাস ও বৈরাগ্যের দ্বারাই একে বশ করা যায়।

যার মন সম্পূর্ণরূপে বশীভূত নয়, তার পক্ষে যোগ দুষ্প্রাপ্য। কিন্তু বিহিতভাবে যত্ন করলে বশীভূতচিত্ত যোগীর যোগ প্রাপ্ত হওয়া সম্ভব।' (গীতা ৬।৩৫-৩৬)

ভগবান আগের শ্লোকেই বলেছেন জ্ঞানের সংস্কারসম্পন্ন ধ্যানযোগী নিজের মধ্যে আত্মাকে দেখেন যা আত্মজ্ঞান আর ভক্তির সংস্কারসম্পন্ন ধ্যানযোগী সবার মধ্যে ভগবান দেখেন যা পরমাত্মজ্ঞান।

আত্মজ্ঞানে থাকে বিবেক-বুদ্ধির প্রাধান্য আর পরমাত্মজ্ঞানে থাকে শ্রদ্ধা-বিশ্বাসের প্রাধান্য। কিন্তু অর্জুনের লক্ষ্য ধ্যানযোগীর অন্তরের জ্ঞান বা ভক্তির সংস্কারের দিকে না গিয়ে মনের চাঞ্চল্যের দিকে ছিল। তাই তিনি মনের চঞ্চলতাকেই প্রতিবন্ধক বলে মনে করেছেন। আসলে মনের চঞ্চলতা আসে জড়পদার্থে আসক্তিবশতঃ এবং তার থেকে কামনা সৃষ্টি হয়।

গীতায় ভগবান কামনা থাকার পাঁচটি স্থানের কথা উল্লেখ করেছেন —ইন্দ্রিয়াদি, মন, বুদ্ধি, বিষয় ও স্বয়ং। **'ইন্দ্রিয়ানি মনো বুদ্ধিঃ অস্য অধিষ্ঠানমুচ্যতে'** (গীতা ৩।৪০) অর্থাৎ কামনাবাসনা শরীরের ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধিতে স্থিত থাকে এবং **'রসবর্জং রসোপ্যস্য'** (গীতা ২।৫৯) অর্থাৎ বিষয়ভোগ নিবৃত্ত হলেও ইন্দ্রিয়াদির বিষয়াসক্তি নিবৃত্ত হয় না।

আসলে কিন্তু কাম বাস করে স্বয়ং-এ আর ইন্দ্রিয়াদি, মন, বুদ্ধি ও বিষয়াদিতে এর প্রকাশ ঘটে। যতক্ষণ স্বয়ং-এ কিছুমাত্র কামনার অংশ (সংস্কার) থাকে, মনের চাঞ্চল্য ততক্ষণই বাধা সৃষ্টি করে। স্বয়ং-এ কামনা সম্পূর্ণ নিবৃত্ত হলে মনের চাঞ্চল্যও স্বতঃই দূর হয়।

দেহাভিমানে গলিতে বিজ্ঞাতে পরমাত্মনি।

যত্র যত্র মনো যাতি তত্র তত্র পরামৃতম্॥ (সরস্বতীরহস্যোপনিষদ্ ৩১)

শাস্ত্রে তাই বলেছে দেহাভিমান (জড়র সঙ্গে বা শরীরের প্রতি আমিত্ব ভাব) যখন সম্পূর্ণ দূর হয়ে পরমাত্মবোধ হয়, তখন মন যে যে স্থানে যায় সেই সেই স্থানেই পরমাত্মতত্ত্ব অনুভূত হয় অর্থাৎ তার অখণ্ড সমাধি (সহজ সমাধি) হয়।

যাইহোক, অর্জুনের প্রশ্নের উত্তরে অর্থাৎ ধ্যানযোগে মনের চাঞ্চল্যের উত্তরণের সম্বন্ধে ভগবান দুটি উপদেশ দিয়েছেন—**'অভ্যাসেন তু কৌন্তেয় বৈরাগ্যেণ চ গৃহ্যতে'**। অর্থাৎ অভ্যাস ও বৈরাগ্য সাধন দ্বারা মনকে নিবৃত্ত করবে।

অভ্যাস— মনকে বারংবার ধ্যেয় বস্তুতে নিবিষ্ট করাই হল অভ্যাস যা ধ্যানযোগে বিশেষ উপযোগী।

বৈরাগ্য—আর জগতের অনিত্যতার কথা চিন্তা করলেই বৈরাগ্য আসে যা জ্ঞানযোগে বিশেষ উপযোগী।

পাতঞ্জল যোগেও চিত্তবৃত্তি নিরোধে অভ্যাস ও বৈরাগ্যের প্রয়োজনীয়তার কথা বলা হয়েছে—

'অভ্যাসবৈরাগ্যাভ্যাং তন্নিরোধঃ' (যোগদর্শন ১।১২)

চিত্তবৃত্তির প্রবাহ পরম্পরাগত সংস্কার অনুযায়ী সাংসারিক ভোগের প্রতি ধাবিত হয়। সেই প্রবাহকে 'রুদ্ধ' করার প্রক্রিয়া হল 'বৈরাগ্য', আর তাকে 'কল্যাণ পথে' নিয়ে যাওয়ার উপায় হল 'অভ্যাস'। আসলে স্বভাব চঞ্চল মনকে কোনো এক ধ্যেয়র প্রতি স্থির করার যে নিরন্তর প্রচেষ্টা তারই নাম অভ্যাস। **'তত্র স্থিতৌযত্নোঽভ্যাসঃ'** (যোগদর্শন ১।১৩)।

শাস্ত্রে বিভিন্ন ধরনের অভ্যাসের কথা বলা আছে, তার মধ্যে পাতঞ্জল যোগের সমাধিপাদের (৩২-৩৯) সূত্রে কয়েকপ্রকার প্রধান অভ্যাসের কথা উল্লেখ্য। এদের মধ্যে যেটি যে সাধকের পক্ষে সুবিধাজনক, যেটিতে তার স্বাভাবিক রুচি আছে সেটিই তার উপযুক্ত।[১]

---

[১]আত্মানুসন্ধানরত যোগীদের প্রতি কতিপয় উপদেশ—

(ক) 'মৈত্রী করুণা মুদিতোপেক্ষণাং সুখদুঃখ পুণ্যাপুণ্য বিষয়াং ভাবনাতশ্চিত্ত প্রসাদনম্॥' (যোগদর্শন ১।৩৩)

সুখীর প্রতি মিত্রভাব, দুঃখীর প্রতি দয়া, পুণ্যাত্মার প্রতি প্রসন্নতা ও পাপীগণে উপেক্ষার ভাব রাখলে চিত্ত শুদ্ধ ও নির্মল হয়।

(খ) 'প্রচ্ছর্দন বিধারণাভ্যাং বা প্রাণস্য' (যোগদর্শন ১।৩৪)

প্রাণায়াম দ্বারাও চিত্ত নির্মল হয়।

(গ) 'যথাভিমত ধ্যানদ্বা' (যোগদর্শন ১।৩৯)

এই অভ্যাসের পথ হচ্ছে নিরন্তর সাধনা করা। **'স তু দীর্ঘকাল নৈরন্তর্য সৎকারাহ্হসেবিতো দৃঢ়ভূমিঃ'** (যোগদর্শন ১।১৪)। দীর্ঘকাল ধরে নিরন্তর এবং যত্নসহকারে ব্যাপৃত থেকে অনুশীলন করলে অভ্যাস দৃঢ়ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত হয়। সাধকের কর্তব্য হল নিজ সাধনের প্রতি কখনো অধৈর্য হবে না, কখনো আলস্য দেখাবে না। যেন দৃঢ় বিশ্বাস থাকে যে, অভ্যাস কখনো ব্যর্থ হতে পারে না, অভ্যাসের শক্তিতে সে আপন লক্ষ্যে পৌঁছে যাবেই। অভ্যাসকে তুচ্ছ করবে না, অভ্যাসের কালের কোনো নির্দিষ্ট সীমা রাখবে না, অভ্যাসকে নিজ জীবনের অবলম্বন করে, অত্যন্ত স্নেহভরে নিরন্তর আজীবন লালন করবে এবং প্রীতিপূর্বকভাবে সমস্ত অঙ্গ সমেত তার অনুশীলনে রত থাকবে।

আত্মানুসন্ধানে রত অভ্যাস যোগীর জন্য মহর্ষি পাতঞ্জলি কর্তৃক কতিপয় পথ নির্দেশ হল—

১) **'ঈশ্বর প্রণিধানাদ্বা'** (যোগদর্শন ১।২৩)

'ঈশ্বর প্রণিধানের দ্বারাও নির্বীজ সমাধি সিদ্ধ হয়।' ঈশ্বর সর্বসমর্থ, তিনি তার শরণাগত ভক্তের প্রতি প্রসন্ন হয়ে তার আকাঙ্ক্ষিত সমস্ত কিছু পূরণ করেন।

২) **'তস্য বাচকঃ প্রণবঃ'** (যোগদর্শন ১।২৭)

নাম ও নামীর সম্বন্ধ অচ্ছেদ্য, অনাদি ও অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। 'ওঁ' সেই পরমেশ্বরের বেদোক্ত নাম এবং তাই মুখ্য। গীতাতেও জপযজ্ঞকে সমস্ত যজ্ঞ

আপন রুচি অনুযায়ী আপন আপন ইষ্টের ধ্যান করলেও মন স্থির হয়।

(ঘ) 'বিষয়বতী বা প্রবৃত্তিরুৎপন্না মনসঃ স্থিতিনিবন্ধনী' (যোগদর্শন ১।৩৫)

বিষয়াবতী বুদ্ধি অর্থাৎ দিব্য বিষয়ে অনুভব হলে, যোগমার্গে বিশ্বাস ও উৎসাহ বৃদ্ধি পায়।

(ঙ) 'বিশোকা বা জ্যোতিস্মতী' (যোগদর্শন ১।৩৬)

অভ্যাসের দ্বারা সাধকের যদি শোকরহিত জ্যোতির্ময় প্রবৃত্তির অনুভব হয় তবে তাও মনের স্থিরতা আনে।

(চ) 'স্বপ্ননিদ্রা জ্ঞানালম্বং বা' (যোগদর্শন ১।৩৮)

স্বপ্নে অলৌকিক দর্শনও চিত্তবৃত্তির নিরোধে সাহায্য করে।

থেকে শ্রেষ্ঠ বলা হয়েছে। শ্রীকৃষ্ণ, রাম আদি যত নাম আছে সেগুলি জপ করার মাহাত্ম্য অসীম।

৩) **'তজ্জপস্তদর্থ ভাবনম্'** (যোগদর্শন ১।২৮)

সাধককে ঈশ্বরের নাম জপ ও তাঁর স্বরূপের স্মরণ-চিন্তন করতে হবে। একেই ঈশ্বরে প্রণিধান, ঈশ্বরে ভক্তি বা ঈশ্বরে শরণাগতি বলে। ঈশ্বরে বিধি ভক্তির আরও অনেক ভেদ আছে কিন্তু জপ-ধ্যানই মুখ্য। এটিকে উপলক্ষ্য ভেবে ভগবদ্‌ভক্ত ঈশ্বর প্রসন্নতাকেই নির্বীজ সমাধির হেতু মনে করবে। সাধকগণ শ্রদ্ধা সহকারে সাধন-ভজন করলেও, যোগ প্রাপ্তিতে বাধা আসে এবং পরমাত্মা সদাসর্বদা বিদ্যমান হলেও শীঘ্র অনুভূত হন না এর একমাত্র কারণ তাঁদের চেষ্টায় শৈথিল্য থাকে। আসলে সাধকের অন্তঃকরণে বিষয় ভোগের যে আসক্তি তার জন্যই তিনি সংযতাত্মা হতে পারেন না। আর আসক্তি সহকারে বিষয় ভোগ করলে যে সংস্কার তৈরি হয় সেটি ভয়ঙ্কর এবং জন্মজন্মান্তরে বিষয়ভোগ ও পাপে প্রবৃত্ত করাতে থাকে। তাই নিজেকে মনে করতে হবে 'আমি ভোগী নই', আমি ভগবানের এবং ভগবানে অর্পিত হওয়াই আমার কাজ। আমি সেবক, সেবা করাই আমার কাজ, কিছু প্রত্যাশা করা আমার কাজ নয়। **ব্যবহারকালে সাধক যেন সতর্ক থাকেন, যেন কখন পরের সত্ত্ব (বস্তু) না এসে পড়ে, কারণ পরের বস্তু গ্রহণ করলে মন অশুদ্ধ হয়।** কোনো চাকরি বা কাজ করলে যা মাইনে পাওয়া যায়, তার থেকে বেশি কাজ করবে। ব্যবসা করলে ওজন, মাপ হিসাবের চেয়ে বেশি দিলেও দেবে কিন্তু কখন যেন কম দেওয়া না হয়। মজুরের মজুরি যেন কাজের চেয়ে বেশিই দেওয়া হয়। এই প্রকার ব্যবহার করতে থাকলে মন শুদ্ধ হয়।

আখ্যান—১) এক রাজা সভায় জিজ্ঞাসা করলেন রাজ্যে কি এমন কেউ আছে যে অন্যের সত্ত্ব ভোগ করে না। জানা গেল এক বুড়ি মা আছেন যিনি তাঁত বুনে খান কিন্তু কারোর সত্ত্ব ভোগ করেন না। রাজা বুড়িমাকে তাঁর বোনা কাপড় নিয়ে আসতে বললেন। বুড়ি আসলে রাজা বললেন, বুড়িমা আপনার কাপড়ে কি কারোর সত্ত্ব আছে। বুড়িমা বললেন, মহারাজ সেরকম কারোর সত্ত্ব নেই, তবে কদিন আগে বাড়ির সামনে এক বিয়ের শোভাযাত্রা

যাচ্ছিল তাতে অনেক আলোক ছিল, আমি এই কাপড়টি বোনার সময় ওই আলোতে বুনেছি। ওটি আমার আলো ছিল না। মহারাজ বুঝলেন বুড়িমার অন্যায় সত্ত্ব গ্রহণে কি গভীর দৃষ্টি।

২) এক রাজ্যে এক পণ্ডিত ছিলেন। তিনি ভাগবত পাঠ শোনাতে রাজার কাছে গেছেন। রাজা তো ভাগবত পাঠ শুনে খুব খুশি, সসম্মানে তাঁকে বিদায় দিলেন কিন্তু কোনো সাম্মানিক অর্থ দিলেন না। তারপর থেকে রাজা মাঝে মাঝেই ছদ্মবেশে রাজ্য পরিভ্রমণে বার হতেন ও কায়িক শ্রম করে উপার্জিত অর্থ জমাতেন। অবশেষে বেশ কিছু অর্থ জমলে সেই পণ্ডিতের বাড়ি গেলেন সাম্মানিক দক্ষিণা দিতে। রাজা বললেন, পণ্ডিতমশাই আমি সেইদিন আপনাকে কিছু দিতে পারিনি কারণ আমার কোষাগারের সব অর্থই কর হিসাবে সংগৃহীত। এই করদাতাদের মধ্যে যেমন সৎ ব্যক্তিও আছে তেমন অসৎ লোকও আছে। এই অসৎ লোকের উপার্জিত অর্থ দিয়ে আপনার সত্ত্ব নষ্ট করতে চাইনি। আজ এই অর্থ আপনাকে দিতে পেরেছি তাতে আমি খুবই পরিতুষ্ট কারণ এ আমার স্বোপার্জিত কায়িক পরিশ্রমের অর্থ, আমি মাথা উঁচু করে আপনাকে দিতে পারছি। দেরি হওয়ার জন্য আমি অনুতপ্ত। আমার প্রণাম গ্রহণ করবেন।

———o———

সপ্তম প্রশ্ন

ষষ্ঠ প্রশ্নের উত্তরে ৩৫, ৩৬ শ্লোকে ভগবান বলেছেন যাঁর অন্তকরণ সম্পূর্ণভাবে বশীভূত নয় অর্থাৎ যে ব্যক্তির প্রচেষ্টায় শৈথিল্য থাকে তার পক্ষে যোগসিদ্ধ হওয়া কঠিন। সেইজন্য অর্জুন পরবর্তী তিনটি শ্লোকে প্রশ্ন করছেন—(শ্লোক ৩৭-৩৯)

অযতিঃ শ্রদ্ধয়োপেতো যোগাচ্চলিতমানসঃ।
অপ্রাপ্য যোগসংসিদ্ধিং কাং গতিং কৃষ্ণ গচ্ছতি॥
কচ্চিন্নোভয়বিভ্রষ্টশ্ছিন্নাভ্রমিব নশ্যতি।
অপ্রতিষ্ঠো মহাবাহো বিমূঢ়ো ব্রহ্মণঃ পথি॥
এতন্মে সংশয়ং কৃষ্ণ ছেত্তুমর্হস্যশেষতঃ।
ত্বদন্যঃ সংশয়স্যাস্য ছেত্তা ন হ্যুপপদ্যতে॥

(গীতা ৬।৩৭-৩৯)

'হে কৃষ্ণ ! যাঁর সাধনে শ্রদ্ধা রয়েছে অথচ যত্নে শৈথিল্যতা আসায় অন্তিমকালে যোগভ্রষ্ট হয়েছেন, তাঁর কী গতি হবে ?

তিনি সংসার আশ্রয়বর্জিত ও পরমাত্মা প্রাপ্তির থেকে বিচ্যুত হয়ে কি ছিন্নবিচ্ছিন্ন মেঘরাশির ন্যায় নষ্ট হয়ে যাবেন না ?

হে কৃষ্ণ, আমার এই সংশয়, নিঃশেষরূপে তুমি ছাড়া আর কেউ দূর করতে পারবে না।' (গীতা ৬।৩৭-৩৯)

অর্জুনের প্রশ্ন সংসার ও সাধনচ্যুত সাধকদের সম্বন্ধে। সারাজীবন সাধনভজন করেও যদি সাধকদের অন্তিমকালে ভগবান স্মরণে না আসে তবে কি তার পতন হয়, এই কথা জানার জন্য অর্জুন অত্যন্ত ব্যাকুল হয়েছিলেন। অর্জুনের এই যে প্রশ্ন 'কাং গতিং কৃষ্ণ গচ্ছতি'র উত্তর ভগবান ষষ্ঠ অধ্যায়ের অবশিষ্ট আটটি শ্লোকের (৪০-৪৭) মাধ্যমে প্রদান করেছেন।

ধ্যানযোগী মনকে (অন্তকরণের অংশ) নিজের বলে মনে করে তা পরমাত্মাতে নিয়োজিত করেন। তাই ধ্যানযোগীর পুনর্জন্ম হয় মন বিচলিত হলে অর্থাৎ সাধন ভ্রষ্ট হলে। কিন্তু এই করণ সাপেক্ষতা অন্য তিন যোগ—যথা কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগে নেই। কর্মযোগী ও জ্ঞানযোগীর পুনর্জন্ম হয় জাগতিক আসক্তি থেকে। কিন্তু ভক্তিযোগে সাধক ভগবানের আশ্রয়ে থাকায় ভগবান তাকে বিশেষভাবে রক্ষা করেন—**'যোগক্ষেমং বহাম্যহম্'** (গীতা ৯।২২), **'মৎপ্রসাদাৎ তরিষ্যসি'** (গীতা ১৮।৫৮)।

অর্জুন জানেন যে, এই গূঢ় প্রশ্নের উত্তর ভগবান ভিন্ন আর কেউ দিতে সক্ষম নয় কারণ তিনিই সকল প্রাণীর গতি-অগতি জানেন।

উৎপত্তিং প্রলয়ং চৈব ভূতানামাগতিং গতিম্।
বেত্তি বিদ্যামবিদ্যাং চ স বাচ্যো ভগবানিতি॥

(বিষ্ণুপুরাণ ৬।৫।৭৮, নারদপুরাণ ৪৬।২১)

'যিনি সমস্ত প্রাণীর সৃষ্টি ও নাশ, গতি ও অগতি, বিদ্যা ও অবিদ্যা জানেন, তিনিই 'ভগবান' শব্দের যোগ্য।'

ভগবানের কথা বলতে শুরু করলে ভক্তর যেমন আশ মেটে না, বলেই চলেন ; তেমন ভগবানও ভক্তপ্রসঙ্গ (যোগীর কথা) ষষ্ঠ অধ্যায়ে শুরু করলেও অতিরিক্ত প্রশ্ন ব্যতীতই ভক্তকথা সপ্তম, নবম ও অংশত দশম অধ্যায়ের একাদশ শ্লোক পর্যন্ত বলেছেন। মাঝে অর্জুন ব্রহ্ম আদি সম্বন্ধে প্রশ্ন করায় ভগবান অষ্টম অধ্যায়ে তার ব্যাখ্যা করে নবম অধ্যায় থেকে আবার ভক্তপ্রসঙ্গে ফিরে এসেছেন।

পুণ্যবান লোকেদের গতি সম্বন্ধে ভগবান বলেছেন—

কল্যাণকারী ব্যক্তি চার প্রকার হয় এবং তাদের অন্তিমগতিও ভিন্ন প্রকারের হয়ে থাকে। (১) রাজসিক ভাবসম্পন্ন কল্যাণকামী (২) শাস্ত্রীয় বিধিসম্পন্ন যজ্ঞকারী কল্যাণকামী (৩) যোগভ্রষ্ট বাসনাযুক্ত সাধক (৪) যোগভ্রষ্ট বাসনারহিত সাধক।

প্রথম প্রকার কল্যাণকারী হল রজোগুণী তার অন্তিমে গতি হয়—'কর্ম-

সঙ্গিষু জায়তে' (গীতা ১৪।১৫) অর্থাৎ মনুষ্যকুলে জন্ম হয়। দ্বিতীয় প্রকার কল্যাণকামী সত্ত্বগুণী, তাদের মৃত্যুকালে স্বর্গসুখ লাভ হয় এবং তা হয় সুকর্মজনিত কারণে **'তদোত্তমবিদাং লোকানমলান্ প্রতিপদ্যতে'**। তিনি সেখানে ততক্ষণই থাকতে পারেন যতক্ষণ না তাঁর পুণ্য শেষ হয় এবং তারপর তাকে প্রত্যাগমন করতে হয়—**'গতাগতং কামকামা লভন্তে'** (গীতা ৯।২১)। এই দুই প্রকারের গতি সম্বন্ধে বিস্তারিতভাবে অন্যত্র বলা হয়েছে। এবারে তৃতীয় ও চতুর্থ প্রকারের যোগভ্রষ্ট সাধকদের কথা আলোচিত হচ্ছে।

যোগসাধনের উৎকর্ষতা	শ্লোক ৪০
যোগভ্রষ্ট সাধকের (বাসনাযুক্ত) গতি	শ্লোক ৪১, ৪৪-৪৫
যোগভ্রষ্ট সাধকের (বাসনারহিত) গতি	শ্লোক ৪২-৪৩
যোগসাধকের মাহাত্ম্য	শ্লোক ৪৬-৪৭

যোগসাধনের উৎকর্ষতা—(শ্লোক ৪০)

পার্থ নৈবেহ নামুত্র বিনাশস্তস্য বিদ্যতে।
ন হি কল্যাণকৃৎ কশ্চিৎ দুর্গতিং তাত গচ্ছতি॥ (গীতা ৬।৪০)

ভগবান বলছেন—'হে পার্থ ! যোগভ্রষ্ট সাধক কখনই দুর্গতি প্রাপ্ত হন না। তাদের না ইহলোকে না পরলোকে বিনাশ হয়।' (গীতা ৬।৪০)

এখানে অর্জুনের মনে সন্দেহ নিরসনের জন্য ভগবান তাঁকে 'তাত' বা বৎস বলে সম্বোধন করেছেন যা গীতায় একবারই উক্ত হয়েছে। ভগবান এখানে অত্যন্ত আশ্বাসবাণী দিয়ে বলেছেন যে যোগসাধনার দ্বারা স্থিত ব্যক্তি যে উচ্চতায় একবার ওঠেন তার থেকে তাঁর আর পতন হয় না অর্থাৎ তিনি আর নীচে নামেন না। তাঁর সাধন-সম্পদ নষ্ট হয় না, তাঁর পারমার্থিক উদ্দেশ্য পরিবর্তিত হয় না। অনাদিকাল থেকে যে জন্ম-মৃত্যু চক্র চলছে তাতে তিনি আর বাঁধা পড়েন না।

এর তাৎপর্য হল এই যে, একবার যে সাধন-সংস্কার গড়ে উঠেছে তা আর নষ্ট হয় না। তিনি পরমাত্মার চিন্তায় ব্যাপৃত থাকেন তাই তাঁর সব কর্মই **'সৎ'**রূপে পরিণত হয়। **'কর্ম চৈব তদর্থীয়ং সদিত্যেবাভিধীয়তে'** (গীতা

১৭।২৭)। তাঁদের যে স্বভাব গড়ে উঠেছে তাতে তাঁদের মনুষ্য, পশু, পাখি যে জন্মই হোক তাঁরা তাঁদের (যোগীর) স্বভাববিরুদ্ধ কাজ করবেন না, কল্যাণকর কাজই করবেন। তবে তাঁদের সাপ, বিছে, বাঘ আদি হিংস্র যোনিতে জন্ম নিতে হয় না কেননা এই প্রাণীদের স্বভাব যোগীর স্বভাবের উপযোগী নয়।

ভরতরাজা ছিলেন ভারতবর্ষের সম্রাট। বার্ধক্যে তিনি রাজ্য ত্যাগ করে একান্তে তপস্যা করতেন। সেখানে একটি হরিণশিশুর প্রতি মায়াবশত তার কথা চিন্তা করতে করতেই দেহত্যাগ করেন এবং পরজন্মে হরিণ হয়েই জন্মগ্রহণ করেন। এই হরিণ জন্মেও কিন্তু তাঁর সাধন-সম্পদ, ত্যাগ-তপস্যা নষ্ট হয়নি। তাঁর পূর্বজন্মের কথা স্মরণে ছিল এবং তিনি সেইমতো আচরণ করতেন। মায়ের কাছ থেকে সরে এসে তিনি মুনি-ঋষিদের পর্ণকুটিরের নিকট থাকতেন, সবুজ পাতার বদলে শুকনো পাতা খেতেন এবং পরের জন্মেই ব্রাহ্মণ বংশে জন্ম হয়ে অবশিষ্ট সাধনা সম্পূর্ণ করে মুক্ত হয়েছিলেন (ভাগবত ৫।৭-৮)।

তবে প্রশ্ন উঠতে পারে যে তাহলে অজামিল ও বিল্বমঙ্গলের পতন হল কেন ? আসলে সাধারণ লোকেদের চোখে পতন দেখালেও প্রকৃতপক্ষে তাদের পতন হয়নি। অন্তিমকালে অজামিলকে নিতে এসেছিলেন ভগবানের পার্ষদ আর বিল্বমঙ্গল হয়েছিলেন ভগবানের পরমভক্ত।

তবে সাধনে বাধা আসা, ভাব ও আচরণাদি খারাপ হওয়া, পরমাত্মা প্রাপ্তিতে বিলম্ব ঘটা—এদিক দিয়ে দেখলে তা পতনই বটে। এই সাধকদের জীবন থেকে আমাদের শিক্ষা নেওয়া উচিত যে, যেন সবসময় সাবধানে থাকি, কুসঙ্গে না পড়ি, বিষয়ে লিপ্ত না হই বা নিজ সাধনভজন ছেড়ে কোনো বিপরীত কাজে লিপ্ত না হয়ে পড়ি।

যোগভ্রষ্ট সাধকের (বাসনাযুক্ত) গতি— (শ্লোক ৪১, ৪৪-৪৫)

প্রাপ্য পুণ্যকৃতাং লোকানুষিত্বা শাশ্বতীঃ সমাঃ।
শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে যোগভ্রষ্টোঽভিজায়তে॥

পূর্বাভ্যাসেন তেনৈব হ্রিয়তে হ্যবশোঽপি সঃ।
জিজ্ঞাসুরপি যোগস্য শব্দব্রহ্মাতিবর্ততে॥
প্রযত্নাদ্ যতমানস্তু যোগী সংশুদ্ধকিল্বিষঃ।
অনেকজন্মসংসিদ্ধস্ততো যাতি পরাং গতিম্॥

(গীতা ৬।৪১, ৪৪-৪৫)

'যোগভ্রষ্ট সাধক যদি সর্ববাসনারহিত না হন তবে তিনি পুণ্যকামীদের প্রাপ্যলোক (স্বর্গ) প্রাপ্ত হন এবং সেখানে বহুবৎসর বাস করে, আবার ইহলোকে শুদ্ধ শ্রীসম্পন্নদের ঘরে জন্মগ্রহণ করেন।

এইরূপ যোগভ্রষ্ট যোগীর ভোগের প্রতি বাসনা থাকলেও পূর্বজন্মকৃত অভ্যাসের (সাধনের) ফলে তিনি পরমাত্মার প্রতি আকৃষ্ট থাকেন, কারণ যোগ (সমত্ব) জিজ্ঞাসু ব্যক্তিও বেদোক্ত সকাম কর্মের ফল অতিক্রম করে যান।

তখন যদি তিনি অধ্যাবসায় সহকারে চেষ্টা করেন তবে তার পাপ (বাসনা) নষ্ট হয় এবং তিনি এইরূপে বহুজন্মের সাধনার ফলে সিদ্ধ হয়ে পরমগতি লাভ করেন।' (গীতা ৬।৪১, ৪৪-৪৫)

ভগবান এখানে সেইসব সাধকের কথা বলেছেন যাঁরা সূক্ষ্ম বাসনাযুক্ত সাধনপরায়ণ কিন্তু অন্তঃকালে কোনো কারণবশত সাধনা থেকে বিচ্যুত হয়েছেন। এইসব সাধকের যদিও পুণ্যকর্মকারীদের লোক অর্থাৎ স্বর্গসুখ লাভের জন্য কোনো আকাঙ্ক্ষা থাকে না তবু অন্তরের সূক্ষ্ম বাসনাহেতু তা বিঘ্নরূপে এবং অনায়াসে জুটে যায়। তবে পুণ্যকামী ব্যক্তি অর্থাৎ শাস্ত্রীয় বিধিমতে যজ্ঞাদি কর্ম সকামভাবে পালনকারী ব্যক্তিরা শুধু ভোগবাসনার জন্য স্বর্গে যাওয়ার ফলে ভোগে লীন হয়ে যান, কিন্তু যোগভ্রষ্ট ব্যক্তি ভোগবাসনায় লীন হন না। আর শুভকর্মকারী ব্যক্তি যত স্বর্গসুখ ভোগ করেন তত পুণ্যক্ষয় হতে থাকে এবং অবশেষে **'ক্ষীণেপুণ্যে মর্ত্যলোকং বিশন্তি'** (গীতা ৯।২১) হয়ে মর্তলোকে ফিরে আসেন। অপরদিকে যোগভ্রষ্ট সাধক যদি সূক্ষ্ম বাসনার জন্য স্বর্গে যানও তবু তাঁর সাধন-সম্পদ ক্ষীণ হয়

না। সেখানে থাকারও তাঁর সময়সীমা থাকে না। কিন্তু সেই যোগভ্রষ্ট ব্যক্তিও আবার ইহলোকে ফিরে আসেন এবং শুদ্ধ শ্রীসম্পন্ন ব্যক্তির গৃহে জন্ম নেন। যোগভ্রষ্ট সাধকদের ফিরে আসার যথার্থ কারণ ভগবানই জানেন, কিন্তু মনে হয় তিনি সাধন করার জন্যই পুনরায় আসেন। সাধনার থেকে বিচ্যুত হলেও তাঁর মধ্যে সাধন-সংস্কার অঙ্কিত থাকে এবং সেই সংস্কারই যোগভ্রষ্ট সাধককে অজ্ঞাতভাবে পুনরায় সাধন-ভজনে প্রেরণা দিতে থাকে।

'শুচিনাং শ্রীমতাং গেহে' অর্থাৎ সেই যোগভ্রষ্ট সাধক এমন গৃহে জন্মগ্রহণ করেন যেখানে অর্থ উপার্জিত হয় শুদ্ধভাবে, যে অপরের ধন গ্রহণ করে না, যাঁর হৃদয়ে ভোগ এবং পদার্থের প্রতি গুরুত্ব বা মমত্ববোধ নেই এবং যাঁর আচরণ ও ভাব শুদ্ধ, সেই গৃহই হল শুদ্ধ ও শ্রীমান।

এখানে মনুষ্যরূপে জন্মগ্রহণ করা যোগভ্রষ্ট সাধককে **'অবশোঽপি সঃ'** বলা হয়েছে কারণ তিনি বহুকাল স্বর্গে বাস করেছেন যেখানে ভোগের অতি বাহুল্য ছিল আর বর্তমানেও শ্রীমান গৃহে ভোগের প্রাচুর্য থাকে তদোপরি তার ভোগের আসক্তি সম্পূর্ণভাবে দূরীভূত হয়নি। এতৎ সত্ত্বেও তিনি **'অবশঃ অপি সঃ'** অর্থাৎ তাঁর পূর্বেকার সংস্কারের প্রাবল্যই তাঁকে ভগবানের দিকে পরিচালিত করে। ভগবান এই পুনর্জন্ম প্রাপ্ত যোগভ্রষ্ট সম্বন্ধে বলেছেন—**'জিজ্ঞাসুরপি যোগস্য শব্দব্রহ্মাতিবর্ততে'**। এখানে **'শব্দব্রহ্ম'** হচ্ছে বেদোক্ত সকাম কর্মকারী এবং **'যোগজিজ্ঞাসু'** হচ্ছে যিনি ভোগ অপেক্ষা যোগকে বেশি প্রাধান্য দেন এবং যোগ প্রাপ্ত করতে উৎসুক। এস্থলে বলা হয়েছে যখন যোগজিজ্ঞাসুরও ঊর্ধ্ব হতে ঊর্ধ্বতর লোক এমনকি ব্রহ্মলোকাদিতে অনীহা আসে তখন আরও উচ্চতর অবস্থার যোগভ্রষ্ট সাধকের অর্থাৎ যে পরমাত্মার পথে নিবিষ্ট, তার যে সাংসারিক ভোগে অনিচ্ছা হবে সে আর এমন কী বেশি ! তাঁর এই বোধ জাগ্রত থাকে যে জাগতিক পুণ্য তো পাপেরই আকাঙ্ক্ষা, কিন্তু ভগবানের সম্পর্কযুক্ত যে পুণ্য (সৎসঙ্গ, ভজন ইত্যাদি) তা অতি বিশিষ্ট। জাগতিক পুণ্য মানুষকে ভগবানের দিকে আকৃষ্ট করে না কিন্তু পারমাত্মিক পুণ্য ফল প্রদানের পরও নষ্ট হয় না—**'নেহাভিক্রমনাশোঽস্তি'** (গীতা ২।৪০)। জাগতিক কামনা

ত্যাগ এবং ভগবানে আকৃষ্ট হওয়া উভয়ই পারমার্থিক পুণ্য।

ভগবান বলেছেন **'পূর্বাভ্যাসেন তেনৈব'** অর্থাৎ যোগভ্রষ্ট যোগীর বর্তমান জন্মে সৎসঙ্গ, সদ্চর্চা ইত্যাদি না হলেও শুধু পূর্ব অভ্যাসের বশেই পরমাত্মাতে আকৃষ্ট হন। স্বর্গ-নরক বা অন্যান্য জন্মে জীবের কেবল শুদ্ধিকরণই হয়, অশুদ্ধিকরণ হয় না। কিন্তু কেবল মনুষ্যজন্মেই জীব তার উদ্ধারের জন্য প্রাপ্ত বস্তুর অসদ্ ব্যবহার করে অর্থাৎ পাপ, অন্যায় করে অশুদ্ধ হয়। যোগভ্রষ্ট সাধক, কোনো মনুষ্যজন্মে যোগের জন্য চেষ্টা করাতে শুদ্ধতা লাভ করেছিলেন, পরে অন্তিমকালে যোগে বিচ্যুত হয়ে স্বর্গলাভ করেছেন এবং সেখানে ভোগে অনীহাবশত সেই পূর্বকৃত শুদ্ধতা নিয়েই পুনরায় শ্রীসম্পন্ন ব্যক্তির গৃহে জন্মগ্রহণ করেছেন। সুতরাং যদি এই জন্মেও তিনি যত্নের সঙ্গে ভোগের পথ পরিহার করে পরমাত্মাকে পাওয়ার জন্য তৎপর হন তবে পূর্ণ শুদ্ধতালাভ করে তিনি পরমগতি লাভ করবেন।

যোগভ্রষ্ট সাধকের (বাসনারহিত) গতি—(শ্লোক ৪২-৪৩)

অথবা যোগিনামেব কুলে ভবতি ধীমতাম্।
এতদ্ধি দুর্লভতরং লোকে জন্ম যদীদৃশম্॥
তত্র তং বুদ্ধিসংযোগং লভতে পৌর্বদেহিকম্।
যততে চ ততো ভূয়ঃ সংসিদ্ধৌ কুরুনন্দন॥

(গীতা ৬।৪২-৪৩)

'বৈরাগ্যবান যোগভ্রষ্ট ব্যক্তি জ্ঞানবান যোগীকুলে জন্মগ্রহণ করেন। এইরূপ যে জন্ম, এই জগতে তা দুর্লভ।

সেখানে সেই যোগভ্রষ্ট ব্যক্তি তাঁর পুনর্জন্মের সুকৃতি সহজেই প্রাপ্ত হন। এই সুকৃতি সহজেই তাদের সাধনসিদ্ধির পথে নিয়ে যায়।' (গীতা ৬।৪২-৪৩)

ভগবান এখানে সেই যোগভ্রষ্টদের কথা বলেছেন যাঁরা বাসনারহিত, তীব্র বৈরাগ্যবান এবং পরমাত্মাকে উদ্দেশ্য করে তীব্র সাধনভজন করেও অন্তিমকালে কোনো কারণবশত যেমন হঠাৎ মৃত্যু বা অন্তিমকালে বৃত্তি সাধনায় না থাকায় যোগভ্রষ্ট হয়েছেন। ভগবান বলছেন এই সব উন্নত সাধক

যোগবিচ্যুত হলেও স্বর্গাদি লোকে গমন করেন না, তাঁরা সরাসরি যোগীকুলেই জন্মগ্রহণ করেন। এই যোগীদের কুলে, গৃহে স্বাভাবিক পারমার্থিক পরিমণ্ডল থাকে যেখানে সাংসারিক ভোগাদির চর্চা হয়ই না। তাই এই পরিমণ্ডলে তত্ত্বজ্ঞ মহাপুরুষদের সুসঙ্গে, সুশিক্ষায় তাঁর সাধনায় তৎপর হওয়া খুব সহজ হয়।

ভাগবতে নবযোগীন্দ্র দর্শনে মহারাজ নিমি বলছেন—

দুর্লভো মানুষো দেহো দেহিনাং ক্ষণভঙ্গুরঃ।

তত্রাপি দুর্লভং মন্যে বৈকুণ্ঠপ্রিয়দর্শনম্॥ (ভাগবত ১১।২।২৯)

'এই অনিত্য মনুষ্যজন্ম লাভ অতি দুর্লভ আর তার চেয়েও দুর্লভ ভক্তবৈষ্ণব সান্নিধ্য লাভ করা।'

এই সঙ্গ, যোগীকুলে জন্মগ্রহণকারী যোগভ্রষ্ট সাধক নিত্য পেয়ে থাকেন। নারদ তাঁর ভক্তিসূত্রে বলছেন **'মহৎসঙ্গস্তু দুর্লভোঽগম্যোঽমোঘশ্চ'**—এই মহৎ সঙ্গ কেবল দুর্লভই নয়, ইহা অগম্য এবং অমোঘ অর্থাৎ অব্যর্থও বটে। এই যোগভ্রষ্ট সাধকপরিমণ্ডল ও সঙ্গছাড়াও তাঁর পূর্বজন্মকৃত সংস্কারের সহায়তা পান, **'বুদ্ধিসংযোগং পৌর্বদেহিকম্'** অর্থাৎ পূর্বজন্মের সাধন-সংস্কারের সাহায্য—যা তাঁকে দ্রুত সাধনসিদ্ধির পথে নিয়ে যায়।

সাধকের (যোগীর) মাহাত্ম্য—(শ্লোক ৪৬-৪৭)

পরবর্তী দুই শ্লোকে ভগবান যোগীদের মাহাত্ম্য ও ভক্তের শ্রেষ্ঠতার সম্বন্ধে বলেছেন।

তপস্বিভ্যোঽধিকো যোগী জ্ঞানিভ্যোঽপি মতোঽধিকঃ।
কর্মিভ্যশ্চাধিকো যোগী তস্মাদ্ যোগী ভবার্জুন॥
যোগিনামপি সর্বেষাং মদ্গতেনান্তরাত্মনা।
শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ॥

(গীতা ৬।৪৬-৪৭)

'হে অর্জুন ! সকাম তপস্বী, জ্ঞানী ও কর্মী অপেক্ষা যোগীই শ্রেষ্ঠ, তাই তুমি যোগী হও।

আবার যোগীদের মধ্যেও যিনি শ্রদ্ধাবান ও আমাকে তদ্গত চিত্তে

ভজনা করেন তিনি আমার মতে সর্বশ্রেষ্ঠ।' (গীতা ৬।৪৬-৪৭)

তপস্বী—ঋদ্ধি-সিদ্ধি ইত্যাদি লাভের জন্য যিনি ক্ষুধা-তৃষ্ণা, শীত-গ্রীষ্মাদি সহ্য করেন তিনি তপস্বী। সকাম ভাব থাকায় এই তপস্বীরা ভোগীর পর্যায়ে পড়ে, যোগীর নয়।

জ্ঞানি—এখানে জ্ঞানী অর্থ শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত যারা অর্থ ও সম্মানের জন্য শাস্ত্রচর্চা করে থাকেন।

কর্মী—ইহলোকে ধন-সম্পত্তি, সুখ-আরাম ইত্যাদি এবং পরলোকে উচ্চলোক প্রাপ্তির জন্য যিনি সকামভাবে যজ্ঞ, দান, শাস্ত্রাদি কর্মসকল করেন।

যার ভেতর সকামভাব থাকে— তিনি ভোগী আর যিনি নিষ্কাম তিনি হলেন যোগী। সকামভাবসম্পন্ন তপস্বী, জ্ঞানী বা কর্মীগণ থেকে নিষ্কামভাবসম্পন্ন যোগীই শ্রেষ্ঠ। ষষ্ঠ অধ্যায়ের শেষে ভগবান জোর দিয়ে বলেছেন যত যোগী আছেন অর্থাৎ কর্মযোগী, সাংখ্যযোগী, ধ্যানযোগী সবার থেকে ভক্তিযোগী—যারা শুধুমাত্র ভগবানের সঙ্গেই সম্পর্ক রাখতে চান তাঁরাই শ্রেষ্ঠ। তাঁরাই 'যুক্ততমো'। এই যুক্ততমো ভক্ত কখনো যোগভ্রষ্ট হন না কারণ তাঁর মন কখনো ভগবান ছাড়া থাকে না আর ভগবানও তাঁকে কখনো ত্যাগ করেন না।

ভগবান বলেছেন—

ততস্তং ম্রিয়মাণং তু কাষ্ঠপাষাণসন্নিভম্।
অহং স্মরামি মদ্ভক্তং নয়ামি পরমাং গতিম্॥

'আমার ভক্ত যদি কখনো কাঠ, পাষাণতুল্য ম্রিয়মাণ হন, সেই ভক্তকে আমি স্বয়ং স্মরণ করি এবং তাকে পরমগতি প্রদান করি।'

কফবাতাদিদোষেণ মদ্ভক্তো ন চ মাং স্মরেৎ।
তস্য স্মরাম্যহং নো চেৎ কৃতঘ্নো নাস্তি মৎপরঃ॥

'আমার ভক্ত যদি কফ, বাত ইত্যাদির জন্য মৃত্যুকালে আমাকে স্মরণ করতে না পারে, তবে আমি স্বয়ং তাঁকে স্মরণ করি আর আমি যদি তা না করি, তবে আমার চেয়ে বেশি কৃতঘ্ন আর কেউ হতে পারে না।'

পরমাত্মাপ্রাপ্তির সর্বপ্রকার সাধনায় ভক্তিই প্রধান। ভক্তির মহিমা এতই

ব্যাপক যে প্রত্যেক সাধনের আদিতেও থাকে ভক্তি আর অন্তেও ভক্তি। কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ এগুলি সাধন আর ভক্তি হল সাধ্য।

প্রত্যেক সাধনের আরম্ভে ভক্তি থাকে পারমার্থিক আকর্ষণরূপে কেননা পরমাত্মার প্রতি আকর্ষিত না হলে কোনো ব্যক্তি সাধনায় নিয়োজিত হতে পারে না। আবার সাধনের শেষে ভক্তিই প্রতিমুহূর্তে প্রেমরূপে সাধকের জীবন বদলে দেয়।

প্রেমভক্তি প্রাপ্ত হলেই মানবজীবন পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়।

———o———

ভক্ত প্রসঙ্গ

(সপ্তম, নবম ও দশম অধ্যায়)

অর্জুনের সপ্তম প্রশ্নের উত্তরে ষষ্ঠ অধ্যায়ে ভগবান যোগমার্গের বিভিন্ন সাধনের কথা উল্লেখ করেছেন এবং ভক্তিযোগই শ্রেষ্ঠ বলে মত প্রকাশ করে অধ্যায় শেষ করেছেন। কিন্তু একবার ভক্তপ্রসঙ্গ শুরু করে ভগবান আর থামতে পারেননি, তিনি সপ্তম অধ্যায়ে জ্ঞান-বিজ্ঞান যোগ, নবম অধ্যায়ে রাজবিদ্যা-রাজগুহ্য যোগ এবং দশম অধ্যায়ে বিভূতি যোগে (১-১১ শ্লোকে) বিস্তৃতভাবে ভক্তপ্রসঙ্গ বর্ণনা করেছেন।

জ্ঞান—জগৎ ভগবান হতে সৃষ্ট হয় এবং সবকিছু তাঁহাতে বিলীন হয়, এই অনুভব হল জ্ঞান।

বিজ্ঞান—ভগবান ছাড়া আর কিছুই নেই এবং তিনিই সবকিছু হয়ে আছেন এই উপলব্ধি হল বিজ্ঞান। এক্ষেত্রে **'বাসুদেবং ইদম্ সর্বং'** সর্বত্র প্রতিভাত হয়—ভগবৎপ্রেম লাভ হয়।

রাজবিদ্যা— নবম অধ্যায়ে এই জ্ঞান-বিজ্ঞানকে 'রাজবিদ্যা' অর্থাৎ সমস্ত বিদ্যার রাজা এবং **রাজগুহ্য** অর্থাৎ এর চেয়ে শ্রেষ্ঠ রহস্য (গুপ্তযোগ) আর কিছু নেই বলে বর্ণনা করা হয়েছে। ভগবান নবম অধ্যায়ের প্রারম্ভে আরো বলেছেন **'যজ্জ্ঞাত্বা মোক্ষসে আশুভাৎ'** অর্থাৎ ইহা জানলে সর্ব অশুভ দূর হয়।

এই তিন অধ্যায়ব্যাপী ৭৫টি শ্লোকে ভগবান জীব, জগৎ ও পরমাত্মার বর্ণনা করেছেন।

ভগবানের প্রকৃতি দুই প্রকারের—অপরা এবং পরা। জগৎ-সংসার হল অপরা প্রকৃতি এবং জীব হল পরা প্রকৃতি। অপরা প্রকৃতি জড় ও নিত্য পরিবর্তনশীল এবং পরা প্রকৃতি হল চেতন ও চির অপরিবর্তনশীল। এর ওপর আছেন পরা-অপরার মালিক পরমাত্মা। সম্পূর্ণ শরীর-জগৎ-সংসার

(অধিভূত) হল অপরা প্রকৃতির অন্তর্গত এবং সম্পূর্ণ শরীরী (আধ্যাত্ম) হল পরা প্রকৃতির অন্তর্গত।

এর তাৎপর্য হল সমগ্র শরীর (জগৎ-সংসার) মাত্রই এক, আর সমগ্র শরীরী (জীব) মাত্রই এক এবং এই যে পরা ও অপরা দুটি যার শক্তি সেই পরমাত্মাও এক। অতএব শরীরের দৃষ্টিতে, আত্মার দৃষ্টিতে ও পরমাত্মার দৃষ্টিতে আমরা সবই এক, অভিন্ন।

কঠোপনিষদে যম-নচিকেতা সংবাদে যমরাজ এবং বৃহদারণ্যক উপনিষদের জনক-যাজ্ঞবল্ক্য সংবাদে যাজ্ঞবল্ক্য উপদেশ দিচ্ছেন—**'নেহ নানাস্তি কিঞ্চন'** (কঠ. ২।১।১১, বৃ. আ. ৪।৪।১১) কিছুই পৃথক নয়, জীব-জগৎ-পরমাত্মা সবই অভিন্ন। কিন্তু যারা এই জগৎ-জীব-পরমাত্মাকে ভিন্ন দেখে, **'য ইহ নানেব পশ্যতি'** তারা **'মৃত্যোঃ স মৃত্যুং গচ্ছতি'** অর্থাৎ মৃত্যু হতে মৃত্যু প্রাপ্ত হয় ; তাৎপর্য হল তারা জন্ম-মৃত্যু চক্র থেকে মুক্তি পায় না।

যোগের দৃষ্টিতে এই অভিন্নতা বা সমতা কীরূপ—

কর্মযোগ—সকল শরীরের সঙ্গে ঐক্য মেনে নিলে, কোনো প্রাণীতেই অনুরাগ বা দ্বেষ থাকে না এবং সমস্ত প্রাণীর প্রতি হিতের ভাব উৎপন্ন হয় এবং সহজেই কর্মযোগ সিদ্ধ হয়। তখন কিছুই ব্যক্তিগত বা নিজের বলে উপলব্ধি হয় না, আর যেসব বস্তু আছে তাতে মমত্ববোধ বা যে সব বস্তু নেই তাতে কামনা বোধও হয় না। কামনা ও মমত্ব সর্বতোভাবে দূর হলে নিজের যা কিছু আছে, তা স্বতঃই অন্যের সেবায় ব্যবহৃত হয়।

জ্ঞানযোগ—সকল জীবে (শরীরীতে) ঐক্য স্বীকার করে নিলে, সর্বত্র আত্মভাব জাগরিত হয়—**'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম'** (ছা. ৩।১৪।১) **'আত্মৈবেদং সর্বম্'** (ছা. ৭।২৫।২) আর এইরূপ ভাব হলে 'জ্ঞানযোগ' অতি সহজে স্বতঃসিদ্ধ হয়। তখন যত জীব বিরাজমান, তা সবই ব্রহ্মরূপে অর্থাৎ জীব ও ব্রহ্ম এবং অভেদরূপে প্রতীয়মান হয়—**'অয়মাত্মা ব্রহ্ম'** (মাণ্ডুক্য ২)।

ভক্তিযোগ—অপরা ও পরা এই দুটি প্রকৃতির স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নেই, ইহারা ভগবানের শক্তি ও স্বভাব হওয়ায় ভগবৎস্বরূপ, এইরূপ স্বীকার করে নিলে

সর্বত্র ভগবৎভাব হয় এবং ভক্তিযোগ সহজে স্বতঃসিদ্ধ হয়। **'বাসুদেবঃ সর্বম্'** (গীতা ৭।১৯) অর্থাৎ সব কিছুই ভগবান—এই হচ্ছে প্রকৃত শরণাগতি। তাৎপর্য হল কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগ সকল দৃষ্টিতেই জগৎ, জীব ও পরমাত্মা হচ্ছে এক ও অভিন্ন। এই সমতাকেই গীতায় যোগ বলা হয়েছে—**'সমত্বং যোগ উচ্চতে'** (গীতা ২।৪৮)।

যদিও আচরণের পার্থক্য স্বাভাবিক ব্যাপার, কিন্তু তা যেন কখনই আমাদের মনে ভাবের পার্থক্য না আনে। গীতায় সমদর্শনকারী সাধকের স্থান অনেক উচ্চ এবং বহুভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। **'পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ'** (গীতা ৫।১৮), **'সমবুদ্ধির্বিশিষ্যতে'** (গীতা ৬।৯), **'যোগযুক্তাত্মা সর্বত্র সমদর্শনঃ'** (গীতা ৬।২৯), **'সর্বত্র সমবুদ্ধয়ঃ'** (গীতা ১২।৪) ইত্যাদি। যে ব্যক্তি অন্যকে পর বলে মনে করে, কারও মন্দ কামনা করে, জগতের কোনো কিছু আকাঙ্ক্ষা করে, সে কখনো কর্মযোগী, জ্ঞানযোগী বা ভক্তিযোগী হতে পারে না। তবে জীব-জগৎ-পরমাত্মা—এই তিনকে নিয়ে চিন্তা করলে বোঝা যাবে যে এদের মধ্যে জীব ও জগতের কোনো পৃথক অস্তিত্ব নেই, অস্তিত্ব কেবলমাত্র পরমাত্মারই আছে।

জগৎ-এর কোনো পৃথক অস্তিত্ব নেই, কারণ জীবই জগৎকে ধারণ করে আছে—**'জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্যতে জগৎ'** (গীতা ৭।৫)। আবার জীবেরও কোনো পৃথক সত্ত্বা নেই, জীব পরমাত্মারই অংশ **'মমৈবাংশো জীবলোকে'** (১৫।৭)। জগৎ ও জীব উভয়েই পরমাত্মা দ্বারাই উদ্ভাসিত হয়। তবে ভগবান অপরা ও পরা প্রকৃতি অর্থাৎ জগৎ ও জীবকে নিজের স্বভাব বলে জানিয়েছেন—**'ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা'** (গীতা ৭।৪) এবং **'প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্'** (গীতা ৭।৫)।

ভগবানের স্বভাব হওয়ায় অপরা প্রকৃতির ভগবানের থেকে পৃথক কোনো অস্তিত্ব নেই। কিন্তু চেতনশীল জীব (পরা প্রকৃতি) অপরাকে পৃথক অস্তিত্ব প্রদান করে তার সঙ্গে নিজের সম্পর্ক স্থাপন করে। এই সম্পর্ক জীব দুভাবে মেনে থাকে—

(১) **অহংবশতঃ**—যেমন আমিই শরীর এবং (২) **মমতাবশতঃ**—যেমন আমার শরীর। এই মেনে নেওয়া সম্পর্কই সকল প্রাণীর উৎপত্তির

কারণ—'**কারণং গুণসঙ্গোঽস্য সদসদ্‌যোনিজন্মসু**' (গীতা ১৩।২১)। তখন জীব ভুলে যায় যে, প্রকৃতপক্ষে সমস্ত জগতের কর্তা, কারণ ও কার্য সবই হচ্ছেন একমাত্র ভগবান—'**মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি**' (গীতা ৭।৭)। জগতে যা কিছু পদার্থ, ক্রিয়া, ভাব ইত্যাদি বা যা কিছু দেখা, শোনা বা বোঝা যায় সেসবেরই বীজ বা মূল কারণ হচ্ছেন ভগবান আর সেসব কারণই কার্যরূপে প্রকটিত হয়। সুতরাং কারণের পৃথক অস্তিত্ব থাকে না। তাই যদি সাধক কোনো কাজের দ্বারা ভগবানকে প্রাপ্ত হতে চান তবে কখনোই তিনি তা লাভ করতে পারেন না—'**ন ত্বহং তেষু তে ময়ি**' (গীতা ৭।১২)। যিনি কারণরূপ ভগবানের শরণাগত হয়ে কার্যরূপ সত্ত্বাদিগুণে আকৃষ্ট থাকেন তিনি জন্ম-মৃত্যু চক্রে আবদ্ধ হন।

সনকাদি চতুঃসনের গুণাদি সম্পর্কে প্রশ্নের যথার্থ উত্তর ব্রহ্মা দিতে না পারায় ঈশ্বর স্বয়ং হংস ভগবানরূপে আবির্ভূত হয়ে উপদেশ দিয়েছেন—

মনসা বচসা দৃষ্ট্যা গৃহ্যতেঽন্যৈরপীন্দ্রিয়ৈঃ।
অহমেব ন মত্তোঽন্যদিতি বুধ্যধ্বমঞ্জসা॥ (ভাগবত ১১।১৩।২৪)

'মন, বাক্‌, দৃষ্টি এবং অন্যান্য ইন্দ্রিয় দ্বারা যা কিছু গ্রহণ করা হয়, সেসব আমিই। সুতরাং আমি ব্যতীত আর কিছুই নেই—ইহা বিবেচনাপূর্বক শীঘ্র উপলব্ধি করো।'

যে সব ব্যক্তি এই জগৎ-সংসারে মোহগ্রস্ত হন না, তাঁরা ভগবানের শরণ গ্রহণ করেন। ভগবানকে যাঁরা আশ্রয় করেন তাঁরা চার প্রকারের হন—অর্থার্থী, আর্ত, জিজ্ঞাসু ও জ্ঞানী। এইসব ভক্তদের মধ্যেও যারা 'সব কিছুই ভগবান' এইরূপ মনে করে ভগবানের শরণ নেন, তাঁরা সর্বশ্রেষ্ঠ। সাধকের জন্ম হয়েছে এবং তার ব্যাধি অবশ্যম্ভাবী না হলেও তাঁর বৃদ্ধাবস্থা ও মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। এর থেকেই মানুষ যত দুঃখ পায়। তাই ভগবান বলেছেন—'**জরামরণমোক্ষায় মামাশ্রিত্য যতন্তি যে**' (গীতা ৭।২৯) অর্থাৎ সাধক যদি ভগবানের আশ্রয়গ্রহণকারী হয় তবে ভক্ত জরা ও মৃত্যু—এই দুই ভয় থেকেই মুক্ত হয়ে থাকে। সেইসব সাধকদের শরীর ধারণকালে জরা

দুঃখদায়ক হয় না এবং মৃত্যুর পরে কি হবে এই চিন্তাতেও তাঁরা ভীত হন না। যেহেতু তাঁরা ভগবানের শরণ নিয়ে সাধনারত, তাই পরা-অপরা সহ ভগবানের সমগ্ররূপ অর্থাৎ বিজ্ঞান-সহ জ্ঞানকে জেনে থাকেন। তাই তাঁরা জন্মমৃত্যু চক্রে আবর্তিতও হন না।

ভগবান ভক্তপ্রসঙ্গ সপ্তম, নবম ও দশম অধ্যায়ে এইভাবে বর্ণনা করেছেন—

বিষয়	৭ম অধ্যায়	৯ম অধ্যায়	১০ম অধ্যায়
উপক্রম	১-৩	১-২	১-২
জ্ঞান-বিজ্ঞান (সব কিছুরই সৃষ্টি ভগবান থেকে। কারণও তিনি, কার্যও তিনি— আবার সবার ঊর্ধ্বেও তিনি)	৪-১২	৪-১০	
নির্বুদ্ধি জীব (মায়াবদ্ধ জীব—ভগবদ্ বৈমুখ্য)	১৩-১৫	৩,১১-১২	
স্বল্পবুদ্ধি জীব অন্য (দেবতাদের পূজক)	২০-২৭	২০,২১, ২৩-২৫	
জ্ঞানী জীব (প্রেমিক ভক্ত)	১৬-১৯ ২৮-৩০	১৩-১৯ ২৬-৩৪	৩-১১
ভগবদ্ কৃপা		২২	১০,১১

উপক্রম—(সপ্তম ১-৩, নবম ১-২ ও দশম ১-২)

ময্যাসক্তমনাঃ পার্থ যোগং যুঞ্জন্মদাশ্রয়ঃ।
অসংশয়ং সমগ্রং মাং যথা জ্ঞাস্যসি তচ্ছৃণু॥
জ্ঞানং তেঽহং সবিজ্ঞানমিদং বক্ষ্যাম্যশেষতঃ।
যজ্জ্ঞাত্বা নেহ ভূয়োঽন্যজ্ জ্ঞাতব্যমবশিষ্যতে॥
মনুষ্যাণাং সহস্রেষু কশ্চিৎ যততি সিদ্ধয়ে।
যততামপি সিদ্ধানাং কশ্চিন্মাং বেত্তি তত্ত্বতঃ॥

(গীতা ৭।১-৩)

ইদং তু তে গুহ্যতমং প্রবক্ষ্যাম্যনসূয়বে।
জ্ঞানং বিজ্ঞানসহিতং যজ্জ্ঞাত্বা মোক্ষ্যসেঽশুভাৎ॥
রাজবিদ্যা রাজগুহ্যং পবিত্রমিদমুত্তমম্ ।
প্রত্যক্ষাবগমং ধর্ম্যং সুসুখং কর্তুমব্যয়ম্॥

(গীতা ৯।১-২)

ভূয় এব মহাবাহো শৃণু মে পরমং বচঃ।
যত্তেঽহং প্রীয়মাণায় বক্ষ্যামি হিতকাম্যয়া॥
ন মে বিদুঃ সুরগণাঃ প্রভবং ন মহর্ষয়ঃ।
অহমাদির্হি দেবানাং মহর্ষীণাঞ্চ সর্বশঃ॥

(গীতা ১০।১-২)

ভগবান বলছেন—'আমাতে আসক্তচিত্ত এবং আমার শরণাগত হয়ে যোগাভ্যাস করলে, নিঃসন্দিগ্ধভাবে আমার সমগ্র রূপ জানতে পারবে।

বিজ্ঞানসহ জ্ঞানের কথা সম্পূর্ণরূপে জানলে আর কিছুই জানবার অবশিষ্ট থাকে না।

সহস্র সহস্র সমগ্র মানুষের মধ্যে কোনো একজন আমায় জানার চেষ্টা করেন আর ওই যত্নশীল সিদ্ধদের মধ্যেও আবার কোনো একজন আমাকে যথার্থভাবে জানতে পারেন।' (গীতা ৭।১-৩)

ভগবান বললেন—'হে অর্জুন ! তুমি দোষদৃষ্টি বর্জিত। তাই এই অতি গুহ্য এই বিজ্ঞানসহ জ্ঞান তোমাকে বলব, যা জানলে তুমি অশুভ অর্থাৎ জন্ম-মরণরূপ সংসার বন্ধন থেকে মুক্তিলাভ করবে।

এই বিজ্ঞানসহ জ্ঞান সমস্ত বিদ্যার ও সমস্ত গোপনীয়তার রাজা অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ। ইহা অত্যন্ত পবিত্র, সর্বোৎকৃষ্ট এবং প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ। আবার এটি ধর্মময়, অবিনাশী এবং প্রাপ্ত হওয়া অত্যন্ত সহজ।' (গীতা ৯।১-২)

'যেহেতু তুমি আমার প্রতি অতিশয় শ্রদ্ধা-প্রেমসম্পন্ন তাই তোমার হিতের নিমিত্ত এই শ্রেষ্ঠ উপদেশ পুনরায় প্রদান করছি।'

ভগবান বলছেন— হে অর্জুন, আমার উৎপত্তির বিষয়টি দেবগণ বা মহর্ষিগণ কেউই জানে না কারণ আমি দেবতা ও মহর্ষিগণেরও আদি কারণ।' (গীতা ১০।১-২)

ভগবান ভক্তের কথা বলতে কখনো শ্রান্ত হন না। সপ্তম অধ্যায়ের প্রথম তিনটি শ্লোকে তিনি ভক্তর শরণাগতির কথা বলেছেন আর তার মধ্যে প্রথম শ্লোকে ভক্ত সম্বন্ধে ভগবান বিশেষ তিনটি লক্ষণ বলেছেন—**মথ্যাসক্তমনাঃ, মদাশ্রয়ঃ** এবং **যোগং যুঞ্জন্**।

মথ্যাসক্তমনাঃ অর্থাৎ ভক্তর মন ভগবানে সদা আসক্ত থাকে। মন আসক্ত হয় ভালোবাসার দ্বারা এবং ভালোবাসা আসে আপনবোধ আসলে। ভক্তের মন ভগবানে অত্যন্ত প্রীত হওয়ায় তাঁর চিত্ত স্বাভাবিকভাবে ভগবানে নিবিষ্ট থাকে এবং ভগবানকে পৃথকভাবে স্মরণের প্রয়োজন হয় না।

ভক্ত **মদাশ্রয়** হন অর্থাৎ ভগবানেই আশ্রয় করেন। আশ্রয় তারই নেওয়া হয় যে বড়, যে শক্তিমান। আর সর্বশক্তিমান তো আমাদের প্রভুই। তাই তাঁর আশ্রয় নিতে হয়, তাঁর প্রত্যেক বিধানে প্রসন্ন থাকতে হয় কেননা তাঁর কোনো বিধান আপাত দৃষ্টিতে আমাদের মনের বিরুদ্ধে হলেও তিনি আমাদের প্রতি সততই স্নেহশীল।

'যোগং যুঞ্জন্'-এর তাৎপর্য হল ভগবানের সঙ্গে যে স্বাভাবিক অখণ্ড সম্বন্ধ থাকে তাকে মেনে নিয়ে, সিদ্ধি-অসিদ্ধিতে সমভাবে থেকে এবং জপ-ধ্যান-কীর্তন, ভগবানের লীলা ও স্বরূপ চিন্তায় স্বতঃই অবিচল থাকা।

এইরূপে যোগাভ্যাস করলে সমগ্ররূপে ভগবানকে বা বিজ্ঞানসহ জ্ঞানকে **'বাসুদেবঃ সর্বম্'** রূপে জেনে ভগবৎপ্রেম লাভ করা যায়। সমস্তই ভগবান—ভগবানের 'সমগ্ররূপই' হল এই। ভগবানের এই কথা বলার তাৎপর্য হল এই যে, যদি মানুষের ভোগে আসক্তি থাকে এবং সে টাকা-পয়সা ও আত্মীয়-স্বজনকে আশ্রয় করে থাকে তবে সে যতই কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ, ধ্যানযোগ ইত্যাদির সাধন করুক না কেন সে ভগবানকে জানতে সক্ষম হয় না। ভগবানকে সমগ্ররূপে জানতে গেলে ভগবানেই অনুরক্ত হতে হবে এবং তাঁকেই আশ্রয় করতে হবে। তাঁর মাধ্যমে ইচ্ছপূরণের আকাঙ্ক্ষাও যেন না হয়। এরূপ হওয়া উচিত আর এইরূপ হওয়া উচিত নয়—এই কামনা ত্যাগ করে, ভগবান যা করেন তাই হওয়া উচিত এবং ভগবান যা করেন না তা হওয়া উচিত নয়—এইভাবে তাঁর আশ্রয় গ্রহণ করা উচিত।

আসলে যে কাজের দ্বারা পরমাত্মার সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপিত হয় (লৌকিক বা পারলৌকিক) সেই কাজই সাধক করেন এবং যে কাজের দ্বারা পরমাত্মার প্রতি বিমুখতা জাগে, সেই কাজ তিনি করেন না।

বাস্তবে **'যোগং যুঞ্জন্'**-এর ততটা প্রয়োজনীয়তা নেই যতটা আবশ্যকতা থাকে সংসারের প্রতি আসক্তি ও আশ্রয় পরিত্যাগের। যদি সংসারের প্রতি আসক্তি, কামনা ও গুরুত্ববোধ থাকে তবে পরমাত্মা যতই সংসারে পরিপূর্ণভাবে থাকুন তাঁকে জানা যায় না।

(শরণাগতির পর্যায়)—

আশ্রয়—যেমন আমরা পৃথিবীর আধার ব্যতীত বাঁচতে পারি না, ওঠা-বসা ইত্যাদি কোনো কাজেই সক্ষম হই না তেমনি বাঁচা বা কোনো কিছু করা প্রভুর আশ্রয়েই হয়ে থাকে। এরই নাম 'আশ্রয়'।

অবলম্বন—যেমন হাত ভেঙে গেলে চিকিৎসক হাতটি ব্যান্ডেজ করে গলার সঙ্গে ঝুলিয়ে দেয় এবং হাতটি গলার অবলম্বনে ঝুলতে থাকে, তেমনি সংসারে বিমুখ, নিরাশ্রয় হয়ে কেবল ভগবানেই ভরসা, তাঁকে ধরে থাকাই হল 'অবলম্বন'।

অধীনতা—নিজের কোনো প্রয়োজন না রেখে, শুধু ভগবানের জন্যই অনন্যমনে সর্বতোভাবে তাঁর দাস হয়ে যাওয়া ও কেবল তাঁকে প্রভু বলে মনে করাই হল 'অধীনতা'।

প্রপত্তি—সংসারে সর্বতোভাবে বিমুখ হয়ে ভগবানের চরণে পতিত হওয়াই হল প্রপত্তি (প্রসন্নতা)।

সাহায্য—জলে ডুবন্ত মানুষ যেমন কোনো গাছ, লতা, দড়ির সাহায্যে বাঁচতে চেষ্টা করে, তেমনি সংসারে জন্ম-মৃত্যুর ভয় থেকে বাঁচার জন্য ভগবানের সহায়তা লাভই হল 'সাহায্য'।

ভগবান এখানে বিজ্ঞানসহ জ্ঞান বলেছেন। এর অর্থ জ্ঞানের সাহায্যে মুক্তিলাভ হতে পারে কিন্তু প্রেমের আনন্দ তখনই পাওয়া যায় যখন জ্ঞানের সঙ্গে বিজ্ঞান (ভগবৎ আশ্রয়) যুক্ত হয়। জ্ঞান হল অর্থের মতো আর বিজ্ঞান হল যেন আকর্ষণ। অর্থের আকর্ষণে যে সুখ তা অর্থে নেই। তেমনি বিজ্ঞানে

(প্রেমে) যে আনন্দ আছে তা জ্ঞানে নেই। জ্ঞানে আছে অখণ্ড রস আর বিজ্ঞানে যে রস তা প্রতি মুহূর্তে বর্ধমান। তাই ভগবানের বিজ্ঞানসহ জ্ঞানের বর্ণনার তাৎপর্য প্রধানত বিজ্ঞানের দিকে এবং এটিই ভগবানের মতে শ্রেষ্ঠ, কারণ জ্ঞানসহ বিজ্ঞানই হল সমগ্রতার বাচক।

ভগবান বলেছেন যে, পরমাত্মাকে পাওয়ার জন্য যত্নশীল ব্যক্তি খুবই কম। আসলে পরমাত্মতত্ত্ব কঠিন নয় কিন্তু পরমাত্মা প্রাপ্তির তীব্র আকাঙ্ক্ষা থাকা এবং তত্ত্বজ্ঞ জীবন্মুক্ত মহাপুরুষের সঙ্গ লাভ করাই দুর্লভ, কঠিন। আসলে স্বর্গাদি লোক লাভ করা বা অনিমা, লঘিমা, গরিমা, মহিমা প্রাপ্তি—এগুলির কোনোটিই প্রকৃতপক্ষে সিদ্ধির প্রাপ্তি নয় ; বরং এগুলি অসিদ্ধিই। এগুলি অসিদ্ধিই কারণ এগুলির দ্বারা বারংবার জন্ম-মৃত্যুর প্রাপ্তি হতে থাকে। এক্ষেত্রে পরমাত্মা প্রাপ্তিকেই সিদ্ধি বলা হয়েছে।

ভগবান বলেছেন কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ, ধ্যানযোগাদি যত প্রকার সাধন প্রণালী আছে এবং তার দ্বারা যারা সিদ্ধিলাভ করেছে সেই জীবন্মুক্ত মহাপুরুষদের মধ্যেও 'সমস্ত কিছুই ভগবান'—এরূপ অনুভবকারী প্রেমিক ভক্ত অত্যন্ত দুর্লভ। তাই ব্রহ্মসূত্রে বলা হয়েছে **'মুক্তোপসৃপ্যব্যপদেশাৎ'** (ব্রহ্মসূত্র ১।৩।২)। সেই প্রেমস্বরূপ ভগবানকে জীবন্মুক্ত পুরুষরাও আকাঙ্ক্ষা করেন। একমাত্র পরাভক্তির সাহায্যেই তাঁকে সমগ্ররূপে জানা সম্ভব **'ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ'** (গীতা ১৮।৫৫)। নবম অধ্যায়ের শুরুতে ভগবান জ্ঞান-বিজ্ঞান সম্বন্ধে বিশেষ ব্যাখ্যা করেছেন। প্রথম শ্লোকে তিনি এটিকে **'গুহ্যতম'** 'অনসূয়বে' ও **'মোক্ষসেহশুভাৎ'** বলেছেন। তৃতীয় শ্লোকে ভগবান জন্ম-মৃত্যু চক্র থেকে মুক্তির কথা বলেছেন।

জগৎ-সংসার প্রকট বা দৃশ্যমান এবং ভগবানেরই অংশ, এটি কর্মযোগ (নিষ্কামভাব) দ্বারা অনুভূত হওয়া হল গুহ্য। জ্ঞানযোগ (আত্মজ্ঞান) হল গুহ্যতর আর জ্ঞানযোগ থেকেও গোপনীয় হল ভক্তিযোগ (পরমাত্মা জ্ঞান) তাই তা (গুহ্যতম)। অসতের বা জগৎ-সংসারের সঙ্গে

সম্বন্ধিত হওয়াই হল অশুভ, যার জন্য জীবের উচ্চ-নীচ যোনিতে জন্ম হয়ে থাকে। ব্রহ্মলোক পর্যন্ত সমস্ত লোকই পুনরাবর্তী হওয়ায় 'অশুভ'। **'আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্তিনোঽর্জুন'** (গীতা ৮।১৬)। গুহ্যতম বিষয়ে জ্ঞান হলে মানুষ সর্বতোভাবে অশুভ (জন্ম-মরণ) থেকে মুক্তিলাভ করে। কর্মযোগ ও জ্ঞানযোগের সাহায্যেও লোকে অশুভ থেকে মুক্তিলাভ করতে পারে কিন্তু ভক্তিযোগের তাৎপর্য হল পরমাত্মা ব্যতীত অন্য কিছুর কোনোরূপ অস্তিত্ব উপলব্ধি না হওয়া, অহং-এর সূক্ষ্মরেশও না থাকা। অশুভ থেকে মুক্তিলাভ যেন কাপড় থেকে ময়লা পরিষ্কার করা। কাপড় হল নিজের আর ময়লা হল বহিরাগত, তাই বহিরাগত ময়লা দূর হলে কাপড় স্বতঃই পরিষ্কার হয়। অসতের (জগতের) সঙ্গে সম্পর্কিত না হলেই জীব মুক্ত হয়। জীব হচ্ছে স্বয়ং ভগবানের অংশ কিন্তু জীব যখন ভগবান হতে বিমুখ হয়, তখন সে যে যোনিতে জন্মগ্রহণ করে তাকেই 'আমি' ও 'আমার' সূত্রে আশ্রয় করে ফলে সেই শরীর ও সংসারের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করে বসে। এই বহিরাগত অসৎ (আমি ও আমার ভাব) বা অশুভই তার জন্ম-মৃত্যুর কারণ হয়। যখন সে নিজেকে চিনতে পারে বা ভগবানের শরণাগত হয় তখন এই অশুভ দূর হয় এবং সে মুক্ত হয়। নবম অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকে অশুভ থেকে মুক্তিলাভের কথা বলে দ্বিতীয় শ্লোকে ভগবান বিজ্ঞানসহ জ্ঞানের আটটি মহিমা বর্ণনা করেছেন—রাজবিদ্যা, রাজগুহ্য, পবিত্র, সর্বোৎকৃষ্ট, প্রত্যক্ষ-ফলদায়ক, ধর্মময়, অবিনাশী ও সুলভ্য।

রাজবিদ্যা—বিজ্ঞান সহ জ্ঞান হল সমস্ত বিদ্যার রাজা আর ইহা যথাযথ অধিগত হলে আর কোনো কিছু জানার বাকি থাকে না।

রাজগুহ্য—জগৎ রহস্যের যতপ্রকার গুপ্ত বিষয় আছে তারও মধ্যে এটি সর্বগুহ্য, কারণ জগতে এর থেকে শ্রেষ্ঠ কোনো রহস্য নেই। যেমন নাটকে অভিনয়কালে অভিনেতা নিজের আসল পরিচয় গোপন রাখে কিন্তু কেউ কেউ হয়তো আসল পরিচয় দিয়ে ফেলে। তেমনি ভগবানও যখন মানুষরূপে লীলা করেন তখন কারোর কাছে নিজেকে প্রকাশ করেন না—**'নাহং প্রকাশঃ সর্বস্য যোগমায়াসমাবৃতঃ'** (গীতা ৭।২৫) আর তাই ভক্তিহীন মানুষ তাকে

সাধারণ মানুষ ভেবে অবজ্ঞা করে। যদিও সত্যিকারের ভক্তরাই তাঁকে জানতে পারে।

পবিত্রম্—এই বিদ্যার ন্যায় পবিত্র বিদ্যা আর নেই। অত্যন্ত পাপী ও দুরাচারী ব্যক্তিও এই বিদ্যার সাহায্যে শীঘ্রই ধর্মাত্মা হয়ে ওঠে—**'ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্মাত্মা'** (গীতা ৯।৩১)। পবিত্র ভগবানের নাম-রূপ-লীলা-ধাম-স্মরণ-কীর্তন-জপ-ধ্যান-জ্ঞান সবই পবিত্র এবং যে তাঁর নাম করে সেও পবিত্র।

অপবিত্রঃ পবিত্রো বা সর্বাবস্থাং গতোঽপি বা।
যঃ স্মরেৎ পুণ্ডরীকাক্ষং স বাহ্যাভ্যন্তরঃ শুচিঃ॥

(ব্র. বৈ. পু. ব্রহ্ম. ১৭।১৭)

উত্তম—এটিই সর্বশ্রেষ্ঠ, এর সমকক্ষ কোনো বস্তু ঘটনা ব্যক্তি বা পরিস্থিতি নেই। এই বিদ্যার দ্বারাই ভক্ত সর্বশ্রেষ্ঠ হয়ে ওঠে, এত শ্রেষ্ঠ হয় যে **'ময়ি তু তেষু চাপ্যহম্'** (গীতা ৯।২৯)। তারা আমাতে অবস্থিত এবং আমিও তাদের মধ্যে অবস্থিত থাকি।

প্রত্যক্ষাবগমম্—এর ফল প্রত্যক্ষ। যে ব্যক্তি এটিকে যত জানবে, সে ততই নিজের মধ্যে এক বৈশিষ্ট অনুভব করবে। আর এটি প্রত্যক্ষভাবে অনুভব হলেই পরমগতি লাভ হয়—এই হল এর প্রত্যক্ষ ফল।

ধর্ম্যম্—এটি ধর্মময়। পরমাত্মাকে লক্ষ্য রেখে নিষ্কামভাবে যত কর্তব্য-কর্ম করা হয়, তা সবই ধর্মের অন্তর্গত। ভগবৎপ্রাপ্তির যতগুলি সাধন আছে বা ভক্তদের যতগুলি লক্ষণ আছে, ভগবান সেসবগুলিকেও **'ধর্ম্যামৃত'** বলে অভিহিত করেছেন (গীতা ১২।২০) অর্থাৎ এগুলি দ্বারাও ভগবদ্প্রাপ্তি হয়, তাই এগুলিও ধর্মময়।

অব্যয়ম্—এই জ্ঞানের বিন্দুমাত্র ক্ষয় হয় না তাই এটি অবিনাশী। ভগবান তাঁর ভক্তদের সম্বন্ধেও বলেছেন **'ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি'** (গীতা ৯।৩১)—আমার ভক্তদের কখনো বিনাশ (পতন) হয় না।

কর্তুং সুসুখম্—এটি পালন করাও অত্যন্ত সহজ। তাই এই অধ্যায়েই প্রেমিক ভক্ত প্রসঙ্গে বলেছেন—

পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি।
তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামি প্রযতাত্মনঃ॥ (গীতা ৯।২৬)

ভগবানকে পত্র-পুষ্প-ফল-জল দ্বারাও লাভ করা যায়। তিনি কত সুলভ !

জ্ঞান-বিজ্ঞান—(সপ্তম ৪-১২, নবম ৪-১০)

ভগবান সপ্তম ও নবম অধ্যায়ে জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রকরণ বিস্তৃতভাবে বলেছেন।

ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ।
অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা॥
অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্যতে জগৎ॥
এতদ্‌যোনীনি ভূতানি সর্বাণীত্যুপধারয়।
অহং কৃৎস্নস্য জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়স্তথা॥
মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়।
ময়ি সর্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণা ইব॥
রসোঽহমপ্সু কৌন্তেয় প্রভাস্মি শশিসূর্যয়োঃ।
প্রণবঃ সর্ববেদেষু শব্দঃ খে পৌরুষং নৃষু॥
পুণ্যো গন্ধঃ পৃথিব্যাঞ্চ তেজশ্চাস্মি বিভাবসৌ।
জীবনং সর্বভূতেষু তপশ্চাস্মি তপস্বিষু॥
বীজং মাং সর্বভূতানাং বিদ্ধি পার্থ সনাতনম্।
বুদ্ধির্বুদ্ধিমতামস্মি তেজস্তেজস্বিনামহম্॥
বলং বলবতাং চাহং কামরাগবিবর্জিতম্।
ধর্মাবিরুদ্ধো ভূতেষু কামোঽস্মি ভরতর্ষভ॥
যে চৈব সাত্ত্বিকা ভাবা রাজসাস্তামসাশ্চ যে।
মত্ত এবেতি তান্ বিদ্ধি ন ত্বহং তেষু তে ময়ি॥
(গীতা ৭।৪-১২)

ময়া ততমিদং সর্বং জগদব্যক্তমূর্তিনা।

মৎস্থানি সর্বভূতানি ন চাহং তেষ্ববস্থিতঃ॥
ন চ মৎস্থানি ভূতানি পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্।
ভূতভৃন্ন চ ভূতস্থো মমাত্মা ভূতভাবনঃ॥
যথাকাশস্থিতো নিত্যং বায়ুঃ সর্বত্রগো মহান্।
তথা সর্বাণি ভূতানি মৎস্থানীত্যুপধারয়॥
সর্বভূতানি কৌন্তেয় প্রকৃতিং যান্তি মামিকাম্।
কল্পক্ষয়ে পুনস্তানি কল্পাদৌ বিসৃজাম্যহম্॥
প্রকৃতিং স্বামবষ্টভ্য বিসৃজামি পুনঃ পুনঃ।
ভূতগ্রামমিমং কৃৎস্নমবশং প্রকৃতের্বশাৎ॥
ন চ মাং তানি কর্মাণি নিবধ্নন্তি ধনঞ্জয়।
উদাসীনবদাসীনমসক্তং তেষু কর্মসু॥
ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্।
হেতুনানেন কৌন্তেয় জগদ্বিপরিবর্ততে॥

(গীতা ৯।৪-১০)

"ভূমি (ক্ষিতি), জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ—এই পঞ্চমহাভূত এবং মন, বুদ্ধি, অহংকার— এই আটপ্রকার ভিন্ন ভিন্ন শক্তিই আমার 'অপরা' প্রকৃতি।

আর 'অপরা' প্রকৃতির থেকে আলাদা হল আমার জীবরূপা 'পরা' প্রকৃতি, যার দ্বারা এই জগৎ ধৃত হয়ে আছে।

'অপরা' ও 'পরা' প্রকৃতি—এই দুই-এর সংযোগেই সমস্ত প্রাণী উৎপন্ন হয়। আমি সমস্ত জগতের উৎপত্তি ও প্রলয়ের অর্থাৎ সৃষ্টির মূল কারণ।

আমি ভিন্ন এই জগতের আর কোনো মূল কারণ নেই। যেমন মণিময় মালায় সমস্ত মণিগুলোই সুতোয় গাঁথা থাকে, সেইরকম সমস্ত জগৎই আমাতে অনুস্যূত অর্থাৎ ওতঃপ্রোত হয়ে আছে।

জলে আমি রস, চন্দ্র ও সূর্যে আমি প্রভা, বেদে আমি প্রণব (ওঁকার), আকাশে আমি শব্দ এবং মানুষের মধ্যে আমি পুরুষার্থরূপে বিরাজ করি।

আমিই পৃথিবীতে পবিত্র গন্ধ, অগ্নিতে তেজ, সমস্ত প্রাণীর

জীবনীশক্তি এবং তপস্বীদের তপস্যা।

আমাকে সর্বপ্রাণীর অনাদি বীজ বলে জানবে। আমি বুদ্ধিমানের বুদ্ধি এবং তেজস্বীগণের তেজস্বরূপ।

হে অর্জুন ! বলবানদিগের কাম ও রাগবর্জিত বল আমি। আর মানুষের ধর্মযুক্ত কামও আমি।

যতপ্রকার সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক ভাব আছে সে সকল আমা হতে উৎপন্ন, কিন্তু আমি সে সবে নেই বা সেগুলিও আমাতে নেই। (গীতা ৭।৪-১২)।

সমস্ত জগতে আমি অব্যক্তস্বরূপে পরিব্যাপ্ত হয়ে থাকি। সমস্ত প্রাণী আমাতে অবস্থিত কিন্তু আমি সে সবে অবস্থিত নই এবং প্রাণীরাও আমাতে অবস্থান করে না।

সকল প্রাণীর উৎপাদক, তাদের ধারক ও পোষক হলেও আমার স্বরূপ ওইসব প্রাণীতে অবস্থিত নয়—আমার এই ঐশ্বরিক যোগ (সামর্থ) দর্শন করো।

সর্বত্র বিচরণশীল মহাবায়ু যেমন নিত্য আকাশেই অবস্থিত, তেমনি সমস্ত প্রাণীগণও আমাতে অবস্থিত।

কল্পর সমাপ্তিকালে মহাপ্রলয় উপস্থিত হলে সমস্ত প্রাণী আমার প্রকৃতিতে লয় পায় আর কল্পের প্রারম্ভে মহাসর্গের সময় আবার আমি তাদের সৃষ্টি করি।

প্রকৃতির অধীন এই সমস্ত প্রাণীদের আমি নিজ প্রকৃতিকে বশীভূত করে কল্পর আদিতে বারংবার সৃষ্টি করি।

কিন্তু সৃষ্টি রচনাদি কর্মে আমি অনাসক্ত এবং উদাসীনের মতো থাকায় এই কর্মসকল আমাকে আবদ্ধ করে না।

আমার অধ্যক্ষতায় প্রকৃতি সমস্ত চরাচর জগৎ সৃষ্টি করে, সেইজন্যই জগৎ বিবিধ প্রকারে পরিবর্তিত হয়।'' (গীতা ৯।৪-১০)

এখানে জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রসঙ্গে ভগবান সাধকের দুই অবস্থার কথা বলছেন—

১) সাধকগণ যদি পরমাত্মা ও জগৎ-সংসারকে দুটি রূপে মনে করেন তাহলে তাঁদের পরমাত্মাতে জগৎ-সংসার এবং জগৎ-সংসারে পরমাত্মা অবস্থিত, এই বোধ হয়—

যো মাং পশ্যতি সর্বত্র সর্বং চ ময়ি পশ্যতি।

তস্যাহং ন প্রণশ্যামি স চ মে ন প্রণশ্যতি॥ (গীতা ৬।৩০)

'যিনি সর্বভূতে আমাকে ব্যাপ্ত দেখেন আর সর্বভূতকে আমার অন্তর্গত দেখেন তাঁর কাছ থেকে আমি কখনো অদৃশ্য হই না অর্থাৎ সদাই আমি তাদের মধ্যে থাকি।'

২) কিন্তু যদি এই দুই ভাব না থাকে সর্বত্র **'বাসুদেবঃ সর্বম্'** প্রতিভাত হয় তখন পরমাত্মাতেও জগৎ নেই এবং জগতেও পরমাত্মা নেই অর্থাৎ সর্বত্রই এক পরমাত্মা বিরাজমান।

পরমাত্মাতে জগৎ, জগতে পরমাত্মা—এ হল 'জ্ঞান' এবং পরমাত্মাতে জগৎ নেই আর জগতে পরমাত্মা নেই অর্থাৎ পরমাত্মা ব্যতীত আর কিছুই নেই—এ হল 'বিজ্ঞান'।

নবম অধ্যায়ের চতুর্থ ও পঞ্চম শ্লোকে জ্ঞান ও বিজ্ঞান সম্বন্ধে বিস্তারিত ভাবে বলা হয়েছে। ভগবান বলছেন **'ময়া ততমিদং সর্বং জগদব্যক্তমূর্তিনা'** অর্থাৎ মন-বুদ্ধি ইন্দ্রিয়াদির দ্বারা অনুভূত ব্যক্ত এবং ইহাদের গোচর নয় এইরূপ অব্যক্ত এই উভয়ের সৃষ্টিতেই তিনি বিরাজিত। আর **'মৎস্থানি সর্বভূতানি'** অর্থাৎ পরা-অপরা প্রকৃতিরূপ সমস্ত জগৎই ভগবানে অবস্থিত। ইহাদের সৃষ্টি, স্থিতি বা লয় সবই তাঁহা হতে হয়। এই উভয়ের সৃষ্টিতেই তিনি বিরাজিত।

এই প্রকার বিধিপূরক সৃষ্টির কথা বলে আবার নিষেধপূর্বক সৃষ্টির কথা ভগবান বলছেন। **'ন চাহং তেষ্ববস্থিতঃ'** অর্থাৎ আমি আমার সৃষ্ট জগতে অবস্থিত নই। আর **'ন চ মৎস্থানি ভূতানি'** অর্থাৎ প্রাণীরা আমাতে অবস্থিত নয়।

এইভাবে ভগবান চারপ্রকার রীতিতে সৃষ্টির কথা বলেছেন—জগতে পরমাত্মা অনুস্যূত হয়ে আছেন এবং পরমাত্মাতে জগৎ অবস্থিত আর

পরমাত্মা জগতে নেই এবং জগৎও পরমাত্মাতে অবস্থিত নয়। এর তাৎপর্য হল এই যে, যখন সাধকের দৃষ্টিতে বোধ হয় যে পরমাত্মাও আছেন এবং সংসারও আছে তখন সে উপলব্ধি করে সংসারে পরমাত্মা আর পরমাত্মায় সংসার। কিন্তু যখন দৃষ্টি খুলে যায়, তখন উপলব্ধি হয় যে, জগৎ-সংসারের কোনো স্বতন্ত্র অস্তিত্বই নেই—কেবল পরমাত্মাই বিরাজিত—তখন সর্বত্র **'বাসুদেবঃ সর্বম্'**। এটি হল জীবন্মুক্তদের দৃষ্টি, ভক্তদের দৃষ্টি—**'যাঁহা যাঁহা নেত্র পড়ে তাঁহা কৃষ্ণ স্ফুরে'**।

ভগবান বলছেন আমি সমস্ত জগতে এবং সমস্ত জগৎ আমাতে, আবার আমি জগতেও নেই ও সর্ব জগৎও আমাতে নেই—এই যে জগৎ-সংসারের প্রতি নির্লিপ্ততা, নিজেই নিজ মধ্যে স্থিতভাব—এই ঈশ্বরীয় যোগ অনুধাবন করো, **'পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্'**। তাৎপর্য হল আমি এক হয়েও বহুরূপে প্রতিভাত হই আবার বহুরূপে দৃষ্ট হলেও একই থাকি অর্থাৎ আমি—আমিই রয়েছি।

আবার ভগবান বলছেন—**'ভূতভৃন্ন চ ভূতস্থো মমাত্মা ভূতভাবনঃ'** অর্থাৎ আমি সকলের উৎপাদক (ভূতভাবন), সকলের ভরণপোষণকারী (ভূতভৃৎ) হয়েও অহং-মমত্ববোধ বর্জিত এবং সকলের মধ্যে অবস্থান করেও কারোর আশ্রিত নই, সেগুলির থেকে সর্বতোভাবে নির্লিপ্ত।

সেইরূপে মানুষও যেন আত্মীয়-স্বজন সকলের ভরণ-পোষণ করেও অহংবোধ না রাখে এবং যে কোনো পরিস্থিতিতে অবস্থান করেও নিজেকে তার আশ্রিত বলে মনে না করে অর্থাৎ যেন নির্লিপ্ত থাকে।

ভক্তর কাছে যে কোনো পরিস্থিতিই আসুক না কেন নুইয়ে পড়া বা বিহ্বল হওয়া উচিত নয়, সবই ভগবানের লীলা বলে মনে করা উচিত। ভগবান স্বয়ং কখনো উৎপত্তির, কখনো স্থিতির আবার কখনো সংহার লীলা করে থাকেন।

যদিও ভক্তর দৃষ্টিতে ভগবানই সব কিন্তু অভক্তদের কাছে এই জগৎ-সংসার বিভক্ত, তাই এই মায়াবদ্ধ জীবই জগৎকে পৃথক অস্তিত্ব প্রদান করে—**'যয়েদং ধার্যতে জগৎ'** (গীতা ৭।৫)। জীবের অহংবোধ, মমত্ববোধ ও

কামনার জন্যই জগতের পৃথক অস্তিত্ব প্রতিভাসিত হয়। তাই যতক্ষণ কিঞ্চিৎ অহংবোধ, মমত্ববোধ ও কামনাবোধও থাকে, ততক্ষণ উচ্চতর সাধকের দৃষ্টিতেও পরমাত্মাতে জগৎ ও জগতে পরমাত্মা অবস্থিত বলে বোধ হয়। কিন্তু অহংবোধ, মমত্ব ও কামনা সর্বতোভাবে দূর হলে সিদ্ধের দৃষ্টিতে তখন আর পরমাত্মাতে জগৎ অবস্থিত নয় আর জগতেও পরমাত্মা অবস্থিত নন। তখন শুধুই 'বাসুদেবঃ সর্বম্'।

শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশ স্কন্ধেও ভগবান শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে ভক্তর অতি উচ্চ সমত্ব ব্যবহার সম্বন্ধে বলছেন—

ব্রাহ্মণে পুক্কসে স্তেনে ব্রহ্মণ্যেঽর্কে স্ফুলিঙ্গকে।
অক্রূরে ক্রূরকে চৈব সমদৃক পণ্ডিতো মতঃ॥ (ভাগবত ১১।২৯।১৪)

সকল প্রাণীকে আমার ভাবে ভাবিত মনে করে ব্রাহ্মণ ও অন্তজ, তস্কর ও দাতা, সূর্য ও অগ্নি এবং কুটিল ও সরলের প্রতি সমদর্শী হবেন।

ভগবান পরবর্তী উপদেশে বলেছেন—

যাবৎ সর্বেষু ভূতেষু মদ্ভাবো নোপজায়তে।
তাবদেবমুপাসীত বাঙ্মনঃকায়বৃত্তিভিঃ॥ (ভাগবত ১১।২৯।১৭)

যে পর্যন্ত সর্বপ্রাণীতে আমার ভাব না জন্মে, তাবৎকাল বাক্য, মন ও কায় দ্বারা আমার উপাসনা করবে।

ভগবদ্ বুদ্ধিতে সর্বজীবে তাঁর পূজ্যপাদ দর্শন, কায়িকরূপে প্রণামাদি, মানস ধ্যান-ধারণাদি করতে করতে ভক্তর নিকট সমস্তই ব্রহ্মময় হয়ে যায়।

সর্বং ব্রহ্মাত্মকং তস্য বিদ্যয়াঽঽত্মমনীষয়া।
পরিপশ্যন্নুপরমেৎ সর্বতো মুক্তসংশয়ঃ॥ (ভাগবত ১১।২৯।১৮)

এইভাবে ঈশ্বর কৃপা দ্বারা সর্বত্র ব্রহ্মদর্শন করলে ভক্ত মুক্ত সন্দেহ হয়ে সর্বপ্রকার ক্রিয়া আচার-অনুষ্ঠান থেকে উপরত হন।

ভগবান এই প্রকরণে বর্ণনা করেছেন যে এই সৃষ্টির উপাদান, নিমিত্ত এবং করণ-কারণও তিনি আবার সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়ও তিনি। ভগবান জগৎ ও জীব সৃষ্টি সম্বন্ধে সপ্তম অধ্যায়ে চতুর্থ থেকে দ্বাদশ শ্লোক পর্যন্ত তাঁর 'অপরা প্রকৃতি' ও 'পরা প্রকৃতির' বর্ণনা করেছেন। জীব-জগতের সৃষ্টি হল

তাঁরই প্রকৃতি অর্থাৎ তাঁরই সৃষ্টি, তাঁরই স্বভাব, তাঁর থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। পরমাত্মা সকলের কারণস্বরূপ। তিনি তাঁর প্রকৃতি সহযোগেই (স্বভাববশতই) সৃষ্টি করেন আর এই জগৎ সৃষ্টির মূল হচ্ছে অপরা প্রকৃতি, যার উপাদান হচ্ছে—

ভূমি, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ, মন, বুদ্ধি ও অহংকার—একটি থেকে অপরটি অধিকতর সূক্ষ্ম। তবে এখানে যে অপরা প্রকৃতির কথা বলা হয়েছে তা 'ব্যষ্টি অপরা প্রকৃতি' অর্থাৎ মানুষের শরীর। কারণ মানুষ ব্যষ্টি শরীরের সঙ্গেই সম্পর্ক পাতায় ফলে সে আবদ্ধ হয়, সমষ্টি প্রকৃতির দ্বারা নয়। ব্যষ্টি প্রকৃতি কোনো পৃথক তত্ত্ব নয়, সমষ্টিরই একটি অংশ যার সঙ্গে মানুষ নিজ সম্পর্ক মেনে নেয়। আর এই মেনে নেওয়া সম্পর্ক উপলক্ষ্য করেই ভগবান তাঁর পরা প্রকৃতি বর্ণনা করেছেন যা তাঁর অংশরূপ, চেতনসম্পন্ন ও অপরিবর্তনশীল।

ভগবান অষ্টম শ্লোকে বলছেন '**জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্যতে জগৎ**'। অপরা প্রকৃতির সূক্ষ্মতম অংশ অহংকার থাকে কারণ-শরীরে তাদাত্ম্যরূপে। এই অহম্ (আমি)-এর একদিকে আছে কারণ শরীর (ব্যষ্টি অপরা প্রকৃতি) আর অন্যদিকে আছে চেতন অংশ (পরা প্রকৃতি)। যখন জীব পরমাত্মাকে স্বীকার না করে অপরা প্রকৃতিকে স্বীকার করে তখন সে জন্ম-মৃত্যুরূপ বন্ধনে আবদ্ধ হয়। অন্য অবলম্বন করার ফলেই পরা প্রকৃতি '**জীবভূতাম্**' অর্থাৎ জীবরূপ হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে এটি জীবরূপা নয়, জীব সেজে বসে আছে। এটি সাক্ষাৎ পরমাত্মার অংশ, কিন্তু স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ-শরীররূপ প্রকৃতির সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করার জন্যই এটি জীব হয়ে আছে। আর এই সম্পর্ক স্থাপন হয়েছে নিজের সুখের আশাতে ব্যষ্টি অহংকে মেনে নেওয়া, স্বীকৃতি দেওয়ার ফলেই।

ভগবান বলেছেন '**যয়েদং ধার্যতে জগৎ**'-এর দ্বারা জগৎ ধৃত হয়ে আছে অর্থাৎ জীব ভোগাসক্তিবশতই এই জগৎকে ভগবৎস্বরূপ দেখতে পায় না, নিজের বলে মনে করে। ভগবান তাই '**ইতীয়ং মে**' বলে সতর্ক করে দিয়ে বলেছেন যে এই অপরা প্রকৃতিও তাঁর। ভ্রম ক্রমে একে নিজের

মনে করলে অর্থাৎ মমতা-আসক্তিপূর্বক সম্পর্ক স্থাপন করলে জন্ম-মৃত্যু বরণ করতে হয়। অতএব এই ভুল শোধরাবার দায়িত্বও তার অর্থাৎ জীবের। সুতরাং জীব যেন অপরা প্রকৃতির সঙ্গে সম্পর্ক না পাতায়। জগতের যে স্বতন্ত্র অস্তিত্ব প্রতিভাত হয় তা ভগবানের দৃষ্টিতেও নেই, মহাপুরুষদের দৃষ্টিতেও নেই আছে কেবল জীবের দৃষ্টিতে (মেনে নেওয়াতে)। ভগবানের দৃষ্টিতে সমস্তই তিনি— **'সদসচ্চাহমর্জুন'** (গীতা ৯।১৯), মহাত্মার দৃষ্টিতে সবই ভগবান—**'বাসুদেবঃ সর্বম্'** (গীতা ৭।১৯)। আর জীবের দৃষ্টিতে রাগ-দ্বেষাদি পূর্ণ জগৎই সর্বদা বর্তমান—**'মনঃষষ্ঠানীন্দ্রিয়াণি প্রকৃতিস্থানি কর্ষতি'** (গীতা ১৫।৭)। এই চেতন জীবাত্মা যখন ব্যষ্টি অহংকে মেনে নেয় তখন অপরা প্রকৃতিরই অংশ পঞ্চইন্দ্রিয় ও মনের কর্তা হয়ে বসে এবং জন্ম-মৃত্যু চক্রে বন্ধন প্রাপ্ত হয়। ভগবান তাই উপনিষদ্, ভাগবত, গীতা সর্বত্রই বলেছেন— তিনি পরা ও অপরা উভয় প্রকৃতিরই প্রভু, সমস্ত সৃষ্টির মহাকারণ, তিনি ভিন্ন আর অন্য কারণ নেই। **'পুরুষান্ন পরং কিঞ্চিৎ সা কাষ্ঠা সা পরা গতিঃ'** পুরুষের পরে আর কিছু নেই। তিনি সবার পরম অবধি বা শেষ এবং সবার পরম গতি।

ভাগবতে কৃষ্ণ-উদ্ধব সংবাদেও সৃষ্টির ক্রম বলতে গিয়ে ভগবান বলছেন—

আত্মৈব তদিদং বিশ্বং সৃজ্যতে সৃজতি প্রভুঃ
ত্রায়তে ত্রাতি বিশ্বাত্মা হ্রিয়তে হরতীশ্বরঃ॥ (ভাগবত ১১।২৮।৬)

—যে সব প্রত্যক্ষ-অপ্রত্যক্ষ বস্তু আছে সে সবই সর্বশক্তিমান পরমাত্মা। যে সৃষ্টিসমূহ প্রতিভাত হয় তার নিমিত্ত কারণও তিনি আবার উপাদান কারণও তিনি। অর্থাৎ বিশ্বজগৎ তিনিই সৃষ্টি করেন আবার সৃষ্টও হন। তিনিই রক্ষক আবার তিনিই রক্ষিত। তিনিই সংহার করেন আবার যাকে সংহার করেন তিনিও নিজেই।

তৈত্তিরীয়োপনিষদে বলা হয়েছে—

অহমন্নমহমন্নমহমন্নম্। অহমন্নাদো৩ঽহমন্নাদোঽহমন্নাদঃ। অহঁশ্লোককৃদহঁ শ্লোককৃদহঁ শ্লোককৃৎ। অহমস্মি প্রথমজা ঋতা৩স্য। পূর্বং

দেবেভ্যোঽমৃতস্য নাভায়ি। যো মা দদাতি স ইদেব মাঽবাঃ। অহমন্নমন্নমদন্তমাদ্মি। অহং বিশ্বং ভুবনমভ্যভবাম্। সুবর্ণ জ্যোতীঃ। য এবং বেদ। ইত্যুপনিষৎ। (তৈ. উ. ৩।১০।৬)

আমিই অন্ন আবার আমিই অন্ন গ্রহণ করি। আমিই এই সর্ব জগৎ হয়ে আছি।

গীতাতেও ভগবান বলছেন আমি সমগ্র জগতের **'প্রভবঃ প্রলয়স্তথা'** (গীতা ৭।৬) অর্থাৎ সৃষ্টির আর নাশেরও মূল কারণ।

প্রভবঃ— তিনি জগতের নিমিত্তের কারণ। যেমন কলসি তৈরির জন্য কুমোর বা সোনার গহনা তৈরির জন্য স্বর্ণকার নিমিত্ত হয়ে থাকে সেইরকম জগৎ-সৃষ্টির জন্য ভগবানই হলেন নিমিত্ত কারণ। এই সমগ্র সৃষ্টি তাঁরই সঙ্কল্প থেকে জাত—

'সদৈক্ষত বহু স্যাং প্রজায়েয়েতি' (ছা. ৬।২।৩)

প্রলয়ঃ—ভগবান আবার জগতের উপাদান কারণও বটে। যেমন কলসি তৈরির উপাদান কারণ মাটি, তেমনি জগৎ সৃষ্টির উপাদান কারণ হলেন ভগবান। আর মাটির কলস যেমন মাটিতেই মিশে যায়, তেমনি এই জগৎ ভগবান হতে উৎপন্ন হয়, তাতেই স্থিত হয় এবং তাঁতেই বিলীন হয়। এই যে জগৎ খণ্ড খণ্ড প্রতীয়মান হয়, তা কিভাবে তা সেই পরমাত্মায় স্থিত থাকে ! ভগবান বলছেন— **'সূত্রে মণিগণা ইব'** অর্থাৎ মণিগুলো ভিন্ন ভিন্ন হলেও যেমন তা একটি সূত্র দ্বারাই যুক্ত থাকে, তেমনি জগতে যত প্রাণী আছে, তাদের নাম-রূপ-আকৃতি-প্রকৃতি ভিন্ন ভিন্ন হলেও তাদের মধ্যে একই চেতনতত্ত্ব পরিব্যাপ্ত হয়ে আছে আর সূত্ররূপী এই চেতন-তত্ত্বই হল স্বয়ং ভগবান। তাই তিনি বলছেন— **'ক্ষেত্রজ্ঞং চাপি মাং বিদ্ধি সর্বক্ষেত্রেষু ভারত'** (গীতা ১৩।২)। এইরূপে মণিরূপা অপরা প্রকৃতিও তাঁর স্বরূপ আর সূত্ররূপা পরা-প্রকৃতিও তাঁর স্বরূপ। দুই স্থানেই ভগবান পরিপূর্ণ, ওতপ্রোত হয়ে আছেন। তবে পরার প্রধান দোষ একটিই, তা হল অপরার সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করা। এই একটি দোষ থেকেই সমস্ত দোষ উৎপন্ন হয় আর এই দোষ দূর হলেই সমস্ত দোষ দূর হয়। আর এর প্রকৃত গুণও হল একটি, যার দ্বারা

সকল গুণ প্রকটিত হয়—তা হল ভগবানের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন। আর এই সম্পর্ক বিশেষভাবে বোঝাবার জন্য প্রকরণের শেষে বর্ণিত হয়েছে যে আমরা যা কিছু দেখি-শুনি-মনে করি বা বুঝি তার সবের কারণই ভগবান। আর যখন ভগবান ব্যতীত এদের কোনো স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নেই এইরূপ বোধ হয়, তখন ভগবানে স্বাভাবিক ভক্তি আসে, ভজনায় স্বাভাবিকভাবে প্রিয়তা জন্মে।

সপ্তম অধ্যায়ের চতুর্থ শ্লোকে বলা হয়েছে এ জগতের সৃষ্টি হয় পঞ্চ মহাভূত দ্বারা—ক্ষিতি (পৃথিবী), অপ (জল), তেজ, মরুৎ (বায়ু) ও ব্যোম (আকাশ)। আর এদের কারণগুলি হল গন্ধ-রস-রূপ-স্পর্শ ও শব্দ। যাদের পঞ্চতন্মাত্র বলা হয়। ভগবান অষ্টম ও নবম শ্লোকে বলছেন এই পঞ্চতন্মাত্রর সৃষ্টি হয় তাঁর থেকে। তিনি হচ্ছেন জলের মধ্যে স্থিত রস তন্মাত্র, পৃথিবীর মধ্যে স্থিত গন্ধও তিনি, অগ্নিতে স্থিত তেজ (রূপ তন্মাত্র) তিনি, আকাশস্থিত শব্দ তন্মাত্রও তিনি। চন্দ্র ও সূর্যের আলোকিত করার যে শক্তি তা হল প্রভা, তাও হলেন তিনি আর বেদের সার প্রণবও হলেন তিনি। প্রণব বা ওঁকারই প্রথমে প্রকট হয়েছেন তার থেকে ত্রিপদ গায়ত্রী এবং তার থেকেই বেদত্রয়ী প্রকটিত। ভগবানই হলেন প্রণবের বাচক। মানুষের সার পদার্থ হল পুরুষার্থ আর প্রকৃত পুরুষার্থ হল পরমাত্মাকে আন্তরিকভাবে পাওয়ার ইচ্ছা। সকল প্রাণীর জীবনীশক্তিও ভগবান আর তপস্বীদের তপস্যাও তিনি। প্রকৃতপক্ষে পরমাত্মতত্ত্ব প্রাপ্তির সাধনা চলাকালীন যে কোনো ক্লেশে নির্বিকার থাকাই হল প্রকৃত তপস্যা।

দশম শ্লোকে ভগবান সৃষ্টি সম্বন্ধে বলেছেন যে, তিনি সর্বপ্রাণীর অনাদি বীজ। অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে জীবও অনন্ত কিন্তু জীবসমূহের বীজ (পরমাত্মা) একটিই। আর যতপ্রকার বীজ আছে, সে সবই বৃক্ষ হতে উৎপন্ন হয় এবং বৃক্ষের জন্ম দিয়েই বীজটি বিনষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু ভগবান এখানে নিজেকে সংসার মাত্রেরই বীজ বলে জানিয়েছেন—**'বীজং মাং সর্বভূতানাং বিদ্ধি পার্থ সনাতনম্'** (গীতা ৭।১০) অর্থাৎ তিনি সনাতন, অনাদি বীজ, উৎপন্ন হওয়া বীজ নন। আবার ভগবান বলেছেন— **'বীজমব্যয়ম্'** (গীতা ৯।১৮) সেই

এক বীজ থেকে অনন্ত জগৎ সংসার উৎপন্ন হলেও তার কোনো ক্ষয় হয় না, কারণ তিনি অব্যয়, অক্ষয়। ভগবান আরও বলছেন বুদ্ধিমানদের বুদ্ধিস্বরূপ তিনি এবং তেজস্বীদের তেজও তিনি।

দৈবসম্পদের একটি গুণ হল তেজ। তত্ত্বজ্ঞ জীবন্মুক্ত মহাপুরুষদের মধ্যে এক বিশেষ তেজ-শক্তি থাকে যার প্রভাবে দুর্গুণ-দুরাচারী ব্যক্তিও তাঁদের সংসর্গে সদ্‌গুণী-সদাচারী হয়ে ওঠে। সেই তেজ ভগবানেরই বিভূতি।

সপ্তম অধ্যায়ের একাদশ শ্লোকে ভগবান বল ও কামে তাঁর প্রকাশ বর্ণনা করেছেন। গীতায় বিভিন্নভাবে বলের বর্ণনা করা হয়েছে। সপ্তদশ অধ্যায়ে বলছেন—**'দম্ভাহঙ্কারসংযুক্তা কামরাগবলান্বিতাঃ'** (গীতা ১৭।৫)। দম্ভ-অহংকার তথা কামনা, বাসনা দ্বারা বল যুক্ত হলে তা হয় অশাস্ত্রবিহিত। ষোড়শ অধ্যায়ে দৈবাসুর সম্পদ বিভাগ যোগে বলেছেন—**'সিদ্ধোঽহং বলবান্ সুখী'** (গীতা ১৬।১৪)। আবার বলছেন—**'অহংকারং বলং দর্পং কামং ক্রোধঞ্চ সংশ্রিতাঃ'** (গীতা ১৬।১৮)—এইসব বল হচ্ছে আসুরী-ভাব সম্পন্ন লোকেদের বল তাই ত্যাজ্য।

সপ্তদশ অধ্যায়ে শ্রদ্ধাত্রয়বিভাগযোগে আহারের বিভাগ সম্বন্ধে বলেছেন—**'আয়ুঃসত্ত্বলারোগ্য সুখপ্রীতিবিবর্ধনাঃ'** (গীতা ১৭।৮) অর্থাৎ এটি সাত্ত্বিক বলের বাচক এবং সত্ত্বগুণের বৃদ্ধিকারী। আর এখানে ভগবান বলছেন **'বলং বলবতাং চাহং কামরাগবিবর্জিতম্'**। অর্থাৎ-লালসাবর্জিত হলে কঠিন হতে কঠিনতর কাজ করলেও নিজের অন্তরে নির্মল উৎসাহ থাকে। আর কাজটি শেষ হওয়ার পরেও কাজটি শাস্ত্রীয়, ধর্মের অনুকূল, লোকমর্যাদা অনুসারে এবং সাধুজন অনুমোদিত এই চিন্তায় মনে একপ্রকার উৎসাহ, বল আসে। এই বলই ভগবানের স্বরূপ আর ইহাই গ্রহণীয়।

কাম সম্বন্ধে শাস্ত্রে কোথাও প্রশংসা করা হয়নি। গীতায়ও ভগবান বলেছেন—**'কাম এষ ক্রোধ এষ রজোগুণসমুদ্ভবঃ। মহাশনো মহাপাপ্মা বিদ্ধ্যেনমিহ বৈরিণম্'** (গীতা ৩।৩৭)। কাম ও ক্রোধ দুইটিই চির অতৃপ্ত ও মহাপাপকারক এবং মনুষ্যের নিত্যবৈরী। কিন্তু এখানে কামের প্রশংসা করে

বলছেন **'ধর্মাবিরুদ্ধো ভূতেষু কামোঽস্মি ভরতর্ষভ'** (গীতা ৭।১১)—শাস্ত্র অবিরোধী ধর্মযুক্ত যে কাম তা ভগবানের স্বরূপ। অবশ্য এই কাম শব্দটি এক্ষেত্রে কামের বাচক নয়, গৃহস্থধর্ম পালনের বাচক।

সবশেষে ভগবান বলছেন—যতপ্রকার সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক গুণ আছে সবই তাঁর থেকে উৎপন্ন। সাধকদের শ্রদ্ধা ও বিবেকবোধ দুই-ই থাকে। ভক্তিমার্গে হয় শ্রদ্ধার প্রাধান্য আর জ্ঞানমার্গে থাকে বিবেকের প্রাধান্য। ভক্তিমার্গে মনে করা হয় যে সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক ভাবসমূহ ভগবান হতে উৎপন্ন আর জ্ঞানমার্গে মনে করা হয় যে সত্ত্ব-রজ-তম গুণগুলি প্রকৃতি হতে জাত। তাহলে এখানে প্রশ্ন হতে পারে যে, যদি সব কিছুই ভগবান তবে সাত্ত্বিক-রাজসিক ও তামসিক ভাব পরিত্যাজ্য কেন ?

এর উত্তর হল, জমিতে সর্বত্র জল থাকলেও যেমন কুঁয়াই হল জল পাওয়ার প্রকৃষ্ট স্থান, যেমন পাইপের সর্বত্র জল প্রবাহিত হলে, কলই হল জল পাওয়ার উপযুক্ত স্থান, সেইরকম সাত্ত্বিক-রাজসিক-তামসিক আদি গুণ ভগবান থেকে সৃষ্ট হলেও এগুলি তাঁকে পাওয়ার পথ নয়। তাঁকে লাভের উপায় হল যজ্ঞ (কর্তব্য-কর্ম) ও ত্যাগ। তাই ভগবান দ্বাদশ শ্লোকে বলেছেন—**'ন ত্বহং তেষু তে ময়ি'**। তারা আমা হতে উৎপন্ন হলেও আমি তাদের মধ্যে নেই বা সেগুলি আমার মধ্যে নেই। অতএব যে সব সাধক আমাকে লাভ করতে চান, তাঁদের দৃষ্টি যেন এই সব ভাবের দিকে না থেকে, তাঁর দিকে থাকে। তারা যদি এই গুণে আবদ্ধ হয়ে পড়ে তবে কখনোই মুক্ত বা ভক্ত হতে পারবে না।

এই প্রকরণের সপ্তম অধ্যায়ে ভগবান বলছেন জগৎ সৃষ্টি তাঁর দ্বারাই হয়, তিনিই এর উপাদান কারণ এবং নিমিত্ত কারণ। আর নবম অধ্যায়ে বলেছেন সৃষ্টির রহস্য ও তার ক্রম। ষষ্ঠ শ্লোকে জগতের সৃষ্টির কথা বলে ভগবান পরের শ্লোকগুলিতে তার উৎপত্তি ও প্রলয়ের কথা বলেছেন। প্রকৃতপক্ষে জগতের কোনো স্থিতিই নেই, আসলে উৎপত্তি আর প্রলয়ের মধ্যবর্তী প্রবাহকেই স্থিতি বলে। ভগবান নবম অধ্যায়ের সপ্তম শ্লোকে প্রলয়কে কল্পক্ষয় ও উৎপত্তিকে কল্পাদৌ বলেছেন। ব্রহ্মার একদিনকে বলা

হয় 'কল্প' যা মানুষের একহাজার চতুর্যুগের সমান আর ব্রহ্মার একটি রাতও একই সময়ের। আর ব্রহ্মার আয়ু শেষ হলে তিনি লীন হন আর এই মহাপ্রলয়ের সময়কেই বলে 'কল্পক্ষয়' আর যখন পুনরায় প্রকটিত হন, সেই মহাসর্গের সময়কে বলা হয় 'কল্পাদৌ'।

ভগবান বলেছেন **'সর্বভূতানি প্রকৃতিং যান্তি মামিকাম্'** অর্থাৎ মহাপ্রলয়ের জীব প্রকৃতিকে প্রাপ্ত হয় আর প্রকৃতি ক্রিয়াশীল হওয়ায় সেটি স্বতঃই লয়ের দিকে অগ্রসর হয় অর্থাৎ ক্রিয়া করতে করতে ক্লান্ত হলে প্রকৃতি পরমাত্মাতে লয় পায়। আর প্রাণীগণও প্রকৃতির সঙ্গে সম্পর্কিত হওয়ায় মহাপ্রলয়ে তারাও প্রকৃতিতে সুপ্ত অবস্থায় থাকে। জগৎ সৃষ্টিতে ভগবানের হাত থাকলেও ধ্বংসের পথে প্রকৃতি স্বতঃই অগ্রসর হয়। আর যেহেতু জীব কামনা-বাসনা-মমতা যুক্ত হয়ে জগৎ ও শরীরের সঙ্গে সম্পর্ক মেনে নেয় তাই প্রকৃতির মতোই তারাও সৃষ্টি ও বিনাশ চক্রে আবর্তিত হতে থাকে।

নদীপারে দণ্ডায়মান একজন সাধুকে এক ব্যক্তি বলল—দেখুন মহারাজ ! নদীর জল এবং সেতুর ওপর মানুষও কিরকম বহমান ! সাধু বলল, দেখ ভাই ! শুধু নদীর জল আর সেতুর ওপর মানুষই নয় নদী নিজে আর সেতুও বয়ে যাচ্ছে। অর্থাৎ নদী, সেতু, মানুষ সবই অত্যন্ত বেগে বিনাশের দিকে ধেয়ে চলেছে। একদিন নদী, সেতু, মানুষ কিছুই থাকবে না। পৃথিবীও এইরূপ প্রলয়ের দিকে বেগে ধাবিত হচ্ছে। আর এইরূপে স্থায়ীরূপে প্রতীয়মান সমগ্র সৃষ্টিও লয়ের দিকে চলেছে। আর প্রকৃতির সঙ্গে সম্পর্কিত হলে জীবের অবস্থাও একই প্রকার হয়। যেমন গাছে নারকেল হলে তাতে যতক্ষণ জল থাকে নারকেলের শাঁসও দৃঢ়ভাবে তার খোলার সঙ্গে লেগে থাকে। কিন্তু যখন নারকেলের মধ্যস্থিত জল শুকিয়ে যায়, নারকেলের শাঁসটি মিষ্ট হয় আর খোলার থেকে পৃথক ভাবে অবস্থান করে। সেইরকম যতক্ষণ জীবের মধ্যে কামনা-বাসনা-মমতা থাকে ততক্ষণ জীব প্রকৃতির সঙ্গে দৃঢ়ভাবে যুক্ত থাকে, বন্ধন কাটিয়ে উঠতে পারে না, শরীরের উৎপত্তিকে নিজের উৎপত্তি, শরীরের বিনাশকে নিজের বিনাশ বলে মনে করে এবং তার ফলে জন্ম-মরণ চক্রে আবর্তিত হতে থাকে। আর কামনা-

বাসনা ত্যাগ হলেই জীব, নারকেলের শাঁসের খোলের থেকে মুক্ত হওয়ার মতোই, জীবন্মুক্ত হয়ে প্রকৃতির বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে যায়। আবার ভগবান সৃষ্টির সম্বন্ধে বলছেন —**'কল্পাদৌ বিসৃজাম্যহম্'**। মহাপ্রলয়ে নিজ নিজ কর্মসহ প্রকৃতিতে লীন হওয়া প্রাণীগণের কর্ম যখন পরিপক্ব হয়ে ফল প্রদানের জন্য উন্মুখ হয় তখন প্রভুর মনে **'বহু স্যাং প্রজায়েয়'** এই সংকল্পের উদয় হয়। এইভাবে মহাসর্গ আরম্ভ হয়। সকল প্রাণীর স্ব-অস্তিত্ব প্রকটিত করার যে সংকল্প সেটিই ভগবানের আদি কর্ম।

নবম অধ্যায়ের অষ্টম শ্লোকে ভগবান বলছেন—**'প্রকৃতিং স্বামবষ্টভ্য'**। প্রকৃতি পরমাত্মারই এক অনির্বচনীয় বিশেষ অলৌকিক শক্তি। এটি পরমাত্মার থেকে পৃথক নয় আবার অভিন্নও নয়। পরমাত্মা প্রকৃতির সহযোগেই সৃষ্টি রচনা করেন, প্রকৃতিকে বাদ দিয়ে নয়। সৃষ্টিতে যা কিছু উৎপত্তি, পরিবর্তন ও বিনাশ হতে দেখা যায় তা সব কিছু প্রকৃতিতেই হয়। আর ভগবান প্রকৃতিকে বশীভূত করেই এই সৃষ্টি করেন। আর কাদের সৃষ্টি করেন ? **'অবশং প্রকৃতের্বশাৎ'** অর্থাৎ সেই সব জীবকে সৃষ্টি করেন যারা প্রকৃতির বশে থাকেন। যারা প্রকৃতির বশে নয় তাদের সৃষ্টি হয় না। **'সর্গেঽপি নোপজায়ন্তে প্রলয়ে ন ব্যথন্তি চ'** (গীতা ১৪।২) তত্ত্বজ্ঞান লাভ হলে জীবের প্রকৃতির বশ্যতা থাকে না। তাই মহাপ্রলয়ের সময়ও তারা ব্যথিত হন না তথা সৃষ্টির সময়ও তাদের পুনর্জন্ম হয় না। আবার প্রকৃতিতে আসক্ত জীব সম্বন্ধে ভগবান বলেছেন— **'বিসৃজামি পুনঃ পুনঃ'** অর্থাৎ তাদের বারে বারে জন্মগ্রহণ করতে হয়। স্থাবর-জঙ্গম, স্থূল-সূক্ষ্ম, চুরাশী লক্ষ যোনির মধ্যে নানা কর্ম সম্পন্নকারী করে তাদের সৃষ্টি করেন।

ভগবান ও তাঁর প্রকৃতিকে পৃথকভাবে দেখলে দেখা যায়, জগতের উপাদান কারণ হল প্রকৃতি ও নিমিত্ত কারণ ভগবান। আবার ভগবান ও প্রকৃতিকে এক করে দেখলে দেখা যায় যে ভগবানই জগতের অভিন্ন এবং নিমিত্ত ও উপাদান কারণ। প্রকৃতি পরমাত্মার অধীনে থেকে সমস্ত জগৎ সৃষ্টি করে, আর জীব প্রকৃতির অধীন হয়ে জন্ম-মৃত্যু চক্রে ঘুরতে থাকে। পরমাত্মা স্বতন্ত্র এবং সর্বশক্তিমান হলেও তাঁর অংশ জীবাত্মা সুখলাভের ইচ্ছায় পরাধীন হয়ে পড়ে।

সৃষ্টি প্রক্রিয়া ভগবানের সংকল্প দ্বারা শুরু হলেও ভগবান নবম শ্লোকে বলছেন তিনি **'উদাসীনবদাসীনম্'** অর্থাৎ তিনি উদাসীনের মতো বিরাজ করেন। প্রাণীদের উৎপত্তিতে আনন্দিতও হন না আবার তারা প্রকৃতিতে লীন হলেও বিষণ্ণ হন না। তিনি এই সৃষ্টি কর্মে প্রেরণার কারণ হলেও **'ন চ মাং তানি কর্মাণি নিবধ্নন্তি ধনঞ্জয়'** অর্থাৎ এই কর্মকাণ্ডে আবদ্ধ হন না, কারণ তিনি **'অসক্তং তেষু কর্মসু'**। তাঁর কোনো কর্মে আসক্তি নেই, ফলাসক্তিও নেই বা কর্তৃত্ব ভাবও নেই।

এই বলে ভগবান প্রত্যেক মানুষকেই শিক্ষা দিচ্ছেন যে, তিনি যেমন কর্মে আসক্তি না থাকায় বদ্ধ হন না, সেইরূপ মানুষও যদি কর্মের প্রতি ফলাসক্তি না রাখে তাহলে তাদেরও দুঃখ পেতে হবে না এবং বারংবার জন্ম-মৃত্যুর চক্রে আবর্তিত হতে হবে না। কর্ম বা তার ফল স্থায়ী হয় না কিন্তু ফলাকাঙ্ক্ষার বন্ধন থেকে যায়। ভগবান এই প্রকরণে তাই বলেছেন, জীবাত্মা চেতন এবং তাঁরই অংশ, সে যেন অযথা প্রকৃতির দিকে ধাবমান না হয়। তিনি সপ্তম অধ্যায়ে পরা-অপরা প্রকৃতি এবং নবম অধ্যায়ে তাঁর লীলা কার্য বর্ণনা করেছেন যাতে সাধক তাঁর প্রেমে আকৃষ্ট হয়, প্রকৃতির প্রতি আকৃষ্ট না হয়।

ভক্তপ্রসঙ্গ বর্ণনায় পরবর্তী তিন প্রকরণে ভগবান তিন প্রকার মানুষের কথা বলেছেন—

১) নির্বুদ্ধি ব্যক্তি (ভগবদ্ বৈমুখ্যতা)—এই সব ব্যক্তি ভগবানকে মানে না, দেবতাদেরও মানে না—সবাইকে সাধারণ মানুষ ভাবে। তারা নিজেদের সবার ওপরে, সবার থেকে বড় বলে মনে করে। দৈবাসুরসম্পদবিভাগ-যোগে এই প্রকার মানুষের প্রকৃতি বর্ণনা করা হয়েছে—

অসৌ ময়া হতঃ শত্রুর্হনিষ্যে চাপরানপি।
ঈশ্বরোঽহমহং ভোগী সিদ্ধোঽহং বলবান্ সুখী॥
আঢ্যোঽভিজনবানস্মি কোঽন্যোঽস্তি সদৃশো ময়া।
যক্ষ্যে দাস্যামি মোদিষ্য ইত্যজ্ঞানবিমোহিতাঃ॥

(গীতা ১৬।১৪-১৫)

এই প্রকৃতির মানুষ মনে করে, 'আমি আজ এই শত্রুকে বধ করেছি, কালকে অন্যদের শেষ করব। আমি ঈশ্বর, আমি ঐশ্বর্যভোগকারী, আমি সর্বসিদ্ধি যুক্ত, আমি বলবান, আমিই সুখী।

আমি অত্যন্ত ধনী, আর বহু আত্মীয়-স্বজন বেষ্টিত, তাই আমার মতো আর কে আছে ? আমি যজ্ঞ করব, দান করব, আমোদ প্রমোদ করব ইত্যাদি—এরূপ নানা সুখ কল্পনায় তার বুদ্ধি অজ্ঞানাচ্ছন্ন থাকে।'

এই সব মানুষদের কথা প্রথম প্রকরণে বলা হয়েছে।

২) **স্বল্পবুদ্ধি ব্যক্তি** (দেবতার শরণগ্রহণকারী জীব)—এই সব মানুষ দেবতার শরণ গ্রহণ করে। এদের মধ্যেও আবার প্রকৃতিজাত গুণানুসারে উপাসনারও বিভিন্নতা থাকে। সপ্তদশ অধ্যায়ে সত্ত্ব, রজ, তমগুণ ভেদে বিভিন্ন দেবতার পূজার কথা বলা হয়েছে।

যজন্তে সাত্ত্বিকা দেবান্ যক্ষরক্ষাংসি রাজসাঃ।
প্রেতান্ ভূতগণাংশ্চান্যে যজন্তে তামসা জনাঃ॥

(গীতা ১৭।৪)

'সাত্ত্বিকভাবাপন্নরা দেবতাদের, রাজসিক ব্যক্তিরা যক্ষ-রাক্ষসদের এবং তামসিক ব্যক্তিরা ভূত-প্রেতের পূজা করে।' যেহেতু তারা উপাসকদের নিজের থেকে বড় বলে মনে করে তাই তাদের মধ্যে কিছুটা হলেও নম্রতা থাকে। এইসব ব্যক্তিদের কথা ভগবান দ্বিতীয় প্রকরণে বলেছেন।

৩) **বুদ্ধিমান ব্যক্তি**—বুদ্ধিমান ব্যক্তি ভগবানের শরণাগত হয়, তারা ভগবানকে সবার ওপরে মনে করে। গীতায় তাদের দুর্লভ বলা হয়েছে—**'বাসুদেবঃ সর্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্লভঃ'** (গীতা ৭।১৯)। এই প্রকার সাধকদের চিন্তায় ভগবদ্ভাবের প্রাধান্য থাকায় তাদের কাছে সমস্ত জগৎই চিন্ময়। তাদের দৃষ্টিতে জড়ত্ব থাকে না। ভগবানে তল্লীনতা থাকায় ভক্তদের নিজেদের শরীরও জড় থাকে না বরং চিন্ময় হয়ে যায়। **'যদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধিং ভবতি তাদৃশী।'** আর এই সাধকদের সম্বন্ধে ভগবান আরো বলেছেন—**'তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্'** (গীতা ৯।২২) চিন্ময়ত্ব প্রাপ্ত নিত্যযুক্ত সেইসব ভক্তর **'যোগক্ষেম'** অর্থাৎ অপ্রাপ্ত

বস্তুর প্রাপ্তি ও প্রাপ্ত বস্তুর রক্ষার দায়িত্ব[১] আমিই বহন করি। এই সব ভক্তের কথা ভগবান অন্য প্রকরণে বলেছেন।

নির্বুদ্ধি জীব (মায়াবদ্ধ জীব— ভগবদ্-বৈমুখ্য) — (সপ্তম ১৩-১৫, নবম ৩, ১১-১২)

আগের প্রকরণে সাধকদের তাঁর দিকে আকৃষ্ট করার জন্য এবং চেতনার উন্মেষ কল্পে ভগবান জগৎ সৃষ্টি ও তার রহস্য বর্ণনা করেছেন। আর এই প্রকরণে প্রকৃতিতে আকৃষ্ট জীবের কথা, যাদের মধ্যে ভগবৎ-বৈমুখ্যতাই প্রধান তাদের কথা বলেছেন।

ত্রিভির্গুণময়ৈর্ভাবৈরেভিঃ সর্বমিদং জগৎ।
মোহিতং নাভিজানাতি মামেভ্যঃ পরমব্যয়ম্ ॥
দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে॥
ন মাং দুষ্কৃতিনো মূঢ়াঃ প্রপদ্যন্তে নরাধমাঃ।
মায়য়াপহৃতজ্ঞানা আসুরং ভাবমাশ্রিতাঃ॥

(গীতা ৭।১৩-১৫)

অশ্রদ্দধানাঃ পুরুষা ধর্মস্যাস্য পরন্তপ।
অপ্রাপ্য মাং নিবর্তন্তে মৃত্যুসংসারবর্ত্মনি॥

(গীতা ৯।৩)

অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্।
পরং ভাবমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্॥
মোঘাশা মোঘকর্মাণো মোঘজ্ঞানা বিচেতসঃ।
রাক্ষসীমাসুরীঞ্চৈব প্রকৃতিং মোহিনীং শ্রিতাঃ॥

(গীতা ৯।১১-১২)

---

[১]এখানে অপ্রাপ্ত বস্তুর প্রাপ্তি ও প্রাপ্ত বস্তুর রক্ষার তাৎপর্য হল—সাধকের পক্ষে যে সাধন পথের প্রয়োজন তা তার সম্মুখে উন্মোচিত করি এবং সাধন পথে তার যেটুকু অগ্রগতি হয়েছে তা রক্ষা করি। জাগতিক বস্তুর প্রাপ্তি ও রক্ষা করা তো নগণ্য ব্যাপার!

'এই তিন গুণরূপ ভাবের দ্বারা মোহিত হয়ে তারা গুণাতীত, অবিনাশী ঈশ্বররূপে আমাকে জানতে পারে না।

কারণ আমার এই গুণময়ী দৈবী মায়া 'দুরত্যয়া' অর্থাৎ পার হওয়া অত্যন্ত কঠিন। যাঁরা শুধুমাত্র আমার শরণাগত হয় তারাই এই মায়া অতিক্রম করতে পারে।

যাদের জ্ঞান মায়াদ্বারা আবৃত, যারা আসুরীভাবের আশ্রয়গ্রহণকারী, মনুষ্যদেরও অধম ও পাপাচরণকারী মূঢ় তারাই আমার আশ্রয় গ্রহণ করে না। (গীতা ৭।১৩-১৫)।

ধর্মের মহিমার প্রতি শ্রদ্ধাহীন এইরূপ ব্যক্তিরা আমাকে লাভ না করে বারংবার জন্ম-মৃত্যু বরণ করে। (গীতা ৯।৩)

তারা সর্বপ্রাণীর মহেশ্বর আমার স্বরূপ না জেনে আমাকে মনুষ্যদেহধারী ভেবে অবজ্ঞা করে।

এই সকল বিবেকহীন ব্যক্তিরা আসুরী (দেহ সর্বস্ব), রাক্ষসী (হিংসক) এবং মোহিনী (বুদ্ধিভ্রংশকারী) প্রকৃতির আশ্রয়গ্রহণকারীদের আশা, কর্ম ও জ্ঞান সবই ব্যর্থ অর্থাৎ তা কখনোই শুভ ফল প্রদান করে না।' (গীতা ৯।১১-১২)

জীবের নির্বুদ্ধিভাব আসে মোহ থেকে। ত্রিগুণের কার্যরূপ এই শরীরকে যদি নিজের বলে মনে করা হয় অথবা নিজেকে শরীর বলে মনে করা হয় তাহলেই মোহবোধ জাগে। নিজেকে শরীর বলে মনে করলে অহংবোধ ও শরীরকে নিজের বলে মনে করলে মমত্ববোধ জন্মায়। শরীরের সঙ্গে অহং-মমত্ব বোধই হল মোহ। এই মোহ আসে কোথা থেকে ? সনাতন গোস্বামী মহারাজ চৈতন্য মহাপ্রভুকে প্রশ্ন করছেন, 'কে আমি কেন মোরে জ্বারে তাপত্রয়' ? মহাপ্রভু বলছেন— জীবের ভগবৎবৈমুখ্যতাই এর মূল কারণ। এখন প্রশ্ন হল জীব আগে পরমাত্মাতে বিমুখ হয়েছিল না আগে সংসারের গুণাবলীতে মুগ্ধ (মোহগ্রস্ত) হয়েছিল ? দার্শনিকদের মত হল—পরমাত্মাতে বিমুখ হওয়া ও সংসারের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করা—এই দুইটিই হল অনাদি, এদের কোনো আদি নেই। এদের কে আগে কে পরে তাই সে প্রশ্ন অবান্তর।

সপ্তম অধ্যায়ের ত্রয়োদশ শ্লোকে ভগবান নিজেকে **'পরমব্যয়ম্'** বলেছেন অর্থাৎ তিনি অবিনাশী এবং গুণের অতীত তাই তিনি গুণগুলির সম্পর্ক রহিত, অতএব গুণের পরিবর্তনে তাঁর কোনো পরিবর্তন হয় না। আবার জীবাত্মাকে বলছেন **'মোহিতং সর্বমিদং জগৎ'** অর্থাৎ যার কোনো অস্তিত্ব নেই তাকে অস্তিত্ব ও গুরুত্ব প্রদান করে এবং সেগুলিতে সম্বন্ধ স্থাপন করে জীব জগৎ নামে অভিহিত হয়। মানুষ ভগবদ্ প্রদত্ত স্বাধীনতার অপব্যবহার করে নিজেই আবদ্ধ হয়, চেতনের যথাযথ ব্যবহার না করায় জড়রূপে পরিণত হয় ; শ্রেষ্ঠ পরা প্রকৃতিও নিকৃষ্ট অপরা প্রকৃতিতে পর্যবসিত হয়। জীব যখন জগতের উৎপত্তি ও বিনাশকে নিজের বিনাশ ও জগতের লাভ-ক্ষতিকে নিজের লাভ-ক্ষতি বলে মনে করে তখন সে জগতের সঙ্গে অভিন্ন হয়ে ওঠে। যেহেতু জীব এই ত্রিগুণাত্মক শরীর থেকে পৃথক এবং পরমাত্মা থেকে অভিন্ন তাই সংসারকে জানতে হলে সংসার থেকে পৃথক হতে হবে এবং পরমাত্মাকে জানতে হলে তাঁর থেকে অভিন্ন হতে হবে।

গুণের প্রতি জীবের যে স্বাভাবিক আকর্ষণ চতুর্দশ শ্লোকে তাকে ভগবান 'মায়া' বলে আরও বলছেন—**'মম মায়া দুরত্যয়া'** অর্থাৎ ইহা **'দুরতিক্রমণীয়'**। ভোগ ও সম্পদ সংগ্রহের ইচ্ছাসম্পন্ন মানুষ কখনো সুখী, কখনো দুঃখী, কখনো বোদ্ধা, কখনো বুদ্ধিহীন, কখনো বলবান, কখনো দুর্বল ভেবে জগতে আত্মস্থ হয়ে যায় এবং মায়া থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করতে পারে না, এর থেকে নিজেকে পৃথক ভাবতে পারে না। আসলে গুণময়ী মায়া তখনই 'দুরত্যয়া' (দুস্তর) হয় যখন জীব ভগবানকে ছেড়ে এই গুণগুলিকে পৃথক সত্ত্বা ও গুরুত্ব দেয়।

তাই ভগবান বলেছেন—**'মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে'**। যে মানুষেরা আমার শরণাগত হয় তারাই আমার এই মায়াকে অতিক্রম করতে পারে।

সেইজন্য মায়ার আশ্রয় নিতে নিষেধ করা হয়েছে। অর্থাৎ টাকা, পয়সা, জিনিসপত্র সবই থাক, কিন্তু এগুলিকে যেন নিজের আধার বলে মনে না করি, এদের আশ্রয় গ্রহণ না করি। এদের ব্যবহারের অধিকার

আমাদের আছে, কিন্তু এদের উপর অধিকার প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য যেন না থাকে। এদের প্রতি আধিপত্যের ইচ্ছাই হল এদের আশ্রিত হওয়া। আর আশ্রিত হলেই গুণের প্রভাব থেকে পৃথক হওয়া শক্ত হয়ে ওঠে—এটিই হল প্রকৃত 'দুরত্যয়া ভাব'। আর এই দুরত্যয়া ভাব থেকে মুক্তি পাবার উপায় জানিয়েছেন, **'মামেব যে প্রপদ্যন্তে'**—আমার শরণ গ্রহণ করো। ভগবানের স্বভাব প্রকৃতই উদার ও প্রেমপূর্ণ। তিনি যাকে যা কিছু প্রদান করেন তাকে সেটি জানতে দেন না যে সেগুলি ভগবান প্রদত্ত। অথচ মানুষ তাকেই নিজের বলে মনে করে অহংকার করে, এই হল মানুষের ভুল, তার মোহ। তবে ভগবানের শরণাগত ভক্ত হলেই তার এই মোহ দূর হয়, সে গুণময়ী মায়াকে অতিক্রম করতে পারে।

আর আসুরী সম্পদসম্পন্ন (অসু-প্রাণময়) অর্থাৎ যারা প্রাণ-পিণ্ডপোষণ পরায়ণ, সুখভোগ পরায়ণ তারা শরীরাদির মোহে আকৃষ্ট থাকায় গুণময়ী মায়াকে অতিক্রম করতে পারে না। তারা যদি ব্রহ্মলোক পর্যন্তও যায়, সেখান থেকেও (গুণময়ী মায়া ব্রহ্মলোক পর্যন্ত থাকায়) তাদের আবার জন্ম-মৃত্যু চক্রে ফিরে আসতে হয়। জীব জড়পদার্থের শরণাগত হলে জড়ত্ব এবং ভগবানের শরণাগত হলে চিন্ময়ত্ব লাভ করে ভক্ত হয়ে ওঠে। আবার যার মধ্যে বিবেকের প্রাধান্য আছে সেই জ্ঞানযোগী স্বয়ং অহং বা সংসারের আশ্রয় ত্যাগ করে ভগবানের আশ্রয় গ্রহণ করে, আর যার মধ্যে শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের প্রাধান্য আছে সেই ভক্তযোগী অহং সহকারেই (যেমন আছে তেমনি ভাবেই) ভগবানের আশ্রয় গ্রহণ করে। এইরূপ ভক্তদের অহং-কে স্বয়ং ভগবানই নাশ করেন।

পঞ্চদশ শ্লোকে তাদের কথা বলা হয়েছে যারা সংসারের মোহে আকৃষ্ট—যারা হৃতজ্ঞান আর তাদের ভগবান বলেছেন দুষ্কৃতি (পাপাচারী), মূঢ় ও নরাধম। দুষ্কৃতি তাদেরই বলা হয়েছে যারা বিনাশশীল ও পরিবর্তনশীল প্রাপ্ত পদার্থে 'মমত্ববোধ' ও অপ্রাপ্ত পদার্থে 'কামনা' করে। কামনা পূর্ণ হলে জাগে সংগ্রহ করার ইচ্ছা এবং তার ফলে জাগে লোভ আর কামনা পূরণে বাধাপ্রাপ্ত হলে জাগে ক্রোধ। এইভাবে তারা 'কামনার' বশবর্তী হয়ে

ব্যাভিচারী হয়ে শাস্ত্র-নিষিদ্ধ বিষয় উপভোগ করে, লোভের বশবর্তী মিথ্যা-কপটাচার-বিশ্বাসঘাতকতা-প্রবঞ্চনা আদি পাপকর্ম করে এবং ক্রোধের বশবর্তী ঈর্ষা-শত্রুতা ইত্যাদি হিংসামূলক কর্ম করে।

এখানে সুকৃতি দুষ্কৃতিকারী হওয়া কোনো ক্রিয়ানির্ভর নয়, এটি নির্ভর করে ভগবানের শরণাগত অথবা বিমুখ হওয়ার উপর। যারা ভগবানের শরণাগত তারা হল সুকৃতি আর ভগবানে যারা বিমুখ তারা দুষ্কৃতিকারী। জননী হলেন একটিমাত্র জন্মের জন্মদাত্রী আর প্রভু হলেন সকল জন্মের চিরস্থায়ী জননী। প্রাণী নামমাত্র তাঁর শরণাগত হলেই তিনি বিশেষভাবে দ্রবীভূত হন আর তাঁর কৃপায় দুরাচারীও শীঘ্রই অতি পবিত্র হয়ে ওঠে। আবার যারা শরণাগত নয় ভগবান তাদের বলেছেন— **'মায়য়াপহৃতজ্ঞানা'** অর্থাৎ মায়ার জন্য তাদের 'বিবেক-শক্তি' আচ্ছন্ন থাকে। তার ফলে ওই সব ব্যক্তি ভোগ-বিলাসে, সম্পদ-সংগ্রহে, শরীরকে সুন্দর করে তুলতে, গৃহকে সাজাতে, মান-সম্মান বাড়াতে ব্যাপৃত থাকে। তারা শরীরের সুখ-আরামের জন্য নতুন নতুন জিনিস আবিষ্কারে মগ্ন থাকে ও সেগুলিকেই গুরুত্ব দেয়। তাদের দৃষ্টি নিত্য-অব্যয় তত্ত্বর দিকে যায়ই না।

জীবের প্রকৃতি হল 'কৃষ্ণের নিত্যদাস'। কিন্তু যে এই নিয়ম লঙ্ঘন করে তার সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকার বলেছেন—

'কৃষ্ণ ভুলি যে জীব অনাদি বহির্মুখ।
তাহাকে সংসার জ্বালা দেয় নিত্য দুখ।'

ভগবান জীবের এই ভগবৎবৈমুখ্যতা নবম অধ্যায়ের 'রাজবিদ্যা-রাজগুহ্য'যোগেও বর্ণনা করেছেন। তৃতীয় শ্লোকে এইসব জীব—যারা নিত্যতত্ত্বকে অবহেলা করে বিনাশশীল পদার্থে আকৃষ্ট তাদের **'অশ্রদ্দধানাঃ'** বলেছেন। তাদের প্রাপ্তি হয় **'মৃত্যুসংসারবর্ত্মনি'** অর্থাৎ যেখানে যাবে সেখান থেকেই ফিরতে হবে, কোথাও স্থায়ীভাবে টিঁকে থাকতে পারবে না। এই সংসারে আছে কেবল মৃত্যু, বিনাশ আর অভাব। ভগবান দ্বাদশ অধ্যায়ে তাই এই সংসারকে **'মৃত্যুসংসারসাগরাৎ'** বলেছেন। অর্থাৎ এই জগৎ হল মৃত্যুর পারাবার, এখানে স্থির হয়ে থাকার কোনো উপায় নেই।

ভগবান মনুষ্যদেহ দিয়েছেন কেবল ঈশ্বর লাভের জন্য। কিন্তু মানুষ জন্ম-মৃত্যু চক্র হতে মুক্ত হওয়ার পূর্ণ স্বাধীনতা পাওয়া সত্ত্বেও তার অপব্যবহার করে পুনঃ পুনঃ জন্ম-মৃত্যু চক্রে আবর্তিত হতে থাকে। এই জন্ম-মৃত্যু চক্র থেকে মুক্ত হওয়ার সুযোগ জীবের বারেবারে আসে না কেবল মনুষ্য জন্মেই তা সম্ভবপর। মনুষ্যদেহ পেয়েও জীব তা অপব্যবহার করলে কবে আবার সে সুযোগ আসবে কে জানে ?

এক শহর ছিল যার চারিদিক উচ্চ পাঁচিল দিয়ে ঘেরা আর প্রবেশ-নির্গমনের একটি মাত্র দরজা ছিল। এক অন্ধ শহর থেকে বাইরে বেরোতে চাইছিল। তার এক হাতে ছিল লাঠি আর অন্য হাত দিয়ে সে পাঁচিলের দরজা খুঁজছিল। চলতে চলতে বাইরে যাওয়ার দরজাটি যেমন এল তার মাথায় চুলকানি হল আর সে দরজা পেরিয়ে গেল। আবার প্রাচীরের গায়ে হাত রেখে সে চলতে লাগল। এইভাবে চলতে চলতে যখনই দরজা আসার সময় হয় সে চুলকাতে শুরু করে আর দরজা পেরিয়ে যায়। ফলে সে শহরের মধ্যে ঘুরতেই থাকে বেরোতে আর পারলই না। জীবও এইভাবে চুরাশী লক্ষ যোনি ভ্রমণ করতে করতে উদ্ধারের দ্বাররূপী মনুষ্য জন্ম প্রাপ্ত হয়, তখনই তার সুপ্ত কামনা-বাসনাগুলি চুলকানি রূপে জেগে ওঠে আর সে পরমাত্মার শরণ না নিয়ে সাংসারিক সংগ্রহে ও সুখ আস্বাদনে ব্যাপৃত হয়ে ওঠে। এইভাবেই সাংসারিক ভোগের মধ্যেই কামনা-বাসনা সহ তার মৃত্যু হয়। আর সে স্বর্গ-নরকাদি ও অন্যান্য যোনিগুলোর চক্রে আবর্তিত হতে থাকে।

মানুষের মধ্যে একথা দৃঢ়ভাবে গেঁথে রয়েছে যে আমরা সংসারী মানুষ, আমাদের জন্মাতে, মরতে এবং এখানেই থাকতে হবে ইত্যাদি। একথা কিন্তু একেবারেই ভুল। আমরা সকলেই পরমাত্মার অংশ, তাঁর স্বজাতীয়, তাঁর সাথী এবং পরমাত্মার ধামেরই বাসিন্দা। সংসারে আসা ও দিশেহারা হয়ে ঘুরে বেড়ানো আমাদের উদ্দেশ্য নয়। এই দেশ, গ্রাম, আত্মীয়-স্বজন, অর্থ-সম্পদ শরীর ইত্যাদি কিছুই আমাদের নয় এবং আমরাও এগুলির নই। এসবই অপরা প্রকৃতি আর আমরা সকলেই পরা প্রকৃতি। ভ্রমবশতঃ আমরা নিজেদের এখানকার নিবাসী বলে মনে করি। এটি দূর করাই হল সাধনা।

জীব স্বয়ং পরমাত্মার অংশ আর পরমাত্মাই হল জীবের প্রকৃত গৃহ। জীব যখন পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হয় তখনই সে তার প্রকৃত স্থান প্রাপ্ত হয়। মুনি-ঋষিরা তাই বলেছেন **'বিশ্রামঃ স্থানম্ একম্'** অর্থাৎ ওই একটি জায়গায় গেলেই ভ্রমণ নিবৃত্তি হয়, আর ফিরে আসতে হয় না। গীতা তাই পুনঃপুনঃ এই কথাই বলেছেন। শ্রুতিও তা মনে করে দিয়েছেন—**'ন চ পুনরাবর্ততে ন চ পুনরাবর্ততে'** (ছান্দোগ্য উপনিষদ্ ৪।১৫।১)। গীতাও বারবার বলেছেন **'গচ্ছন্ত্যপুনরাবৃত্তিম্'** (গীতা ৫।১৭), **'যং প্রাপ্য ন নিবর্তন্তে'** (গীতা ৮।২১), **'যস্মিন্ গতা ন নিবর্তন্তি ভূয়ঃ'** (গীতা ১৫।৪), **'যদ্গত্বা ন নিবর্তন্তে'** (গীতা ১৫।৬)।

নবম অধ্যায়ে ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শ্লোকে ভগবান তাঁর শক্তি, তাঁর বৈভব যে সংসার অনাসক্তদের ওপর কোনো প্রভাব ফেলে না সেই বিষয়ে বলেছেন। তাঁর অধ্যক্ষতায় (নির্দেশে), প্রকৃতি এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করে আবার অন্তে তাঁতেই লীন হয়। তাঁরই সত্ত্বা-স্ফূর্তির দ্বারা জগতের সবকিছু সংঘটিত হয়, তিনিই কৃপা করে তাঁকে লাভ করার জন্যই জীবকে মনুষ্যদেহ দিয়েছেন। এর আগে একাদশ-দ্বাদশ শ্লোকে ভগবান মূঢ় জীবদের সম্বন্ধে বলেছেন যারা অজ্ঞানতাবশত তাঁকে **'মানুষীং তনুমাশ্রিতম্'** অর্থাৎ সাধারণ মানুষ বলে মনে করে। ভগবান কিন্তু দেহাশ্রিত নন। তারাই দেহাশ্রিত হয়, যাদের পূর্বকৃত কর্ম অনুসারে এবং কর্মফল ভোগের জন্য দেহধারণ করতে হয়। কিন্তু ভগবানের মানব বা অন্যান্য দেহধারণ কর্মজনিত নয় তিনি স্ব-ইচ্ছায় প্রকট হন। ভাগবতে বলা হয়েছে—

যৎপাদপঙ্কজপরাগনিষেবতৃপ্তা যোগপ্রভাববিধুতাখিলকর্মবন্ধাঃ।
স্বৈরং চরন্তি মুনয়োঽপি ন নহ্যমানাস্তস্যেচ্ছয়াঽঽত্তবপুষঃ কুত এব বন্ধঃ॥

(ভাগবত ১০।৩৩।৩৫)

স্বাধীনভাবেই তিনি মৎস, কূর্ম, বরাহ, বামনাদি অবতার গ্রহণ করেন। তাঁর কর্মবন্ধনও নেই, তিনি দেহাশ্রিতও হন না। দেহ অর্থাৎ প্রকৃতিই তাঁকে আশ্রয় করে—**'প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবামি আত্মমায়য়া'** (গীতা ৪।৬) অর্থাৎ তিনিই প্রকৃতিকে অধিকৃত করে প্রকটিত হন, প্রকৃতি তাঁর

নির্দেশানুসারে কাজ করে।

ভগবান বিবেকহীন সংসারাসক্ত ব্যক্তিদের অভিহিত করেছেন আসুরী, রাক্ষসী ও মোহিনী হিসেবে। তাদের সমস্ত আশা, সমস্ত শুভ কর্ম ও জ্ঞান ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয় অর্থাৎ তা শুভ-ফল প্রদান করে না। এই আসুরী ব্যক্তিদের সম্বন্ধে বলা হয়েছে, তারা নিজ স্বার্থ-সিদ্ধিতে, নিজ কামনা পূরণে, নিজের প্রাণের পোষণেই সদা ব্যস্ত থাকে, তাতে অপরের যত ক্ষতিই হোক বা অপরে যত দুঃখই পাক না, তারা পরোয়া করে না। আসুরীভাবসম্পন্ন লোকেরা হল কামনাপ্রধান।

রাক্ষসীভাবসম্পন্ন লোক হল যারা নিজ স্বার্থসিদ্ধির জন্য, নিজ কামনা পূরণে কোনো প্রতিবন্ধকতা এলেই ক্রোধান্বিত হয় এবং উদ্দেশ্য সাধনের জন্য অন্যের ক্ষতি করে, সর্বনাশ করে বা হত্যাও করে। রাক্ষসী ভাবাপন্ন লোকেরা হল ক্রোধপ্রধান।

মোহিনী স্বভাববিশিষ্ট লোকেদের স্বভাব নিজেদের কোনো লৌকিক বা পারলৌকিক উদ্দেশ্য বা শত্রুতা ব্যতীতই অন্যের ক্ষতি করা। যেমন পাখিকে গুলি করে মারা বা ঘুমন্ত কুকুরকে লাঠি দিয়ে খুঁচিয়ে আনন্দিত হওয়া। মোহিনীভাবাপন্ন লোকেদের মধ্যে মোহভাবের (মূঢ়তা) প্রাধান্য থাকে।

গীতার ষোড়শ অধ্যায়ে **'দৈবাসুরসম্পদবিভাগযোগে'** এই তিন প্রকার ভাবসম্পন্ন লোকের কথা বিশদরূপে বলা হয়েছে। এরা যে সুখের আশায় পাপ কর্ম করে তাতো ফলবতী হয়ই না, উল্টে এদের চুরাশী লক্ষ যোনি ও নরকাদি প্রাপ্ত হতে হয়—**'গতাগতং কামকামা লভন্তে'** (গীতা ৯।২১)।

স্বল্পবুদ্ধি জীব (অন্য দেবতাদের পূজক)—(শ্লোক সপ্তম ২০-২৭, নবম ২০-২১, ২৩-২৫)

কামৈস্তৈস্তৈর্হৃতজ্ঞানাঃ প্রপদ্যন্তেঽন্যদেবতাঃ।
তং তং নিয়মমাস্থায় প্রকৃত্যা নিয়তাঃ স্বয়া॥
যো যো যাং যাং তনুং ভক্তঃ শ্রদ্ধয়ার্চিতুমিচ্ছতি।
তস্য তস্যাচলাং শ্রদ্ধাং তামেব বিদধাম্যহম্॥

স তয়া শ্রদ্ধয়া যুক্তস্তস্যারাধনমীহতে।
লভতে চ ততঃ কামান্ ময়ৈব বিহিতান্ হি তান্॥
অন্তবত্তু ফলং তেষাং তদ্ভবত্যল্পমেধসাম্।
দেবান্ দেবযজো যান্তি মদ্ভক্তা যান্তি মামপি॥
অব্যক্তং ব্যক্তিমাপন্নং মন্যন্তে মামবুদ্ধয়ঃ।
পরং ভাবমজানন্তো মমাব্যয়মনুত্তমম্॥
নাহং প্রকাশঃ সর্বস্য যোগমায়াসমাবৃতঃ।
মূঢ়োঽয়ং নাভিজানাতি লোকো মামজমব্যয়ম্॥
বেদাহং সমতীতানি বর্তমানানি চার্জুন।
ভবিষ্যাণি চ ভূতানি মাং তু বেদ ন কশ্চন॥
ইচ্ছাদ্বেষসমুত্থেন দ্বন্দ্বমোহেন ভারত।
সর্বভূতানি সম্মোহং সর্গে যান্তি পরন্তপ॥

(গীতা ৭।২০-২৭)

ত্রৈবিদ্যা মাং সোমপাঃ পূতপাপা
যজ্ঞৈরিষ্ট্বা স্বর্গতিং প্রার্থয়ন্তে।
তে পুণ্যমাসাদ্য সুরেন্দ্রলোক-
মশ্নন্তি দিব্যান্ দিবি দেবভোগান্॥
তে তং ভুক্ত্বা স্বর্গলোকং বিশালং
ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্যলোকং বিশন্তি।
এবং ত্রয়ীধর্মমনুপ্রপন্না
গতাগতং কামকামা লভন্তে॥

(গীতা ৯।২০-২১)

যেঽপ্যন্যদেবতা ভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।
তেঽপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্বকম্॥
অহং হি সর্বযজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ।
ন তু মামভিজানন্তি তত্ত্বেনাতশ্চ্যবন্তি তে॥

যান্তি দেবব্রতা দেবান্ পিতৃন্ যান্তি পিতৃব্রতাঃ।
ভূতানি যান্তি ভূতেজ্যা যান্তি মদ্‌যাজিনোঽপি মাম্॥

(গীতা ৯।২৩-২৫)

'কামনার দ্বারা যাদের বিবেক অপহৃত হয়েছে তারা নিজ নিজ প্রকৃতির অর্থাৎ স্বভাবের বশীভূত হয়ে অন্য দেবতাদের শরণাগত হয় এবং তাদের আরাধনার নিয়মগুলি পালন করে থাকে।

আমি কিন্তু যে যে ভক্ত যে যে দেবতার পূজা করতে ইচ্ছুক, সেই সেই দেবতার প্রতি তার ভক্তি অচলা করে দিই।

আমার দ্বারা দৃঢ়ীকৃত শ্রদ্ধাযুক্ত হয়ে সে সকাম ভাবে সেই দেবতারই উপাসনা করে এবং তার কামনার পূরণও হয়। সেই কামনা-পূরণ কিন্তু আমার দ্বারা বিহিত হয়েই হয়ে থাকে।

এই অল্পবুদ্ধি মানুষদের ওইসকল দেবতাদের আরাধনার ফল বিনাশশীলই হয়ে থাকে। দেবতাদের যাঁরা পূজা করেন তাঁরা দেবতাদের আর আমাকে যাঁরা পূজা করেন তাঁরা আমাকেই লাভ করেন।

এই অল্পবুদ্ধি ব্যক্তিগণ আমার সর্বোৎকৃষ্ট পরমভাব না জেনে, মন-ইন্দ্রিয়াদির অতীত (অব্যক্ত) আমাকে অর্থাৎ সচ্চিদানন্দময় পরমাত্মাকে মানুষের ন্যায় শরীরধারণকারী বলে মনে করে থাকে।

আর এই সব মূঢ়ব্যক্তি যারা আমাকে নিত্য ও অবিনাশীরূপে জানে না (বা মানে না) তাদের সামনে আমি যোগমায়া দ্বারা সমাবৃত থেকে প্রকাশিত হই না।

যারা অতীতে হয়েছে, বর্তমানে হচ্ছে বা ভবিষ্যতে হবে সেই সকল প্রাণীকে আমি জানি। কিন্তু আমাকে (ভক্ত ব্যতীত) কেউই জানে না।

ইচ্ছা অর্থাৎ আকাঙ্ক্ষা এবং দ্বেষ দ্বারা উৎপন্ন দ্বন্দ্ব ও মোহে মোহিত হয়ে প্রাণীগণ অনাদি কাল থেকে জগতে হৃতজ্ঞান হওয়ায় জন্ম-মৃত্যু প্রাপ্ত হতে থাকে।' (গীতা ৭।২০-২৭)

তিন বেদে কথিত সকাম অনুষ্ঠানকারী এবং সোমরস পানকারী যে সব নিষ্পাপ ব্যক্তিগণ যজ্ঞ দ্বারা ইন্দ্ররূপে আমাকে পূজা করে স্বর্গপ্রাপ্তি কামনা

করেন, তাঁরা পুণ্যফল স্বরূপ ইন্দ্রলোক লাভ করেন এবং দেবগণের দিব্যভোগসমূহ উপভোগ করে থাকেন।

তাঁরা সেই বিশাল স্বর্গসুখ ভোগ করে পুণ্যক্ষয় হলে মৃত্যুলোকে ফিরে আসেন। এইভাবে তিনবেদে কথিত সকাম ধর্মের আশ্রয় গ্রহণকারীগণ কামনা পরবশ হয়ে বারংবার জন্ম-মৃত্যু প্রাপ্ত হন।' (গীতা ৯।২০-২১)

'আসলে যে কোনো মানুষ বা ভক্ত শ্রদ্ধাযুক্ত হয়ে অন্য দেবতাদের পূজা করলেও প্রকৃতপক্ষে তিনি আমারই পূজা করেন কিন্তু তা হয় অবিধিপূর্বক অর্থাৎ তারা দেবতাগণকে আমার থেকে পৃথক মনে করে।

কারণ আমি সমস্ত যজ্ঞের ভোক্তা ও প্রভু। যারা তত্ত্বগতভাবে আমাকে জানে না তাদেরই পতন হয়।

যারা সকামভাবে দেবতাদের পূজা করে তারা দেবলোক, পিতৃগণের পূজনকারী পিতৃলোক, ভূত-প্রেতাদির পূজনকারী ভূত-প্রেতলোক প্রাপ্ত হয়। কিন্তু যারা আমার পূজা করে তারাই আমাকে প্রাপ্ত হয়।' (গীতা ৯।২৩-২৫)

এই অল্পবুদ্ধি লোকেদের বর্ণনা প্রসঙ্গে ভগবান বলেছেন—(১) তারা কেন অন্য দেবতাদের পূজা করে, (২) জন্মমৃত্যুর কারণ, (৩) তাদের শ্রদ্ধা অনুসারে অন্য দেবতার পূজা করলে ভগবানের কী প্রতিক্রিয়া হয়, (৪) এই ভাব নিয়ে পূজা করার ফলই বা কী ?

স্বল্পবুদ্ধিভাবাপন্নদের অন্য দেবতাদের পূজার কারণ—(৭।২০, ২৪ ও ৯।২৩, ২৪

প্রথম কারণ কামনা, তারপর ভগবানকে না বোঝা এবং ইচ্ছা-দ্বেষপূর্বক দ্বন্দ্বভাব।

অন্য দেবতাদের পূজা করার প্রথম কারণ হল **'কামৈস্তৈস্তৈর্হৃতজ্ঞানাঃ'** অর্থাৎ এরূপ মানুষদের ইহলোক এবং পরলোকের ভোগকামনা দ্বারা জ্ঞান আবৃত থাকে এবং তারা পরমাত্মা প্রাপ্তির দিকে আকৃষ্ট না হয়ে নিজ নিজ কামনা পূর্তিতে ব্যাপৃত থাকে। ইহ-জগতের কামনার অন্তর্গত হল ইচ্ছামতো ভোগসুখ, যেমন ইচ্ছা ও যত ইচ্ছা অর্থব্যয়, সুখ ও আরামে কাটানোর জন্য ধন সংগ্রহের কামনা ইত্যাদি এবং পুণ্য সংগ্রহের কামনার মধ্যে পড়ে

আমাকে পুণ্যাত্মা বলা হোক এবং পরলোকেও যেন আমার ভোগসুখ প্রাপ্তি হয় ইত্যাদি এবং এ সবের দ্বারা জ্ঞান আবৃত থাকে। আগের প্রকরণে 'ভগবৎ বিমুখ' জীবকে হৃতজ্ঞান বলা হয়েছে কিন্তু তা হল **'মায়য়াপহৃতজ্ঞানা'** (গীতা ৭।১৫) অর্থাৎ তমোগুণের প্রাধান্য ও রজোগুণের গৌণত্ব আর এখানে বলছেন **'কামৈস্তৈস্তৈর্হৃতজ্ঞানাঃ'** অর্থাৎ এ হল রজপ্রধান। **'মায়য়পহৃতজ্ঞানা'** জড় পদার্থের প্রাধান্যের জন্য আসুরীভাব, মিথ্যাচার, কপটতা, বিশ্বাসঘাতকতা আদির আশ্রয়স্থান এবং **'কামৈস্তৈস্তৈর্হৃতজ্ঞানাঃ'** হল কামনা পূর্তির জন্য দেবতাদের আশ্রয়স্থান। প্রথমোক্ত ব্যক্তিগণের জীবনে জড় ভাব অত্যাধিক থাকায় তারা দুষ্ট স্বভাবের জন্য নরকে গমন করে, আর দ্বিতীয় প্রকার ব্যক্তিগণের মধ্যে চৈতন্যভাব সামান্য অধিক থাকায় তারা কামনাবশত বারংবার জন্মগ্রহণ করে।

এখানে তাদেরই **'হৃতজ্ঞানা'** বলা হয়েছে অর্থাৎ তাদের জ্ঞান নষ্ট হয়নি বরং সুখের কামনার জন্য জ্ঞান কেবল আবৃত হয়েছে। এই কামনা প্রকৃতি সৃষ্টও নয় আর পরমাত্মা সৃষ্টও নয় এটা মনুষ্য সৃষ্ট। তাই এটি দূর করার দায়িত্বও মানুষেরই। তা মানুষ এটি পরিবর্তন করতে পারে না কেন ? ভগবান বলছেন— **'প্রকৃত্যা নিয়তাঃ স্বয়া'** অর্থাৎ কামনায় বিবেক আচ্ছাদিত হলে মানুষ নিজ প্রকৃতির দ্বারা অর্থাৎ স্বভাব বশীভূত হয়ে কর্ম করে। কারণ **'স্বভাবো মূর্ধ্নি বর্ততে'** ব্যক্তিগত স্বভাব সকলের মধ্যে প্রধান হয়। আর এই বিবিধ কামনা পূর্তির জন্য মানুষ **'তং তং নিয়মমাস্থায় প্রপদন্তেহন্যদেবতাঃ'** মানে, নানা দেবতাকে নানা ভাবে পূজা করে তাঁদের তুষ্ট করার বিধান বার করে। যেমন কোন্ দেবতাকে যজ্ঞ করলে কামনা পূরণ হবে, কার জন্য তপস্যা করতে হবে, কার জন্য দান করতে হবে আর কে বা কোন্ মন্ত্রে তুষ্ট হবে ইত্যাদি। দেবতাদের শরণ নেওয়ার দুটি কারণ প্রধান—এক কামনা আর অপর স্বভাবের বশ্যতা। কামনার বশ্যতা থাকলে মানুষ স্বভাবের বশ অবশ্যই হবে।

গীতার সপ্তম অধ্যায়ের ষোড়শ শ্লোকে ভগবান আগেই চার প্রকার ভজনকারী ভক্তর কথা বলেছেন যার মধ্যে 'আর্ত' ও 'অর্থার্থী' ভক্তর

মধ্যেও কামনা থাকে কিন্তু তাদের কামনার প্রাধান্য থাকে না, ভগবানেরই প্রাধান্য থাকে তাই তাঁরা 'হৃতজ্ঞানাঃ' নন। অপরপক্ষে এইস্থানে বর্ণিত মানুষের মধ্যে কামনার প্রাধান্য থাকে তাই তারা 'হৃতজ্ঞানাঃ'। অর্থার্থী ও আর্ত ভক্ত শুধুমাত্র ভগবানেরই শরণাগত হন কিন্তু এইসব ব্যক্তি ভগবানকে ছেড়ে অন্য দেবতার শরণ নেয়। কামনা যদি বিভিন্ন প্রকারেরও হয় কিন্তু যদি উপাস্য দেবতা একমাত্র পরমাত্মাই হন তবে উপাস্যদেবই তাঁকে উদ্ধার করেন। কিন্তু বিভিন্ন কামনায় বিভিন্ন উপাস্য দেবতা থাকে তবে কেই বা উদ্ধার করবে। একমাত্র ভগবান ব্যতীত অন্য কোনো কিছুই নেই—এই হল 'জ্ঞান' আর সুখের কামনায় এই জ্ঞান আবৃত হয়ে যায় তা মানুষেরই সৃষ্টি। তাই এই নির্বুদ্ধিতা দূর করার দায়িত্বও মানুষেরই।

ভগবান সপ্তম অধ্যায়ের চব্বিশতম শ্লোকে এই সব মানুষকে **'অবুদ্ধয়ঃ'** বলেছেন। এর অর্থ এই নয় যে তাদের বুদ্ধির অভাব রয়েছে প্রত্যুত তাদের বুদ্ধিতে বিবেকবোধ থাকা সত্ত্বেও এবং জগৎকে উৎপত্তি ও বিনাশশীল জেনেও তারা এটা মানে না—এটাই তাদের নির্বুদ্ধিতা বা মূঢ়তা। চতুর্থ অধ্যায়ে ষষ্ঠ শ্লোকে ভগবান নিজের সম্বন্ধে বলেছেন—**'অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোঽপি সন্'** আমি অজ (জন্মরহিত) হয়েও প্রকট হই, অবিনাশী হয়েও বিনাশপ্রাপ্ত হই আবার সকলের ঈশ্বর হয়েও আদেশ পালনকারী (পুত্র বা শিষ্য) হয়ে থাকি। আমি নিরাকার হয়েও সাকার এবং সাকার হয়েও নিরাকার।

ভগবানের এই স্বরূপ না জানায় লোকে তাঁকে মানুষী-শরীর বলে কল্পনা করে থাকে। ভগবান এই প্রকরণেও বলছেন যে অল্পবুদ্ধি লোকেরা তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব (পরমভাব), অবিনাশীত্ব (অব্যয়ম্) ও পরম হিতাকাঙ্ক্ষী ভাব (অনুত্তমম্) জানতে পারে না।

জীবের বারংবার জন্ম-মৃত্যুর কারণ—(শ্লোক ৭।২৭)

ভগবান বলেছেন **'ইচ্ছাদ্বেষসমুত্থেন'** অর্থাৎ ইচ্ছা ও দ্বেষ থেকে উৎপন্ন দ্বন্দ্ব ও মোহদ্বারা মোহিত প্রাণীগণ ভগবান-বিমুখ হওয়ায় জন্ম-মৃত্যুরূপ সংসারে আবদ্ধ থাকে। মনুষ্যজীবন বিবেক প্রধান, তাই মানুষের

প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি পশুদের মতো না হয়ে তাদের বিবেক অনুযায়ী হওয়া উচিত। কিন্তু মানুষ যখন তার বিবেককে প্রাধান্য না দিয়ে, রাগ-দ্বেষ দ্বারা পরিচালিত হয়ে প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তিকে প্রাধান্য দেয় তখন তার পতন হয়।

প্রাপ্ত পরিস্থিতির সদ্ব্যবহার করলে সম্মোহ অর্থাৎ জন্ম-মৃত্যু চক্র দূর হয়। সদ্ব্যবহার কীভাবে হয় ? যে অবস্থা বা পরিস্থিতি প্রাপ্ত হয়েছে সেগুলিকে অপব্যবহার না করে শাস্ত্র বা লোকমর্যাদা অনুযায়ী পালন করলে অহং-অভিমানও হয় না আর ফলেচ্ছাও থাকে না ফলে মুক্তি স্বতঃসিদ্ধ হয়।

সাধকদের মধ্যে এই ভাবটি প্রায়শই গভীরভাবে থাকে যে, সাধন-ভজন, জপ-ধ্যান ইত্যাদির বিভাগ পৃথক এবং সাংসারিক কাজকর্ম করার ভাগ পৃথক। এই কারণে তাঁরা সাধন-ভজন-ধ্যান ইত্যাদি বাড়িয়ে দেন কিন্তু সাংসারিক কাজকর্মে রাগ-দ্বেষ, কাম-ক্রোধ ইত্যাদি নিবৃত্তির দিকে বিশেষ নজর দেন না। এর ফলে চরম ক্ষতি এই হয় যে সাধকের রাগ-দ্বেষ দূর হয় না, ফলে তাঁর সাধনে শীঘ্র উন্নতি দেখা যায় না।

প্রকৃতপক্ষে সাধক পারমার্থিক কাজই করুন বা সাংসারিক কাজ করুন, তাঁর চিত্তে রাগ-দ্বেষ থাকা উচিত নয়। পারমার্থিক ও সাংসারিক ক্রিয়াদিতে পার্থক্য থাকলেও সাধকের মনোভাবে পার্থক্য থাকা উচিত নয়। ভাবের পার্থক্য না থাকলে অর্থাৎ সকল ক্রিয়াতেই একমাত্র ভগবদ্প্রাপ্তির ভাব (উদ্দেশ্য) থাকলে পারমার্থিক ও সাংসারিক দুটি ক্রিয়াই সাধনরূপে পরিণত হয়।

কোনো দেশ, কাল, বস্তু, ব্যক্তি, পরিস্থিতি ইত্যাদিকে নিজের সুখ-দুঃখের কারণ বলে মনে করলে রাগ-দ্বেষ উৎপন্ন হয়। এই রাগ-দ্বেষ দূর হলে মানুষ অনায়াসে সংসার-বন্ধন থেকে মুক্ত হয়—**‘নির্দ্বন্দ্বো হি মহাবাহো সুখং বন্ধাৎ প্রমুচ্যতে’** (গীতা ৫।৩)।

নবম অধ্যায়ের তেইশতম ও চব্বিশতম শ্লোকেও ভগবান অন্য দেবতার উপাসনার কথা বলেছেন। দেবতাদের আরাধনাকারী এইসব ভক্ত ‘আমিই সব’ (**সদসচ্চাহম্** গীতা ৯।১৯) এই কথা বুঝতে পারে না। এই দেবতাদের কৃপাতেই সব লাভ হবে এই ভেবে সর্বদা ওই দেবতাদের সেবা-পূজাতে

ব্যাপৃত থাকে। কিন্তু ভগবান বলছেন—'**তেঽপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্বকম্**' অর্থাৎ অন্য দেবতাদের যাঁরা পূজা করে প্রকৃতপক্ষে তারা আমারই পূজা করেন, কারণ তত্ত্বত আমি ছাড়া কিছুই নেই। আমি ভিন্ন এই দেবতাদের কোনো পৃথক অস্তিত্বই নেই, এরা আমারই স্বরূপ। দেবতাদের যে পূজা করা হয় তা আমারই পূজা, কিন্তু এটা বিধিবহির্ভূত। এর অর্থ অবশ্য এই নয় যে পূজার সামগ্রী পূজার মন্ত্র ইত্যাদি অবিধিপূর্বক, এর অর্থ হল—ওই সব দেবতাকে আমার থেকে পৃথক করে দেখাই হল 'অবিধিপূর্বক' আসলে ভগবানই সব। অতএব যাঁরই উপাসনা করা হয়, সেবা করা হয়, বা কিছু মঙ্গল কাজ করা হয় তাতে প্রকারান্তরে ভগবানেরই উপাসনা করা হয়। **আকাশাৎ পতিতং তোয়ং যথা গচ্ছতি সাগরম্। সর্বদেবনমস্কারঃ কেশবং প্রতিগচ্ছতি॥** (লৌগাক্ষিস্মৃতি)

যেমন আকাশ থেকে বৃষ্টিপাত হলে সেই জল নদী, নালা, ঝরনা হয়ে শেষ পর্যন্ত সমুদ্রকেই প্রাপ্ত হয়, তেমনি মানুষ যাঁরই পূজা করুক, তাতে তত্ত্বত ভগবানেরই পূজা হয়। কিন্তু পূজকের লাভ হয় নিজ নিজ ভাব অনুযায়ী। ভগবান হচ্ছেন সমস্ত যজ্ঞের ও তপের ভোক্তা। তাই পঞ্চম অধ্যায়ে তিনি বলেছেন—'**ভোক্তারং যজ্ঞতপসাম্**' (গীতা ৫।২৯)—তিনিই সমস্ত কর্মের মহাকর্তা ও মহাভোক্তা কিন্তু কর্তা-ভোক্তা হয়েও ভগবান নির্লিপ্তভাবে থাকেন, তাঁর মধ্যে না আছে কর্তৃত্বভাব বা ভোক্তৃত্বভাব। তাই গীতার চতুর্থ অধ্যায়ে ভগবান বলছেন—

'**তস্য কর্তারমপি মাং বিদ্ধ্যকর্তারমব্যয়ম্**' (গীতা ৪।১৩), '**ন মাং কর্মাণি লিম্পন্তি ন মে কর্মফলে স্পৃহা**' (গীতা ৪।১৪)। মানুষের ভগবদ্ অভিমুখে চলার পথে দুটি বাধা আছে—

(১) নিজেকে ভোগের ভোক্তা বলে মনে করা এবং (২) নিজেকে সংগৃহীত সম্পদের মালিক (কর্তা) বলে মানা।

শিশুকালে মাকে ছাড়া বালক থাকতে পারে না। কিন্তু বড় হয়ে যখন তার বিবাহ হয়, তখন স্ত্রীর সঙ্গে 'এই আমার স্ত্রী' এইরূপ অধিকার রূপ সম্বন্ধ স্থাপন করে বসে তার ফলে সে তার 'ভোক্তা' ও 'মালিক' হয়ে বসে।

তখন আর মাকে তত ভালো লাগে না, সহ্য হয় না। সেইরকম জীব যখন ভোগ ও ঐশ্বর্যের সঙ্গে সম্পর্কিত হয়, তখন নিজেকে এদের 'ভোক্তা' ও 'কর্তা' বোধ হলেও বস্তুত এদের দাসে পরিণত হয় এবং ক্রমে সে সম্পূর্ণরূপে ভগবদ্ বিমুখ হয়। ভগবান নবম অধ্যায়ে ২৩তম শ্লোকে এদের বলেছেন **'অতঃ চ্যবন্তি তে'** অর্থাৎ তাদের পতন হয়। কিন্তু যখন জীবের এই বোধ বা চেতন উন্মেষিত হয় যে সমগ্র ভোক্তা ও কর্তা ভগবান অথচ তিনি সবকিছুতেই নির্লিপ্তভাবে থাকেন, তখন তার আর কর্তা ও ভোক্তা ভাব থাকে না তার পতনও হয় না এবং সে শান্তি লাভ করে।

শ্রীনামদেব একবার তীর্থযাত্রায় গিয়েছেন। কোনো এক বৃক্ষের নিচে রুটি তৈরি করে ভগবানকে নিবেদন করার জন্য ঘি মাখাতে যাবেন এমন সময় একটা কুকুর রুটিটি নিয়ে দৌড় দেয়। নামদেব তখন ঘিয়ের পাত্রটি নিয়ে কুকুরের পেছনে পেছনে দৌড়াতে দৌড়াতে বলতে লাগলেন— 'হে প্রভু ! আপনাকেই ভোগ দেওয়ার কথা, তাহলে এই শুকনো রুটি নিয়ে যাচ্ছেন কেন ? রুটিতে একটু ঘি মাখাতে দিন। শ্রীনামদেব একথা বলামাত্রই কুকুরের স্থান থেকে ভগবান প্রকটিত হলেন। প্রাণীমাত্রেই তত্ত্বত ভগবানই বিরাজ করেন। তাই যাকে যাই দেওয়া হোক তা ভগবানই পেয়ে থাকেন। সেইজন্য ভক্ত যা কিছু সামগ্রীই কাউকে অর্পণ করে, সে মনে করে **'ত্বদীয়ং বস্তু গোবিন্দ তুভ্যমেব সমর্পয়ে'**। অন্য দেবতাদের শরণগ্রহণকারীদের প্রদত্ত অর্পণও ভগবানেই অর্পিত হয় কিন্তু তারা তা বুঝতে পারে না।

অন্য দেবতাদের শরণগ্রহণকারীদের এই শ্রদ্ধা দেখে ভগবান কী করেন—(শ্লোক ৭।২১, ২২, ২৫, ২৬)

এই স্বল্পবুদ্ধি মানুষ যখন ভগবান থেকে পৃথক জ্ঞানে অন্য দেবতার আরাধনায় রত হয়, তখন ভগবান কী করেন তা সপ্তম অধ্যায়ের ২১, ২২, ২৫ ও ২৬তম শ্লোকে বর্ণনা করেছেন।

ভগবান বলছেন—**'তস্য তস্যাচলাং শ্রদ্ধাং তামেব বিদধাম্যহম্'**—মানুষ যে যে দেবতার ভক্ত হয়ে শ্রদ্ধা সহকারে ভজন-পূজন করতে চায় আমি সেই সেই দেবতার প্রতি তার শ্রদ্ধা অচলা (দৃঢ়) করে দিই। আর যাদের আমার

প্রতি শ্রদ্ধা-প্রেম থাকে, যারা নিজেদের কল্যাণ চায়, তাদের শ্রদ্ধা আমি আমার প্রতিই দৃঢ় করি।

এখানে প্রশ্ন ভগবান সকলের শ্রদ্ধা তাঁর প্রতি দৃঢ় করেন না কেন ? আর যখন নিজেই এদের শ্রদ্ধা অন্যদের প্রতি দৃঢ় করেন তবে সেই শ্রদ্ধা আবার দূর হবে কী ভাবে, তাদের কি পতন হতেই থাকবে ? এই প্রসঙ্গে বলা যায় যে মানুষ প্রায়শই অন্য ব্যক্তিদের নিজের দিকে টানতে চায়, নিজের শিষ্য বা দাস করতে চায়, নিজেকে অন্যর কাছে শ্রদ্ধার্ঘ করতে চায় ইত্যাদি। কিন্তু ভগবান সবার নিয়ন্তা হয়েও কারোর শ্রদ্ধাভাজন বা কাউকে তাঁর অধীন করতে চান না।

মানুষের মনে এই শ্রদ্ধা সৃষ্টি হয় তার ইচ্ছা অনুযায়ী যা পরিবর্তন করতে মানুষ সম্পূর্ণভাবে স্বাধীন ও সমর্থ। মনুষ্যজন্মের সার্থকতাই হল কামনাকে শুদ্ধ করে বিবেককে উন্মোচিত করা। **'জহি শত্রুং মহাবাহো কামরূপং দুরাসদম্'** (গীতা ৩।৪৩) দুর্জয় শত্রু কামনাকে মানুষ নিজেই দমন (নাশ) করবে। গীতার অন্তিম অধ্যায় **'মোক্ষসন্ন্যাসযোগে'** ভগবান অর্জুনকে সমস্ত উপদেশ দেওয়ার পরে বলছেন—**'যথেচ্ছসি তথা কুরু'** (গীতা ১৮।৬৩) অর্থাৎ গুহ্য থেকে গুহ্যতর তত্ত্বজ্ঞান তোমাকে বললাম এখন তুমি তা সম্পূর্ণরূপে পর্যালোচনা করে যেমন অনুভব করো তেমন করো। একথা শুনে অর্জুন বিহ্বল হয়ে পড়ায় ভগবান তখনই তাঁর সবথেকে গোপন কথাটি তাকে বললেন **'য ইমং পরং গুহ্যম্'** আর কথাটি হল **'মামেকং শরণং ব্রজ'** (গীতা১৮।৬৬)—তুমি আমার শরণাগত হও। ভগবান সকল দেবতাকে পৃথকভাবে সীমাবদ্ধ অধিকার দিয়ে রেখেছেন কিন্তু তাঁর অধিকার বা ক্ষমতা অসীম। মানুষ কামনা পূরণের জন্য যে যে দেবতাদের আরাধনায় যুক্ত হয়ে যে ফল লাভ করে প্রকৃতপক্ষে তা তাঁরই বিধান অনুসারে হয়। কিন্তু ভগবানের বিশেষত্ব হল তিনি কাউকে শাসন করেন না, কাউকে তাঁর দাস বা শিষ্যও করেন না—বরং সবাইকে সমান মনে করে থাকেন, সকলকে মিত্র বলে মনে করেন। যেমন নিষাদরাজ ছিলেন সিদ্ধভক্ত, সম্পাতি পক্ষী হয়েও ছিলেন ভক্ত, বিভীষণ ছিলেন সাধক, সুগ্রীব ছিলেন বিষয়ী কিন্তু ভগবান

শ্রীরাম সকলকেই বন্ধুর স্বীকৃতি দিয়েছিলেন। গীতাতেও ভগবান অর্জুনকে বলেছেন—**'ভক্তোঽসি মে সখা চেতি'** (গীতা ৪।৩) মানে অর্জুন ভক্তর মতো ব্যবহার করলেও তিনি তাকে সখা বলেই সম্বোধন করেছেন।

ভগবান সকলকেই সমানভাবে বুদ্ধিবৃত্তি উন্মেষের সুযোগ দেন। যে যেমন চায় ভগবান সেইভাবে তার শ্রদ্ধা সৃষ্টি করেন এবং যোগমায়া সমাবৃত ভগবানকে সে সেইভাবে দেখে থাকে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যখন বলরাম সহ কংসের রাজসভায় প্রবেশ করছেন তখন কে কিরকম ভাবে তাঁকে দেখছে তার সুন্দর বর্ণনা ভাগবতে আছে।

মল্লানামশনির্নৃণাং নরবরঃ স্ত্রীণাং স্মরো মূর্তিমান্
গোপানাং স্বজনোঽসতাং ক্ষিতিভুজাং শাস্তা স্বপিত্রোঃ শিশুঃ।
মৃত্যুর্ভোজপতের্বিরাডবিদুষাং তত্ত্বং পরং যোগিনাং
বৃষ্ণীনাং পরদেবতেতি বিদিতো রঙ্গং গতঃ সাগ্রজঃ।।

(শ্রীভাগবত ১০।৪৩।১৭)

মল্লরা তাঁকে দেখল বজ্রকঠিন দেহধারী মানুষ হিসেবে, সাধারণ মানুষ দেখল নরশ্রেষ্ঠরূপে, স্ত্রীদের কাছে তিনি দৃশ্যমান হলেন মূর্তিমান কামদেবরূপে, গোপেদের কাছে তিনি স্বজন, দুষ্ট নৃপতিদের নিকট দণ্ডদানকারী শাসক, মা-বাবার নিকট শিশু, কংসের কাছে মৃত্যু, জ্ঞানীদের নিকট বিরাট পুরুষ, যোগীদের নিকট পরমতত্ত্ব এবং ভক্তিশিরোমণি বৃষ্ণিবংশীয়দের নিকট তিনি ইষ্টদেবরূপে প্রতিভাত হলেন।

ভগবান অনুগ্রহ করে মানুষকে অন্তিম জন্ম দিয়েছেন। এখন এই জন্মে সে নিজের উদ্ধার সাধন করবে, না পুনর্বার জন্ম-মৃত্যুরূপ পতনের দিকে যাবে তা তার ওপরেই নির্ভর করে। ভগবান ষষ্ঠ অধ্যায়ে বলছেন—

উদ্ধরেদাত্মনাত্মানং নাত্মানামবসাদয়েৎ।
আত্মৈব হ্যাত্মনো বন্ধুরাত্মৈব রিপুরাত্মনঃ।। (গীতা ৬।৫)

নিজের দ্বারাই নিজেকে সংসার সাগর থেকে উদ্ধার করবে এবং নিজেকে কখনো অধোগতির পথে যেতে দেবে না।

মানব সর্বদা সংস্কার উন্নত করার চেষ্টা করবে। কেননা—

'যং যং বাপি স্মরনং ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরম্।
তং তমেবৈতি কৌন্তেয় সদা তদ্ভাবভাবিতঃ॥' (গীতা ৮।৬)

মানুষ মৃত্যুকালে যে যে ভাব স্মরণ করতে করতে দেহত্যাগ করে, সে সেই ভাবই প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ তার সেই প্রকার জন্মগ্রহণই হয়। ভগবান আরো বলেছেন যদি অন্তকালে আমাকে স্মরণ করে দেহত্যাগ করে। **'অন্তকালে চ মামেব স্মরন্মুক্তা কলেবরম্। যঃ প্রয়াতি স মদ্ভাবং যাতি নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ॥'** (গীতা ৮।৫) তাহলে সে আমাকেই প্রাপ্ত হয়।

মানুষ ছাড়া অন্যান্য প্রাণীদের মধ্যেও পরম্পরাগতভাবে কর্মফলের প্রবাহ লেগে থাকে যার জন্য এরা বারংবার জন্ম-মৃত্যু বরণ করে। এই কর্মফল প্রবাহের মধ্যে কোনো জীব যদি কোনো কারণবশত মনুষ্যদেহে (বা অন্য কোনো যোনিতে) জন্মগ্রহণ করে প্রভুর আশ্রয় গ্রহণ করে তখন ভগবান তার অনন্ত জন্মের পাপ দূর করেন।

ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোনো ভাগ্যবান জীব।
গুরু, কৃষ্ণ প্রসাদে পায় ভক্তিলতা বীজ॥

ভাগবতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ-উদ্ধব সংবাদে বলেছেন—**'ময়ানুকূলেন নভস্বতেরিতং পুমান্ ভবাব্ধিং ন তরেৎ স আত্মহা'** (ভাগবত ১১।২০।১৭)। অর্থাৎ এই মনুষ্যদেহ-রূপ নৌকা এবং কৃপারূপী অনুকূল বাতাস পেয়েও যদি কোনো ব্যক্তি ভব-সাগর পার না হয়, তবে সে আত্মঘাতী তুল্য—'আত্মঘাতী মহাপাপী'।

অল্পবুদ্ধিসম্পন্নদের অন্য দেবতা আরাধনার ফল কী ? (শ্লোক ৭।২৩, ৯।২০, ২১, ২৫)

এই প্রকরণের শেষ পর্বে ভগবান বলেছেন যে স্বল্পবুদ্ধিসম্পন্ন লোকেরা বিনাশশীল পদার্থে আকৃষ্ট হয়ে নানা দেবতাদের উপাসনা করে কিন্তু তার ফল হয় স্বল্পস্থায়ী। সপ্তম অধ্যায়ের ২৩ এবং নবম অধ্যায়ের ২০, ২১ ও ২৫ শ্লোকে এর বর্ণনা করা হয়েছে। ভগবান অন্য দেবতার পূজাকারীগণকে **'অল্পমেধসাম্'** বলেছেন কারণ তারা বিনাশশীল পদার্থ আকাঙ্ক্ষা করে এবং পরিণামে সীমিত ও বিনাশশীল ফলই লাভ করে। এরা

সীমিত ফল লাভ করে কেন ? কারণ প্রথমত এদের কামনাই থাকে সীমিত ও বিনাশশীল পদার্থের প্রতি। আর দ্বিতীয়ত তারা দেবতাদের ভগবানের থেকে আলাদা বলে মনে করে যাদের ক্ষমতাও সীমিত। তবে যদি তারা কামনা না রেখে নিষ্কামভাবে দেবতাগণের উপাসনা করে তাহলে অবিনাশী ফল প্রাপ্ত হয়। আবার তারা যদি দেবগণকে ভগবান হতে পৃথক মনে না করে অর্থাৎ ভগবৎ-স্বরূপই মনে করে আরাধনা করে, তাহলে কামনা থাকলেও তা ক্রমশ দূর হয়ে যায় এবং তারা অবিনাশী ফল লাভ করতে পারে। তবে ভগবানের আরাধনাকারীদের সমস্ত কামনাই যে পূরণ হবে এমন কোনো নিয়ম নেই। ভগবান উচিত মনে করলে সেই কামনা পূর্ণ করতেও পারেন আবার নাও করতে পারেন অর্থাৎ তাদের মঙ্গল হলে পূর্ণ করেন আর যদি মঙ্গল না বোঝেন তবে অনেক ডাকলেও বা কাঁদলেও তা পূরণ করেন না।

ভগবানের উপাসনা করাও অত্যন্ত সহজ, এতে কোনো বিধি, নিয়ম বা পরিশ্রমের প্রয়োজন হয় না শুধু ভাবেরই প্রাধান্য থাকে। আর দেবতাদের উপাসনাতে ক্রিয়া, বিধি ও পদার্থের প্রাধান্য থাকে। আবার প্রাকৃতিক জগতেও যতপ্রকার বিদ্যা-কলা-কৌশল আদি জ্ঞান আছে তা অধিগত হলেও মানুষ **'অল্পমেধসাম্'** (তুচ্ছবুদ্ধিসম্পন্ন)-এর মধ্যে পড়ে কারণ তা অজ্ঞানতাই দৃঢ় করে। কিন্তু যিনি ভগবানকে জেনেছেন, তাঁর কোনোরূপ জাগতিক বিদ্যা-কলা-কৌশল না থাকলেও তিনি সকল জ্ঞানসম্পন্ন—**'স সর্ববিদ্ভজতি মাং সর্বভাবেন ভারত'** (গীতা ১৫।১৯)।

নবম অধ্যায়ে ভগবান সেইসব মানুষের কথা বলেছেন যারা সংসারে নিজেদের বিশেষ বুদ্ধিমান বলে মনে করে। তারা অনেক সময় আবার জাগতিক সুখে বদ্ধ না হয়ে ঋক্-সাম-যজুঃ আদি বেদোক্ত সকাম কর্মের ও তার ফলের দিকে আকৃষ্ট হয়। এই শ্রেণীর লোকেরা স্বর্গলাভ ও স্বর্গের ভোগগুলির প্রতি লালায়িত হয়ে বেদোক্ত নানা যজ্ঞানুষ্ঠানে ব্যাপৃত হয় এই সব ব্যক্তিদের ভগবান **'ত্রৈবিদ্যা মাং সোমপাঃ পূতপাপা যজ্ঞৈরিষ্ট্বা স্বর্গতিং প্রার্থয়ন্তে'** (গীতা ৯।২০) বলেছেন। এই স্বর্গলাভে ইচ্ছুক ব্যক্তিগণ সোমরসকে বৈদিক মন্ত্রাদির সাহায্যে যজ্ঞে অভিমন্ত্রিত করে পান করেন তাই

তাদের **'সোমপাঃ'** বলা হয়েছে। বেদাদি বর্ণিত যজ্ঞানুষ্ঠানকারীগণ বেদমন্ত্র দ্বারা অভিমন্ত্রিত সোমরস পান করে স্বর্গের প্রতিবন্ধকরূপ পাপ দূর করেন তাই তাদের **'পূতপাপা'** বলা হয়েছে। এদের সম্বন্ধে ভগবান বলছেন—

তে তং ভুক্ত্বা স্বর্গলোকং বিশালং ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্যলোকং বিশন্তি।

(গীতা ৯।২১)

তারা বিশাল স্বর্গলোক কামনা করেন কারণ স্বর্গলোকও বিশাল (বিস্তৃত), সেখানকার আয়ুও বিশাল (দীর্ঘ) এবং সেখানকার ভোগবিলাসের উপকরণও বিশাল (প্রচুর)। তারা এই স্বর্গলাভ কামনায় ভগবদ্প্রাপ্তির কোনো সাধনের সাহায্য গ্রহণ করেন না। ফলে **'ক্ষীণে পুণ্যে'** অর্থাৎ স্বর্গসুখ লাভ করায় তাদের পুণ্য ক্ষয়ের ফলে আবার তাদের মর্ত্যলোকে জন্মগ্রহণ করতে হয়।

এখানে **'পূতপাপাঃ'** ও **'ক্ষীণপুণ্যের'** অর্থে সম্পূর্ণ পাপ ও সম্পূর্ণ পুণ্যনাশের কথা বলা হয়নি, তাহলে তারা মুক্ত হয়ে যেত। এখানে পদগুলির অর্থ স্বর্গলাভের প্রতিবন্ধক পাপগুলি দূর করা ও ভোগসুখের ফলে স্বর্গপ্রাপ্তির পুণ্য ক্ষয় করা।

এই প্রকরণের শেষে ভগবান বলেছেন দেব পূজার পৃথক্ নিয়ম পালনকারীগণ (দেবব্রত) দেবলোকে, সকামভাবে পিতৃগণ পূজাকারী ব্যক্তি পিতৃলোক লাভ করে। ভূত-প্রেত পিশাচাদি যোনি স্বভাববশতই অশুদ্ধ তাই এদের পূজার নিয়ম বিধি, সামগ্রী আদিও অশুদ্ধ তাই পূজকদের এদের প্রতি ভগবদ্বুদ্ধি হতে পারে না এবং নিষ্কামভাবও আসে না তাই এদের পতন হয়। যদিও দেবতা, পিতৃগণের উপাসনা স্বরূপত (আনুষ্ঠানিকভাবে) ত্যাজ্য নয় কিন্তু ভূত-প্রেতাদির উপাসনা পরিত্যাজ্য। তবে সাধকগণের ভূত-প্রেতাদির উদ্ধারের জন্য শ্রাদ্ধ-তর্পণ বা পিণ্ডদান আদি করা দোষণীয় নয়।

জ্ঞানী জীব (প্রেমিক ভক্ত)—(৭।১৬-১৯, ২৮-৩০, ৯।১৩-১৯, ২৬-৩৪ ও ১০।৩-১১)

সপ্তম, নবম ও দশম অধ্যায়ের তেত্রিশটি শ্লোকে ভগবান প্রেমিক ভক্তপ্রসঙ্গের প্রকরণগুলি এইভাবে বর্ণনা করেছেন—(১) ভগবানের

আরাধনাকারী (৯।১৩-১৫, ৭।২৮-৩০, ১০।৩), (২) ভক্তের প্রকারভেদ (৭।১৬-১৯, ৯।৩০-৩৪), (৩) ভক্তের ভাব (৯।২৬-২৯, ১০।৭-৯), ভগবানের বিভূতি-ঐশ্বর্য (৯।১৬-১৯, ১০।৪-৬), (৫) ভগবানের কৃপা (৯।২২, ১০।১০-১১)।

চতুর্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ সুকৃতিনোঽর্জুন।
আর্তো জিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ॥
তেষাং জ্ঞানী নিত্যযুক্ত একভক্তির্বিশিষ্যতে।
প্রিয়ো হি জ্ঞানিনোঽত্যর্থমহং স চ মম প্রিয়ঃ॥
উদারাঃ সর্ব এবৈতে জ্ঞানী ত্বাত্মৈব মে মতম্।
আস্থিতঃ স হি যুক্তাত্মা মামেবানুত্তমাং গতিম্॥
বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে।
বাসুদেবঃ সর্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্লভঃ॥

(গীতা ৭।১৬-১৯)

যেষাং ত্বন্তগতং পাপং জনানাং পুণ্যকর্মণাম্।
তে দ্বন্দ্বমোহনির্মুক্তা ভজন্তে মাং দৃঢ়ব্রতাঃ॥
জরামরণমোক্ষায় মামাশ্রিত্য যতন্তি যে।
তে ব্রহ্ম তদ্বিদুঃ কৃৎস্নমধ্যাত্মং কর্ম চাখিলম্॥
সাধিভূতাধিদৈবং মাং সাধিযজ্ঞং চ যে বিদুঃ।
প্রয়াণকালেঽপি চ মাং তে বিদুর্যুক্তচেতসঃ॥

(গীতা ৭।২৮-৩০)

মহাত্মানস্তু মাং পার্থ দৈবীং প্রকৃতিমাশ্রিতাঃ।
ভজন্ত্যনন্যমনসো জ্ঞাত্বা ভূতাদিমব্যয়ম্॥
সততং কীর্তয়ন্তো মাং যতন্তশ্চ দৃঢ়ব্রতাঃ।
নমস্যন্তশ্চ মাং ভক্ত্যা নিত্যযুক্তা উপাসতে॥
জ্ঞানযজ্ঞেন চাপ্যন্যে যজন্তো মামুপাসতে।
একত্বেন পৃথক্ত্বেন বহুধা বিশ্বতোমুখম্॥

অহং ক্রতুরহং যজ্ঞঃ স্বধাহমহমৌষধম্।
মন্ত্রোঽহমহমেবাজ্যমহমগ্নিরহং হুতম্॥
পিতাহমস্য জগতো মাতা ধাতা পিতামহঃ।
বেদ্যং পবিত্রমোঙ্কার ঋক্ সাম যজুরেব চ॥
গতির্ভর্তা প্রভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং সুহৃৎ।
প্রভবঃ প্রলয়ঃ স্থানং নিধানং বীজমব্যয়ম্॥
তপাম্যহমহং বর্ষং নিগৃহ্ণাম্যুৎসৃজামি চ।
অমৃতং চৈব মৃত্যুশ্চ সদসচ্চাহমর্জুন॥

(গীতা ৯।১৩-১৯)

পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি।
তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামি প্রযতাত্মনঃ॥
যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
যৎ তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্॥
শুভাশুভফলৈরেবং মোক্ষ্যসে কর্মবন্ধনৈঃ।
সন্ন্যাসযোগযুক্তাত্মা বিমুক্তো মামুপৈষ্যসি॥
সমোঽহং সর্বভূতেষু ন মে দ্বেষ্যোঽস্তি ন প্রিয়ঃ।
যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু চাপ্যহম্॥
অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্।
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্ব্যবসিতো হি সঃ॥
ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্মাত্মা শশ্বচ্ছান্তিং নিগচ্ছতি।
কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি॥
মাং হি পার্থ ব্যপাশ্রিত্য যেঽপি স্যুঃ পাপযোনয়ঃ।
স্ত্রিয়ো বৈশ্যাস্তথা শূদ্রাস্তেঽপি যান্তি পরাং গতিম্॥
কিং পুনর্ব্রাহ্মণাঃ পুণ্যা ভক্তা রাজর্ষয়স্তথা।
অনিত্যমসুখং লোকমিমং প্রাপ্য ভজস্ব মাম্॥

মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি যুক্ত্বৈবমাত্মানং মৎপরায়ণঃ॥
(গীতা ৯। ২৬-৩৪)

যো মামজমনাদিঞ্চ বেত্তি লোকমহেশ্বরম্।
অসংমূঢ়ঃ স মর্ত্যেষু সর্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে॥
বুদ্ধির্জ্ঞানমসম্মোহঃ ক্ষমা সত্যং দমঃ শমঃ।
সুখং দুঃখং ভবোঽভাবো ভয়ং চাভয়মেব চ॥
অহিংসা সমতা তুষ্টিস্তপো দানং যশোঽযশঃ।
ভবন্তি ভাবা ভূতানাং মত্ত এব পৃথগ্বিধাঃ॥
মহর্ষয়ঃ সপ্ত পূর্বে চত্বারো মনবস্তথা।
মদ্ভাবা মানসা জাতা যেষাং লোক ইমাঃ প্রজাঃ॥
এতাং বিভূতিং যোগঞ্চ মম যো বেত্তি তত্ত্বতঃ।
সোঽবিকম্পেন যোগেন যুজ্যতে নাত্র সংশয়ঃ॥
অহং সর্বস্য প্রভবো মত্তঃ সর্বং প্রবর্ততে।
ইতি মত্বা ভজন্তে মাং বুধা ভাবসমন্বিতাঃ॥
মচ্চিত্তা মদ্‌গতপ্রাণা বোধয়ন্তঃ পরস্পরম্।
কথয়ন্তশ্চ মাং নিত্যং তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ॥
তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্বকম্।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে॥
তেষামেবানুকম্পার্থমহমজ্ঞানজং তমঃ।
নাশয়াম্যাত্মভাবস্থো জ্ঞানদীপেন ভাস্বতা॥
(গীতা ১০। ৩-১১)

'ভগবান বলছেন—হে অর্জুন ! চার প্রকারের সুকৃতিশীল মানুষ–অর্থার্থী, আর্ত, জিজ্ঞাসু ও জ্ঞানী (বা প্রেমিক) আমাকে ভজনা করে বা আমার শরণাগত হয়।

এই চার প্রকার ভক্তর মধ্যে সতত আমাতে সমাহিত চিত্ত ও অনন্য ভক্তিসম্পন্ন জ্ঞানী বা প্রেমিক ভক্তই অতিশয় শ্রেষ্ঠ। কারণ আমি জ্ঞানী ভক্তর

অতি প্রিয় ও সেও আমার অতিশয় প্রিয়।

উপরোক্ত চার প্রকার ভক্তই অত্যন্ত মহান, কিন্তু জ্ঞানী (প্রেমিক) ভক্তই আমার আত্মস্বরূপ— এই হল আমার মত। সে আমাতে তদ্‌গতচিত্ত এবং আমি ছাড়া যে আর কোনো শ্রেষ্ঠ গতি নেই এই বিশ্বাসে দৃঢ় আস্থাবান।

অনেক জন্মের পরে অর্থাৎ অন্তিম মনুষ্য জন্মে এই জ্ঞানী ব্যক্তিরা 'পরমাত্মাই সবকিছু' এই ভেবে আমার শরণাগত হন। এইরূপ মহাত্মা যথার্থই অত্যন্ত দুর্লভ। (গীতা ৭।১৬-১৯)

যে পুণ্যকর্মা ব্যক্তিদের পাপ নষ্ট হয়ে গেছে, সেই দ্বন্দ্ব-মোহরহিত এবং দৃঢ়ব্রত ব্যক্তিগণই আমার ভজনা করেন।

বৃদ্ধাবস্থা ও মরণ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য যাঁরা আমার শরণাগত হয়, তারা সনাতন ব্রহ্ম, সমগ্র অধ্যাত্ম এবং সম্পূর্ণ কর্মতত্ত্ব অবগত হয়।

যেসব মানুষ আধিভূত, আধিদৈব এবং আধিযজ্ঞ সহ আমাকে জানেন, তাঁরা যুক্তচিত্ত হওয়ায় মৃত্যুকালেও আমকে জানতে পারেন অর্থাৎ আমাকেই প্রাপ্ত হন। (গীতা ৭।২৮-৩০)

অনন্য চিত্ত মহাত্মাগণ দৈবী প্রকৃতির আশ্রিত হওয়ায় সর্বভূতের আদি ও অবিনাশী জেনে আমাকে ভজনা করে থাকেন।

আমাতে নিত্যযুক্ত ব্যক্তি দৃঢ়ব্রত হয়ে যত্নপূর্বক আমারই সাধনভজন, ভক্তিপূর্বক আমার কীর্তন এবং আমাকে নমস্কার করতঃ নিরন্তর আমারই উপাসনা করেন।

কোনো কোনো সাধক জ্ঞানযজ্ঞের সাহায্যে অভেদভাবে আমাকে উপাসনা করেন। আবার কোনো কোনো সাধক নিজেকে পৃথক বলে মনে করে সেব্য-সেবক ভাব দ্বারা সংসারকে আমার বিরাটরূপ মনে করে উপাসনা করে।

ভগবান বলছেন— আমি ক্রতু, আমি যজ্ঞ, আমি স্বধা, আমি ঔষধ, আমি মন্ত্র, আমিই ঘৃত, আমি অগ্নি, আমিই যজ্ঞরূপ ক্রিয়া।

যা কিছু জ্ঞেয়, যা কিছু পবিত্র সেও আমি, আমি ওঁকার এবং ঋক-সাম-যজুর্বেদ।

এই সমগ্র জগতের পিতা, মাতা, পিতামহ, গতি, ভর্তা, প্রভু, সাক্ষী,

নিবাস, আশ্রয়, সুহৃদ, উৎপত্তি, প্রলয়, স্থান, নিধান এবং অবিনাশী বীজও আমি।

জগতের হিতার্থে আমি সূর্যরূপে তাপ বিকীরণ করি, জলকে আকর্ষণ করি এবং পুনরায় বৃষ্টিরূপে বর্ষণ করি। আমিই মৃত্যু, আমিই অমৃত, সৎ এবং অসৎও আমি। (গীতা ৯।১৩-১৯)

যে সব ভক্ত পত্র, পুষ্প, ফল ও জল ইত্যাদি সাধ্যমতো বস্তু ভক্তিপূর্বক আমাকে অর্পণ করে, তল্লীন চিত্ত সেইসব ভক্তর ভক্তিপূর্বক প্রদত্ত উপহার আমি ভক্ষণ করি (গ্রহণ করি)।

হে অর্জুন ! তুমি যা কিছু কর, যা কিছু খাও, যা হোম কর, দান কর, বা তপস্যা কর সবই আমাতে অর্পণ করো।

এইভাবে আমাকে সর্বকর্ম অর্পণ করলে, কর্মবন্ধন থেকে এবং শুভ ও অশুভ (বিহিত ও নিষিদ্ধ) সর্ব কর্ম থেকে মুক্ত হয়ে তুমি আমাকেই প্রাপ্ত হবে।

সকল প্রাণীতেই আমি সমান। কেউই আমার অপ্রিয়ও নয় বা প্রিয়ও নয়। কিন্তু ভক্তিপূর্বক যাঁরা আমাকে ভজনা করে তাঁরা আমাতে এবং আমি তাঁদের মধ্যে অবস্থান করি।

অতি দুরাচারী ব্যক্তিও যদি অনন্য ভক্ত হয়ে আমার ভজনা করে তবে তাকে সাধু বলেই জানবে কারণ তার এই সিদ্ধান্ত অত্যন্ত সঠিক।

সেই ব্যক্তি তৎক্ষণাৎ ধর্মাত্মা হয়ে যান এবং চিরশান্তি লাভ করেন। হে অর্জুন ! তুমি শপথ নিয়ে বলতে পারো তাদের কখনো পতন হয় না।

নীচ যোনিসম্ভূত জীব অথবা স্ত্রীজাতি, বৈশ্য, শূদ্র যে কেউ যদি সর্বতোভাবে আমার শরণ গ্রহণ করে তাহলে নিঃসন্দেহ ভাবে সে পরমগতি প্রাপ্ত হয়।

তাহলে পবিত্র আচরণকারী ব্রাহ্মণ এবং ঋষিকল্প ক্ষত্রিয় যদি ভগবানের ভক্ত হয় তবে তারা যে পরমাগতি প্রাপ্ত হবে তাতে কি সন্দেহ আছে। অতএব তুমি এই অনিত্য ও সুখশূন্য প্রাপ্ত দেহ দ্বারা আমারই ভজনা করো।

তুমি আমার ভক্ত হও, আমাতে মদ্গতচিত্ত হও, আমার পূজনকারী হও এবং আমাতে প্রণত হও। এইভাবে আমাতে যুক্ত ও মৎপরায়ণশীল হলে

তুমি আমাকেই লাভ করবে। (গীতা ৯।২৬-৩৪)

যারা আমাকে অজ, অনাদি এবং সর্বলোকের মহেশ্বর বলে জানে অর্থাৎ দৃঢ়তার সঙ্গে মেনে নেয়, মানুষের মধ্যে তারাই জ্ঞানী এবং তারাই মুক্ত হন।

বুদ্ধি, জ্ঞান, অসম্মোহ, ক্ষমা, সত্য, শম, দম, সুখ, দুঃখ, উৎপত্তি (ভব), লয় (অভাব), ভয়, অভয়—

অহিংসা, সমতা, তুষ্টি, তপ, দান, যশ, অপযশ—প্রাণীদের এইপ্রকার ভিন্ন ভিন্ন (কুড়ি প্রকার) ভাব আমা হতেই উৎপন্ন হয়।

সপ্ত মহর্ষি, তাঁদের পূর্ববর্তী চার সনকাদি এবং চতুর্দশ মনু, যাঁদের থেকে জগতের এই সমস্ত প্রজা সৃষ্টি হয়েছে, তাঁরা সকলেই আমার মন হতে উৎপন্ন এবং আমার প্রতি ভাব (শ্রদ্ধা ও ভক্তি) সম্পন্ন।

যে ব্যক্তি আমার এই বিভূতি এবং যোগৈশ্বর্য জানেন, তিনি ভক্তিযোগে অবিচলিতভাবে যুক্ত হন, এতে বিন্দুমাত্র সংশয় নেই।

আমি জগৎমাত্রেরই প্রভব (মূল কারণ), আমা হতেই এই জগৎ-সংসার প্রবৃত্ত হচ্ছে অর্থাৎ প্রবর্তিত হচ্ছে, বুদ্ধিমান ভক্তগণ আমাকে এইরূপ জেনে শ্রদ্ধা-ভক্তি সহকারে আমাকেই ভজনা করে থাকে—সর্বভাবেই আমারই শরণ গ্রহণ করে।

মদ্‌গতচিত্ত, মদ্‌গতপ্রাণ ভক্তগণ নিজেদের মধ্যে আমার গুণ, প্রভাব আলোচনা করে এতেই সর্বদা সন্তুষ্ট থাকেন এবং আমার সঙ্গে প্রেমবন্ধনে যুক্ত হয়ে থাকেন।

আমাতে সতত আসক্ত, প্রেমপূর্বক আমার ভজনাকারী ভক্তদের আমি সেই বুদ্ধিযোগ প্রদান করি যার দ্বারা তারা আমাকে প্রাপ্ত হয়।

সেই ভক্তগণের প্রতি কৃপা করার জন্যই তাদের স্বরূপভাবস্থ আমি তাদের অজ্ঞানজনিত অন্ধকার প্রজ্বলিত জ্ঞানরূপ অগ্নিদ্বারা সর্বতোভাবে নাশ করে থাকি।' (গীতা ১০।৩-১১)

ভক্ত-প্রসঙ্গ বর্ণনা শুরু করে ভগবান প্রথমেই কোন্ ব্যক্তি ভগবানকে ডাকে সে বিষয়ে বলেছেন।

১. ভগবানের আরাধনাকারী—(৯।১৩-১৫, ৭।২৮-৩০, ১০।৩)

ভগবান বলছেন দৈবী প্রকৃতির লোকেরাই ভগবৎ আরাধনা করে। এখানে পরমাত্মাকে বলা হয়েছে দৈবী এবং পরমাত্মার সম্পদকে বলা হয়েছে দৈবী সম্পদ। পরমাত্মাকে লাভ করতে যে গুণ বা আচরণের প্রয়োজন হয়, সেগুলি সবই সৎ বা নিত্য এবং ভগবৎ স্বরূপ, তাই এদের সদ্‌গুণ, সদাচার ইত্যাদি বলা হয়। আবার তা ভগবানের স্বভাব হওয়ায় এগুলিকে ভগবানের 'প্রকৃতি'ও বলে। এই প্রকৃতি লাভে সকল মানুষেরই পূর্ণ অধিকার আছে এবং কে এর আশ্রয় গ্রহণ করবে বা কে করবে না তা নির্ভর করে মানুষেরই ওপর। যারা এইসবের আশ্রয় নিয়ে ভগবদমুখী হয় তারা নিজেদের কল্যাণ সাধন করে।

কিন্তু যারা এসবকে নিজের পুরুষার্থ দ্বারা উপার্জিত বলে মনে করে বা স্বাভাবিক না ভেবে নিজসৃষ্ট ভাবে, তাদের অহংকার জন্মায়। কিন্তু এই গুণগুলিকে ভগবানের গুণ ও ভগবদ্‌কৃপা বলে মনে করলে অহংকার আসে না। দৈবী সম্পদের পূর্ণতা না হলেই অহংকার উৎপন্ন হয়। আমি 'সত্যবাদী' এই অহংকার এলেই বুঝতে হবে যে সত্যভাষণের মধ্যে কিছু অসত্য ভাষণও রয়েছে। মানুষের মধ্যে দৈবী প্রকৃতি তখনই প্রকটিত হয় যখন সাধকের একমাত্র উদ্দেশ্য থাকে ভগবৎ প্রাপ্তি করা। ভগবদ্ প্রাপ্তির জন্য দৈবী গুণের আশ্রিত হলে তার অভিমান (অহং, কর্তৃত্ববোধ) থাকে না। তার বদলে নম্রতা, সরলতা, নিরহংকারবোধ আসে এবং সাধন-ভজনে নিত্য উৎসাহ দেখা দেয়।

এইরূপ ভগবানে অনন্যচিত্ত ও দৈবীসম্পন্ন সাধকদের ভগবান 'মহাত্মা' বলে উল্লেখ করেছেন। তাঁরা কী করেন **'ভজন্ত্যনন্যমনসো জ্ঞাত্বা ভূতাদিমব্যয়ম্'** (গীতা ৯।১৩)। ভগবানই হলেন অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের অবিনাশী বীজ এবং দৃঢ়তা সহকারে ইহা মানাই হল ভগবানকে আদি ও অবিনাশী রূপে জানা। ভগবান পরের শ্লোকে বলেছেন ভক্তগণ হন **'নিত্যযুক্তাঃ'**, **'সততং কীর্তয়ন্তো'** এবং **'যতন্তশ্চ দৃঢ়ব্রতাঃ'** (গীতা ৯।১৪) অর্থাৎ সর্বক্ষণ

তাঁতে নিমগ্ন থেকে দৃঢ়ভাবে তাঁরই সাধনে মগ্ন থাকেন।

যারা জাগতিক ভোগ সংগ্রহাদিতে ব্যাপৃত থাকে তারা পারমার্থিক বিষয়ে দৃঢ়নিশ্চয় হতে পারে না। কিন্তু সত্যিকারের ভক্ত নিজেদের আমিত্বকে এইভাবে পরিবর্তন করে যে তার সততই বোধ হয় 'আমি ভগবানের ও ভগবান আমার' অথবা 'আমি সংসারের নই বা সংসারও আমার নয়। এইসব সাধক তাদের কর্মসকল এমনভাবে করেন যে মনে হয় সাংসারিক মানুষ মমত্ব সহকারে আত্মীয় প্রতিপালন করছে, বা লোভ সহকারে অর্থ উপার্জন করছে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাদের কর্মসকল সাংসারিক বলে মনে হলেও তা সাংসারিক নয় তাঁদের প্রচেষ্টার সকল উদ্দেশ্যই হলেন ভগবান। ভগবান ভক্ত সম্বন্ধে বলেছেন **কীর্তয়ন্তো, নমস্যন্ত** এবং **উপাসতে**।

কীর্তয়ন্ত—অর্থাৎ ভক্ত যা বলেন তা সবই ভগবানের গুণকীর্তন। তিনি যেসব ক্রিয়া-কর্ম করেন তা সবই ভগবানের সেবা। নিমিরাজের সভায় নব যোগীন্দ্রর অন্যতম 'কবি' ভক্তপ্রসঙ্গ বর্ণনা করে বলছেন—

কায়েন বাচা মনসেন্দ্রিয়ৈর্বা বুদ্ধ্যাঽঽত্মনা বানুসৃতস্বভাবাৎ।
করোতি যদ্ যৎ সকলং পরস্মৈ নারায়ণায়েতি সমর্পয়েৎ তৎ॥

(ভাগবত ১১।২।৩৬)

শরীর, মন, বাণী, ইন্দ্রিয়াদি, অহংকার অথবা অনুগত স্বভাবের নিমিত্ত ভক্ত যা কিছু করেন, তা সবই পরম পুরুষ নারায়ণের জন্যই, তাঁকেই সমর্পিত করে করেন।

এই ভক্তগণ কখনো প্রেমসহ গদ্‌গদ ভাবে নামকীর্তন করেন, কখনো নাম-জপ করেন, পাঠ করেন, কখনো নিত্য কর্ম করেন, কখনো বা ভগবদ্ সম্বন্ধীয় আলোচনা করেন, যা কিছু বলেন সবই ভগবানের স্তোত্রই হয়ে থাকে—'**স্তোত্রাণি সর্বা গিরঃ**'।

নমস্যন্ত—ভগবান ভক্তদের বলছেন তারা সদা '**নমস্যন্ত**' পরায়ণ অর্থাৎ ভক্তি সহকারে ভগবানকে প্রণিপাত করেন। তাঁদের মধ্যে নানা সদ্‌গুণ-সদাচার উদ্ভাসিত হলেও তাঁরা অবনত মস্তকে অনুধাবন করেন যে—'হে প্রভু! এ সবই আপনার কৃপায় হচ্ছে'।

উপাসতে—আর তাঁরা অনন্য ভক্ত তাই সর্বদা তাঁরই উপাসনা করে থাকেন, অর্থাৎ এঁরা কীর্তন প্রণিপাত তো করেনই, ইহা ব্যতিরেকে খাওয়া-দাওয়া, শয়ন-জাগরণ ইত্যাদি ক্রিয়াও ভগবৎ প্রসন্নতার উদ্দেশ্যেই করেন।

সঞ্চারঃ পদয়োঃ প্রদক্ষিণবিধিঃ স্তোত্রাণি সর্বা গিরো।

যদযৎ কর্ম করোমি তত্তদখিলং শম্ভো তবারাধনম্‌।। (শিবমানসপূজা)

হে শম্ভো ! আমার চলাফেরা, পরিক্রমা, সমস্ত শব্দ আপনারই স্তব। আমি যেসব কর্ম করি, সে সবই আপনার আরাধনা।

পরের শ্লোকে ভগবান দৈবী সম্পদসম্পন্নদের মধ্যেও বিভিন্ন প্রকার ভজনাকারী সম্পর্কে বলছেন—**'জ্ঞানযজ্ঞেন একত্বেন'** ও **'পৃথক্‌ত্বেন বিশ্বতোমুখম্‌'**।

একত্বেন—কোনো কোনো সাধক জ্ঞানযোগের অর্থাৎ বিবেক-বিচারের সাহায্যে জগৎ-সংসারকে অসৎরূপে মেনে তাকে স্বরূপতঃ পরিত্যাগ করে সর্বত্র পরিব্যাপ্ত পরমাত্মতত্ত্বকে ও নিজের স্বরূপকে এক বলে মেনে তাঁর নির্গুণ নিরাকার স্বরূপের উপাসনায় রত হন।

পৃথক্‌ত্বেন—আবার কোনো কোনো কর্মযোগী সাধক, সংসার মাত্রকেই ভগবানের বিরাটরূপ মনে করে নিজ শরীর-মন-বুদ্ধি-ইন্দ্রিয়াদি দ্বারা সংসারের সেবায় আত্মনিয়োগ করে এবং এতেই তাঁদের ভগবদ্‌কৃপার পূর্ণতা প্রাপ্তি ঘটে।

ভগবৎ আরাধনাকারীদের সম্পর্কে ভগবান সপ্তম অধ্যায়ে আরো বলেছেন সাধকগণ নিজস্ব রুচি, যোগ্যতা এবং শ্রদ্ধা-বিশ্বাস অনুসারে পৃথক পৃথক সাধনা দ্বারা যেভাবেই তাঁর উপাসনা করুক না কেন, তাতে ভগবানের সমগ্ররূপেরই উপাসনা করা হয়। ভগবান নবম অধ্যায়ে জানিয়েছেন দৈবীভাবাপন্নব্যক্তিরা তাঁকে উপাসনা করে (শ্লোক ১৩), আর সপ্তম অধ্যায়ে (শ্লোক ২৮-৩০) বলেছেন দ্বন্দ্ব-মোহমুক্ত ব্যক্তি, পাপহীন ব্যক্তি, জরা-মৃত্যু থেকে মুক্তিকামী ব্যক্তি এবং আধিভূত, আধিদৈব এবং আধিযজ্ঞসহ ভগবানকে জানা ব্যক্তিও ভগবৎ আরাধনায় রত হন।

ভগবান বলছেন **'যেষাং ত্বন্তগতং পাপং জনানাং পুণ্যকর্মণাম্‌'** অর্থাৎ

যাঁদের ভগবানে আকৃষ্ট হওয়ার ফলে পাপের শিকড় (মূল) ছিন্ন হয়েছে তারাই ভগবৎ ভজনা করে থাকেন। ভগবৎ বৈমুখ্যতাই সমস্ত পাপের মূল কারণ। সাধুরা বলেন দেড়টি পাপ আর দেড়টি পুণ্য। ভগবানে বিমুখ হওয়া পুরো পাপ ও দুর্গুণ-দুরাচারী হওয়া অর্ধেক পাপ—এই হল দেড়টি পুরো পাপ। আবার ভগবানে আকৃষ্ট হওয়া পুরো পুণ্য এবং সদগুণ-সদাচারী হওয়া অর্ধপুণ্য। সব মিলিয়ে দেড়টি পুণ্য। যখন মানুষ সর্বতোভাবে ভগবানের শরণাগত হয় তখন তার সমস্ত পাপের অন্ত হয়।

নিমি রাজসভায় নবযোগীন্দ্রর অন্যতম 'করভাজন' বলেছেন—

স্বপাদ-মূলং ভজতঃ প্রিয়স্য ত্যক্তান্যভাবস্য হরিঃ পরেশঃ।
বিকর্ম যচ্চোৎ পতিতং কথঞ্চিদ্ ধুনোতি সর্বং হৃদি সন্নিবিষ্টঃ॥

(ভাগবত ১১।৫।৪২)

পরমেশ্বর হরি তাঁর পাদসেবী অনন্যভাবাপন্ন ভক্তের হৃদয়ে সন্নিবিষ্ট থাকেন। ক্বচিৎ কখনো যদি তারা পুরাতন সংস্কারবশত পাপকার্য করেও ফেলে তবুও তা স্থায়ী হয় না, কেননা হৃদয়ে নিত্য বিরাজমান ভগবানই তা দূর করে দেন।

এইভাবে পুণ্যকর্মা ব্যক্তিগণ দ্বন্দ্বরূপ মোহ বর্জন করে দৃঢ়ব্রতী হয়ে ভগবানের ভজনা করেন। মানুষের মনে দ্বন্দ্ব[১] নানা কারণে হতে পারে—

(১) ভগবানে মনোনিবেশ করব না সাংসারিক কাজ করব পরলোকের জন্য ভগবানের ভজনা প্রয়োজন আবার ইহলোকের জন্য প্রয়োজন সাংসারিক কাজ। কোন্‌টি করব?

(২) পরমাত্মার ভজনেও নানা দ্বন্দ্ব আসে—

ক) বৈষ্ণব, শৈব, শাক্ত, গাণপত্য ও সৌর এই সম্প্রদায়ের মধ্যে কোন্‌টির অন্তর্ভুক্ত হবে।

খ) পরমাত্মার স্বরূপের কোন্‌টি স্বীকার করব কোন্‌টি করব না—দ্বৈত, অদ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত, শুদ্ধাদ্বৈত, অচিন্ত্যভেদাভেদ তত্ত্ব ইত্যাদি।

---

[১]সংসারের অনুকূল-প্রতিকূল, হর্ষ-বিষাদ, সুখ-দুঃখ, রাগ-দ্বেষ আদি সমস্ত বিপরীতমুখী ভাবকে বলা হয় দ্বন্দ্ব।

গ) পরমাত্মা প্রাপ্তির কোন্ পথ অনুকরণ করব—ভক্তিযোগ, জ্ঞানযোগ, কর্মযোগ, ধ্যানযোগ, লয়যোগ, মন্ত্রযোগ ইত্যাদি ইত্যাদি।

উপরোক্ত সমস্ত পারমার্থিক ও সাংসারিক দ্বন্দ্ব থেকে মুক্ত হয়ে দৃঢ়ব্রতী মানুষই ভগবানকে ভজনা করেন। উপাসনার পদ্ধতি ভিন্ন ভিন্ন হলেও, লক্ষ্য সকলের এক হওয়ায় কোনো পদ্ধতিই ছোট বা বড় নয়। যে সাধকের যে পদ্ধতিতে শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস আছে তার পক্ষে সেই পদ্ধতিই শ্রেষ্ঠ এবং তার সেটিই অনুসরণ করা উচিত। কিন্তু অপরের পদ্ধতি বা নিষ্ঠার নিন্দা করা বা আরাধনাকে দ্বিতীয় শ্রেণীর মনে করা অন্যায়। তাই সমস্ত পদ্ধতির এবং নিষ্ঠার সম্মান করতে হয়, কিন্তু অনুসরণ করতে হয় নিজ পদ্ধতির এবং নিষ্ঠার, তাহলে সাধন বিষয়ে দ্বন্দ্ব দূর হয়।

আর 'দৃঢ়ব্রতাঃ' হওয়ার অর্থ হল 'আমাদের সংসার বিমুখ হতে হবে এবং ভগবদ্ অভিমুখে যাত্রা করতে হবে'—এটি দৃঢ়ভাবে অনুসরণ করা যা হল সর্বদর্শনের সার।

মনুষ্যদেহ ভোগযোনি নয় কর্মযোনি। সাধু-সন্তের বাণী ও শাস্ত্রানুযায়ী মনুষ্যদেহ শুধুমাত্র ঈশ্বরলাভের জন্যই প্রাপ্ত হয়েছে। অন্য জন্মে কর্মফলের ভোগে পাপ নাশ হলেও স্বভাব যে শোধরাবে তার কোনো নিশ্চয়তা নেই ; যেমন চুরাশী লক্ষ জন্ম এবং নরক ভোগ করলে পাপ নাশ হয়ে যায় কিন্তু স্বভাব বদলায় না। কিন্তু মনুষ্য দেহে পাপ থাকলেও সাধকের স্বভাবের পরিবর্তন আসতে পারে যেমন—পাপ অবশিষ্ট থাকলে তার ফলরূপে প্রতিকূল পরিস্থিতি (অসুখ ইত্যাদি) আসে, কিন্তু সৎসঙ্গের দ্বারা, অহংভাবের পরিবর্তন দ্বারা সাধকের স্বভাব পরিবর্তিত হলে, এই প্রতিকূল পরিস্থিতিও তার মনে দুঃখ উৎপাদন করে না বরং ভগবৎ কৃপারূপে প্রতিভাত হয়। মনুষ্য-জীবনে পুরাতন পুণ্য অনুযায়ী যেসব অনুকূল পরিস্থিতি আসে বা পুরাতন পাপ অনুযায়ী যেসব প্রতিকূল পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়, সে সবই তখন সাধকের কাছে সাধন বস্তু হয়। অনুকূল পরিস্থিতি এলে সকলের সেবা করতে হয় যাতে অহং নাশ হয় এবং প্রতিকূল পরিস্থিতি এলে আনুকূল্যের ইচ্ছে পরিত্যাগ করতে হয়—সাধকের এই হল মুখ্য কাজ।

আবার দেখা যায় অনুকূল পরিস্থিতিতে পুরাতন পুণ্য নাশ হয় এবং বর্তমান ভোগে আবদ্ধ হওয়ার সম্ভাবনাও থেকে যায়। কিন্তু প্রতিকূল পরিস্থিতিতে পুরাতন পাপের ক্ষয় হয় এবং বর্তমানে বেশি সতর্কতা এবং সাবধানতা থাকে তার ফলে সাধন অনায়াস হয়। সেইজন্য সাধুগণ সাংসারিক প্রতিকূল পরিস্থিতিকে অনাদর করেন না।

এই অধ্যায়ের পরের শ্লোকে ভগবান বলছেন **'জরামরণমোক্ষায় মামাশ্রিত্য যতন্তি যে'** (গীতা ৭।২৯) অর্থাৎ যারা জরা-মরণ রূপ ভীতি থেকে মুক্ত হতে চায় তারাও আমার শরণ নেয়। তবে জরা-মরণ থেকে মুক্ত হওয়ার অর্থ এই নয় যে বৃদ্ধাবস্থা না হওয়া বা মৃত্যু না হওয়া। এর অর্থ হল বৃদ্ধাবস্থা ও মৃত্যু তো অবশ্যই আসবে কিন্তু এগুলো যেন তাকে অন্তর থেকে দুঃখী করতে না পারে। যেমন, কোনো এক যুবকের, যার এখনও বৃদ্ধাবস্থা আসেনি সে বর্তমানে জরা-মরণ থেকে মুক্ত কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই জরা-মরণ তার যৌবনে অন্তর্নিহিত আছে। কিন্তু জীবন্মুক্ত মহাপুরুষের শরীরে জরা এবং মৃত্যু এলেও তিনি এগুলি থেকে মুক্ত। এটা তখনই সম্ভব যখন মানুষ আমি ও আমার ভাব থেকে মুক্ত হয়। তাহলে সে জরা-মৃত্যু থেকে মুক্ত হয়ে যাবে। ভগবান তাই চতুর্দশ অধ্যায়ে বলেছেন **'জন্মমৃত্যুজরাদুঃখৈ-র্বিমুক্তোঽমৃতমশ্নুতে'** (গীতা ১৪।২০) অর্থাৎ জন্ম, মৃত্যু, জরা, দুঃখ আদিতে ভীতি দর্শন না করা। বর্তমান শ্লোকে এর উপায় হিসাবে ভগবান বলেছেন **'মামাশ্রিত্য যতন্তি যে'** অর্থাৎ শাস্ত্রানুসারে উদ্যোগে তৎপর হবে (যতন্তি যে) এবং সেই উদ্যোগের সাফল্যকে ভগবানের বলে মানবে (মামশ্রিত্য)। কিন্তু তা না করে যদি 'আমি এটা করেছি তার এই ফল লাভ হল' এই চিন্তা আসে তবে 'অহংভাব' এবং যদি 'ভগবানের কৃপায় সব হয়ে যাবে' এই চিন্তা আসে তবে আলস্য ভাব জাগ্রত হয়, যা হল রজগুণ ও তমগুণের বৃত্তি।

এইভাবে সংসার বিমুখ হয়ে এবং ভগবানে শরণাগত হয়ে যারা প্রযত্ন করেন, ভগবান তাঁদের সমগ্ররূপে বোধ ও প্রেম প্রাপ্তি করান— **'তে ব্রহ্ম তদ্বিদুঃ কৃৎস্নম্ আধ্যাত্মং কর্ম চাখিলম্'** (গীতা ৭।২৯) অর্থাৎ তাঁরা সমগ্র

ব্রহ্ম এবং সমগ্র জ্ঞানযোগ ও কর্মযোগ প্রাপ্ত হন।

এই অধ্যায়ের শেষ শ্লোকে ভগবান বলছেন যেসব সাধক অধিভূত, অধিদৈব ও অধিযজ্ঞ সহ আমাকে জানেন তাঁরা মৃত্যুকালেও আমাকে জানতে পারেন। **'স অধিভূতাধিদেবং মাং সাধিযজ্ঞং যে বিদুঃ।' 'প্রয়াণকালেঽপি চ মাং তে বিদুর্যুক্তচেতসঃ ॥'** (গীতা ৭।৩০)। এখানে অধিভূত, অধিদৈব ও অধিযজ্ঞের অর্থ হচ্ছে তমোগুণ, রজোগুণ ও সত্ত্বগুণের সৃষ্টিকারী ভগবানকে তত্ত্বত জানা।

এখানে ভৌতিক স্থূল সৃষ্টিকেই বলা হয়েছে 'অধিভূত' যাতে তমোগুণের প্রাধান্য থাকে। এই ভৌতিক স্থূল-সৃষ্টি বা অধিভূতের অস্তিত্ব ভগবান ব্যতিরেকে সম্ভব হয় না অর্থাৎ তত্ত্বত এই জগৎ-সংসার ভগবানেরই স্বরূপ—এটি জানাই অধিভূত সহ ভগবানকে জানা। অধিদৈব হল জগৎ-সৃজনকারী হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মা এবং তাঁর রজোগুণের প্রাধান্য থাকে। ভগবান ব্রহ্মার রূপে প্রকটিত হন অর্থাৎ তত্ত্বত ব্রহ্মা হলেন ভগবৎ স্বরূপই—এটি জানাই অধিদৈব সহ ভগবানকে জানা।

বিষ্ণুকে বলা হয় অধিযজ্ঞ, তিনি সত্ত্বগুণের প্রতিভূ এবং অন্তর্যামীরূপে সর্বত্র ব্যপ্ত হয়ে আছেন। তত্ত্বত ভগবান অন্তর্যামীরূপে সর্বত্র পরিপূর্ণ—এটি জানাই অধিযজ্ঞ সহ ভগবানকে জানা।

ভগবান এই সব সাধকদের সম্বন্ধে বলেছেন—**'প্রয়াণকালেঽপি চ মাং তে বিদুর্যুক্তচেতসঃ'** অর্থাৎ মৃত্যুকালেও তাদের এই ভগবৎস্মৃতি জাগ্রত থাকে। ভগবান অষ্টম অধ্যায়ে বলেছেন **'অন্তকালে চ মামেব স্মরন্ মুক্ত্বা কলেবরম্। যঃ প্রয়াতি স মদ্ভাবং যাতি নাস্ত্যত্র সংশয়** (গীতা ৮।৫) অর্থাৎ অন্তকালে যে আমাকে চিন্তা করে দেহত্যাগ করে, সে আমাকেই প্রাপ্ত হয় আর এখানে বলছেন এইসব সাধকেরা মৃত্যুর সময়ও যোগভ্রষ্ট হন না, তাদের মনে সদাই তাঁর স্মৃতি জাগরূক থাকে তাই তারা তাঁকেই প্রাপ্ত হন।

ভগবান এই দশম অধ্যায়ের তৃতীয় শ্লোকে অন্যান্য উপাসনাকারীদের সম্বন্ধে বলে এই প্রকরণটি শেষ করেছেন। যারা 'অসম্মূঢ়' ভাবে তাঁর অজ, অনাদি এবং মহেশ্বররূপ অনুধাবন করে, তারাই পাপ হতে মুক্ত হয়ে তাঁকে

পায়। ভগবান বলেছেন, তিনি অজ অর্থাৎ জন্মরহিত বা সৃষ্টি রহস্যের অতীত, তিনি অনাদি অর্থাৎ এই যে কাল যাতে আদি-অনাদি শব্দ প্রযুক্ত হয় কারণ তিনি 'সেই কালেরও কাল', সেই কালাতীত ভগবানেই কালেরও আদি ও অন্ত হয়। তিনি সর্বলোকের মহেশ্বর অর্থাৎ স্বর্গ, মর্ত, পাতাল বা এই বিশ্বে যত প্রাণী আছে বা সেই প্রাণীদের যত অধিদেবতা (পৃথক পৃথক অধিকার প্রাপ্ত প্রভু) আছেন, তিনি সবারই মহেশ্বর। যে ভগবানকে নিজেকে সহ সমস্ত জগতের মালিকরূপে দৃঢ়ভাবে মেনে নিয়েছে এবং জগতের ক্ষণভঙ্গুরতাকে তত্ত্বত জেনেছে তার 'আমি' ও 'আমার' ভাব থাকতে পারে না। একমাত্র ভগবানেই তাঁর আত্মীয়তাবোধ জন্মায়। এই বাস্তবিক তথ্য জানাই হল 'অসম্মূঢ়তা'। ভগবান বলছেন এই প্রকার অসম্মূঢ় চিত্তে উপাসনাকারী সাধকই '**সর্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে**' অর্থাৎ গুণাদি সঙ্গরহিত হয়। গুণাদির সঙ্গ যতক্ষণ থাকে ততক্ষণ মানুষ পাপ হতে মুক্ত হতে পারে না, কারণ পাপের মূল কারণই হল গুণাদির সঙ্গ।

ভগবান তাঁর আরাধনাকারীদের সম্বন্ধে বিস্তৃতভাবে বলে এবার ভজনকারীদের প্রকারভেদ সম্বন্ধে বলছেন।

২. ভক্তের প্রকারভেদ—(৭।১৬-১৯, ৯।৩০-৩৪)

ভগবান এই প্রকরণের সপ্তম অধ্যায়ে চার প্রকার ভক্ত ও নবম অধ্যায়ের সাত প্রকার অধিকারীর বর্ণনা করেছেন।

সপ্তম অধ্যায়ের চারটি শ্লোকে (১৬-১৯) ভগবান প্রথমে চারপ্রকার ভক্তের কথা বলেছেন, তারা হল—অর্থার্থী, আর্ত, জিজ্ঞাসু ও জ্ঞানী। এই সব ভক্তকেই ভগবান '**সুকৃতিনঃ জনাঃ**' '**উদারাঃ**' ইত্যাদি বলে সম্বোধন করেছেন অর্থাৎ এঁরা ভগবানে অনুরক্ত। এঁরা যোগভ্রষ্ট ব্যক্তিদের (৬।৪১-৪২) থেকে ভিন্ন। আবার এঁরা শাস্ত্রসম্মত পুণ্যকর্মকারীও নন, এঁরা ভগবানের সঙ্গে নিজ সম্পর্ক স্থাপন করে হন ভগবদ্ কর্ম সম্পাদনকারী।

সকাম ব্যক্তিরা কামনা পূরণের জন্য অস্থির থাকায় এই অধ্যায়েরই ২০ সংখ্যক শ্লোকে ভগবান তাদের '**কামৈস্তৈস্তৈর্হৃতজ্ঞানাঃ**' বলে অভিহিত করেছেন। তারা কামনা পূরণের জন্য অন্য দেবতাদের আশ্রয় গ্রহণ করে।

কিন্তু অর্থার্থী ও আর্ত ভক্তদের 'হৃতজ্ঞানাঃ' বলা যায় না কারণ এদের কামনার কিছু তারতম্য থাকলেও এঁরা ভগবদ্‌নিষ্ঠ তাই ভগবান এদের **'সুকৃতিনঃ'** ও **'উদারাঃ'** বলেছেন। ভগবানের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা যত বৃদ্ধি পেতে থাকে, এদের অন্তরে সকাম ভাবও তত দূর হয়ে ঈশ্বরের প্রতি অনুরাগ বিশেষভাবে জাগ্রত হতে থাকে। ভগবানের ভজনাকারী সুকৃতি মানুষই 'জনাঃ' অর্থাৎ মানুষ নামের উপযুক্ত। ভগবানে যার মতি হয়েছে তিনিই ভাগ্যশালী, মনুষ্য পদবাচ্য। পূর্বজন্মের কোনো পুণ্যফলে হোক বা বিপদকালে অন্যের সহায়তা না পাওয়ার জন্যই হোক অথবা কোনো বিষম দুঃখ বিহ্বলতার জন্যই হোক বা সৎসঙ্গ-স্বাধ্যায় বা বিচার ইত্যাদির দ্বারাই হোক—যে কোনো কারণেই হোক না কেন, ভগবানে মতি হলে তারা সকলেই সুকৃতিকারী।

এই চার প্রকার ভক্তর স্বভাব কী ?

(ক) অর্থার্থী ভক্ত—যাদের ন্যায়সঙ্গত ভাবে সুখ-সুবিধার ইচ্ছা হয়, কিন্তু তারা কেবল ভগবানের কাছ থেকেই তা চায়, অন্য কারো থেকে নয়—তাদেরই অর্থার্থী ভক্ত বলে।

চার প্রকার ভক্তর মধ্যে অর্থার্থী ভক্তকেই প্রারম্ভিক ভক্ত বলে। যাদের ধনলাভ বা অন্যান্য সুখের ইচ্ছা থাকে এবং প্রাপ্তির জন্য তারা সাংসারিক সাহায্য নেয় বা কখনো কখনো ভগবানকেও স্মরণ করে তারা অর্থার্থী ভক্ত নয় এরা হল কেবল 'অর্থার্থী' বা 'অর্থের ভক্ত'। কিন্তু যাদের মধ্যে ভগবানের আশ্রয়ই মুখ্য থাকে, তাদের মন ভগবদ্ নিবিষ্ট থাকায় ক্রমে ক্রমে তাদের মধ্যে অর্থ বা অন্যান্য সুখ-সুবিধাদির ইচ্ছে কমে যায় এবং অবশেষে তা একেবারেই দূর হয়ে যায়। এরাই হল 'অর্থার্থী ভক্ত' যাদের মধ্যে একজন হল 'ভক্ত ধ্রুব'।

ধ্রুব—ভাগবতের চতুর্থ স্কন্ধের অষ্টম অধ্যায় থেকে দ্বাদশ অধ্যায় পর্যন্ত মৈত্রেয় মুনি কর্তৃক বিদুরকে ধ্রুবর উপাখ্যান বলা হয়েছে। ব্রহ্মার অংশ থেকে সৃষ্ট হন সায়ম্ভুব মনু ও শতরূপা। তাদের পুত্র উত্তানপাদ ও উত্তানপাদের পুত্র হলেন ধ্রুব। অতি অল্পবয়সে (পাঁচ বৎসর) ধ্রুব বিমাতার

কুবাক্যে ব্যথিত হয়ে অভিমানবশত ভগবানের আরাধনার নিমিত্ত গৃহত্যাগ করেন। যদিও ধ্রুব পিতৃস্নেহ ও রাজ্যলাভের আশায় গৃহত্যাগ করেন কিন্তু ভগবানের পরমভক্ত দেবর্ষি নারদ ধ্রুবকে দেখেই বুঝেছিলেন এ বালক সামান্য নয়। তিনি উপদেশ দিলেন—

পরিতুষ্যেত্ততস্তাত তাবন্মাত্রেণ পূরুষঃ।
দৈবোপসাদিতং যাবদ্বীক্ষ্যেশ্বরগতিং বুধ॥ (ভাগবত ৪।৮।২৯)

হে ধ্রুব ! বিজ্ঞ ব্যক্তির সতত মনন করা উচিত ঈশ্বরই একমাত্র গতি অর্থাৎ কর্মের ফলাফল সমস্তই একমাত্র ঈশ্বরের ইচ্ছায় সম্পাদিত হয়। এই ধারণা রেখে ভাগ্যানুসারে যখন যেমন পরিস্থিতি উপস্থিত হয় তাতেই সন্তুষ্ট থাকা উচিত। নারদ এই বলে তাঁকে 'ওঁ নমো ভাগবতে বাসুদেবায়'—এই দ্বাদশ অক্ষরযুক্ত কৃষ্ণ মন্ত্রে দীক্ষা দিলেন। তিনি আরো বললেন—

লব্ধা দ্রব্যময়ীমর্চাং ক্ষিত্যম্বাদিষু বার্চয়েৎ।
আভৃতাত্মা মুনিঃ শান্তো যতবাঙ্‌মিতবন্যভুক্॥ (ভাগবত ৪।৮।৫৬)

শিলাদি নির্মিত প্রতিমা পেলে ভাল, না হলে মৃত্তিকা জলাদিতে শ্রীভগবানের অর্চনা করবে। এইরূপে ক্রমশ মন সম্যক্ একাগ্র ও বাক্য সংযত করে শান্তচিত্ত হবে। নারদের উপদেশানুসারে ভক্ত ধ্রুব একাগ্রমনে ভগবান পুরুষোত্তমের উপাসনা আরম্ভ করলেন—**'সমাহিতঃ পর্যচরদৃষ্যা-দেশেন পূরুষম্'** (ভাগবত ৪।৮।৭১)।

ধ্রুবর ঐকান্তিক তপস্যায় প্রীত হয়ে ভগবান শ্রীহরি মাত্র ছয় মাসের মধ্যেই ধ্রুবকে দর্শন দিয়ে কৃতার্থ করলেন।

যদিও তপস্যাকালেই ধ্রুবর জাগতিক আকাঙ্ক্ষা দূর হয়ে গিয়েছিল, তবু ভক্তাকাঙ্ক্ষা পূরণকারী ভগবান বরদান করলেন যে ৩৬০০০ হাজার বছর পিতৃরাজ্য শাসন করে তৎপরে **'ততো গন্তাসি মৎস্থানং'** (৪।৯।২৫) আমার সমীপে আসবে।

এইরূপে ভগবানের কাছ থেকে বরপ্রাপ্ত হয়ে জিতেন্দ্রিয় ধ্রুব মহারাজ বিষয় ভোগ দ্বারা প্রাপ্ত শুভ অদৃষ্টসমূহ ও যজ্ঞাদি দ্বারা প্রাপ্ত দৃষ্টসমূহ ক্ষয় করে, ভগবৎ চিন্তার জন্য বদরীকাশ্রম গমন করলেন। সেখানে ধ্রুব আবার

হরিভজনা শুরু করলেন।

ভক্তিং হরৌ ভগবতি প্রবহন্নজস্রমানন্দবাস্পকলয়া মুহুরর্দ্যমানঃ।
বিক্লিদ্যমানহৃদয়ঃ পুলকাচিতাঙ্গো নাত্মানমস্মরদসাবিতি মুক্তলিঙ্গঃ।।

(ভাগবত ৪।১২।১৮)

ভগবান হরির প্রতি অবিচ্ছিন্ন ভাবধারা বহন করতে করতে ধ্রুব মুহুর্মুহু আনন্দাশ্রু প্রবাহে অভিভূত হতে লাগলেন। তাঁর সর্বশরীর রোমাঞ্চিত হল, চিত্ত দ্রবীভূত হল। এর ফলে তাঁর দেহাভিমান দূর হল আর আমিত্ব চিন্তা থাকল না। তখন ধ্রুব দেখলেন তাঁকে ভগবৎধামে নিয়ে যাওয়ার জন্য উত্তম রথ উপস্থিত। ধ্রুবও মৃত্যু সমাগত দেখে (শরীর ত্যাগের সময় উপস্থিত বুঝে) নিজেকে প্রস্তুত করলেন। এমন সময় ধর্মরাজ উপস্থিত হয়ে বললেন—হে মহারাজ ধ্রুব ! ভগবৎভক্ত আমার অধিকারের বাইরে, কিন্তু আমি যেহেতু লোকপাল, তাই আমাকে অঙ্গীকার মাত্র করে, আমার মস্তকে আপনার উত্তরীয় অর্পণ করে এবং তাতে পা দিয়ে রথারোহণ করুন।

তদোত্তানপদঃ পুত্রো দদর্শান্তকমাগতম্।
মৃত্যোর্মূর্ধ্নি পদং দত্ত্বা আরুরোহাদ্ভুতং গৃহম্।। (ভাগবত ৪।১২।৩০)

মহারাজ ধ্রুবও তখন মৃত্যুকে দেখে তাঁর মস্তকে পদাঘাত (পদদ্বয় স্থাপন করে) সেই উত্তম বিমানে আরোহণ করে ধ্রুবলোকে গমন করলেন।

ইতি উত্তানপাদঃ পুত্রো ধ্রুবঃ কৃষ্ণপরায়ণঃ।
অভূৎ ত্রয়াণাং লোকানাং চূড়ামণিরিবামলঃ।। (ভাগবত ৪।১২।৩৮)

এইরূপে পরমভাগবৎ উত্তানপাদ পুত্র মহারাজ ধ্রুব, ত্রিভুবনের নির্মল চূড়ামণিস্বরূপ হয়েছিলেন।

(খ) আর্তভক্ত—যে সব ভক্ত প্রাণ-সঙ্কট হলে, বিপদ এলে, ইচ্ছের বিরুদ্ধে ঘটনা ঘটলে নিজ দুঃখ দূর করার জন্য ভগবানকে ডাকেন ও কেবল তাঁরই আশ্রয় গ্রহণ করেন তাদের 'আর্তভক্ত' বলে। দ্রৌপদী, গজেন্দ্র ও উত্তরা আর্তভক্ত। তবে উত্তরা প্রথম থেকেই কেবলমাত্র ভগবানের আশ্রয় নেওয়ায় তিনিই প্রকৃত আর্ত ভক্ত।

গজেন্দ্র—ক্ষিরোদ সাগর পরিবেষ্টিত ত্রিকুট পর্বতে এক মহাগজ হস্তিনী

ও হস্তিশাবক সহ বাস করত। একবার নিকটস্থ এক সরোবরে জলপান করার সময় গজেন্দ্র এক মহাকুমীর কর্তৃক আক্রান্ত হয়। সহসা আক্রান্ত মহাগজ, কুম্ভীরটিকে তীরের দিকে আর কুম্ভীরটি মহাগজকে জলমধ্যে আকর্ষণ করতে লাগল। হস্তিযূথের অন্যান্য হস্তিসমূহও যূথপতিকে এইরূপ আক্রান্ত দেখে সাহায্য করতে এগিয়ে এলেও বিশেষ কিছু করতে পারল না। কালক্রমে গজরাজ হীনবল হওয়ায় কুম্ভীর ক্রমে তাকে জলের মধ্যে আকর্ষণ করতে উদ্যত হল।

শ্রীশুকদেব বলছেন—

এবং ব্যবসিতো বুদ্ধ্যা সমাধায় মনো হৃদি।
জজাপ পরমং জাপ্যং প্রাগ্‌জন্মন্যনুশিক্ষিতম্‌॥ (ভাগবত ৮।৩।১)

নিজ প্রাণধারণে অসমর্থ হয়ে গজেন্দ্র স্থিরচিত্ত হয়ে পূর্বজন্মাভ্যস্ত পবিত্র স্তব জপ করতে লাগলেন। গজেন্দ্রর এই স্তব ভাগবতের তৃতীয় অধ্যায়ে ২-২৯ শ্লোকে বর্ণিত হয়েছে—

নমঃ শান্তায় ঘোরায় মূঢ়ায় গুণধর্মিণে।
নির্বিশেষায় সাম্যায় নমো জ্ঞানঘনায় চ॥ (ভাগবত ৮।৩।১২)

হে ভগবন্‌ ! তুমি সাধুদিগের প্রতি শান্ত, খলের প্রতি উগ্র এবং সংসারকারীগণের (বদ্ধজীবের ও ইতর প্রাণীদের) থেকে প্রচ্ছন্ন থাক। আমি তোমার কাছে, অন্তরে ও বাহিরে অবিবেক আবৃত গজদেহ রক্ষার প্রার্থনা করি না। আমি অবিনাশী এই আত্মার অজ্ঞানতা নাশক মুক্তিই প্রার্থনা করি।

গজেন্দ্রর আকুল প্রার্থনা শুনে ভগবান গরুড়পৃষ্ঠে আরূঢ় হয়ে চক্রহস্তে তার দৃশ্যপথে আবির্ভূত হলেন। তখন সেই মহাগজ অনেক কষ্টে—

উৎক্ষিপ্য সাম্বুজকরং গিরমাহ।
কৃচ্ছ্রান্‌ নারায়ণে অখিলগুরো ভগবন্‌ নমস্তে॥ (ভাগবত ৮।৩।৩২)

হে নারায়ণ, হে অখিলগুরু আপনাকে প্রণাম বলে নিবেদন করল। ভগবান স্বীয় ভক্ত গজেন্দ্রকে পীড়িত দেখে, দ্রুত চক্র দ্বারা কুম্ভীরকে নাশ করে গজেন্দ্রকে মুক্ত করলেন।

তখন গজেন্দ্র ও কুম্ভীর দুজনাই মুক্ত হলেন।

সোঽনুকম্পিত ঈশেন পরিক্রম্য প্রণম্য তম্।

লোকস্য পশ্যতো লোকং স্বমগান্মুক্তকিল্বিষঃ।। (ভাগবত ৮।৪।৫)

ভগবান কর্তৃক অনুগৃহীত ঐ কুম্ভীর তখন নিষ্পাপ গন্ধর্ব হয়ে, শ্রীহরিকে প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করে স্বীয়ধাম গন্ধর্বলোকে গমন করল।

আর গজেন্দ্রর কি হল ?

গজেন্দ্রো ভগবৎস্পর্শাদ্বিমুক্তোঽজ্ঞানবন্ধনাৎ।

প্রাপ্তো ভগবতো রূপং পীতবাসা চতুর্ভুজঃ।। (ভাগবত ৮।৪।৬)

গজেন্দ্র ভগবানের স্পর্শে অজ্ঞান বন্ধন থেকে মুক্ত হলেন এবং পীতাম্বর ও চতুর্বাহু প্রাপ্ত হয়ে ভগবানের সারূপ্য মুক্তি লাভ করলেন।

এখন বক্তব্য এই যে মূঢ় যোনিতে জন্ম হয়েও গজেন্দ্র কী করে সারূপ্য মুক্তি ও কুম্ভীর দেবলোক লাভ করলেন ?

শ্রীশুকদেব বলছেন—ঐ গজেন্দ্র পূর্বজন্মে দ্রাবিড়শ্রেষ্ঠ বিষ্ণুভক্ত ইন্দ্রদ্যুম্ন নামে এক রাজা ছিলেন। তিনি কুলাচলে আশ্রম নির্মাণ করে আরাধনায় রত অবস্থায় একদিন অগস্ত্য মুনি এসে উপস্থিত হন। তিনি রাজাকে অতিথি সৎকার না করে ধ্যানরত অবস্থায় দেখে হস্তিযোনি প্রাপ্তির অভিশাপ দেন। কিন্তু '**হর্যর্চনানুভাবেন যদ্ গজত্বেঽপ্যনুস্মৃতিঃ**' (ভাগবত ৮।৪।১২), হস্তিযোনি প্রাপ্ত হলেও শ্রীহরির প্রভাবে তাঁর পূর্বস্মৃতি নষ্ট হল না। অন্তিমকালে ভগবৎনাম মনে আসায়, শ্রীহরি গজেন্দ্রকে পার্ষদগতি দান করেন। আর কুম্ভীর পূর্বজন্মে ছিলেন গন্ধর্বরাজ হুহু। তিনি জলক্রিড়ার সময় দুর্বুদ্ধিবশত স্নানরত দেবল মুনির পাদদ্বয় আকর্ষণ করায় শাপগ্রস্ত হয়ে কুম্ভীর যোনি প্রাপ্ত হন। পরে রাজা ক্ষমা প্রার্থনা করায় মুনি অনুকম্পা করে বলেন, ভগবান গজেন্দ্রের উদ্ধারের সময় তোমাকেও উদ্ধার করবেন।

(গ) জিজ্ঞাসু ভক্ত—যাঁদের নিজের স্বরূপ, ভগবদ্‌তত্ত্ব জানার তীব্র আকাঙ্ক্ষা জাগে আর এই তত্ত্ব জানার জন্য শাস্ত্র, গুরু বা পুরুষার্থর (শ্রবণ, মনন, নিধিধ্যাসন ইত্যাদি উপায়ের) সাহায্য না নিয়ে কেবল ভগবানের আশ্রিত হয়েই তাঁর কাছ থেকে এই তত্ত্ব জানতে চায় তারাই জিজ্ঞাসু ভক্ত।

জিজ্ঞাসু ভক্তদের মধ্যে 'নচিকেতা' ও 'উদ্ধব' উল্লেখ্য। তবে নচিকেতা

গিয়েছিলেন যমরাজার কাছে ভগবান জ্ঞানে এবং ভগবদ্‌তত্ত্ব প্রাপ্ত হওয়ার জন্য আর উদ্ধব সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণের কাছেই উপদেশ প্রাপ্ত হয়েছেন।

নচিকেতা—যম-নচিকেতা আখ্যানটি কঠ উপনিষদে বর্ণিত হয়েছে। ঋষি বাজশ্রবস এক যজ্ঞ করেছিলেন, তাতে দানের জন্য যে গাভীগুলি আনা হয়েছিল তা ছিল অস্থিচর্মসার, বৃদ্ধ ও অকর্মণ্য। বাজশ্রবসের পুত্র নচিকেতা তা দেখে দুঃখিত হয়ে পিতাকে বারংবার জিজ্ঞাসা করলেন, বাবা আমাকে কাকে দান করলেন, কারণ যজ্ঞে দান প্রিয়বস্তুকেই করা হয়, নিকৃষ্ট জিনিসকে নয়। পিতা তখন ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন, তোমায় যমরাজকে দিলাম। নচিকেতা পিতার আজ্ঞায় যমলোকে গিয়ে উপস্থিত হলেন। সেখানে নচিকেতা যমরাজের কাছ থেকে তিনটি বর পেলেন।

নচিকেতা ভগবৎ জ্ঞানে যমরাজকে অর্চনা করে প্রথম বরে 'পিতার ক্ষমালাভ', দ্বিতীয় বরে 'স্বর্গলাভের সাধনভূত অগ্নিবিদ্যা' ও তৃতীয় বরে 'আত্মার স্বরূপ-জ্ঞান' প্রার্থনা করলেন। যমরাজ প্রথম দুটি বর সহজে পূরণ করলেও তৃতীয় বরের জন্য তাকে নানা ভাবে পরীক্ষা করলেন ও অনেক প্রলোভন এবং অন্য বর প্রার্থনার অনুরোধ করলেন। কিন্তু দৃঢ়প্রতিজ্ঞ 'জিজ্ঞাসু নচিকেতা' বললেন—

'যোঽয়ং বরো গূঢ়মনুপ্রবিষ্টো নান্যং তস্মান্নচিকেতো বৃণীতে'

(কঠ. ১।১।২৯)

যে আত্মতত্ত্ব অতি গূঢ় এবং চিন্তাদ্বারা দুষ্প্রাপ্য সেই বর ছাড়া নচিকেতা অন্য কিছুই প্রার্থনা করে না। তখন যমরাজ বললেন—**'ত্বাদৃঙ্‌ নো ভূয়ান্নচিকেতঃ প্রষ্টা'** অর্থাৎ হে নচিকেতা! তোমার ন্যায় জিজ্ঞাসু শিষ্য যেন আমরা লাভ করতে পারি।

উপযুক্ত ও দৃঢ়নিষ্ঠ শিষ্যকে পেয়ে দ্বাদশ ভাগবতের অন্যতম যম মহারাজ তখন নচিকেতাকে আত্মতত্ত্ব প্রদান করলেন, তা কঠ উপনিষদের পরবর্তী ৯০টি শ্লোকে বর্ণিত হয়েছে। এই তত্ত্ব খুবই গূঢ় ও গভীর। যমরাজের উপদিষ্ট শাশ্বত ও আত্মতত্ত্ব বিষয়ক কয়েকটি শ্লোক উদ্ধৃত করা হল—

শ্রেয়শ্চ প্রেয়শ্চ মনুষ্যমেতস্তৌ সম্পরীত্য বিবিনক্তি ধীরঃ।
শ্রেয়ো হি ধীরোঽভি প্রেয়সো বৃণীতে প্রেয়ো মন্দো যোগক্ষেমাদ্ বৃণীতে।।

(কঠ. ১।২।২)

শ্রেয় ও প্রেয় পরস্পর ভিন্ন হলেও উভয়েই মানুষের নিকট উপস্থিত হয়। বিবেকবান পুরুষ বিবেচনাপূর্বক এই দুইটিকে পৃথক করে প্রেয় থেকে শ্রেয়কে বেছে নেন। আর অজ্ঞানী ব্যক্তি অপ্রাপ্ত বস্তুর প্রাপ্তি ও প্রাপ্ত বস্তুর রক্ষণার্থে প্রেয়কেই গ্রহণ করে থাকে।

নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনূ স্বাম্।।

(কঠ. ১।২।২৩)

উত্তমরূপে বেদাধ্যায়ন, বুদ্ধি বা চিন্তাশক্তি অথবা বহু লোকের শ্রবণ দ্বারাও এই পরমাত্মাকে লাভ করা যায় না। তিনিই যাকে বরণ করেন বা যোগ্য মনে করেন তার নিকটই তিনি প্রকাশিত (অনুভূত) হন।

নাবিরতো দুশ্চরিতান্নাশান্তো নাসমাহিতঃ।
নাশান্তমানসো বাপি প্রজ্ঞানেনৈনমাপ্নুয়াৎ।। (কঠ. ১।২।২৪)

যে ব্যক্তি দুষ্কার্য থেকে বিরত নয়, ইন্দ্রিয়লোলুপতা হেতু যার চিত্ত শান্ত নয়, যে ব্যক্তি একাগ্রতাহীন, ফলাকাঙ্ক্ষাবশতঃ যার মন সদাই অশান্ত, সে ব্যক্তি কখনোই আত্মাকে লাভ করতে পারে না। কেবলমাত্র প্রজ্ঞান দ্বারা অর্থাৎ পরমাত্মাকে সমর্পণ দ্বারাই তাঁকে পাওয়া যায়।

অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষো মধ্য আত্মনি তিষ্ঠতি।
ঈশানো ভূতভব্যস্য ন ততো বিজুগুপ্সতে।। (কঠ. ২।১।১২)

অঙ্গুষ্ঠ পরিমিত পুরুষ দেহ অন্তরে বাস করেন। ইনি ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান কালের নিয়ন্তা। ইনিই সেই আত্মা। ইহাকে জানতে পারলে অর্থাৎ 'আমার আত্মাই স্বরূপতঃ পরমাত্মা'—এই বোধ হলে জীব জ্ঞানী হয়, তার আর গোপনীয় কিছু থাকে না।

ভয়াদস্যাগ্নিস্তপতি ভয়াৎ তপপ্রতি সূর্যঃ।
ভয়াদিন্দ্রশ্চ বায়ুশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ।। (কঠ. ২।৩।৩)

তাঁরই ভয়ে অগ্নি তাপ দেয়, তাঁরই ভয়ে সূর্য উত্তাপ দেয়, তাঁরই ভয়ে ইন্দ্র, বায়ু ও পঞ্চম বা যম ধাবমান হয় অর্থাৎ স্ব স্ব কার্যে প্রবৃত্ত হয়।

ইহ চেদশকদ্ বোদ্ধুং প্রাক্ শরীরস্য বিস্রসঃ।
ততঃ সর্গেষু লোকেষু শরীরত্বায় কল্পতে॥ (কঠ. ২।৩।৪)

যদি কেহ শরীরত্যাগের পূর্বেই এই দেহেই ব্রহ্মকে সম্যক্ উপলব্ধি করতে সমর্থ হয় তবে সে জন্ম-মরণ চক্র থেকে মুক্ত হয় নতুবা বিবিধ লোকে জন্মগ্রহণ করতে হয়।

যদা সর্বে প্রমুচ্যন্তে কামা যেঽস্য হৃদি শ্রিতাঃ।
অথ মর্ত্যোঽমৃতো ভবত্যত্র ব্রহ্ম সমশ্নুতে॥ (কঠ. ২।৩।১৪)

মানুষের হৃদয়ে যে সকল কামনা আশ্রিত আছে, যখন সেসকল দূরীভূত হয় তখন এই মরণশীল মানুষই অমৃতত্ব লাভ করে ব্রহ্মকে জানতে সমর্থ হয়।

অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষোঽন্তরাত্মা সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ।
তং স্বাচ্ছরীরাৎ প্রবৃহেন্মুঞ্জাদিবেষীকাং ধৈর্যেণ।
তং বিদ্যাচ্ছুক্রমমৃতং বিদ্যাচ্ছুক্রমমৃতমিতি॥
(কঠ. ২।৩।১৭)

অঙ্গুষ্ঠমাত্র অন্তরাত্মা পুরুষ সর্বদা সর্বজনের হৃদয়ে সন্নিবিষ্ট আছেন। ধানের খোসার মধ্যে যেমন চাল গোপনভাবে অবস্থান করে এবং লোকে যেমন খোসা বাদ দিয়ে চাল বার করে সেইরকম দেহ-মন-ইন্দ্রিয়াদির ক্রিয়া দ্বারা জীবাত্মা আবৃত থাকে। মুমুক্ষু পুরুষ বিশেষ ধৈর্য দ্বারা আত্মাকে শরীর থেকে পৃথক করবেন অর্থাৎ দেহ বা তার কোনো শক্তিকে আত্মা বলে মনে করবেন না। যিনি এইরূপ আত্মাকে পরমাত্মা বলে জানেন তিনিই মৃত্যু অতিক্রম করে অমৃতময় জীবন লাভ করেন।

নচিকেতমুপাখ্যানাং মৃত্যুপ্রোক্তং সনাতনম্।
উক্ত্বা শ্রুত্বা চ মেধাবী ব্রহ্মলোকে মহীয়তে॥ (কঠ. ১।৩।১৬)

যে বিবেকবান ব্যক্তি যমরাজ নচিকেতা কর্তৃক শ্রুত এই চিরন্তন বৈদিক উপাখ্যান নিজে শোনেন ও অন্যদেরও শোনান তিনি ব্রহ্মাত্মস্বরূপ হয়ে

সকলের পূজিত হন। অনন্তর নচিকেতা যমরাজ কথিত এই ব্রহ্মবিদ্যা অবগত হয়ে ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হলেন এবং অমৃতত্ব লাভ করলেন। কঠোপনিষদের শেষ শ্লোকে বলা হয়েছে— 'অন্যঃ অপি যঃ অধ্যাত্মম্ এবং বিৎ' (কঠ. ২।৩।১৮) অর্থাৎ অপরে যে কেহ এই প্রকারে আত্মতত্ত্ব অবগত হন, তিনিও নচিকেতার মতন ব্রহ্মকে পেয়ে নির্মল (অনাসক্ত) হন, মৃত্যুর অতীত হন।

উদ্ধব—উদ্ধব-এর প্রতি শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ ভাগবতে (একাদশ স্কন্ধের ৭-৩০ অধ্যায়) শ্রীকৃষ্ণ-উদ্ধব সংবাদ হিসেবে বর্ণিত হয়েছে। উদ্ধব হচ্ছেন যদু বংশোদ্ভূত সাত্যকির পুত্র, বৃহস্পতির শিষ্য, বৃষ্ণিদের মন্ত্রী এবং শ্রীকৃষ্ণের সখা, সচিব এবং পরমভক্ত। শ্রীকৃষ্ণের সমস্ত প্রিয় কাজে উদ্ধব অগ্রণী ছিলেন। তিনি শ্রীকৃষ্ণের নির্দেশে বৃন্দাবনে গোপীনিদের কাছে শ্রীকৃষ্ণর বার্তা নিয়ে গিয়েছিলেন যা 'উদ্ধব সন্দেশ' নামে খ্যাত। তিনি দ্রৌপদীর স্বয়ংবর সভায় ছিলেন, সুভদ্রার বিয়েতেও যৌতুক নিয়ে গিয়েছিলেন। আর দ্বাপর লীলার শেষে যখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর অবতারলীলা শেষ করে স্বীয় ধামে ফিরে যেতে প্রস্তুত তখন তাঁর সেই ইচ্ছাতন্ত্রীর ঝঙ্কার ভক্ত হৃদয়ে পৌঁছাল। উদ্ধব বললেন— হে ভগবন্ ! হে মহাযোগিন্ ! আপনি আমাকে একলা পরিত্যাগ করে প্রস্থান করবেন না। ভক্তগণের সঙ্গে আপনার শ্রীচরণ দর্শন, স্মরণ এবং কীর্তনাদির দ্বারা আপনার অনুগ্রহ লাভই আমি পরম পুরুষার্থ মনে করি।

ত্বয়োপভুক্তস্রগ্গন্ধবাসোঽলঙ্কারচর্চিতাঃ ।
উচ্ছিষ্টভোজিনো দাসাস্তব মায়াং জয়েমহি॥ (ভাগবত ১১।৬।৪৬)

আপনার উপভুক্ত মাল্য, গন্ধ, বসন এবং অলংকারে সজ্জিত হয়ে আপনার দাস আমরা আপনার প্রসাদ ভক্ষণ করেই আপনার মায়াকেই জয় করব।

ভগবান তখন স্নেহভরে বললেন—

ত্বং তু সর্বং পরিত্যজ্য স্নেহং স্বজনবন্ধুষু।
ময্যাবেশ্য মনঃ সম্যক্ সমদৃগ্ বিচরস্ব গাম্॥ (ভাগবত ১১।৭।৬)

হে মহাযোগিন ! আপনাকে নমস্কার, যাতে আপনার পাদপদ্মে আমার সুদৃঢ় মতি হয় সেই আশীর্বাদ প্রদান করুন।

শ্রীশুকদেব মহারাজ পরীক্ষিৎকে বলছেন—

ততস্তমন্তর্হৃদি সন্নিবেশ্য গতো মহাভাগবতো বিশালাম্।
যথোপদিষ্টাং জগদেকবন্ধুনা ততঃ সমাস্থায় হরেরগাদ্ গতিম্।।
য এতদানন্দ সমুদ্রসম্ভৃতং জ্ঞানামৃতং ভাগবতায় ভাষিতম্।
কৃষ্ণেন যোগেশ্বরসেবিতাঙ্ঘ্রিণা সচ্ছ্রদ্ধয়াऽऽসেব্য জগদ্বিমুচ্যতে।।

(ভাগবত ১১।২৯।৪৭-৪৮)

অনন্তর ভক্তচূড়ামণি উদ্ধব কৃষ্ণকে হৃদয়ের অভ্যন্তরে স্থাপন করে এবং অনন্য শরণ শ্রীকৃষ্ণের আদেশক্রমে বদরিকাশ্রমে উপস্থিত হয়ে তপস্যার দ্বারা ভগবৎ স্বরূপ প্রাপ্ত হয়েছিলেন।

যোগিবরগণ যাঁর চরণযুগলের সেবা করেন, সেই কৃষ্ণ কর্তৃক ভক্ত উদ্ধবকে কথিত এই আনন্দসাগরনিহিত জ্ঞানামৃত যিনি প্রগাঢ় শ্রদ্ধার সঙ্গে অতি অল্পমাত্রও সেবা (গ্রহণ) করেন, তিনি মুক্ত হন। তাঁর সংসর্গে জগৎও বিমুক্ত হয়ে থাকে।

(ঘ) জ্ঞানী (প্রেমিক)—

ভগবান প্রথমে তিনপ্রকার ভক্ত—যথা অর্থার্থী, আর্ত ও জিজ্ঞাসু ভক্তদের কথা বলে তারপরে এদের থেকে পৃথক বা বিশেষরূপ প্রতিপন্ন করার জন্য জ্ঞানী ভক্তর পরে 'চ' শব্দটি ব্যবহার করেছেন।

জ্ঞানী ভক্তরা অনুকূল ও প্রতিকূল সমস্ত পরিস্থিতি, ঘটনা, ব্যক্তি, বস্তু ইত্যাদিকে ভগবদ্স্বরূপই মনে করে থাকেন। এঁদের অনুকূলতা প্রাপ্ত করার বা প্রতিকূলতা দূর করার কোনো কামনা বা ইচ্ছাই হয় না, এরা এসকল ভগবদ্‌লীলা হিসেবে দেখেন এবং ভগবদ্‌প্রেমে বিভোর হয়ে থাকেন।

কামনা দুই প্রকারের হয়—পারমার্থিক ও লৌকিক।

১) লৌকিক কামনা—ইহা দুই প্রকারের হয়—সুখ প্রাপ্তি করা ও দুঃখ দূর করা।

সুখ প্রাপ্তির কামনা হল শরীর যেন আরামে থাকে এই ইচ্ছে, জীবিত

কালে যেন সম্মান লাভ হয় আর মৃত্যুর পরে যেন নাম অমর হয় অথবা স্বর্গসুখ লাভের বাসনা ইত্যাদি। এসকল কামনার দ্বারা বাসনা বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং মানুষ বন্ধনদশা প্রাপ্ত হয় ও তার পতন ঘটে। ইহা আসুরী সম্পদযুক্ত অতএব পরিত্যাজ্য।

অপর কামনা হল দুঃখ দূর করার। দুঃখ হল তিন প্রকারের—আধিদৈবিক যা দেবতাদের অধিকারগত ক্ষমতা থেকে হয় যথা—অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, শীত-গ্রীষ্ম, প্লাবন-ভূমিকম্পন ইত্যাদি। আধিভৌতিক হল ভূত অর্থাৎ হিংস্র জন্তু বা নিষ্ঠুর মানুষ থেকে যে দুঃখ উৎপন্ন হয়। আর আধ্যাত্মিক অর্থাৎ নিজ শরীর বা অন্তঃকরণের দ্বারা যে কষ্ট উৎপন্ন হয়। ইহাও আবার দুপ্রকার আধি ও ব্যাধি। মনের চিন্তা, শোক, উন্মত্ততাকে বলে আধি আর শরীরের অসুখকে বলে ব্যাধি।

এই দুঃখগুলিকে দূর করার যে কামনা তা নিরর্থক। এইসব কামনা কখনো সম্পূর্ণ পূরণ হয় না বা পূরণ হলেও তৎক্ষণাৎ অন্য কামনা উৎপন্ন হয়।

২) পারমার্থিক কামনা—ইহা আবার দুই প্রকারের—মুক্তি (কল্যাণের) কামনা ও ভক্তির (ভগবৎ প্রেমের) কামনা। যাদের মুক্তির বা তত্ত্ব জানার আগ্রহ থাকে তারা হল জিজ্ঞাসু। প্রকৃতভাবে বিচার করলে এই কামনা কামনাই নয় কেননা নিজ স্বরূপকে জানা প্রকৃতই প্রয়োজন এবং যা প্রয়োজন তা অবশ্যই পূরণ হয়। লৌকিক কামনা কেবল দেহ বা উপাধি (মন) পূর্তির জন্য হয় যা কখনোই সর্বতোভাবে পূর্ণ হয় না এবং কামনা থেকেই যায় সুতরাং লৌকিক কামনা সর্বদা পরিত্যাজ্য। অপর কামনা হল প্রভু প্রেম প্রাপ্তির কামনা। এতে নিজের কোনো প্রয়োজন থাকে না (যেমন শারীরিক, মানসিক বা তত্ত্ব জিজ্ঞাসার), এতে প্রভুর কাছে সমর্পিত হওয়ারই প্রয়োজন থাকে। তাই মুক্তি থেকে ভক্তি শ্রেষ্ঠ কারণ মুক্তিতে নেওয়ার ইচ্ছে থাকে যার ফলে সূক্ষ্ম অহং থাকতে পারে আর ভক্তিতে দেওয়ার ইচ্ছে থাকে তাই ভক্তিতে অহং একেবারেই থাকে না।

সন্ত-বাণীতে আছে যে, প্রেম কেবলমাত্র ভগবানই করে থাকেন ভক্ত

কালে যেন সম্মান লাভ হয় আর মৃত্যুর পরে যেন নাম অমর হয় অথবা স্বর্গসুখ লাভের বাসনা ইত্যাদি। এসকল কামনার দ্বারা বাসনা বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং মানুষ বন্ধনদশা প্রাপ্ত হয় ও তার পতন ঘটে। ইহা আসুরী সম্পদযুক্ত অতএব পরিত্যাজ্য।

অপর কামনা হল দুঃখ দূর করার। দুঃখ হল তিন প্রকারের—আধিদৈবিক যা দেবতাদের অধিকারগত ক্ষমতা থেকে হয় যথা—অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, শীত-গ্রীষ্ম, প্লাবন-ভূমিকম্পন ইত্যাদি। আধিভৌতিক হল ভূত অর্থাৎ হিংস্র জন্তু বা নিষ্ঠুর মানুষ থেকে যে দুঃখ উৎপন্ন হয়। আর আধ্যাত্মিক অর্থাৎ নিজ শরীর বা অন্তঃকরণের দ্বারা যে কষ্ট উৎপন্ন হয়। ইহাও আবার দুপ্রকার আধি ও ব্যাধি। মনের চিন্তা, শোক, উন্মত্ততাকে বলে আধি আর শরীরের অসুখকে বলে ব্যাধি।

এই দুঃখগুলিকে দূর করার যে কামনা তা নিরর্থক। এইসব কামনা কখনো সম্পূর্ণ পূরণ হয় না বা পূরণ হলেও তৎক্ষণাৎ অন্য কামনা উৎপন্ন হয়।

২) পারমার্থিক কামনা—ইহা আবার দুই প্রকারের—মুক্তি (কল্যাণের) কামনা ও ভক্তির (ভগবৎ প্রেমের) কামনা। যাদের মুক্তির বা তত্ত্ব জানার আগ্রহ থাকে তারা হল জিজ্ঞাসু। প্রকৃতভাবে বিচার করলে এই কামনা কামনাই নয় কেননা নিজ স্বরূপকে জানা প্রকৃতই প্রয়োজন এবং যা প্রয়োজন তা অবশ্যই পূরণ হয়। লৌকিক কামনা কেবল দেহ বা উপাধি (মন) পূর্তির জন্য হয় যা কখনোই সর্বতোভাবে পূর্ণ হয় না এবং কামনা থেকেই যায় সুতরাং লৌকিক কামনা সর্বদা পরিত্যাজ্য। অপর কামনা হল প্রভু প্রেম প্রাপ্তির কামনা। এতে নিজের কোনো প্রয়োজন থাকে না (যেমন শারীরিক, মানসিক বা তত্ত্ব জিজ্ঞাসার), এতে প্রভুর কাছে সমর্পিত হওয়ারই প্রয়োজন থাকে। তাই মুক্তি থেকে ভক্তি শ্রেষ্ঠ কারণ মুক্তিতে নেওয়ার ইচ্ছে থাকে যার ফলে সূক্ষ্ম অহং থাকতে পারে আর ভক্তিতে দেওয়ার ইচ্ছে থাকে তাই ভক্তিতে অহং একেবারেই থাকে না।

সন্ত-বাণীতে আছে যে, প্রেম কেবলমাত্র ভগবানই করে থাকেন ভক্ত

তো তাঁর সঙ্গে আত্মীয়তা করে। যে প্রেম করে তার কারোর কাছ থেকে নেওয়ার কিছুই থাকে না, যেমন ভগবান জীবমাত্রকেই সর্বস্ব দিয়ে নিজের জন্য কিছুই ইচ্ছে করেন না। তবে জীব যদি ভগবানের সঙ্গে আত্মীয়তা পাতিয়ে নিজেকে সর্বতোভাবে ভগবানের চরণে সমর্পণ করে, তখন তার আর কিছুই পাওয়ার ইচ্ছা থাকে না তখন তাকে জ্ঞানী বা প্রেমিক ভক্ত বলে।

কামনাসক্ত ভোগী ব্যক্তি ভগবানের ভক্ত হতে পারে না। তাই অর্থার্থী ভগবদ্‌ভক্ত হলেও ভোগার্থী ভগবদ্‌ভক্ত হতে পারে না। ভোগার্থীর মধ্যে জাগতিক লিপ্ততা অনেক বেশি থাকে আর সেই তুলনায় অর্থার্থীর মধ্যে ভগবানের প্রাধান্য বেশি থাকে।

এই চার প্রকার ভক্তর মধ্যে ভগবান ভিন্ন অন্য অস্তিত্বে সম্পর্কিত হওয়ায় অর্থার্থী, আর্ত ও জিজ্ঞাসু ভক্তরা, প্রেমিক ভক্তদের থেকে পৃথক। যাঁর কাছে ভগবান ভিন্ন আর অন্য অস্তিত্বের বোধ নেই তিনিই জ্ঞানী বা প্রেমিক ভক্ত। ভগবান এই প্রকার জ্ঞানী বা প্রেমিক ভক্তকে বলেছেন 'একভক্তির্বিশিষ্যতে' অর্থাৎ অনন্য ভক্তিসম্পন্ন ও অতিশয় শ্রেষ্ঠ।

চার প্রকার ভক্তই ভগবানে নিত্য সমাহিত থাকেন। এদের মধ্যে প্রথম তিনপ্রকার ভক্তের মনে কিছু না কিছু ব্যক্তিগত আকাঙ্ক্ষা থাকে যেমন—অর্থার্থী ব্যক্তি আনুকূল্য চান, আর্ত ব্যক্তি প্রতিকূলতা দূর করতে চান ও জিজ্ঞাসু ব্যক্তি তাঁর স্বরূপ জানার আগ্রহ পোষণ করেন। কিন্তু জ্ঞানী বা প্রেমিক ভক্ত নিজের জন্য কোনো ইচ্ছাই পোষণ করেন না, তাই তিনি একক ভক্তিযুক্ত ভক্ত। অবশ্য ভগবানের অন্য ভক্তদের মধ্যেও ক্রমে ক্রমে এই কামনা দূর করার প্রবণতা দেখা যায় ও তারা প্রেমিক ভক্ত হয়ে ওঠে।

তবে ভগবানকে মান্য না করা কামনা করার থেকেও বেশি দোষাবহ। যাঁরা শুধু ভগবানের ভজনা করেন, তাঁদের মধ্যে যদি কামনাবাসনা থাকে তাহলেও ভগবানের কৃপা ও আরাধনার প্রভাবে তাঁরা ভগবানকেই লাভ করেন। মানুষ যে কোনো প্রকারে ভগবানের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করলেই সে ভগবানকে প্রাপ্ত হয়। **'কেন উপায়েণ কৃষ্ণে মন নিবেশয়েৎ'**।

ভাগবতেও বলা হয়েছে—

কামাদ্ দ্বেষাদ্ ভয়াৎ স্নেহাৎ যথা ভক্ত্যেশ্বরে মনঃ।

আবেশ্য তদঘং হিত্বা বহবস্তদ্ গতিং গতাঃ॥ (ভাগবত ৭।১।২৯)

যে কোনো মানুষই কামের দ্বারা, দ্বেষের দ্বারা, ভয়ের দ্বারা বা স্নেহের দ্বারা ভগবানে মন সমর্পণ করলে, তাদের সমস্ত পাপ ধুয়ে যায় এবং সেভাবেই ভগবানকে লাভ করে যেভাবে ভক্ত ভক্তির দ্বারা ভগবান প্রাপ্ত হন।

ভক্ত যখন সর্বতোভাবে নিষ্কাম হয়ে যায় অর্থাৎ তার মধ্যে লৌকিক-পারলৌকিক কোনো বাসনাই থাকে না তখন তার মধ্যে পূর্ণরূপে প্রেম জাগরিত হয়। এই প্রেম কখনো সমাপ্ত হয় না, কারণ তা অনন্ত এবং প্রতি মুহূর্তে বর্ধমান। প্রতিক্ষণ বর্ধমানের অর্থ হল প্রেমে প্রতিক্ষণই এক অলৌকিক বিশেষত্ব অনুভূত হয় মনে হয় 'আরে এদিকে তো আগে খেয়াল করিনি এদিকে আগে নজর ছিল না, এখন বুঝতে পারছি' প্রতি মুহূর্তে এই অতৃপ্তির তৃপ্তি অনুভূত হতে থাকে। সেইজন্য প্রেমকে অনন্ত বলা হয়। ভক্তগণ ভগবানের প্রেমিক ও প্রেমাস্পদ হয়ে ওঠেন। তখন ভক্ত ও ভগবানে দ্বৈতের ভাব না হয়ে প্রেমাদ্বৈতের ভাব জাগ্রত হয়। জ্ঞানমার্গে যে অদ্বৈতভাব আছে তা সর্বদা অখণ্ডরূপে শান্ত ও সমভাবে বিরাজমান। কিন্তু প্রেমে যে অদ্বৈতভাব, তা পরস্পরের অভিন্নতা অনুভব করিয়ে প্রতি মুহূর্তে বৃদ্ধি পেতে থাকে। প্রেমের অদ্বৈতভাব এক হয়েও দুই থাকে আর দুই হয়েও এক। তাই প্রেম-তত্ত্ব হল অনির্বচনীয়।

অর্থার্থী, আর্ত এবং জিজ্ঞাসুর মধ্যে নিজ সত্ত্ব (অহংবোধ) থাকে, যা ক্রমশঃ হ্রাস পেতে থাকে কিন্তু জ্ঞানীর (প্রেমিক ভক্তর) মধ্যে তা একেবারেই থাকে না। তাই তাঁর দৃষ্টিতে প্রেমিক রূপে সাক্ষাৎ একমাত্র ভগবানই থাকেন—'**তস্মিংস্তজ্জনে ভেদাভাবাৎ**' (নারদভক্তিসূত্র. ৪১)। ভক্তির জন্য এই আত্মীয়তা হল স্বীকৃত দ্বৈত, যা জ্ঞানযোগের অদ্বৈত থেকেও সুন্দর '**ভক্ত্যর্থং কল্পিতং (স্বীকৃতং) দ্বৈতমদ্বৈতাদপি সুন্দরম্**' (বোধসার, ভক্তি. ৪২)।

যেমন নদী সমুদ্রে প্রবিষ্ট হলে সমুদ্রের জলের সাথে একাকার হয়ে যায়

আবার একাকার হওয়া সত্ত্বেও দুদিকেই জলের প্রবাহ বহমান থাকে অর্থাৎ কখনো নদীর জল সমুদ্রের দিকে, কখনো সমুদ্রের জল নদীর দিকে প্রবহমান থাকে ; সেইরকম প্রেমেও প্রেমিকের প্রেমাস্পদর দিকে এবং প্রেমাস্পদর প্রেমিকের দিকে প্রেমের প্রবাহ চলতে থাকে। তাঁদের নিত্যযোগে বিয়োগ ও বিয়োগে নিত্যযোগ এইরূপ এক বিশেষ লীলা অনন্তকাল ধরে চলতে থাকে। এতে কেই বা প্রেমাস্পদ আর কেই বা প্রেমিক তার হিসাব কে রাখবে। সেখানে উভয়েই প্রেমাস্পদ উভয়েই প্রেমিক।

সপ্তম অধ্যায়ে এই প্রকরণের শেষ শ্লোকে ভগবান বলেছেন **'বহূনাং জন্মনামন্তে'** (গীতা ৭।১৯) অর্থাৎ অনেক জন্মের পরে মনুষ্যজন্ম প্রাপ্ত হলে তবেই এই জ্ঞান বা প্রেম পাওয়া সম্ভব হয়। এই মনুষ্যজন্ম সর্বজন্মের আদি জন্ম আবার সর্বজন্মের অন্তিম জন্মও। সর্বজন্মের আরম্ভ মনুষ্যজন্ম থেকেই হয় আবার মনুষ্যজন্মে করা কর্মের পাপ চুরাশী লক্ষ অন্য যোনিতে জন্ম এবং নরক ভোগ করলেও শেষ হয় না, অবশিষ্ট থাকে, তাই এটি হল সমস্ত জন্মের আদি জন্ম। আবার এই জন্মে মানুষ সমস্ত পাপ নাশ করে, সকল বাসনা দূর করে নিজ কল্যাণ করতে পারে, ভগবানকে লাভ করতে সমর্থ হয়, তাই এটি হল সর্বজন্মের অন্তিম জন্ম। তবে ভগবানের দিক থেকে মানুষ মাত্রেরই জন্ম হল অন্তিম জন্ম, কারণ ভগবানের সংকল্প হল এই যে, তাঁর প্রদত্ত শরীর দ্বারা যেন মানুষ নিজ কল্যাণ সাধন করে। সুতরাং মানুষ যদি নিজের কোনো ইচ্ছা না রেখে কেবল নিমিত্ত মাত্র হয়ে কর্ম করে তবে ভগবানের সংকল্পর ফলে তার কল্যাণ হবে।

ভগবানের সংকল্প অবশ্য এই নয় যে, সাধকের আগ্রহ ছাড়াই তার কল্যাণ হোক অর্থাৎ অভিশাপ ও বরপ্রদানের মাধ্যমে তাকে মুক্ত করা হোক। তবে এই সংকল্প কেমন ? ভগবান মানুষের নিজ কল্যাণের স্বাধীনতা এই মনুষ্যজন্মেই দিয়েছেন। মানুষ যদি এই স্বাধীনতার অপব্যবহার না করে অর্থাৎ ভগবান ও শাস্ত্রবিধির বিপরীতে না যায় তবে তার দ্বারা ভগবান ও শাস্ত্রানুকূল আচরণ স্বাভাবিক ভাবেই সম্পন্ন হয়। আর এইভাবে চললে হয় সে শরীর, মন, বুদ্ধির সাহায্যে কিছুই করে না অথবা ভগবান ও শাস্ত্রের

অনুকূলে সব কার্য করে। আর শাস্ত্র নির্দেশ অনুযায়ী নিষ্কামভাবে কর্ম করলে কর্মবেগ দূর হয় ও ক্রিয়াপদার্থর থেকে সম্বন্ধ ছেদ হয়। এর ফলে নতুন কামনাও উৎপন্ন হয় না এবং পুরানো আসক্তিও ক্রমে দূর হয় এবং স্বতঃই 'বোধ' জেগে ওঠে। তাই প্রকৃতপক্ষে জ্ঞানযোগ ও কর্মযোগ উভয়ত একই।

ভগবান চতুর্থ অধ্যায়ে বলেছেন—

'তৎ স্বয়ং যোগসংসিদ্ধঃ কালেনাত্মনি বিন্দতি' (গীতা ৪।৩৮) অর্থাৎ সেই কর্মযোগী স্বতঃই স্বয়ংকে জানতে সক্ষম হন।

মনুষ্য জন্মের বিশেষত্ব কী, মহিমাই বা কী ?

মনুষ্য জন্মের বিশেষত্ব এই যে, মানুষ ভগবানের আশ্রয় গ্রহণ করে নিজেকে কল্যাণের পথে নিয়ে যেতে পারে। শ্রীমদ্‌ভাগবতে অবধূত ব্রাহ্মণ দত্তাত্রেয় রাজা যদুকে বলছেন—

লব্ধ্বা সুদুর্লভমিদং বহুসম্ভবান্তে মানুষ্যমর্থমনিত্যমপীহ ধীরঃ।
তূর্ণং যতেত ন পতেদনুমৃত্যু যাবন্নিঃশ্রেয়সায় বিষয়ঃ খলু সর্বতঃ স্যাৎ॥

(ভাগবত ১১।৯।২৯)

বহু জন্মের পরে এই পরম পুরুষার্থ সাধনরূপ মানবদেহ, যা অনিত্য হলেও অতি দুর্লভ, তা লাভ করে বুদ্ধিমান ব্যক্তির উচিত যেন সে অতি শীঘ্র, মৃত্যুর পূর্বেই যেন নিজ কল্যাণের চেষ্টা করে। সকল যোনিতেই বিষয় ভোগ সম্ভব, তার জন্য এই অমূল্য জীবন নষ্ট করা উচিত নয়।

ভাগবতের একাদশ স্কন্ধে শ্রীকৃষ্ণ-উদ্ধব সংবাদে মানবদেহের উৎকর্ষতা সম্বন্ধে ভগবান বলছেন—

নৃদেহমাদ্যং সুলভং সুদুর্লভং প্লবং সুকল্পং গুরুকর্ণধারম্।
ময়ানুকূলেন নভস্বতেরিতং পুমান্ ভবাব্ধিং ন তরেৎ স আত্মহা॥

(ভাগবত ১১।২০।১৭)

এই মনুষ্যদেহ সমস্ত ফল প্রাপ্তির মূল এবং অত্যন্ত দুর্লভ হলেও অনায়াসে সুলভ হয়েছে। এটি সংসার-সমুদ্র পার হওয়ার এক সুদৃঢ় নৌকাস্বরূপ। গুরুরূপ নাবিক এটি চালিয়ে থাকেন ও আমি (ভগবান) বায়ুরূপ ধারণ করে সেটিকে লক্ষ্যর দিকে যেতে সাহায্য করি। এত সুবিধা

থাকা সত্ত্বেও যে ব্যক্তি এই সংসার-সমুদ্র পার হয় না, সে নিজ আত্মহননকারী অর্থাৎ নিজের পতনকারী হয়। আর এই শ্লোকেরই (গীতা ৭।১৯) দ্বিতীয় অংশে ভগবান বলেছেন— **'বাসুদেবঃ সর্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্লভঃ'**।

ভগবান এরূপ কথা আগেও তৃতীয় শ্লোকে বলেছেন—

মনুষ্যাণাং সহস্রেষু কশ্চিৎ যততি সিদ্ধয়ে।
যততামপি সিদ্ধানাং কশ্চিন্মাং বেত্তি তত্ত্বতঃ॥ (গীতা ৭।৩)

সহস্র মানুষের মধ্যে কোনো একজন প্রকৃত সিদ্ধিলাভের জন্য যত্নবান হয়, আর ওই যত্নশীল ব্যক্তিদের মধ্যে কশ্চিৎ একজন আমাকে যথার্থভাবে জানতে পারে। এর অর্থ 'সবই বাসুদেব' এইরূপ বোধসম্পন্ন তত্ত্বত জ্ঞানী বা প্রেমিক মহাত্মা সুদুর্লভ। অবশ্য তার মানে এই নয় যে পরমাত্মা প্রাপ্তি অতি দুর্লভ। দুর্লভ হল সত্যকার হৃদয় দিয়ে পরমাত্মা প্রাপ্তির চেষ্টায় নিরত ব্যক্তির। আন্তরিকভাবে চেষ্টা করলে মনুষ্যমাত্রেই পরমাত্মাপ্রাপ্তি করতে সক্ষম হয় এবং মনুষ্যদেহ সেই জন্যই পাওয়া।

শাস্ত্রে কর্মযোগী, জ্ঞানযোগী, ধ্যানযোগী, হঠযোগী, লয়যোগী, রাজযোগী, মন্ত্রযোগী আদি নানা যোগীর বর্ণনা আছে যারা সকলেই ভগবানকে আকাঙ্ক্ষা করেন, কিন্তু ভগবান তাদের মোটেই দুর্লভ বলেননি, কিন্তু যিনি 'সর্বত্রই বাসুদেব' দেখেন তাঁকেই ভগবান অত্যন্ত 'দুর্লভ মহাত্মা' বলে জানিয়েছেন।

আবার ভগবান গীতায় শুধু ভক্তিমার্গের সাধকদেরই মহাত্মা বলে জানিয়েছেন। **'মহাত্মানস্তু মাং পার্থ দৈবীং প্রকৃতিমাশ্রিতাঃ'** (গীতা ৯।১৩) —আমাকে অনন্যমনে ভজনাকারী দৈবীসম্পন্ন সাধকই মহাত্মা। **'বাসুদেবঃ সর্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্লভঃ'** (গীতা ৭।১৯)—যাঁরা সর্বত্র আমাকে অভিন্নভাবে দেখে তারাও মহাত্মা। **'নাপ্নুবন্তি মহাত্মানঃ সংসিদ্ধিং পরমাং গতাঃ'** (গীতা ৮।১৫)—যাঁরা পরমসিদ্ধি (পরমপ্রেম) লাভ করেছে তাঁরাও মহাত্মা।

এই পরমভক্ত সাধকদের সম্বন্ধে ভগবান হংসরূপ ধারণ করে ব্রহ্মা ও

সনকাদি চারমুনিকে ভাগবতের একাদশ স্কন্ধে বলেছেন—

মনসা বচসা দৃষ্ট্যা গৃহ্যতেঽন্যৈরপীন্দ্রিয়ৈঃ।
অহমেব ন মত্তোঽন্যদিতি বুধ্যধ্বমঞ্জসা॥ (ভাগবত ১১।১৩।২৪)

মন, বাণী, দৃষ্টি বা অন্য ইন্দ্রিয়াদির দ্বারা যা কিছু গ্রহণ করা হয়, সব কিছুই ভগবান। পরমপ্রেমী ভক্ত দেখেন তিনি ভিন্ন আর কিছুই নেই। কারোর সঙ্গে তাঁর বিরোধ নেই—'**নিজ প্রভুময় দেখহিঁ জগত কেহি সন করহিঁ বিরোধ**' (রামচরিতমানস ৭।১১২ খ)। সাধকের যখন সবত্রই ইষ্ট দর্শন হয় তখন তার কী অবস্থা হয় সে বিষয়ে ভাগবতের একাদশ স্কন্ধে শ্রীকৃষ্ণ-উদ্ধব সংবাদে ভগবান এইরূপ বলেছেন—

বাগ্‌ গদ্‌গদা দ্রবতে যস্য চিত্তং রুদত্যভীক্ষ্ণং হসতি ক্বচিচ্চ।
বিলজ্জ উদ্‌গায়তি নৃত্যতে চ মদ্ভক্তিযুক্তো ভুবনং পুনাতি॥
(ভাগবত ১১।১৪।২৪)

যাঁর বাণী আমার নাম, গুণ ও লীলাকথা বর্ণনায় গদ্‌গদ হয়ে যায়, যাঁর চিত্ত আমার রূপ, গুণ, প্রভাব ও লীলাকথায় দ্রবীভূত হয়ে যায়, যাঁরা বারংবার কাঁদে, কখনো কখনো হাসে, কখনো নির্লজ্জভাবে উচ্চৈঃস্বরে গান গায়, নাচে—আমার এইরূপ ভক্তরা সমস্ত জগৎ পবিত্র করে। তাঁর জীবন অলৌকিক আনন্দে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে আর তখন তাঁর কিছু করার, জানার বা পাওয়ার আশা থাকে না। তিনি সর্বতোভাবে পূর্ণত্ব লাভ করেন।

সাধারণত সাধকের একটি ভুল হয় যে সে নিজেকে জগৎ থেকে পৃথক ভেবে জগৎকে ভগবৎস্বরূপ দেখার চেষ্টা করেন। প্রকৃতপক্ষে কিন্তু তাঁরা নিজেরাও ভগবদ্স্বরূপ। '**সকলমিদমহং চ বাসুদেবঃ**' (বিষ্ণুপুরাণ ৩।৭।৩২)। সুতরাং সাধকের সর্বদা মনে রাখা উচিত যে তাঁর শরীর অর্থাৎ মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়াদি, প্রাণ, অহং (আমিত্ব) সবই ভগবদ্স্বরূপ।

তাই ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণ-উদ্ধব সংবাদে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে বলেছেন—

সর্বং ব্রহ্মাত্মকং তস্য বিদ্যয়াঽঽত্মমনীষয়া।
পরিপশ্যন্নুপরমেৎ সর্বতো মুক্তসংশয়ঃ॥ (ভাগবত ১১।২৯।১৮)

যখন সবই ভগবান এরূপ নিশ্চিত হয়ে যায়, তখন সাধক এই অধ্যাত্ম বিদ্যার (ব্রহ্মবিদ্যার) সাহায্যে সর্বপ্রকার সংশয়রহিত হয়ে সর্বত্র তাঁকে অনুভব করেন, অর্থাৎ সর্বত্রই ভগবান এই ভাবনা আর থাকে না, তিনি সর্বত্র ভগবানকেই প্রত্যক্ষ করেন। অতি উচ্চকোটির সাধু-মহাত্মারা অনেক সময় আবার জগৎ-সংসারে ভগবানের লীলাকার্যের—তার ইচ্ছার অনুগামী কার্যের সহায়তা করেন।

১) সাধারণত ভগবৎকোটির মহাপুরুষগণ সর্বদা অভিন্নভাবে ও অখণ্ডরূপে নিজ স্বরূপে বা ভগবদতত্ত্বে স্থিত থাকেন। তাঁদের জীবন, দর্শন, চিন্তাধারা, শরীরের স্পর্শের বায়ু ইত্যাদি দ্বারা জীবের কল্যাণ হয়।

২) কখনো এই মহাপুরুষরা এই অতি উচ্চভাব থেকে নিচে অবতরণ করেন। তাঁদের আচরণ ও কথিত বচন থেকেই শাস্ত্র সৃষ্টি হয়।

৩) সাধারণ মানুষ শাস্ত্র অবধারণ করতে পারে না তাদের জন্য কখনো আরো নিম্নে অবতরণ করে নানা উপদেশ, নির্দেশাদির দ্বারা মানব জীবনের কল্যাণ সাধনে ব্রতী হন।

৪) যারা নির্দেশ পালনে অপারগ বা ইচ্ছাকৃত অবমাননা করে, তাদের কখনো বরপ্রদান বা অভিশাপ দ্বারাও উন্নত করার চেষ্টা করেন।

এই মহাত্মারা শাপই দিন বা বরপ্রদান করুন অথবা নির্দেশই দিন—এসবই তাঁদের অত্যাধিক ত্যাগের পরিচয়। তাঁরা জীব উদ্ধারের জন্য বিভিন্ন ভূমিতে অবতরণ করেন, এতে তাঁদের বিন্দুমাত্রও স্বার্থ থাকে না।

ভগবানও তেমনি সর্বদা নিজ স্বরূপে অবস্থান করেন। এটি অত্যন্ত উচ্চকোটির বিষয়। কিন্তু অত্যাধিক কৃপাবশত তিনি কখনো জীবের উদ্ধারের জন্য আদর্শ লীলা করেন। তাঁর লীলা দেখে এবং শুনেই লোকে উদ্ধার লাভ করেন।

আরো নিচে এসে অবতাররূপে বা কারক পুরুষরূপে উপদেশ প্রদান করেন, শাসন করেন, অভিশাপ প্রদান, বর প্রদান অথবা জগতের হিতার্থে তাদের মৃত্যু পর্যন্ত ঘটান। ভগবান তাই বলেছেন—

'ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে'। (গীতা ৪।৭)

ভক্তির অধিকারী—(শ্লোক ৩০-৩৪)

সপ্তম অধ্যায়ে ভগবান ভাব অনুযায়ী চার প্রকার ভক্তের কথা বলেছেন আর নবম অধ্যায়ের শেষ পাঁচ শ্লোকে (৩০-৩৪) বর্ণ, আচরণ ও ব্যক্তিত্ব অনুযায়ী অপর সাত প্রকার ভক্তির অধিকারীর কথা বর্ণনা করেছেন। এরূপ অধিকারী ভক্তরাও তাদের ভাব অনুসারে সপ্তম অধ্যায় বর্ণিত অর্থার্থী, আর্ত, জিজ্ঞাসু ও জ্ঞানী ভক্তও হতে পারে। ভগবান এই ভক্তদের সম্বন্ধে বলেছেন যে আচরণ অনুযায়ী দুরাচার ও পাপযোনি, ব্যক্তিত্ব অনুসারে নারীজাতি এবং বর্ণ বিভাগে বৈশ্য, শূদ্র, ক্ষত্রিয় এবং ব্রাহ্মণ আদি যারাই তাঁর ভজনা করে সকলেই শীঘ্রই মহাত্মা পদবাচ্য হয়। এই শ্লোকগুলিতে প্রথমে দুরাচারী ও পাপযোনিদের কথা বলে পরে অন্যদের কথা বলা হয়েছে কারণ ভক্তিতে যে নিজেকে ছোট ভাবে ও অহংবর্জিত হয় সে ততই ভগবানের প্রিয় হয়। দুরাচারী ও পাপযোনিদের ভালত্বের ও সদ্‌গুণ সদাচারের অহংকার থাকে না, স্বাভাবিক ভাবেই ক্ষুদ্র ও দীনভাব থাকে তাই ভগবান প্রথমে তাদের কথা বলেছেন। সেইজন্য দ্বাদশ অধ্যায়ের ভক্তিযোগেও ভগবান সিদ্ধব্যক্তিদের প্রিয় ও সাধকদের অত্যন্ত প্রিয় বলেছেন।

এখন প্রশ্ন দুরাচারী ও পাপযোনি হঠাৎ কি করে অনন্যচিত্তে ভগবানের উপাসনায় ব্যাপৃত হবে। এর বিভিন্ন কারণ হতে পারে—

১) তার যদি বিপদে পড়েও কোনো সাহায্যের আশা না থাকে আর এইরকম অবস্থায় তার হঠাৎ মনে পড়ে যে 'ভগবান সকলের সাহায্যকর্তা ও তাঁর শরণাগত হলে সব কাজ ঠিক হয়ে যাবে।' তখন তার মধ্যে পরিবর্তন আসতে পারে।

২) মহাপুরুষের স্থানে গেলে সেই স্থান-মাহাত্ম্যে তাঁর ভগবানে আগ্রহ জাগতে পারে।

৩) বাল্মীকি, অজামিল প্রভৃতি পাপীও ভগবানের ভক্ত হয়েছেন, ভজনার প্রভাবে তাঁরা মহান হতে পেরেছেন।

এভাবে তাদের মধ্যে সুসংস্কার জাগতে পারে—যা সকলের মধ্যেই

অন্তর্নিহিত রয়েছে। ভগবান বলেছেন এই দুরাচারী যদি **'অনন্যভাক'** হয়, তার মানে এই নয় সে, অনন্যভাবে ভজনা করে। এর অর্থ সে অন্য আশ্রয় ত্যাগ করে ভগবৎ আশ্রয় গ্রহণ করে— **'ন অন্যাং ভজতি'**। **'অনন্যভাক্'**-এর ফলে আমিত্বর শুদ্ধি হয়, 'আমি ভগবানের এবং ভগবান আমার' এই ভাব আসে।

ভগবান হলেন **'ভাবগ্রাহী জনার্দন'**, তিনি ভক্তর ভাবই গ্রহণ করেন তার জপ-তপ-যজ্ঞ ক্রিয়া প্রভৃতিকে গুরুত্ব দেন না। এখন প্রশ্ন হল আমিত্ব পরিবর্তন কীরূপে হয় ? নিম্নোক্ত তিন প্রকারে এটির পরিবর্তন হতে পারে।

১) আমিত্ব দূরীকরণ—জ্ঞানযোগের সাহায্যে আমিত্ব দূর হয়।

২) আমিত্ব ভাবের শুদ্ধিকরণ— কর্মযোগের সাহায্যে অহংভাব শুদ্ধ হয়। অন্যের কর্তব্য না দেখে কেবলমাত্র নিজ কর্তব্য পালন করলে অহং-ভাব শুদ্ধ হয়। নিজের সুখ ও আরামের দিকে দৃষ্টিই অহং অশুদ্ধির মূল কারণ।

৩) আমিত্ব ভাবের পরিবর্তন—ভক্তিযোগের দ্বারা আমিত্ব ভাবের পরিবর্তন হয়। যেমন বিবাহ দ্বারা পতির সঙ্গে সম্পর্কিত হলে কন্যার আমিত্ব ভাবের পরিবর্তন হয়, তার আমিত্ব তার পতিকে নিয়েই থাকে তেমনি মানুষের অহংভাব যদি 'আমি ভগবানের ও ভগবান আমার' এইভাব নিয়ে হয় তবে তার অহংভাবের পরিবর্তন হয়। অহংভাবের এই পরিবর্তিত হওয়াই হল **'অনন্যভাক্'**।

দুরাচারী—এখানে প্রশ্ন এই যে, যে আগে দুরাচারী ছিল এবং এখনো হয়তো সম্পূর্ণ শুদ্ধ হয়নি সে কি সত্যই সাধু পদবাচ্য ? ভগবান কিন্তু এই বিধি দিয়েছেন যে **'সাধুরেব স মন্তব্যঃ'** অর্থাৎ সে ব্যক্তি সাধুই এবং ইহাই ভগবানের বিশেষ আজ্ঞা।

গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে ভগবান বলেছেন **'ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিরেকেহ কুরুনন্দন'** (গীতা ২।৪১) অর্থাৎ জ্ঞানযোগী ও কর্মযোগীর বুদ্ধি একনিষ্ঠ হয়, আর এখানে বলছেন **'সম্যক্ ব্যবসিতো হি সঃ'** অর্থাৎ কর্তাই এখানে একনিষ্ঠ। ভক্তিযোগের দৃষ্টিতে সমস্ত দুর্গুণ-দুরাচার টিকে থাকে ভগবৎ

বিমুখতায়, তাই মানুষ যখন অনন্যভাবে ভগবানের শরণ নেয়, যখন স্বয়ংই ভগবানে একনিষ্ঠ হয় তখন তার সমস্ত দুর্গুণ-দুরাচার দূর হয়। ভগবান বলেছেন, তখন সে **'ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্মাত্মা'** (গীতা ৯।৩১)—সে অতি শীঘ্রই ধর্মাত্মা হয়।

ব্রহ্মা ও অন্যান্য দেবতাগণ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবকালে তাঁকে স্তুতি করে জ্ঞানী ও ভক্ত সম্বন্ধে বলছেন—

যেঽন্যেঽরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিনস্ত্বয্যস্তভাবাদবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ।
আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ পতন্ত্যধোঽনাদৃতযুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ॥

(ভাগবত ১০।২।৩২)

হে কমলনয়ন ! যাঁরা আপনার শ্রীচরণে আশ্রয় গ্রহণ করে না এবং আপনাতে ভক্তিবর্জিত হওয়ার জন্য বুদ্ধিও শুদ্ধ নয়, তারা নিজেদের যতই মুক্ত মনে করুক, আসলে বদ্ধই।

তথা ন তে মাধব তাবকাঃ ক্বচিদ্ ভ্রশ্যন্তি মার্গাত্ত্বয়ি বদ্ধসৌহৃদাঃ।
ত্বয়াভিগুপ্তা বিচরন্তি নির্ভয়া বিনায়কানীকপমূর্ধসু প্রভো॥

(ভাগবত ১০।২।৩৩)

কিন্তু ভগবন্ ! যাঁরা আপনার ভক্ত, যাঁরা আপনার শ্রীচরণে সত্যকার প্রীতি উজাড় করে দিয়েছেন, তাঁরা কখনো জ্ঞানভিমানীদের মতো নিজ সাধন থেকে বিচ্যুত হন না। আপনি এদের সুরক্ষা দেওয়ায় এরা বড় বড় বিঘ্ন প্রদানকারী সৈনিকদের সর্দারের মাথায় পা দিয়ে নির্ভয়ে বিচরণ করেন, কোনো বিঘ্নই তাঁদের পথে অন্তরায় সৃষ্টি করতে পারে না।

জ্ঞানযোগের সাধকদের মধ্যে কিছু ন্যূনতা থাকলে তাদের পতন হতে পারে, কিন্তু ভক্তিযোগের সাধকদের কোনো ন্যূনতাই তাদের পতনের কারণ হতে পারে না। তাই ভাগবতের একাদশ স্কন্ধে শ্রীকৃষ্ণ-উদ্ধব সংবাদেও ভগবান উদ্ধবকে বলছেন—

বাধ্যমানোঽপি মদ্ভক্তো বিষয়ৈরজিতেন্দ্রিয়ঃ।
প্রায়ঃ প্রগল্ভয়া ভক্ত্যা বিষয়ৈর্নাভিভূয়তে॥ (ভাগবত ১১।১৪।১৮)

হে উদ্ধব ! আমার যে সব ভক্ত এখনো জিতেন্দ্রিয় হতে পারেনি এবং

সাংসারিক বিষয়ে নানাভাবে বাধাপ্রাপ্ত হয়ে সেদিকে আকৃষ্ট হতে থাকে, তারাও কিন্তু আমার প্রতি মুহূর্তে বর্ধনশীল ভক্তির প্রভাবে প্রায়শই বিষয়াদির কাছে পরাজিত হয় না।

রাজর্ষি অম্বরীষ প্রসঙ্গে ভগবান দুর্বাসামুনিকে বলছেন—

অহং ভক্তপরাধীনো হ্যস্বতন্ত্র ইব দ্বিজ।
সাধুভির্গ্রস্তহৃদয়ো ভক্তৈর্ভক্তজনপ্রিয়ঃ॥ (ভাগবত ৯।৪।৬৩)

হে দ্বিজ ! আমি সর্বতোভাবে ভক্তর অধীন, স্বাধীন নই। ভক্তগণের আমার হৃদয়ের ওপর সম্পূর্ণ অধিকার আছে। মহাভারতের অনুশাসনপর্বে বলা হয়েছে—

'ন বাসুদেবভক্তানাং অশুভং বিদ্যতে ক্বচিৎ'।

(মঃ ভাঃ, অঃ পঃ ১৪৯।১৩১)

ভগবদ্‌ভক্তর কখনো অশুভ হয় না।

ভগবান তাই গীতার এই শ্লোকে বলছেন **'কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি'** (গীতা ৯।৩১)—অর্থাৎ হে অর্জুন তুমি শপথ করেও বলতে পারো যে আমার ভক্তর কখনো পতন হয় না।

পাপযোনি—ভগবান সুদুরাচারীদের সম্বন্ধে বলার পর অন্য অধিকারী অর্থাৎ পাপযোনিদের সম্পর্কেও বলেছেন। এই জন্মে যারা মন্দ আচরণ করে তারা দুরাচার আর পূর্বজন্মে যারা পাপ আচরণ করেছে এবং এজন্মে পাপের ফল ভোগের জন্য নীচ বংশে জন্মগ্রহণ করে তাদের পাপযোনি বলা হয়েছে।

পাপযোনি শব্দটি বড়ই ব্যাপক এবং এতে পশু-পক্ষী থেকে অসুর-রাক্ষস সবই ধরা যেতে পারে। ভগবান ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণ-উদ্ধব সংবাদে উদ্ধবকে সাধুসঙ্গ ও ভক্তির মাহাত্ম্য প্রসঙ্গে বলেছেন—

বহবো মৎ পদং প্রাপ্তাস্ত্বাষ্ট্রকায়াধবাদয়ঃ।
বৃষপর্বা বলির্বাণো ময়শ্চাথ বিভীষণঃ॥
সুগ্রীবো হনুমানৃক্ষো গজো গৃধ্রো বণিক্‌পথঃ।
ব্যাধঃ কুব্জা ব্রজে গোপ্যো যজ্ঞপত্ন্যস্তথাপরে॥

(ভাগবত ১১।১২।৫-৬)

'বৃত্তাসুর, প্রহ্লাদ, বৃষপর্বা, বাণাসুর, বলিরাজা, ময়দানব, সুগ্রীব, হনুমান, জাম্বুবান, গজ, জটায়ু, তুলাধারবৈশ্য, ধর্মব্যাধ, ব্রজের কুব্জা, গোপীগণ, যজ্ঞপত্নীগণ এবং অপরাপর অনেকে আমার পদপ্রাপ্ত হয়েছে।'

কেবলেন হি ভাবেন গোপ্যো গাবো নগা মৃগাঃ।
যেঽন্যে মূঢ়ধিয়ো নাগাঃ সিদ্ধা মামীয়ুরঞ্জসা॥
যং ন যোগেন সাংখ্যেন দানব্রততপোঽধ্বরৈঃ।
ব্যাখ্যাস্বাধ্যায়সন্ন্যাসৈঃ প্রাপ্নুয়াদ্‌যত্নবানপি॥

(ভাগবত ১১।১২।৮-৯)

'ভগবান আরো বলছেন সাংখ্যযোগ, দানব্রত, তপস্যা, যজ্ঞ, শাস্ত্রব্যাখ্যা, বেদাধ্যায়ন ও সন্ন্যাস দ্বারা যত্নবান হয়েও আমাকে কেহ লাভ করতে পারে না। কিন্তু সেই আমি ভক্তিভাবের দ্বারা আবদ্ধ হয়ে, গোপীগণের এবং গো, গিরি, মৃগ, নাগ এবং অন্যান্য বিমূঢ়চিত্ত সিদ্ধগণেরও লভ্য হই।'

মহর্ষি শাণ্ডিল্য বলেছেন—**'আনিন্দ্যয়োন্যধিক্রিয়তে পারম্পর্যাৎ সামান্যবৎ'** (শাণ্ডিল্য ভক্তিসূত্র ৭৮) অর্থাৎ মানুষ যেমন দয়া, ক্ষমা, উদারতা ইত্যাদি সাধারণ ধর্মের অধিকারী হয় তেমনি নীচ থেকে নীচ ও উচ্চ থেকে উচ্চতর যোনিসম্ভূত সমস্ত প্রাণীই ভগবদ্‌ভক্তির অধিকারী।

নারী—চতুর্বর্ণের অন্তর্গত হলেও ভগবান পৃথকভাবে নারীদের কথা উল্লেখ করেছেন। এর অর্থ নারীগণ যে কেবল স্বামীর সঙ্গেই ভগবানের শরণ গ্রহণ করবেন এমন কোনো কথা নেই। নারীগণ অবশ্যই স্বাধীনভাবে তাঁর আশ্রয় গ্রহণ করতে পারে। এই প্রসঙ্গে বিপ্রপত্নীদের কৃষ্ণভক্তি উল্লেখনীয়।

বিপ্রপত্নী—শ্রীকৃষ্ণের সপ্তম বর্ষ বয়সে গ্রীষ্মকালে তাঁর যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণ পত্নীদের অনুগ্রহ করার ইচ্ছা জাগল। তখন শ্রীকৃষ্ণ গোচারণ ছলে যমুনা উপকূলবর্তী ব্রাহ্মণ পত্নীদের গৃহের নিকট আগমন করলেন। গোপবালকগণকে যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণদের নিকট অন্ন যা।র নির্দেশ দিলেন। কিন্তু ঐ ব্রাহ্মণরা ছিলেন **'ক্ষুদ্রাশা ভূরিকর্মাণো বালিশা বৃদ্ধমানিনঃ'** (ভাগবত

১০।২৩।৯) অর্থাৎ অজ্ঞ অথচ বিজ্ঞতা অভিমানী, তাই তারা তুচ্ছ স্বর্গলাভ কামনায় ধুমধাম করে যজ্ঞ করে চললেন, গোপবালকগণের প্রতি দৃক্‌পাতও করলেন না।

তখন শ্রীকৃষ্ণ ঈষৎ হাস্য করে গোপবালকগণকে বিপ্রপত্নীদের নিকট অন্ন যাচ্ঞার নির্দেশ দিলেন। এই দ্বিজপত্নীগণ পূর্ব হতেই শ্রীকৃষ্ণ কথায় আকৃষ্টচিত্তা ছিলেন এবং এখন গোপবালকগণের নিকট শ্রীকৃষ্ণের আগমন বার্তা ও অন্ন যাচ্ঞার কথা শুনে পরমানন্দে আত্মহারা হয়ে গেলেন। তাঁরা পিতা, পতি, ভ্রাতা ও বন্ধুগণের পুনঃপুনঃ নিষেধ সত্ত্বেও যাবতীয় চর্ব, চুষ্যাদি অন্নসামগ্রী নিয়ে দ্রুত শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশে ধাবিত হলেন।

শ্রীকৃষ্ণের দর্শনান্তে বিপ্রপত্নীদের কী হল—

অন্তঃ প্রবেশ্য সুচিরং পরিরভ্য তাপং।
প্রাজ্ঞং যথাভিমতয়ো বিজহুর্নরেন্দ্র॥ (ভাগবত ১০।২৩।২৩)

তাঁরা নয়ন দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে হৃদয়ে প্রবেশ করালেন এবং অন্তরে গাঢ় আলিঙ্গন করে শ্রীকৃষ্ণবিরহজনিত তাপ থেকে সদ্যই মুক্তিলাভ করলেন।

আর শ্রীকৃষ্ণ কী করলেন—

ভগবানপি গোবিন্দস্তেনৈবান্নেন গোপকান্।
চতুর্বিধেনাশয়িত্বা স্বয়ঞ্চ বুভুজে প্রভুঃ॥ (ভাগবত ১০।২৩।৩৫)

সেই প্রেমবতী বিপ্রপত্নীদের দ্বারা সমর্পিত অন্নব্যঞ্জনাদি পরম সমাদরে ভোজন করলেন ও গোপবালকগণকে ভোজন করালেন।

শ্রীকৃষ্ণ বললেন—হে ভাগ্যবতী দ্বিজপত্নীগণ ! তোমাদের এই আগমন পরম সার্থক। তোমরা আমাকে পরমাত্মারূপে হৃদয়ে ধারণ করেছ এবং আমার দর্শন লাভ করেছ তাই তোমাদের সর্ববিধ অভিষ্ট সিদ্ধ হয়েছে। আমার ভক্তগণ দয়ালু হয়, তাই তোমরা এখন আবার যজ্ঞস্থলে গমন করো। তোমাদের পতি যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণরা স্বর্গলাভ আকাঙ্ক্ষায় বহু ক্লেশকারী যজ্ঞ অনুষ্ঠান করছেন, তোমাদের উপস্থিতি দ্বারা তা সমাপ্ত হোক, কেননা শাস্ত্রে আছে—'**সস্ত্রীকো ধর্মমাচরেৎ**'। তোমরা যজ্ঞস্থলে প্রত্যাবর্তন করলে পতি, পিতা, ভ্রাতা, পুত্র কেহই তোমাদের দোষদৃষ্টি দেবে না এমনকি যজ্ঞিয়

দেবতাগণও তোমাদের সাদরে গ্রহণ করবে। শ্রীকৃষ্ণের আদেশানুসারে যখন যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণপত্নীরা যজ্ঞশালার নিকটবর্তী হলেন, তখন ব্রাহ্মণগণ দ্রুত এসে তাঁদের পত্নীদের পরম সমাদরে যজ্ঞস্থানে নিয়ে গিয়ে যজ্ঞ সম্পূর্ণ করলেন।

কেননা পদ্মপুরাণে আছে—

যেনার্চিতো হরিস্তেন তর্পিতানি জগন্তপি।

রজ্যন্তি জন্তবস্তত্র নিম্নমাপ ইব স্বয়ং॥ (পদ্মপুরাণ)

যাদের মন কৃষ্ণ অনুরাগে পূর্ণ, তাদের প্রতি সর্বপ্রাণীর ভালোবাসা স্বতঃই প্রবাহিত হয়, যেমন নদীর প্রবাহ নিম্নগামীই হয়ে থাকে।

যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণ পত্নীগণও শ্রীকৃষ্ণ দর্শনের পর কিছুদিনমাত্র কর্মানুবন্ধন দেহে আভাস মাত্র থেকে পরে প্রেমময় দেহ প্রাপ্ত হয়ে শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎ সেবাধিকার প্রাপ্ত হন। তাই ভক্তিরসামৃতসিন্ধু বলেছেন **'কৃপাসিদ্ধা বিপ্রপত্ন্যো বৈরোচনি শুকাদয়ঃ'**—বিপ্রপত্নী, বলিরাজা ও শ্রীশুকদেব সবাই ভগবানের কৃপাসিদ্ধ। আর সঙ্গপ্রভাবে যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণদেরও বৈধীভক্তি লাভ হল। তাঁরা নিরন্তর চিন্তা করলেন—**'অহো বয়ং ধন্যতমা যেষাং নস্তদৃশী স্ত্রীয়ঃ। ভক্ত্যা যাসাং মতির্জাতা অস্মাকং নিশ্চলা হরৌ॥'** যাঁদের ভক্তিবলে আমাদের শ্রীকৃষ্ণে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছে, তারা আমাদের স্ত্রী বলেই আমরা কৃতার্থ হয়েছি। তদবধি এই ব্রাহ্মণদের কৃষ্ণনাম কীর্তন, কৃষ্ণলীলা স্মরণ বা কৃষ্ণপাদ অর্চনে আর কোনো ত্রুটি রইল না।

বৈশ্য ও শূদ্র—স্ত্রী জাতির পরে ভগবান বৈশ্য ও শূদ্রগণেরও ভক্তিভাবে তাঁকে প্রাপ্তির কথা বলেছেন—**'তে অপি যান্তি পরাং গতিম্'**। প্রাচীনকালে পঞ্চকন্যা অর্থাৎ অহল্যা, দ্রৌপদী, কুন্তী, তারা, মন্দোদরী এবং দেবহুতি, শবরী আদি অনেক নারীই এবং বৈশ্যদের মধ্যে সমাধি, তুলাধার এবং শূদ্রদের মধ্যে বিদুর, সঞ্জয়, নিষাদরাজ গুহক আদি অনেকেই ভক্তিদ্বারাই ভগবানকে প্রাপ্ত হয়েছেন।

ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়—ভগবান পরের শ্লোকে পুণ্যবান ব্রাহ্মণ ও রাজর্ষি ক্ষত্রিয়দের কথা বলেছেন। এই সব ব্যক্তি পূর্বজন্ম অর্জিত পুণ্য দ্বারা

ইহজন্মে পবিত্র কুল ও পবিত্র আচরণের অধিকারী হন। ভগবান বলছেন **'অনিত্যমসুখং লোকমিমং প্রাপ্য ভজস্ব মাম্'** (গীতা ৯।৩৩)। অর্থাৎ এই সব মান্যবর ব্যক্তিরা যদি তাঁদের শরীরকে অনিত্য এবং সংসারকে দুঃখময় মনে করে এসব তুচ্ছ করে ভগবান ভজনে মত্ত হন তবেই তারা ভগবানকে প্রাপ্ত হন।

ভগবান বলতে চেয়েছেন পবিত্র আচরণকারী ব্রাহ্মণ বা ঋষিসুলভ ক্ষত্রিয়ের কোনো মূল্যই নেই, সব মূল্যই হল ভক্তির।

সপ্তম অধ্যায়ে চার প্রকারের ভক্ত ও নবম অধ্যায়ে সাত অধিকারীর কথা বলে ভগবান এই অধ্যায় শেষ করছেন ভজনার ছয়টি প্রকারের কথা জানিয়ে। ভগবান বলছেন, ভগবদ্ভক্ত হবে সদাই মন্মনা, মদ্ভক্তো, মদ্যাজী, মাং নমস্কুরু, যুক্তাত্মন এবং মৎপরায়ণ।

মন্মনা—যেখানে প্রিয়ভাব থাকে সেখানেই মন আকৃষ্ট হয়। তাই ভগবান বলছেন ভক্ত সদাই 'মদ্গতচিত্ত হও'।

মদ্ভক্ত—সে সদাই আমার ভক্ত হবে অর্থাৎ আমার সঙ্গেই সম্পর্ক স্থাপন করবে, আমার সঙ্গেই আত্মীয়তা করবে। আমি অমুক বর্ণের, অমুক সম্প্রদায়ের ইত্যাদি জাগতিক আশ্রয় ত্যাগ করে ভগবানেরই আশ্রয় গ্রহণ করবে।

মদ্যাজী—আমার পূজনকারী হও। অর্থাৎ খাওয়াদাওয়া, শোওয়া-জাগা, আসা-যাওয়া যা কিছু কর্মই কর, তা সবই আমার পূজারূপে করো। সে সবই আমার পূজা মনে করবে।

মাং নমস্কুরু— আমাকে প্রণাম করো, এর তাৎপর্য হল ভগবৎ প্রদত্ত সমস্ত অনুকূল-প্রতিকূল পরিস্থিতিতে ভক্ত প্রসন্ন থাকবে। যদি মন ও মর্যাদার বিরুদ্ধেও কোনো পরিস্থিতি আসে তাতেও ভক্ত প্রসন্ন থাকে। যারা জাগতিক সুখ ও পরলোকের ভয়ে ভগবদ্ চরণে পতিত হয়, তারা আসলে সেই সুখ-সুবিধারই শরণাগত থাকে, ভগবানের নয়। প্রকৃতপক্ষে তাকেই ভগবৎ চরণাশ্রিত বলে যে নিজের বলে কিছুই না রেখে সবই ভগবৎ ইচ্ছায় সমর্পণ করে।

যুক্তাত্মন—নিজেকে আমাতে যুক্ত করবে এর অর্থ এই যে 'আমি ভগবানেরই' এই ভাবে অহং-অভিমান পরিবর্তিত হলে দেহ-মন-ইন্দ্রিয়-পদার্থ-ক্রিয়া সবই আমাতে অবনমিত হবে। একে বলে শরণাগতি। আমার প্রাপ্তিলাভে সন্দেহ সেখানেই থাকে যখন আমাকে ছাড়াও অন্য কিছুর কামনা বা আসক্তি থাকে, এর ফলে আমি সর্বত্র পরিপূর্ণ থাকলেও আমাতে আমার প্রাপ্তি হয় না।

মৎপরায়ণঃ—এর অর্থ হল আমার ইচ্ছা ব্যতিরেকে যেন নিজের কিছু করার বা করানোর ইচ্ছে না থাকে। আমাতে অভিন্ন হয়ে যেন আমার ক্রীড়নক হয়ে থাকে।

কবীর বলছেন—

'কবীরা কুতিয়া রামকি, মুতিয়া মেরা নাও
গলেমে রামকা জেবরী, যিত খিঁচো তিত যাঁউ।'

কবীর রামেরই কুকুর, তাঁর গলায় রামনামেরই মালা (কণ্ঠি)। এই মালা ধরে রাম তাকে যেখানেই নিয়ে যান তাতেই তিনি খুশি।

৩. ভক্তর ভাব—(৯।২৬-২৯, ১০।৭-৯)

আরাধনাকারী ভক্ত ও অধিকারী ভক্তর বর্ণনা করে, ভগবান বলছেন ভক্ত কীভাবে তাঁর ভজন করবে। সাত শ্লোকব্যাপী এই বর্ণনা আছে নবম অধ্যায়ে এবং দশম অধ্যায়ে।

সংসারের দুটি রূপ পদার্থ ও ক্রিয়া। এতে আসক্ত হলে পতন হয় আর এগুলিকে ভগবানকে অর্পণ করলে ভগবানই তাঁর হয়ে যান।

ভক্তর পদার্থ সমর্পণ—ছাব্বিশতম শ্লোকে ভগবান বলছেন **'পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি'**। এই শ্লোকে পদার্থের মুখ্যতা নেই, আছে ভাবের মুখ্যতা কারণ ভগবান ভাবেরই পিয়াসী, পদার্থর নয়। দেবতাদের উপাসনায় বিশেষ বিশেষ বস্তুর, পূজার বিধি-নিয়মের ও মন্ত্রাদির প্রয়োজন হয় কিন্তু ভগবানের পূজা হয় ভক্ত কর্তৃক যথাসাধ্য অর্পিত পত্রাদি, ফুল, ফল ও জলে—যা ভগবান গ্রহণ করেন। কিন্তু অর্পণ করতে হবে **'ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি'** অর্থাৎ ভক্তিভাবে। ভগবান ভক্তিভাবে অর্পিত এই সামান্য পদার্থ

কেবল স্বীকারই করেন না, তা ভক্ষণ করেন **'তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামি প্রযতাত্মনঃ'**।

মানুষ যখন কোনো বস্তুকে আহুতি দেয়, সেটি যজ্ঞে পরিণত হয়। শ্রদ্ধাপূর্বক কাউকে দিলে তাকে দান বলে। আবার সেটিকে যদি সংযমপূর্বক নিজ কাজে ব্যবহার না করা হয় তবে তা হয় তপ এবং তা ভগবানে সমর্পণ করলে তা হয় যোগ (ভগবৎ-সম্বন্ধ)। এ হল ত্যাগেরই ভিন্ন ভিন্ন নাম।

আমরা জানি দ্রৌপদী প্রেমের সহিত ভগবানকে পত্র (শাকপাতা), গজেন্দ্র পুষ্প (পদ্ম), শবরী ফল এবং রন্তিদেব জল অর্পণ করে ভগবানকে প্রাপ্ত হয়েছিলেন।

ভক্তর ক্রিয়া সমর্পণ— ভক্তদের পদার্থ সমর্পণের কথা বলে ভগবান ক্রিয়া সমর্পণের কথা বলছেন।

যৎ করোষি, যৎ অশ্নাসি, যজ্জুহোসি, দদাসি যৎ।
যৎ তপস্যাসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্॥ (গীতা ৯।২৭)

যৎ করোষি—অর্থাৎ ভক্ত যা কিছু করবে যেমন শারীরিক, ব্যবহারিক, সামাজিক, পারমার্থিক —সবই ভগবানের উদ্দেশে করবে। ভগবান পরে ক্রিয়াগুলি ভাগ করে বলেছেন।

যৎ অশ্নাসি —এই পদটি হল সমস্ত শারীরিক ক্রিয়ার অর্পণ। অর্থাৎ শরীরের জন্য যা কিছু গ্রহণ করা হয় যেমন আহার পানীয় ইত্যাদি, বস্ত্র পরিধান, স্নানাদি নিত্যকর্ম, শরীর রক্ষার জন্য শয়ন, নিদ্রা, ঘুরে বেড়ানো ইত্যাদি সবই ভগবানের জন্য বলে তাঁকে সমর্পণ করতে হয়।

যজ্জুহোসি—যত শাস্ত্রীয় ক্রিয়া অর্থাৎ যজ্ঞ-সামগ্রী একত্রিত করা, প্রজ্জ্বলন করা, মন্ত্রপাঠ, আহুতি প্রদান সবই তাঁকে অর্পণ করা।

দদাসি যৎ—অন্যকে যা কিছু দান অর্থাৎ অন্যের সেবা করা, অপরকে সাহায্য করা ইত্যাদি সমস্ত শাস্ত্রবিহিত কর্মও ভগবানকে অর্পণ করবে।

যৎ তপস্যাসি—ভক্ত যা কিছু তপস্যা করে অর্থাৎ ইন্দ্রিয় সংযম, কর্তব্য পালনকালে আগত অনুকূল-প্রতিকূল পরিস্থিতিজনিত অবস্থায় স্থিতি, তীর্থ, ব্রত, ভজন, ধ্যান, জপ-কীর্তনাদি সমস্ত পারমার্থিক ক্রিয়াও ভগবানে সমর্পণ

করে। আগের শ্লোকে ভগবান বলেছেন অকিঞ্চিৎকর বস্তুও ভক্তি সহকারে নিবেদন করলে আমি গ্রহণ করি আর এই শ্লোকে বলছেন কিছু বস্তু দিতে হবে না, নতুন কোনো উদ্যমও নিতে হবে না কেবল আমাদের দ্বারা যেসব লৌকিক, পারমার্থিক ক্রিয়া স্বাভাবিক ভাবে হয় তাই ভগবানকে অর্পণ করতে হবে। বস্তুত নিজেকে (স্বয়ংকে) সমর্পণ করলেই সব ক্রিয়া স্বভাবত ভগবানে অর্পিত হয় এবং ভগবানের প্রসন্নতার হেতু হয়। বালক যেমন মার সাথে খেলা করতে করতে কখনো দূরে চলে যায়, আবার কখনো কোলে চলে আসে, কখনো পিঠে চড়ে বসে। এইসব ক্রিয়াতে মা প্রসন্ন হন। বালকের মার প্রতি আপন ভাবই মায়ের প্রসন্নতার কারণ। তেমনি শরণাগত ভক্তর ভগবানের প্রতি আপনভাব হলেই ভক্তর প্রতিটি ক্রিয়াতেই ভগবান প্রসন্ন হন।

অর্পণকারী ভক্তর ত্যাগের অহংকার হতে পারে না কেননা যাঁর জিনিস তাঁকে অর্পণ করে কিসের অহংকার ? ভক্ত সদাই মনে করে '**ত্বদীয় বস্তু গোবিন্দ তুভ্যমেব সমর্পয়ে**'। জ্ঞানযোগী পদার্থ ও ক্রিয়াসমূহ 'পরিত্যাগ' করে আর ভক্ত সমস্ত পদার্থ ও ক্রিয়াসমূহ ভগবানে অর্পণ করে অর্থাৎ সেগুলি নিজের বলে না মেনে ভগবৎস্বরূপ বলে মেনে নিয়ে তাঁকে প্রাপ্ত হয়।

পরের শ্লোকে ভগবান বলছেন—'**সন্ন্যাসযোগযুক্তাত্মা বিমুক্তো মামুপৈষ্যসি**' (গীতা ৯।২৮) অর্থাৎ এইভাবে সবকিছুই আমাকে সমর্পণ করলে সমস্ত কিছু থেকে মুক্ত হয়ে আমাকেই প্রাপ্ত হবে। এখানে সমর্পণ যোগকেই বলা হয়েছে সন্ন্যাসযোগ। ভগবান বলছেন সেই ভক্ত শুভাশুভ ফল থেকে মুক্ত হয়। এখানে শুভ হচ্ছে অপরের জন্য করা কর্ম ও অশুভ হচ্ছে নিজের জন্য করা কর্ম। শুভ কর্মের ফল হয় অনুকূল পরিস্থিতি আর অশুভ কর্মের ফল হচ্ছে প্রতিকূল পরিস্থিতি। এই শুভ কর্ম ও অশুভ কর্মর ফল আসক্তি সহ ভোগ করলে উভয়েই বন্ধনকারক হয়ে থাকে। যেমন শিকল সোনারই হোক বা লোহারই হোক বন্ধন উভয়ের সাহায্যেই হয়ে থাকে। ভক্ত শুভ কর্ম ভগবানকে সমর্পণ করেন আর অশুভ কর্ম তো কখনো

করেনই না। যদি বা কোনোভাবে অশুভ কর্ম হয়ে যায় তবে তজ্জনিত প্রতিকূল পরিস্থিতি প্রসন্ন মনে ভোগ করেন। ভক্তর কাছে অনুকূল ও প্রতিকূল পরিস্থিতি ভগবানের 'দয়া' ও 'কৃপা' রূপে পর্যবসিত হয়। ভগবান যখন জীবকে ভালবেসে, স্নেহ করে কর্মবন্ধন থেকে অনুকূল পরিস্থিতি দিয়ে তাকে মুক্ত করেন তাকে বলে দয়া। আর যখন শাসন করে প্রতিকূল পরিস্থিতি সৃষ্টি করে তাকে মুক্ত করেন তখন তাকে বলা হয় কৃপা। এইরূপে দয়া ও কৃপা করে ভগবান ভক্তকে সবল ও সহিষ্ণু করে তোলেন। ভক্ত দুই ব্যাপারেই প্রসন্ন থাকেন। কারণ তাঁর লক্ষ্য অনুকূলতা বা প্রতিকূলতার দিকে থাকে না, তার দৃষ্টি থাকে ভগবানের দিকে, তাই দয়া ও কৃপা তার কাছে একইরূপে প্রতিভাসিত হয়।

লালনে তাড়নে মাতুর্নাকারুণ্যং যথার্ভকে।
তদ্বদেব মহেশস্য নিয়ন্তুর্গুণদোষয়োঃ॥

বালককে যেমন পালন করায় বা তাড়না করায় মায়ের কখনো অকৃপা হয় না সেইরকম জীবগণের দোষগুণ নিয়ন্ত্রণকারী পরমেশ্বরের কখনো কারোর উপর অকৃপা হয় না।

পরের শ্লোকে ভগবান সর্বপ্রাণীর প্রতি তাঁর সমত্ব ভাবের কথা বলেছেন, **'সমোহহং সর্বভূতেষু ন মে দ্বেষ্যোঽস্তি ন প্রিয়ঃ।'** (গীতা ৯।২৯)

তাঁর দৃষ্টিতে সব প্রাণীর প্রতিই সমান ভাব থাকে অর্থাৎ পিঁপড়ে ছোট বলে কৃপা কম আর হাতি বড় বলেই বেশি, উচ্চবর্ণ বলে আপন এবং অন্য বর্ণ বলে পর অথবা ভগবৎ প্রতিকূল আচরণকারীদের মধ্যে তাঁর প্রকাশ কম আর তাঁর অনুকূল আচরণকারীদের তিনি বেশি প্রকাশিত এমন কখনই নয়। তিনি সকল প্রাণীতে সমানরূপে ব্যাপ্ত। অবশ্য একথা সত্যি যে, যে ব্যক্তি সকামভাবে শুভকর্ম করে সে উচ্চগতি প্রাপ্ত হবে আর যে অশুভকর্ম করে সে নিম্নগতি অর্থাৎ চুরাশী লক্ষ যোনি প্রাপ্ত হবে আর এটি ঋত বা প্রকৃতির নিয়ম অনুসারেই হয়। কিন্তু প্রাণী পুণ্যাত্মা বা পাপাত্মা যাই হোক না কেন তারা কখনোই ভগবানের রাগ বা দ্বেষের পাত্র নয়।

যেমন কোনো ব্যক্তির এক হাতে ব্যথা হলে সেটি শরীরের কোনো কাজে লাগে না উল্টে রাত্রে ঘুম আসে না, কাজ করতে অসুবিধা হয় আর অন্য হাতটি শরীরের সব কাজ করে দেয়, কিন্তু কোনো ব্যক্তিই পীড়িত হাতকে দ্বেষ করে না বা সুস্থ হাতকে প্রিয় ভাবে না।

সেইরকম কেউ যদি শাস্ত্রানুসারে কর্ম করে পুণ্যাত্মা হয়, আবার কেউ যদি পাপী হয় তবুও এই দুই-এর কারো প্রতি ভগবানের রাগ বা দ্বেষ হয় না কারণ প্রাণীতে তিনি সমান রূপে ব্যপ্ত।

এই শ্লোকের পরের লাইনে ভগবান বলেছেন— **'যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু চাপ্যহম্'** (গীতা ৯।২৯)। অর্থাৎ যাঁরা ভক্তিপূর্বক আমাকে ভজনা করেন, তাঁরা আমাতে ও আমি তাদের মধ্যে অবস্থান করি। অবশ্য এর অর্থ এই নয় যারা ভক্তিহীন বা শাস্ত্রের নির্দেশের বিরুদ্ধে চলে তারা আমাতে নেই বা আমি তাদের মধ্যে নেই। আসলে তারা নিজেরাই আমার অবস্থিতি মানে না। তারা নিজেদের সংসারী জীব ভেবে সংসারেই থাকতে চায়।

আসলে এই বিভেদ হয় নিজের নিজের ভাবের কারণে। যেমন কোনো পুত্র ভালো কাজ করলে তাকে বলে 'সুপুত্র' আর খারাপ কাজ করলে তাকে বলে কুপুত্র। তাদের আচরণের জন্যই সুপুত্র-কুপুত্র বিভেদ হয়ে থাকে, বাবা-মায়ের পুত্রভাবে কোনো পার্থক্য থাকে না। ইলেকট্রিকের সাহায্যে কোথাও বরফ তৈরি হয় আবার কোথাও আগুন তৈরি হল। এই বৈষম্য ইলেট্রিকের নয়, এ যন্ত্রেরই সৃষ্টি। তেমনি যারা ভগবানে অবস্থান করেও ভগবানকে মানে না, তাঁর ভজনা করে না, এই বৈষম্য তাদেরই সৃষ্টি ভগবানের নয়। সূর্য সকলকে সমান কিরণ বিতরণ করলেও বস্তুভেদে তার প্রভাব ভিন্ন ভিন্ন হয়। কাঠের টুকরো সূর্যরশ্মি অবরোধ করে, কাঁচের টুকরোয় সূর্যরশ্মি অতিক্রম করে আর আতস কাঁচ সূর্যের কিরণ একস্থানে কেন্দ্রীভূত করে অগ্নি প্রজ্বলিত করে। তাৎপর্য এই যে, বৈষম্য পদার্থগুলির সৃষ্টি, সূর্যের নয়। সূর্যকিরণ সর্বত্র সমানভাবে পড়লেও পদার্থগুলি সূর্যের কিরণ যেভাবে গ্রহণ করে, সূর্যকিরণ তার মধ্যে সেভাবেই প্রকটিত হয়।

ভক্তের ভাবটি হল আমি 'ভগবানের ও ভগবান আমার' এই সম্পর্ক স্থাপন করা। ক্রমে ঘনিষ্ঠতা এত বৃদ্ধি পায় যে ভক্ত ও ভগবান অভিন্ন হয়ে যায়—**'তস্মিংস্তজ্জনে ভেদাভাবাৎ'** (নারদভক্তিসূত্র ৪১)। সেইজন্য ভগবান ভক্তের মধ্যে ও ভক্ত ভগবানের মধ্যে অবস্থিত বলা হয়।

ভগবান ভক্তের ভাবের প্রকরণটি শেষ করেছেন দশম অধ্যায়ের (৭-৯) তিনটি শ্লোকে ভগবানের বিভূতির প্রতি তাঁর ভক্তদের দৃঢ় শ্রদ্ধার কথা বলে। ভগবানের শক্তিকে বলে যোগ এবং তার থেকে প্রকটিত ব্যক্তি, বস্তু, পদার্থ আদিকে বলা হয় বিভূতি। ভগবান বলছেন তাঁর বিভূতি ও যোগকে দৃঢ়ভাবে জেনে ভক্ত **'অবিকম্পেন যোগেন যুজ্যতে নাত্র সংশয়ঃ'** (গীতা ১০।৭) অর্থাৎ অবিচলিত ভক্তিযোগে যুক্ত হন।

মানুষ যখন ভোগবুদ্ধি সহকারে ভোগাস্বাদন করে, তার থেকে সুখ গ্রহণ করে তখন তার শক্তির হ্রাস পায় ও ভোগবস্তুর নাশ হয়। কিন্তু যদি তার মধ্যে ভোগবাসনার লেশমাত্র না থাকে তখন তার শক্তি হ্রাস পায় না এবং সামর্থ্যও বজায় থাকে। মানুষ কাজ করতে করতে যদি ক্লান্ত হয়ে পড়ে তবে বিশ্রাম নিলে শক্তি ফিরে পায়। জীবনের প্রাণশক্তি ফুরিয়ে গেলে তখন তার মৃত্যু হয় আবার নতুন জন্মে প্রাণশক্তি ফিরে আসে। সর্গে (সৃষ্টিতে) শক্তি ক্ষীণ হয় আর প্রলয়ে শক্তি সঞ্চিত হয়। প্রকৃতির সঙ্গে আসক্তি সহকারে যুক্ত হলেই শক্তি ক্ষীণ হয় আর তার থেকে সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হলে মহান শক্তি অর্জিত হয়। জগৎ-পদার্থে বিশেষত্ব, অলৌকিকত্ব দেখলে মানুষ তা ব্যক্তি বা বস্তুরই ভাবে এবং সে এতে আসক্ত হয়ে পড়ে। ভক্ত যখন দৃঢ়ভাবে মানে যে এসবই ভগবানের যোগশক্তির দ্বারা প্রকটিত ঐশ্বর্য (বিভূতি) তখন তার ভক্তি অবিচলিত হয়। আর এইরূপ ভক্ত সম্বন্ধে ভগবান প্রকরণের শেষ (নবম) শ্লোকে বলছেন—মচ্চিত্তা, মদ্গতপ্রাণা।

মচ্চিত্তাঃ—এটা হল মদ্গতচিত্ত অর্থাৎ স্বয়ংকে ভগবানে আকৃষ্ট করা ফলে চিত্ত, বুদ্ধি আদি ভগবানে আকৃষ্ট থাকে।

মদগতপ্রাণাঃ— ভক্তের প্রাণও ভগবানে সমর্পিত থাকে। তাদের বেঁচে থাকাও ভগবানের জন্য আবার শরীরের সমস্ত ক্রিয়াদিও ভগবানের

জন্য। গোপিনীরা 'গোপীগীত' এ বলছেন—'ত্বয়ি ধৃতাসবঃ' (ভাগবত ১০।৩১।১) অর্থাৎ হে কৃষ্ণ! আমরা আমাদের প্রাণ তোমাকে সমর্পণ করে দিয়েছি। তোমার জন্যই প্রাণ ধারণ করে আছি। এইসব ভক্ত যখন পরস্পরে মিলিত হন, তারা ভগবৎ কথায় মগ্ন থাকেন। **'কণ্ঠাবরোধরোমাঞ্চাশ্রুভিঃ পরস্পরং লপমানাঃ পাবয়ন্তি কুলানি পৃথিবীং চ'** (নারদভক্তিসূত্র ৬৮)। তাঁরা 'কণ্ঠাবরোধ, রোমাঞ্চ এবং সাশ্রুপূর্ণ নয়নে পরস্পরকে সম্ভাষণ করে নিজ কুল ও পৃথিবীকে পবিত্র করে থাকেন।

৪. ভগবানের বিভূতি-ঐশ্বর্য— নবম অধ্যায় (১৬-১৯), দশম অধ্যায় (৪-৬)

পূর্ব প্রকরণে ভগবান ভক্তর তাঁর বিভূতি ও যোগের প্রতি দৃঢ় আস্থার কথা বলেছেন। এই প্রকরণের নবম ও দশম অধ্যায়ে ভগবান তাঁর ৮২টি বিভূতির বর্ণনা করেছেন যাতে সাধারণ মানুষ প্রকৃতির অন্যান্য ছোট বিভূতিতে আকৃষ্ট না হয়। এর মধ্যে নবম অধ্যায়ের চারটি শ্লোকে (১৬-১৯) ভগবান জগৎ-সংসারে তাঁর ৩৭ প্রকার বিভূতির কথা ও দশম অধ্যায়ে তিনটি শ্লোকে (৪-৬) প্রাণীগণের ভাবরূপে ২৫টি ও সিদ্ধ দেবতারূপে ২০টি নিম্নোক্ত বিভূতির কথা বলেছেন।

১. ক্রতু—বৈদিক রীতিতে যে হোমযজ্ঞ করা হয় তা ক্রতু, তাও ভগবান।

২. যজ্ঞঃ—পৌরাণিক রীতিতে হোম আদিকে বলে যজ্ঞ, তাও ভগবান।

৩. স্বধা—পিতৃপুরুষদের জন্য যে অন্ন-জলাদি অর্পণ করা হয় তা স্বধা, সেটিও ভগবান।

৪. ঔষধম্—স্বধার জন্য প্রয়োজনীয় ফল-ফুল-যব-তিল আদি বস্তুও ভগবান।

৫-৮. মন্ত্র, আজ্যম্, অগ্নি, হুতম্—এই ক্রতু বা যজ্ঞাদিতে যে মন্ত্র পড়া হয় তা, তার ঘৃত, তার অগ্নি এবং যজ্ঞরূপ ক্রিয়া—সবই ভগবান।

৯-১৪. বেদ্যম্, পবিত্র, ওঙ্কার, ঋক্, সাম, যজুঃ—বেদে বর্ণিত বিধি হল বেদ্য আর পবিত্র ওঙ্কার, বেদত্রয় সবই ভগবান। **'যজ্ঞো দানং তপশ্চৈব পাবনানি মনীষিণাম্'** (গীতা ১৮।৫)। নিষ্কামভাবে যজ্ঞ করলে যে পবিত্রতা

আসে তাও ভগবানের স্বরূপ। আবার সব মন্ত্রের আগে ওঁ যুক্ত হয়, তাও ভগবৎস্বরূপ।

১৫-১৮. পিতা, মাতা, ধাতা ও পিতামহ—এই জড়-চেতন-স্থাবর-জঙ্গম সবই ভগবানের সৃষ্টি আবার অবতাররূপে জন্মগ্রহণ করে বারে বারে তিনি এদের রক্ষাও করেন তাই তিনি পিতা। জীবগণের যে যে যোনিতে এবং যেমন যেমন শরীরের প্রয়োজন হয় তাদের সেইভাবে জন্ম দেওয়ান তাই তিনি মাতা। জগৎ সংসারকে সর্বতোভাবে ধারণ করেন তাই তিনি ধাতা। জগৎস্রষ্টা ব্রহ্মারও তিনি সৃষ্টিকর্তা তাই তিনি পিতামহ।

১৯-২৫. গতি, ভর্তা, প্রভু, সাক্ষী, নিবাসঃ, শরণং, সুহৃৎ—প্রাণীদের মধ্যে যা সর্বাপেক্ষা প্রাপনীয় গতি তাই তিনি। সংসার মাত্রেরই ভরণপোষণকারী হওয়ায় তিনি 'ভর্তা'। সব সময় সকলকে এবং সব কাজকে ঠিকমতো জানায় 'সাক্ষি' তিনি। ভগবানের অংশ হওয়ায় সমস্ত জীব স্বরূপত ভগবানেই অবস্থান করে তাই সকলের নিবাসস্থানও তিনি। যাঁর আশ্রয়গ্রহণ করা হয় সেই 'শরণ'ও তিনি কেননা কারণ ব্যতীতই প্রাণীদের হিতকারী 'সুহৃদ'ও ভগবান।

২৬-৩১. প্রভব, প্রলয়, স্থানম্, নিধানম্, বীজম্, অব্যয়ম্—সমস্ত জগৎ ভগবান হতে উৎপন্ন হয় এবং ভগবানেই লীন হয়, তাই তিনি 'প্রভব' ও 'প্রলয়'। মহাপ্রলয়ে প্রকৃতি সহ সমস্ত জগৎ ভগবানেই অবস্থান করে তাই তিনি 'স্থান'। জগৎ স্থিতি বা প্রলয়ের সময় তাঁর নির্দেশেই হয় তাই ভগবান হচ্ছেন 'নিধান'। জাগতিক বীজ সৃষ্টি করেই নষ্ট হয়ে যায়, কিন্তু ভগবান অনাদি এবং অনন্ত বিশ্ব রচনা করেও একই থেকে যান—**'পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে। পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে॥'** তাই তিনি 'অব্যয় বীজ'।

৩২-৩৭. তপামি, বর্ষম্, অমৃতম্, মৃত্যুম্, সৎ, অসৎ— সর্বজীবের জীবন প্রদানকারী 'সূর্যতাপ'ও ভগবান এবং এই তাপদ্বারা শোষিত জলীয় বাষ্পরূপ 'বর্ষাও' তিনি। জীবের প্রাণধারণকারী 'অমৃতরূপেও' ভগবান আবার 'মৃত্যুরূপে'ও ভগবান। এই পরিবর্তনশীল শরীর ও জগৎ এবং

অপরিবর্তনশীল জীবাত্মা ও পরমাত্মারূপে 'সদ্' ও 'অসৎ' সবই ভগবান– তিনি ব্যতীত আর কিছুই নেই। **'অহমেবাসমেবাগ্রে নান্যদ্ যৎ সদসৎ পরম্। পশ্চাদহং যদেতচ্চ যোঽবশিষ্যেত সোঽস্ম্যহম্'** (ভাগবত ২।৯।৩২)। জগৎ সৃষ্টির আগেও আমি ছিলাম, আমা ব্যতীত কিছুই ছিল না আবার জগৎ সৃষ্টি পরে যা কিছু দেখা যায় সেসবও আমি। জগৎ ছাড়াও আর যা কিছু আসে সেসবও আমি আর জগৎ ধ্বংসের পর বাকি যা থাকবে সেও আমিই।

জগতে ভগবানের বিভূতি বর্ণনা করে ভগবান দশম অধ্যায়ের তিনটি শ্লোকে (৪-৬) ভক্তের মধ্যে ব্যক্ত তাঁর কুড়িটি ও সিদ্ধভক্ত হিসাবে পাঁচিশটি অর্থাৎ মোট ৪৫টি (নিম্নোক্ত) বিভূতির বর্ণনা করেছেন।

১-৭ বুদ্ধিম্, জ্ঞানম্, অসম্মোহ, ক্ষমা, সত্যম্, দমঃ, শমঃ—কোনো উদ্দেশ্য নিয়ে নিশ্চয়কারী বৃত্তিকে বলা হয় 'বুদ্ধি'। নিত্য-অনিত্য যে বিবেক তা ভগবদ্প্রদত্ত এবং তাই 'জ্ঞান'। শরীর ও জগৎকে পরিবর্তনশীল জেনেও তাতে 'আমি' ও 'আমার ভাব' রাখা সম্মোহ আর তা না থাকাই হল 'অসম্মোহ'। কেউ যদি বড় ক্ষতিও করে, প্রতিকারের সামর্থ্য থাকলেও তা সহ্য করা এবং সেই অপরাধীকে নিজের কাছ থেকে বা ভগবানের কাছ থেকে ইহলোকে বা পরলোকেও কোনো শাস্তি না পাক এইরূপ চিন্তা করা হল ক্ষমা। যেমন শোনা, দেখা বা বোঝা হয়েছে, সেই অনুযায়ী অভিমান ও স্বার্থ পরিত্যাগপূর্বক অন্যর হিতের জন্য বেশি বা কম না করে যেমন আছে তেমন বাক্য বলাই 'সত্য'। পরমাত্মা প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে ইন্দ্রিয়গুলিকে নিজ নিজ বিষয় থেকে সরিয়ে নিজের বশে রাখা হল 'দম' এবং মনকে জাগতিক ভোগ চিন্তা থেকে সরিয়ে রাখা হল 'শম'।

৮-১৩ সুখম্, দুঃখম্, ভবঃ, অভাবঃ, ভয়ম্, অভয়ম্—শরীর-মন-ইন্দ্রিয়াদির অনুকূল পরিস্থিতির প্রাপ্তিতে যে প্রসন্নতা আসে তা 'সুখ' এবং প্রতিকূল পরিস্থিতি, ভাব ইত্যাদি উৎপন্ন হওয়াকে বলে ভব এবং এগুলি না হওয়াকে বলে 'অভাব'। নিজের আচরণ, ভাব শাস্ত্র, লোক মর্যাদাদির বিরুদ্ধ হলে মনে যে অনিষ্ট হওয়ার আশঙ্কা হয় তা হল 'ভয়'। আবার আচরণ ও ভাব যদি ভাল হয়, যদি সে দুঃখ না দেয়, শাস্ত্র ও সিদ্ধান্তের

বিরুদ্ধে কাজ না করে তাহলে চিত্তে অনিষ্ট হওয়ার আশঙ্কা থাকে না তাকে বলে 'অভয়'।

১৪-২০ অহিংসা, সমতা, তুষ্টিঃ, তপঃ, দানম্, যশঃ, অযশঃ—কায়-মন-বাক্যে কোথাও কোনো পরিস্থিতিতেই কোনো প্রাণীকে বিন্দুমাত্র দুঃখ না দেওয়াই হল 'অহিংসা'। নানা প্রকার অনুকূল-প্রতিকূল অবস্থা, বস্তু বা ব্যক্তি প্রাপ্ত হলেও চিত্তে বিষম ভাব না থাকাই হল 'সমতা'। বেশি প্রয়োজন থাকলেও অল্প প্রাপ্তিতে সন্তুষ্ট থাকা এবং আরো প্রাপ্তি হোক এইরূপ আশা না থাকাকে বলে 'তুষ্টি'। নিজের কর্তব্য পালন করতে গিয়ে যে কষ্ট, প্রতিকূল অবস্থা আসে তা প্রসন্নতা সহকারে সহ্য করাই হল 'তপ'। প্রত্যুপকারা ও ফলের আশা না রেখে প্রসন্নভাবে নিজ সৎ উপার্জন কোনো সৎপাত্রকে দেওয়া হল 'দান'। মানুষের ভাল ব্যবহার, গুণাদি নিয়ে জগতে যে খ্যাতি, গৌরব, প্রশংসাদি হয় তা হল 'যশ'। আবার দুর্ব্যবহার, কুভাব, দুর্গুণাদি নিয়ে জগতে যে নিন্দা আদি হয় তা হল 'অযশ' (অপযশ)।

এখানে কুড়িটি ভাব ভগবানের থেকে উৎপন্ন এবং তাঁরই এইসব বিভূতি জানানোর তাৎপর্য এই যে এরা ভিন্ন ভিন্ন হলেও আধার একই ভগবান। এক ভগবানে নানা প্রকার পরস্পর বিরুদ্ধ ভাব বিদ্যমান থাকে।

ভগবান এই প্রকরণে তাঁর বিভূতির কথা বলে শেষ করেছেন। এবারে জীবসৃষ্টির আদিকালে ব্যক্তিরূপে আবির্ভূত তাঁর পাঁচিশটি বিভূতির বর্ণনা করছেন।

১-৭ মহর্ষয়ঃ সপ্ত—

> **মরীচিরঙ্গিরাশ্চাত্রিঃ পুলস্ত্যঃ পুলহঃ ক্রতুঃ।**
> **বশিষ্ঠ ইতি সপ্তৈতে মানসা নির্মিতা হি তে॥**
> **এতে বেদবিদো মুখ্যা বেদাচার্যাশ্চ কল্পিতাঃ।**
> **প্রবৃত্তিধর্মিণশ্চৈব প্রজাপত্যে চ কল্পিতাঃ॥**
>
> (মহাভারত, শান্তিপর্ব ৩৪৭।৬৯।৭০)

মারীচি, অঙ্গিরা, অত্রি, পুলহ, পুলস্থ, ক্রতু ও বশিষ্ঠ এই সাতজনকে মহর্ষি বলা হয়েছে, এঁরা সকলে বেদবেত্তা ও বেদের আচার্য এবং প্রবৃত্তি-ধর্মের সঞ্চালনকারী প্রজাপতির কার্যে নিযুক্ত।

সপ্তৈতে সপ্তভিশ্চৈব গুণৈঃ সপ্তর্ষয়ঃ স্মৃতাঃ।
দীর্ঘায়ুষো মন্ত্রকৃত ঈশ্বরো দিব্যচক্ষুষঃ।
বৃদ্ধাঃ প্রত্যক্ষধর্মাণো গোত্রপ্রবর্তকাশ্চ যে॥

(বায়ুপুরাণ ৬১।৯৩-৯৪)

এই সপ্তর্ষি দীর্ঘায়ু, মন্ত্র প্রকাশকারী, ঐশ্বর্যশালী, দিব্যদৃষ্টিসম্পন্ন, গুণ, বিদ্যা ইত্যাদিতে প্রাজ্ঞ, ধর্মদ্রষ্টা ও গোত্র প্রবর্তনকারী।

৮-১১ চত্বারঃ—সনক, সনন্দন, সনাতন ও সনৎকুমার—এই চারজন ব্রহ্মার সৃষ্ট আদি পুরুষ। এঁরা প্রত্যেকেই ভগবৎস্বরূপ এবং ত্রিলোকে জ্ঞান, ভক্তি ও বৈরাগ্য প্রচার করেন। এরা সর্বদা মুখে **'হরি শরণম্'** উচ্চারণ করেন। **'হরিঃ শরণমেবং হি নিত্যং যেষাং মুখে বচঃ'** (পদ্মপুরাণ-মদভাগবৎ মাহাত্ম্য ২।৪৮)। এরা ভগবৎ আলোচনার প্রেমিক। তাই চারজনের মধ্যে একজন বক্তা হন ও অন্য তিনজন শ্রোতা হয়ে শোনেন।

১২-২৫—ব্রহ্মার মানস সৃষ্টির শেষে আছে চতুর্দশ মনু, যাদের সমবেত আয়ু ব্রহ্মার একদিনের সমান (১০০০ চতুর্যুগ)। এই চতুর্দশ মনুগণ হলেন—স্বায়ম্ভুব, স্বারোচিষ, উত্তম, তামস, রৈবত, চাক্ষুস, বৈবস্বত, সাবর্ণি, দক্ষসাবর্ণি, ব্রহ্মসাবর্ণি, ধর্মসাবর্ণি, রুদ্রসাবর্ণি, দেবসাবর্ণি এবং ইন্দ্রসাবর্ণি (বর্তমান হচ্ছে বৈবস্বত মন্বন্তর)। এঁরা সবাই ব্রহ্মার নির্দেশে সৃষ্টির উৎপাদক ও প্রবর্তক। এই সপ্ত মহর্ষি, চার সনকাদি ও চতুর্দশ মনু—পঁচিশ জনই ব্রহ্মার বা ভগবানের মানসপুত্র।

সনকাদি চার জন বিবাহ করেননি তাই নিবৃত্তপরায়ণ যত সাধু-মহাপুরুষ পূর্বে ছিলেন বা আছেন বা ভবিষ্যতে হবেন সবই উপলক্ষণে এঁদের নাদজ প্রজা।

আর সপ্ত ঋষি এবং চতুর্দশ মনু বিবাহিত ছিলেন তাই যারা বিবাহিত ছিলেন বা হবেন তারা সব উদ্ধৃত প্রজা। এঁরা হলেন বিন্দুজ প্রজা।

ভগবদ্ কৃপা—(নবম ২২), (দশম ১০-১১)

ষষ্ঠ অধ্যায়ে অর্জুনের প্রশ্ন ছিল **'অপ্রাপ্য যোগসংসিদ্ধিং কাং গতিং কৃষ্ণ গচ্ছতি'** (গীতা ৬।৩৭)। এই প্রশ্নের উত্তর ভগবান ষষ্ঠ অধ্যায়েই শেষ

করেছেন, কিন্তু ভক্তপ্রসঙ্গ ভগবানের অত্যন্ত প্রিয়। তাই নবম অধ্যায়ের ২২তম শ্লোকে ভগবান বলেছেন যে আমাতে নিত্যযুক্ত ভক্তের যাবতীয় দায়িত্ব অর্থাৎ অপ্রাপ্ত বস্তুর প্রাপ্তি এবং প্রাপ্ত বস্তুর রক্ষা যোগক্ষেম আমি বহন করি—

অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্যুপাসতে।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্॥ (গীতা ৯।২২)

এরূপ ভক্তের জন্য ভগবান ভাগবতেও বলেছেন—

'এবং স্বভক্তয়ো রাজন্ ভগবান্ ভক্তভক্তিমান্' (ভাগবত ১০।৮৬।৫৯)

ভক্ত কখনো ভগবানের হন আবার ভগবান কখনো ভক্তের ভক্ত হন। তাই বিনা প্রশ্নেই ভগবান সপ্তম, নবম ও দশম অধ্যায়ের (প্রথম অংশে) ৭৫টি শ্লোকে প্রকৃতি ও জগৎ সৃষ্টি, জীব সৃষ্টি ও তার বিভাগ তথা নির্বুদ্ধি জীব (ভগবৎ বিমুখ), স্বল্পবুদ্ধি জীব (অন্য দেবতার শরণগ্রহণকারী) এবং জ্ঞানী (প্রেমিক) সাধকের কথা বর্ণনা করেছেন। এই প্রকরণটি শেষ হয়েছে দশম অধ্যায়ের দুটি শ্লোকে (দশম ও একাদশ) একান্তি ভক্তর প্রতি তাঁর অহৈতুক কৃপার কথা বর্ণনা করে। ভগবান এই প্রকার ভক্তকে **'সততযুক্তানাম্'** বলেছেন। এই প্রকার ভক্তর প্রতি ভগবানের কৃপা কিভাবে আসে ? তিনি ভক্তকে 'বুদ্ধিযোগ' প্রদান করেন। এই বুদ্ধিযোগ কী ? কোনো বস্তু, ব্যক্তি বা পরিস্থিতি ইত্যাদির সংযোগ বা বিয়োগে তাঁদের চিত্তে কোনো চাঞ্চল্য আসে না। স্তুতি হোক বা নিন্দা হোক, স্বাস্থ্য ঠিক থাক বা না থাক ইত্যাদি পরস্পর বিরোধী পরিস্থিতি এলেও তাঁরা তাতে সমভাবে থাকতে পারেন।

এই 'বুদ্ধিযোগ' জাগ্রত হলে ভক্ত সেটিকে নিজের বলে মনেও করে না বা এই সমভাব থাকার জন্য নিজের কোনো বিশেষত্বও অনুভব করে না। আর বুদ্ধিযোগরূপী সমত্ব প্রাপ্ত হলেই ভক্ত **'মামুপয়ান্তি তে'** অর্থাৎ ভগবানকেই প্রাপ্ত হন, মানে তখন তার মধ্যে অপূর্ণতা বলে কিছু থাকে না। ভগবানের কৃপা আর কিভাবে প্রকাশ পায় ? তিনি ভক্তর অজ্ঞানতা জ্ঞানরূপ প্রদীপ দ্বারা নাশ করেন। আর এই অবস্থায় ভক্তচিত্তে কোনো প্রকার

সাংসারিক বাসনা তো থাকেই না এমনকি ভগবানকে ছাড়া তাঁর মুক্তির বাসনাও থাকে না। অজ্ঞানতা নাশরূপী এই যে তত্ত্ববোধ আর তার মহিমা শাস্ত্রাদিতে অনেক গীত হয়েছে, কিন্তু ভক্তর এজন্য কোনো পরিশ্রম করতে হয় না, ভগবান স্বয়ংই তাঁকে তত্ত্ববোধ প্রদান করেন। আর এসব দেওয়া সত্ত্বেও ভগবান এই প্রকার ভক্তর কাছে ঋণী থাকেন ও ভক্তকে প্রেমও প্রদান করেন। ভগবানে প্রেমভক্তি কি তা শাস্ত্রে নানাভাবে বলা হয়েছে এবং তাঁদের যে অপ্রাপ্য কিছুই নেই তাও বলা হয়েছে।

নারদ পঞ্চরাত্র বলেছে—

অনন্যমমতা বিষ্ণৌ মমতা প্রেমসঙ্গতা।
ভক্তিরিতুচ্যতে ভীষ্মপ্রহ্লাদোদ্ধবনারদৈঃ॥

অন্য কোনো বিষয়ের প্রতি মমতা না হয়ে যখন একমাত্র পরমেশ্বরের দিকেই হৃদয় ধাবিত হয়, তখন সেই প্রেমসংযুক্ত আসক্তিকে প্রকৃত ভক্তি বলে। ভীষ্ম, প্রহ্লাদ, উদ্ধব, নারদ আদি ভক্তগণ একবাক্যে একথা জানিয়েছেন। ভগবদ্‌নিষ্ঠ সাধুগণ ভগবান ছাড়া সমস্ত, তত্ত্বজ্ঞান বা অন্য কিছুই চান না।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে ভাগবতে বলছেন—

ন পারমেষ্ঠ্যং ন মহেন্দ্রধিষ্ণ্যং ন সার্বভৌমং ন রসাধিপত্যম্।
ন যোগসিদ্ধীরপুনর্ভবং বা ময্যর্পিতাত্মেচ্ছতি মদ্বিনান্যৎ॥

(ভাগবত ১১।১৪।১৪)

স্বয়ং আমাতে অর্পিত ভক্ত আমি ব্যতীত ব্রহ্মপদ, ইন্দ্রপদ, সসাগরা পৃথিবী, পাতাল রাজ্য, সমস্ত যোগসিদ্ধি এমনকি মোক্ষলাভও আকাঙ্ক্ষা করে না। ওই ভক্তগণের চিত্তে কোনোরূপ সাংসারিক বাসনা থাকে না ; শুধু তাই নয়, তাদের মধ্যে একমাত্র ভগবান ব্যতিত মুক্তির আকাঙ্ক্ষাও থাকে না। ভগবান কপিল স্বীয় জননী দেবাহুতিকে বলছেন—

সালোক্যসার্ষ্টিসামীপ্যসারূপ্যৈকত্বমপ্যুত।
দীয়মানং ন গৃহ্ণন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ॥ (ভাগবত ৩।২৯।১৩)

প্রেমিক ভক্তগণ ভগবানের সেবা পরিত্যাগ করে সালোক্য, সার্ষ্টি, সামীপ্য, সারূপ্য ও সাযুজ্য আদি পঞ্চপ্রকার মুক্তি প্রদান করলেও তা গ্রহণ

করে না। ভক্তি মানবজীবনের একটি পরম সম্পত্তি। প্রেমভক্তি দ্বারা পরমেশ্বরকে যত শীঘ্র লাভ করা যায় অপর কিছুতেই সেইরূপ হয় না। ভগবান তাই কৃষ্ণ-উদ্ধব সংবাদে বলছেন—

ন সাধয়তি মাং যোগো ন সাংখ্যং ধর্ম উদ্ধব।
ন স্বাধ্যায়স্তপস্ত্যাগো যথা ভক্তির্মমোর্জিতা॥ (ভাগবত ১১।১৪।২০)

বিচাররূপ জ্ঞান-চক্ষে আমরা ব্রহ্মকে অপরোক্ষরূপে দর্শন করে থাকি কিন্তু ভক্তিদ্বারা আমরা তাকে স্পর্শ করি, তাঁর সঙ্গে পরম আত্মীয়তা স্থাপন করি। ভক্তি না থাকলে কি জ্ঞান, কি বৈরাগ্য, কি তপস্যা কিছুই হৃদয়কে সেইরকম মধুময় করতে পারে না। ভক্তির অভাবে যদিও জ্ঞান একেবারে বিফল হয় না কিন্তু ভক্তি থাকলে কি জ্ঞান, কি বৈরাগ্য, কি তপস্যা সকলেই ক্রমে ম্লান ও জলো হয়ে পড়ে। যাদের তত্ত্বজ্ঞান হয়নি, তাদের হৃদয়েও যদি পবিত্র ভক্তির আবির্ভাব হয়, তাহলে ভক্তির প্রসাদে তাদের জ্ঞান, বৈরাগ্য ও অন্যান্য যাবতীয় বিষয় যথাসময় আপনা হতে লাভ হয় এবং তারা কৃতার্থ হয়। তাদের সমস্ত প্রতিবন্ধক অচিরেই ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। তারা প্রেমানন্দে ভগবানেরই ভজনা করে আর তাদের এই নিষ্কাম ও প্রেমপূর্বক ভাব দেখে ভগবানের হৃদয় দ্রবীভূত হয় এবং ভগবান স্বয়ংই তাদের অজ্ঞানজনিত অন্ধকার দূর করেন।

বাসুদেবে ভগবতি ভক্তিযোগঃ প্রযোজিতঃ।
জনয়ত্যাশু বৈরাগ্যং জ্ঞানঞ্চ যদহৈতুকম্॥ (ভাগবত ১।২।৭)

ঈশ্বরবিষয়িণী ভক্তির প্রভাবে শীঘ্রই বৈরাগ্য এবং জ্ঞান স্বয়ং উৎপন্ন হয়ে থাকে।

শ্রীকৃষ্ণ-উদ্ধব সংবাদে ভগবান বলছেন—

তে নাধীতশ্রুতিগণা নোপাসিতমহত্তমাঃ।
অব্রতাতপ্ততপসঃ সৎসঙ্গান্মামুপাগতাঃ॥ (ভাগবত ১১।১২।৭)

জ্ঞানী ভক্তিরহিত হতে পারে কিন্তু ভক্ত জ্ঞানরহিত হতে পারে না। গোপিনীরা শ্রুতি অধ্যয়ন করেননি, জ্ঞানী মহাপুরুষদের সঙ্গলাভও করেননি, তেমন ব্রত তপস্যাও করেননি, কিন্তু কেবলমাত্র প্রেম প্রভাবেই

(সৎসঙ্গের) তাঁরা আমাকে প্রাপ্ত হয়েছেন।

গোপিনীরা রাসলীলায় গোপীগীতায় গাইছেন—

ন খলু গোপিকানন্দনো ভবানখিলদেহিনামন্তরাত্মদৃক্।
বিখনসার্থিতো বিশ্বগুপ্তয়ে সখ উদেয়িবান্ সাত্বতাং কুলে॥

(ভাগবত ১০।৩১।৪)

হে সখে ! তুমি শুধুমাত্র যশোদার পুত্র নও বরং সমস্ত প্রাণীদের অন্তরাত্মার সাক্ষী। ব্রহ্মার প্রার্থনা শুনে বিশ্বরক্ষার নিমিত্তই তুমি যদুকুলে অবতীর্ণ হয়েছ।

আগেই বলা হয়েছে প্রেমিক ভক্ত কিছু না চাইলেও ভগবান তাকে **'দদামি বুদ্ধিযোগং তম্'** ও **'জ্ঞানদীপেন ভাস্বতা'** অর্থাৎ বুদ্ধিযোগ ও জ্ঞানযোগ প্রদান করেন এবং এসব দেওয়া সত্ত্বেও ভগবান তাঁর কাছে ঋণী থাকেন। এই প্রসঙ্গে ভাগবতে রাসপঞ্চাধ্যায়ীতে ভগবান বলছেন—

ন পারয়েঽহং নিরবদ্যসংযুজাং স্বসাধুকৃত্যং বিবুধায়ুষাপি বঃ।
যা মাভজন্ দুর্জরগেহশৃঙ্খলাঃ সংবৃশ্চ্য তদ্ বঃ প্রতিযাতু সাধুনা॥

(ভাগবত ১০।৩২।২২)

আমার সঙ্গে সর্বতোভাবে অনিন্দ্য (নির্দোষ) সম্পর্ক স্থাপনকারী গোপিনীদের উপর আমার যে কৃতজ্ঞতা ও ঋণ আছে তা আমি, দেবতাদের ন্যায় দীর্ঘায়ু হয়েও শোধ করতে পারব না। বড় বড় মুনি-ঋষি ও ত্যাগীরাও যে আত্মীয়তার গণ্ডী সহজে পার হতে পারে না, গোপিনীগণ তা সহজেই অতিক্রম করেছে।

প্রেমিক ভক্তও তার ভক্তির জোর জানে। ভক্ত রামপ্রসাদ বলেছেন—

'আমি ভক্তির জোরে কিনতে পারি ব্রহ্মময়ীর জমিদারী।'

———o———

অষ্টম প্রশ্ন

শ্রীভগবান সপ্তম অধ্যায়ের শেষে নিজের সমগ্ররূপ বর্ণনা করতে গিয়ে ব্রহ্ম, আধ্যাত্ম, কর্ম, অধিভূত, অধিদৈব এবং অধিযজ্ঞ—এই ছয়টি শব্দ প্রয়োগ করেছেন এবং বলেছেন যে যোগিগণ সমগ্ররূপে ইহা জেনে অন্তকালে তাঁকেই প্রাপ্ত হন।

ভগবানের এই কথা শুনে এই ছয়টি শব্দের অর্থ স্পষ্টভাবে জানার জন্য অষ্টম অধ্যায়ের প্রারম্ভেই অর্জুন সাতটি প্রশ্ন করেছেন।

কিং তদ্ব্রহ্ম কিমধ্যাত্মং কিং কর্ম পুরুষোত্তম।
অধিভূতং চ কিং প্রোক্তমধিদৈবং কিমুচ্যতে॥
অধিযজ্ঞঃ কথং কোঽত্র দেহেঽস্মিন্ মধুসূদন।
প্রয়াণকালে চ কথং জ্ঞেয়োঽসি নিয়তাত্মভিঃ॥

(গীতা ৮।১-২)

'অর্জুন বললেন—হে পুরুষোত্তম ! ব্রহ্ম কী ? অধ্যাত্ম কী ? কর্ম কী ? অধিভূত কাকে বলে ? অধিদৈবই বা কাকে বলে ?

অধিযজ্ঞ কী এবং এই দেহে কীভাবে অবস্থিত ? হে মধুসূদন ! সংযতচিত্ত ব্যক্তি মৃত্যুকালে কিভাবে আপনাকে জানতে পারে।' (গীতা ৮।১-২)

ভগবান অর্জুনের এই সাতটি প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন সমগ্র অষ্টম অধ্যায়ব্যাপী ২৬টি শ্লোকে এইভাবে—

প্রথম ৬টি প্রশ্নের উত্তর	শ্লোক ৩, ৪
৭ম প্রশ্নের উত্তর	শ্লোক ৫-৭
অভ্যাসযোগ ও ধ্যানযোগে ভগবৎ লাভ	শ্লোক ৮-১৩

ভক্তিযোগে ভগবৎ লাভ	শ্লোক ১৪-১৬, ২০-২২
ব্রহ্মলোক ও পুনরাবর্তন	শ্লোক ১৭-১৯
শুক্ল ও কৃষ্ণ গতিপথ	শ্লোক ২৩-২৮

প্রথম ছয়টি প্রশ্নের উত্তর—(শ্লোক ৩-৪)

অক্ষরং ব্রহ্ম পরমং স্বভাবোঽধ্যাত্মমুচ্যতে।
ভূতভাবোদ্ভবকরো বিসর্গঃ কর্মসংজ্ঞিতঃ॥
অধিভূতং ক্ষরো ভাবঃ পুরুষশ্চাধিদৈবতম্।
অধিযজ্ঞোঽহমেবাত্র দেহে দেহভৃতাং বর॥

(গীতা ৮।৩-৪)

'ভগবান উত্তরে জানাচ্ছেন পরম অক্ষরই ব্রহ্ম আর স্বভাব বা পরা প্রকৃতিকে (জীবাত্মাকে) আধ্যাত্ম বলা হয়। প্রাণীদের সত্তা প্রকটকারী যে ত্যাগ তাকেই কর্ম বলে।

ক্ষরভাব অর্থাৎ নশ্বর দেহকেই অধিভূত বলে, পুরুষ অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মাই অধিদৈব এবং দেহে অন্তর্যামীরূপে আমি (ভগবানই) বিরাজমান।' (গীতা ৮।৩-৪)

অক্ষরং ব্রহ্ম পরমম্—গীতায় যদিও ব্রহ্ম শব্দটি প্রণব, বেদ ইত্যাদি অর্থেও ব্যবহৃত হয়েছে তাহলেও এই স্থানে 'ব্রহ্ম' শব্দটির সঙ্গে 'পরমং' ও 'অক্ষরং' বিশেষণ যোগ হওয়ায় ইহা সচ্চিদানন্দ, অবিনাশী, নির্গুণ-নিরাকার পরমাত্মার বাচক।

স্বভাবোঽধ্যাত্মমুচ্যতে—যদিও আধ্যাত্মমার্গ বা আত্মবিদ্যাকেও আধ্যাত্ম বলে তবে এখানে 'স্বভাব' বিশেষণ যুক্ত হওয়ায় আধ্যাত্ম শব্দটি আত্মার বা জীবের স্ব-সত্তার (স্বরূপেরই) বাচক।

ভূতভাবোদ্ভবকরো বিসর্গঃ কর্মসংজ্ঞিতঃ—স্থাবর-জঙ্গম যত প্রকার প্রাণী আছে, তাদের সত্তা প্রকটিত করার জন্য যে ত্যাগ তাই 'কর্ম' নামে অভিহিত। মহাপ্রলয়ের সময় প্রকৃতি ক্রিয়াহীন হয় এবং মহাসর্গের সময় প্রকৃতি সক্রিয় অবস্থা প্রাপ্ত হয়। এর অর্থ হল মহাপ্রলয়ের সময় অহংভাব ও সঞ্চিত কর্মর সঙ্গে সকল প্রাণী প্রকৃতিতে লীন হয়ে যায় এবং প্রকৃতিও

প্রাণীদের সহ পরমাত্মায় লীন হয়ে থাকে। আবার এই লীন হয়ে থাকা প্রকৃতিকে বিশেষভাবে ক্রিয়াশীল করার জন্য ভগবানের পূর্বোক্ত সংকল্পই **'অহম্ বহুস্যাম প্রজাজেয়'** হল বিসর্গ অর্থাৎ ত্যাগ বা কর্মের আরম্ভ যার থেকে সৃষ্টি পরম্পরা শুরু হয়। কর্ম করতে করতে ক্লান্তি এসে গেলে প্রাণী যেমন তার 'কর্তৃত্বাভিমান', কর্মফলাসক্তি এবং সঞ্চিত কর্ম সঙ্গে রেখেই ঘুমিয়ে পড়ে এবং ঘুমে বিশ্রাম হওয়ার ফলে তার নিদ্রা হয় ও কর্ম করার জন্য শরীর-মন-বুদ্ধি-ইন্দ্রিয়াদিতে সতেজ ভাব আসে, শক্তি আসে—তেমনই সৃষ্টির অন্তে প্রলয়কালে জীব সকল নিজ নিজ কর্তৃত্বাভিমান, কর্মফলাসক্তি এবং সঞ্চিত কর্ম সহ সূক্ষ্ম প্রকৃতিতে এবং মহাপ্রলয়ে কারণ প্রকৃতিসহ যেন পরমাত্মায় লীন হন। সেই লীন হওয়া প্রাণীদের কর্ম বিশ্রাম লাভ করে ক্রমে পরিপক্ক হয় অর্থাৎ আবার প্রারব্ধরূপ ফল দানের জন্য উন্মুখ হয়ে ওঠে। তখন ভগবানের সংকল্প হয় এবং জীবের জন্মারম্ভের প্রক্রিয়া শুরু হয়। ইহাই 'আদি কর্ম' এবং জীবের নিজ নিজ কর্মের ফল অনুযায়ী বিভিন্ন শরীরের সঙ্গে সংযুক্তি ঘটানোকে ভগবান চতুর্দশ অধ্যায়ে **'তস্মিন্ গর্ভং দদাম্যহম্'** (গীতা ১৪।৩) বলেছেন। এই আদি কর্ম সৃষ্টির বিভাগ আছে—

(১) জগৎ সৃষ্টি (২) শুধুমাত্র ক্রিয়া সম্পাদন—যা ফলদায়ক নয় এবং (৩) পাপ-পুণ্য (শুভ-অশুভ কর্ম)—যা ফলদায়ক হয়ে থাকে। ভগবানের জগৎ সৃষ্টিরূপ কর্মও বাস্তবে ক্রিয়া বা অকর্মই। ভগবান বলছেন—**'তস্য কর্তারমপি মাং বিদ্ধ্যকর্তারমব্যয়ম্'** (গীতা ৪।১৩) অর্থাৎ এই জগৎ সৃষ্টির কর্তা হলেও আমাকে (পরমেশ্বরকে) তুমি অকর্তা বলে জানবে। আর জগৎ সৃষ্টিরূপ কর্মাদিকে 'ত্যাগ' বলার অর্থ হল ভগবানের এই সঙ্কল্পের ফলেই কর্মের আরম্ভ হয় এবং প্রাণীকুলের কর্ম-পরম্পরা চলতে থাকে।

অধিভূতং ক্ষরো ভাবঃ— ক্ষিতি-অপ-তেজ-মরুৎ-ব্যোম— এই পঞ্চ মহাভূতের দ্বারা সৃষ্ট, প্রতিক্ষণ পরিবর্তনশীল ও বিনাশশীল নশ্বর জগৎই হল অধিভূত।

পুরুষশ্চাধিদৈবতম্—অধিদৈব অর্থাৎ আদি পুরুষ হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মার বাচক। মহাসর্গের আদিতে সর্বপ্রথম ব্রহ্মা প্রকটিত হন এবং সর্গের আদিতে তিনি জগৎ সৃষ্টি করেন।

অধিযজ্ঞোঽহমেবাত্র দেহে—এই দেহসকলে আমিই অন্তর্যামীরূপে অবস্থিত। ভগবান যে সর্বভূতের হৃদয়ে বিরাজমান সেকথাটি গীতার অনেক জায়গায় বলেছেন। **'হৃদি সর্বস্য বিষ্ঠিতম্'** (গীতা ১৩।১৭), **'সর্বস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টঃ'** (গীতা ১৫।১৫), **'ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জুন তিষ্ঠতি'** (গীতা ১৮।৬১)।

'অহমেব অত্র দেহে' কথাটির অর্থ হল অন্যান্য যোনিতে পূর্বকৃত কর্মের ভোগ হয়, নতুন কর্ম সৃষ্টি হয় না কিন্তু মনুষ্যদেহে কর্মফল ভোগও হয় আবার নতুন কর্ম সৃষ্টিও হয়। মানুষের সংস্কার অনুযায়ী ভগবান তার কর্মে প্রেরণা দেন। স্বভাবে রাগ-দ্বেষ থাকলে প্রকৃতির বশীভূত হতে হয় কিন্তু যেখানে মানুষ রাগ-দ্বেষ করে না, সেখানে তার সব কর্মই ভগবানের প্রেরণা অনুযায়ী হয় এবং তা হয় শুদ্ধ অর্থাৎ বন্ধনকারক হয় না। আর যখন মানুষ রাগ-দ্বেষের বশবর্তী থাকে তখন সে ভগবানের প্রেরণা অনুসারে কর্ম করে না, স্বভাব অনুযায়ী করে তখনই সেই কর্ম বন্ধনকারক হয়।

মানুষ শাস্ত্র, সাধু-মহাত্মা এবং ভগবানের আশ্রয় নিয়ে নিজ স্বভাব পরিবর্তন করতে সক্ষম। এই বর্ণনার তাৎপর্য হল এই যে, যেমন একই জল, বাষ্প, মেঘ, বৃষ্টিবিন্দু, শিলাবৃষ্টি আদি ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রতীয়মান হয় কিন্তু বাস্তবে তা একই, তেমনি একই পরমাত্মাতত্ত্ব ব্রহ্ম, আধ্যাত্ম, কর্ম, অধিদৈব, অধিযজ্ঞ রূপে ভিন্ন ভিন্ন প্রতীয়মান হলেও তত্ত্বত একই। ভগবান ও তাঁর সৃষ্টির ছয়টি ভেদ এইভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।
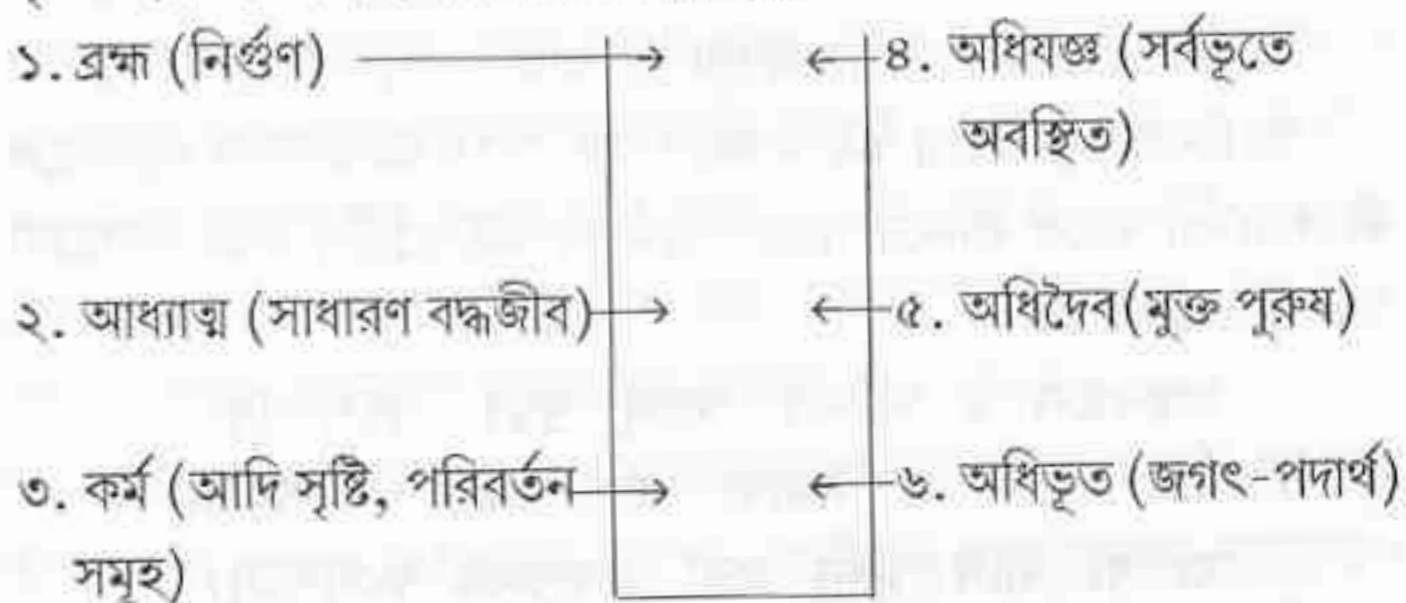
পরমাত্মা অনন্ত আনন্দ-স্বরূপ, সেখানে দুঃখের লেশমাত্র থাকে না,

শাস্ত্রে এরূপ বলা আছে এবং সন্তগণ তা অনুভব করেছেন।

এখন বিচার্য যে সাধক তো সংসারকে প্রত্যক্ষভাবে দেখে থাকেন আর পরমাত্মাকে প্রত্যক্ষভাবে দেখা যায় না। কিন্তু তাঁরা পরমাত্মাকে মানেন। শাস্ত্র ও সন্তরা বলে থাকেন যে 'সংসারে পরমাত্মা এবং পরমাত্মাতে সংসার বিদ্যমান' এটা মেনেই সাধক সাধন শুরু করেন। এই সাধনায় যতক্ষণ সংসার মুখ্যভাবে থাকে ততক্ষণ পরমাত্মাকে মেনে নেওয়া গৌণ হয়। সাধনা করতে করতে পরমাত্মার সম্বন্ধে ধারণা (মেনে নেওয়া) যতই প্রধান হতে থাকে, ততই সংসারের মান্যতা গৌণ হতে থাকে। পরমাত্মার ধারণা সর্বতোভাবে প্রাধান্য পেলে সাধক স্পষ্টভাবে অনুভব করেন যে সংসার প্রতিমুহূর্তে বিনাশশীল এবং পরমাত্মা সদাই বিদ্যমান। তখন সত্য স্বরূপে 'সবকিছুই পরমাত্মা' এই বাস্তবিক অনুভূতি হয়, এবং সাধককে সিদ্ধ বলা হয়।

পরমাত্মাকে লাভ করতে ইচ্ছুক যে সব সাধক, তাঁরা দুই শ্রেণীর হয়ে থাকেন —(১) বিবেক-জ্ঞানসম্পন্ন জ্ঞানী সাধক (২) শ্রদ্ধাপ্রধান ভক্ত সাধক। বিবেকবান সাধক সম, শান্ত, সৎ, চিৎ ও আনন্দ তত্ত্বে অটলভাবে স্থিতিলাভ করে অখণ্ড আনন্দ লাভ করেন। আর শ্রদ্ধাসম্পন্ন সাধক ভগবানের সম্মুখীন হন, যার ফলে তিনি জড়ত্বের থেকে বিমুখ হয়ে ভগবানকে প্রেমানন্দে লাভ করেন। তিনি ভগবানের সঙ্গে একাত্ম হয়ে প্রেমের অনন্ত ও প্রতিমুহূর্তে বর্ধমান আনন্দ লাভ করেন।

অবশিষ্ট (সপ্তম) প্রশ্নের উত্তর—(শ্লোক ৫-৭)

অর্জুনের সপ্তম প্রশ্নে এই জিজ্ঞাসা ছিল 'সংযতচিত্ত ব্যক্তি মৃত্যুকালে কী করে আপনাকে জানতে পারে।' ভগবান এই প্রশ্নটির উত্তর দিয়েছেন পরবর্তী ৩টি শ্লোকে।

অন্তকালে চ মামেব স্মরন্ মুক্ত্বা কলেবরম্।
যঃ প্রয়াতি স মদ্ভাবং যাতি নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ॥
যং যং বাপি স্মরন্ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরম্।
তং তমেবৈতি কৌন্তেয় সদা তদ্ভাবভাবিতঃ॥

তস্মাৎ সর্বেষু কালেষু মামনুস্মর যুধ্য চ।
ময্যর্পিতমনোবুদ্ধির্মামেবৈষ্যস্যসংশয়ম্ ॥

(গীতা ৮।৫-৭)

'যে ব্যক্তি অন্তকালে আমাকে স্মরণ করতে করতে দেহত্যাগ করেন তিনি আমাকেই প্রাপ্ত হন—এতে কোনো সন্দেহ নেই।

মানুষ মৃত্যুকালে যে যে ভাব স্মরণ করে দেহত্যাগ করে, সে তার সেই অন্তিমভাবে সদা ভাবিত হওয়ায়, সেই গতিই প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ সেই যোনিতেই জন্ম নেয়।

হে অর্জুন ! তুমি তাই সকল সময় আমাকে স্মরণ করো, আর যুদ্ধও করো। আমাতে মন ও বুদ্ধি সমর্পণ করলে তুমি নিঃসন্দেহে আমাকেই লাভ করবে।' (গীতা ৮।৫-৭)।

ভগবান ষষ্ঠ শ্লোকে বলতে চেয়েছেন যে মৃত্যুর সময় মানুষ যা কিছু চিন্তা করে, শরীর ত্যাগের পর যতক্ষণ না অন্য দেহ ধারণ করে, ততক্ষণ সেই ভাবেই ভাবিত থাকে **'সদা তদ্ভাবভাবিতঃ'**। মৃত্যুকালের চিন্তাধারা (স্মরণ) স্থায়ী হয় এবং সেই চিন্তা অনুসারেই তার মানসিক শরীর গড়ে ওঠে আর মানসিক শরীর অনুসারেই সে অন্যদেহ ধারণ করে। যে চিন্তা নিয়ে মানুষ দেহত্যাগ করে, দেহত্যাগের পর সেই চিন্তা পরিবর্তনের কোনো সুযোগ, শক্তি বা স্বাধীনতা তার থাকে না অথবা নতুন চিন্তা করার অধিকারও থাকে না। অতএব সেই চিন্তাতেই সে মগ্ন থাকে এবং ক্রমে তা দৃঢ়ীকৃত হয়। এইভাবে মৃত্যুকালে যা কিছুর স্মরণ হয়, সেই অনুসারে জন্মগ্রহণ করতে হয়। তাই বলা হয়েছে **'অন্তমতি অন্তগতি'**। কিন্তু এর মানে এই নয় যে বাড়ি বা অর্থের চিন্তা করতে করতে মারা গেলে বাড়ি বা অর্থ হয়ে জন্মাবে। বাড়ির কথা ভেবে মৃত্যু হলে ওই বাড়িতে ইঁদুর অথবা টিকটিকি এবং অর্থ চিন্তা করতে করতে দেহত্যাগ করলে সাপ ইত্যাদি হয়ে জন্মাবে।

এইভাবে পরজন্ম প্রাপ্তি পূর্বজন্মের অন্তিমকালের চিন্তা অনুযায়ী হয় আর যার যেমন স্বভাব, মৃত্যুকালে প্রায়শই সে চিন্তাই করে থাকে। মৃত্যুকালে মনুষ্যেতর প্রাণীর (পশু-পক্ষী ইত্যাদির) নিজ নিজ পূর্ব কর্ম অনুযায়ী জন্ম

হয়। কিন্তু মনুষ্যদেহে এই বৈশিষ্ট রয়েছে যে মৃত্যুকালে তার স্মরণ 'কর্মের' অধীন নয়, তা পুরুষার্থর অধীন। পুরুষার্থে মানুষ সর্বতোভাবে স্বাধীন। সেইজন্যই অন্যান্য জন্মের তুলনায় এই জন্মের মহিমা অনেক বেশি। তবে একথাও ঠিক যে মৃত্যুকালে বিভিন্ন ইন্দ্রিয়াদি মন, বুদ্ধি প্রভৃতির শক্তি ক্ষীণ হয়ে পড়ে ফলে প্রায়শঃই মানুষ যেন অচেতনের মতো অভ্যাসের বশীভূত হয়ে তদনুসারে চালিত হয়ে থাকে। সেইজন্য প্রারম্ভ থেকেই মানুষকে সর্বদা ঈশ্বরকে স্মরণ রাখার চেষ্টা করা উচিত। যাতে অন্তকালেও সে ঈশ্বরকে স্মরণে রেখে দেহত্যাগ করতে সক্ষম হয়। একটি দৃষ্টান্ত দ্বারা অন্তকালীন চিন্তা ও সেই অনুসারে গতি সম্বন্ধে বলা হচ্ছে যাতে বিষয়টি সহজে বোঝা যায়।

দৃষ্টান্ত—একজন লোক ফটো তোলাতে সেজেগুজে স্টুডিয়োতে গেছে এবং তার আশা ফটো সেরকম ভাবেই উঠবে। কিন্তু যদি ফটো তোলার সময় নাকে মাছি বসে এবং তার হাঁচি আসে তবে তার ফটো ওইরকম ভাবেই উঠবে। তার পরিবর্তন সম্ভব নয়। ফটো তোলার মুহূর্তে যে চেহারা থাকবে সেইরকম ফটো ওঠে। তাও ফটো তোলার সময়টি জানা থাকে, কিন্তু মৃত্যু কখন আসবে তার ঠিক নেই। সেইজন্য নিজ স্বভাব, চিন্তা, নির্মল রেখে সবসময় সাবধানে থাকা উচিত এবং ভগবানকে নিত্য-নিরন্তর স্মরণ রাখা কর্তব্য।

বাসনা যস্য যত্র স্যাৎ স তং স্বপ্নেষু পশ্যতি।
স্বপ্নবন্ স্মরণে জ্ঞেয়ং বাসনা তু বপুর্নৃণাম্॥

যে ব্যক্তির যেমন বাসনা থাকে, সে সেই বাসনা অনুযায়ী স্বপ্ন দেখে। আর স্বপ্নের মতোই তার মৃত্যু হয় অর্থাৎ বাসনা অনুযায়ী মৃত্যুর সময় তার চিন্তার উন্মেষ ঘটে এবং সেই চিন্তা অনুযায়ী তার গতি হয়ে থাকে। মৃত্যুকালে আমরা ইচ্ছেমতন চিন্তা করতে সক্ষম নই বরং আমাদের মধ্যে যেমন বাসনা থাকে, স্বতঃই সেইরকম চিন্তার উন্মেষ হয় এবং সেই অনুযায়ী গতি হয়।

গুরুগ্রন্থ সাহেবের সন্তবাণী খণ্ডে অন্তকালের চিন্তা অনুযায়ী যেরূপ শরীর ধারণ হয় সে বিষয়ে বলা হয়েছে। শ্লোকগুলি গুরুমুখীতে লেখা আর

গ্রন্থটিতে 'লক্ষ্মী' অর্থে ধন-সম্পদ, 'সিমরে' অর্থে স্মরণ করে, 'সরপ জোন' অর্থে সর্প যোনী, 'বল বল অউত্তরে' অর্থে বারে বারে জন্মগ্রহণ করে, 'বেসবা জোন' অর্থে বেশ্যা যোনী, 'মন্দির' অর্থে ঘরবাড়ি বোঝানো হয়েছে।

অন্ত কাল জো লক্ষ্মী সিমরে ঐসী চিন্তা মে জে মরে।
সরপ জোন বল বল অউত্তরে।
অরী বাঈ গোবিন্দ নাম মত বীসরে॥ ১
অন্ত কাল জো স্ত্রী সিমরে ঐসী চিন্তা মে জে মরে।
বেসবা জোন বল বল অউত্তরে॥ ২
অন্ত কাল জো লড়কে সিমরে ঐসী চিন্তা মে জে মরে।
সূকর জোন বল বল অউত্তরে॥ ৩
অন্ত কাল জো মন্দির সিমরে ঐসী চিন্তা মে জে মরে।
প্রেত জোন বল বল অউত্তরে॥ ৪
অন্ত কাল নারায়ণ সিমরে ঐসী চিন্তা মে জে মরে।
বদত ত্রিলোচন তে নর মুক্তা পীতম্বর বা কে রিদে বসৈ॥ ৫

ভগবান ষষ্ঠ শ্লোকে বলছেন—**'তং তমেবৈতি'** অর্থাৎ যেমন সূঁচের পেছনে (সেই পথেই) সুতো যায়, মানুষও সেইরকম অন্তকালের ভাব অনুসারে গতি লাভ করে। যে বস্তুতে আমরা অস্তিত্ব ও গুরুত্ব দিয়ে থাকি, যার সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করি, যার থেকে সুখ গ্রহণ করি—তারই বাসনা অন্তরে স্থায়ী হয়। যদি সংসারে সুখবুদ্ধি না হয় তবে সংসারের বাসনা সৃষ্টি হয় না। আকাঙ্ক্ষা (বাসনা) সৃষ্টি না হলে মৃত্যুকালে যে চিন্তার উদয় হয় তা ভগবানের চিন্তাই হয় কেননা সিদ্ধান্ত হল সব কিছুই ভগবান—**'বাসুদেব সর্বম্'**।

আর মৃত্যুকালে যদি ভগবদ্স্মরণ করি তবে সংসারের সঙ্গে সমস্ত কৃত্রিম সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায়। ভগবান তাই পঞ্চম শ্লোকে বলছেন—**'অন্তকালে চ মামেব'** অর্থাৎ যাঁরা সারা জীবনে সাধনা-ভজনা করেননি তাঁরাও যদি অন্তিম সময়ে আমাকে স্মরণ করতে পারেন তাহলে আমাকেই

প্রাপ্ত হন। ভগবানের একথা বলার উদ্দেশ্য এই যে, যাঁরা ভগবানের উপাসনা করেন, তাঁরা উপাস্যকে স্মরণে আসায় ভগবদ্ভাব তো প্রাপ্ত হনই, কিন্তু যাঁরা উপাসনা করেন না, তাঁদেরও যদি মৃত্যুকালে কোনো কারণবশত ভগবানের নাম, রূপ, লীলা, ধাম ইত্যাদি স্মরণে আসে তবে তাঁরাও ভগবদ্ উপাসকদের ন্যায় ভগবদ্গতি প্রাপ্ত হন।

এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে যে, যে ব্যক্তি সারাজীবন ধরে সাধন-ভজন করেনি, সর্বদা ভগবানে বিমুখ থেকেছেন, তার জীবনের অন্তকালে কিভাবে ভগবদ্স্মরণ হবে, কি করে তার কল্যাণ হবে ? এর উত্তর হল যে, অন্তিম কালে তার ওপর যদি ভগবানের বিশেষ কৃপা হয় বা সাধু-মহাত্মার দর্শন লাভ হয়, তাহলে ভগবদ্স্মরণের ফলে তার কল্যাণ হয়। ভগবানের দেওয়া এই সুযোগ প্রতিটি মানুষেরই বিশেষভাবে সদ্ব্যবহার করা উচিত। তাই কোনো ব্যক্তি ব্যধিগ্রস্থ বা মরণাপন্ন হলে তাকে ইষ্টের চিত্র বা মূর্তি দেখানো উচিত। সেইরকম, যার যেরকম সাধন-ভজন, ভগবদ্ নামে রুচি সেই ভগবদ্নাম তাকে শোনানো উচিত। যে রূপে তার শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস, সেইরূপই তাকে স্মরণ করানো, ভগবদ্ মহিমা বর্ণনা করা উচিত। ভগবানের লীলাচরিত ইত্যাদি শোনালে তার কল্যাণ সাধিত হয়। মরণাপন্ন ব্যক্তির যদি গীতায় আগ্রহ থাকে, তাহলে তাকে গীতার অষ্টম অধ্যায় শোনানো উচিত কারণ এই অধ্যায়ে জীবের সদ্গতির বর্ণনা বিশেষভাবে করা হয়েছে। কোনো ব্যক্তির যদি মৃত্যু পবিত্র তীর্থস্থানে হয়, তবে স্থান প্রভাবেও তার স্মৃতি জাগ্রত হয়।

অযোধ্যা মথুরা মায়া কাশী কাঞ্চী অবন্তিকা।
পুরী দ্বারাবতী চৈব সপ্তৈতা মোক্ষদায়িকাঃ॥

(নারদপুরাণ, পূর্ব. ২৭।৩৫)

এমনকি কোনো সাধু-মহাপুরুষ যদি কোনো মরণাপন্ন ব্যক্তির প্রতি দৃষ্টিপাত করেন বা তার মৃতদেহ দেখেন বা তাঁর চিতার ধোঁয়া বা ভস্ম দেখেন তাহলেও ওই ব্যক্তির কল্যাণ সাধিত হয়।

মহাপাতকযুক্তা বা যুক্তা বা চোপপাতকৈঃ।
পরং পদং প্রয়ান্ত্যেব মহদ্ভিরবলোকিতাঃ॥

কলেবরং বা তদ্ভস্ম তদ্ধূমং বাপি সত্তম।
যদি পশ্যতি পুণ্যাত্মা স প্রযাতি পরাং গতিম্॥

(নারদপুরাণ, পূর্ব ১।৭।৭৪-৭৫)

যদি কোনো ব্যক্তি বেহুঁশ অবস্থায় প্রাণত্যাগ করে তাহলে তার কাছে ভগবদ্নামের উচ্চারণ ও গীতার শ্লোক পড়া, জপ-কীর্তন আদি করতে হয় যাতে সেখানকার পরিমণ্ডল ভগবদ্নামে পরিপূর্ণ থাকে। মৃত্যুর সময় অজামিল 'নারায়ণ' নাম উচ্চারণ করায়, সেখানে ভগবানের পার্ষদ হাজির হয়েছিলেন এবং যমদূতেরা যমরাজের কাছে পালিয়ে গিয়েছিলেন।

তখন যমরাজ দূতদের বলেছিলেন—

এবং বিমৃশ্য সুধিয়ো ভগবত্যনন্তে সর্বাত্মনা বিদধতে খলু ভাবযোগম্।
তে মে ন দণ্ডমর্হন্ত্যথ যদ্যমীষাং স্যাৎ পাতকং তদপি হন্ত্যরুগায়বাদঃ॥

(ভাগবত ৬।৩।২৬)

'যেখানে ভগবানের নাম-জপ-কীর্তন, কথা-মাহাত্ম্য হয়, সেখানে কখনোই যাবে না, কারণ সেখানে আমাদের কোনো অধিকার নেই। এই বলে যমরাজ ভগবানকে স্মরণ করে ক্ষমা চেয়ে বলছেন'—

তৎক্ষম্যতাং স ভগবান্ পুরুষঃ পুরাণো নারায়ণঃ স্বপুরুষৈর্যদসৎকৃতং নঃ।
স্বানামহো ন বিদুষাং রচিতাঞ্জলীনাং ক্ষান্তির্গরীয়সি নমঃ পুরুষায় ভূম্নে॥

(ভাগবত ৬।৩।৩০)

'আমার নিজের লোক (দূতগণ) যে অন্যায় কার্য করেছে তা নিত্যপুরুষ নারায়ণ নিজগুণে ক্ষমা করুন। তাঁর ন্যায় অপার মাহাত্ম্যশালী পরম পুরুষের পক্ষে মাদৃশ অক্ষ অজ্ঞ প্রণতজনের প্রতি ক্ষমা করাই যুক্তিযুক্ত, আমি সেই বিরাট পুরুষকে নমস্কার করি।'

সপ্তম শ্লোকে ভগবান এই প্রকরণটি শেষ করেছেন কিভাবে ভগবানকে স্মরণ করা উচিত এই বর্ণনা করে। ভগবান বলছেন—'**তস্মাৎ সর্বেষু কালেষু মামনুস্মর যুধ্য চ**' অর্থাৎ প্রত্যেক কাজের সময় ভাগ করা থাকে যেমন কোনো সময় হল খাওয়ার, কোনোটি শোওয়ার, কোনোটি জেগে থাকার, কোনোটি নিত্যকর্ম করার, কোনোটি জীবিকা সংক্রান্ত কর্ম করার ইত্যাদি।

কিন্তু ভগবদ্স্মরণের সময় ভাগ করা উচিত নয়। ভগবদ্স্মরণ সর্বক্ষণেরই। আর **'যুধ্য চ'** বলার তাৎপর্য হল উপস্থিত কর্তব্য-কর্ম যা স্বতঃই প্রাপ্ত তা অবশ্যই করা উচিত। কিন্তু এই কর্তব্য-কর্মও ভগবানকে স্মরণ করে পালন করা উচিত এবং এতে ভগবদ্ স্মরণ হবে মুখ্যরূপে আর কর্তব্য-কর্ম হবে গৌণরূপে। আর **'অনুস্মর'** হচ্ছে স্মরণের পর স্মরণ হতে থাকা অর্থাৎ নিরন্তর স্মরণ হওয়া। ভগবদ্স্মরণ জাগরূক করতে ভগবানের সঙ্গে আপনত্ব থাকা চাই। আর এই আপনত্ব যত দৃঢ় হয়, ভগবদ্স্মৃতি ততই বারবার মনে দৃঢ়ভাবে আসে। ভগবান এই শ্লোকেই বলেছেন **'মর্য্যর্পিত মনোবুদ্ধিঃ'** এর অর্থ কেবল মন দ্বারা ভগবানকে চিন্তা বা ভগবানে বুদ্ধি দৃঢ় করাই নয় এর প্রকৃত অর্থ হল—মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়, শরীর ইত্যাদিকে ভগবানের বলে জানা, কখনো যেন ভুল করেও নিজের বলে মনে না করা। এখানে মনের অন্তর্গত চিত্তকে এবং বুদ্ধির অন্তর্গত অহংকারকেও অর্পিত ধরে নিতে হবে যাতে মন-বুদ্ধি সমর্পিত ভক্ত মমত্বহীন ও নিরহঙ্কার হয়ে ওঠেন। প্রকৃতপক্ষে ভক্ত নিরন্তর ভগবানকে স্মরণ করে নিজেই ভগবানে সমর্পিত হয়ে যান।

স্মরণ তিন প্রকারের হয়ে থাকে— **বোধজনিত, সম্বন্ধজনিত** ও **ক্রিয়াজনিত**।

১) **বোধজনিত স্মরণ**— নিজের যা স্ব-ভাব তা স্মরণ করতে হয় না। কিন্তু শরীরের প্রতি যে একত্ব মেনে নেওয়া হয় সেটিই হল ভুল। বোধ হলে এই ভ্রম দূর হয়, তখন স্বভাব স্বতঃসিদ্ধ হয়।

২) **সম্বন্ধজনিত স্মরণ**—'আমিত্ব'র পর আছে 'আমার ভাব'। যা আমার নিজের বলে মেনে নিই, তা হল সম্বন্ধজনিত স্মরণ। যেমন আমার শরীর, আমার সংসার, আমার গাড়ি, বাড়ি ইত্যাদি। যখন আমরা এই সম্পর্ক অস্বীকার করি তখন ভগবানের সঙ্গে নিত্য-সম্বন্ধ স্বতঃই জাগ্রত হয় এবং ভগবানের স্মরণ সর্বদা জাগ্রত থাকে।

৩) **ক্রিয়াজনিত স্মরণ**—ক্রিয়াজনিত স্মরণ অভ্যাসের দ্বারা হয়। সমস্ত কাজে ভগবানকে নিরন্তর স্মরণ করাকে বলে 'অভ্যাসজনিত স্মরণ'।

এই অভ্যাসজনিত স্মরণও হয় তিন প্রকার—

ক) সংসারের কাজ করার সময় ভগবানকে স্মরণে রাখা—এতে সাংসারিক কাজের মুখ্যতা ও ভগবদ্স্মরণে গৌণতা থাকে। এতে এই ভাব থাকে যে সাংসারিক কাজ যেন খারাপ না হয় এবং এর সঙ্গে ভগবদ্স্মরণও যেন হতে থাকে।

খ) ভগবানকে স্মরণে রেখে সাংসারিক কাজ করা—এতে ভগবৎ স্মরণ মুখ্যভাবে থাকে এবং সাংসারিক কাজ গৌণভাবে থাকে। এতে সাংসারিক কাজে ভুল হলেও ভগবদ্ স্মরণে কোনো ভুল হয় না।

গ) কাজগুলিকে ভগবানেরই বলে মনে করা—এতে সব কাজের মধ্যেই এক বিশেষ আনন্দ থাকে যে আমি ভগবানের কাজ করছি, তাঁরই সেবা করছি। সুতরাং এই কাজে ভগবদ্স্মৃতি বিশেষভাবে জাগরুক থাকে। যেমন কোনো ভদ্রলোক তাঁর কন্যার বিবাহর সময় নানা কার্য করেন, যেমন নানাপ্রকার সামগ্রী ক্রয় করা, সকলকে নিমন্ত্রণ করা, কন্যাকে সম্প্রদান করা এমনকি পরিবেশন আদি সমস্ত কর্মই অতি আনন্দিত মনে করেন কেননা তাঁর সর্বদা স্মরণে থাকে 'মেয়ের বিয়ে দিতে হবে'। সেইভাবে সাধক ভক্তরাও সমস্ত কাজই ভগবদ্ সম্বন্ধীয় কাজ হিসেবে দেখেন।

ভগবদ্ সম্বন্ধীয় কাজও দুই প্রকার—

১) স্বরূপতঃ—ভগবানের নাম জপ, কীর্তন, ভগবদ্লীলা শ্রবণ, চিন্তন ইত্যাদি ভগবদ্ সম্বন্ধীয় কাজ।

২) ভাবের দ্বারা— সংসারের কাজ করলেও তাঁরা অনুভব করেন যে 'সমস্ত জগৎই' যখন ভগবানের, তখন সমস্ত কাজই তাঁর প্রসন্নতার জন্যই করা। এরূপ ভাব থাকলে সাংসারিক কাজও সাধনা এবং ভগবানের কাজে পরিণত হয়।

অভ্যাসযোগ ও ধ্যানযোগে ভগবৎ লাভ—(শ্লোক ৮-১৩)

ভগবান অষ্টম অধ্যায়ের পরবর্তী ছয়টি শ্লোকে অভ্যাসযোগের কথা বলেছেন—

অভ্যাসযোগযুক্তেন চেতসা নান্যগামিনা।
পরমং পুরুষং দিব্যং যাতি পার্থানুচিন্তয়ন্॥

কবিং পুরাণমনুশাসিতার-
মণোরণীয়াংসমনুস্মরেদ্ যঃ।
সর্বস্য ধাতারমচিন্ত্যরূপ-
মাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ॥
প্রয়াণকালে মনসাচলেন
ভক্ত্যা যুক্তো যোগবলেন চৈব।
ভ্রুবোর্মধ্যে প্রাণমাবেশ্য সম্যক্
স তং পরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্॥
যদক্ষরং বেদবিদো বদন্তি
বিশন্তি যদ্ যতয়ো বীতরাগাঃ।
যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্যং চরন্তি
তত্তে পদং সংগ্রহেণ প্রবক্ষ্যে॥
সর্বদ্বারাণি সংযম্য মনো হৃদি নিরুধ্য চ।
মূর্ধ্ন্যাধায়াত্মনঃ প্রাণমাস্থিতো যোগধারণাম্॥
ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম ব্যাহরন্ মামনুস্মরন্।
যঃ প্রয়াতি ত্যজন্ দেহং স যাতি পরমাং গতিম্॥

(গীতা ৮।৮-১৩)

"হে অর্জুন! অভ্যাসযোগ দ্বারা যুক্ত ও অনন্যচিত্ত ব্যক্তি পরমপুরুষের চিন্তন করতে করতে তাঁকেই প্রাপ্ত হন।

তিনি অচিন্ত-স্বরূপের এইভাব চিন্তন করেন যে—পরমাত্মা সর্বজ্ঞ, অনাদি, সকলের শাসনকর্তা, সূক্ষ্ম থেকেও সূক্ষ্ম, সর্বপ্রাণীর পালন-পোষণকারী, সর্বতোভাবে অজ্ঞানের অতীত, সূর্যের ন্যায় স্ব-প্রকাশক অর্থাৎ জ্ঞানস্বরূপ।

অতঃপর সেই ভক্তিযুক্ত মানুষ মৃত্যুকালে একাগ্র মনে এবং যোগবলের দ্বারা ভ্রূযুগলের মধ্যে প্রাণকে সম্যক্‌ভাবে ধারণ করে শরীর ত্যাগ করলে, সেই পরম দিব্যপুরুষকেই প্রাপ্ত হন।

বেদবিদগণ যাঁকে অক্ষর বলেন, বীতরাগ যোগিগণ যাঁকে প্রাপ্ত করেন

এবং যাঁকে পাওয়ার আশায় ব্রহ্মচর্য পালন করেন, সেই পদপ্রাপ্তির কথা সংক্ষেপে জানাচ্ছি।

সমস্ত ইন্দ্রিয়দ্বার রুদ্ধ বা সংযত করে, মনকে হৃদয়ে নিরুদ্ধ করে এবং নিজের প্রাণকে মস্তকে স্থাপনা করে এবং যোগধারণে সম্যক্‌রূপে স্থিত হয়ে—

যিনি 'ওঁ' এই এক অক্ষর ব্রহ্ম মনে মনে উচ্চারণপূর্বক আমাকে স্মরণ করতে করতে শরীর পরিত্যাগ করেন তিনিই পরমগতি প্রাপ্ত হন।'' (গীতা ৮।৮-১৩)

ভগবান এই প্রকরণের শুরুতেই বলেছেন **'অভ্যাসযোগযুক্তেন'** (গীতা ৮।৮)। এই বাক্যে দুটি পদ আছে—'অভ্যাস' এবং 'যোগ'। মনকে সংসার থেকে পরমাত্মাতে বারংবার নিয়োজিত করার নাম হচ্ছে 'অভ্যাস' এবং সমতাকে বলা হয় 'যোগ'। অভ্যাসে মন নিবিষ্ট হলে প্রসন্নতা আসে এবং মন না লাগলে বিষণ্ণতা আসে। এটিই অভ্যাস কিন্তু এটি অভ্যাস যোগ নয়। অভ্যাস যোগ তখনই হয় যখন প্রসন্ন বা বিষণ্ণতা কোনোটিই আসে না। এই প্রসন্নতা বা বিষণ্ণতাকে গুরুত্ব না দিয়ে, নিজের লক্ষে স্থির থাকতে হয়, দৃঢ় থাকতে হয় এবং এই দৃঢ় থাকাই হল 'যোগ'। চিত্ত যেন এইরূপ 'যোগযুক্ত' হয়। চিত্তকে 'যোগযুক্ত' বলার পরে ভগবান বলছেন **'চেতসা নান্যগামিনা'** অর্থাৎ এক পরমাত্মা ব্যতিরেকে অন্য লক্ষ্য যেন না থাকে। আর এইভাবে চিত্তের দ্বারা পরমাত্মার ধ্যান করতে করতে দেহ ত্যাগকারী ব্যক্তি সেই পরমাত্মাকেই লাভ করে।

যোগী ধ্যানে কী চিন্তা করে—ভগবান নবম শ্লোকে তাঁর আটটি 'সগুণের' কথা বলেছেন।

১. কবিম্—তিনি সর্বজ্ঞ কারণ তিনি সকল প্রাণী এবং তাদের শুভাশুভ কর্মগুলি জানেন। তাঁর জ্ঞানের বাইরে কিছু নেই।

২. পুরাণম্—তিনি সবকিছুর আদি হওয়ায় 'পুরাণ'। তিনি অনাদি, কালেরও অতীত এবং কালের প্রকাশক।

৩. অনুশাসিতারম্—আমরা চক্ষুদ্বারা দেখে থাকি তার ওপর থাকে মন।

মনকে শাসন করে বুদ্ধি। বুদ্ধির ওপর থাকে 'অহং কর্তৃত্ব বোধ'। আর তাকে যে শাসন করে, যিনি সকলের আশ্রয়, প্রকাশক, প্রেরক, সেই পরমাত্মা হলেন 'অনুশাসিতা'। অপর একটি ভাব হল, তিনি মানুষের 'কর্তব্য-অকর্তব্যর' বিধানকারী এবং মানুষের পূর্বে সম্পাদিত কর্মের পাপ-পুণ্যের ফল প্রদান করে সেগুলিকে নষ্ট করান তাই তিনি হলেন অনুশাসিতা। অনুশাসিতার অর্থ হল সব কিছুই তাঁর শাসনাধীন। তিনি জীব ও জগৎ —উভয়েরই শাসক।

'ক্ষরং প্রধানমমৃতাক্ষরং হরঃ ক্ষরাত্মানাবীশতে দেব একঃ'

(শ্বেতাশ্বতর. ১।১০)

প্রকৃতি বিনাশশীল এবং তাকে যে ভোগ করে সেই জীবাত্মা অমৃতস্বরূপ অবিনাশী। এই বিনাশশীল ও অবিনাশী উভয়কেই এক ঈশ্বর তাঁর শাসনে রাখেন।

৪. অণোরণীয়াংসম্—পরমাত্মা অনুর থেকেও অতিশয় সূক্ষ্ম। অর্থাৎ তিনি মন-বুদ্ধির বিষয় নন, মন বা বুদ্ধি তাঁকে ধরতে পারে না।

৫. সর্বস্য ধাতারম্—পরমাত্মা অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডের বিধাতা। এ সব তাঁরই কাছ থেকে সত্তা লাভ করে, তিনি সকলের পালন-পোষণকারী।

৬. অচিন্ত্যরূপম্—সেই পরমাত্মা হলেন মন-বুদ্ধি-চিন্তার অগোচর।

৭. আদিত্যবর্ণম্— ভগবান হলেন সূর্যের ন্যায় উজ্জ্বল অর্থাৎ সূর্যের ন্যায় সব কিছুর প্রকাশক—মন, বুদ্ধি ইত্যাদিরও প্রকাশক। তাঁর থেকেই সব কিছু উদ্ভাসিত।

৮. তমসঃ পরস্তাৎ—পরমাত্মা সর্বতোভাবে অজ্ঞানেরও অতীত। তিনি হলেন জ্ঞানেরও প্রকাশক।

অনুস্মরেৎ—আর যোগী সদাই তাঁকে 'অনুস্মরেৎ' অর্থাৎ তার এই গুণসকল চিন্তা করেন। যিনি অচিন্ত্য তাঁকে কীভাবে চিন্তা করা যায় ? এর উত্তর হল এই পরমাত্মতত্ত্ব চিন্তার বিষয় নয় কিন্তু উপরোক্ত ধারণায় দৃঢ় থাকাই হল পরমাত্মাকে চিন্তা করা।

পরবর্তী দশম শ্লোকে ভগবান বলছেন **'প্রয়ানকালে মনসাচলেন'**

(গীতা ৮।১০) অর্থাৎ মৃত্যুকালে কবি, পুরাণ, অনুশাসিতা ইত্যাদি মনন দ্বারা সগুণ ব্রহ্মে চিত্ত স্থির করাই হল মন অচল হওয়া। আর 'যোগবলেন চৈব' অর্থাৎ প্রাণায়াম দ্বারা প্রাণের গতিকে রুদ্ধ করার যে বল তা হল 'যোগবল'। এই যোগবলের সাহায্যে, দুই ভ্রুর মধ্যে যে দ্বিদল চক্র আছে তাতে স্থিত সুষুম্না নাড়ীতে প্রাণকে সম্যক্‌ভাবে ধারণ করে দশম দ্বার দিয়ে শরীর ত্যাগ করলে দিব্য পরমপুরুষকে পাওয়া যায়। এখানে যোগবলের কথা বলা হয়েছে। দেখা যায় যে, এই যোগবল অর্জনের জন্য প্রারম্ভিক অবস্থাতে যখন মন সংসার থেকে সরিয়ে পরমাত্মাতে নিবিষ্ট করতে কাঠিন্য ও অসমর্থতার সম্মুখীন হতে হয় তখন মৃত্যুর মতন অপারগ ও কঠিন সময়ে কীভাবে ভগবানে মন নিবিষ্ট করা যাবে ? ইহা সাধারণ লোকের কাজ নয়। যাদের আগে থেকে যোগবল থাকে তারাই মৃত্যুর সময় নিজের মন পরমাত্মাতে নিয়োজিত করে এবং প্রাণকে সুষুম্না নাড়িতে প্রবেশ করিয়ে শরীরের দশম দ্বার অর্থাৎ মূর্ধ্না দিয়ে শরীর ত্যাগ করতে সক্ষম হন। যার যোগাভ্যাস করা আছে তার পক্ষেই মৃত্যুকালের অশক্ত অবস্থা কোনো বাধাই হয়ে দাঁড়ায় না।

এই শ্লোকে ভগবান আর একটি কথা বলেছেন 'ভক্ত্যা যুক্তো'। কথাটির তাৎপর্য হল প্রিয়তা মানে ভগবানে প্রিয়ভাব বা আকর্ষণ থাকলে তবেই তাঁতে মন অচল হয়। এই প্রিয়ভাব স্বাভাবিক হতে হয়, মন-বুদ্ধি ইত্যাদির চেষ্টায় নয়। সংসারে আসক্তি দূর হলে সাধকের একমাত্র পরমাত্মাতেই আকর্ষণ থেকে যায়, অন্য কিছুতে আর আকর্ষণ থাকে না। সংসারী ব্যক্তি অপরা বস্তুতে (জাগতিক বিনাশশীল বস্তুতে) আকৃষ্ট থাকে আর যে অপরাকে পরিত্যাগ করে ভগবানে আকৃষ্ট হন তিনিই ভক্ত রূপে পরিগণিত হন। সংসারী ব্যক্তি শরীর ও সংসারে আকৃষ্ট হয়ে 'বিভক্ত' অর্থাৎ ভগবান থেকে পৃথক হয় আর ভগবানে আকৃষ্ট সাধক বিভক্ত না হয়ে ভক্ত হয়ে যান অর্থাৎ ভগবানের সঙ্গে এক বা অভিন্ন হয়ে যান।

পরের একাদশ শ্লোকে ভগবান তাঁকে 'অক্ষর' বলে বর্ণনা করে তাঁকে পাওয়ার জন্য সাধক কীভাবে সাধনা করেন তাই বলেছেন। এই সাধনা সকল

বর্ণ ও সকল আশ্রমেই করা সম্ভব এবং তাঁকে পেয়ে মুক্তিলাভও সম্ভব।

ভগবান বলছেন **'যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্যং চরন্তি'** অর্থাৎ তাঁকে পাওয়ার আশায় সাধক 'ব্রহ্মচর্য' পালন করেন, ইন্দ্রিয় সংযম করেন অর্থাৎ কোনো বিষয়ই ভোগবুদ্ধি সহকারে সেবন করেন না।

'যদক্ষরং বেদবিদো বদন্তি' পদটি গৃহস্থাশ্রমের ইঙ্গিত করে। গৃহস্থরাই বেদ অধ্যয়ন করেন, বেদবিধি পালন করেন। বেদই ব্রহ্মকে অক্ষর-নির্গুণ-নিরাকার বলেছেন।

'বিশন্তি যদ্ যতয়ো বীতরাগাঃ' এই পদটিতে বাণপ্রস্থ ও সন্ন্যাসের ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। যাঁর চিত্তে আকাঙ্ক্ষার অবসান হয়েছে, আর সেইজন্য চিত্ত অতি নির্মল হওয়ার ফলে অদ্বিতীয় পরমাত্মতত্ত্ব লাভের তীব্র ইচ্ছা জাগে, এইরূপ প্রযত্নশীল যোগী মহাপুরুষগণই তাঁকে লাভ করেন।

শেষ দুটি শ্লোক অর্থাৎ ১২ ও ১৩ শ্লোকে ধ্যানযোগের মাধ্যমে পরমাত্মা প্রাপ্তির কথা বলে এই প্রকরণটি শেষ করেছেন। **'সর্বদ্বারাণি সংযম্য'** অর্থাৎ মৃত্যুকালে সমস্ত ইন্দ্রিয়দ্বার সংযম করবে অর্থাৎ রূপ, রস, শব্দ, গন্ধ ও স্পর্শ এই পাঁচটি বিষয় থেকে পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয় যথা চক্ষু, জিহ্বা, নাসিকা, কর্ণ ও ত্বক এবং পাঁচটি ক্রিয়া অর্থাৎ কথা বলা, গ্রহণ করা, গমন করা, মল ও মূত্রাদি ত্যাগ থেকে পাঁচটি কর্মেন্দ্রিয় যথা বাণী-হস্ত-পদ-উপস্থ-গুহ্য আদিকে সর্বোতভাবে সরিয়ে আনলে ইন্দ্রিয়গুলি নিজস্থানেই অবস্থান করবে।

'মনো হৃদি নিরুধ্য চ' মনকে হৃদয়ে নিরোধ করবে অর্থাৎ তাঁকে 'বিষয়াভিমুখে' যেতে দেবে না। তাতে মন নিজস্থানে (হৃদয়ে) থাকবে।

'মূর্ধ্ন্যাধায়াত্মনঃ প্রাণম্' প্রাণকে মস্তকে অর্থাৎ ব্রহ্মরন্ধ্রে নিরুদ্ধ করবে। **'ওঁ ব্যাহরন্ মামনুস্মরন্'** মনে মনে অক্ষর ব্রহ্ম ওঁ (প্রণব) উচ্চারণ করবে।

এইভাবে যোগধারণে স্থিত হতে হবে। ইন্দ্রিয়গুলির দ্বারা কোনো চেষ্টা না করা, মনে কোনো সংকল্প-বিকল্প না রাখা, প্রাণের ওপর সম্পূর্ণ অধিকার প্রাপ্ত হওয়াই হল যোগধারণে স্থিত হওয়া। এরূপ

যোগে স্থিত হয়ে যে সাধক মনে মনে 'ওঁ' উচ্চারণ করতে করতে দেহের দশম দ্বার দিয়ে দেহত্যাগ করেন তিনি নির্গুণ-নিরাকার পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হন।

ভক্তিযোগে ভগবৎ লাভ—(শ্লোক ১৪-১৬, ২০-২২)

যাঁর যোগবল থাকে এবং প্রাণের ওপর নিজস্ব অধিকার থাকে তিনি নির্গুণ-নিরাকার ব্রহ্মকে লাভ করে থাকেন। কিন্তু দীর্ঘকালের অভ্যাসসাধ্য হওয়ায় সাধারণের পক্ষে এটি কষ্টকর। তাই পরবর্তী কয়েকটি শ্লোকে ভগবান তাঁকে পাওয়ার সহজ পথ—ভক্তির কথা বলেছেন।

অনন্যচেতাঃ সততং যো মাং স্মরতি নিত্যশঃ।
তস্যাহং সুলভঃ পার্থ নিত্যযুক্তস্য যোগিনঃ॥
মামুপেত্য পুনর্জন্ম দুঃখালয়মশাশ্বতম্।
নাপ্নুবন্তি মহাত্মানঃ সংসিদ্ধিং পরমাং গতাঃ॥
আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্তিনোঽর্জুন।
মামুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে॥

(গীতা ৮।১৪-১৬)

পরস্তস্মাৎ তু ভাবোঽন্যোঽব্যক্তোঽব্যক্তাৎ সনাতনঃ।
যঃ স সর্বেষু ভূতেষু নশ্যৎসু ন বিনশ্যতি॥
অব্যক্তোঽক্ষর ইত্যুক্তস্তমাহুঃ পরমাং গতিম্।
যং প্রাপ্য ন নিবর্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম॥
পুরুষঃ স পরঃ পার্থ ভক্ত্যা লভ্যস্ত্বনন্যয়া।
যস্যান্তঃস্থানি ভূতানি যেন সর্বমিদং ততম্॥

(গীতা ৮।২০-২২)

'অনন্যচিত্ত হয়ে যে ব্যক্তি আমাকে স্মরণ করেন, সেই নিত্যযুক্ত ব্যক্তির কাছে আমি সহজলভ্য অর্থাৎ সহজেই প্রাপ্ত হই।

মহাত্মাগণ আমাকে প্রাপ্ত হয়ে দুঃখের আলয় এবং অশাশ্বত অর্থাৎ নিত্য পরিবর্তনশীল সংসারে পুনর্জন্ম প্রাপ্ত হন না ; কারণ তাঁরা পরমসিদ্ধি অর্থাৎ পরমপ্রেম প্রাপ্ত হয়েছেন।

হে অর্জুন ! ব্রহ্মলোক পর্যন্ত সমস্ত লোকই আবর্তনশীল অর্থাৎ সেখান থেকে ফিরে আসতে হয়, কিন্তু আমাকে প্রাপ্ত হলে আর পুনর্জন্ম হয় না। (গীতা ৮।১৪-১৬)

সেই অব্যক্তর (ব্রহ্মার সূক্ষ্ম শরীরের) অতীত, অনাদি, সর্বশ্রেষ্ঠ ভাবরূপ যে অব্যক্ত (ঈশ্বর) আছেন, সমস্ত প্রাণীর নাশ হলেও তাঁর বিনাশ নেই।

তাঁকেই অব্যক্ত অক্ষর বলা হয়েছে, তাকেই পরমগতি বলা হয়েছে, যাঁকে প্রাপ্ত হলে আর ফিরে আসতে হয় না, সেই হল পরমধাম।

হে অর্জুন ! সমস্ত প্রাণী যাঁর অন্তর্গত এবং যার দ্বারা এই জগৎ পরিব্যাপ্ত হয়ে আছে, সেই পরমপুরুষ পরমাত্মাকে কেবল অনন্যা ভক্তি দ্বারাই লাভ করা যায়।' (গীতা ৮।২০-২২)

ভগবান চতুর্দশ শ্লোকে বলেছেন—ভক্ত হবে অনন্যচেতা, নিত্য স্মরতি ও নিত্যযুক্তস্য।

অনন্যচেতা হচ্ছেন তিনি যাঁর চিত্ত ভগবান ব্যতীত কোনো ভোগভূমি বা ঐশ্বর্যের দিকে একেবারেই যায় না। তিনি আমি শুধু ভগবানের আর ভগবানই আমার ; আমার আর কেউ নেই এবং আমিও কারও নই এই ভাব নিয়ে থাকেন।

আর 'স্মরতি নিত্যশঃ' হল তিনি নিরন্তর অর্থাৎ ঘুম ভেঙে ওঠা থেকে ঘুমোতে যাওয়া পর্যন্ত সবসময়ে এবং সর্বদা অর্থাৎ আমৃত্যু পর্যন্ত আমাকে স্মরণ করেন।

ভক্ত 'নিত্যযুক্ত' হন অর্থাৎ 'আমি ভগবানের ও ভগবান আমার' এই নিত্য সম্বন্ধে দৃঢ়ভাবে থাকাই হল 'নিত্যযুক্ত হওয়া'। এইরূপ ভক্তদের সম্বন্ধে ভগবান বলছেন **'তস্যাহং সুলভঃ পার্থ'**। অর্থাৎ এইরূপ ভক্তদের কাছে আমি সহজলভ্য। একমাত্র ভগবানই আপন, তিনি ছাড়া শরীর, মন, বুদ্ধি, প্রাণ, ইন্দ্রিয়াদি কিছুই আপন নয়—দৃঢ়তার সঙ্গে এটি মেনে নিলে ভগবান সহজলভ্য হন। শরীরাদিকে আপন মনে করলে ভগবানকে সহজে পাওয়া যায় না।

সপ্তম অধ্যায়ে ভগবান মহাত্মাকে দুর্লভ বলে জানিয়েছেন **'স মহাত্মা সুদুর্লভঃ'** (গীতা ৭।১৯), আর এই শ্লোকে নিজেকে 'সুলভ' বলেছেন **'তস্যাহং সুলভঃ পার্থ'** (গীতা ৮।১৪)। এর অর্থ হল এই যে ভগবান জগতে দুর্লভ নন, বরং তাঁর তত্ত্ব জেনে তাঁর শরণাগত ভক্ত হওয়াই দুর্লভ। ভগবানকে খুঁজলে সর্বত্রই পাওয়া যায় কিন্তু ভক্ত কচিৎ পাওয়া যায়।

হরি দুরলভ নহিঁ জগৎ মে, হরিজন দুরলভ হোয়।
হরি হের্যাঁ সব জগ মিলৈ, হরিজন কহিঁ এক হোয়॥

প্রকৃতপক্ষে এই অসার ও অসৎ জগৎ-সংসারকে অস্তিত্ব ও গুরুত্ব দিলেই এবং তার সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করলেই, নিত্যপ্রাপ্ত পরমাত্মা দুর্লভ হয়ে পড়েন। অসৎ-এর (জগৎ-সংসারের, তার বস্তুর, ব্যক্তির, ক্রিয়ার) অস্তিত্ব আছে এবং তা নিজের এবং নিজের জন্য আছে—এরূপ মনে করাই হল অসৎ-এর সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করা।

পরের শ্লোকে ভগবান তাঁকে প্রাপ্ত হলে কি হয় বলছেন—**'পুনর্জন্ম নাপ্নুবন্তি'** অর্থাৎ তাকে আর এই দুঃখপূর্ণ ও বিনাশশীল জগতে জন্ম নিতে হয় না। এখানে জগৎকে 'দুঃখালয়ম্' ও 'অশাশ্বতম্' বলা হয়েছে এর অর্থ হল যে ব্যক্তি জাগতিক বস্তু, ব্যক্তি এবং ক্রিয়া থেকে সুখ গ্রহণ করে, তার পক্ষে সংসার ভয়ানক দুঃখপ্রদানকারী কিন্তু যিনি বস্তু ও ক্রিয়ার দ্বারা মানুষের সেবা করেন, তাঁর কাছে সংসার পরমাত্মাস্বরূপ। সুখভোগকারী কখনো দুঃখ হতে পরিত্রাণ পায় না—এ এক অকাট্য নিয়ম। তাই বস্তু, ব্যক্তি বা ক্রিয়া থেকে কখনো সুখ আস্বাদন করা উচিত নয়। যে মুহূর্তে সর্বতোভাবে সুখবুদ্ধি ত্যাগ করা হয়, সেই মুহূর্তেই পরমপ্রাপ্তি হয়—**'ত্যাগাচ্ছান্তিরনন্তরম্'** (গীতা ১২।১৯) এখানে বক্তব্য এই যে ভগবান যেমন যুগে যুগে ধর্ম সংস্থাপন, সাধুদের রক্ষা ও দুষ্টের দমনের জন্য অবতাররূপে জন্মগ্রহণ করেন, সেইরকম ভগবৎপ্রাপ্ত ভক্তগণও কারকপুরুষ অথবা সাধুরূপে এই পৃথিবীতে জন্ম নেন। আবার ভগবান যখন অবতাররূপে আসেন তখন সিদ্ধভক্তগণ কখনো কখনো তাঁর পার্ষদ হয়ে (গোপবালকের ন্যায়) জন্মগ্রহণ করেন। কিন্তু তাঁদের পক্ষে এই জন্ম **'দুঃখালয়ম্'** অথবা **'অশাশ্বতম্'** হয় না কারণ

তাঁদের এই জন্ম কর্মজনিত নয়, তাঁদের এই জন্ম হয় ভগবৎ প্রেরণা থেকে।

শাস্ত্র অনুযায়ী সাধক যখন অসৎ হতে সর্বতোভাবে সম্পর্ক ছিন্ন করে তখন সে মুক্ত হয়, কিন্তু নিজ অংশীর স্বীকৃতি ছাড়া পরমপ্রেমের প্রাপ্তি হয় না এবং প্রতিক্ষণ বর্ধমান আনন্দ লাভও করতে পারে না। সেই প্রতিক্ষণ বর্ধমান আনন্দ, প্রেম প্রাপ্তিকেই ভগবান **'সংসিদ্ধিং পরমাং গতা'** অর্থাৎ পরমসিদ্ধি প্রাপ্তি বলেছেন।

এই প্রকরণটি ভগবান শেষ করেছেন অষ্টম অধ্যায়ের ১৬শ শ্লোকে এই বলে যে চুরাশি লক্ষ যোনি থেকে ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি সমস্তই **'পুনরাবর্তিনো'** অর্থাৎ পুনর্জন্মকারী কিন্তু ভগবৎ লাভ করলে তার নিবৃত্তি হয়। এর তাৎপর্য হল, পৃথিবীমণ্ডল থেকে ব্রহ্মলোক পর্যন্ত সুখ সীমিত, পরিবর্তনশীল ও বিনাশশীল। আর ভগবদ্ প্রাপ্তির সুখ হল অনন্ত, অপার ও অগাধ। অনন্ত ব্রহ্মা, অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড যদি শেষ হয়েও যায়, তাহলেও এই পরমপ্রাপ্তির সুখ কখনো নষ্ট হয় না, সর্বদা বজায় থাকে।

প্রাণীগণ পরমাত্মার অংশ হওয়ায় নিত্য। তারা যতক্ষণ না নিত্য তত্ত্ব লাভ করছেন ততক্ষণ তাঁরা যত উচ্চলোকই লাভ করুন তাঁদের আবার পুনর্জন্ম গ্রহণ করতে হয়। এখানে একটি সংশয় হতে পারে যে সাধু, ভক্ত, জীবন্মুক্ত বা কারকপুরুষদের দর্শনমাত্রেই কল্যাণ হয়। তাহলে ব্রহ্মা তো ভগবদ্ভক্ত এবং কারকপুরুষ তবে তাঁকে দর্শনলাভ করলে মুক্তি হবে না কেন ? এর উত্তর হল মনুষ্যযোনিই একমাত্র কর্মযোনি। সাধু, ভক্ত এঁদের দর্শন, চিন্তা বা সম্ভাষণ ইত্যাদির মাহাত্ম্য কেবল মানুষদের জন্যই। এই জন্মে ভগবদ্ প্রাপ্তির সামান্যতম সুযোগ লাভ হলেও সে মুক্ত হয়। কিন্তু এইরূপ অধিকার অন্য কোনো লোকে নেই, তাই তারা মুক্ত হয় না। নরক গমনকারীরাও পরমভাগবত, কারকপুরুষ যমরাজের দর্শন পান কিন্তু শাস্ত্রে শোনা যায় না তাদের মুক্তি হয়েছে। তবে অন্যান্য লোকে বা পশুপক্ষীদের মধ্যেও যদি মুক্তিলাভের জন্য তীব্র বাসনা জাগে তবে কেউ কখনো কখনো মুক্তি লাভ করে, তবে সে বড় ব্যতিক্রমী। পরমাত্মা ছাড়া প্রকৃতির আর সমস্ত কার্যকে বলে 'অন্য'। যে এই 'অন্যকে' গুরুত্ব না দিয়ে, ভগবানকেই ভক্তি

করে সেই 'অনন্যা' ভক্ত। ভগবানকে কেবল এই অনন্যা ভক্তি দ্বারাই লাভ করা যায়।

ব্রহ্মলোক ও পুনরাবর্তন—(শ্লোক ১৭-১৯)

ভগবান তিনটি শ্লোকে ব্রহ্মলোক ও তার অধিকারীদেরও পুনর্জন্মের কথা বলেছেন।

> **সহস্রযুগপর্যন্তমহর্যদ্ ব্রহ্মণো বিদুঃ।**
> **রাত্রিং যুগসহস্রান্তাং তেঽহোরাত্রবিদো জনাঃ॥**
> **অব্যক্তাদ্ব্যক্তয়ঃ সর্বাঃ প্রভবন্ত্যহরাগমে।**
> **রাত্র্যাগমে প্রলীয়ন্তে তত্রৈবাব্যক্তসংজ্ঞকে॥**
> **ভূতগ্রামঃ স এবায়ং ভূত্বা ভূত্বা প্রলীয়তে।**
> **রাত্র্যাগমেঽবশঃ পার্থ প্রভবত্যহরাগমে॥**

(গীতা ৮।১৭-১৯)

'যাঁরা ব্রহ্মার চতুর্যুগ সহস্র ব্যাপী একটি দিন ও চতুর্যুগ সহস্র ব্যাপী একটি রাত্রিকে জানে, তাঁরাই ব্রহ্মার দিন ও রাত্রের প্রকৃত তত্ত্বকে জানেন।

ব্রহ্মার দিবসের প্রারম্ভে অব্যক্ত (ব্রহ্মার সূক্ষ্মশরীর) থেকে সকল প্রাণী উদ্ভূত হয় এবং ব্রহ্মার রাত্রির প্রারম্ভে সেই অব্যক্তেই অর্থাৎ ব্রহ্মার সূক্ষ্ম শরীরে সমস্ত প্রাণী লীন হয়।

হে পার্থ ! এই সেই প্রাণীসকল যারা প্রকৃতির বশীভূত থেকে পুনঃপুনঃ ব্রহ্মার দিবসের প্রারম্ভে উৎপন্ন এবং রাত্রির প্রারম্ভে লীন হয়।' (গীতা ৮।১৭-১৯)

মানুষের একটি দিন ও রাতকে বলে 'অহোরাত্র'। এইরকম পনেরো অহোরাত্রকে বলে এক 'পক্ষ'। দুই পক্ষ নিয়ে হয় এক 'মাস'। মানুষের ছয় মাসে হয় এক 'অয়ন' আর বারমাসে হয় এক 'বৎসর'। মানুষের এক বৎসরে হয় দেবতাদের একটি দিন। উত্তরায়ণ হচ্ছে দেবতাদের একদিন ও দক্ষিণায়ণ একরাত্রি। মানুষের চার যুগ অতিক্রান্ত হলে, দেবগণের এক দিব্যযুগ হয়। অর্থাৎ মানুষের সত্যযুগের সতেরো লাখ আটাশ হাজার বৎসর, ত্রেতার বারো লাখ ছিয়ানব্বই হাজার বৎসর, দ্বাপরের আট লাখ

চৌষট্টি হাজার বৎসর এবং কলির চার লাখ বত্রিশ হাজার বৎসর মোট তেতাল্লিশ লাখ কুড়ি হাজার বৎসর পার হলে হয় দেবতাদের এক দিব্যযুগ।

মানুষ ও দেবতাদের সময়ের হিসাব সূর্য থেকে হলেও ব্রহ্মার সময়ের হিসাব কিন্তু দেবগণের দিব্যযুগ থেকে হয় অর্থাৎ দেবতাদের এক হাজার দিব্যযুগে (মানুষের চারশত বত্রিশ কোটি বৎসর) ব্রহ্মার এক দিন হয় আর ঐরূপ পরিণামেই রাত্রি হয়। ব্রহ্মার এই দিনকে 'কল্প' বা 'সর্গ' বলা হয় আর রাত্রিকে বলে 'প্রলয়'। দিন-রাতের এই গণনা অনুসারে ব্রহ্মার আয়ু একশো বৎসর। ব্রহ্মার একশো বছর হলে তিনি পরমাত্মায় লীন হয়ে যান আর তাঁর ব্রহ্মলোকও প্রকৃতিতে লীন হয় এবং প্রকৃতিও পরমাত্মায় লীন হয়।

অষ্টাদশ শ্লোকে প্রাণীমাত্রের শরীরকেই 'ব্যক্তয়ঃ' বলা হয়েছে। এই যে স্থূলসমষ্টিগত সৃষ্টি পরিলক্ষিত হয়, তা সবই ব্রহ্মার জাগরণের পর তাঁর সূক্ষ্মশরীর (অব্যক্ত) হতে অর্থাৎ প্রকৃতি থেকে উৎপন্ন হয়। ব্রহ্মার নিদ্রার সময় এ সবই তার সূক্ষ্মশরীরে লীন হয়। তাৎপর্য হল এই যে ব্রহ্মার জাগরণে হয় সর্গ আর নিদ্রাতে হয় প্রলয়। আর এই যে উচ্চ হতে উচ্চতর যে ব্রহ্মলোক তাও কালের অন্তর্গত। তবে ব্রহ্মার দিন ও রাত্রির গণনা সূর্যকে কেন্দ্র করে হয় না, সেটির গণনা হয় প্রকৃতিকে কেন্দ্র করে। কিন্তু ভগবান কালের অন্তর্গত নন। তিনি সর্বতোভাবে কালেরও অতীত।

শুক্ল ও কৃষ্ণ গতিপথ—(শ্লোক ২৩-২৮)

ভগবান এই প্রশ্নের শেষ প্রকরণটি বলেছেন উচ্চমার্গগামীদের আবৃত্তি ও অনাবৃত্তি সম্পর্কে রেখাপাত করে।

ভগবান চতুর্দশ অধ্যায়ে বলেছেন '**উর্ধ্বং গচ্ছন্তি সত্ত্বস্থা মধ্যে তিষ্ঠন্তি রাজসাঃ। জঘন্যগুণবৃত্তিস্থা অধো গচ্ছন্তি তামসাঃ॥**' (গীতা ১৪।১৮) কিন্তু কোন্ ধরনের সাধক উর্ধ্বে এবং কত উর্ধ্বে যায় এবং তাদের কী প্রকার গতি হয় তা সংক্ষেপে বর্ণনা করা হয়েছে ষষ্ঠ ও অষ্টম অধ্যায়ে। গীতায় চার প্রকার সাধকের কথা বলা হয়েছে যারা উর্ধ্বগতি প্রাপ্ত হন।

১) যাঁরা কেবল ভোগ-বাসনার কারণে উচ্চলোকে যান তারা সংযম রক্ষা করে ইহলোকে ভোগ বর্জন করেছেন। সেই ত্যাগের জন্য এখানকার

ভোগাদি না পাওয়ায় তাঁদের মধ্যে আংশিক সমতা এসেছে এবং তাদের যোগী বলা হয়েছে। আবার যাদের পরমাত্মা প্রাপ্তির উদ্দেশ্য থাকে অথচ সূক্ষ্ম ভোগ-বাসনার জন্য যোগে বিচলিত হন তারাও এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। এই সব সাধকেরা স্বর্গে বা ব্রহ্মলোকাদিতে অনেক কাল কাটিয়ে আবার পৃথিবীতে এসে শুদ্ধ-শ্রীমানের গৃহে জন্মগ্রহণ করে। এইরূপ যোগভ্রষ্ট ব্যক্তিদের পথ হল কৃষ্ণমার্গ যা অষ্টম অধ্যায়ের পঁচিশ শ্লোকে বলা হয়েছে। আর পুনরাবর্তী হলে মনুষ্যদেহ লাভের কথা ষষ্ঠ অধ্যায়ে একচল্লিশ এবং চুয়াল্লিশ এবং পঁয়তাল্লিশ শ্লোকে বলা হয়েছে।

২) দ্বিতীয় শ্রেণীর সাধকদের মধ্যে সাধনাবস্থায় ব্রহ্মলোক পাওয়ার বাসনা থাকতে পারে বা তারা পরমাত্মাকে পরব্রহ্মরূপে জানতে পারেন অথবা পরমাত্মা প্রাপ্তির উদ্দেশ্য থাকলেও তাদের সুখভোগের সূক্ষ্মবাসনা সর্বতোভাবে দূর হয়নি, তাই তাঁরা শরীর ত্যাগের পর ব্রহ্মলোকে গমন করে সেখান থেকেই মুক্তিলাভ করেন, কিন্তু তাদের পথ হয় ভিন্ন—'শুক্লমার্গে'। অষ্টম অধ্যায়ের চব্বিশতম শ্লোকে এর বর্ণনা আছে।

৩) তৃতীয় শ্রেণীর সাধকদের উদ্দেশ্য শুধু পরমাত্মা প্রাপ্তি এবং তাদের ইহলোক বা ব্রহ্মলোক কোনো লোকেরই কোনো বাসনা থাকে না। কিন্তু যদি অন্তিমকালে নির্গুণের ধ্যান থেকে বিচ্যুত হন তবে তাঁরা ব্রহ্মলোকাদিতেও যান না, তাঁরা সোজা যোগীকুলেই জন্মগ্রহণ করেন। তাঁদের এমন যোগীদের কুলে জন্ম হয় যে, সেখানে তাঁদের পূর্বজন্মকৃত ধ্যানরূপ সাধন নির্বিঘ্নে হওয়া সম্ভব। সেখানে তাঁরা সাধন করে মুক্তিলাভ করেন (গীতা ৬।৪২-৪৩)।

যত্র কালে ত্বনাবৃত্তিমাবৃত্তিং চৈব যোগিনঃ।
প্রয়াতা যান্তি তং কালং বক্ষ্যামি ভরতর্ষভ॥
অগ্নির্জ্যোতিরহঃ শুক্লঃ ষণ্মাসা উত্তরায়ণম্।
তত্র প্রয়াতা গচ্ছন্তি ব্রহ্ম ব্রহ্মবিদো জনাঃ॥
ধূমো রাত্রিস্তথা কৃষ্ণঃ ষণ্মাসা দক্ষিণায়নম্।
তত্র চান্দ্রমসং জ্যোতির্যোগী প্রাপ্য নিবর্ততে॥

শুক্লকৃষ্ণে গতী হ্যেতে জগতঃ শাশ্বতে মতে।
একয়া যাত্যনাবৃত্তিমন্যয়াবর্ততে পুনঃ॥
নৈতে সৃতী পার্থ জানন্ যোগী মুহ্যতি কশ্চন।
তস্মাৎ সর্বেষু কালেষু যোগযুক্তো ভবার্জুন॥
বেদেষু যজ্ঞেষু তপঃসু চৈব দানেষু যৎ পুণ্যফলং প্রদিষ্টম্।
অত্যেতি তৎ সর্বমিদং বিদিত্বা যোগী পরং স্থানমুপৈতি চাদ্যম্॥

(গীতা ৮।২৩-২৮)

'হে অর্জুন ! যে কালে বা যে পথে শরীর ত্যাগের পর যোগিগণ 'অনাবৃত্তি' অর্থাৎ পুনর্জন্ম প্রাপ্ত হন না এবং যে পথে গমন করে 'আবৃত্তি' অর্থাৎ পুনর্জন্ম প্রাপ্ত হন, সেই উভয় পথের কথাই বলছি।

যে মার্গে জ্যোতির্ময় অগ্নির অধিপতি দেবতা, দিনের অধিপতি দেবতা, শুক্লপক্ষের অধিপতি দেবতা, উত্তরায়ণের অধিপতি দেবতা থাকেন, ব্রহ্মবেত্তা পুরুষগণ দেহত্যাগ করে সেই মার্গে গমন করে প্রথমে ব্রহ্মলোক এবং পরে ব্রহ্মার সঙ্গে ব্রহ্ম লাভ করেন।

যে মার্গে ধূমের অধিপতি দেবতা, রাত্রির অধিপতি দেবতা, কৃষ্ণপক্ষের অধিপতি দেবতা এবং দক্ষিণায়নের অধিপতি দেবতা থাকেন, দেহত্যাগ করে সেই সব যোগী (বা সকাম ভক্ত) এই মার্গে গমন করে জ্যোতিপ্রাপ্ত হয়ে ফিরে আসেন, অর্থাৎ তাঁরা জন্ম-মৃত্যু প্রাপ্ত হন।

শুক্ল ও কৃষ্ণ—এই দুটি গতিই অনাদিকাল থেকে জগতের (প্রাণী-কুলের) সঙ্গে সম্পর্কিত। এর মধ্যে একটির দ্বারা মোক্ষলাভ হয় (অর্থাৎ পুনর্জন্ম হয় না) আর অপরটিতে পুনর্জন্ম হয় (অর্থাৎ ফিরে আসতে হয়)।

এই উভয় মার্গ সম্পর্কে অবগত কোনো যোগীই মোহগ্রস্ত হন না। অতএব হে অর্জুন ! তুমি সর্বদা যোগযুক্ত (সমত্ব স্থিত) হও।

যোগী (ভক্ত) এই অধ্যায়ে বর্ণিত তত্ত্ব অনুধাবন করে, বেদ, যজ্ঞ, তপ ও দানে যেসব পুণ্যফলের কথা বলা হয়েছে, সেসব পুণ্যফল অতিক্রম করে আদ্যস্থান পরমাত্মাকে লাভ করেন।' (গীতা ৮।২৩-২৮)

ভগবান তেইশতম শ্লোকে 'অনাবৃত্তিম্', 'আবৃত্তিম্' ও 'যোগিনঃ'–

এই তিন প্রকার সাধকদের শরীর ত্যাগের পর অন্তগতির কথা উল্লেখ করেছেন। অনাবৃত্তিম্ জ্ঞানসম্পন্ন হলেন তাঁরা যাঁরা সাংসারিক পদার্থ ও ভোগাদি বিমুখ হয়ে পরমাত্মার শরণাগত হয়েছেন। তাঁদের জ্ঞান (বিবেক) আবৃত নয় জাগ্রত তাই তাঁরা অনাবৃত পথে গমন করেন, যে স্থান থেকে আর সংসারে ফিরে আসতে হয় না। নিষ্কাম ভাব থাকায় তাদের পথে বিবেক বা প্রকাশের প্রাধান্য থাকে। আবার যারা জাগতিক পদার্থ ও ভোগে আসক্ত, কামনা ও মমতাসম্পন্ন এবং নিজ স্বরূপের প্রতি ও ভগবানে বিমুখ তারা আবৃত জ্ঞানসম্পন্ন অর্থাৎ তাদের জ্ঞান (বিবেক) আবৃত। এইজন্য তারা আবৃত্তি মার্গে গমন করে, যেখান থেকে জন্ম-মৃত্যু চক্রে আবার ফিরে আসতে হয়। সকামভাব থাকায় তাদের পথে অন্ধকার বা অবিবেকী ভাবের প্রাধান্য থাকে। যারা পরমাত্মা প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে সাধন করেন অথচ অন্তরে আংশিক বাসনা থাকায় অন্তিমকালে বিচলিত পুণ্যকারক লোক (ভোগস্থান) প্রাপ্ত হয়ে পুনর্জন্ম গ্রহণ করেন সেই যোগভ্রষ্টকারীদের আবৃত জ্ঞানসম্পন্ন বলা হয়েছে। এখানে **'যোগিনঃ'** পদটি সকাম ও নিষ্কাম উভয় পুরুষদের উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে।

অনাবৃত্ত যোগী—শুক্লমার্গ[১]

অনাবৃত্ত জ্ঞানসম্পন্ন ব্রহ্মবেত্তা পুরুষগণ দেহত্যাগ করলে শুক্লমার্গে অর্থাৎ উজ্জ্বল প্রকাশময় মার্গে গমনকালে তাঁরা প্রথম অধিকারে আসেন জ্যোতিস্বরূপ 'অগ্নিদেবতার'। যতদূর অগ্নিদেবতার অধিকার সেইস্থান থেকে অগ্নিদেবতা তাকে দিনের 'অধিপতিদের' কাছে সমর্পণ করেন। তার পর দিনের অধিপতি দেবতা তাঁকে শুক্লপক্ষের অধিপতি দেবতাকে সমর্পণ করেন এবং তিনি নিজ সীমা পার করিয়ে জীবকে উত্তরায়ণের অধিপতি দেবতার কাছে অর্পণ করেন। পরে উত্তরায়ণের অধিপতি দেবতা তাঁকে ব্রহ্মলোকের অধিপতি দেবতার কাছে সমর্পণ করেন এবং এইভাবে অনাবৃত্ত

---

[১]শুক্লমার্গকে উপনিষদে দেবযান, অর্চিমার্গ, উত্তরমার্গ, দেবপথ, ব্রহ্মপথও বলা হয়েছে।

জ্ঞানসম্পন্ন জীব ব্রহ্মলোকে পৌঁছে যায়। ব্রহ্মার আয়ুষ্কাল পর্যন্ত সেখানে বাস করে মহাপ্রলয়ে ব্রহ্মার সঙ্গে তিনি মুক্তি লাভ করেন অর্থাৎ সচ্চিদানন্দ পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হন।

এখানে 'ব্রহ্মবিদঃ' বলা হয়েছে সেই সব সাধকদের যাঁরা পরোক্ষরূপে পরমাত্মাকে জানতে চেয়ে 'ক্রমমুক্তি' লাভ করেন, অপরোক্ষরূপে অনুভবকারী ব্রহ্মজ্ঞানীদের নয়। অপরোক্ষ ব্রহ্মজ্ঞানী সদ্যোমুক্ত বা জীবন্মুক্ত হন। ক্রমমুক্তি সাধকদের সম্বন্ধে কূর্মপুরাণ বলছে—

ব্রহ্মণা সহ তে সর্বে সম্প্রাপ্তে প্রতিসঞ্চরে।

পরাস্যান্তে কৃতাত্মানঃ প্রবিশন্তি পরং পদম্॥ (কূর্মপুরাণ, পূর্ব ১১।২৮৪)

ব্রহ্মার আয়ুষ্কাল পূর্ণ হলে যখন মহাপ্রলয় উপস্থিত হয়, তখন এই শুদ্ধ অন্তঃকরণ সম্পন্ন সাধক ব্রহ্মার সঙ্গেই পরমপদে প্রবিষ্ট হন।

ক্রমমুক্তিতে ব্রহ্মলোক হল শুক্লমার্গের একটা স্টেশনের মতন। যাঁরা সুখের বাসনা করেন, সেইসব উচ্চস্তরের সাধক এখানে আসেন। কিন্তু যাদের সুখের বাসনা নেই তাঁরা এখানে আসেন না—যেমন আমাদের যদি প্রয়োজন না থাকে তবে স্টেশনই আসুক বা জঙ্গলই আসুক আমাদের কি যায় আসে, আমরা গন্তব্যস্থলেই চলে যাব।

বিভিন্ন উপনিষদ ও ব্রহ্মসূত্রেও এই শুক্লমার্গ সম্বন্ধে একইকথা বলা হয়েছে। যথা—

১) ছান্দোগ্য উপনিষদ অনুসারে—অর্চির দেবতা, দিনের দেবতা, শুক্লপক্ষের দেবতা, উত্তরায়ণের দেবতা, সংবৎসর, আদিত্য, চন্দ্র, বিদ্যুৎ (বিদ্যুৎদেব) এবং পরে অমানব পুরুষ দ্বারা ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি (ছাঃ ৪।১৫। ৫; ৫।১০।১-২)।

২) বৃহদারণ্যক উপনিষদ অনুসারে—জ্যোতির দেবতা, দিনের দেবতা, শুক্লপক্ষের দেবতা, উত্তরায়ণের দেবতা, দেবলোক, আদিত্য, বিদ্যুৎ (বৈদ্যুৎদেব) এবং পরে মানসপুরুষের দ্বারা ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি (৬।২।১৫)।

৩) কৌষীতকি ব্রাহ্মণ অনুসারে—অগ্নিলোক, বায়ুলোক, সূর্যলোক, বরুণলোক, ইন্দ্রলোক, প্রজাপতিলোক এবং ব্রহ্মলোক (১।৩)।

৪) ব্রহ্মসূত্রেও (৪।৩।২-৩) এই বিষয়ে উল্লিখিত হয়েছে।

কৃষ্ণমার্গ—

পরবর্তী শ্লোকে ভগবান কৃষ্ণমার্গে গমনকারীদের কথা বলেছেন। এই মার্গে গমনকারীদের ধূমাধিপতি দেবতা নিজ সীমা পার করিয়ে রাত্রির অধিপতি দেবতার কাছে অর্পণ করেন। রাত্রির অধিপতি দেবতা তাঁকে নিজ সীমা পার করিয়ে কৃষ্ণপক্ষের অধিপতি দেবতার অধীনে অর্পণ করেন। কৃষ্ণপক্ষের অধিপতি দেবতা নিজ সীমানা অতিক্রমপূর্বক দেশ ও কালের দৃষ্টিতে বহুদূর পর্যন্ত অধিকারসম্পন্ন দক্ষিণায়নের দেবতার কাছে সমর্পণ করেন এবং সেই দেবতা তাঁকে চন্দ্রলোকাধিপতি দেবতার কাছে অর্পণ করেন। এইভাবে কৃষ্ণমার্গে গমনকারী জীব যথাক্রমে ধূম, রাত্রি, কৃষ্ণপক্ষ এবং দক্ষিণায়নের অধিকার প্রাপ্ত দেশ অতিক্রম করে চন্দ্রের জ্যোতি অর্থাৎ যেখানে অমৃত পান করানো হয় সেই স্বর্গাদি দিব্যলোক প্রাপ্ত হন। নিজ পুণ্য অনুযায়ী সেখানে বাস করে অর্থাৎ সুখাদি ভোগ করে তিনি ফিরে আসেন। এখানে উল্লেখ্য যে চন্দ্রমণ্ডল কিন্তু চন্দ্রলোক নয়। চন্দ্রমণ্ডল সৌরমণ্ডলের একটি অংশ কিন্তু চন্দ্রলোক সূর্যেরও ওপারে অবস্থিত। সেই চন্দ্রলোক থেকে চন্দ্রমণ্ডল অমৃত লাভ করে যাতে শুক্লপক্ষে ঔষধিসকল পুষ্ট হয়।

এখানে আরও একটি বোঝার বিষয় হল যে, এখানে যে কৃষ্ণমার্গের বর্ণনা করা হয়েছে, তা শুক্লমার্গের তুলনায় কৃষ্ণমার্গ কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সেটি উচ্চলোকে যাওয়ারই পথ। সাধারণ মানুষ মৃত্যুর পর মৃত্যুলোকে যায়, যারা পাপী তারা আসুরী যোনি লাভ করে, তাদের থেকেও যারা পাপী তারা নরককুণ্ডে যায়—এই সব মানুষ থেকে কৃষ্ণমার্গে গমনকারী ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ।

আর চন্দ্রের জ্যোতিপ্রাপ্ত হয়—এর অর্থ জগতে জন্ম-মৃত্যুর যত প্রকার পথ আছে, তার মধ্যে এই কৃষ্ণমার্গ (ঊর্ধ্বগতি হওয়ায়) শ্রেষ্ঠ এবং ওইগুলির থেকে বেশি জ্যোতির্ময়। কৃষ্ণমার্গ থেকে ফেরার সময় ওই জীব প্রথমে আকাশে গমন করে, পরে বায়ুর অধীন হয়ে মেঘে অবস্থান করে, মেঘ থেকে বর্ষার সঙ্গে পৃথিবীতে এসে অন্নে অবস্থান করে। তারপর কর্ম অনুসারে যে যোনিতে জন্মাবার হয়, সেই যোনির পুরুষ প্রাণীর মধ্যে অন্নের

মাধ্যমে প্রবেশ করে এবং ক্রমে পুরুষের থেকে স্ত্রীদেহ গমন করে ও শরীর ধারণ করে জন্মগ্রহণ করে। এইভাবে জন্ম-মৃত্যু চক্রে আবর্তিত হয়।

সাধারণের এমন ধারণা যে বোধহয় দিনের বেলায়, শুক্লপক্ষে বা উত্তরায়ণের সময় মৃত্যুলাভ করলে মুক্তিলাভ হয়। প্রকৃতপক্ষে শুক্লমার্গ ও কৃষ্ণমার্গ হল ঊর্ধ্বগতি প্রাপ্ত হওয়া ব্যক্তির পথ এর সঙ্গে মৃত্যুকালের কোনো সম্পর্ক নেই। মৃত্যুর পর মানুষ নিজ নিজ কর্ম অনুসারেই উচ্চ-নীচ গতি প্রাপ্ত হয় তা তার মৃত্যু দিনেই হোক বা রাত্রিতেই হোক, শুক্লপক্ষেই হোক বা কৃষ্ণপক্ষেই হোক, উত্তরায়ণেই হোক বা দক্ষিণায়নেই হোক।

এখন প্রশ্ন হতে পারে যে পিতামহ ভীষ্ম যিনি তত্ত্বজ্ঞ মহাপুরুষ ছিলেন, তিনি দক্ষিণায়নে শরীর ত্যাগ না করে কেন উত্তরায়ণের জন্য অপেক্ষা করেছিলেন। আসলে ভীষ্ম ছিলেন দৌ (অষ্টবসুর একজন) নামে দেবতা, তিনি শাপগ্রস্ত হয়ে ইহলোকে জন্ম নিয়েছিলেন। মৃত্যুর পর তাঁর ভগবদ্ধামে নয় দেবলোকেই যাওয়ার কথা কিন্তু দক্ষিণায়নের সময় দেবলোকে রাত্রি, সেই সময় সেখানকার দরজা বন্ধ থাকে। তাঁর ইচ্ছামৃত্যু ছিল। তাই তিনি দেখলেন যে দেবলোকে প্রবেশের জন্য প্রতীক্ষা করার চেয়ে পৃথিবীতে অপেক্ষা করাই ভালো। এখানে শ্রীকৃষ্ণর দর্শন লাভও হবে আবার পাণ্ডবদের উপদেশ দানও হবে। তাই তিনি উত্তরায়ণ পর্যন্ত অপেক্ষা করে দেহত্যাগ করেন।

এইভাবে শুক্ল ও কৃষ্ণ এই উভয় মার্গের পরিণাম যাঁরা জানেন তাঁরা যোগী, তাঁরা জাগতিক ভোগ-সুখে নির্বিকার থাকেন। ভগবান অষ্টম অধ্যায়ের সপ্তম শ্লোকে বলছেন—**'তস্মাৎ সর্বেষু কালেষু মামনুস্মর যুধ্য চ'** আর এখানে সপ্তবিংশ শ্লোকে বলছেন **'তস্মাৎ সর্বেষু কালেষু যোগযুক্তো ভবার্জুন'** এর অর্থ হল সবসময়ে 'ভগবদ্স্মরণ' করা বা ভগবানে মন সন্নিবিষ্ট করাও হল 'যোগ' আবার 'সমত্বে স্থিত' হওয়াও হল যোগ। উভয়ের পরিণাম একই।

যজ্ঞ, দান, তপ, তীর্থ, ব্রতাদি যত প্রকার শাস্ত্রীয় কর্ম আছে তার যে ফল—তা সবই বিনাশশীল। জীব স্বয়ং পরমাত্মার অংশ হয়েও বিনাশশীল

পদার্থে আবদ্ধ থাকে, এর কারণ হল তার অজ্ঞতা। ভগবান তাই অষ্টবিংশতি শ্লোকে বলছেন, যে ব্যক্তি এই শুক্ল ও কৃষ্ণমার্গের রহস্য বুঝতে সক্ষম সেই হল যোগী, সে এই যজ্ঞ, তপাদি পুণ্যফল অতিক্রম করে পরমাত্মাকে লাভ করে। তাই ভগবান অর্জুনকে বলছেন, যোগী হও, সমত্বে স্থিত হও অর্থাৎ অনুকূল-প্রতিকূল পরিস্থিতিকে সদ্‌ব্যবহার করো, মানে অনুকূল পরিস্থিতিতে জগতের সেবা করো এবং প্রতিকূল পরিস্থিতিতে অনুকূলতার ইচ্ছা ত্যাগ করো।

———o———

নবম প্রশ্ন

ভগবান সমগ্র গীতাব্যাপী কোথাও জ্ঞানের মহিমা বর্ণনা করে জ্ঞান প্রাপ্তির জন্য অনুপ্রেরণা দিয়েছেন আবার কোথাও ভক্তপ্রসঙ্গ বর্ণনা করে ভক্তির মহিমা ও অনন্যভক্তি বর্ণনা করেছেন।

জ্ঞানপ্রসঙ্গ—

১) **'সর্বং কর্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে'** (গীতা ৪।৩৩)

সমস্ত কর্ম জ্ঞানেই সমাপ্তি লাভ করে।

২) **'নৈব কিঞ্চিৎ করোমীতি যুক্তো মন্যেত তত্ত্ববিৎ'** (গীতা ৫।৮)

আমি কিছুই করি না—নিশ্চিতরূপে জ্ঞানী ব্যক্তি এইরূপ মনে করেন।

৩) **'সর্বকর্মাণি মনসা সন্ন্যস্যাস্তে সুখং বশী।**
নবদ্বারে পুরে দেহী নৈব কুর্বন্ ন কারয়ন্।।' (গীতা ৫।১৩)

অন্তকরণ বশীভূত সাংখ্যযোগী নবদ্বারযুক্ত শরীরে অবস্থিত থেকেও বিবেক-বিচারপূর্বক মনে মনেও সমস্ত কর্ম ত্যাগ করে আনন্দে পরমাত্ম-স্বরূপে স্থিত হন।

৪) **'স যোগী ব্রহ্মনির্বাণং ব্রহ্মভূতোঽধিগচ্ছতি'** (গীতা ৫।২৪)

সাংখ্যযোগী পরব্রহ্ম পরমাত্মার সঙ্গে একীভূত হয়ে নির্বাণব্রহ্ম লাভ করেন।

৫) **'জ্ঞানবিজ্ঞানতৃপ্তাত্মা কূটস্থো বিজিতেন্দ্রিয়'** (গীতা ৬।৮)

জ্ঞান-বিজ্ঞানে যাঁর আত্মা পরিতৃপ্ত তিনি যোগযুক্ত।

৬) **'যদক্ষরং বেদবিদো বদন্তি বিশন্তি যদ্‌যতয়ো বীতরাগাঃ'** (গীতা ৮।১১)।

বেদজ্ঞ পুরুষ যে পরমপদকে অক্ষর বলেন অনাসক্ত যোগিগণ তাঁহাতেই প্রবেশ করেন।

৭) **'ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম ....পরমাং গতিম্'** (গীতা ৮।১৩)

জ্ঞানযোগিগণ 'ওঁ' এই এক অক্ষরযুক্ত ব্রহ্ম উচ্চারণপূর্বক নির্গুণ ব্রহ্মরূপ পরমগতি লাভ করেন।

৮) 'জ্ঞানযজ্ঞেন চাপ্যন্যে যজন্তো মামুপাসতে' (গীতা ৯।১৫) জ্ঞানযোগিগণ নির্গুণ ব্রহ্মরূপ আমাকে জ্ঞানযজ্ঞের দ্বারা পূজা করে আমার উপাসনা করে থাকেন।

ভক্তিপ্রসঙ্গ—

১) যোগিনামপি সর্বেষাং মদ্গতেনান্তরাত্মনা।
শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ॥ (গীতা ৬।৪৭)

যোগীদের মধ্যেও যিনি শ্রদ্ধাবান ও মদ্গতচিত্তে আমাকে নিরন্তর ভজনা করেন, তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ যোগী—এই আমার মত।

২) ময্যাসক্তমনাঃ পার্থ যোগং যুঞ্জন্ মদাশ্রয়ঃ।
অসংশয়ং সমগ্রং মাং যথা জ্ঞাস্যসি তচ্ছৃনু॥ (গীতা ৭।১)

পার্থ ! অনন্য ভক্তি দ্বারা আমাতে আসক্ত চিত্ত ও অনন্যভাবে মৎপরায়ণ এবং যোগযুক্ত হয়ে আমার আশ্রয়গ্রহণকারী সাধক নিঃসংশয়ে আমাকে জানতে পারে।

৩) জরামরণমোক্ষায় মামশ্রিত্য.........কর্ম চাখিলম্। (গীতা ৭।২৯)

আমার শরণাগত হয়ে জরা-মরণ হতে মুক্তিলাভের জন্য যে আমাকে যত্নপূর্বক ভজনা করে সেই ভক্তও ব্রহ্ম, আধ্যাত্ম ও অখিল কর্ম অবগত হয়।

৪) তস্মাৎ সর্বেষু কালেষু মামনুস্মর যুধ্য চ।
ময্যর্পিত মনোবুদ্ধির্মামেবৈষ্যসংশয়ম্॥ (গীতা ৮।৭)

হে অর্জুন ! তুমি নিরন্তর আমার স্মরণ করো এবং যুদ্ধ করো। এইভাবে মন ও বুদ্ধি আমাতে অর্পিত হলে, আমাতে যুক্ত হয়ে নিঃসন্দেহে আমাকেই লাভ করবে।

৫) অনন্যচেতাঃ সততং যো মাং স্মরতি নিত্যশঃ।
তস্যাহং সুলভঃ পার্থ নিত্যযুক্তস্য যোগিনঃ॥ (গীতা ৮।১৪)

যে ব্যক্তি অনন্যচিত্তে সর্বদা এবং নিরন্তর আমাকে স্মরণ করে সে সহজেই আমাকে লাভ করে।

৬) সততং কীর্তয়ন্তো মাং যতন্তশ্চ দৃঢ়ব্রতাঃ।
নমস্যন্তশ্চ মাং ভক্ত্যা নিত্যযুক্তা উপাসতে॥ (গীতা ৯।১৪)

দৃঢ়ব্রত ভক্তগণ নিত্য আমার নাম ও গুণকীর্তন করে আমাকে লাভের জন্য চেষ্টা করেন এবং বারংবার আমাকে প্রণাম করে আমার অনন্য প্রেমে নিত্য সমাহিত থেকে আমারই ভজনা করেন।

৭) **অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্যুপাসতে।**
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্॥ (গীতা ৯।২২)

যে ভক্তগণ নিরন্তর অনন্যচিত্ত হয়ে আমাকে নিষ্কামভাবে ভজনা করেন এবং নিরন্তর আমাতে চিন্তাযুক্ত, সেই উপাসনাকারীদের যোগক্ষেম আমি বহন করি।

৮) **অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্।**
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্ব্যবসিতো হি সঃ॥ (গীতা ৯।৩০)

যদি অতি দুরাচারী ব্যক্তিও অনন্যচিত্তে আমার ভক্ত হয় এবং আমার ভজনা করে তবে তাকে নিশ্চিত সাধু বলে জানবে।

৯) **মচ্চিত্তা মদ্গতপ্রাণা বোধয়ন্ত পরস্পরম্।**
কথয়ন্তশ্চ মাং নিত্যং তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ॥ (গীতা ১০।৯)

আমাতে মদ্গতচিত্ত ও মদ্গতপ্রাণ ভক্তগণ সদাই আমার কথা আলোচনা করে এবং আমার গুণ-প্রভাব সম্বলিত কথা কীর্তন করে সন্তোষ লাভ করে এবং আমার মধ্যেই নিরন্তর রমণ করে।

১০) **মৎকর্মকৃৎ মৎপরমো মদ্ভক্তঃ সঙ্গবর্জিতঃ।**
নির্বৈরঃ সর্বভূতেষু যঃ স মামেতি পাণ্ডব॥ (গীতা ১১।৫৫)

হে অর্জুন! আমার জন্যই কর্মরত, আমাতে পরায়ণ, আমার ভক্ত—যে সদাই আসক্তিবর্জিত এবং সমস্ত প্রাণীতে বৈরীভাবরহিত হয় সেই অনন্য ভক্তিযুক্ত পুরুষ আমাকেই প্রাপ্ত হয়।

অর্জুন পূর্বে কর্মযোগ ও জ্ঞানযোগ সম্বন্ধে প্রশ্ন করেছেন এবং তাঁর দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর ভগবানের কাছে শুনে কিছুটা সংশয়রহিত হয়েছেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের মুখে জ্ঞান ও ভক্তির মহিমা ও মাহাত্ম্য শুনে এবং একাদশ অধ্যায়ের শেষ শ্লোকে (১১।৪৫) অনন্য ভক্তের উচ্চ অবস্থা দেখে তাঁর প্রশ্ন জাগল সগুণ ভগবানের উপাসনাকারী 'ভক্ত' ও নির্গুণ ব্রহ্মের

উপাসনাকারী 'জ্ঞানী'—এদের মধ্যে কোন্ উপাসক শ্রেষ্ঠ।

এবং সততযুক্তা যে ভক্তাস্ত্বাং পর্যুপাসতে।

যে চাপ্যক্ষরমব্যক্তং তেষাং কে যোগবিত্তমাঃ॥ (গীতা ১২।১)

'যে সকল ভক্ত নিরন্তর এবং নিবিষ্ট চিত্তে আপনার উপাসনা করে এবং যারা অবিনাশী নিরাকারের উপাসনা করে তাদের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ ?'

অর্জুনের এই যে প্রশ্ন—সাকার ও নিরাকার উপাসকদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে ? এর উত্তর এত গুরুত্ব সহকারে ভগবান দিয়েছেন যে তা দ্বাদশ অধ্যায়ের দ্বিতীয় শ্লোক থেকে শুরু করে চতুর্দশ অধ্যায়ের বিংশতি শ্লোক পর্যন্ত ব্যাখ্যা করে চলেছেন। তিয়াত্তর শ্লোক সংবলিত এত দীর্ঘ প্রকরণ গীতার মধ্যে আর কোনো প্রশ্নের উত্তরে দেখা যায় না। এর দ্বারা স্পষ্ট বোঝা যায় যে এই প্রকরণে ভগবান বিশেষ কোনো নির্দেশ দিতে চেয়েছেন। ভগবান চেয়েছেন সাধকদের সাকার ও নিরাকার স্বরূপের তাৎপর্য বোধ হোক, তাদের জীবনে অনুভবী সিদ্ধ মহাপুরুষদের জীবনের সর্বাঙ্গীন রহস্য প্রকটিত হোক। তাই তিনি সিদ্ধভক্তের (গীতা ১২।১৩-১৯) এবং জ্ঞানীগণের (১৩।২২-২৫) আদর্শ লক্ষণের কথা বলেছেন যাতে সাধকগণ এই সব লক্ষণের সঙ্গে বিশেষভাবে পরিচিত হন এবং সংসার থেকে সম্পর্ক বিচ্ছিন্নতার বিশেষ মহত্ত্ব তাঁদের বোধগম্য হয়। ভগবানের হৃদয়ে জীবদের জন্য যে অত্যন্ত গোপনীয়, পরম কল্যাণকারী, অতি উত্তম ভাব বিদ্যমান, তা অর্জুনের ভগবৎ-প্রেরিত এই প্রশ্নটির দ্বারাই প্রকটিত হল।

অর্জুনের প্রশ্নে দুইটি পদ বিশেষ উল্লেখ্য। ভক্ত হয় সদাই **'সততযুক্তা'** ও **'পর্যুপাসতে'**।

সততযুক্তাঃ— ভগবানে পূর্ণ শ্রদ্ধাশীল সাধক ভক্তর একমাত্র উদ্দেশ্য ভগবদ্প্রাপ্তি।

তাই তাদের প্রত্যেকটি ক্রিয়াতেই ভগবদ্সম্বন্ধ বজায় থাকে এবং সততযুক্তা পদটি এইরূপ সাধক ভক্তগণের বাচক।

সাধকেরা প্রায়ই এই ভুল করেন তারা পারমার্থিক ক্রিয়া যথা ভগবদ্-

সম্বন্ধীয় জপ-ধ্যান-স্বাধ্যায়াদি করার সময় নিজেদের সঙ্গে ভগবানের সম্পর্ক মনে রাখলেও ব্যবহারিক ক্রিয়ার (শারীরিক এবং জীবিকা সম্বন্ধীয়) সময় নিজেদের সাংসারিক জীব হিসেবে মেনে নেন। ঈশ্বরলাভের একমাত্র উদ্দেশ্য হলে সাধক জপ-স্মরণাদির সময় তো ভগবানের সঙ্গে সম্পর্ক রাখেনই, ব্যবহারিক ক্রিয়াদি সম্পন্ন করার সময়েও সর্বক্ষণ ভগবানের সঙ্গে নিজেদের যুক্ত রাখেন। যদি ক্রিয়ার আরম্ভে এবং অন্তে সাধকদের ভগবদ্স্মৃতি থাকে, তাহলে ক্রিয়াকালীনও তাদের সম্বন্ধাত্মক ভগবদ্স্মৃতি বজায় থাকে। যেমন হিসাব করার সময় ব্যবসায়ী সেই কাজে এত মগ্ন থাকে যে সে কে, কেন হিসাব করছে সে কথা তার মনেও থাকে না, শুধু হিসাবের দিকেই তার মন পড়ে থাকে। কিন্তু অবশ্যই হিসাবের আগে তার মনে থাকে যে, আমি অমুক ব্যবসায়ী আর অমুক কাজের জন্য হিসাব করছি। আবার হিসাব শেষ হয়ে গেলেই মনে জেগে ওঠে যে আমি অমুক ব্যবসায়ী আর ওই কাজটি করেছিলাম। এই যে আগে-পরে ব্যবহারিক সম্বন্ধের প্রাকট্য তার ফলে তার হিসেবও নিপুণ হয় এবং তা নিজের জন্যই হয়। সেইরকম যদি প্রত্যেক কর্তব্য-কর্মের প্রারম্ভে ও শেষে সাধকের এই ভাব থাকে যে 'আমি ভগবানেরই' এবং 'তাঁরই জন্য কর্তব্য-কর্ম করছি' আর তার মধ্যে অন্য কোনো চিন্তাভাবনা না থাকে তবে কর্তব্য-কর্মর সময়ও ভগবদ্‌বিস্মৃতি কোনো বিস্মৃতিই নয় বরং ইহা ভগবদ্‌কর্মই হয়ে থাকে।

পর্যুপাসতে—পদটির অর্থ হল 'পরিতঃ উপাসতে' অর্থাৎ ভালোভাবে উপাসনা করা। যেমন পতিব্রতা স্ত্রী কখনো স্বামীর সেবা করে, কখনো স্বামীর অনুপস্থিতিতে তার চিন্তা করে, কখনো স্বামীর বাবা-মায়ের সেবা করে, কখনো আবার রান্না ইত্যাদির গৃহকার্য দ্বারা স্বামীর সেবা করে— সেইরকম সাধক ভক্তও কখনো ভগবানে তল্লীন হয়ে, কখনো ভগবানের জপ-ধ্যান করে, কখনো সাংসারিক প্রাণীদের ভগবদ্‌জ্ঞানে সেবা করে আবার কখনো ভগবানের নির্দেশিত রীতিতে কর্ম করে সদাসর্বদা ভগবানের উপাসনাতে ব্যাপৃত থাকে। এইরূপ উপাসনাই হল বিধিসম্মত উপাসনা। এরূপ উপাসকদের চিত্তে বিনাশশীল বস্তু বা ক্রিয়ার প্রতি বিন্দুমাত্রও আকর্ষণ

বা গুরুত্ব থাকে না।

নবম প্রশ্নে অর্জুনের সংশয় ছিল যে ভক্ত ও জ্ঞানীদের মধ্যে অর্থাৎ সগুণ-সাকার উপাসক ও নির্গুণ-নিরাকারের উপাসকদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে ?

ভগবান উত্তরে বলেছেন যাঁরা তাঁর উপাসনা করেন তারাই শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ ভক্তই শ্রেষ্ঠ। পরে বলেছেন অবক্ত-অক্ষরের উপাসকগণও তাঁকে প্রাপ্ত হন, তবে দেহাভিমান থাকায় তাঁদের সাধনায় অধিক ক্লেশ হয়।

ভক্তপ্রসঙ্গ ভগবান **দ্বাদশ অধ্যায়ে** বর্ণনা করেছেন। তারপরে বলেছেন জীবের বন্ধন হয় দুই প্রকারে—প্রকৃতি দ্বারা ও প্রকৃতির কার্য গুণের দ্বারা। জ্ঞানী কীভাবে এই দুই বন্ধন থেকে মুক্ত হন তা তিনি **ত্রয়োদশ** ও **চতুর্দশ** অধ্যায়ে বর্ণনা করেছেন।

দ্বাদশ অধ্যায়ে ভগবান ভক্তপ্রসঙ্গ পাঁচটি প্রকরণে ভাগ করেছেন।

বিষয়	শ্লোক
সগুণোপাসক ভক্তই শ্রেষ্ঠ	২
নির্গুণোপাসক ভক্ত	৩-৫
ভক্তর প্রতি ভগবানের কৃপা	৬, ৭
ভক্তি সাধনার ক্রম	৮-১২
ভক্তর লক্ষণ	১৩-২০

সগুণোপাসক ভক্তই শ্রেষ্ঠ—(শ্লোক ২)

ময্যাবেশ্য মনো যে মাং নিত্যযুক্তা উপাসতে।
শ্রদ্ধয়া পরয়োপেতাস্তে মে যুক্ততমা মতাঃ।। (গীতা ১২।২)

'শ্রীভগবান বললেন—আমাতে মন নিবিষ্ট করে যে ভক্ত নিত্য-নিরন্তর আমাতে যুক্ত থাকেন এবং পরম শ্রদ্ধা সহকারে আমার উপাসনা করেন, আমার মতে তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ যোগী।'

ভগবান এই কথাটি আগেও ষষ্ঠ অধ্যায়ে বলেছেন—

যোগিনামপি সর্বেষাং মদ্‌গতেনান্তরাত্মনা।
শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতাঃ।। (গীতা ৬।৪৭)

'সকল যোগীর মধ্যে যিনি শ্রদ্ধাবান ও মদগতচিত্তে আমাকে নিরন্তর

ভজনা করেন, তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ যোগী।' ভগবানের এই সিদ্ধান্তটি কিন্তু অর্জুন সেখানে ঠিকমতো ধরতে পারেননি তাই এখানে আবার প্রশ্ন করেছেন।

ভগবান এখানে ভক্ত সম্বন্ধে দুটি পদ বলেছেন—

'নিত্যযুক্তাঃ' ও 'শ্রদ্ধয়া পরয়া উপাসতে'।

নিত্যযুক্তাঃ—কথাটির অর্থ হল সাধক নিজের আগ্রহেই ভগবানে আকৃষ্ট হয়। 'ভগবান আমার এবং আমি ভগবানের'—এই হল স্বয়ং ভগবানে আকৃষ্ট হওয়া। সাধক সাধারণত এই ভুল করেন যে তিনি স্বয়ং ভগবানে আকৃষ্ট না হয়ে নিজের মন-বুদ্ধিকে একাগ্র করে ভগবানে নিবিষ্ট করার অভ্যাস করেন। কিন্তু স্বয়ং (স্বরূপ) ভগবানে আকৃষ্ট না হলে মন-বুদ্ধি ভগবানে নিবিষ্ট করা কঠিন। মন-বুদ্ধি একাগ্র হলে সিদ্ধি ইত্যাদি লাভ হতে পারে কিন্তু প্রকৃত কল্যাণ কেবল স্বয়ং ভগবানে নিবিষ্ট হলেই হয়।

অন্যদিকে জীবের এই বিজাতীয় শরীর ও সংসারের সঙ্গে ভ্রমবশত মেনে নেওয়া সম্পর্ক এত দৃঢ় যে, এটি স্মরণ না করলেও সর্বদা স্মরণে থাকে। আর একমাত্র ভগবানের হয়েও জীব যত বেশি প্রকৃতি হতে সুখভোগ করতে চায়, ততই তার শরীর সম্পর্ক দৃঢ় আর তখন সে ভগবদ্সম্পর্ককে দৃঢ়তা সহকারে মানতে পারে না। কিন্তু যখন সে নিজ অংশী পরমাত্মার সঙ্গে নিজের প্রকৃত সম্পর্ক বুঝতে পারে তখন ওঠা-বসা, খাওয়া-দাওয়া, শোওয়া-জাগা —সবেতেই ভগবানের স্মরণ-চিন্তন স্বাভাবিকভাবে হতে থাকে।

শ্রদ্ধয়া পরয়া উপাসতে—সাধক যাঁকে সর্বশ্রেষ্ঠ মনে করেন তাঁকেই শ্রদ্ধা করেন। শ্রদ্ধা হলে অর্থাৎ বুদ্ধি দিয়ে বুঝতে পারলে তিনি নিজে নিশ্চিত হয়ে তাঁর সিদ্ধান্ত অনুসারে নিজ জীবন তৈরি করেন এবং কখনো সিদ্ধান্ত হতে বিচলিত হন না। আর শ্রদ্ধার অতি পরিপক্ব অবস্থায় প্রেম জাগে। যেখানে প্রেম হয়, সেখানে মন আকৃষ্ট হয় আর যেখানে শ্রদ্ধা হয় সেখানে বুদ্ধি আকৃষ্ট হয়। প্রেমে প্রেমাস্পদের সঙ্গ আর শ্রদ্ধায় আনুগত্যের প্রাধান্য থাকে। ভগবানে প্রেম হলে ভক্তের সঙ্গে ভগবানের সর্বদা অভিন্ন সম্পর্ক অনুভূত হয়, কখনো বিচ্ছেদ অনুভূত হয় না।

জ্ঞান ও ভক্তি—এ দুইই জাগতিক দুঃখ দূর করতে সক্ষম কিন্তু এদের মধ্যে জ্ঞানের থেকে ভক্তির মাহাত্ম্যই বেশি। জ্ঞানে অখণ্ডরস প্রাপ্তি হয় কিন্তু ভক্তিতে অনন্তরস প্রাপ্তি, যা প্রতিমুহূর্তে বর্ধমান। ভগবানের জ্ঞানের ক্ষুধা নেই কিন্তু প্রেমের ক্ষুধা আছে। তিনি শুধু প্রেমেরই পিয়াসী। প্রেমকে অনুভব করেন স্বয়ং ভগবান। তাই অন্তিম তত্ত্ব হল প্রেম, মুক্তি নয়। ভক্ত একমাত্র ঈশ্বর ব্যতীত অন্য কোনো পৃথক অস্তিত্বকে মানেন না তাই ভক্ত ক্রমেই ঈশ্বরের সঙ্গে অভিন্নতা অনুভব করেন। আর ঈশ্বরের সঙ্গে অভিন্নতা হলেই প্রেমের উদয় হয় আর তখন সূক্ষ্ম-অহম্ এবং তার থেকে উৎপন্ন সর্ব দার্শনিক মতভেদও দূর হয়। তাঁর দ্বৈত, অদ্বৈত, দ্বৈতাদ্বৈত, শুদ্ধাদ্বৈত আদি সর্বপ্রকার মতভেদও দূর হয় এবং তিনি **'বাসুদেবঃ সর্বম্'** হয়ে ওঠেন। তাৎপর্য হল জ্ঞানের ঐক্য থেকে প্রেমের ঐক্য শ্রেষ্ঠ। ভগবান তৃতীয় অধ্যায়ে বলেছেন—

লোকেঽস্মিন্ দ্বিবিধা নিষ্ঠা পুরা প্রোক্তা ময়ানঘ।
জ্ঞানযোগেন সাংখ্যানাং কর্মযোগেন যোগিনাম্॥ (গীতা ৩।৩)

'এই জগতে দুই প্রকার নিষ্ঠা আছে একটি জ্ঞানযোগ ও অন্যটি কর্মযোগ, আর উভয়েই লৌকিক।' অর্থাৎ উভয় যোগেই সাধন হল জীবের লৌকিক জগৎ থেকে বন্ধন ছিন্ন করা। আর ভক্তিযোগ হল অলৌকিক নিষ্ঠা যার সাধন উপলক্ষ্য জগৎ-সংসার নয় তা ভগবানই এবং তা সাধককে ভগবানের সঙ্গে যুক্ত করে। তাঁর (ভক্তের) সাধন ও সাধ্য দুই-ই হয় ভগবান। তাই নব যোগীন্দ্রর অন্যতম 'প্রবুদ্ধ' নিমিরাজকে বলছেন **'ভক্ত্যা সঞ্জাতয়া ভক্ত্যা'** (ভাগবত ১১।৩।৩১) অর্থাৎ সাধন ভক্তি থেকে ক্রমে প্রেম ভক্তি উৎপন্ন হয়।

শ্রবণং কীর্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্।
অর্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্॥ (ভাগবত ৭।৫।২৩)

সাধন ভক্তি হল নয়টি—শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ, পাদসেবনং, অর্চনং, বন্দনং, দাস্য, সখ্য ও আত্মনিবেদন। আর তার থেকে শ্রেষ্ঠ হয় 'প্রেম লক্ষণা ভক্তি' যা সবারই সাধ্য। জ্ঞানযোগে সাধক সৎ-অসতের বিবেককে

গুরুত্ব দিয়ে, অসৎকে পরিত্যাগ করেন। কর্মযোগে সাধক অসৎকে (সাংসারিক বস্তু ও ক্রিয়াসকলকে) অন্যের সেবায় লাগিয়ে অসৎকে পরিত্যাগ করেন। কিন্তু ভক্তিযোগে সাধক জগৎকেই ভগবৎস্বরূপ মানায় অসৎ অতি শীঘ্রই এবং সহজেই পরিত্যক্ত হয়। তাই ভগবান আগে বলেছেন—'তয়োস্তু কর্মসন্ন্যাসাৎ কর্মযোগো বিশিষ্যতে' (গীতা ৫।২) জ্ঞানযোগ থেকে কর্মযোগ শ্রেষ্ঠ।

আবার এখানে বলেছেন—

যোগিনামপি সর্বেষাং মদগতেনান্তরাত্মনা।
শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্তোতমো মতঃ॥ (গীতা ৬।৪৭)

অর্থাৎ কর্মযোগ থেকে ভক্তিযোগ শ্রেষ্ঠ।

একাদশ অধ্যায়ের চুয়ান্নতম শ্লোকেও ভগবান বলেছেন—

ভক্ত্যা ত্বনন্যয়া শক্য অহমেবংবিধোঽর্জুন।
জ্ঞাতুং দ্রষ্টুঞ্চতত্ত্বেন প্রবেষ্টুঞ্চ পরন্তপ॥ (গীতা ১১।৫৪)

'হে অর্জুন ! অনন্যা ভক্তিদ্বারা আমাকে প্রত্যক্ষরূপে দেখা, স্বরূপত জানা ও প্রাপ্ত হওয়া সম্ভবপর হয়।'

আবার অষ্টাদশ অধ্যায়ে নির্গুণ জ্ঞানযোগীদের সম্পর্কে ভগবান বলেছেন—**ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চামি তত্ত্বতঃ।**
ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাতা বিশতে তদনন্তরম্॥ (গীতা ১৮।৫৫)

'নির্গুণ ব্রহ্মে একাত্ম জ্ঞানযোগী তত্ত্বতঃ তাঁকে জানতে পারেন এবং তাঁর মধ্যে বিলীন হতে পারেন বা প্রাপ্ত হন।' কিন্তু এক্ষেত্রে জ্ঞানযোগীদের তাঁকে দর্শন দানের কথা বলা হয়নি।

নির্গুণোপাসক ভক্ত—(শ্লোক ৩-৫)

যে ত্বক্ষরমনির্দেশ্যমব্যক্তং পর্যুপাসতে।
সর্বত্রগমচিন্ত্যঞ্চ কূটস্থমচলং ধ্রুবম্॥
সংনিয়ম্যেন্দ্রিয়গ্রামং সর্বত্র সমবুদ্ধয়ঃ।
তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব সর্বভূতহিতে রতাঃ॥
ক্লেশোঽধিকতরস্তেষামব্যক্তাসক্তচেতসাম্ ।

অব্যক্তা হি গতির্দুঃখং দেহবদ্ভিরবাপ্যতে॥

(গীতা ১২।৩-৫)

'যাঁরা নিজ ইন্দ্রিয় সম্পূর্ণরূপে বশীভূত করে অচিন্ত, সর্বত্র পূর্ণভাবে অবস্থিত, অনির্দেশ্য, কূটস্থ, অচল, ধ্রুব, অক্ষর এবং অব্যক্তের একাগ্র উপাসনা করেন, আর হন প্রাণীমাত্রেরই হিতপরায়ণ এবং সর্বত্র সমবুদ্ধিসম্পন্ন সেই ব্যক্তিগণ আমাকেই প্রাপ্ত হন।

কিন্তু অব্যক্তে (নির্গুণ ব্রহ্মে) আসক্তচিত্ত সাধকদের, নিজ নিজ সাধনে অধিক ক্লেশ হয়ে থাকে তাই দেহধারী ব্যক্তিদের অব্যক্তের প্রাপ্তি কষ্টসাধ্য হয়।' (গীতা ১২।৩-৫)

পরমাত্মতত্ত্ব বোঝাতে গিয়ে ভগবান এই প্রকরণের প্রথম দুটি শ্লোকে তাঁর পাঁচটি নিষেধাত্মক, তিনটি বিধ্যাত্মক ও জ্ঞানী সাধকের তিনটি গুণের কথা বর্ণনা করেছেন। পরমাত্মার অক্ষর, অনির্দেশ্য, অব্যক্ত, অচিন্ত্য, অচল আদি গুণগুলি হল নিষেধাত্মক বিশেষণ যা তাঁর সঙ্গে প্রকৃতির অসঙ্গতা জ্ঞাপন করে। আর অন্য তিনটি বিশেষণ বিধ্যাত্মক যথা তিনি সর্বব্যাপী, কূটস্থ এবং ধ্রুব তা তাঁর স্বতন্ত্র জ্ঞাপন করে। জ্ঞানী সাধক তাঁদের তিনটি সাধনালব্ধ গুণ **'সন্নিয়ম্যেন্দ্রিয়গ্রামম্'**, **'সমবুদ্ধয়ঃ'** ও **'সর্বভূতহিতে রতাঃ'** হয়ে পরমাত্মায় নিষেধাত্মক ও বিধ্যাত্মক বিশেষণ হৃদয়ে ধারণপূর্বক উপাসনা করে (পর্যুপাসতে), তাঁকেই প্রাপ্ত হন—**'তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব'**।

নিষেধাত্মক—

অক্ষরম্—যাঁর কখনো ক্ষরণ বা বিনাশ হয় না এবং যাঁর মধ্যে কখনো কোনো অনস্তিত্ব পরিলক্ষিত হয় না, সেই সচ্চিদানন্দঘন ব্রহ্ম হলেন 'অক্ষরম্'।

অনির্দেশ্যম্— যাঁকে বাক্যের দ্বারা প্রকাশ করা যায় না অর্থাৎ তিনি ভাষা, বাণী ইত্যাদির বিষয় নন।

অব্যক্তম্—যিনি ব্যক্ত নন অর্থাৎ মন-বুদ্ধি-ইন্দ্রিয়র গম্য বিষয় নন এবং যাঁকে রূপ বা আকার দিয়ে ধরা যায় না।

অচিন্ত্যম্— প্রাকৃতিক পদার্থমাত্রেই 'চিন্ত্য' অর্থাৎ মন, বুদ্ধি ইত্যাদির

অধিগত হওয়ার বিষয়। কিন্তু পরমাত্মা প্রকৃতিরও অতীত হওয়ায় 'চিন্ত্য' নন। পরমাত্মাকে কেবল স্বয়ং (করণ-নিরপেক্ষ জ্ঞান) দ্বারা জানা সম্ভব, প্রকৃতির কার্য মন, বুদ্ধি (করণ সাপেক্ষ জ্ঞান) দ্বারা নয়।[১]

অচলম্—এই পদটি সর্বতোভাবে ক্রিয়াবর্জিত ব্রহ্মের বাচক। প্রকৃতি সচল এবং ব্রহ্ম অ-চলমান।

বিধ্যাত্মক—

সর্বত্রগম্—সমস্ত দেশ, কাল, বস্তু এবং ব্যক্তিতে পরিপূর্ণভাবে থাকায় ব্রহ্ম 'সর্বত্রগম্'। ব্যাপ্তিস্বরূপ হওয়ায় তাঁকে সীমিত মন-বুদ্ধি-ইন্দ্রিয়াদির দ্বারা গ্রহণ করা যায় না।

কূটস্থম্—এই পদটি নির্বিকার এবং সর্বদা একরসে অবস্থিত সচ্চিদানন্দঘন ব্রহ্মের বাচক। সমস্ত দেশ কাল, বস্তু, ব্যক্তি ইত্যাদিতে অবস্থান করলেও তিনি স্বরূপত নির্বিকার ও নির্লিপ্ত। তাঁর কখনো বিন্দুমাত্র পরিবর্তন হয় না—তাই তিনি 'কূটস্থ'। 'কূট'এর ওপর রেখে বিভিন্ন গহনা, অস্ত্রশস্ত্র বা জিনিসপত্র তৈরি করা হলেও সেটি যেমন-তেমনই থাকে, তেমনি জগৎ ও তাতে প্রাণী-পদার্থর উৎপত্তি, স্থিতি ও বিনাশ হতে থাকলেও পরমাত্মা সর্বদা একপ্রকার থাকেন।

ধ্রুবম্—যাঁর অস্তিত্ব নিশ্চিত (সত্য) এবং নিত্য, তাকেই বলে 'ধ্রুব'। সচ্চিদানন্দঘন ব্রহ্ম সত্তারূপে সর্বত্র বিদ্যমান হওয়ায় তাঁকে 'ধ্রুব' বলা হয়। জ্ঞানী সাধক তাঁর উন্নত সাধনালব্ধ গুণ দ্বারা পরমাত্মার উপরিউক্ত বিভূতির মনন করে তাকে প্রাপ্ত হন। সাধকের উপলব্ধি কী ?

জ্ঞানীর লক্ষণ—

সন্নিয়ম্যেন্দ্রিয়গ্রামম্—জ্ঞানী সাধক হবেন 'সন্নিয়ম্য ইন্দ্রিয়' অর্থাৎ তাঁর সমস্ত ইন্দ্রিয় হবে সম্যক্‌ভাবে ও সম্পূর্ণরূপে বশীভূত, যাতে এগুলি অন্য কোনো বিষয়ের দিকে ধাবিত না হতে পারে। সগুণ-উপাসনাতে ইন্দ্রিয়-সংযমের প্রয়োজনীয়তা থাকলেও তত বেশি থাকে না, যত থাকে নির্গুণ উপাসনাতে। নির্গুণ উপাসনাতে ধ্যান করার কোনো আধার না

[১]প্রকৃতিভ্য পরা যো স অচিন্ত্যস্য লক্ষণম্।

থাকায় ইন্দ্রিয়গুলোর সম্পূর্ণ সংযম না থাকলে (অর্থাৎ আসক্তি থাকলে) বিষয়ের দিকে মন চলে যেতে পারে এবং বিষয়চিন্তা থাকলে পতনও হতে পারে।

সর্বত্র সমবুদ্ধয়ঃ—নির্গুণ-নিরাকার সাধকদের দৃষ্টি ব্রহ্মের উপর থাকায় প্রাণী ও পদার্থে বৈষম্য আসে না, কারণ পরমাত্মা হলেন সম। ভগবান তাই পঞ্চম অধ্যায়ে বলেছেন—

ইহৈব তৈর্জিতঃ সর্গো যেষাং সাম্যে স্থিতং মনঃ।
নির্দোষং হি সমং ব্রহ্ম তস্মাদ্ব্রহ্মণি তে স্থিতাঃ।। (গীতা ৫।১৯)

যাঁদের মন সম-ভাবে স্থিত, তাঁরা জীবিত অবস্থাতেই এই জগৎ-সংসার জয় করেছেন, কারণ সচ্চিদানন্দঘন পরমাত্মা নির্দোষ ও সম—তাই তাঁরা সেই পরমাত্মাতেই অবস্থান করেন।

সিদ্ধমহাপুরুষদের দৃষ্টিতে একমাত্র পরমাত্মা ছাড়া অন্য কোনো অস্তিত্ব না থাকায় তাঁরা সর্বত্র ও সর্বদা সমদৃষ্টি হয়ে থাকেন। সিদ্ধমহাপুরুষদের এই স্বাভাবিক স্থিতি সাধকদের পক্ষে আদর্শ এবং তারা এই লক্ষ রেখেই অগ্রসর হন। সাধক তাঁর বুদ্ধির দ্বারা সর্বত্র পরমাত্মাকে দেখার চেষ্টা করেন কিন্তু সিদ্ধমহাপুরুষদের বুদ্ধিতে পরমাত্মা এত নিবিড়ভাবে থাকেন যে তাঁদের কাছে পরমাত্মা ভিন্ন আর কিছু থাকে না। তাই পরমাত্মা তাঁদের বুদ্ধির বিষয় নন, প্রত্যুত তাঁদের বুদ্ধি পরমাত্মা দ্বারাই তৎরূপ হয়ে আছে, তাই তাঁরা 'সর্বত্র সমবুদ্ধয়ঃ'। তিনি **'আত্মৌপম্যেন সর্বত্র সমং পশ্যতি যোঽর্জুন'** (গীতা ৬।৩২) অর্থাৎ সর্ব প্রাণীকে নিজ শরীরের মতো আপন করে নেন।

সর্বভূতহিতে রতাঃ—কর্মযোগের সাধনায় আসক্তি মমত্ববোধ, কামনা, স্বার্থ ত্যাগের প্রাধান্য থাকে। মানুষ যখন শরীর, অর্থ, সম্পত্তি ইত্যাদি পদার্থকে 'নিজের' এবং 'নিজের জন্য' মনে না করে অপরের সেবায় নিয়োজিত করেন তখন তাঁর আসক্তি, কামনা, মমত্ববোধ, স্বার্থভাব আপনই দূর হয়ে যায়। সাধকদের প্রথম থেকে লক্ষ্য রাখতে হয় যে, যে পদার্থ সেবায় নিয়োগ করা হচ্ছে সেটা সেব্যেরই। সুতরাং কর্মযোগের সাধনায় সমস্ত প্রাণীদের হিতে নিরত থাকা অত্যন্ত প্রয়োজন। সুতরাং **'সর্বভূতহিতে রতাঃ'**

পদটির প্রয়োগ কর্মযোগের আচরণকারীদের সম্বন্ধেই বেশি যুক্তিযুক্ত। কিন্তু ভগবান এখানেও বলেছেন, আর আগেও পঞ্চম অধ্যায়ে জ্ঞানযোগীদের সম্বন্ধে '**সর্বভুতহিতে রতাঃ**' বলেছেন।

লভন্তে ব্রহ্মনির্বাণমৃষয়ঃ ক্ষীণকল্মষাঃ।
ছিন্নদ্বৈধা যতাত্মনঃ সর্বভুতহিতে রতাঃ॥ (গীতা ৫।২৫)

যাঁর সমস্ত পাপ দূর হয়েছে, সমস্ত সংশয় জ্ঞান দ্বারা ছিন্ন হয়েছে, যিনি সর্বভূতহিতে রত, সংযত চিত্ত সেই যোগী নির্বাণ ব্রহ্ম লাভ করেন।

এর দ্বারা প্রমাণিত যে নির্গুণ-এর উপাসনাকারী সাধকদেরও সকল প্রাণীদের হিতে এবং তাদের প্রতি ভালবাসা থাকা প্রয়োজন—তাহলেই আসক্তি দূর হয়ে জ্ঞাননিষ্ঠা সিদ্ধ হতে পারে। জ্ঞানযোগী সাধক প্রায়শই সমাজ থেকে দূরে একাকী বসবাস করেন। তাই তাঁদের মধ্যে ব্যক্তিভাব (অহং) থেকে যায়, যা দূর করার জন্য সংসারের হিত কামনা রাখা অত্যন্ত প্রয়োজন। শুধুমাত্র অপরকে কিছু দেওয়া বা নিজ শরীর দ্বারা সেবা করাকেই সেবা বলে না, নিজের জন্য কিছু আশা না করে অন্যের কিসে মঙ্গল হবে, তারা কিসে সুখ পাবে—এই ভাব নিয়ে কর্ম করাকেই সেবা বলে। 'আমি সেবক'—এই ভাবও মনে রাখা উচিত নয়। সেবা তখনই সার্থক যখন সেবক যার সেবা করেন তার সঙ্গে নিজেকে অভিন্ন ভাবেন (নিজ শরীরের মতোই) এবং পরিবর্তে কিছু আশা না করেন। একটি কথা বিশেষভাবে মনে রাখা প্রয়োজন যে শরীর-পদার্থ এবং ক্রিয়া দ্বারা যে সেবা করা হয় তা সীমিত হয়। কিন্তু সেবাভাব নিয়ে প্রাণীমাত্রেরই যে হিত করার ভাব তা অসীম হওয়ায় সেই সেবাই অসীম হয়। আর অসীম পরমাত্মা প্রাপ্তির জন্য এই অসীম ভাবেরই অত্যন্ত প্রয়োজন এবং '**সর্বভূতহিতে রতাঃ**' পদটি সেই ভাবকেই প্রকাশ করে।

জগৎ-জীব-পরমাত্মা—এই তিনের দৃষ্টিতেই আমরা সব এক। অপরা প্রকৃতির অন্তর্গত হওয়ায় সমস্ত শরীরই এক, পরা প্রকৃতির অন্তর্গত হওয়ায় সমস্ত জীবও এক এবং এসবই পরমাত্মা থেকে সৃষ্ট হওয়ায় তিনিও এক।

ভগবান ব্রহ্মর যে লক্ষণগুলি এখানে বলেছেন (অক্ষর, অব্যক্ত,

অচিন্ত্য, কূটস্থ, অচলং ইত্যাদি) সেইগুলি জীবাত্মার লক্ষণরূপে অন্যত্রও জানিয়েছেন। যেমন— অক্ষর (১৫।১৬,১৮), অব্যক্ত (২।২৫), অচিন্ত্য (২।২৫), কূটস্থ (১৫।১৬), অচলং (২।২৪)। এর অর্থ হল জীব ও ব্রহ্ম স্বরূপত একই কিন্তু শরীরের সঙ্গে সম্পর্কিত হওয়ায় তাঁকে জীব বলা হয়, আবার তিনিই দেহের সঙ্গে সম্পর্কবর্জিত হলে ব্রহ্ম বলা হয়। জীব শুধু দেহের উপাধিতে, দেহাভিমানের জন্যই পৃথক তা না হলে সে ব্রহ্মই।

এই প্রকরণের শেষ অর্থাৎ পঞ্চম শ্লোকের দুটি পদে ভগবান বলছেন যে জ্ঞানমার্গে এত সাধনা করলেও দেহাভিমানবশত জ্ঞানযোগীর অব্যক্ত প্রাপ্তি অতি কষ্টে লাভ হয়। পদ দুটি হল—**'ক্লেশোঽধিকতর স্তেষাব্যক্তাসক্ত-চেতসাম্'** এবং **'অব্যক্তা হি গতির্দুঃখং দেহবদ্ভিরবাপ্যতে'**। এখানে সেইসকল সাধকদের **'অব্যক্ত আসক্ত চেতসাম্'** বলা হয়েছে যাঁরা অব্যক্তে আবিষ্ট নন। এইসব সাধকদের আসক্তি থাকে দেহে প্রতি কিন্তু তারা অব্যক্তের মহিমা শুনে এবং নির্গুণ উপাসনাই শ্রেষ্ঠ বলে মনে করে তাতে আসক্ত হন। শ্লোকের পরের অংশে এই নির্গুণ সাধনাকারীদের **'দেহবদ্ভি'** অর্থাৎ দেহাভিমানী বলা হয়েছে আর সেইসব মানুষই হল দেহভিমানী যাদের দেহের সঙ্গে দৃঢ় সম্পর্ক আছে।

নির্গুণ সাধনায় দেহাভিমানই প্রধান বাধা—

'দেহাভিমানিনি সর্বে দোষাঃ প্রাদুর্ভবন্তি' অর্থাৎ চিত্ত দেহাভিমানী হলে তার হৃদয়ে সর্বদোষের প্রাদুর্ভাব হয়। আর এই দেহাভিমান দূর করার জন্যই ভগবান অর্জুনের অন্য কোনো প্রশ্ন ব্যতীতই ত্রয়োদশ অধ্যায়ে 'ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ বিভাগ যোগে' **প্রকৃতির বন্ধন** এবং চতুর্দশ অধ্যায়ে 'গুণত্রয় বিভাগ যোগে' **প্রকৃতির গুণত্রয়র বন্ধন** থেকে মুক্ত হওয়ার কথা বলেছেন।

ভক্তের প্রতি ভগবানের কৃপা—(শ্লোক ৬,৭)

ভগবান পরের দুই শ্লোকে ভক্তের লক্ষণ ও তাঁদের ওপর ভগবৎ কৃপা বর্ণনা করেছেন।

যে তু সর্বাণি কর্মাণি ময়ি সন্ন্যস্য মৎপরাঃ।
অনন্যেনৈব যোগেন মাং ধ্যায়ন্ত উপাসতে॥

তেষামহং সমুদ্ধর্তা মৃত্যুসংসারসাগরাৎ।
ভবামি নচিরাৎ পার্থ ময্যাবেশিতচেতসাম্॥

(গীতা ১২।৬-৭)

'যাঁরা সমস্ত কর্ম আমাতে অর্পণ করে, মৎ-পরায়ণ হয়ে অনন্যভাবে আমারই ধ্যান করতে করতে উপাসনা করে—

সেইসব সমর্পিত চিত্ত ভক্তদের আমি মৃত্যুরূপ-সংসার-সাগর থেকে অতি শীঘ্র মুক্ত করি বা উদ্ধার করি।' (গীতা ১২।৬-৭)

ভগবান তাঁর ভক্তকে বলেছেন **'অনন্যেন যোগেন'**, **'মৎপর'** এবং **'ময্যাবেশিতচেতসাম্'** আর জগৎকে বলেছেন **'মৃত্যুসংসার-সাগরাৎ'**। আর তাঁর কৃপা হল **'তেষামহং সমুদ্ধর্তা'**।

অনন্যেন যোগেন—সাধকের যদি ভগবৎপ্রাপ্তি করাই উদ্দেশ্য হয়, তাহলে তার অন্য বস্তুর আকাঙ্ক্ষা থাকে না। নিজেকে ভগবানের বলে মনে করায় তার সকল মমতা দেহের থেকে দূর হয়ে স্বয়ং ভগবানেই অর্পিত হওয়ায় তার সকল কর্মই ভগবদর্পিত হয়। তখন **'মেরে তো গোপাল, দুসরো না কোঈ'**—গোপাল ছাড়া তার আর কোনো সম্বন্ধও থাকে না, আশ্রয়ও থাকে না।

মৎপরাঃ—মৎপরায়ণ হওয়ার অর্থ—ভগবানকে পরমসাধ্য এবং সর্বশ্রেষ্ঠ বলে জেনে তাঁর প্রতি সমর্পিত ভাবে থাকা। সর্বতোভাবে ভগবদ্‌পরায়ণ হলে সগুণ-উপাসক নিজেকে ভগবানের যন্ত্র বলে মনে করেন। তাই তাঁর শুভকর্মগুলি তিনি ভগবানের দ্বারা কৃত বলে মনে করেন এবং সংসারের প্রতি আসক্তি না থাকায় তাঁর ভোগাকাঙ্ক্ষা থাকে না আর ভোগাকাঙ্ক্ষা না থাকায় তাঁর দ্বারা কোনো অশুভ ক্রিয়া হয়ই না।

ময্যাবেশিতচেতসাম্—যে সাধকদের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, ধ্যেয় একমাত্র ভগবান এবং যাঁরা ভগবানেই অনন্য প্রেমপূর্বক চিত্ত সমর্পণ করেছেন এবং যারা নিজেরাই ভগবানে সমর্পিত হয়েছেন, তাঁদের উদ্দেশ্যেই ভগবান এখানে **'ময্যাবেশিতচেতসাম্'** পদটি ব্যবহার করেছেন। আগের প্রকরণে ভগবান দেহাভিমানবশত জ্ঞানমার্গের সাধকগণের সম্বন্ধে

বলেছেন—**'অব্যক্তাসক্তচেতসাম্'** (গীতা ১২।৫) অর্থাৎ অব্যক্তে আসক্ত, আবিষ্ট নয়, আর এই প্রকরণে ভক্তের সম্বন্ধে বলছেন **'ময্যাবেশিতচেতসাম্'** অর্থাৎ ভক্তরা ভগবানে আবিষ্ট হয়। সাংখ্য সাধনার পথে বিবেক-বিচার হল প্রধান, ভক্তিতে বিশ্বাসই হল প্রধান। জ্ঞানে অপরা প্রকৃতি পরিত্যাজ্য আর ভক্তিতে তাই ভগবদ্‌স্বরূপ।

মৃত্যুসংসার-সাগরাৎ—সমুদ্রে যেমন জল আর জল, তেমনি জগতে কেবল মৃত্যু আর মৃত্যু। জগতে উদ্ভূত এমন কোনো বস্তু নেই, যা ক্ষণকালের জন্যও মৃত্যুর আঘাত থেকে বেঁচে থাকতে পারে। অর্থাৎ উৎপন্ন হওয়া প্রতিটি বস্তুই প্রতিমুহূর্তে মৃত্যুর দিকে অগ্রসর হচ্ছে, তাই জগৎকে মৃত্যু-সংসার-সাগর বলা হয়েছে।

তেষামহং সমুদ্ধর্তা—ভগবান পূর্বে জ্ঞানী সাধকদের সম্বন্ধে বলেছেন **'উদ্ধরেদাত্মনাত্মানাম্'** (গীতা ৬।৫) অর্থাৎ নিজেদের নিজে উদ্ধার করার কথা আর এখানে অনন্য ভক্তদের সম্বন্ধে বলছেন **'তেষামহং সমুদ্ধর্তা'**। এর তাৎপর্য হল সাধনকারীদের মধ্যে যে সাধক ভগবানের শরণাগত হন, ভগবান তাঁকে উদ্ধার করেন। ভক্ত নিজের উদ্ধারের কথা মনে না এনে ভগবানের সাধন-ভজনেই ব্যাপৃত থাকেন তাই তাঁর সাধন ও সাধ্য ভগবানই হয়ে থাকেন এবং ভগবান তাঁকে উদ্ধার করেন। কিন্তু যাঁরা জ্ঞানমার্গের সাধক তাঁরা নিজেদের উদ্ধারের জন্য নিজেরাই ব্যাপৃত থাকেন তাই তাদের সাধনের সময় পতনেরও আশঙ্কা থাকে।

ভক্তি সাধনার ক্রম—(শ্লোক ৮-১২)

এই প্রকরণে ভগবান মানুষের কল্যাণের জন্য চারপ্রকার সাধন প্রণালীর বর্ণনা করেছেন—

(১) সমর্পণযোগ (২) অভ্যাসযোগ (৩) ভগবানের প্রীত্যর্থে সমস্ত কর্ম অনুষ্ঠান এবং (৪) সর্বকর্মফলত্যাগ।

প্রকৃতপক্ষে চারটি সাধন-প্রণালীই স্বয়ংসম্পূর্ণ ও শ্রেষ্ঠ। তাই সাধক যেটিকেই গ্রহণ করবেন, সেই সাধনটিকে তাঁর সর্বোত্তম বলে মেনে নেওয়া উচিত। নিজের আলম্বিত সাধনাকে কখনোই গৌণ বলে মনে করা উচিত নয়

এবং সাধনার সাফল্যে (ভগবদ্প্রাপ্তির) বিষয়ে কখনোই সংশয় থাকা উচিত নয়। সাধকের যদি একমাত্র উদ্দেশ্য থাকে ভগবদ্প্রাপ্তি এবং যদি তাঁর সাধনা তাঁর রুচি, বিশ্বাস এবং যোগ্যতা অনুযায়ী হয় এবং তা পূর্ণ উদ্যমে তৎপরতার সঙ্গে করা হয় তাহলে সকল সাধনাই সমান হয়ে থাকে। সাধক যদি নিজ উদ্দেশ্য, ভাব, চেষ্টা, তৎপরতা, উৎকণ্ঠা ইত্যাদিতে ত্রুটি না রাখেন তাহলে ভগবান স্বয়ং নিজেকে সাধকের সম্মুখে প্রকাশিত করেন। ভগবানের প্রাপ্তিতে, বৈরাগ্য এবং তাঁকে পাওয়ার আগ্রহ দুটিই প্রধান। এই দুটির মধ্যে একটি তীব্রতর হলেই ভগবদ্প্রাপ্তি হয়ে থাকে। তাহলেও ভগবদ্প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষাতে বিশেষ শক্তি আছে। যে চারটি সাধনের কথা আলোচিত হয়েছে তাঁর প্রথম তিনটি ভগবদ্প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা জাগ্রতকারী এবং চতুর্থ সাধনটি (কর্মফল ত্যাগ) প্রধানত সংসার থেকে সম্বন্ধ-বিচ্ছেদকারী (বৈরাগ্যকারী)।

মষ্যেব মন আধৎস্ব ময়ি বুদ্ধিং নিবেশয়।
নিবসিষ্যসি মষ্যেব অত উর্ধ্বং ন সংশয়ঃ॥
অথ চিত্তং সমাধাতুং ন শক্নোষি ময়ি স্থিরম্।
অভ্যাসযোগেন ততো মামিচ্ছাপ্তুং ধনঞ্জয়॥
অভ্যাসেঽপ্যসমর্থোঽসি মৎকর্মপরমো ভব।
মদর্থমপি কর্মাণি কুর্বন্ সিদ্ধিমবাপ্স্যসি॥
অথৈতদপ্যশক্তোঽসি কর্তুং মদ্‌যোগমাশ্রিতঃ।
সর্বকর্মফলত্যাগং ততঃ কুরু যতাত্মবান্॥
শ্রেয়ো হি জ্ঞানমভ্যাসাজ্ জ্ঞানাদ্ধ্যানং বিশিষ্যতে।
ধ্যানাৎ কর্মফলত্যাগস্ত্যাগাচ্ছান্তিরনন্তরম্॥

গীতা (১২।৮-১২)

'ভগবান বলছেন—তুমি আমাতে মন নিবিষ্ট কর এবং আমাতেই বুদ্ধি নিয়োগ কর ; তাহলে তুমি আমাতেই বাস করবে (স্থিতিলাভ করবে) এতে সন্দেহ নেই।

যদি চিত্ত আমাতে অচল করতে (অর্পণ করতে) সক্ষম না হও, তাহলে

হে ধনঞ্জয় ! অভ্যাসযোগের সাহায্যে আমাকে পাবার চেষ্টা কর।

যদি তুমি অভ্যাসযোগেও অসমর্থ হও তবে আমার জন্য কর্মপরায়ণ হও। আমার জন্য কর্ম করতে থাকলেও তুমি সিদ্ধিলাভ করবে।

যদি তুমি আমার যোগের (সমত্বর) আশ্রিত থেকে পূর্বোক্ত কোনো সাধনগুলি করতেও অসমর্থ হও তাহলে ইন্দ্রিয় ও মনকে সংযত করে সমস্ত কর্মফলের ইচ্ছা ত্যাগ করো।

অভ্যাসের থেকে শাস্ত্রজ্ঞান শ্রেষ্ঠ, শাস্ত্রজ্ঞান থেকে ধ্যান শ্রেষ্ঠ, এবং ধ্যানের থেকে সমস্ত কর্মফল ত্যাগ শ্রেষ্ঠ আর কর্মফলত্যাগে অচিরাৎ শান্তি পাওয়া যায়।' (গীতা ১২।৮-১২)

১) **সমর্পণযোগ**—ভগবানকে পাওয়ার সাধনায় ভগবান প্রথমেই বলেছেন মন-বুদ্ধি সমর্পণের কথা।

শ্লোকের প্রথমার্ধে বলেছেন—'**ময্যেব মন আধৎস্ব ময়ি বুদ্ধিং নিবেশয়**'। ভগবানের মতে সেই ব্যক্তিই উত্তম যোগবেত্তা যার ভগবানের সঙ্গে নিত্য যোগ অনুস্যূত হয়েছে। মন-বুদ্ধি ভগবানে নিবিষ্ট না হলে ভগবানের সঙ্গে স্বাভাবিক নিত্য সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয় না। মন-বুদ্ধি ভগবানে নিবিষ্ট করার অর্থ হল যে, যে মন দ্বারা জড় সংসারে মমত্ববোধ, আসক্তি, সুখভোগের আকাঙ্ক্ষার চিন্তা হয় এবং যে বুদ্ধির দ্বারা সংসারের ভাল-মন্দর চিন্তা হতে থাকে ; সেই মন-বুদ্ধিকে সংসার থেকে সরিয়ে দৃঢ়তার সঙ্গে চিন্তা করা যে 'আমি শুধুমাত্র ভগবানেরই এবং ভগবানই কেবল আমার'। মন-বুদ্ধি নিবিষ্ট করার মধ্যে বুদ্ধি নিবিষ্ট করাই হল মুখ্য ব্যাপার। কোনো ব্যাপার আগে বুদ্ধিই স্থির করে পরে বুদ্ধির স্থিরতা মন মেনে নেয়। সাধন করার সময়েও উদ্দেশ্য প্রস্তুত করতে বুদ্ধিরই প্রাধান্য থাকে, মনের প্রাধান্য পরে হয়। যাদের ভগবদ্প্রাপ্তির উদ্দেশ্য থাকে না, তারা যদি মন-বুদ্ধি অন্য বিষয়ে নিবিষ্ট করে তবে তারা সেই সব বিষয়ে সিদ্ধিলাভ করলেও ভগবদ্প্রাপ্তি উদ্দেশ্য না থাকায় ভগবদ্প্রাপ্তি হয় না। তাই সাধকের উচিত বুদ্ধির দ্বারা দৃঢ় নিশ্চিত হওয়া যে 'আমাকে ভগবদ্প্রাপ্তি করতেই হবে'। অবশ্য সাধকের দৃষ্টিতে এই দৃঢ়নিশ্চয়তা বুদ্ধিতে হয় বলে প্রতীত হলেও

প্রকৃতপক্ষে তা নয়। সম্বন্ধের এই নিশ্চয়তা 'আমি' বা 'অহং' ভাব বর্তমান থাকে। তাই ভগবান এখানে তাঁর উপর এই নির্ভরতা বুদ্ধি দ্বারা নয়, স্বয়ং দ্বারাই করতে বলেছেন যা নিত্যই ভগবানেই স্থিত। অহংভাবেরও প্রকাশ ও আধার হল এই স্বয়ং চেতন ও নিত্য। বিনাশশীল সংসারের সঙ্গে স্বয়ং-এর কোনো সম্পর্ক থাকে না আবার ভগবানের সঙ্গে এঁর সম্পর্ক স্বতঃ ও স্বাভাবিক। এই অনুভব হলেই মন-বুদ্ধি স্বতঃই ভগবানে নিবিষ্ট হয়।

শ্লোকের দ্বিতীয়ার্ধে ভগবান বলছেন—

'নিবসিষ্যসি ময্যেব অত ঊর্ধ্বং ন সংশয়ঃ।' অর্থাৎ যে মুহূর্তে মন-বুদ্ধি ভগবানে নিবিষ্ট হবে তাতে আপনত্ব থাকবে না, সেই মুহূর্তেই ভগবদ্প্রাপ্তি হয়ে যাবে। 'ন সংশয়ঃ' বলেছেন কেন না মানুষের মধ্যে ধারণা গাঁথা হয়ে আছে যে যদি ভাল কর্ম করা হয়, ভাল আচরণ হয়, যদি জপ-ধ্যানাদি করা হয় তবেই পরমাত্মা প্রাপ্তি সম্ভব। আর যদি এইসব সাধন না করা হয় তবে পরমাত্মা প্রাপ্তি হয় না। এই ভ্রম দূর করার জন্য ভগবান বলছেন যে, আমাকে লাভ করার জন্য মন-বুদ্ধি নিবিষ্ট করা যত গুরুত্বপূর্ণ, এই জপ-ধ্যানাদি সমস্ত সাধনাও একসঙ্গে মিলিয়েও তার সমকক্ষ নয়। এই উপদেশ ভগবান আগেও দিয়েছেন—**'মর্য্যর্পিত মনোবুদ্ধির্মামেবৈষ্যস্য সংশয়ম্'** (গীতা ৮।৭)।

যতক্ষণ পর্যন্ত বুদ্ধিতে সংসারের গুরুত্ব আর মনে সংসারের চিন্তা থাকে, ততক্ষণ নিজ অবস্থিতি সংসারে আছে বলে বুঝতে হবে। আর সংসারে স্থিতি থাকলে জীব সংস্কার চক্রেই ঘুরতে থাকে। সমগ্র সৃষ্টির মধ্যে একমাত্র জীবাত্মাই হল ঈশ্বরের সাক্ষাৎ অংশ। কিন্তু সেই জীবাত্মা (স্বয়ং) জগতেরই একটি তুচ্ছ অংশকে (শরীর, মন, বুদ্ধি ইত্যাদিকে) নিজের বলে মনে করে এদের প্রভু হয়ে ওঠে। সে (জীবাত্মা) একেবারেই ভুলে যায় যে সে যাদের নিজের বলে মনে করে তা পরমাত্মার সমষ্টি সৃষ্টিরই এক তুচ্ছ অংশ।

যেমন এক কোটিপতি ব্যক্তির মূর্খ পুত্র পিতার থেকে পৃথক হয়ে বাবার বিশাল প্রসাদের দু-চারটি ঘরে আপন অধিকার প্রতিষ্ঠা করে মনে করে, খুব উন্নতি হয়েছে। কিন্তু যখন তার ভুল ভাঙে তখন আর তার কোটিপতি পিতার

উত্তরাধিকারী হতে কোনো বাধা থাকে না। ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণ-উদ্ধব সংবাদে শ্রীকৃষ্ণ বলছেন—

'বিষয়ান্ ধ্যায়তশ্চিত্তং বিষয়েষু বিষজ্জতে।

মামনুস্মরতশ্চিত্তং ময্যেব প্রবিলীয়তে॥' (ভাগবত ১১।১৪।২৭)

অর্থাৎ 'বিষয়ের চিন্তা করলে মন বিষয়ে আবদ্ধ হয় আর আমাকে স্মরণ করলে মন আমাতে বিলীন হয়।'

তাই ভগবান বলছেন যে মন-বুদ্ধিরূপ অপরা প্রকৃতি থেকে 'আপন-ভাব' সরিয়ে সেগুলি ভগবানের বলে মনে করবে কেননা সেগুলি প্রকৃতপক্ষে তাঁরই। এইভাবে মন-বুদ্ধি তাঁকে সমর্পণ করলে, এগুলির প্রতি ভ্রমবশত মেনে নেওয়া সম্পর্ক দূর হবে এবং তাঁর (প্রভুর) সঙ্গে স্বতঃসিদ্ধ নিত্য-সম্বন্ধ অনুভূত হবে।

২) **অভ্যাসযোগ**—আগের শ্লোকে সমর্পণের কথা বলে বর্তমান শ্লোকে ভগবান বলছেন— **'অথ চিত্তং ন সমাধাতুং'** অর্থাৎ যদি মন-বুদ্ধি আমাতে অচঞ্চলভাবে স্থাপন করতে সমর্থ না হও তবে **'অভ্যাস যোগেন মামিচ্ছাপ্তুং'** অর্থাৎ অভ্যাসযোগের দ্বারা আমাকে পেতে চেষ্টা করবে।

অভ্যাস ও অভ্যাসযোগ দুটি আলাদা। বিশেষ উদ্দেশ্যে চিত্তকে বা বিক্ষিপ্ত মনকে নিরোধ করার চেষ্টা হল অভ্যাস। যদি শুধু অভ্যাস হয় আর তাতে যোগের সম্বন্ধ না থাকে তবে তা এক বিশেষ ব্যবহারিক অবস্থার সৃষ্টি করে কিন্তু তাতে কল্যাণ (উদ্ধার) হয় না। আর সমতা রেখে অভ্যাস করাই হল 'অভ্যাসযোগ'। অভ্যাসযোগে মনের নিরোধ হয় না, বরং মনের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন হয়—**'সমত্বং যোগ উচ্যতে'** (গীতা ২।৪৮)। শুধুমাত্র ভগবদ্প্রাপ্তির উদ্দেশ্য-কৃত ভজন, নাম-জপ প্রভৃতিকে বলা হয় **'অভ্যাসযোগ'**। **'মামিচ্ছাপ্তুং'** পদটির দ্বারা ভগবান 'অভ্যাসযোগ'কেই তাঁর প্রাপ্তির স্বতন্ত্র সাধন বলে জানিয়েছেন। অভ্যাসের সঙ্গে যোগের সংযোগ না হলে সাধকের উদ্দেশ্য সংসারেই সীমাবদ্ধ থাকে। যোগ তখনই হয় যখন ক্রিয়ামাত্রের উদ্দেশ্য বা ধ্যেয় একমাত্র পরমাত্মাই হয়। আর যদি ভগবদ্প্রাপ্তিই উদ্দেশ্য হয় এবং উদ্দেশ্যের সঙ্গে সাধক অভিন্ন হন তবে

কেবল অভ্যাসের দ্বারাই তার ভগবদ্প্রাপ্তি হয়ে থাকে।

একটি আখ্যান— এক গুরুমহারাজ প্রায়ই নদী পেরিয়ে যজমান বাড়ি যান। সেখানে এক মূর্খ চাষী যার ভগবানকে ডাকার খুব ইচ্ছা, প্রায়ই তাঁকে দিক্ষা দিতে বলেন। শেষে বিরক্ত হয়ে গুরুমহারাজ বললেন—নে তুই 'গোপাল' নাম জপ কর। চাষী নাম ভাল বুঝলই না, যা শুনেছে তাই 'টোপাল' 'টোপাল' বলে ডাকা শুরু করল। বেশ কিছুদিন পরে ভোরবেলায় হঠাৎ চাষীটি গুরুমহারাজের কাছে হাজির। গুরু জিজ্ঞাসা করলেন কিরে এত সকালে, নদী পেরিয়ে এলি কি করে ? চাষী বলল মহারাজ আপনার দেওয়া নাম জপ করতে করতে আমি কৃষ্ণ দর্শন পাই। আর নদী পেরোনোতো অতি তুচ্ছ। গুরুকৃপায় কত লোক সংসার সাগরই পার হয়ে যায় আর এ-তো ছোট নদী। চোখ বুঁজে নাম জপ করতে করতে কখন নদী পেরিয়ে গেছি তাই জানি না। গুরু ভাবলেন মন্ত্রর মধ্যে নিশ্চয় কোনো শক্তি আছে তাই কাজ করেছে। তিনি ভুলে গেছেন কি বলেছিলেন, তাই বললেন বলতো কি মন্ত্র দিয়েছি। চাষীটি বলল 'টোপাল'। গুরু টোপাল নামটি জপ করতে করতে অতি সন্তর্পণে নদী পার হতে গিয়ে জলে পড়ে হাবুডুবু খেতে লাগলেন।

সাধক যখন ভগবদ্প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে বারংবার নাম-জপ, কীর্তন, শ্রবণ ইত্যাদি করতে থাকেন, তখন তাঁর চিত্ত শুদ্ধ হতে থাকে, সাংসারিক বৈরাগ্য আপনিই আসে এবং ভগবদ্প্রাপ্তির তীব্র আকাঙ্ক্ষা জাগে। জাগতিক সিদ্ধি-অসিদ্ধিতে সমত্ব লাভ হলে ভগবদ্প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা আরো তীব্র হয়ে ওঠে। ভগবদ্প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা তীব্র হলে ভগবানের সঙ্গে মিলনের ব্যাকুলতা জেগে ওঠে। এই ব্যাকুলতাই তার অবশিষ্ট সাংসারিক আসক্তি ও অনন্ত জন্মের পাপ ভস্ম করে দেয়। সাংসারিক আসক্তি এবং পাপ নাশ হলে তাঁর ভগবানে অনন্য প্রেম জন্মায় আর তিনি তখন ভগবানের বিচ্ছেদ সহ্য করতে পারেন না, ভগবৎ বিচ্ছেদ অসহনীয় হয়ে ওঠে। তখন ভগবান ও তাঁর বিচ্ছেদ সহ্য করতে পারেন না এবং সেই ভক্তর ঈশ্বর লাভ হয়।

৩) **ভগবানের প্রীত্যর্থে সমস্ত কর্ম অনুষ্ঠান**—পরের শ্লোকে ভগবান

বলছেন —**'অভ্যাসেঽপ্যসমর্থোঽসি মৎকর্মপরমো ভব'** অর্থাৎ অভ্যাস-যোগের সাহায্যেও যদি ভগবানে মন নিবিষ্ট করা সম্ভব না হয় তবে **'মদর্থমপি'** কর্ম করতে বলেছেন যার তাৎপর্য হল শুরু থেকেই ভগবানের জন্য কর্ম করে যাওয়া। অর্থাৎ শরীর-নির্বাহ ও জীবিকাদি লৌকিক কর্ম এবং নাম-জপ, ভজন-ধ্যানাদি পারমার্থিক কর্ম যেন সাংসারিক ভোগ ও সংগ্রহের জন্য না করে ভগবদ্প্রাপ্তির জন্য করা হয়। যে সকল কর্ম ভগবদ্প্রাপ্তির জন্য ভগবদ্ নির্দেশানুযায়ী করা হয় তাকেই **'মৎকর্ম'** বলে। সাধকের উদ্দেশ্য যখন ভগবদ্প্রাপ্তি হয় তখন সাধকের ধ্যেয় আর সাংসারিক ভোগ ও সংগ্রহে আবদ্ধ থাকে না আর নিষিদ্ধ কর্ম স্বতঃই দূর হয়। ফলে সমস্ত ক্রিয়াই শাস্ত্রবিহিত ও ভগবদর্থে হয়ে ওঠে। ভগবান **'মৎকর্মপরমো ভব'** অর্থাৎ আমারই জন্য কর্মপরায়ণ হও বলে এই সাধনটিও তাকে প্রাপ্তির পৃথক সাধন বলে জানিয়েছেন। অভ্যাসের থেকে ক্রিয়াসমূহ ভগবানে অর্পণ করা সহজ কেননা অভ্যাস বারে বারে চর্চা করতে হয়, কিন্তু কর্ম স্বতঃই হয়, স্বভাবেই থাকে কর্মের প্রবণতা। কেবল নিজের জন্য না করে কর্মগুলি ভগবানে সমর্পণ করতে হবে।

৪) **সর্বকর্মফলত্যাগ**—আগের শ্লোকে ভগবান তাঁর উদ্দেশ্যে সমস্ত কর্ম অর্পণ করে তাঁকে প্রাপ্ত হওয়ার কথা বলেছেন, আর পরবর্তী শ্লোকে সমস্ত কর্মের ফলত্যাগ রূপ সাধনার কথা বলেছেন।

পূর্বের শ্লোকে সমস্ত কর্ম ভগবানের জন্য করায় ভক্তির প্রাধান্য থাকে তাই ওটি হল 'ভক্তিযোগ' আর এখানে সর্বকর্মফলত্যাগে শুধুমাত্র 'কর্মফলত্যাগের' প্রাধান্য থাকায় এটি হল 'কর্মযোগ'। এইরূপে দুটিই ভগবদ্প্রাপ্তির পৃথক সাধন।

এখানে 'সর্বকর্ম' পদটি যজ্ঞ-দান-তপ-সেবা, বর্ণাশ্রম অনুযায়ী জীবিকা এবং শরীর নির্বাহর জন্য শাস্ত্রবিহিত সমস্ত কর্মগুলির বাচক। আর কর্মফল ত্যাগের অভিপ্রায় বুঝতে হবে কর্মফলে মমত্ববোধ, আসক্তি, কামনা বা বাসনা ত্যাগ। আর ফলাসক্তি ত্যাগ করে কর্ম করতে থাকলে, কর্ম করার স্বাভাবিক বেগও প্রশমিত হয় এবং পূর্বের আসক্তিও দূর

হয়। ফলের আকাঙ্ক্ষা না থাকায় কর্ম থেকে সর্বতোভাবে সম্বন্ধ বিচ্ছেদ হয় এবং নতুন করে কর্মে আসক্তি জন্মায় না। ফলে সাধক কৃতকৃত্য হন। পদার্থ ও ক্রিয়াতে অনুরাগ, আসক্তি, কামনা বা ফলেচ্ছা থাকলেই ক্রিয়ার বেগ সৃষ্টি হয়। আসলে ফলেচ্ছাই বন্ধনের কারণ—**'ফলে সক্তো নিবধ্যতে'** (গীতা ৫।১২)।

ভগবান শ্লোকের দ্বিতীয়ার্ধে বলেছেন—**'ততঃ কুরু যতাত্মবান্'** অর্থাৎ কর্মফল ত্যাগের সাধনে সাধক মন, ইন্দ্রিয়াদির সংযম করবে। কর্মযোগের সাধনে স্বভাবতই কর্মের আধিক্য থাকে। তাই মন ও ইন্দ্রিয় সংযত হলে তবেই অনায়াসে কর্মফল ত্যাগ করা সম্ভব। সাধক যদি মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয় ইত্যাদির সংযম না করেন তাহলে স্বতঃই তার মনে বিষয়-চিন্তা হতে থাকে এবং তা থেকে তাঁর মধ্যে বিষয়াসক্তি ও ভোগাসক্তি জন্মায়। ফলে তাঁর পতনের সম্ভাবনা থাকে। **'ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ............বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি'** (গীতা ২।৬২-৬৩)।

আবার ত্যাগের উদ্দেশ্য থাকলে সাধক সহজেই মন ও ইন্দ্রিয় সংযম করতে পারেন। এই উভয়েই পরস্পরের পরিপূরক। যাদের ভগবানের প্রতি পরিপূর্ণ সমর্পণ নেই অথচ ভগবানে শ্রদ্ধা আছে এবং দেশ ও সমাজের সেবা করায় বেশি উৎসাহী তাদের জন্যই এই শ্লোকে ভগবান 'সর্বকর্মফলত্যাগ-রূপ' সাধনার কথা বলেছেন। যদি ভগবানকে মন-বুদ্ধি সমর্পণ করা সম্ভব না হয় তবে তার অভ্যাস করা উচিত, তাও যদি না পারা যায় তবে সকল কর্ম তাঁর কর্ম বলে মনে করে করো এবং তাও যদি না পারা যায় তবে সংযতচিত্তে কর্মসকল সম্পন্ন করো এবং সেই কর্মফলে মমতা ও আসক্তি ত্যাগ করতে হবে। কর্তব্য-কর্ম ফলেচ্ছা ত্যাগপূর্বক করলেই তবে সংসার থেকে সম্পর্ক ছিন্ন হয়।

এই সাধন চারটির প্রথমটি 'সমর্পণযোগে' ভগবান তাঁতে স্থিতি লাভের কথা বলেছেন, 'অভ্যাসযোগে' তাঁকে পাওয়ার কথা বলেছেন এবং তাঁর জন্য কর্ম করলে সিদ্ধিলাভের কথা বলেছেন কিন্তু সাধন চতুষ্টয়ের শেষ সাধন 'সর্বকর্মফলত্যাগে' ভগবান কোনো ফলের কথা জানাননি। এর ফলে

সংশয় হতে পারে যে 'সর্বকর্মফলত্যাগরূপ' সাধন কি সব থেকে নিম্নশ্রেণীর সাধন। এই সংশয় দূর করার জন্য ভগবান এই প্রকরণের অন্তিমে দ্বাদশতম শ্লোকে তিনটি সাধনের বিশ্লেষণ করেছেন এবং 'সর্বকর্মফলত্যাগরূপ' সাধনকে শ্রেষ্ঠ বলে জানিয়ে তার ফলেরও উল্লেখ করেছেন।

শ্রেয়ো হি জ্ঞানমভ্যাসাৎ—এখানে 'অভ্যাস' শব্দটি শুধু অভ্যাসরূপ ক্রিয়ার বাচক, অভ্যাসযোগের বাচক নয়। জড়তত্ত্ব থেকে সম্পর্ক-বিচ্ছিন্ন হলেই যোগ হয়, কিন্তু এখানে উক্ত এই অভ্যাস (প্রাণায়াম, মনোনিগ্রহাদি) জড়েরই (শরীর, ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধির) আশ্রয় নিয়ে হয়ে থাকে। আর এখানে 'জ্ঞান' শব্দের অর্থ শাস্ত্রজ্ঞান, তত্ত্বজ্ঞান নয়, কারণ তত্ত্বজ্ঞান হল সকল সাধনার ফল। এইরূপ জ্ঞানে ধ্যান, অভ্যাস বা কর্মফল ত্যাগরূপ কোনো সাধনাই নেই, এ জ্ঞান পুঁথিগত বিদ্যা। তাহলেও এখানে বলা হয়েছে জ্ঞানরহিত অভ্যাস ভগবদ্প্রাপ্তিতে তত সহায় হয় না যতটা অভ্যাসরহিত জ্ঞান সহায়ক হয়। কারণ এইপ্রকার জ্ঞানের সাহায্যেও ভগবদ্প্রাপ্তির অভিলাষ যতটা জাগ্রত হতে পারে, সাংসারিক আকর্ষণ কাটানো কিন্তু এইরূপ অভ্যাসের দ্বারা ততটা সম্ভব হয় না।

জ্ঞানাদ্‌ধ্যানং বিশিষ্যতে—এখানে ধ্যান শব্দটি শুধুমাত্র মনের একাগ্রতার বাচক, ধ্যানযোগের বাচক নয়। এই ধ্যানে শাস্ত্রজ্ঞানও নেই আর কর্মফলত্যাগও নেই। ভগবান বলছেন এইরূপ জ্ঞান অপেক্ষা উপরোক্ত ধ্যানই শ্রেষ্ঠ। কারণ ধ্যানের সাহায্যে মন নিয়ন্ত্রিত হয়, শুধুমাত্র শাস্ত্র-জ্ঞানে মন নিয়ন্ত্রিত হয় না। মন নিয়ন্ত্রিত হওয়ায় ধ্যানের যে শক্তি সঞ্চিত হয়, তদ্রূপ শাস্ত্রজ্ঞান দ্বারা হয় না। মন নিয়ন্ত্রিত হওয়ায় ধ্যানের দ্বারা যে শক্তি সঞ্চিত হয়, তদ্রূপ শাস্ত্রজ্ঞান দ্বারা হয় না। সাধক যদি সেই শক্তির সদ্‌ব্যবহার করে পরমাত্মার দিকে অগ্রসর হতে চান তবে সেটি যেরূপ সহায়ক হয়, শুধু শাস্ত্রজ্ঞানীদের সেরূপ হয় না। আবার ধ্যানকারী সাধক যদি শাস্ত্র অধ্যয়ন করে তবে তখন তার মন একাগ্র হওয়ায় প্রকৃত জ্ঞান অতি সহজে প্রাপ্ত হয়, কিন্তু শাস্ত্র অধ্যয়নকারী সাধকের ইচ্ছা থাকলেও মনের চঞ্চলতার জন্য ধ্যানে মগ্ন হতে আয়াস বোধ হয়।

ধ্যানাৎ কর্মফলত্যাগঃ—ভগবান বলছেন জ্ঞান ও কর্মফল ত্যাগরহিত 'ধ্যানের' থেকে জ্ঞান ও ধ্যানবর্জিত 'কর্মফল ত্যাগ' শ্রেষ্ঠ। এখানে কর্মফল ত্যাগের অর্থ, কর্ম ও কর্মফল ত্যাগ নয়, বরং বলা হয়েছে কর্ম ও তার ফলের ওপর মমতা, আসক্তি ও কামনা ত্যাগের কথা। কর্মে আসক্তি এবং ফলেচ্ছাই সংসারের মূল কারণ। কর্মযোগী অনুভব করেন শরীর, ইন্দ্রিয়াদি, মন, বুদ্ধি, যোগ্যতা, সামর্থ্য, পদার্থ ইত্যাদি যা কিছু তার থাকে, সে সব কোনো কিছুই তার ব্যক্তিগত নয়, সমস্তই প্রকৃতি থেকে আহরিত। তাই কর্মফলত্যাগী অর্থাৎ কর্মযোগী সেইসব সামগ্রী নিজস্ব বা নিজের বা নিজের জন্য মনে না করে জগতেরই সেবায় নিষ্কামভাবে নিয়োজিত করেন। গীতার ধ্যানযোগ প্রকরণে (ষষ্ঠ অধ্যায়) ভগবান বলছেন, ধ্যানের অভ্যাস করতে করতে শেষকালে যখন সাধকের চিত্ত একবারে ভগবানে স্থিত হয় তখন তিনি কামনারহিত হন এবং পরমাত্মাতে স্থিতিলাভ করেন (গীতা ৬।১৮-২০)। কিন্তু কর্মযোগী সমস্ত কামনা পরিত্যাগ করে অচিরাৎ পরমাত্মাতে স্থিত হন—

প্রজাহাতি যদা কামান্ সর্বান্ পার্থ মনোগতান্।
আত্মন্যেবাত্মনা তুষ্টঃ স্থিতপ্রজ্ঞস্তদোচ্যতে॥ (গীতা ২।৫৫)

কর্মযোগের মূলমন্ত্র হল—'নিজের জন্য কিছুই নয়, নিজের জন্য কিছু চাই না, নিজের জন্য কিছু না করা।' যার ফলে সব সাধনার থেকে বিশিষ্ট এই সাধনা '**কর্মযোগো বিশিষ্যতে**' (গীতা ৫।২)। কর্মফল ত্যাগের ফল ভগবান জানিয়েছেন—

ত্যাগাচ্ছান্তিরনন্তরম্—ত্যাগ অসীম। সংসারে সম্পর্কের সীমাবদ্ধতা থাকে, কিন্তু সংসারে ত্যাগের (সম্বন্ধ-বিচ্ছেদের) সীমা থাকে না। পরমাত্মতত্ত্ব অসীম আর পরমাত্মতত্ত্ব প্রাপ্তিও অসীম। সীমিত বস্তুসমূহের মোহে এই অসীম পরমাত্মতত্ত্ব অনুভূত হয় না। ত্যাগ দ্বারাই পরমাত্মতত্ত্ব প্রাপ্তি হয়। শান্তি পদটির অর্থ হল পরমশান্তি প্রাপ্ত করা। একেই ভগবদ্প্রাপ্তি বলা হয়। অভ্যাস, জ্ঞান এবং ধ্যান—এই তিনটি সাধনের মধ্যে বস্তুত কর্মফলত্যাগরূপ সাধনই শ্রেষ্ঠ। সাধকের মনে যতক্ষণ ফলের আকাঙ্ক্ষা

থাকে, ততক্ষণ তিনি জড় বস্তুর আশ্রয় থেকে মুক্ত হন না। **'যুক্তঃ কর্মফলং ত্বক্তা শান্তিমাপ্নোতি নৈষ্ঠিকীম্'** (গীতা ৫।১২) অর্থাৎ যুক্ত কর্মযোগী কর্মফল ত্যাগ করে ভগবৎ লাভরূপ শান্তি প্রাপ্ত হন। কর্মযোগে ফলাসক্তি ত্যাগ করাই প্রধান কর্তব্য। সুস্থতা-অসুস্থতা, ধনবত্তা-নির্ধনতা, মান-অপমান, স্তুতি-নিন্দা ইত্যাদি সমস্ত অনুকূল-প্রতিকূল পরিস্থিতি কর্মের ফলরূপে উপস্থিত হয়। এগুলির প্রতি রাগ বা দ্বেষ থাকলে কখনো পরমাত্মাকে লাভ করা যায় না। **'ব্যাবসায়াত্মিকা বুদ্ধিঃ সমাধৌ ন বিধীয়তে'** (গীতা ২।৪৪)। অভ্যাস, শাস্ত্রজ্ঞান এবং ধ্যান—এই তিনটি সাধন হচ্ছে করণ (ইন্দ্রিয়) সাপেক্ষ আর কর্মফল ত্যাগ হল করণ (ইন্দ্রিয়) নিরপেক্ষ। বাস্তবে চারটি সাধনই শ্রেষ্ঠ, সেইসব সাধকদের জন্য, যাঁদের উদ্দেশ্য হল 'ত্যাগ'। অন্তিম শ্লোকে কিন্তু চারটি সাধনের অন্তর্গত **'মদর্থমপি কর্মাণি'** অর্থাৎ ভগবানের জন্য কর্ম করা (গীতা ১২।১০) ধরা হয়নি কারণ **'মদর্থমপি কর্মাণি'** অর্থাৎ কেবলমাত্র ভক্তি দ্বারাই সাধনা পূর্ণতা লাভ করে। সুতরাং ভক্তি ও ত্যাগ উভয় সাধনই সমান শ্রেষ্ঠ।

ভক্তের লক্ষণ—(শ্লোক ১৩-২০)

ভগবান এই অধ্যায়ের শেষ আটটি শ্লোকে আগের প্রকরণে বর্ণিত চারটি সাধন দ্বারা সিদ্ধাবস্থাপ্রাপ্ত তাঁর প্রিয় ভক্তদের উনচল্লিশটি লক্ষণ বর্ণনা করেছেন। আর অধ্যায়ের অন্তিম শ্লোকে বলেছেন এইরূপ লক্ষণযুক্ত ভক্তরাই তাঁর অত্যন্ত প্রিয়।

অদ্বেষ্টা সর্বভূতানাং মৈত্রঃ করুণ এব চ।
নির্মমো নিরহঙ্কারঃ সমদুঃখসুখঃ ক্ষমী॥
সন্তুষ্টঃ সততং যোগী যতাত্মা দৃঢ়নিশ্চয়ঃ।
ময্যর্পিতমনোবুদ্ধির্যো মদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ॥
যস্মান্নোদ্বিজতে লোকো লোকান্নোদ্বিজতে চ যঃ।
হর্ষামর্ষভয়োদ্বেগৈর্মুক্তো যঃ স চ মে প্রিয়ঃ॥
অনপেক্ষঃ শুচির্দক্ষ উদাসীনো গতব্যথঃ।
সর্বারম্ভপরিত্যাগী যো মদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ॥

যো ন হৃষ্যতি ন দ্বেষ্টি ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
শুভাশুভপরিত্যাগী ভক্তিমান্ যঃ স মে প্রিয়ঃ॥
সমঃ শত্রৌ চ মিত্রে চ তথা মানাপমানয়োঃ।
শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু সমঃ সঙ্গবিবর্জিতঃ॥
তুল্যনিন্দাস্তুতির্মৌনী সন্তুষ্টো যেন কেনচিৎ।
অনিকেতঃ স্থিরমতির্ভক্তিমান্ মে প্রিয়ো নরঃ॥
যে তু ধর্ম্ম্যামৃতমিদং যথোক্তং পর্য্যুপাসতে।
শ্রদ্দধানা মৎপরমা ভক্তাস্তেঽতীব মে প্রিয়াঃ॥

(গীতা ১২।১৩-২০)

'সর্বপ্রাণীতে দ্বেষভাব বর্জিত, সকলের মিত্র (প্রেমী) ও দয়ালু, মমতা রহিত, অহংকারবর্জিত, সুখ-দুঃখে সমভাবাপন্ন, ক্ষমাশীল, সদা সন্তুষ্ট, সংযত দেহ, দৃঢ়চিত্ত ও আমাতে মনবুদ্ধি অর্পিত এরূপ ভক্তই আমার প্রিয়।

যাঁর জন্য কোনো প্রাণী উদ্বিগ্ন হয় না এবং যিনি কোনো প্রাণীর থেকে উদ্বিগ্ন হন না, যিনি হর্ষ, অমর্ষ (ঈর্ষা), ভয় ও উদ্বেগ হতে মুক্ত, তিনি আমার প্রিয়।

যিনি আকাঙ্ক্ষারহিত (নিস্পৃহ), বাহ্যান্তরে পবিত্র, দক্ষ, উদাসীন, ব্যথারহিত এবং যে কোনো আরম্ভ অর্থাৎ নতুন কর্মারম্ভ সর্বতোভাবে বর্জন করেছেন, এরূপ ভক্ত আমার প্রিয়।

যিনি কখনো হৃষ্ট হন না, দ্বেষ করেন না, শোক করেন না, কোনো কিছুর আকাঙ্ক্ষা করেন না, যিনি শুভাশুভ কর্মে রাগ-দ্বেষ পরিত্যাগ করেছেন সেইরূপ ভক্তিমান পুরুষই আমার প্রিয়।

যিনি শত্রু-মিত্রে, মান-অপমানে, শীত-উষ্ণে (অনুকূলতা-প্রতিকূলতায়), সুখ-দুঃখে সম এবং আসক্তিবর্জিত, নিন্দাস্তুতিকে সমানরূপে জ্ঞান করেন, মননশীল, যে কোনো অবস্থাতেই (শরীর-নির্বাহে) সন্তুষ্ট, আবাসস্থল এবং দেহাদিতে মমত্ব ও আসক্তিবর্জিত, স্থিরবুদ্ধিসম্পন্ন, সেই ভক্তিমান ব্যক্তিই আমার প্রিয়।

যে সকল ভক্ত আমার প্রতি এইরূপ শ্রদ্ধাশীল এবং মৎপরায়ণ

হয়ে পূর্বোক্তরূপে এই অমৃততুল্য ধর্মাচরণ করেন তারা আমার অত্যন্ত প্রিয়।' (গীতা ১২।১৩-২০)

ভক্তর লক্ষণ বর্ণনায় ভগবান প্রথম সাতটি শ্লোকের চারটি প্রকরণে উনচল্লিশটি সিদ্ধভক্তর লক্ষণ এবং শেষ (বিংশতি) শ্লোকে সাধক ভক্তর লক্ষণ বর্ণনা করেছেন।

সিদ্ধ ভক্তর লক্ষণ—

১. অদ্বেষ্টা সর্বভূতানাম্—অনিষ্ট প্রদানকারী দুই প্রকারের হয়—ক) ইষ্ট প্রাপ্তিতে বাধাদানকারী। খ) অনিষ্টকর পদার্থ, ক্রিয়া, ব্যক্তি বা ঘটনার সঙ্গে সংযোগকারী। যে কেউই ভক্তর শরীর, মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়াদির এবং সিদ্ধান্তের যতই প্রতিকূল ব্যবহার করুক, ইষ্ট প্রাপ্তিতে বাধা দান করুক অথবা কোনো ভাবে আর্থিক বা শারীরিক ক্ষতি করুক, তাতে ভক্তর হৃদয়ে বিন্দুমাত্র দ্বেষভাব আসে না। তিনি সকল প্রাণীর মধ্যে আপন প্রভুকে পরিব্যাপ্ত দেখেন—

'নিজ প্রভুময় দেখহিঁ জগত। কেহি সন করহিঁ বিরোধ।'

(শ্রীরামচরিতমানস ৭।১১২ খ)

শুধু তাই নয় ভক্ত অনিষ্টকারীদের সমস্ত ক্রিয়াকেই ভগবানের মঙ্গলময় বিধান বলেই মনে করেন।

২. এবং ৩. মৈত্রঃ করুণ এব চ— ভক্তর চিত্তে শুধু প্রাণীদের প্রতি দ্বেষভাব থাকে না তা নয় বরং সমস্ত প্রাণীদের প্রতি ভগবদ্‌ভাব থাকায় তিনি সকলের প্রতি মৈত্রপূর্ণ এবং সদয় ব্যবহার করে থাকেন। ভগবান প্রাণীমাত্রেরই সুহৃদ—**'সুহৃদং সর্বভূতানাম্'** (গীতা ৫।২৯)। আর ভগবানের স্বভাব ভক্তর মধ্যে সঞ্চারিত হওয়ায় ভক্তও সকল প্রাণীর সুহৃদ হয়ে ওঠেন—**'সুহৃদঃ সর্বদেহিনাম্'** (শ্রীমদ্ভাগবত ৩।২৫।২১)। তাই ভক্তর সমস্ত প্রাণীর প্রতি কোনো স্বার্থ ছাড়াই স্বাভাবিক মৈত্রী হয়ে থাকে।

পাতঞ্জল যোগদর্শনে চিত্তশুদ্ধির চারটি বিষয়ে জানানো হয়েছে—

'মৈত্রীকরুণামুদিতোপেক্ষাণাং সুখদুঃখ পুণ্যাপুণ্য বিষয়াণাং ভাবনাতশ্চিত্ত প্রসাদনম্' (১।৩৩)

সুখীদের প্রতি মৈত্রী, দুঃখীদের প্রতি করুণা, পুণ্যাত্মাদের প্রতি মুদিতা (প্রসন্নতা) এবং পাপাত্মাদের প্রতি উপেক্ষার ভাব থেকে চিত্তে নির্মলতা আসে।

ভগবান এখানে চারটি বিষয়কে দুইভাবে ভাগ করেছেন—**'মৈত্রঃ চ করুণঃ'** অর্থাৎ সিদ্ধ ভক্তদের, সুখী এবং পুণ্যবান ব্যক্তিদের প্রতি 'মৈত্রী' ভাব এবং দুঃখী ও পাপাত্মাদের প্রতি 'করুণার' ভাব থাকে। আসলে দুঃখী ব্যক্তিদের থেকে দুঃখপ্রদানকারীদের ওপর উপেক্ষার ভাব না রেখে দয়ার ভাব রাখা উচিত। কারণ যারা দুঃখ ভোগ করে তারা তো অতীত পাপের ফল ভোগ করে পাপ থেকে মুক্ত হচ্ছে কিন্তু দুঃখপ্রদানকারী নতুন পাপ সংগ্রহ করে, তাই তারাই বিশেষভাবে করুণার পাত্র।

৪. **নির্মমঃ**—যদিও প্রাণীমাত্রের প্রতি ভক্তর স্বাভাবিক মৈত্রী ও করুণার ভাব থাকে তবুও তাঁর কারও প্রতি বিন্দুমাত্র মমত্ব থাকে না। সাধকরা এই ভুল করেন যে তারা প্রাণী ও পদার্থে মমত্ববোধ দূর করার চেষ্টা করলেও নিজ দেহ, মন, ইন্দ্রিয়, বুদ্ধি থেকে তা সরানোর দিকে বিশেষ নজর দেন না। সেইজন্য তাঁরা সর্বতোভাবে নির্মম হতে পারেন না।

৫. **নিরহঙ্কারঃ**—শরীর, ইন্দ্রিয়াদি জড় পদার্থগুলিকে নিজ স্বরূপ বলে মনে করলে অহংকার উৎপন্ন হয়। ভক্তের নিজ শরীরের প্রতি বিন্দুমাত্র অহংবুদ্ধি না থাকায় এবং ভগবানের সঙ্গে নিজ নিত্য সম্বন্ধ অনুভব হওয়ায় তাঁর চিত্তে স্বতঃই শ্রেষ্ঠ, অলৌকিক গুণাবলী প্রকটিত হতে থাকে। এই গুণগুলি দৈবী-সম্পদ হওয়ায় ভক্ত এগুলিকেও নিজের গুণ বলে মনে করে না। ফলে তিনি সর্বতোভাবে অহংভাব থেকে রহিত হন।

৬. **সমদুঃখসুখঃ**—ভক্ত সুখদুঃখের পরিস্থিতিতে সমভাবে বিরাজ করেন অর্থাৎ অনুকূল-প্রতিকূলতা তাঁর চিত্তে রাগ-দ্বেষ, হর্ষ-শোকাদি কোনো বিকারই সৃষ্টি করে না। কোনো পরিস্থিতির জ্ঞান হওয়া দোষের নয়, কিন্তু তার জন্য চিত্তে বিকার আসাই দোষের। ভক্ত রাগ-দ্বেষ, হর্ষ-শোক ইত্যাদি বিকার থেকে সর্বভাবে রহিত হন। যেমন প্রারব্ধ অনুসারে ভক্তর শরীরে কোনো ব্যাধি দেখা দিলে, তার শারীরিক পীড়ার জ্ঞান (অনুভব)

হবে, কিন্তু তার জন্য তার চিত্তে কোনো প্রকার বিকার আসবে না।

৭. ক্ষমী— নিজের প্রতি কেউ যদি কোনো অপরাধ করে তবে তাকে শাস্তি দেবার কথা না ভেবে যারা ক্ষমা করে তাদের বলে 'ক্ষমী'।

ভক্তের লক্ষণগুলির বর্ণনায় সর্বপ্রথমে ভগবান 'অদ্বেষ্টা' পদটি দিয়ে ভক্তদের নিজেদের অপরাধকারীদের প্রতি দ্বেষ না থাকার কথা বলেছেন, আর এখানে ক্ষমী পদটির দ্বারা জানিয়েছেন যে ভক্তদের মনে সেই অপরাধীদের জন্য দ্বেষভাব থাকেই না উল্টে এই ভাব থাকে যে তারা যেন ভগবান বা অন্য কারও দ্বারা কোনো শাস্তিও না পায়। এই ক্ষমা ভাব ভক্তের এক বৈশিষ্ট।

৮. সন্তুষ্টঃ সততম্—জীবের মনের অনুকূল প্রাণী, পদার্থ, ঘটনা, পরিস্থিতি ইত্যাদির সংযোগে এবং মনের প্রতিকূল প্রাণী, পদার্থ, ঘটনা, পরিস্থিতি ইত্যাদির বিয়োগে সন্তুষ্টিভাব সমানভাবে বিরাজ করে।

ভাগবতে বলা হয়েছে—

সদা সন্তুষ্টমনসঃ সর্বাঃ সুখময়া দিশঃ।
শর্করাকণ্টকাদিভ্যো যথোপানৎপদঃ শিবম্॥ (ভাগবত ৭।১৫।১৭)

যেমন জুতো পরে চললে পায়ে কাঁকর বা কাঁটা ফোঁটার ভয় থাকে না, তেমনি যার মনে সন্তুষ্টি আছে, তার সর্বত্রই সুখে ভরা, দুঃখ কোথাও নেই।

ভগবানকে লাভ করলে ভক্ত নিত্য-নিরন্তর সন্তুষ্ট থাকেন। কারণ তাঁর ভগবানের সঙ্গে কখনো বিচ্ছেদ হয় না এবং বিনাশশীল জগতের কোনো প্রয়োজনও থাকে না। তাঁর অসন্তুষ্টির কোনো কারণই থাকে না, তাই নিজের সন্তুষ্টির জন্য তিনি জগতের কোনো প্রাণী বা পদার্থকে বিন্দুমাত্রও গুরুত্ব দেন না।

সন্ত কবীর বলেছেন—

গোধন গজধন বাজিধন, ঔর রতন ধন মান।
জব আবৈ সন্তোষ ধন, সব ধন ধূলি সমান॥

ভগবান এখানে 'সন্তুষ্ট সততম্' বলেছেন অর্থাৎ এই সন্তুষ্টি সততই থাকে, ইহা চিরস্থায়ী এবং এতে কখনো তারতম্য হয় না। কর্মযোগ,

জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ— সব যোগেই সিদ্ধমহাপুরুষদের মধ্যে এই সন্তুষ্টি সর্বক্ষণই বিরাজ করে।

৯. **যোগী**— ভক্তিযোগের সাহায্যে পরমাত্মাকে প্রাপ্ত ব্যক্তিকে যোগী বলা হয়েছে। বাস্তবে পরমাত্মার সঙ্গে বিযুক্তি কখনো সম্ভব নয়, এই সত্য যিনি অনুভব করেন তিনিই যোগী।

১০. **যতাত্মা**— যাঁর মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়সহ শরীরের ওপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ থাকে, তিনি 'যতাত্মা'। সিদ্ধভক্তদের মন, বুদ্ধি ইত্যাদি বশ করতে হয় না, এগুলি তাঁদের স্বাভাবিকভাবে বশে থাকে। তাই তাদের দ্বারা কোনোপ্রকার ইন্দ্রিয়জনিত দুর্গুণ-দুরাচারের আচরণ কখনোই সম্ভব নয়। মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়াদি সংসারে আসক্তিযুক্ত হওয়াতেই মানুষ পথভ্রষ্ট হয়। ভক্তর সংসারের সঙ্গে কোনো আসক্তিযুক্ত সম্পর্ক না থাকায় তাঁর মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়সকল সর্বদাই তাঁর বশে থাকে। তাঁর প্রত্যেক কার্যই তাই অন্যের কাছে আদর্শরূপে পরিগণিত হয়।

১১. **দৃঢ়নিশ্চয়**—সিদ্ধমহাপুরুষদের দৃষ্টিতে জগতের কোনো পৃথক সত্ত্বা থাকে না, পরমাত্মাই সর্বত্র বিরাজমান। তাই তাদের বুদ্ধিতে বিপর্যয় দোষ অর্থাৎ পরিবর্তনশীল জগৎকে স্থায়ী মনে করা কখনোই হয় না। তাঁরা ভগবানেই 'দৃঢ়নিশ্চয়ঃ' হয়ে থাকেন আর এই দৃঢ়তা বুদ্ধিতে নয়, স্বয়ং-এ প্রতিফলিত হয়—যার প্রতিফলন পড়ে বুদ্ধিতে। অজ্ঞানী ব্যক্তির বুদ্ধিতে জাগতিক সত্ত্বার গুরুত্ব থাকে। কিন্তু সিদ্ধ ভক্তের বুদ্ধিতে কেবল ভগবান ব্যতিরেকে জগতের কোনো পৃথক অস্তিত্ব থাকে না, কোনো গুরুত্ব থাকে না।

১২. **ময্যর্পিতমনোবুদ্ধিঃ**—সাধক যখন ভগবদ্প্রাপ্তিকেই নিজ উদ্দেশ্য মনে করেন তখন তাঁর বুদ্ধি স্বতঃই ভগবানে নিয়োজিত হয়। ভক্তর কাছে ভগবানের থেকে বেশি প্রিয় বা শ্রেষ্ঠ কিছুই নেই। ভক্ত তাঁর মন বা বুদ্ধির ওপরও নিজের অধিকার জানেন না, তিনি সেগুলিকে ভগবানের বলে মনে করেন। তাই তাঁর মন, বুদ্ধি স্বাভাবিকভাবেই ভগবানে নিবিষ্ট থাকে।

১৩. মদ্ভক্তঃ—ভগবানের কাছে তো সকলেই প্রিয় কিন্তু ভক্তের প্রেম কেবল ভগবান ছাড়া কোথাও হয় না। ভগবান বলেছেন—

যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্ (গীতা ৪।১১)

তাই ভক্তর প্রতি তাঁর বিশেষ প্রীতি ভাব থাকে।

১৪. যস্মান্নোদ্বিজতে লোকঃ—ভক্ত সর্বত্র এবং সর্বভূতে তাঁর পরমপ্রিয় প্রভুকে দেখেন। তাই তাঁর দৃষ্টিতে মন, বাক্য ও শরীর দ্বারা কৃত সমস্ত কর্মই একমাত্র ভগবানের প্রসন্নতার জন্য হয়ে থাকে। এরূপ অবস্থায় ভক্ত কাদেরই বা উদ্বিগ্ন করতে পারে ! তা সত্ত্বেও ভক্তদের জীবনে দেখা যায় কোনো না কোনো ব্যক্তি ঈর্ষাবশত ভক্তদের অকারণে হিংসা ও উদ্বিগ্ন করতে থাকে। ভক্তদের প্রতি কারোর কারোর এইরূপ বিদ্বেষভাবের কারণ কী ? আসলে তা তাদের অন্তর্নিহিত রাগ-দ্বেষযুক্ত আসুরী ভাবের জন্যই হয়ে থাকে।

মৃগমীনসজ্জনানাং তৃণজলসন্তোষবিহিত বৃত্তিনাম্

লুব্ধকধীবর পিশুনা নিষ্কারণবৈরিণো জগতি॥ (ভর্তৃহরিনীতিশতক ৬১)

হরিণ, মৎস ও সজ্জন ব্যক্তি যথাক্রমে তৃণ, জল ও সন্তোষের দ্বারাই তাদের জীবন নির্বাহ করে (কাউকে বিরক্ত করে না), কিন্তু ব্যাধ, মৎস্যশিকারী ও দুষ্টব্যক্তি অকারণে এদের সঙ্গে শত্রুতা করে থাকে।

প্রকৃতপক্ষে ভক্তদের দ্বারা অন্যদের উদ্বিগ্ন হওয়ার প্রশ্নই ওঠে না, বরং প্রায়শই দেখা যে ভক্তসঙ্গ লাভের ফলে দুর্জনও তাদের আসুরী ভাব ত্যাগ করে ভক্ত হয়ে ওঠে।

১৫. লোকান্নোদ্বিজতে চ যঃ—ভগবান আগের পদে বলেছেন ভক্তর দ্বারা কোনো প্রাণী উদ্বেগপ্রাপ্ত হন না আর এই পদটিতে বলছেন ভক্তরা নিজেরাও কোনো প্রাণী দ্বারা উদ্বেগপ্রাপ্ত হন না। কারণ সিদ্ধভক্ত প্রাণীমাত্রের ক্রিয়াতেই ভগবদ্‌লীলাই দর্শন করে থাকে। কোনো পার্থিব ক্রিয়া দ্বারাই তাঁর বিন্দুমাত্র উদ্বেগ হয় না।

১৬-১৯. হর্ষামর্ষভয়োদ্বেগৈর্মুক্তো যঃ স চ মে প্রিয়ঃ—ভক্ত 'হর্ষ' থেকে মুক্ত একথার অর্থ এ নয় সিদ্ধভক্ত সর্বদা হর্ষশূন্য (অপ্রসন্ন)ভাবে থাকেন, বরং তাঁর প্রসন্নতা নিত্য হয় যা সাংসারিক পদার্থের সংযুক্তি-

বিযুক্তিতে উৎপন্ন হয় না বা ক্ষণিক, বিনাশশীল এবং হ্রাস-বৃদ্ধি সম্পন্নও হয় না। সর্বত্র ভগবদ্‌বুদ্ধি হওয়ায় তিনি ইষ্ট ভগবান ও তাঁর লীলা দর্শন করে সর্বদাই প্রসন্নভাবে অবস্থান করেন।

কারোর উন্নতি সহ্য করতে না পারা হল 'অমর্ষ', আর ভক্ত হল তার থেকে মুক্ত। সাংসারিক ব্যক্তি অন্যদের বেশি সুখ-সুবিধা, অর্থ, বিদ্যা, সম্মান, যশপ্রাপ্ত দেখলে পরশ্রীকাতর হয়ে পড়েন। আবার সাধকরাও অনেক সময় অন্যদের আধ্যাত্মিক উন্নতি বা আনন্দভাবে কিঞ্চিৎ ঈর্ষান্বিত হয়ে পড়েন। কিন্তু সিদ্ধভক্তের কাছে তাঁর প্রিয় প্রভু ছাড়া অন্য কারো পৃথক অস্তিত্বই থাকে না। তাই তাঁর কার ওপরেই বা অমর্ষভাব থাকবে ? ভক্ত 'ভয়' নামক বিকার থেকেও মুক্ত। ভয় উৎপন্ন হয় ইষ্টর বিয়োগ ও অনিষ্টর সংযোগের আশঙ্কা থেকে। বিভিন্ন কারণে ভয় হতে পারে যেমন—

(১) বাহ্য কারণবশত, যথা—বাঘ, সিংহ, চোর, ডাকাত ইত্যাদির থেকে অনিষ্ট বা সাংসারিক ক্ষতি হওয়ার আকাঙ্ক্ষা। (২) ভিতর কারণবশত, যেমন—ছল, কপট, চুরি, ব্যভিচার আদি শাস্ত্রবিরুদ্ধ ভাব বা আচরণ করা। (৩) সব থেকে বড় ভয় হল মৃত্যুর। বিবেকশীল ব্যক্তিদেরও প্রায়শই মৃত্যু ভয় থাকে। **'স্বরসবাহী বিদুষোঽপি তথারূঢ়োঽভিনিবেশঃ'** (পাতঞ্জল যোগদর্শন ২।৯)।

এই সমস্ত ভয়ই শরীরের (অর্থাৎ জড়র) আশ্রয়েই উৎপন্ন হয়। ভক্ত যতক্ষণ ভগবদ্‌চরণে আশ্রিত থাকেন, তিনি ভয়বর্জিত। তাই সাধকের ততক্ষণই ভয় থকে, যতক্ষণ তিনি সর্বতোভাবে ভগবদ্‌চরণ আশ্রিত না হয়ে প্রকৃতির আশ্রিত থাকেন।

মন একরূপভাবে না থেকে বিক্ষিপ্ত হলে তাকে উদ্বেগ বলে এবং ভক্ত তা থেকেও সদা মুক্ত থাকেন। পঞ্চদশ শ্লোকে ভগবান তিনবার উদ্বেগ থেকে মুক্ত হবার কথা বলেছেন। প্রথম উদ্বেগ হল ভক্তর কোনো ক্রিয়াই মানুষের উদ্বেগের কারণ হতে পারে না। দ্বিতীয় উদ্বেগ হল অপরের কোনো ক্রিয়াই ভক্তর উদ্বেগের কারণ হয় না। তৃতীয় উদ্বেগ হল ভক্তর নিজ ক্রিয়া যথা—নানা কার্য করে ফল না পাওয়া, অনিচ্ছাকৃত প্রাকৃতিক বিপর্যয়,

ভূমিকম্প, বন্যা আদি দুঃখদায়ক দুর্ঘটনা, নিজ কামনা, মান্যতা অথবা সাধন পথে বিঘ্ন হওয়া ইত্যাদি।

ভক্ত এই সব উদ্বেগ থেকে সদাই মুক্ত হন। এর তাৎপর্য হল, ভক্তর অন্তঃকরণে 'উদ্বেগ' বলে কোনো বস্তুই থাকে না। উদ্বিগ্ন হওয়ার মূল কারণ হল অজ্ঞতাজনিত কামনা এবং আসুরী স্বভাব। ভক্তর অজ্ঞান সর্বতোভাবে দূরীভূত হওয়ায় তাদের কোনো কামনা থাকে না এবং আসুরী স্বভাব সাধনাবস্থাতেই শেষ হয়ে যায়। তখন ভগবদ্ ইচ্ছাই ভক্তর ইচ্ছা হয়ে থাকে। ভক্ত তাঁর ক্রিয়ায় ফলরূপে অনিচ্ছাকৃতভাবে প্রাপ্ত, অনুকূল-প্রতিকূল পরিস্থিতিকে ভগবানের কৃপাপূর্ণ বিধানরূপে দেখেন এবং নিরন্তর আনন্দে বিভোর হয়ে থাকেন। তাই ভক্তজনের উদ্বেগ সর্বতোভাবে দূর হয়।

ভগবান এখানে 'ভক্ত' শব্দ ব্যবহার না করে 'মুক্ত' শব্দটি ব্যবহার করেছেন যার অর্থ হল হর্ষ, অমর্ষ, ভয়, উদ্বেগাদি, বিকার, দুর্গুণ-দুরাচার থেকে সর্বতোভাবে মুক্তি। গুণের অহংকার হলে দুর্গুণ নিজে থেকে উৎপন্ন হয়। কোনো গুণের বিকাশে যদি অহংকার উৎপন্ন হয় তবে তাকে আর গুণ বলা যায় না। গুণাদির অহংকারে গুণ কম, দুর্গুণ বেশি থাকে। আর অহংকার থেকেই দুর্গুণ বৃদ্ধি পায় এবং সমস্ত গুণই দুর্গুণ-দুরাচারে পরিণত হয়।

ভক্তর কিন্তু প্রায়শই খেয়ালই থাকে না যে তার মধ্যে কোনো গুণ আছে। তিনি যদি কোনো গুণ দেখেনও তবে তা ভগবানেরই বলে মনে করেন নিজের নয়। এইভাবে গুণের অহংকার না থাকায় ভক্ত সমস্ত দুর্গুণ-দুরাচার ও বিকার থেকে মুক্ত হন। আবার অন্য কিছুকে অস্তিত্ব প্রদান করলে তখন তার প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তিতে উদ্বেগ, ঈর্ষা, ভয় ইত্যাদি আসে। ভক্তর দৃষ্টিতে ভগবান ব্যতীত অন্য কিছুরই অস্তিত্ব নেই তাই তিনি কিসের জন্যই বা উদ্বেগ, ঈর্ষা, ভয় করবেন।

ভক্তর কাছে—

নিজ প্রভুময় দেখহি জগত, কেহি সন করহি বিরোধ।

(শ্রীরামচরিতমানস, উত্তরকাণ্ড ১১২ খ)

২০. **অনপেক্ষ**—ভক্ত কিছুরই অপেক্ষায় থাকেন না অর্থাৎ তিনি সর্বদা আকাঙ্ক্ষারহিত হন। তিনি ভগবানকেই সর্বশ্রেষ্ঠ বলে মনে করেন আর তাঁর কাছে ভগবদ্প্রাপ্তির থেকে বেশি কিছুই হয় না। তাই সংসারের কোনো বস্তুতেই তাঁর আকর্ষণ থাকে না। এমনকি শরীর, ইন্দ্রিয়াদি, মন, বুদ্ধিতেও তিনি আপনভাব রাখেন না। বরং সেগুলিকেও ভগবানের বলে মনে করেন। তাই তাঁর জীবিকা-নির্বাহেরও কোনো চিন্তা থাকে না। প্রকৃতপক্ষে শরীর নির্বাহের প্রয়োজনীয় সামগ্রী স্বাভাবিকভাবেই পাওয়া যায় বরং আকাঙ্ক্ষা করলে বস্তু প্রাপ্তিতে বাধা আসে। প্রায়শই দেখা যায় যাদের নেবার আকাঙ্ক্ষা প্রবল (চোর, তস্কর, স্বার্থপর ইত্যাদি) তাদের কেউ কিছু দিতে চায় না। অপরপক্ষে ত্যাগী সাধু, বালকদের প্রয়োজনের কথা অপরে সহজেই অনুভব করে এবং তাদের শরীর নির্বাহের ব্যবস্থা করে দেয়। কোনো কোনো ভক্ত তো ভগবান দর্শনের আকাঙ্ক্ষাও করেন না। ভগবান যদি দর্শন দেন তো আনন্দ আবার যদি না দেন তাহলেও আনন্দ। তিনি সর্বদাই ভগবানের প্রসন্নতা ও কৃপা অনুভব করে তাতেই আনন্দে বিভোর থাকেন। শ্রীকৃষ্ণ-উদ্ধব সংবাদে ভগবান এইরূপ সিদ্ধ সাধক সম্বন্ধে বলেছেন—

নিরপেক্ষং মুনিং শান্তং নির্বৈরং সমদর্শনম্।
অনুব্রজাম্যহং নিত্যং পুয়েয়েত্যঙ্ঘ্রিরেণুভিঃ॥ (ভাগবত ১১।১৪।১৬)

'যিনি নিরপেক্ষ (কাহারো সাহায্যের অপেক্ষা রাখেন না), সর্বদা মননশীল, শান্ত, দ্বেষবর্জিত এবং সবার প্রতি সমদৃষ্টি সম্পন্ন, সেই মহৎ ব্যক্তির পিছনে আমি সর্বদা অনুগমন করি যাতে তাদের পদধূলি আমার ওপর পতিত হয়ে আমাকে পবিত্র করে।'

মানুষ যদি কোনো পদার্থের আকাঙ্ক্ষায় ভগবানে ভক্তি করে তবে বাস্তবে সে সেই পদার্থেরই ভক্তি করে, ভগবানে নয়। তবে ভগবান এতই উদার যে তিনি সেই সেই ব্যক্তিকেও তাঁর ভক্ত রূপে স্বীকৃতি দান করেন। উদাহরণস্বরূপ অর্থার্থী ভক্ত ধ্রুবের নাম নেওয়া যেতে পারে এবং তাদের আকাঙ্ক্ষা পূরণ করে ক্রমে সর্বতোভাবে নিস্পৃহ করে তোলেন।

২১. শুচি—শরীরে অহংবোধ ও মমত্ববোধ (আমি ও আমার ভাব) না থাকায় ভক্তর দেহ অতি পবিত্র হয়। আবার অন্তঃকরণে রাগ-দ্বেষ, হর্ষ-শোক, কাম-ক্রোধাদি বিকার না থাকায় তাঁদের হৃদয়ও অত্যন্ত পবিত্র হয়। তিনি **'পবিত্রানাং পবিত্রং চ'** পবিত্রকেও পবিত্র করে থাকেন।

মহামতি বিদুর সমগ্র ভারততীর্থ পরিক্রমা করে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের শেষে হস্তিনাপুরে প্রবেশ করলে যুধিষ্ঠির বলছেন—**'তীর্থীকুর্বন্তি তীর্থানি স্বান্তঃ স্থেন গদাভৃতা'** (ভাগবত ১।১৩।৯)। অর্থাৎ হে বিদুর আপনার ন্যায় ভক্ত শ্রেষ্ঠগণ তীর্থের মতোই পবিত্র, আপনারা স্বহৃদয়ে গোবিন্দকে ধারণ করে ভ্রমণ করায় তীর্থও মহাতীর্থরূপে পরিগণিত হয়।

মহারাজ ভগীরথ স্বর্গ থেকে পৃথিবীতে গঙ্গা আনয়নের জন্য তপস্যা করলে, গঙ্গা দর্শন দিয়ে বললেন—'হে ভগীরথ ! আমি যখন পৃথিবীতে অবতরণ করব তখন পাপীগণ এসে আমার জলে পাপ প্রক্ষালন করলে আমি সে পাপ কোথায় প্রক্ষালন করব।'

তখন ভগীরথ বলছেন—

সাধবো ন্যাসিনঃ শান্তা ব্রহ্মিষ্ঠা লোকপাবনাঃ।
হরন্ত্যঘং তেঽঙ্গসঙ্গাৎ তেষ্বাস্তে হ্যঘভিদ্ধরিঃ।। (ভাগবত ৯।৯।৬)

'মাত ! ইহলোকে-পরলোকে সমস্ত কামনা পরিত্যাগপূর্বক যে সব ব্রহ্মনিষ্ঠ সাধু-সন্ত জগৎ পবিত্রকারী—তাঁরাই আপনার জলে স্নান করে আপনার সমস্ত পাপ হরণ করবেন, কারণ তাঁদের হৃদয়ে পাপহারী গোবিন্দ সদা বাস করেন।'

২২. দক্ষঃ—যিনি উপযুক্ত কাজ নিপুণভাবে করেন, তিনিই দক্ষ। মানব জীবনের উদ্দেশ্যই হল ভগবদ্প্রাপ্তি এবং এই জন্যই মনুষ্যদেহ পাওয়া। সুতরাং যিনি এই উদ্দেশ্য সম্পন্ন করেছেন অর্থাৎ এই মনুষ্যদেহেই ভগবানকে লাভ করেছেন তিনি দক্ষ, তিনিই বুদ্ধিমান।

ভাগবতের শ্রীকৃষ্ণ-উদ্ধব সংবাদে ভগবান তাই বলছেন—

এষা বুদ্ধিমতাং বুদ্ধির্মনীষা চ মণীষিণাম্।
যৎ সত্যমনৃতেনেহ মর্তোনাপ্নোতি মামৃতম্।। (ভাগবত ১১।২৯।২২)

'যুক্তিশীল ব্যক্তিদের বিবেক ও বুদ্ধিমান ব্যক্তিদের বুদ্ধির এতই পরাকাষ্ঠা যে তারা এই বিনাশশীল ও অসৎ শরীরের সাহায্যেই আমার মতন অবিনাশী তত্ত্বকে প্রাপ্ত হয়।'

সাংসারিক দক্ষতা প্রকৃতপক্ষে দক্ষতা নয়। একভাবে দেখলে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে অত্যধিক দক্ষতা আবদ্ধেরই কারণ হয়ে পড়ে। কারণ এর ফলে জড় পদার্থের প্রতি আকর্ষণ বৃদ্ধি পায় ও মানুষের পতন হয়।

সিদ্ধভক্তদের মধ্যে অনেকসময় ব্যবহারিক (সাংসারিক) দক্ষতাও থাকে। কিন্তু ব্যবহারিক দক্ষতাকে পারমার্থিক দক্ষতার কষ্টিপাথর মনে করা প্রকৃতপক্ষে সিদ্ধভক্তর অপমান করা।

২৩. উদাসীনঃ—উদাসীনের অর্থ হল উৎ+আসীন অর্থাৎ ওপরে বসা, তটস্থ, পক্ষপাতরহিত হওয়া ইত্যাদি। উদাসীন শব্দটি নির্লিপ্ততার দ্যোতক। যেমন উঁচু পর্বতে আসীন কোনো ব্যক্তির ওপর নীচে প্রজ্জলিত আগুন বা বন্যার কোনো প্রভাব পড়ে না, তেমনি কোনো ঘটনা, অবস্থা বা পরিস্থিতির প্রভাবই ভক্তর ওপর পড়ে না, তিনি সর্বদা নির্লিপ্ত থাকেন।

যে ব্যক্তি ভক্তদের হিত চান এবং তাঁদের অনুকূল আচরণ করেন, তাঁদের ভক্তদের মিত্র বলে বুঝতে হবে। আর যেসব ব্যক্তি ভক্তদের অহিত চায় এবং প্রতিকূল আচরণ করে তাদের ভক্তদের শত্রু বলে বুঝতে হবে। ভক্তর শত্রু ও মিত্রর প্রতি ব্যবহারে পার্থক্য থাকলেও অন্তরে দুই প্রকার মানুষের প্রতি বিন্দুমাত্র ভিন্নভাব থাকে না। তিনি শরীর সহ সমস্ত জগৎই ভগবানের বলে মনে করেন তাই তাঁর অন্তরের ভাব পক্ষপাতহীন হয়।

২৪. গতব্যথঃ—কিছু পাওয়া যাক বা না যাক, যাঁর চিত্তে দুঃখ-চিন্তা-শোকরূপ কোনো চিন্তাই হয় না, সেই ভক্তকেই 'গতব্যথঃ' বলে।

২৫. সর্ব আরম্ভ পরিত্যাগী—ভোগ ও সম্পদ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে নতুন নতুন কর্ম করাকে 'আরম্ভ' বলে। সুখভোগের উদ্দেশ্যে নতুন নতুন জিনিস কেনা, টাকা বাড়ানোর জন্য নতুন নতুন কাজ শুরু করা ইত্যাদি হচ্ছে আরম্ভ। যার মধ্যে পরমাত্মা প্রাপ্তির জন্য সত্যকারের আকাঙ্ক্ষা থাকে, সেই সাধক যে কোনো মার্গেরই হোন না কেন, ভোগের লালসা বা সম্পদ-

সংগ্রহের লালসায় কখনো নতুন কোনো কর্ম আরম্ভ করেন না। তাঁর সমস্ত কর্মই ভগবানের প্রসন্নতার নিমিত্ত হয়ে থাকে। ধন-সম্পত্তি, সুখ-আরাম, মান-মর্যাদা ইত্যাদির জন্য কর্ম তাঁর দ্বারা কখনোই হয় না।

ভগবান এই 'সর্বারম্ভপরিত্যাগী' পদটি গীতায় দুইবার বলেছেন। এখানে বলেছেন **'সর্বারম্ভপরিত্যাগী যো মদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ'** (১২।১৬) অর্থাৎ নতুন কর্মারম্ভ সর্বতোভাবে বর্জনকারী ভক্তই আমার প্রিয়। আবার চতুর্দশ অধ্যায়ে বলেছেন **'সর্বারম্ভপরিত্যাগী গুণাতীতঃ স উচ্যতে'** (গীতা ১৪।২৫)—অর্থাৎ সব-কিছুর প্রারম্ভেই যিনি কর্তৃত্বভাববর্জিত, তাঁকেই গুণাতীত বলা হয়। আর গুণাতীত হলে কি হয়—

স গুণান্ সমতীত্যৈতান্ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে। (গীতা ১৪।২৬)

গুণাতীত ব্যক্তি সচ্চিদানন্দঘন ব্রহ্মলাভ করেন। এই গুণাতীত মহাপুরুষদের মধ্যে কর্তৃত্ব না থাকায় তাঁরা সর্বারম্ভ পরিত্যাগী হন। আর ভক্তর মধ্যে স্বার্থভাব এবং অহং-অভিমান না থাকায় তাঁরা সর্বারম্ভ-পরিত্যাগী হন। ভক্তর নিজের জন্য কিছু করার থাকে না। তাঁদের দ্বারা কোনো কাজ আরম্ভ তো হতে পারে, কিন্তু এতে তাঁদের কোনো আসক্তি, প্রয়োজন বা আগ্রহ থাকে না, আরম্ভ হলেও ঠিক আছে না হলেও ঠিক আছে। তাঁরা এই দুয়েতেই সম থাকেন।

২৬. যো মদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ—ভগবানের মধ্যে স্বভাবতই এমন এক মহান আকর্ষণ থাকে যে ভক্ত স্বাভাবিকভাবে তাঁর প্রতি আকর্ষিত হয়, তার প্রেমিক হয়ে ওঠে। ভাগবতে আছে যে যখন সুত শৌনক ঋষিদের বলছেন যে ব্যাসদেব শ্রীশুকদেবকে ভাগবত অধ্যয়ন করান, তখন শৌনক ঋষিগণ আশ্চর্যান্বিত হয়ে বলছেন যে এ কি করে সম্ভব। শ্রীশুকদেবের মতন জ্ঞানী ও মননশীল মহাপুরুষের পক্ষে কি করে এই ভক্তিশাস্ত্র অধ্যয়ন করা সম্ভব।

তখন সুত বলছেন—

আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে।
কুর্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিমিত্থম্ভূতগুণো হরিঃ॥ (ভাগবত ১।৭।১০)

'জ্ঞানের সাহায্যে যাঁহাদের চিৎ-জড়গ্রন্থি ছিন্ন হয়েছে, সেই আত্মারাম

মুনিগণও ভগবানে অহৈতুক (নিষ্কাম) ভক্তি করে থাকেন। কারণ ভগবানের এমনই গুণ যে তিনি সকল প্রাণীকেই তাঁর দিকে আকর্ষিত করেন।'

এখন প্রশ্ন এই যে ভগবানের যদি এতই আকর্ষণ, তাহলে সব মানুষ তাঁর দিকে আকর্ষিত হন না কেন ? সকলেই কেন তাঁর প্রেমিক হয় না ? এর কারণ এই যে মানুষ ভোগাদি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ে আসক্ত থাকায় তার মধ্যে অবস্থিত ভগবানকে অনুভব করতে পারে না। কিন্তু যখন এই বিনাশশীল ভোগে আর তার আকর্ষণ থাকে না, তখন স্বতঃই ভগবানের দিকে তার মন আকৃষ্ট হয়। তখন ভগবানের সঙ্গে তার প্রেম হয় আর এইরূপ অনন্য ভক্তকেই ভগবান 'মদ্ভক্তঃ' বলেছেন।

২৭-২৮. যো ন হৃষ্যতি ন দ্বেষ্টি ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি—প্রধান বিকার চার প্রকারের (১) রাগ, (২) দ্বেষ, (৩) হর্ষ ও (৪) শোক। সিদ্ধভক্তদের এই প্রকার বিকার হয় না। কারণ ভক্তদের ভগবদ্ দর্শন হলে এই চারপ্রকার বিকার সর্বতোভাবে দূর হয়। সাধন অবস্থাতেও সাধক যেমন যেমন তার সাধনাতে অগ্রগতি লাভ করেন, তেমন তেমন তাঁর রাগ-দ্বেষাদি কমতে থাকে।

রাগ ও দ্বেষের দুইটি পরিণাম— হর্ষ ও শোক। যার প্রতি (অনু)-রাগ হয়, তার সংযোগে এবং যার প্রতি (বি)-দ্বেষ হয় তার বিয়োগে হর্ষ হয় অপর পক্ষে যার প্রতি (অনু)-রাগ হয় তার বিয়োগে বা বিয়োগের আশঙ্কায় এবং যার প্রতি (বি)-দ্বেষ হয় তার সংযোগে বা সংযোগের আশঙ্কায় 'শোক' হয়। সিদ্ধ ভক্তদের মধ্যে রাগ-দ্বেষের অত্যন্ত অভাব হওয়ায় তাঁদের একই স্বাভাবিক অবস্থা নিত্য বিরাজমান থাকে। তাঁরা এইসব বিকার থেকে সর্বতোভাবে মুক্ত।

যেমন রাত্রিকালে অন্ধকারে 'দীপ জ্বালাবার' ইচ্ছা হয়, 'দীপ জ্বালালে' আনন্দ হয়, যে ব্যক্তি 'দীপ নিভিয়ে দেয়' তার প্রতি দ্বেষ বা ক্রোধ আসে এবং 'পুনরায় দীপ কিভাবে জ্বালানো যায়' তার চিন্তা হয়। রাত্রিকালে এই চারটি ক্রিয়া দ্বারা চারটি বিকার উৎপন্ন হয়। কিন্তু মধ্যাহ্নে সূর্য তাপপ্রদান করে, তাই কারোর দীপ জ্বালাবার ইচ্ছা হয় না, দীপ জ্বালালে আনন্দও হয় না

আর দীপ নিভিয়ে দিলে দ্বেষ বা ক্রোধও হয় না। আর অন্ধকার না থাকায় আলোর অভাবের কথা মনেও হয় না। এইরূপ ভগবান বিমুখ হয়ে সংসারের আশ্রিত হলে শরীর-নির্বাহ ও সুখের জন্য চাই অনুকূল পরিস্থিতি তখন পদার্থর প্রতি রাগ আসে আর তা পেলে জাগে হর্ষ এবং প্রাপ্তিতে বাধা পেলে বাধাদানকারীর প্রতি জাগে দ্বেষ এবং না পেলে শোক (বা চিন্তা) উৎপন্ন হয়। কিন্তু যিনি মধ্যাহ্ন সূর্যের ন্যায় ভগবদ্প্রাপ্তি লাভ করেছেন তাঁর মধ্যে কখনো এই বিকার থাকে না। তিনি পূর্ণকাম হয়ে যান।

২৯. শুভাশুভ পরিত্যাগী—ভক্ত শুভকর্মগুলিকে করেন মমত্ববোধ, আসক্তি ও ফলেচ্ছারহিত হয়ে, তাই তাঁর সকল কর্মগুলি অকর্ম হয়। তাই ভক্তকে শুভ কর্মফল ত্যাগীও বলা হয়। আর ভক্ত সর্বোতভাবে রাগ-দ্বেষ বর্জিত হওয়ায় তাঁর দ্বারা কেনো অশুভ কর্ম হয় না। সেইজন্য ভক্তকে অশুভ কর্মত্যাগীও বলা হয়। ভক্তের শুভকর্মে অনুরাগ থাকে না আর অশুভ কর্মে দ্বেষ থাকে না তাই তাঁর দ্বারা স্বাভাবিকভাবেই শুভকর্মর আচরণ ও অশুভকর্মর পরিত্যাগ হয়ে থাকে। কর্ম মানুষকে আবদ্ধ করে না বরং কর্মে যে রাগ-দ্বেষ থাকে তাই তাকে আবদ্ধ করে। রাগ-দ্বেষ, হর্ষ-শোক ইত্যাদি হল দ্বন্দ্ব। ভক্তর মধ্যে কোনো দ্বন্দ্ব থাকে না। নারদ ভক্তিসূত্রে আছে—

যতপ্রাপ্য ন কিঞ্চিদ্ বাঞ্ছতি, ন শোচতি, ন দ্বেষ্টি, ন রমতে, নোৎসাহী ভবতি। (নারদ ভক্তিসূত্র ৫)

যে ভক্তিলাভ হলে, ভক্ত কোনো বস্তু কামনা করে না, শোক করে না, দ্বেষ করে না, কোনো বস্তুতে বা বস্তুলাভে উৎসাহী হন না।

ভক্তর লক্ষণ বর্ণনা প্রসঙ্গে ভগবান এই পাঁচটি প্রকরণের অন্তিম প্রকরণে পাঁচটি দ্বন্দ্বাত্মক সমতা ও পাঁচটি অন্য লক্ষণ সহ মোট দশটি দৈবী-ভাবের কথা বলেছেন।

৩০. সমঃ শত্রৌ চ মিত্রে চ—ভগবান এখানে ভক্তগণের মানুষের প্রতি যে সমভাব থাকে সেটির বর্ণনা করেছেন। সাধারণ মানুষই তাঁদের স্বভাব অনুযায়ী, কারো ব্যবহারে অনুকূলতা-প্রতিকূলতা আরোপ করে, মিত্রভাব বা শত্রুভাব পোষণ করে থাকে। কিন্তু ভক্ত নিজের মধ্যে অনুকূলতা-

প্রতিকূলতা ভাব পোষণ না করায় এবং সর্বদাই পূর্ণভাবে থাকায় এবং সর্বত্র ভগবদ্‌বুদ্ধি হওয়ায় তাঁর চিত্তে কখনো শত্রু-মিত্র ভাব উৎপন্ন হয় না।

৩১. তথা মান অপমানয়োঃ—মান-অপমান পরকৃত ক্রিয়া, যা শরীরের প্রতি হয়। ভক্তের নিজের বলে যে দেহ তাতে অহংভাবও থাকে না, মমত্ববোধও থাকে না। তাই শরীরের মান-অপমান হলেও তাতে ভক্তর চিত্তের কোনো বিকার (হর্ষ বা শোক) উৎপন্ন হয় না। তিনি নিত্য নিরন্তর সমতায় স্থিত থাকেন।

৩২-৩৩. শিতোষ্ণ সুখদুঃখেষু সমঃ—এই পদ দুটির দ্বারা সিদ্ধ ভক্তর সমতার কথা বলা হয়েছে।

(ক) শীত-উষ্ণে সমতা অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গুলি নিজ নিজ বিষয়ে সংযুক্ত হলেও কোনো বিকার উৎপন্ন না হওয়া।

(খ) সুখ-দুঃখে সমতা অর্থাৎ ধনাদি পদার্থের প্রাপ্তিতে বা অপ্রাপ্তিতে কোনো বিকার উৎপন্ন না হওয়া।

শিতোষ্ণ ও সুখ-দুঃখের পরিস্থিতি অবশ্যম্ভাবী, এর থেকে মুক্ত হওয়া সম্ভব নয়। ভক্তের জীবনে এইরূপ অনুকূল-প্রতিকূল পরিস্থিতি উৎপন্ন হলেও তাতে তাঁর মধ্যে হর্ষ-শোক উৎপন্ন হয় না।

৩৪. তুল্যনিন্দাস্তুতিঃ—নিন্দা-স্তুতি মূলত নামেরই হয়ে থাকে, এটিও মান-অপমানের মতো পরকৃত ক্রিয়া। লোকেরা নিজ নিজ স্বভাব অনুসারে ভক্তদের স্তুতি বা নিন্দা করে থাকে কিন্তু ভক্তদের নিজ নাম ও শরীরের প্রতি বিন্দুমাত্র অহংবোধ ও মমতা না থাকায় এই নিন্দা-স্তুতির কোনো প্রভাবই তাঁদের ওপর পড়ে না।

সাধারণ মানুষের মধ্যে নিজ প্রশংসা শোনার আগ্রহ থাকে, তাই তারা নিজ নিন্দা শুনে দুঃখ পায় আর প্রশংসা শুনে খুশি হয়। অপরপক্ষে সাধক পুরুষরা নিন্দা শুনে সতর্ক হন আর প্রশংসা শুনে লজ্জিত হন। সিদ্ধভক্ত কিন্তু নিজ নামের বা শরীরের প্রতি বিন্দুমাত্র আত্মীয়তা না থাকায় উভয় ভাবেই অর্থাৎ নিন্দা-স্তুতিতে সমভাব থাকেন। অবশ্য কখনো কখনো লোকসংগ্রহের জন্য সিদ্ধভক্তরাও সাধকদের মতন নিন্দাতে সতর্ক ও

স্তুতিতে লজ্জিত হওয়ার মতো ব্যবহার করে থাকেন। ভক্তর সর্বত্র ভগবদ্ বুদ্ধি থাকায় তারা নিন্দা বা স্তুতিকারীদের মধ্যে ভেদভাব রাখেন না। ভক্তর দ্বারা অশুভ কাজ তো হয়ই না, আর তিনি তাঁর করা শুভকর্মর জন্য ভগবানকেই হেতু বলে মনে করে থাকেন। তা সত্ত্বেও যদি কেউ তাঁর নিন্দা বা প্রশংসা করে তবে তাতে তাঁর কোনো বিকার হয় না।

৩৫. সঙ্গবর্জিতঃ—'সঙ্গ' শব্দটির অর্থ 'সম্বন্ধ' ও 'আসক্তি'। মানুষের স্বরূপত (বাহ্যরূপে) সমস্ত পদার্থের সঙ্গ বা সম্বন্ধ পরিত্যাগ করা সম্ভব নয়। কারণ মানুষ যতক্ষণ জীবিত থাকে, ততক্ষণ শরীর-মন-বুদ্ধি-ইন্দ্রিয়াদিও তার সঙ্গে থাকে। তবে শরীর থেকে পৃথক কিছু পদার্থ বাহ্যিকভাবে ত্যাগ করা সম্ভব। কিন্তু যদি কোনো ব্যক্তি স্বরূপত প্রাণী ও পদার্থের সঙ্গ পরিত্যাগ করেও তার চিত্তে সেই প্রাণী বা পদার্থের প্রতি বিন্দুমাত্রও আসক্তি রাখে তবে সেই প্রাণী বা পদার্থর থেকে সে দূরে থাকলেও তাদের সঙ্গে সম্পর্ক বজায় থাকে। অন্যদিকে যদি চিত্তে প্রাণী বা পদার্থের প্রতি বিন্দুমাত্র আসক্তি না থাকে তাহলে পদার্থগুলি কাছে থাকলেও প্রকৃতপক্ষে তাদের সঙ্গে সম্পর্ক থাকে না। পদার্থ ও প্রাণীকে বাহ্যত ত্যাগ করলেই যদি মুক্তি হত তা হলে মৃত্যুপথগামী প্রত্যেক ব্যক্তিই মুক্তিলাভ করত। কিন্তু ব্যাপার তা নয়, চিত্তে আসক্তি থাকার জন্য শরীরত্যাগ করেও মুক্তিলাভ হয় না। আসক্তি দূর করার জন্য পদার্থগুলি বাহ্যিক ত্যাগ করাও এক প্রকার সাধনা হতে পারে কিন্তু, আসল প্রয়োজন আসক্তি সর্বতোভাবে পরিত্যাগ করা।

ভগবান দ্বিতীয় অধ্যায়ে বলেছেন '**রসবর্জং রসোঽপ্যস্য পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ততে**' (গীতা ২।৫৯) অর্থাৎ বিষয়-আসয় পরিত্যাগ করলেও আসক্তি থেকে যায় কিন্তু ভগবদ্প্রাপ্তি হলে আসক্তি সর্বতোভাবে নিবৃত্ত হয়। যদিও কখনো কখনো ভগবদ্প্রাপ্তির আগেও আসক্তির নিবৃত্তি হতে পারে কিন্তু ভগবদ্প্রাপ্তির পর আসক্তি সর্বতোভাবে নিবৃত্তি হয়েই যায়। ভক্ত নিজ অংশী ভগবান হতে বিমুখ হয়ে ভ্রমবশত জগৎ-সংসারকে নিজের বলে মেনে নিলেই, সংসারে অনুরাগ আসে এবং এই অনুরাগ থেকে আসক্তি জন্ম

নেয়। সংসারের প্রতি এই মেনে নেওয়া আত্মীয়তাবোধ সর্ব্বতোভাবে দূর হলে বুদ্ধিতে সমতা (সমত্ব) আসে এবং বুদ্ধি সম হলেই অন্তর থেকে আসক্তি দূর হয়।

এর তাৎপর্য এই যে ভগবানে অনুরাগ প্রকটিত হলেই আসক্তি দূর হতে থাকে (সূর্যোদয়ে তমোনাশের ন্যায়) আর বৈরাগ্য উৎপন্ন হয়। আর যেমন যেমন বৈরাগ্য প্রকটিত হতে থাকে তেমন তেমন ভগবানে অনুরাগও বৃদ্ধি পায়। আর আসক্তি দূর হলে তৎ বিরোধী বৈরাগ্য স্বয়ংই শান্ত হয় যেমন কাঠকে পুড়িয়ে আগুন শান্ত হয়। আর পরস্পর বিরোধী আসক্তি ও বৈরাগ্য না থাকলে ভগবানে অনুরাগের (ভগবৎপ্রেমের) স্রোত স্বাভাবিকভাবে প্রবাহিত হতে থাকে। তার জন্য কোনো চেষ্টা করতে হয় না। তখন ভক্ত সর্বপ্রকারেই ভগবানে পূর্ণ সমর্পিত হয়ে থাকেন, তাঁর সকল কর্মই ভগবানে সমর্পিত হয়। ভগবান এতে প্রসন্ন হয়ে সেই ভক্তকে প্রেমদান করেন। ভক্ত সেই প্রেমও ভগবানেই অর্পণ করেন। তাতে আনন্দিত হয়ে ভগবান তাঁকে পুনর্বার প্রেম প্রদান করলে, ভক্তও পুনর্বার তা ভগবানে প্রদান করেন। এইভাবে ভক্ত ও ভগবানের মধ্যে প্রতিক্ষণ ক্রমবর্ধমান প্রেমের আদান-প্রদানের লীলা চলতেই থাকে।

৩৬. মৌনী—সিদ্ধ ভক্তর দ্বারা স্বতঃ স্বাভাবিকভাবে ভগবদ্স্বরূপের মনন হতে থাকে, তাই তাঁকে 'মৌনী' বা মননশীল বলা হয়েছে।

৩৭. সন্তুষ্টো যেন কেনচিৎ—অন্য ব্যক্তির কাছে সিদ্ধভক্ত সদাই **'সন্তুষ্টো যেন কেনচিৎ'** বলে মনে হয় অর্থাৎ প্রারব্ধ অনুসারে শরীরনির্বাহের জন্য যা কিছু পাওয়া যায়, তাতেই সন্তুষ্ট বলে প্রতীত হয় ; কিন্তু ভক্তর সন্তুষ্টির প্রকৃত কারণ, কোনো সাংসারিক পদার্থ বা পরিস্থিতি নয়। ভগবানে অনুরাগ হওয়ার জন্যই ভক্ত নিত্য-নিরন্তর ভগবানেই সন্তুষ্ট থাকেন, সংসারের সমস্ত অনুকূল-প্রতিকূল পরিস্থিতিতেই তিনি সমভাবে অবস্থান করেন। অত্যন্ত ভগবদ্প্রীতি থাকায় তিনি প্রতিটি অনুকূল-প্রতিকূল পরিস্থিতি ভগবানের মঙ্গলময় বিধানরূপ অনুভব করেন।

৩৮. **অনিকেতঃ**—নিকেতন মানে বাসস্থান। অনিকেত মানে যার কোনো বাসস্থান নেই নয়, যার বাসস্থানের প্রতি কোনো প্রকার আসক্তি বা মমত্ব নেই তাকেই বোঝায়। ভক্তর কেবল গৃহাদি বা আশ্রমাদির প্রতিই নয় তার শরীররূপী আবাসের (স্থূল-সূক্ষ্ম ও কারণ শরীরের) প্রতিও কোনো আসক্তি থাকে না তাই তিনি '**অনিকেতঃ**'।

৩৯. **স্থিরমতিঃ**—ভক্তর বুদ্ধিতে ভগবদ্ সত্ত্বা এবং স্বরূপের বিষয়ে কোনো সংশয় বা বিপর্যয় (বিপরীত জ্ঞান) হয় না। তাঁদের বুদ্ধি ভগবদ্‌তত্ত্ব জ্ঞান থেকে কোনো অবস্থাতেই বিচলিত হয় না। তাঁর ভগবদ্‌তত্ত্ব অনুভূত হয়েছে তাই সেটির জন্য তাঁর কোনো প্রমাণ বা শাস্ত্র-বিচার বা স্বাধ্যায় ইত্যাদির প্রয়োজনীয়তা থাকে না ; সেইজন্য তাঁকে 'স্থিরমতিঃ' বলা হয়েছে। স্থিরবুদ্ধি না হওয়ার প্রধান কারণ হল 'কামনা'—'**ভোগৈশ্বর্য-প্রসক্তানাং তয়াপহৃত চেতসাম্**' (গীতা ২।৪৪)। ভোগ ও ঐশ্বর্যে অত্যাসক্ত ব্যক্তির পরমাত্মাতে স্থির বুদ্ধি হয় না। তাই স্থিরবুদ্ধি হওয়ার উপায় হল কামনা ত্যাগ। '**প্রজহাতি যদা কামান্ ....স্থিতপ্রজ্ঞস্তদোচ্যতে**' (গীতা ২।৫৫)। যখন কোনো ব্যক্তি মন থেকে সমস্ত কামনাবাসনা পরিপূর্ণভাবে বিসর্জন দেন তখন তাঁকে স্থিতপ্রজ্ঞ বলা হয়। যেমন সিনেমার দৃশ্যাবলী মিথ্যা জানলেও তাতে আসক্তি দূর হয় না সেইরকম যতক্ষণ অন্তরে জাগতিক সুখের কামনা থাকে ততক্ষণ জগৎকে মিথ্যা বলে জানলেও জাগতিক আসক্তি দূর হয় না। অতএব যে কোনো উপায়ে হোক না কেন এই আসক্তি অর্থাৎ জাগতিক কামনাকে সর্বতোভাবে দূর করতে হবে।

ভক্তিমান্ মে প্রিয়ো নরঃ—ভগবান 'ভক্ত লক্ষণের' সাতটি শ্লোকে চারবার '**মে প্রিয়ঃ**' ও সর্বশেষে '**প্রিয়ঃ নর**' বলে উল্লেখ করে, সিদ্ধভক্তদের লক্ষণগুলিকে পাঁচভাগে ভাগ করেছেন। এই পাঁচটি প্রকরণের যে কোনো একটি প্রকরণের সব লক্ষণই যার মধ্যে থাকে তিনিই ভগবানের প্রিয় ভক্ত। সাধকের নিজ রুচি, বিশ্বাস, যোগ্যতা ও স্বভাব অনুযায়ী যে সাধক, কোনো একটি প্রকরণের ভক্ত-লক্ষণ সামনে রেখে

নিজ নিজ জীবন তৈরী করেন, সেই ভগবানের ভক্ত ও সেই ভগবানের প্রিয়।

'যো মদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ', 'ভক্তিমান্ মে প্রিয়ঃ নরঃ' ইত্যাদি পদগুলি প্রতি প্রকরণের শেষেই আছে। এর অর্থ হল ভক্তগণ ভক্তির জন্যই ভগবানের প্রিয়, গুণাদির (লক্ষণাদির) জন্য নয়। ভগবানকে পাওয়ার জন্য গুণ প্রধান নয়, প্রধান হল ভক্তি।

সাধক ভক্ত-লক্ষণ—দ্বাদশ অধ্যায়ে সিদ্ধ ভক্ত-লক্ষণ বর্ণনা করে অন্তিম শ্লোকে সাধক ভক্ত প্রসঙ্গ বর্ণনা করেছেন। এই প্রসঙ্গে ভগবান বলেছেন সাধক ভক্ত হবেন—শ্রদ্দধানাঃ, মৎপরমাঃ ও ধর্ম্যামৃতম্ পর্যুপাসতে।

শ্রদ্দধানাঃ—সাধক ভক্ত শ্রদ্ধাযুক্ত হয়ে ভগবানের অমৃতময় উপদেশ (যা ত্রয়োদশ থেকে উনবিংশ শ্লোকে বর্ণিত হয়েছে) অনুযায়ী কেবল ভগবদ্-প্রাপ্তির জন্যই নিজের জীবনে ধারণ করার জন্য সচেষ্ট হন। যদিও 'ভক্তির' সাধনায় শ্রদ্ধা ও প্রেম এবং 'জ্ঞানের' সাধনায় বিবেকের গুরুত্ব থাকে, তবু এমন মনে করার কোনো কারণ নেই যে ভক্তি সাধনায় বিবেক এবং জ্ঞান সাধনায় শ্রদ্ধার কোনো দরকার নেই। প্রকৃতপক্ষে সকল সাধনাতেই শ্রদ্ধা ও বিবেকের অত্যন্ত প্রয়োজন আছে।

মৎপরমাঃ— সাধক ভক্তদের সিদ্ধভক্তে অত্যন্ত পূজ্যভাব থাকে এবং তাঁদের অনুসরণ করেই ভগবদ্‌পরায়ণ হন।

ভক্তিযোগীদের সম্বন্ধে বলতে গিয়ে ভগবান বলেছেন—মৎপরমঃ (গীতা ১১।৫৫), মৎপরাঃ (গীতা ১২।৬)। আর এখানে বলেছেন মৎপরাঃ (গীতা ১২।২০)। এর তাৎপর্য হল ভগবান বলতে চেয়েছেন ভক্তিযোগে ভগবদ্‌পরায়ণতাই প্রধান। আর ভগবদ্‌পরায়ণ হলে ভগবদ্ কৃপায় স্বতঃস্ফূর্ত ভাবেই সাধন হয় এবং অসাধনের (সাধনের বিঘ্নগুলির) নাশ হয়।

ধর্ম্যামৃতমিদং যথোক্তং পর্যুপাসতে—সিদ্ধ ভক্তদের উনচল্লিশটি লক্ষণের প্রতিটিই ধর্মময় অর্থাৎ ধর্মে ওতপ্রোত। তাতে অপগুণের লেশমাত্র অংশ নেই। আর যে সাধনায় সাধন-বিরোধী অংশ থাকে না, সেটি অমৃত

তুল্য হয়ে ওঠে। আর সাধক ভক্ত এই অমৃতময় ধর্মই সাধন করে থাকেন। যতক্ষণ সাধনের সঙ্গে অসাধন এবং গুণের সঙ্গে অপগুণ থাকে, ততক্ষণ সাধকের মনে নিজ সাধনার বা গুণের অহংকার থেকে যায়, যেটি আসুরী সম্পদের আধার। তাই 'ধর্ম্যামৃত' যথোক্তভাবে অর্থাৎ যেমন বর্ণনা আছে ঠিক তেমনভাবেই পালন করার কথা বলা হয়েছে। ধর্ম্যামৃত পালনে যদি দোষ অর্থাৎ অসাধন থাকে তাহলে ভগবদ্প্রাপ্তি হয় না। সুতরাং সাধকদের এই বিষয়ে সতর্ক থাকা উচিত।

আগের শ্লোকগুলিতে সিদ্ধভক্তদের ভগবান প্রিয় বলে জানিয়েছেন আর বর্তমান শ্লোকে সাধকদের সম্বন্ধে ভগবান বলেছেন **'ভক্তাস্তেঽতীব মে প্রিয়াঃ'** অর্থাৎ সাধকরা তাঁর অত্যন্ত প্রিয়। এর কারণ হল সিদ্ধদের দৃষ্টিতে একমাত্র পরমাত্মা ব্যতীত আর কিছু নেই আর সাধকদের দৃষ্টিতে অন্য অস্তিত্বও বিদ্যমান থাকে। তাই তাঁরা উপাসনা করে (পর্যুপাসতে), নিজেদের জীবন ওইভাবে তৈরি করেন, আর তাঁদের মধ্যে এই ভাব থাকে যে ভগবান ব্যতীত আর কিছু যদি থাকে তাহলে সেগুলিও ভগবানেরই লীলা। সিদ্ধ ভক্তদের তো তত্ত্বের অনুভূতি অর্থাৎ ভগবদ্প্রাপ্তি হয়েছে, কিন্তু সাধক ভক্তদের ভগবদ্প্রাপ্তি না হলেও তারা শ্রদ্ধাপূর্বক ভগবদ্পরায়ণ হয়ে থাকেন। তাই তারা ভগবানের অত্যন্ত প্রিয়। আবার সিদ্ধভক্তদের ভগবান প্রত্যক্ষভাবে দর্শন দিয়ে নিজেকে ঋণমুক্ত বলে মনে করেন, কিন্তু সাধকভক্ত প্রত্যক্ষদর্শন না পেলেও সরল বিশ্বাসে বা একমাত্র ভগবদ্‌বিশ্বাসে তাঁকে ভক্তি করেন। তাই তখনো তাঁদের দর্শন দান না করায় ভগবান নিজেকে তাঁদের কাছে ঋণী বলে মনে করায় তাঁদের অত্যন্ত প্রিয় বলে মনে করেন।

ভগবান শ্রীমদ্ভাগবতের শ্রীকৃষ্ণ-উদ্ধব সংবাদে বলছেন—

যাবৎ সর্বেষু ভূতেষু মদ্ভাবো নোপজায়তে।
তাবদেবমুপাসীত বাঙ্মনঃ কায়বৃত্তিভিঃ॥
সর্বং ব্রহ্মাত্মকং তস্য বিদ্যয়াঽঽত্মমনীষয়া।
পরিপশ্যন্নুপরমেৎ সর্বতো মুক্তসংশয়ঃ॥

(ভাগবত ১১।২৯।১৭-১৮)

যতক্ষণ সর্বপ্রাণীতে আমার ভাব অর্থাৎ 'সবই পরমাত্মা' এই বাস্তবিক ভাব না আসে, ততক্ষণ মন, বাক্য এবং শরীরের দ্বারা আমারই উপাসনা করা উচিত। আর তারপরে এই সাধনকারী ভক্ত যখন আধ্যাত্মবিদ্যার (ব্রহ্মবিদ্যার) সাহায্যে সর্বপ্রকার সংশয়বর্জিত হয়ে এবং সর্বত্র সম্যক্‌রূপে আমাকে দর্শন করে জগতের ঊর্ধ্বে উঠে যান অর্থাৎ 'সবই পরমাত্মা'—এই চিন্তাও আর থাকে না, তখন তাঁর কাছে সর্বত্র সাক্ষাৎ পরমাত্মাই পরিলক্ষিত হন।

প্রকৃতির বন্ধন থেকে মুক্তি (ত্রয়োদশ অধ্যায়)

দ্বাদশ অধ্যায়ের প্রারম্ভেই অর্জুন জিজ্ঞাসা করেছিলেন ভগবানের সগুণ-সাকাররূপের উপাসক এবং নির্গুণ-নিরাকাররূপের উপাসকদের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ ? তার উত্তরে ভগবান বলেছেন যে সব ভক্ত তাঁর সাকার রূপের উপাসনা করে তাঁরাই শ্রেষ্ঠ। আবার বলেছেন, যে সাধক অব্যক্ত অক্ষররূপের উপাসনা করেন তাঁরাও তাঁকে প্রাপ্ত হন কিন্তু দেহাভিমান থাকায় তাঁদের উপাসনায় অধিক ক্লেশ হয়। দ্বাদশ অধ্যায়ে ভক্তর সগুণ-সাকার বর্ণনা করে, ত্রয়োদশ অধ্যায়ে ভগবান অব্যক্ত অক্ষরের উপাসনা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন এবং শরীরের প্রতি অহংরূপী প্রধান বাধাকে দূর করে প্রকৃতির বন্ধন থেকে মুক্তি পাওয়ার উপায় জানিয়েছেন।

এই অধ্যায়ের ছয়টি প্রকরণে প্রকৃতি, পুরুষ ও পরমাত্মাতত্ত্ব এইভাবে বর্ণিত হয়েছে—

বিষয়	শ্লোক
ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ	১-৪, ১৯-২০, ২৬
ক্ষেত্র	৫-৬
ক্ষেত্রজ্ঞ	২১-২৩
জ্ঞান মার্গের সাধন	৭-১১
পরমাত্মতত্ত্ব	১২-১৮, ৩১-৩৪
পরমাত্মা লাভের সাধন	২৪-২৫, ২৭-৩০

ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ—(শ্লোক ১-৪, ১৯-২০, ২৬)

ইদং শরীরং কৌন্তেয় ক্ষেত্রমিত্যভিধীয়তে।
এতদ্ যো বেত্তি তং প্রাহুঃ ক্ষেত্রজ্ঞ ইতি তদ্বিদঃ॥
ক্ষেত্রজ্ঞঞ্চাপি মাং বিদ্ধি সর্বক্ষেত্রেষু ভারত।
ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োর্জ্ঞানং যত্তজ্ জ্ঞানং মতং মম॥
তৎ ক্ষেত্রং যচ্চ যাদৃক্ চ যদ্বিকারি যতশ্চ যৎ।
স চ যো যৎপ্রভাবশ্চ তৎ সমাসেন মে শৃণু॥
ঋষিভির্বহুধা গীতং ছন্দোভির্বিবিধৈঃ পৃথক্।
ব্রহ্মসূত্রপদৈশ্চৈব হেতুমদ্ভির্বিনিশ্চিতৈঃ॥

(গীতা ১৩।১-৪)

প্রকৃতিং পুরুষঞ্চৈব বিদ্ধ্যনাদী উভাবপি।
বিকারাংশ্চ গুণাংশ্চৈব বিদ্ধি প্রকৃতিসম্ভবান্॥
কার্যকরণকর্তৃত্বে হেতুঃ প্রকৃতিরুচ্যতে।
পুরুষঃ সুখদুঃখানাং ভোক্তৃত্বে হেতুরুচ্যতে॥

(গীতা ১৩।১৯-২০)

যাবৎ সঞ্জায়তে কিঞ্চিৎ সত্ত্বং স্থাবরজঙ্গমম্।
ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞসংযোগাৎ তদ্বিদ্ধি ভরতর্ষভ॥

(গীতা ১৩।২৬)

'শ্রীভগবান বললেন—হে কৌন্তেয় ! এই শরীরকে বলা হয় ক্ষেত্র আর এই ক্ষেত্রকে যিনি জানেন তাঁকেই জ্ঞানী পণ্ডিতগণ ক্ষেত্রজ্ঞ বলেন।

এই সমস্ত ক্ষেত্রে আমি ক্ষেত্রজ্ঞরূপে অবস্থান করি, আর ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞের যে জ্ঞান তাই হল প্রকৃত জ্ঞান।

এই ক্ষেত্র কী, কেমন, কীপ্রকার বিশিষ্ট এবং কার থেকে উৎপন্ন হয় আর ক্ষেত্রজ্ঞই বা কী এবং কীরূপ প্রভাবসম্পন্ন তা আমি সংক্ষেপে বর্ণনা করছি।

এই ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ তত্ত্ব ঋষিগণ বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করেছেন, বেদের ছন্দগুলিতে ইহা নানাভাবে বর্ণিত হয়েছে এবং ব্রহ্মসূত্রের

পদগুলিতে ইহা আলোচিত হয়েছে। (গীতা ১৩।১-৪)

প্রকৃতি ও পুরুষকে তুমি অনাদি বলে জেনো এবং বিকারাদি গুণসমূহকেও প্রকৃতি থেকেই উৎপন্ন বলে জানবে।

কার্য ও করণের দ্বারা সংঘটিত ক্রিয়াগুলির উৎপত্তি প্রকৃতি থেকেই হয় আর সুখ-দুঃখ আদি ভোগের বিষয়ে পুরুষই হল হেতু। (গীতা ১৩।১৯-২০)

হে অর্জুন ! স্থাবর-জঙ্গম আদি যত কিছু প্রাণী আছে তা সমস্তই ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞর সংযোগের ফলেই হয়।' (গীতা ১৩।২৬)

ভগবান ক্ষেত্রকে 'ইদম্ শরীরম্' বলেছেন যার মধ্যে স্থূল শরীর, সূক্ষ্ম শরীর ও কারণ শরীর সবই পড়ে।

স্থূল-শরীর—পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু ও আকাশ—এই পাঁচ তত্ত্ব থেকে সৃষ্ট হয়েছে, অর্থাৎ মাতা-পিতার রজ-বীর্য থেকে যা উৎপন্ন হয়েছে, তাকে বলে স্থূল শরীর। এর অপর নাম 'অন্নময় কোষ' কারণ এটি অন্নের বিকার থেকেই উদ্ভূত এবং অন্ন দ্বারাই পুষ্ট হয়। ইহা কোষ কারণ তলোয়ারের খাপ বা ধানের খোসার মতো ইহা জীবাত্মার বহিরাবরণ মাত্র। ইহা ইন্দ্রিয়াদির বিষয় হওয়ায় ইহাকে **'ইদম্ শরীরম্'** বলে।

সূক্ষ্ম-শরীর—পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়, পাঁচটি প্রাণ এবং মন ও বুদ্ধি—এই সতেরোটি তত্ত্ব দ্বারা যা গঠিত হয় তাকে বলা হয় সূক্ষ্ম শরীর। এই সতেরোটি তত্ত্বের মধ্যে প্রাণের প্রাধান্য নিয়ে যে সূক্ষ্ম শরীর তাকে বলা হয় 'প্রাণময় কোষ', মনের প্রাধান্য নিয়ে যে সূক্ষ্ম শরীর তাকে বলা হয় 'মনোময় কোষ' আর বুদ্ধির প্রাধান্য নিয়ে যে শরীর তা হল 'বিজ্ঞানময় কোষ'। ইহা অন্তঃকরণের বিষয় হওয়ায় ইহাকে **'ইদম্ শরীরম্'** বলে।

কারণ-শরীর — অ-জ্ঞানকে বলে কারণ শরীর। মানুষের জ্ঞান বুদ্ধি পর্যন্ত হয়, কিন্তু বুদ্ধির পরে আর জ্ঞান হয় না, তাই তাকে বলা হয় অ-জ্ঞান। **'অজ্ঞানমেবাস্য হি মূলকারণম্'** (আধ্যাত্ম রামায়ণ উত্তরকাণ্ড ৫।৯)।

এই অজ্ঞান শরীর সমস্ত শরীরের কারণ হওয়ায় তাকে কারণ-শরীর বলে। এই শরীরকে অভ্যাস, প্রকৃতিও বলে।

জাগ্রত অবস্থায় স্থূল-শরীরের প্রাধান্য থাকে আর সূক্ষ্ম ও কারণ-শরীরও সঙ্গে থাকে। স্বপ্ন অবস্থাতে সূক্ষ্ম-শরীরের প্রাধান্য থাকে আর কারণ-শরীর তার সঙ্গে থাকে। সুষুপ্তি অবস্থায় স্থূল শরীরের জ্ঞানও থাকে না, সূক্ষ্ম-শরীরের জ্ঞানও থাকে না অর্থাৎ বুদ্ধিও অবিদ্যাতে (অজ্ঞানে) নিমজ্জিত থাকে। অতএব সুষুপ্তি অবস্থা কারণ-শরীরেরই হয়। জাগ্রত ও স্বপ্ন অবস্থায় সুখ-দুঃখের অনুভূতি হয়, কিন্তু সুষুপ্তি অবস্থায় কেবলই সুখ হয়, তাই কারণ-শরীরকে বলা হয় আনন্দময় কোষ। আর 'কারণ-শরীর' স্বয়ং-এর বিষয় হওয়ায় এবং স্বয়ং দ্বারা জ্ঞাত হওয়ায় ইহাকেও 'ইদম শরীরম্' বলে। উপরোক্ত তিনটি দেহকে 'শরীর' বলার অর্থ হল এগুলি প্রতিমুহূর্তে বিনাশপ্রাপ্ত হচ্ছে ('শৃ' হিংসায়াম্ ধাতুর দ্বারা 'শরীর' শব্দটি তৈরি হয় যার অর্থ হল যা ক্ষয়প্রাপ্ত হচ্ছে)। আবার দেহকে 'ক্ষেত্র' বলার অর্থ এটি যা প্রতিক্ষণ নষ্ট হচ্ছে, পরিবর্তন হচ্ছে (ক্ষি অর্থাৎ ক্ষয় ধাতু সহযোগে 'ক্ষেত্র' শব্দটি তৈরি হয়েছে)। এটি এত দ্রুত পরিবর্তিত হয় যে একে কেউ দ্বিতীয়বার এক অবস্থায় দেখতে সক্ষম হয় না, ইতিমধ্যেই তা পরিবর্তিত হয়ে গেছে।

দেহকে 'ক্ষেত্র' বলায় অন্য অর্থ হল এটি হল ক্ষেত্র বা জমি। জমিতে যেমন নানাপ্রকার বীজ বপন করে চাষ করা হয়, তেমনি এই মনুষ্যদেহের প্রতি অহং ও মমত্ববোধ আশ্রয় করে জীব নানা প্রকার কর্ম করে থাকে এবং সেই কর্মগুলির সংস্কার পড়ে চিত্তে। আর এই সংস্কারগুলি যখন ফলরূপে প্রকটিত হয় তখনই অন্য শরীর (দেবতা, পশু-পক্ষী, কীট-পতঙ্গাদি) প্রাপ্ত হয়। আবার, ক্ষেত্রে যেমন বীজ পোতা হয়, তেমনই শস্য উৎপন্ন হয়, সেইরকম এই শরীর দ্বারা যেমন কর্ম করা হয়, সেই অনুযায়ী পরবর্তীকালে অন্য শরীর, তদনুরূপ পরিস্থিতি লাভ হয়। অর্থাৎ এই শরীর দ্বারা কর্ম-অনুযায়ীই জীব বারংবার জন্ম-মৃত্যুরূপ ফল ভোগ করে থাকে। সেই জন্য এই শরীরকে ক্ষেত্র বলা হয়।

ভগবান **'ইদং শরীরং ক্ষেত্রম্'** পদটির দ্বারা, অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের একটি ক্ষুদ্র অংশ শরীরাদি পদার্থগুলিকে নিজের (স্বয়ং-এর) থেকে পৃথক 'ইদম্'

রূপে দেখার কথা বলছেন। মনুষ্যদেহেই বন্ধন হয়, আবার ইহাকে 'ইদম্' রূপে (পৃথকরূপে) দেখতে পারলে মনুষ্যদেহেতেই মুক্তি পাওয়া সম্ভব। এর অর্থ মানুষ যদি তার শরীরের সঙ্গে কোনো প্রকার অহং ও মমত্বর সম্পর্ক না রাখে আর নিজেকে (জীবাত্মাকে) এর থেকে পৃথক মনে করে তাহলে সে সংসার থেকে মুক্ত হতে পারে।

দ্বিতীয় শ্লোকে ভগবান ক্ষেত্রজ্ঞর স্বরূপ জানিয়েছেন। জগৎ-সংসারের যা কিছু জ্ঞেয় মানুষ 'করণ' দ্বারাই তা জানতে পারে। করণ দুই প্রকারে হয়—বহিঃকরণ ও অন্তঃকরণ। মানুষ সংসারের বিষয়গুলিকে বহিঃকরণ দ্বারা (চক্ষু, কর্ণ ইত্যাদি) জানতে পারে এবং বহিঃকরণকে আবার অন্তঃকরণের (মন, বুদ্ধি ইত্যাদি) সাহায্যে জানতে পারে। অন্তঃকরণের বৃত্তি চারপ্রকার—মন, বুদ্ধি, চিত্ত এবং অহংকার। এই চারটির মধ্যে অহংকার হল সব থেকে সূক্ষ্ম, যা একদেশীয়। এই অহংকারও যার দ্বারা প্রকাশিত হয়, জানা যায়, সেই ক্ষেত্রজ্ঞই হল জ্ঞাতা এবং প্রকাশস্বরূপ। এই ক্ষেত্রজ্ঞই সাক্ষাৎ ভগবানের স্বরূপ।

রূপং দৃশ্যং লোচনং দৃক্ তদ্দৃশ্যং দৃক্ তু মানসম্।
দৃশ্যা ধীবৃত্তয়ঃ সাক্ষী দৃগেব ন তু দৃশ্যতে।। (বাক্যসুধা ১)

সর্বপ্রথম নেত্র হল দ্রষ্টা আর রূপ হল দৃশ্য। এরপর মন হল দৃষ্টা আর নেত্রাদি ইন্দ্রিয়গুলি হল দৃশ্য, তারপর বুদ্ধি হল দ্রষ্টা এবং মন হল দৃশ্য। শেষে বুদ্ধিবৃত্তিগুলিরও যে দ্রষ্টা, সেই সাক্ষী (স্বয়ংপ্রকাশ আত্মা) কারোরই দৃশ্য নয়। স্বয়ংই প্রকৃত দৃষ্টা। শাস্ত্রাদিতে প্রকৃতি, জীব এবং পরমাত্মার ভিন্ন ভিন্ন বর্ণনা আছে আর পরমাত্মারও সর্বব্যাপক স্বরূপের বর্ণনা আছে কিন্তু এখানে ভগবান বলছেন **'ক্ষেত্রজ্ঞং চাপি মাং বিদ্ধি'** অর্থাৎ ক্ষেত্রে ক্ষেত্রজ্ঞরূপে পৃথকভাবে যা দেখা যায় তাও তিনিই।

ক্ষেত্রের (শরীরের) সমস্ত জগতের সঙ্গে ঐক্য থাকে এবং ক্ষেত্রজ্ঞর (জীবাত্মার) থাকে ভগবানের সঙ্গে ঐক্য। ভগবান বলছেন **'ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞয়োর্জ্ঞানং মতং মম'** অর্থাৎ ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞর জ্ঞান হল এই যে, পরমাত্মার যথার্থ জ্ঞান লাভ করতে হলে ক্ষেত্রজ্ঞর সঙ্গে তাঁর অভিন্নতার

অনুভব করতে হবে। আর এই অভিন্নতার অনুভব হলে তবেই পরমাত্মার প্রকৃত জ্ঞান লাভ হয়। ভগবান এই অভিন্ন অনুভবকে বলেছেন 'মতং মম' অর্থাৎ এটা তাঁরই মতো। এর অর্থ হল জগতে নানা বিদ্যা, নানা ভাষা, নানা লিপি, নানাপ্রকার কলা, তিনলোক, চতুর্দশ ভুবনের যাবতীয় জ্ঞান তা প্রকৃত জ্ঞান নয়। এইসব জ্ঞান ব্যবহারিক প্রয়োজনে লাগলেও সংসারে আবদ্ধকারী হওয়ায় তা অজ্ঞানই। প্রকৃত জ্ঞান হল সেটি, যার দ্বারা স্বয়ং-এর (জীবাত্মার) সঙ্গে শরীরের সম্পর্ক ছেদ হয়। এর ফলে সংসারে আর পুনর্জন্ম হয় না এবং ভগবানের মতে এটাই হল প্রকৃত জ্ঞান।

তৃতীয় শ্লোকে ভগবান ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞর বিভাগ সংক্ষেপে বর্ণনা করেছেন যা পরবর্তী প্রকরণে আরো বিস্তারিতভাবে বলেছেন।

যচ্চ—ক্ষেত্রের স্বরূপ কী ? এটি পঞ্চম শ্লোকে বর্ণিত হয়েছে।

যাদৃক চ—ক্ষেত্রের স্বভাব কীরূপ ? ছাব্বিশতম-সাতাশতম শ্লোকে ক্ষেত্রের উৎপত্তি বিষয়ে জানিয়েছেন।

যদ্বিকারি—ক্ষেত্রের বিকার হল ইচ্ছা-দ্বেষাদি যা ষষ্ঠ শ্লোকে বলা হয়েছে।

যতশ্চ যৎ—ক্ষেত্র কার থেকে উদ্ভূত তা উনিশতম শ্লোকের উত্তরার্ধে বর্ণিত হয়েছে।

স চ—ক্ষেত্রজ্ঞর বর্ণনা বলা হয়েছে প্রথম শ্লোকের উত্তরার্ধে।

যঃ—ক্ষেত্রজ্ঞর স্বরূপ যা বিংশতি শ্লোকের উত্তরার্ধে এবং বাইশতম শ্লোকে বর্ণিত হয়েছে।

যৎ প্রভাবশ্চ—ক্ষেত্রজ্ঞ যেরূপ প্রভাবশালী তার বর্ণনা একত্রিশ, বত্রিশ ও তেত্রিশতম শ্লোকে করা হয়েছে।

এখানে ভগবান ক্ষেত্রর সম্বন্ধে চারটি কথা শোনার নির্দেশ দিয়েছেন। যেমন তার স্বরূপ, স্বভাব, বিকার কার থেকে উদ্ভূত ইত্যাদি কিন্তু ক্ষেত্রজ্ঞর সম্বন্ধে বলেছেন কেবল তার স্বরূপ ও প্রভাব-এর কথা। এর কারণ হল ক্ষেত্র নিয়ত পরিবর্তনশীল এবং বিনাশের দিকে এগিয়ে চলেছে তাই তার কি-ই বা প্রভাব হতে পারে ? আসলে সংসারী ব্যক্তির চিত্তে জড় পদার্থের

প্রতি আসক্তি থাকে তাই ক্ষেত্রের (অর্থাদি জড় পদার্থের) প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। আবার ক্ষেত্রজ্ঞ উৎপত্তি ও বিনাশরহিত তাই তার স্বভাব, বিকার ও উৎপত্তিও বর্ণনা করা হয়নি।

চতুর্থ শ্লোকে ভগবান বলেছেন ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞর বিস্তারিত বর্ণনা ঋষিরা করেছেন অর্থাৎ তা শাস্ত্র-স্মৃতিতে আছে, বেদ অর্থাৎ সংহিতা, ব্রাহ্মণ ও উপনিষদেও আছে এবং ব্রহ্মসূত্রেও আছে। কেউ যদি বিস্তারিতভাবে জানতে চায় তবে উপরোক্ত গ্রন্থগুলি অধ্যয়ন করতে পারে।

পরের প্রকরণে ভগবান পুরুষ ও প্রকৃতির পার্থক্য ও অনাদিত্ব সম্বন্ধে বলেছেন **'প্রকৃতিং পুরুষং চৈব বিদ্ধ্যনাদী উভাবপি'** (গীতা ১৩।১৯) অর্থাৎ ক্ষেত্রর কারণরূপ 'মূল প্রকৃতি' এবং ক্ষেত্রকে যিনি জানেন সেই 'ক্ষেত্রজ্ঞ' উভয়েই অনাদি। এখানে অনাদি বলার অর্থ পরমাত্মার অংশ হিসাবে পুরুষ (জীবাত্মা) অনাদি এবং ভগবান থেকে সৃষ্ট হওয়ায় প্রকৃতিও অনাদি। যদিও উভয়ের অনাদিত্বে কোনো পার্থক্য নেই কিন্তু উভয়ের স্বরূপে পার্থক্য আছে এবং তাও অনাদি। প্রকৃতি গুণাদিসম্পন্ন আর পুরুষ সর্বগুণরহিত। প্রকৃতিতে বিকার (পরিবর্তন) হয় পুরুষ বিকাররহিত। প্রকৃতি জগতের কারণ হয়ে ওঠে, পুরুষ কারোর কারণ নয়। প্রকৃতিতে কার্য-কারণ ভাব থাকে পুরুষ-কার্য কারণ ভাবরহিত। এই শ্লোকের উত্তরার্ধে প্রকৃতির বিকার ও গুণ সম্বন্ধে ভগবান বলেছেন **'বিকারাংশ্চ গুণাংশ্চৈব বিদ্ধি প্রকৃতিসম্ভবান্'** অর্থাৎ ইচ্ছা, দ্বেষ, সুখ, দুঃখ, সংঘাত, চেতনা এবং ধৃতি—এই সাতটি বিকার এবং সত্ত্বঃ, রজঃ ও তম—এই তিনটি গুণ প্রকৃতি হতেই উৎপন্ন এবং এর তাৎপর্য হল পুরুষের মধ্যে বিকার এবং গুণ নেই।

পূর্বে সপ্তম অধ্যায়ে ভগবান বলেছেন—

যে চৈব সাত্ত্বিকা ভাবা রাজসাস্তামসাশ্চ যে।
মত্ত এবেতি তান্ বিদ্ধি ন ত্বহং তেষু তে ময়ি।। (গীতা ৭।১২)

অর্থাৎ যে সকল ভাব সত্ত্ব, রজ ও তমোগুণ থেকে উৎপন্ন হয় সেগুলি 'আমা হতে উৎপন্ন' হয়। আর এখানে বলছেন গুণসমূহ প্রকৃতি হতে জাত। এর তাৎপর্য হল সপ্তম অধ্যায় ভক্তিরসাশ্রিত তাই ভগবান ভক্তদের নির্দেশ

দিচ্ছেন যে এই গুণসকল তাঁর থেকেই উৎপন্ন তাই এই গুণময়ী মায়া অতিক্রম করার জন্য তাঁরই শরণাগত হতে হবে। কিন্তু এখানে জ্ঞানের প্রকরণ হওয়ায় গুণগুলি প্রকৃতি হতে উৎপন্ন বলে জানিয়েছেন যাতে সাধক গুণের সঙ্গে নিজ সম্পর্ক না রেখে মুক্তি পেতে পারে।

পরের শ্লোকের প্রথমার্থে ভগবান বলছেন— **'কার্যকরণকর্তৃত্বে হেতুঃ প্রকৃতিরুচ্যতে'** অর্থাৎ কার্য-কারণ দ্বারা সংঘটিত ক্রিয়াগুলির উৎপত্তি প্রকৃতি থেকে হয়। কার্য হল পাঁচটি মহাভূত—আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল ও মাটি এবং পঞ্চ বিষয়—শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ এই দশটি মিলে হল কার্য।

করণ হল ত্রয়োদশটি। তার মধ্যে পাঁচটি কর্মেন্দ্রিয় (হস্ত, পদ, বাক্য, উপস্থ ও গুহ্য) এবং পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয় (চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক)। এই দশটি হল বহিঃকরণ। আর মন, বুদ্ধি ও অহংকার—এই তিনটি হল অন্তঃকরণ। এই ত্রয়োদশটি করণের মধ্যে অহংকার হল সূক্ষ্মতম আর তা দুপ্রকার—(১) অহংবৃত্তি (২) অহংকর্তা। অহংবৃত্তি কখনোই কারো পক্ষে দোষের নয়, কিন্তু স্বয়ং যখন অহংবৃত্তির সঙ্গে নিজের সম্পর্ক স্থাপন করে, তাদাত্ম্য করে তখন সে অহংকর্তা হয়ে ওঠে আর তখনই প্রকৃতিকৃত সমস্ত কর্মের কর্তা ও ভোক্তা হয়ে যায়। তাই পরের শ্লোকার্ধে ভগবান বলেছেন—**'পুরুষঃ প্রকৃতিস্থো হি ভুঙ্‌ক্তে প্রকৃতিজান্‌গুণান্‌'** (গীতা ১৩।২১)। অর্থাৎ যখন পুরুষ (জীবাত্মা) প্রকৃতিকৃত কার্যের কর্তা ও ভোক্তা হয় তখন সে সুখ ও দুঃখ ভোগেরও হেতু হয়। ভগবান বিংশ শ্লোকের দ্বিতীয়ার্ধে আবার বলেছেন—**'পুরুষঃ সুখ দুঃখানাং ভোক্তৃত্বে হেতুরুচ্যতে'**। অর্থাৎ অনুকূল পরিস্থিতি যা প্রকৃতিতে ঘটে তাতে প্রসন্ন হওয়া এবং তদনুরূপ প্রতিকূল পরিস্থিতি যা ঘটে তাতে অপ্রসন্ন হওয়া হল সুখ-দুঃখ ভোগ করা। এটা চেতন বা পুরুষেই সম্ভব কিন্তু তা কেবলই সম্ভব প্রকৃতিজাত সমস্ত ক্রিয়ার উপর পুরুষের কর্তৃত্ব ও ভোক্তৃত্বের ফলেই। শুধু তাই নয় প্রকৃতির সঙ্গে তাদাত্ম্য করার ফলে পুরুষ যখন 'প্রকৃতিস্থ পুরুষ' রূপে নিজের অন্য এক স্বতন্ত্র সত্তা সৃষ্টি করে, তখন তাকে বলে জীব, ক্ষেত্রজ্ঞ,

শরীরী, দেহী ইত্যাদি। এইরূপ অভিহিত পুরুষ তখন প্রকৃতি বা জড়ে সৃষ্ট সুখ-দুঃখরূপ বিকারগুলি (যা প্রকৃতপক্ষে শরীরাদির পক্ষে অনুকূল-প্রতিকূল পরিস্থিতি) নিজের বলে মেনে নেয় তাকে তাদাত্ম্য বলে এবং তখনই আমি সুখী বা আমি দুঃখী—এরূপ অনুভব করে। যেমন দোকানে লোকসান হলে দোকানদার বলে 'আমার লোকসান হচ্ছে', দেহের তাপ বৃদ্ধি হলে মনে করে 'আমার জ্বর হয়েছে'। প্রকৃতপক্ষে কিন্তু স্বয়ং-এর কখনো জ্বরও আসে না বা প্রকৃতির কোনো হ্রাস-বৃদ্ধিতে তার লাভ-লোকসান কিছুই হয় না।

বৃহদারণ্যক উপনিষদের জনক-যাজ্ঞবল্ক্য-সংবাদে যাজ্ঞবল্ক্য বলছেন—

আত্মানং চেদ্ বিজানীয়াদয়মস্মীতি পুরুষঃ।
কিমিচ্ছন্ কস্য কামায় শরীরমনুসংজ্বরেৎ॥

(বৃহদারণ্যক উপনিষদ ৪।৪।১২)

পুরুষ যদি আত্মাকে 'আমিই এই' (সোঽহং) বলে বিশেষভাবে জানতে পারে, তাহলে আর কিসেরই বা ইচ্ছে হবে অথবা কেনই বা সে কামনার তাপে অনুতপ্ত হবে।

সুখ-দুঃখ বিকাররূপী জড়কে স্বীকার করে নিলেই তাদাত্ম্য আসে এবং তাতেই বন্ধন হয়। তাদাত্ম্য হলে ভোগের আকাঙ্ক্ষায় জড়ের প্রাধান্য থাকে এবং মুক্তির আকাঙ্ক্ষায় (নিজ কল্যাণের) চেতনের প্রাধান্য থাকে।

শ্বেতাশ্বতর (শ্বেত-অশ্বতর মানে বিশুদ্ধ ইন্দ্রিয়) ঋষি শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে সনৎকুমার আদি আশ্রমিকদের বলছেন—**'মায়াং তু প্রকৃতিং বিদ্যাৎ মায়িনং তু মহেশ্বরম্'** (শ্বেতাশ্বতর ৪।১০)। ভগবান হলেন শক্তিমান ও প্রকৃতি হল তাঁর শক্তি। আবার তাঁর সৃষ্টিতে পুরুষ ও প্রকৃতি হল সমষ্টি সৃষ্টি এবং ক্ষেত্রজ্ঞ ও ক্ষেত্র হল ব্যষ্টি সৃষ্টি। জ্ঞানের দৃষ্টিতে দেখলে 'প্রকৃতির' কোনো অস্তিত্বই নেই—**'নাসতো বিদ্যতে ভাব'** (গীতা ২।১৬)। আবার ভক্তির দৃষ্টিতে দেখতে গেলে 'প্রকৃতি' ভগবানের শক্তি হওয়ায় তা ভগবানের থেকে অভিন্ন—**'সদসচ্চাহম্'** (গীতা ৯।১৯) বাস্তবে প্রকৃতি ও পুরুষের স্বভাব পৃথক পৃথক হওয়া সত্ত্বেও উভয়েই পরস্পরের

অভিন্নই, সমগ্রই পরমাত্মার স্বরূপ। এই প্রকরণের অন্তিম শ্লোকে ভগবান বলেছেন— **'যাবৎ সঞ্জায়তে কিঞ্চিৎ..... ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞসংযোগাৎ'** (গীতা ১৩।২৬) অর্থাৎ জরায়ুজ-অণ্ডজ, উদ্ভিজ্জ-স্বেদজ, জলচর-স্থলচর-নভচর, মনুষ্য, দেবতা, পিতৃগণ, ভূত-প্রেত-পিশাচ ইত্যাদি যত প্রকারের প্রাণী আছে সকলই ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞর সংযোগ থেকে উৎপন্ন।

ক্ষেত্রের স্বভাব—পূর্বে সপ্তম অধ্যায়ে ভগবান বলেছেন পরা ও অপরা প্রকৃতি তাঁরই—**'বিদ্ধি মে পরাম্'** (গীতা ৭।৫)। আর তাঁর শক্তি দ্বারাই জগতের উৎপত্তি-স্থিতি-প্রলয় হয়—**'অহং কৃৎস্নস্য জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়স্তথা'** (গীতা ৭।৬)। আর এখানে বলছেন সকল প্রাণী ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞর সংযোগে উৎপন্ন হয়। এর তাৎপর্য হল সপ্তম অধ্যায়ে রয়েছে ভক্তিপ্রকরণ। ভক্তর কাছে সাধ্য ও সাধন দুইই ভগবান। তাই ভক্তর দৃষ্টি তাঁর দিকে ফেরানোর জন্য ভগবান সবই তাঁর সৃষ্টি বলেছেন। আর বর্তমান আলোচ্য শ্লোকটিতে জ্ঞানের প্রকরণ উল্লিখিত। তাই ভগবান জ্ঞানীকে ক্ষেত্রজ্ঞর দিকে দৃষ্টি দিতে বলেছেন কেননা ক্ষেত্রজ্ঞ যখন ক্ষেত্রর সঙ্গে একাত্মতা বোধ করে তখনই তার বন্ধন হয়। এখন প্রশ্ন হল আকর্ষণ ও একাত্মতা সজাতীয়র প্রতিই হয় তাহলে কীকরে ক্ষেত্রজ্ঞ ও ক্ষেত্র—যারা বিজাতীয় অর্থাৎ চেতন ও জড় হয়েও কীভাবে একাত্মবোধ করে ? এর উত্তর হল ভগবানের অংশ হওয়ায় ক্ষেত্রজ্ঞর মধ্যে এমন শক্তি থাকে যে সে বিজাতীয় বস্তুকেও (ক্ষেত্রকে) আকর্ষণ করতে পারে, সম্পর্ক স্থাপন করতে পারে। ভগবান তাকে স্বাধীনতা দিয়েছেন। কিন্তু এই স্বাধীনতার অপব্যবহার করে সে ভগবানের সঙ্গে সম্পর্ক অস্বীকার করে জগৎ-সংসারের সঙ্গে সম্পর্ক মেনে নেয়, যার ফলে জীব বারংবার জন্ম-মৃত্যু চক্রে আবর্তিত হয়ে চলে—**'সদসদ্‌যোনিজন্মসু'** (গীতা ১৩।২১)।

ক্ষেত্র—(শ্লোক ৫-৬)

ভগবান ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞর বিষয়ে যে ছটি কথা বলেছেন তার মধ্যে ক্ষেত্রের স্বভাব (যাদৃক চ) ছাব্বিশতম ও উৎপত্তির (যতশ্চ যৎ) বর্ণনা করেছেন। উনিশতম শ্লোকে এবং বাকি দুটি বিষয় অর্থাৎ স্বরূপ (যচ্চ) ও

বিকারের (যদ্বিকারী) বর্ণনা পরবর্তী দুটি শ্লোকে করা হয়েছে।

মহভূতান্যহঙ্কারো বুদ্ধিরব্যক্তমেব চ।
ইন্দ্রিয়াণি দশৈকঞ্চ পঞ্চ চেন্দ্রিয়গোচরাঃ॥
ইচ্ছা দ্বেষঃ সুখং দুঃখং সঙ্ঘাতচেতনা ধৃতিঃ।
এতৎ ক্ষেত্রং সমাসেন সবিকারমুদাহৃতম্॥ (গীতা ১৩।৫-৬)

'মূল প্রকৃতি, সমষ্টি বুদ্ধি (মহত্তত্ত্ব), সমষ্টি অহংকার, পঞ্চ মহাভূত, দশ ইন্দ্রিয় ও মন এবং পঞ্চেন্দ্রিয়র পাঁচটি বিষয় অর্থাৎ এই চব্বিশটি তত্ত্ব হল ক্ষেত্র।

আর ইচ্ছা, দ্বেষ, সুখ, দুঃখ, সংঘাত, চেতনা (প্রাণশক্তি) এবং ধৃতি—বিকারসহ এই ক্ষেত্র সম্বন্ধে সংক্ষেপে বলা হল।' (গীতা ১৩।৫-৬)

ভগবান পঞ্চম শ্লোকে চব্বিশ তত্ত্বসম্পন্ন সমষ্টি-জগতের বর্ণনা করেছেন আর ষষ্ঠ শ্লোকে বর্ণনা করেছেন সাতটি বিকারসম্পন্ন ব্যষ্টি-শরীরের। আর এই চব্বিশতত্ত্ব ও সাতটি বিকারকে **'এতৎ ক্ষেত্রম্'** অর্থাৎ ইহাই ক্ষেত্র নামে বলা হয়েছে।

ক্ষেত্রের স্বরূপ 'যচ্চ'—

অব্যক্ত—মূল প্রকৃতিকে বলা হয় 'অব্যক্ত'। ইহা সমষ্টি বুদ্ধির কারণ কিন্তু নিজে কারোর কার্য নয় এবং ইহা অনাদি।

বুদ্ধিঃ—এই তত্ত্বটি সমষ্টি-বুদ্ধি অর্থাৎ মহত্তত্ত্বের বাচক। এই বুদ্ধির দ্বারা অহংকার উৎপন্ন হয়।

অহংকার—এই পদটি সমষ্টি-অহংকারের বাচক, একে 'অহংভাব'ও বলা হয়। ইহা পঞ্চমহাভূতের কারণ।

মহাভূতানি—ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরু ও ব্যোম্ অর্থাৎ পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু ও আকাশ এই হল পঞ্চমহাভূত বা পঞ্চতন্মাত্র। এই পঞ্চমহাভূত দশ ইন্দ্রিয়, এক মন এবং রস আদি পাঁচটি বিষয়েরও কারণ অর্থাৎ এগুলি পঞ্চমহাভূত হতে উৎপন্ন হয়।

দশ ইন্দ্রিয়াণি—পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয় যথা চক্ষু, কর্ণ, জিহ্বা, নাসিকা ও ত্বক এবং পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় যথা বাক্, পাণি, পাদ, উপস্থ ও পায়ু। এগুলি পঞ্চ

মহাভূত হতে উৎপন্ন।

এবং চ—এই 'এবং চ' হচ্ছে মন এবং ইহা পঞ্চমহাভূত হতে উৎপন্ন।

পঞ্চ চেন্দ্রিয়গোচরা—রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দ—এই পাঁচটি হল পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়র বিষয়। এই চব্বিশ তত্ত্ব সমুদায়কে বলা হয় ক্ষেত্র। আর এরই এক তুচ্ছ অংশ হচ্ছে এই মনুষ্যদেহ, প্রথম শ্লোকে ভগবান তাকে বলেছেন **'ইদং শরীরম্'** আর তৃতীয় শ্লোকে তাকে **'তৎ ক্ষেত্রম্'** বলেছেন। ষষ্ঠ শ্লোকে ভগবান ব্যষ্টি শরীরের সংঘটিত বিকারের কথা জানিয়েছেন। কিন্তু **'পুরুষ প্রকৃতিস্থো হি'** অর্থাৎ জীবাত্মার ব্যষ্টি শরীরের সঙ্গে একাত্ম হলেও এই শরীরের স্থিতি সমষ্টি-প্রকৃতিতেই হয়। ব্যষ্টি শরীর ও সমষ্টি শরীর সর্বতোভাবে এক। বাস্তবে ব্যষ্টি বলে কিছু নেই, সমষ্টিই আছে। সমুদ্রের ঢেউগুলোকে যেমন সমুদ্রের থেকে পৃথক মনে করা ভুল, তেমন ব্যষ্টি-শরীরকে সমষ্টি-জগৎ থেকে পৃথক মনে করে নিজের বলে মনে করাই ভুল।

ইচ্ছা—মনে যে বাসনার উদয় হয়, যেমন অমুক বস্তু, অমুক ব্যক্তি, অমুক পরিস্থিতি ইত্যাদির প্রাপ্তি ঘটুক—তাকে বলে ইচ্ছা। ক্ষেত্রের বিকার-গুলির মধ্যে ভগবান সর্বপ্রথম ইচ্ছারূপ বিকারের কথা বলেছেন। এর অর্থ হল ইচ্ছা হচ্ছে মূল বিকার। কারণ এমন কোনো পাপ বা দুঃখ নেই, যা সাংসারিক ইচ্ছা থেকে উৎপন্ন না হয়, অর্থাৎ সমস্ত পাপ এবং দুঃখ সাংসারিক ইচ্ছাগুলি থেকেই উদ্ভূত হয়।

দ্বেষঃ—কামনা এবং অহং-অভিমানে প্রতিবন্ধকতা হলে ক্রোধ উৎপন্ন হয় আর চিত্তে সেই ক্রোধের যে সূক্ষ্ম রেশ থাকে, তাকে বলা হয় 'দ্বেষ'।

সুখম্—অনুকূল পরিস্থিতিতে মনে যে প্রসন্নতা উৎপন্ন হয় তাকে বলে 'সুখ'।

দুঃখম্—প্রতিকূল পরিস্থিতিতে মনে যে অপ্রসন্নতার উদয় হয় তাকে বলে 'দুঃখ'।

সঙ্ঘাতঃ—চব্বিশটি তত্ত্ব দ্বারা নির্মিত এই শরীরকে বলা হয় সংঘাত। এতে যে পরিবর্তন হতে থাকে তাও বিকার।

চেতনা—প্রাণশক্তিকে বলা হয় চেতনা অর্থাৎ শরীরে যে প্রাণ থাকে তাকে বলে চেতনা। চেতনা সর্বদা পরিবর্তিত হতে থাকে, যেমন—সাত্ত্বিক-বৃত্তিতে প্রাণশক্তি শান্ত থাকে কিন্তু চিন্তা, শোক, ভয়, উদ্বেগাদিতে প্রাণশক্তি শান্ত না থেকে ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। আবার প্রাণশক্তি সর্বদা নষ্টও হতে থাকে। সুতরাং এটিও বিকাররূপ। সাধারণ মানুষ প্রাণশক্তিসম্পন্নদের চেতন এবং নিষ্প্রাণকে অচেতন বলে।

ধৃতিঃ—ধারণাশক্তিকে বলা হয় ধৃতি। ধৃতিরও পরিবর্তন হয়। মানুষ কখনো ধৈর্য ধারণ করতে সক্ষম হয় আবার কখনো প্রতিকূল পরিস্থিতিতে ধৈর্য হারিয়ে ফেলে। ধৃতিও ক্ষেত্রের বিকার। অষ্টাদশ অধ্যায়ের তেত্রিশ থেকে পঁয়ত্রিশতম শ্লোকে ধৃতির সাত্ত্বিক, রাজসিক এবং তামসিক ভাব বর্ণনা করেছেন। পরমাত্মার শরণাগত হতে গেলে সাত্ত্বিক ধৃতির অত্যন্ত প্রয়োজন।

ক্ষেত্রজ্ঞ যখন নির্বিচারে ক্ষেত্রের সঙ্গে নিজ সম্পর্ক মেনে নেয়, তখন ক্ষেত্রে ইচ্ছা-দ্বেষ ইত্যাদি বিকার উৎপন্ন হয়। আর বোধ হলে অর্থাৎ ক্ষেত্র (শরীর) এবং ক্ষেত্রজ্ঞ সর্বোতভাবে ভিন্ন এই জ্ঞান হলে ইচ্ছা, দ্বেষ আদি বিকারও দূর হয়। সুখ-দুঃখের জ্ঞান থাকা দোষের নয় কিন্তু তাদের দ্বারা প্রভাবিত হওয়ায়ই দোষের। যেমন—আহার গ্রহণের সময় জিভে যে স্বাদের জ্ঞান হয় তা দোষের নয় কিন্তু বস্তুতে অনুরাগ বা তাচ্ছিল্যই দোষের। জীবন্মুক্ত মহাপুরুষের 'সংঘাত' অর্থাৎ শরীরের সঙ্গে বিন্দুমাত্রও 'আমি-আমার' সম্বন্ধ না থাকায় বিকার থাকে না তাই তাঁদের শরীরও মহাপবিত্র হয়ে ওঠে।

ক্ষেত্রজ্ঞ—(শ্লোক ২১-২৩)

ভগবান পূর্বের প্রকরণে ক্ষেত্র সম্বন্ধে বলেছেন আর এখন ক্ষেত্রজ্ঞ সম্বন্ধে জানাচ্ছেন।

পুরুষঃ প্রকৃতিস্থো হি ভুঙ্ক্তে প্রকৃতিজান্ গুণান্।
কারণং গুণসঙ্গোঽস্য সদসদ্‌যোনিজন্মসু॥
উপদ্রষ্টানুমন্তা চ ভর্তা ভোক্তা মহেশ্বরঃ।

পরমাত্মেতি চাপ্যুক্তো দেহেঽস্মিন্ পুরুষঃ পরঃ॥
য এবং বেত্তি পুরুষং প্রকৃতিং চ গুণৈঃ সহ।
সর্বথা বর্তমানোঽপি ন স ভূয়োঽভিজায়তে॥

(গীতা ১৩।২১-২৩)

'প্রকৃতিতে অধিষ্ঠিত পুরুষই প্রকৃতিজাত গুণসমূহের ভোক্তা হয়ে থাকে এবং এই গুণসমূহের সংসর্গই তার উচ্চ-নীচ যোনিতে জন্মগ্রহণের কারণ হয়ে থাকে।

এই যে পুরুষ, তা দেহের সঙ্গে সম্পর্কিত হওয়ায় 'উপদ্রষ্টা', তার সঙ্গে মিলিত হয়ে সম্মতি, অনুমতি প্রদান করায় 'অনুমন্তা', নিজেকে ভরণপোষণকারী মনে করায় 'ভর্তা', দেহের সাহচর্যে সুখ-দুঃখ অনুভব করায় 'ভোক্তা' এবং নিজেকে প্রভু বলে মনে করায় 'মহেশ্বর'রূপে বিবেচিত হন। কিন্তু স্বরূপত ইনি পরমাত্মাই আর দেহে অবস্থান করলেও তিনি দেহের অতীত অর্থাৎ সর্বতোভাবে সম্বন্ধরহিত হয়ে থাকেন।

যে ব্যক্তি এইভাবে পুরুষকে এবং গুণাদিসহ প্রকৃতিকে পৃথকরূপে অনুভব করেন তিনি সর্বপ্রকার ব্যবহারাদি করলেও আর জন্মগ্রহণ করেন না।' (গীতা ১৩।২১-২৩)

ক্ষেত্রজ্ঞ সম্বন্ধে বলতে গিয়ে ভগবান বলছেন প্রকৃতপক্ষে পুরুষ প্রকৃতিতে (শরীরে) অবস্থিত নয়, কিন্তু যখন সে প্রকৃতির সঙ্গে (শরীরের সঙ্গে) তাদাত্ম্য করে শরীরকে 'আমি' ও 'আমার' বলে মেনে নেয় তখন তাকে প্রকৃতিতে অবস্থিত বলে। এখানে পুরুষকে 'প্রকৃতিস্থ' বলার তাৎপর্য তাকে 'শরীরস্থ' বলা। নিজেকে 'স্বস্থ' না মানলে অর্থাৎ 'স্ব'-তে নিজের স্থিতি অনুভব না করলে সে নিজেকে শরীরস্থ বলে ধারণ করে। আর এইরূপ 'শরীরস্থ' পুরুষই শরীরের অনুকূল পরিস্থিতিতে সুখী ও প্রতিকূল পরিস্থিতিতে দুঃখী হয়ে থাকে। এটিই হল পুরুষের প্রকৃতিজনিত গুণসমূহের ভোক্তা হওয়া। যেমন মোটর দুর্ঘটনাতে মোটরগাড়ি ও চালক উভয়ই জড়িত থাকে কিন্তু ক্রিয়াটিতে মোটরগাড়ির প্রাধান্য থাকলেও দুর্ঘটনার ফল বা শাস্তি ভোগ করতে হয় মোটরগাড়ির সঙ্গে সম্পর্কিত হওয়ায় তার চালককে

(কর্তা)। সেইরকম জাগতিক কার্যাদি করাতে প্রকৃতি ও পুরুষ— উভয়েরই হাত থাকে। কিন্তু ক্রিয়াগুলিতে শরীরে প্রাধান্য থাকলেও সুখ-দুঃখরূপ ফল ভোগ শরীরের সঙ্গে নিজ সম্পর্ক স্থাপনাকারী পুরুষকেই করতে হয়। যদি সে শরীরের সঙ্গে নিজ সম্পর্ক স্থাপন না করে, সমস্ত ক্রিয়াই প্রকৃতি দ্বারা সংঘটিত হচ্ছে বলে মনে করে তখন সে আর ক্রিয়ার ফল ভোগকারী হয় না।

শ্লোকটির দ্বিতীয়ার্ধে বলা হয়েছে কারণং **গুণসঙ্গোহস্য সদ্সদ্যোনি-জন্মসু**—যে যোনিতে সুখের বাহুল্য থাকে তাকে বলে 'সৎ যোনি' আর যে যোনিতে দুঃখের বাহুল্য, তাকে বলে 'অসৎ যোনি'। গুণাদির সংস্পর্শে সুখ-দুঃখ ভোগকারী পুরুষই বন্ধনপ্রাপ্ত হয়ে সৎ বা অসৎ যোনিতে জন্মগ্রহণ করে। '**নিবধ্নন্তি মহাবাহো দেহে দেহিনমব্যয়ম্**' (গীতা ১৪।৫)। কিন্তু যদি সে প্রকৃতিতে অবস্থান না করে, প্রকৃতির (শরীরের) ওপর অহং ও মমত্ববোধ না রাখে, নিজ স্বরূপে অবস্থান করে, অসঙ্গ থাকে, তাহলে পুরুষ কখনোই সুখ-দুঃখের ভোক্তা হয় না, বরং সুখ-দুঃখে সম হয়ে, সে স্ব-তে স্থিত হয়। আসলে অসঙ্গতাই হল আমাদের স্বরূপ—'**অসঙ্গো হ্যয়ং পুরুষঃ**' (বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ ৪।৩।১৫)। আর তাই পুরুষ (জীবাত্মা) যদি অনিত্যর (শরীরের) সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন না করে তাহলে তাঁর জন্ম-মৃত্যু হওয়া সম্ভবই নয়।

উপদ্রষ্টা—ভগবান পুরুষকে বলেছেন 'উপদ্রষ্টা' অর্থাৎ পুরুষ স্বরূপত নিত্য, সর্বত্র পরিপূর্ণ, স্থির, অচল এবং সনাতন হওয়া সত্ত্বেও প্রকৃতি ও শরীরের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করেন।

অনুমন্তা—আবার পুরুষ শরীরের প্রত্যেক কাজে সম্মতি দিয়ে থাকেন, তাই তাঁর নাম 'অনুমন্তা'।

ভর্তা—পুরুষ 'ভর্তা' নামেও অভিহিত কারণ তিনি একটি ব্যষ্টি-দেহের সঙ্গে মিলিত হয়ে, তার সঙ্গে তাদাত্ম্য করে অন্ন-জল ইত্যাদির সাহায্যে শরীরকে পোষণ করেন এবং শীত-গ্রীষ্মাদি থেকে দেহকে সংরক্ষণ করতে ব্যস্ত থাকেন।

ভোক্তা— পুরুষ দেহের সঙ্গে একাত্ম হয়ে অনুকূল-পরিস্থিতিতে নিজেকে সুখী ও প্রতিকূল পরিস্থিতিতে নিজে দুঃখী বলে মনে করে তাই তাঁর সংজ্ঞা 'ভোক্তা'।

মহেশ্বর— তিনি শরীর, ইন্দ্রিয়াদি, মন, বুদ্ধি ও ধনসম্পত্তির মালিক মনে করায় তাকে 'মহেশ্বর' বলা হয়।

পরমাত্মা—আর পুরুষ সর্বোৎকৃষ্ট, পরম আত্মা তাই তাঁকে 'পরমাত্মা' বলা হয়েছে—**'পরমাত্মেতি চাপ্যুক্তো'**। ইনি দেহে অবস্থান করলেও **'দেহেঽস্মিন্ পুরুষঃ পরঃ'** অর্থাৎ দেহসম্বন্ধরহিত। মানুষের পুত্রের সঙ্গে সম্পর্ক থেকে পিতা, পত্নীর সঙ্গে সম্পর্ক থেকে পতি, বোনের সম্পর্ক থেকে ভাই ইত্যাদি হয়। এইসব সম্পর্ক কিন্তু শুধু নিজ নিজ কর্তব্য পালন করার উদ্দেশ্যেই হয়ে থাকে, মমতা সৃষ্টির জন্য নয়। পুরুষের প্রকৃত স্বরূপ হল 'পর' অর্থাৎ সর্বতোভাবে সম্পর্করহিত। কিন্তু অন্যের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপিত হওয়ায় সে উপদ্রষ্টা, অনুমন্তা ইত্যাদি হয়ে ওঠে।

ভগবান এই প্রকরণের অন্তিম শ্লোকে বলেছেন **'য এনং বেত্তি পুরুষং প্রকৃতিং চ গুণৈঃ সহ'** (গীতা ১৩।২৩)। এটি আগের শ্লোকের অর্থাৎ **'দেহেঽস্মিন্ পুরুষঃ পরঃ'** পদটির ব্যাখ্যা। ভগবান সাধকদের প্রকৃত স্বরূপ জানিয়ে সাবধান করে বলেছেন— তাদের যেন এই বোধ হয় যে স্বরূপে কোনো ক্রিয়াশীলতা নেই তাই তিনি ক্রিয়ার কর্তা নন এবং কর্তা না হওয়ায় ভোক্তাও নন। সাধক যখন নিজেকে অকর্তা বলে জানতে পারেন, পুরুষকে প্রকৃতি এবং তার গুণগুলি থেকে পৃথক বলে অবগত হন, তখন তাঁর কর্তৃত্বের অভিমান স্বতঃই দূর হয় আর ক্রিয়ার ফলেও আসক্তি থাকে না। তাঁর দ্বারা তখন স্বতঃ শাস্ত্রসম্মত কার্যাদি হতে থাকে। গুণাতীত হওয়ায় তাঁর আর পুনর্জন্ম হয় না।

ভগবান পূর্বে বলেছেন— **'সর্বথা বর্তমানোঽপি স যোগী ময়ি বর্ততে'** (গীতা ৬।৩১) আর এখানে বলেছেন—**'সর্বথা বর্তমানোঽপি ন স ভূয়োঽভিজায়তে'**। ষষ্ঠ অধ্যায়ে ভক্তিপ্রসঙ্গে ভগবান বলেছেন—ভক্ত আসক্ত মানুষের মতো আচরণ করলেও নির্বিকারই থাকেন তাই প্রেম প্রাপ্ত হন। আর এখানে বলেছেন—**'ন স ভূয়োঽভিজায়তে'** অর্থাৎ তার বোধ

প্রাপ্তি হয়। তাৎপর্য হল প্রেম ও বোধ দুটোতেই গুণাদির সঙ্গ থাকে না। কিন্তু বোধ হলে জন্ম-মৃত্যু চক্র থেকে মুক্ত হয় আর প্রেমে মুক্তির সঙ্গে সঙ্গে ভগবানেও অভিন্নতা আসে।

জ্ঞান মার্গের সাধন— (শ্লোক ৭-১১)

পুরুষের শরীরের সঙ্গে তাদাত্ম্য হওয়ার ফলে দেহের প্রতি জন্মে আসক্তি ও মমতা এবং তার ফলে জাত হয় ইচ্ছা-দ্বেষ আদি বিকারসমূহ। ভগবান এই অধ্যায়ের পাঁচটি শ্লোকে এই তাদাত্ম্য দূর করার জন্য কুড়িটি সাধনাকে 'জ্ঞান' নামে বর্ণনা করেছেন।

অমানিত্বমদম্ভিত্বমহিংসা ক্ষান্তিরার্জবম্।
আচার্যোপাসনং শৌচং স্থৈর্যমাত্মবিনিগ্রহঃ॥
ইন্দ্রিয়ার্থেষু বৈরাগ্যমনহঙ্কার এব চ।
জন্মমৃত্যুজরাব্যাধিদুঃখদোষানুদর্শনম্ ॥
অসক্তিরনভিষ্বঙ্গঃ পুত্রদারগৃহাদিষু।
নিত্যঞ্চ সমচিত্তত্বমিষ্টানিষ্টোপপত্তিষু॥
ময়ি চানন্যযোগেন ভক্তিরব্যভিচারিণী।
বিবিক্তদেশসেবিত্বমরতির্জনসংসদি ॥
অধ্যাত্মজ্ঞাননিত্যত্বং তত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শনম্।
এতজ্ জ্ঞানমিতি প্রোক্তমজ্ঞানং যদতোঽন্যথা॥

(গীতা ১৩।৭-১১)

'মানিত্ব (নিজের শ্রেষ্ঠত্ব ভাব) না থাকা, দম্ভভাব (আত্মপ্রচারের ভাব) না থাকা, অহিংসা, ক্ষমা, সারল্য, গুরুসেবা, অন্তর-বাহিরে শুচিতা, স্থৈর্য এবং আত্মসংযম।

ইন্দ্রিয়ভোগ্য বস্তুতে বৈরাগ্য, নিরহংকারিতা, জন্ম-মৃত্যু, জরা, ব্যাধি আদি দুঃখরূপ দোষগুলিতে বারংবার অবলোকন।

বিষয়ে অনাসক্তি, স্ত্রী-পুত্র-গৃহাদিতে একাত্ম না হওয়া (ঘনিষ্ঠতা না বাড়ানো) এবং অনুকূল-প্রতিকূল অবস্থায় চিত্তের সর্বদা সমভাব থাকা।

অনন্যযোগের দ্বারা আমাতে অব্যভিচারিণী (অচলা) ভক্তি হওয়া,

নির্জন স্থানে (একান্তে) বাসের স্বভাব থাকা এবং জনসমাগমে প্রীতি উৎপন্ন না হওয়া।

নিত্য-নিরন্তর আধ্যাত্ম জ্ঞানের অনুশীলন, তত্ত্বজ্ঞান অর্থাৎ পরমাত্মাকে সর্বত্র দর্শন, এই পূর্বোক্ত কুড়িটিকে জ্ঞান বলা হয়, এর বিপরীতে যা কিছু তা সবই অজ্ঞান।' (গীতা ১৩।৭-১১)

১) 'অমানিত্বম্'—নিজের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্বভাব না থাকাকে বলা হয় 'অমানিত্ব'। শরীরের সঙ্গে তাদাত্ম্য হলে তবেই বর্ণ, আশ্রম, যোগ্যতা, বিদ্যা, গুণ, পদ ইত্যাদির জন্য নিজের মনে শ্রেষ্ঠত্ব ভাবের উদয় হয়। এইরূপ মানিত্বর অভিমান থাকলে সাধকের যথার্থ জ্ঞান হয় না। এই জড়ত্বের গুরুত্ব যত কম হবে, নিজের মধ্যে তা নিয়ে অভিমান বা শ্লাঘা ততই কম হতে থাকবে এবং সাধক ততই চিন্ময়ের দিকে অতি দ্রুত অগ্রসর হতে থাকবেন। তাই সাধকের উচিত যাঁরা শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি, সাধনায় যাঁরা তাঁর থেকে উচ্চ, যাঁরা তত্ত্বজ্ঞ (জীবন্মুক্ত), তাঁদের সঙ্গ করা, তাদের অনুগত হওয়া যাতে তাদের অভিমান দূর হয় আর সঙ্গগুণে নিজ বহুদোষও অতি সহজে দূর হয়। সাধু সদাই অমানী হন ও সকলকেই মান প্রদান করেন। ভগবান চৈতন্যমহাপ্রভু তাঁর শিক্ষাষ্টকে বলেছেন—

তৃণাদপি সুনিচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্তনিয়া সদা হরিঃ॥

অর্থাৎ তৃণ থেকেও নম্র থাকবে, বৃক্ষের মতো সহিষ্ণু হবে, অমানি হয়ে সকলকে মান্য করে হরি কীর্তন করলে তবেই হরিকে পাওয়া যায়।

ভগবান ষোড়শ অধ্যায়ে ভক্তিমার্গের সাধকদের জন্য ২৬টি দৈবীগুণের কথা বলেছেন যার প্রথমটি হল 'অভয়ং' (গীতা ১৬।১) এবং শেষে বলেছেন 'অমানিত্বম্' (গীতা ১৬।৩)। এর তাৎপর্য হল ভক্ত ভগবানের শরণাগত হয়েই তার সাধনা শুরু করেন তাই প্রথম থেকে তার মধ্যে 'অভয়' রূপী দৈবীগুণ এসে যায়। ভগবান শ্রীরামচন্দ্র বলেছেন—

সকৃদেব প্রপন্নায় তবাস্মীতি চ যাচতে।
অভয়ং সর্বভূতেভ্যো দদাম্যেতদ্ ব্রতং মম॥

(বাল্মীকি রামায়ণ ৬।১৮।৩৩)

অর্থাৎ যে সর্বতোভাবে শরণাগত হয়ে আমাকে চায়, তাকে অভয় প্রদান করাই আমার ব্রত।

বালক যেমন মাকে দেখে নির্ভয় হয়, তেমনি ভক্তিমার্গের সাধক শ্রীপ্রহ্লাদের মতোই প্রারম্ভেই সর্বত্র প্রভুকে অবলোকন করেন, আর তাই তাঁর মধ্যে 'অভয়' প্রথম থেকেই প্রকাশ পায়। তাঁর মধ্যে অন্যকে মান দেওয়ার প্রবণতা থাকায় ক্রমেই তিনি 'অমানী' হয়ে ওঠেন অর্থাৎ তাঁর 'দেহাধ্যাস' দূর হয়।

আর এখানে জ্ঞানমার্গের সাধনের কথা বলা হয়েছে। জ্ঞানমার্গের সাধক প্রথম থেকেই শরীরের সঙ্গে ঐক্য অস্বীকার করে তাঁর সাধনা শুরু করেন। তাঁর মূল লক্ষ্য থাকে **'ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োর্জ্ঞানং যতজ্‌জ্ঞানং মতং মম'** (গীতা ১৩।২)। অর্থাৎ ক্ষেত্র (শরীর) ও ক্ষেত্রজ্ঞের (জীবাত্মা) পৃথকত্ব অনুভব করা। তাই জ্ঞানমার্গের সাধকের প্রথম সাধন হয় 'অমানিত্বম্' অর্থাৎ অমানী হয়ে থাকা। কারণ শরীরের সঙ্গে ঐক্য মেনে নিলে তবেই মানিত্ব ভাব এসে যায়। আর জ্ঞানমার্গের শেষে তাঁর **'তত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শনম্'** হয় অর্থাৎ তিনি পরমাত্মাকে সর্বত্র দর্শন করে তাঁর অভয় চরণ প্রাপ্ত হন এবং 'অভয়' হন।

২) **অদম্ভিত্বম্**—লোক দেখানো ভাবকে বলে দম্ভ। লোকে আমার মধ্যে ভাল গুণ দেখলে আমাকে সম্মান করবে, উচ্চাসনে বসাবে এই ভাব, অর্থাৎ নিজের মধ্যে প্রকটিত গুণ না থাকলেও তা বাহ্যত প্রকাশ করাকে বলে 'দম্ভ'। সাধকের একমাত্র উদ্দেশ্য হওয়া উচিত ভগবান লাভ করা, লোক দেখানো নয়। তার মধ্যে লোক দেখানো ভাব আসলে সাধনায় শৈথিল্য আসে ফলে উদ্দেশ্য সিদ্ধির পথে বাধা পড়ে। তাই সাধকের নিজ ভালো-মন্দ, উচ্চ-নীচ যা কিছু অবস্থাই আসুক না কেন, সেদিকে লক্ষ্য না রেখে কারোর জাগতিক প্রশংসায় আকৃষ্ট না হয়ে নিজ সাধনায় ব্যাপৃত থাকা উচিত। এইভাবে সতর্ক থাকলে দম্ভ দূর হয় অর্থাৎ সাধক অদম্ভি হন।

৩) **অহিংসা**—কায়মনোবাক্যে কাউকে দুঃখ না দেওয়াই হল অহিংসা। কর্তাভেদে অহিংসা হয় তিন প্রকারের। কৃত (নিজে হিংসা করা), কারিত

(কারো দ্বারা হিংসা করানো) এবং অনুমোদিত (হিংসাকে অনুমোদন বা সমর্থন করা)। আর এই হিংসাও তিনটি করণের (যন্ত্র বা ইন্দ্রিয়র) সাহায্যে হয়ে থাকে—শরীর দ্বারা, বাক্য দ্বারা ও মন দ্বারা। এগুলির কোনোটিই না করা হল অহিংসা। অহিংসাও চার প্রকার—দেশগত, কালগত, সময়গত ও ব্যক্তিগত। অমুক তীর্থস্থানে, অমুক মন্দিরে হিংসা না করার অভিপ্রায়কে বলে 'দেশগত অহিংসা'। কোনো বিশেষ তিথিকে যেমন অমাবস্যা, পূর্ণিমা ইত্যাদিতে কাউকে দুঃখ না দেওয়ার ইচ্ছেকে বলে 'কালগত অহিংসা'। সাধুলাভ হলে, পুত্রের জন্মদিনে কাউকে দুঃখ না দেওয়ার যে ইচ্ছে তাকে বলে 'সময়গত অহিংসা'। আর গরু, হরিণ আদি প্রাণী বা গুরুজন, মা-বাবা, শিশুকে দুঃখ না দেওয়ার অভিপ্রায়কে বলে 'ব্যক্তিগত অহিংসা'। এই সকল অহিংসাই মনে রেখে সাধকের সকলের সুখে নিজের সুখ, সকলের হিতে নিজের হিত আর সকলের সেবায় নিজের সেবা বলে মনে করা উচিত। 'সবই নিজের স্বরূপ'—এই বিবেক বোধ জাগলে, তখন সাধক আর কাউকে দুঃখ প্রদান করতে পারে না, এবং নিজের মধ্যে স্বতঃই অহিংস-ভাব জাগরিত হয়।

৪) **ক্ষান্তি**—সহনশীলতা অর্থাৎ ক্ষমাকে বলা হয় ক্ষান্তি। নিজের সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও অপরাধীর যেন কখনো কোনোভাবেই দণ্ডবিধান না করা, অন্যায়কারীর প্রতিশোধ না নেওয়া বা কারোর শাস্তিবিধানের কথা না ভাবাই হল 'ক্ষান্তি'। আহার গ্রহণের সময় নিজের দাঁত দিয়ে নিজের জীভ কামড়ে দিলে আমরা দাঁতের ওপর রাগ করে কোনো দণ্ডবিধান করি না। জীভ তাড়াতাড়ি সেরে যাক এই ভাবনা থাকলেও দাঁতগুলি ভেঙে ফেলব এইরূপ চিন্তা কখনো মনে আসে না। কারণ যেমন জীভ তেমন দাঁতগুলিও আমাদেরই স্বরূপ, তাঁদের ভেঙে ফেললে আমরা অধিক কষ্ট পাব। ঠিক সেইরকম যদি কেহ অন্যায় আচরণ করে আমাদের দুঃখ দেয় তবে এবং তাকেও আমরা যদি দুঃখ দিই তবে আমাদেরও ক্ষতি হবে কেননা সেও আমাদের স্বরূপই। **'সর্বভূতস্থমাত্মানাং সর্বভূতানি চাত্মনি'** (গীতা ৬।২৯)।

৫) **আর্জবম্**—সহজ সরল ভাবকে বলে 'আর্জব'। সাধকের কায়মনো-

বাক্যে সহজ-সরল হওয়া উচিত। সহজ-অকপট ভাব, উদ্ধত-জেদী বা অহংকারী না হওয়া—এসবই হল 'শারীরিক সরলতা'। সৌম্য ব্যবহার, হিতাকাঙ্ক্ষা, দয়া আদি 'মানসিক সরলতা'। ব্যঙ্গ, নিন্দা, পরচর্চা, অপমানজনক বিদ্রূপ বাক্য পরিত্যাগ আর সরল, প্রিয়, হিতকারী বাক্য বলা—এসবই হল 'বাচনিক সরলতা'। শরীরের সঙ্গে সম্পর্ক রাখলে নিজেকে অন্যের থেকে বিশেষ ব্যক্তি বলে মনে হয়। তার ফলে ঔদ্ধত্য ও অহংকার জন্মায়। তাই শরীরের সঙ্গে সম্পর্ক না রেখে শুধু স্বরূপের দিকে দৃষ্টি রাখলে এই ঔদ্ধত্য দূর হয়। আর সাধকের মধ্যে তখন স্বতঃই সরলতা, নম্রতা আসে।

৬) **আচার্যোপাসনম্**—সাধারণত বিদ্যা ও সদুপদেশ প্রদানকারী গুরুকেও আচার্য বলা হয় কিন্তু এই স্থানে 'আচার্য' পদটি পরমাত্মতত্ত্ব প্রাপ্ত জীবন্মুক্ত মহাপুরুষের বাচক। জাগতিক গুরুকে দণ্ডবৎ প্রণাম, শ্রদ্ধা-সম্মান জানানো, সেবা করার শাস্ত্রবিহিত চেষ্টাকে উপাসনা বলা হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তত্ত্ববেত্তা গুরুর সিদ্ধান্ত ও আদর্শ অনুসারে নিজ জীবন গঠন করাকেই প্রকৃত উপাসনা বলা হয়। গুণাতীত মহাপুরুষের কেবলমাত্র দেহের পরিচর্যা করলেই তাঁকে পূর্ণভাবে সেবা হয় না যা দেহাভিমানী ব্যক্তির হয়। ভগবান দৈবী-সম্পদের লক্ষণ বর্ণনায় **'আচার্যোপাসনম্'** পদটি ব্যবহার না করে জ্ঞানের সাধনায় তা ব্যবহার করেছেন। এর কারণ জ্ঞানমার্গে গুরুর যতটা প্রয়োজন থাকে, ভক্তিমার্গে ততটা নয়। ভক্তিমার্গের সাধক সদাই ভগবানে আশ্রিত থেকে সাধন-ভজন করেন, তাই ভগবান স্বয়ং তাকে কৃপা করে তাঁর যোগক্ষেম নিজেই বহন করেন—**'তেষাম্ নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্'** (গীতা ৯।২২)। তাঁর সমস্ত বাধাবিঘ্ন দূর করে জ্ঞানের আলোকে তাঁর জীবন উদ্ভাসিত করে দেন—**'নাশয়াম্যাত্মভাবস্থো জ্ঞানদীপেন ভাস্বতা'** (গীতা ১০।১১)। জ্ঞানমার্গের সাধক কিন্তু তাঁর নিজের সাধনার বলের ওপর নির্ভর করেন তাই তাঁর সাধনায় কিছু কিছু সূক্ষ্ম ঘাটতি থাকা সম্ভব। তবে গুরু কেবল আমারই কল্যাণ করবেন—এমন ভাব পোষণ করা সাধকের পক্ষেও বন্ধন। তার উচিত নিজের জন্য কিছু আশা না করে সর্বতোভাবে গুরুপদে সমর্পিত হওয়া, তাঁর ইচ্ছায় নিজেকে সমর্পণ করা।

যদি সত্যকার সদ্‌গুরু মহাপুরুষ না পাওয়া যায় তাহলে সাধকের উচিত শুধু ভগবদ্‌পরায়ণ হয়ে তাঁর ধ্যান, চিন্তা ইত্যাদিতে ব্যাপৃত হওয়া এবং এই বিশ্বাস রাখা যে পরমাত্মা অবশ্যই তাকে গুরু পাইয়ে দেবেন। প্রকৃতপক্ষে দেখা যায় যে পূর্ণভাবে পরমাত্মার ওপর নির্ভর করলে ভগবান স্বয়ংই গুরুর কাজ সম্পন্ন করেন।

৭) **শৌচম্**—শৌচম দুই প্রকার—বাহ্য ও অন্তর। জল ও মৃত্তিকা দ্বারা শারীরিক শুদ্ধি হয় এবং দয়া, ক্ষমা, ঔদার্য ইত্যাদির সাহায্যে চিত্তর শুদ্ধি হয়। শরীর এমন সব পদার্থ দ্বারা সৃষ্ট যে একে যতই শুদ্ধ করা হোক, অশুদ্ধই থেকে যায়। এর থেকে বারবার অশুদ্ধ পদার্থই নির্গত হয়। সুতরাং একে বারবার শুদ্ধ করতে করতে এর প্রকৃত অশুদ্ধি সম্বন্ধে জ্ঞান হয়, ফলে শরীরে অনাসক্তি (বৈরাগ্য) আসে।

৮) **স্থৈর্যম্**—একনিষ্ঠা, লক্ষ্য থেকে বিচলিত না হওয়াকে বলা হয় স্থৈর্য। আমাকে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করতেই হবে—এরূপ দৃঢ়নিশ্চয়তা থাকা এবং বাধাবিঘ্ন এলেও তাতে বিচলিত না হয়ে নিজের লক্ষ্য অনুযায়ী সাধনায় তৎপর থাকা—একেই এখানে স্থৈর্য নামে অভিহিত করা হয়েছে। সাধু এবং শাস্ত্রাদির বচনে যত বেশি বিশ্বাস জন্মাবে ততই তার মধ্যে স্থিরতা আসবে।

৯) **আত্মবিনিগ্রহঃ**—এখানে আত্মা মনের বাচক। মনকে বশ রাখাই হল আত্মবিনিগ্রহঃ। মনের ভাব হয় দুই প্রকারের—স্ফুরণ ও সংকল্প। স্ফুরণ নানা প্রকারের হয় এবং এটি আসে ও যায়। আর যে স্ফুরণে মন আকৃষ্ট হয়, সেটিকে সংকল্প বলে। সংকল্পে দুটি জিনিস থাকে—রাগ ও দ্বেষ, যার জন্য মনে চিন্তা আসে। স্ফুরণ হল দর্পণে ভেসে ওঠা দৃশ্যের মতো আর সংকল্প হল ক্যামেরার ফিল্মের মতো। দর্পণে কোনো দৃশ্য ধরে রাখতে পারে না কিন্তু ক্যামেরা দৃশ্যকে ধরে রখে। সেইরকম স্ফুরণ আসে ও যায় কিন্তু সংকল্পে মনে আসক্তির দৃঢ় ছাপ ফেলে। অভ্যাসের সাহায্যে অর্থাৎ মনকে বারংবার ধ্যেয়তে সন্নিবেশিত করলে স্ফুরণগুলি নষ্ট হয়। আর বৈরাগ্যের দ্বারা অর্থাৎ কোনো বস্তু, ব্যক্তির প্রতি অনুরাগ ও গুরুত্ব ত্যাগ করলে সংকল্প নষ্ট হয়ে যায়। সেইজন্য সাধনে বৈরাগ্যেরও অসীম প্রভাব।

১০) **ইন্দ্রিয়ার্থেষু বৈরাগ্যম্**—ইহলোক-পরলোকাদির বিষয়ভোগে আকর্ষণ না থাকাই হল ইন্দ্রিয়াদি বিষয়ে আসক্তিবর্জিত হওয়া। শাস্ত্রানুসারে জীবন-নির্বাহের জন্য বিষয় সেবন করলেও সাধকদের বিষয়াদিতে অনুরাগ, আসক্তি এবং প্রিয়ভাব থাকা উচিত নয়। যদি বিচার করা হয় যে, যাঁরা ভোগ-বিলাস করেননি, যাঁদের কোনো ভোগ-সামগ্রী নেই, সংসারে উদাসীন, অনাসক্ত তাঁদের থেকে যাঁরা খুব ভোগ করেছেন এবং এখনো ভোগ করে চলেছেন এই উভয়ের মধ্যে কি বিশেষ পার্থক্য আছে ? কিছুই না, বরং ভোগ বাসনাকারীরা তো সদাই শোক-চিন্তায় মগ্ন থাকে, ভোগের ফলে ক্রমশ দুর্বল হয়ে যায় এবং শেষকালে দুর্বল শরীর ত্যাগ করে চলে যেতে হয়। এইভাবে চিন্তা করলে বৈরাগ্য আসে।

১১) **অনহঙ্কার এব চ**—'আমি শরীর' এই মনোভাবের ফলেই অহং-অভিমান সৃষ্টি হয়। এই অহংকার, সাধন-ভজনকালে প্রায়শই বহুদূর পর্যন্ত থেকে যায়। সাংসারিক বস্তুর সম্বন্ধ ছাড়াও ত্যাগ, বৈরাগ্য, শিক্ষা প্রভৃতির জন্য নিজের যে বৈশিষ্ট্য অনুভব হয় তার জন্যও অহং-অভিমান হয়। এখানে 'অনহঙ্কার' অর্থে এই অভিমান সর্বতোভাবে নাশের কথা বলা হয়েছে।

১২) **জন্মমৃত্যুজরাব্যাধি দুঃখদোষানুদর্শনম্**—এখানে জন্ম, মৃত্যু, বৃদ্ধাবস্থা এবং রোগাদির দুঃখগুলি বারংবার দেখার কথা বলা হয়েছে যার অর্থ বিচার করা। যাতে উৎপত্তি এবং বিনাশশীল বস্তুর প্রতি আসক্তি স্বাভাবিকভাবে হ্রাস পায় অর্থাৎ বৈরাগ্য আসে। তখন সাধক বুঝতে পারে 'শরীরং ব্যাধিমন্দিরম্'। অপরদিকে শরীরাদি জড় পদার্থের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করলে, গুরুত্ব দিলে, আশ্রয় গ্রহণ করলে সমস্ত দোষ উৎপন্ন হয়—**'দেহাভিমানিনি সর্বে দোষা প্রাদুর্ভবন্তি'**।

১৩) **অসক্তিঃ**—উৎপন্ন হওয়া যে কোনো জাগতিক বস্তু, ব্যক্তি, ঘটনা, পরিস্থিতি ইত্যাদিতে যে প্রিয়ভাব উৎপন্ন হয় তাকে বলে 'সক্তি'। সেই 'সক্তি' রহিত হওয়াকে বলে 'অসক্তি'। সংযোগজনিত সুখ প্রারম্ভে অমৃতের মতো হলেও তার পরিণাম হয় বিষের মতো। **'বিষয়েন্দ্রিয়-**

সংযোগাদ্ যত্তদগ্রেঽমৃতোপমম্ পরিণামে বিষমিব তৎ সুখং রাজসং স্মৃতম্' (গীতা ১৮।৩৮)। সংযোগজনিত সুখভোগকারীদের পরিণামে দুঃখভোগ করতেই হয় এটাই নিয়ম। তাই সংযোগজনিত সুখের পরিণামের দিকে দৃষ্টি থাকলে আর আসক্তি থাকে না।

১৪) **অনভিষ্বঙ্গঃ পুত্রদারগৃহাদিষু**—স্ত্রী, পুত্র, পরিবার, অর্থ, বাড়ি, জমি ও বস্তু ইত্যাদির সঙ্গে মেনে নেওয়া যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বা তাদাত্ম্য তা হল 'অভিষ্বঙ্গ'। যেমন পুত্র বা স্ত্রী গত হলে মানুষ বলে 'আমি মরে গেলাম', অর্থ ক্ষতি হলে বলে আমি মারা পড়লাম ইত্যাদি। এই একাত্মতা বর্জিত হওয়াকেই 'অনভিষ্বঙ্গঃ' বলা হয়েছে। স্ত্রী-পুত্রাদির সঙ্গে যথাযোগ্য কর্তব্য-কর্ম, তাদের সঙ্গে আপনভাব না রেখে সেবা করা ইত্যাদি 'অভিষ্বঙ্গ' নয়, এগুলি আনে নির্লিপ্ততা বা অসঙ্গতা যা অমরত্ব অনুভব করার প্রধান সাধন। তবে আপনজনের সন্তুষ্টির জন্য কখনো তার সেবা গ্রহণ করলেও তাতে সুখী বা সন্তুষ্ট হওয়া উচিত নয়, কারণ সন্তুষ্ট হলেই অভিষ্বঙ্গ জন্মায়। অর্থাৎ কারও সঙ্গে বা কোনো কর্মের সঙ্গে নিজেকে লিপ্ত করা উচিত নয়, এই বিষয়ে অত্যন্ত সজাগ থাকতে হয়।

১৫) **নিত্যঞ্চ সমচিত্তত্বমিষ্টানিষ্টোপপত্তিষু**—এখানে বলা হয়েছে ইষ্ট অর্থাৎ অনুকূল বস্তু, ব্যক্তি, পরিস্থিতি ইত্যাদির প্রাপ্তিতে চিত্তে আসক্তি, হর্ষ, সুখ ইত্যাদি বিকার না হওয়া এবং অনিষ্ট অর্থাৎ মনের প্রতিকূল বস্তু, ব্যক্তি ইত্যাদি প্রাপ্ত হলে চিত্তে দ্বেষ, শোক, দুঃখ, উদ্বেগ আদি বিকার উৎপন্ন না হওয়া। তাৎপর্য এই যে, অনুকূল-প্রতিকূল পরিস্থিতিতে চিত্ত যেন সর্বদা সম থাকে, কোনো প্রভাব না পড়ে—যেমন ভগবান আগেও বলেছেন '**সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমো ভূত্বাঃ**' (২।৪৮) অর্থাৎ সিদ্ধি-অসিদ্ধিতে সম থাকবে।

মানুষের সবচেয়ে বড় বাধা হল যে, যা কিছু অনুকূল সামগ্রী সে প্রাপ্ত হয়, সেগুলিকে নিজের বলে মনে করে সুখভোগ করতে থাকে। আসলে সংসারের দ্রব্যগুলি সংসারের কাজে লাগাবার জন্যই পাওয়া, ইন্দ্রিয়-সুখাদির জন্য নয়। তেমনি মানুষের জীবনে যে প্রতিকূলতা আসে, তা

দুঃখভোগের জন্য নয়, বরং সংযোগজনিত সুখের আশা পরিত্যাগ করার জন্য। অনুকূল-প্রতিকূল পরিস্থিতি মানুষকে সুখ-দুঃখের উর্ধ্বে এনে, এই দুয়ের অতীত পরমাত্মতত্ত্ব লাভ করার জন্যই প্রাপ্ত হয়েছে।

১৬) **ময়ি চানন্যযোগেন ভক্তিরব্যভিচারিণী**— সংসারের আশ্রয় আঁকড়ে থাকায় সাধকের দেহাভিমান বজায় থাকে। এটিই হল অব্যক্তর জ্ঞান লাভে প্রধান বাধা। এটি দূর করার জন্যই ভগবান অনন্যযোগের দ্বারা তাঁর অব্যভিচারিণী ভক্তিকেই তত্ত্বজ্ঞানের সাধন বলে জানিয়েছেন। তাৎপর্য হল ভক্তিরূপ সাধনে দেহাভিমান অনায়াসে দূর হয়। ভগবান ব্যতীত আর কারোর কাছে কিছু পাওয়ার ইচ্ছা অর্থাৎ ভগবান ব্যতিরেকে মানুষ, গুরু, দেবতা, শাস্ত্র প্রভৃতি আমাকে এই তত্ত্ব অনুভব করাতে সক্ষম বা নিজের বল, বুদ্ধি, যোগ্যতার দ্বারা আমি এই তত্ত্ব প্রাপ্ত হব, এই চিন্তা ত্যাগ করে ভগবদ্ আশ্রয়েই থাকব এই চিন্তাই হল 'অনন্য যোগ' হওয়া। আর শুধু ভগবানের সঙ্গেই সম্পর্কিত হওয়া এবং অন্য কারো সঙ্গে কোনোরূপ সম্পর্ক না রাখা—একেই বলা হয় 'অব্যভিচারিণী ভক্তি'।

একটি আখ্যান— মহারাজ 'অম্বরীস' পরম বিষ্ণুভক্ত। একবার তাঁর রাজসভায় ঐরাবত আরোহণ করে দেবাধিপতি ইন্দ্র এসে উপস্থিত হন। মহারাজ ত্রস্ত হয়ে পাদ্য-অর্ঘ্য দ্বারা তাঁকে অর্চনা করলেন। দেবাধিপতি অত্যন্ত প্রীত হয়ে বললেন— মহারাজ, আপনার মতো ধার্মিক ও ভক্ত পৃথিবীতে অত্যন্ত দুর্লভ, আমি নিজেই আপনার দর্শনে এসেছি, আপনি বর প্রার্থনা করুন— 'বরং ব্রূনু'। মহারাজ অম্বরীস করজোড়ে বললেন 'হে দেবাধিপতি, ভগবৎ কৃপায় আমার কিছুর অভাব নেই। আমার পার্থিব বা পারমার্থিক কিছুই পাওয়ার আর আকাঙ্ক্ষাও নেই'। ইন্দ্র বললেন—দেখ অম্বরীস, আমি স্বর্গাধিপতি, আমাকে দর্শন পাওয়ার জন্য কত মুনি-ঋষি তপস্যা করে আর তোমাকে আমি অযাচিতভাবে এসে বর দিতে চাইছি, তুমি ফিরিয়ে দিচ্ছ। জান এর ফল কি হতে পারে, তোমাকে আমি বজ্রাঘাত করব।

ভক্ত চিরদিনই নির্ভয়। মহারাজ অম্বরীস হাতজোড় করে নতমস্তকে বজ্রাঘাতের প্রতীক্ষায় রইলেন। ইন্দ্রও বজ্র ছুড়লেন, আর তা মহারাজ

অম্বরীসের মাথায় এসে পড়ল। কিন্তু কি পড়ল, না পুষ্পবৃষ্টি। ভগবৎ আশ্রয়কারী ভক্তর, কারোর কাছে কিছু প্রাপ্তব্য থাকে না, তিনি সকলেরই পূজনীয় হয়ে থাকেন।

পাতঞ্জল যোগসাধনেও পরমাত্মপ্রাপ্তির সহায়করূপে অষ্টাঙ্গ যোগের সাধনায় ভক্তির কথা এবং অন্যত্র স্বতন্ত্ররূপেও ভক্তি সাধনার কথা বলা হয়েছে—

(ক) **'শৌচসন্তোষতপঃস্বাধ্যায়েশ্বরপ্রণিধানানি নিয়মাঃ'** (যোগদর্শন ২।৩২) শৌচ (শুদ্ধি), সন্তুষ্টি, তপ, স্বাধ্যায় এবং ঈশ্বরের শরণাগতি—এই পাঁচটি হল 'নিয়ম'।

(খ) **'ঈশ্বর প্রণিধানাদ্বা'** (যোগদর্শন ১।২৩) ঈশ্বরের ভক্তি অর্থাৎ শরণাগতির নাম হল 'ঈশ্বরপ্রণিধান'। এটির দ্বারাও শীঘ্রই নির্বীজ-সমাধি লাভ হয়।

কেবল ভগবানকেই আপন বলে মনে করা, ভগবানেরই আশ্রয় গ্রহণ করা এবং শ্রদ্ধা-বিশ্বাসপূর্বক ভগবদ্‌নাম জপ, কীর্তন, স্মরণ, মনন আদি করাই ভক্তিলাভের সহজ উপায়।

১৭) **বিবিক্তদেশসেবিত্বম্**—একান্ত বাস করে পরমাত্মতত্ত্ব চিন্তা, ভজন-স্মরণ, সৎ-শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন, সাধনায় যেন কোনো বাধা না আসে এই চিন্তন, এইরূপ সাধকের স্বাভাবিক ইচ্ছাকে বলে **'বিবিক্তদেশসেবিত্ব'**। কিন্তু শুধুমাত্র নির্জন স্থানে বাস করলেই ভগবদ্‌সাধন হয় না, কারণ সম্পূর্ণ জগতের বীজ তো এই দেহের সঙ্গে সঙ্গেই থাকে। যতক্ষণ এই দেহের সঙ্গে সম্পর্ক থাকে ততক্ষণ সম্পূর্ণ জগতের সঙ্গেও সম্পর্ক থাকে। সুতরাং একান্ত বাস তখনই সহায়ক হয়, যখন সাধকের প্রধান উদ্দেশ্য থাকে দেহাভিমান নাশ করা।

১৮) **অরতির্জন সংসদি**—সাধারণ মনুষ্য সমাগমে প্রীতি, রুচি না হওয়া, সাংসারিক আলোচনা শোনার আগ্রহ না থাকা, বিভিন্ন খবরাখবরে কোনো প্রীতি ও আকাঙ্ক্ষা না থাকা হল **'অরতির্জন সংসদি'**। তবে তত্ত্বজ্ঞান নিয়ে যে আলোচনা, পরমাত্মতত্ত্বজ্ঞানীর সঙ্গলাভে যে রুচি তা

'অরতির্জন সংসদি' নয়, সেগুলিকে আবশ্যক কার্য বলা হয়েছে। মার্কণ্ডেয়পুরাণ বলছেন—

সঙ্গঃ সর্বাত্মনা ত্যাজ্যঃ স চেত্ত্যক্তুং ন শক্যতে।
স সদ্ভিঃ সহ কর্তব্যঃ সতাং সঙ্গো হি ভেষজম॥

(মার্কণ্ডেয়পুরাণ ৩৭।২৩)

আসক্তি সহকারে কারও সঙ্গ করা উচিত নয়। কিন্তু যদি এরূপ অসঙ্গতা না আসে, তাহলে শ্রেষ্ঠ পুরুষদেরই সঙ্গ করা উচিত। কারণ শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের সঙ্গই অসঙ্গতা লাভের ঔষধ।

১৯) **অধ্যাত্মজ্ঞাননিত্যত্বং**—সমস্ত শাস্ত্রের মূল উদ্দেশ্যই হল মানুষকে পরমাত্মার অভিমুখে নিয়োজিত করা, পরমাত্মা প্রাপ্তি করানো। আধ্যাত্মিক গ্রন্থাদির পঠন-পাঠন, তত্ত্বজ্ঞ মহাপুরুষদের নিকট থেকে তত্ত্বজ্ঞান শ্রবণ ও প্রতিপ্রশ্ন দ্বারা জগতের পৃথক অস্তিত্বের অভাব চিন্তন এবং পরমাত্মার অস্তিত্ব সর্বক্ষণ মনন করাই হল **'অধ্যাত্মজ্ঞাননিত্যত্বম্'**।

২০) **তত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শনম্**—তত্ত্বজ্ঞানের অর্থ 'পরমাত্মানুভব'। পরমাত্মাকে সর্বত্র দর্শন করা, তাঁকেই সর্বত্র অনুভব করা, একেই বলে 'তত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শনম্'। এই পরমাত্মা সর্বদেশ, কাল, বস্তু, ব্যক্তি, ঘটনা, পরিস্থিতি ইত্যাদিতে সমভাবে পরিপূর্ণ। এই পরমাত্মাকে সর্বত্র দর্শন করা যাঁর স্বভাবে পরিণত হয়—তাকেই বলা **'তত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শনম্'**। এটি সিদ্ধ হলে সাধকের পরমাত্মতত্ত্ব অনুভূত হয়।

একটি আখ্যান—এক সাধক নদীতীরে দীর্ঘদিন তপস্যারত ছিলেন। তিনি কাউকে তাঁর নিকটে আসতে দিতেন না, সযত্নে সকলকে এড়িয়ে চলতেন। কিন্তু অনেক দিন পরেও কিছুতেই ভগবদ্ উপলব্ধি না হওয়ায় তিনি নদীতে আত্মবিসর্জন দেবেন মনস্থ করলেন। এমন সময় একটি মাছ নদী থেকে লাফিয়ে ডাঙায় পড়ল। মাছটি বলল, 'সাধু মহারাজ আমায় বাঁচান, জলের অভাবে আমি মৃতপ্রায়'। সাধুটি বলল, 'আচ্ছা বোকা তো তুমি। তুমি নদীতে বাস কর, তোমার চারপাশে জল, তোমার খাওয়ারও পাও জলে, নিশ্বাস নাও জলে আবার জিজ্ঞাসা করছ জল কোথায় ? মাছটি বলল,

'মহারাজ আমিও সেই কথাই তো ভাবছি, ঈশ্বর আপনার চারপাশে অথচ আপনি তাঁকে পাচ্ছেন না।' এই বলে মাছটি নদীতে লাফিয়ে পড়ল। সাধুর বোধোদয় হল।

বহুমুখে সম্মুখে তোমার, ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর।
জীবে প্রেম করে যেইজন। সেইজন সেবিছে ঈশ্বর॥

এই প্রকরণের অন্তিমে ভগবান বলেছেন—'**এতজ্জ্ঞানমিতি প্রোক্তম-জ্ঞানং যদতোঽন্যথা**' অর্থাৎ 'অমানিত্বম্' থেকে 'তত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শনম্' পর্যন্ত যে কুড়িটি সাধনের কথা বলা হয়েছে, এ সমস্তই দেহাভিমান দূর করে পরমাত্মপ্রাপ্তিতে সহায়ক হওয়ায় 'জ্ঞান' নামে অভিহিত হয়েছে।

সাধকের যখন এমন তীব্র বৈরাগ্য জাগে যে শরীরের সঙ্গে মেনে নেওয়া সম্পর্ক ত্যাগ করতে তিনি সক্ষম হন, তখন এই সাধন-সামগ্রী তাঁর মধ্যে স্বতঃই প্রকট হয়। তখন আর এই সাধনগুলি পৃথকভাবে করার প্রয়োজন থাকে না। বিনাশশীল শরীরকে নিজ অবিনাশী স্বরূপ থেকে পৃথক বোধ করাই হল প্রধান সাধন। ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ বিভাগ সম্বন্ধে অবহিত করানোর এই কুড়িটি সাধনকে বলা হয়েছে জ্ঞান এবং এর বিপরীতে যা তাকে বলা হয় অজ্ঞান। সাধনা না করলে মানুষ জ্ঞানের কথা শিখতে পারলেও অনুভব করতে সক্ষম হয় না। সুতরাং সাধন না করলে অজ্ঞতা অর্থাৎ ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞকে এক করে দেখার ভাব রয়ে যায় এবং অজ্ঞতা থাকাকালীন কেউ যদি ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞর ব্যাপার শিখে (অর্থাৎ অনুভব না করে) তাই নিয়ে আলোচনা করে তবে তা প্রকৃতপক্ষে তার দেহাভিমানই পুষ্ট করে।

পরমাত্মতত্ত্ব—(শ্লোক ১২-১৮, ৩১-৩৪)

আগের প্রকরণে যে জ্ঞান বিবৃত হয়েছে পরবর্তীতে সেই সাধ্য তত্ত্বকে 'জ্ঞেয়' নাম দিয়ে ভগবান তা পরের দুটি প্রকরণে বর্ণনা করেছেন।

জ্ঞেয়ং যৎ তৎ প্রবক্ষ্যামি যজ্জ্ঞাত্বামৃতমশ্নুতে।
অনাদিমৎ পরং ব্রহ্ম ন সত্তন্নাসদুচ্যতে॥
সর্বতঃ পাণিপাদং তৎ সর্বতোঽক্ষিশিরোমুখম্।
সর্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি॥

সর্বেন্দ্রিয়গুণাভাসং সর্বেন্দ্রিয়বিবর্জিতম্।
অসক্তং সর্বভৃচ্চৈব নির্গুণং গুণভোক্তৃ চ॥
বহিরন্তশ্চ ভূতানামচরং চরমেব চ।
সূক্ষ্মত্বাৎ তদবিজ্ঞেয়ং দূরস্থং চান্তিকে চ তৎ॥
অবিভক্তঞ্চ ভূতেষু বিভক্তমিব চ স্থিতম্।
ভূতভর্তৃ চ তজ্জ্ঞেয়ং গ্রসিষ্ণু প্রভবিষ্ণু চ॥
জ্যোতিষামপি তজ্জ্যোতিস্তমসঃ পরমুচ্যতে।
জ্ঞানং জ্ঞেয়ং জ্ঞানগম্যং হৃদি সর্বস্য বিষ্ঠিতম্॥
ইতি ক্ষেত্রং তথা জ্ঞানং জ্ঞেয়ং চোক্তং সমাসতঃ।
মদ্ভক্ত এতদ্বিজ্ঞায় মদ্ভাবায়োপপদ্যতে॥

(গীতা ১৩।১২-১৮)

অনাদিত্বান্নির্গুণত্বাৎ পরমাত্মায়মব্যয়ঃ।
শরীরস্থোঽপি কৌন্তেয় ন করোতি ন লিপ্যতে॥
যথা সর্বগতং সৌক্ষ্ম্যাদাকাশং নোপলিপ্যতে।
সর্বত্রাবস্থিতো দেহে তথাত্মা নোপলিপ্যতে॥
যথা প্রকাশয়ত্যেকঃ কৃৎস্নং লোকমিমং রবিঃ।
ক্ষেত্রং ক্ষেত্রী তথা কৃৎস্নং প্রকাশয়তি ভারত॥
ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োরেবমন্তরং জ্ঞানচক্ষুষা।
ভূতপ্রকৃতিমোক্ষঞ্চ যে বিদুর্যান্তি তে পরম্॥

(গীতা ১৩।৩১-৩৪)

'পূর্বোক্ত জ্ঞান দ্বারা জ্ঞাতব্য পরমাত্মতত্ত্ব জ্ঞাত হলে মানুষ অমৃতত্ব লাভ করে। সেই জ্ঞেয়-তত্ত্ব অনাদি ও তিনিই পরম ব্রহ্ম। তাঁকে সংও বলা যায় না আবার অসংও বলা যায় না।

তিনি (পরমাত্মা) সর্বত্র হস্ত ও পদবিশিষ্ট, সর্বদিকে নেত্র, মস্তক ও মুখসম্পন্ন এবং সর্বদিকে কর্ণযুক্ত। তিনি জগৎ-সংসারে সর্বত্র এবং সবকিছুতেই ব্যাপ্ত হয়ে রয়েছেন।

পরমাত্মা সর্বেন্দ্রিয় বিবর্জিত এবং সর্ববিষয়ের প্রকাশক। তিনি

আসক্তিবর্জিত অথচ সমস্ত জগতের ধারক ও পালক ; সর্বগুণবর্জিত আবার সমস্ত গুণের ভোক্তা।

পরমাত্মা সকল প্রাণীর অন্তরে এবং বাইরে পরিপূর্ণ, চর-অচর প্রাণীর রূপেও তিনি, অতি দূরেও এবং অতি নিকটেও তিনি। অতি সূক্ষ্মতাবশত তিনি অবিজ্ঞেয় অর্থাৎ জানার বিষয় নন।

পরমাত্মা স্বয়ং অপরিচ্ছন্ন হয়েও সর্বভূতে বিভক্তের ন্যায় অবস্থান করেন। সেই জ্ঞেয় পরমাত্মাই সকল প্রাণীর সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা এবং সংহারকর্তা।

এই পরমাত্মা জ্যোতি সকলেরও জ্যোতি এবং অজ্ঞানরূপ অন্ধকারেরও উর্ধ্বে বলে কথিত। সেই জ্ঞানস্বরূপ জ্ঞেয়-তত্ত্ব জ্ঞানের দ্বারাই লভ্য এবং সকলের হৃদয়ে বিরাজমান।

এইভাবে ক্ষেত্র, জ্ঞান ও জ্ঞেয় সংক্ষেপে বলা হয়। আমার ভক্ত এটিকে তত্ত্বত জেনে আমার ভাব প্রাপ্ত হন।' (গীতা ১৩।১২-১৮)

পুরুষ স্বয়ং গুণরহিত হওয়ায় অবিনাশী পরমাত্মাস্বরূপ। তিনি এই শরীরে অবস্থান করেও কিছুই করেন না বা কোনো কিছুতেই লিপ্ত হন না।

যেমন সর্বত্র পরিব্যাপ্ত আকাশ অতি সূক্ষ্মতাবশত কোনো কিছুতেই লিপ্ত হন না তেমনি সর্বত্র পরিপূর্ণ আত্মাও কোনো দেহে লিপ্ত হন না।

যেমন একটি সূর্য সমস্ত চরাচরকে প্রকাশিত করে, তেমনি এই ক্ষেত্রজ্ঞ (আত্মা) সমস্ত ক্ষেত্রকে প্রকাশিত করেন।

এইভাবে যাঁরা জ্ঞানচক্ষুর সাহায্যে ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞর প্রভেদ এবং কার্য-কারণসহ প্রকৃতির থেকে নিজেকে পৃথকভাবে জানেন বা অনুভব করেন, তিনি পরমাত্মাকে লাভ করেন।' (গীতা ১৩।৩১-৩৪)

আগের প্রকরণে জ্ঞানমার্গের কুড়িটি সাধনের কথা বর্ণনা করে বর্তমান প্রকরণে ভগবান তাঁর নিজের পঁচিশটি ঐশ্বর্য্যর কথা বলেছেন।

জ্ঞেয়ম্— ভগবান প্রকরণটি শুরু করেছেন পরমাত্মাকে 'জ্ঞেয়ম্' বলে অভিহিত করে যার তাৎপর্য জগতে যতপ্রকার বিষয়, পদার্থ, বিদ্যা বা কলা তার কোনোটিই অবশ্য জানার যোগ্য নয়। একমাত্র পরমাত্মাই অবশ্যরূপে

জানার যোগ্য। জাগতিক বিষয়ের জ্ঞানে জন্ম-মৃত্যু চক্র থেকে মুক্তি হয় না কিন্তু পরমাত্মাকে তত্ত্বত জানলে জানার আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না এবং জন্ম-মৃত্যু চক্র থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যায়। তাই এই জগতে পরমাত্মা ব্যতীত আর কিছুই পাওয়ার যোগ্য নয়।

যজ্জ্ঞাত্বাঽমৃতমশ্নুতে— এই জ্ঞেয়-তত্ত্ব অবগত হলে অমৃতত্ব অনুভব হয়। অর্থাৎ এঁর প্রাপ্তিতে আর কিছু জানা ও পাওয়ার বাকি থাকে না।

অনাদিমৎ—জগৎ-সংসার তাঁর হতে উৎপন্ন হয়, তাঁতে অবস্থান করে এবং অন্তকালে তাঁতেই লীন হয়। তিনি আদি, মধ্য ও অন্তকালে একইভাবে বিরাজ করেন তাই তিনি অনাদি।

পরম্ ব্রহ্ম— প্রকৃতিকে ব্রহ্ম বলা হয়েছে, বেদকেও ব্রহ্ম বলা হয়েছে কিন্তু পরমাত্মাই একমাত্র 'পরম ব্রহ্ম'।

ন সৎ তন্নাসদুচ্যতে— পরমাত্মাকে সৎও বলা যায় না আবার অসৎও বলা যায় না। গীতায় পরমাত্মার তিন প্রকারের বর্ণনা আছে।

(ক) পরমাত্মা সৎ ও অসৎ উভয়েই—**'সদসচ্চাহম্'** (গীতা ৯।১৯)।

(খ) পরমাত্মা সৎ, অসৎ ও সদসতেরও অতীত—**'সদসৎতৎপরং যৎ'** (গীতা ১১।৩৭)।

(গ) পরমাত্মা সৎ ও অসৎ কোনোটিই নয়—**'ন সৎ তন্নাসদুচ্যতে'** (গীতা ১৩।১২)।

—এর অর্থ হল প্রকৃতপক্ষে পরমাত্মা ব্যতীত আর কিছুই নেই। তিনি মন-বুদ্ধি-ইন্দ্রিয়াদি বাণীর অতীত তাই তাঁকে বর্ণনা করা যায় না, কিন্তু তাঁকে প্রাপ্ত করা যায়। তিনি তুলনামূলকভাবে অসৎ থেকে সৎ, বিকারের থেকে নির্বিকার, এক দেশীয়র থেকে সর্বদেশীয় হলেও সৎ, নির্বিকার আদি শব্দ তাঁকে বর্ণনা করতে পারে না, তিনি দেশ, কালের অতীত। তাই বলা হয়েছে, তাকে সৎ বা অসৎও বলা যায় না।

অহমেবাসমেবাগ্রে নান্যদ্ যৎ সদসৎ পরম্।
পশ্চাদহং যদেতচ্চ যোঽবশিষেত সোঽস্ম্যহম্॥ (ভাগবত ২।৯।৩২)

জগৎ সৃষ্টির আগেও আমি ছিলাম, আমি ছাড়া কিছু ছিল না। আবার

জগৎ উৎপন্ন হওয়ার পরে যা কিছু দেখা যায় তাও আমি। সৎ, অসৎ ও সৎ-অসতের অতীত যা কিছু কল্পনা করা সম্ভব সেসবও আমি। জগৎ ব্যতীত যা কিছু আছে, সেসবও আমি আর জগতের বিনাশ ঘটলেও যা কিছু অবশিষ্ট থাকে, তা-ও আমি।

তাঁকে বলা হয়েছে **'সর্বতঃপাণিপদাং তৎ'**—অর্থাৎ যেমন কালিতে সর্বত্র সব রকমের লেখন বিদ্যমান সেইরূপ ভক্ত যে কোনো স্থানে যা কিছু ভগবানের হাতে সমর্পণ করতে চান তার জন্য ভগবানের হাত সর্বস্থানে বিদ্যমান। ভক্ত যে কোনো স্থানেই তাঁর চরণ বন্দনা করতে চান, তিনি সেই স্থানেই উপস্থিত। ভক্ত জলে-স্থলে-অগ্নিতে যে কোনো স্থানেই বিপদে পড়ুক না কেন, ভগবানকে ডাকলে সেই স্থানেই তিনি উপস্থিত হন, রক্ষা করেন।

সর্বতোঽক্ষিশিরোমুখম্—ভক্ত যে স্থানেই দ্বীপ জ্বালে, আরতি করে ভগবানের দৃষ্টি সেই স্থানেই থাকে। আর ভক্ত যেখানেই ভক্তিভাবে নৃত্য করেন ভগবান সেই স্থানেই তার নৃত্য উপভোগ করেন। এর তাৎপর্য হল, যে ব্যক্তি ভগবানকে সর্বত্র বিরাজমান দেখে ভগবানও কখনো তাঁর দৃষ্টির থেকে আড়াল হন না।

যো মাং পশ্যতি সর্বত্র সর্বং চ ময়ি পশ্যতি।
তস্যাহং ন প্রণশ্যামি স চ মে ন প্রণশ্যতি॥ (গীতা ৬।৩০)

ভক্ত যেখানে ভগবানের মস্তকে চন্দন চর্চিত করতে চায়, পুষ্প দিতে চায় সেখানেই ভগবানের মস্তক থাকে। ভক্ত যেখানে ভোগ উৎসর্গ করতে চান, সেখানেই ভগবানের শ্রীমুখ অবস্থিত অর্থাৎ ভক্তের ভক্তিপূর্বক প্রদত্ত ভোগ ভগবান তৎক্ষণাৎ এবং সেইস্থানেই গ্রহণ করেন।

সর্বতঃ শ্রুতিমৎ—ভক্ত যখনই যে কোনো স্থান থেকে প্রার্থনা করুন ভগবান সেখানেই স্বকর্ণে তা শোনেন। ভগবান বলতে চেয়েছেন যে তাঁর সর্বদিকে হাত, পাপ, চক্ষু, কর্ণ, মুখ, মস্তক আছে—এর অর্থ হল তিনি কোনো প্রাণীর থেকেই দূরে নন, সর্বত্রই তিনি পরিপূর্ণভাবে বিরাজিত।

সংসারী ব্যক্তি যেমন বাইরে-ভেতরে, উপরে-নীচে সর্বত্র শুধু

সংসারই দেখে, সংসার ব্যতীত আর কিছু দেখতে পায় না, তেমনি পরমাত্মাকে তত্ত্বত যিনি জানেন, তিনি সর্বত্র পরমাত্মাকেই বিরাজমান দেখেন, আর পরমাত্মাও তাঁর কাছে সেইভাবেই প্রকাশমান হন।

লোকে সর্বমাবৃত তিষ্ঠতি—ত্রয়োদশ শ্লোকের অন্তিমে ভগবান বলছেন—এই যে অনন্ত সৃষ্টি, অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড, অনন্ত ঐশ্বর্য, এই যে সব দেশ, কাল, বস্তু, ব্যক্তি সমস্তই আমার অন্তর্গত। আগেও ভগবান অর্জুনকে দশম অধ্যায়ে বলেছেন—

বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ। (গীতা ১০।৪৯)

'এই সমস্ত জগৎ আমি আমার যোগশক্তির একাংশের দ্বারা ধারণ করে আছি।'

পরবর্তী কয়েকটি শ্লোকে ভগবান তাঁর ঐশ্বর্যের বৈপরীত্যের কথা বলেছেন।

সর্বেন্দ্রিয়গুণাভাসং সর্বেন্দ্রিয়বিবর্জিতম্—প্রথমে পরমাত্মা তারপরে তাঁর শক্তি প্রকৃতি। সৃষ্টির ক্রম হল—প্রকৃতির কার্য মহত্তত্ত্ব, মহত্তত্ত্বের কার্য সমষ্টি অহংকার, অহংকারের কার্য হল পঞ্চ মহাভূত, পঞ্চ মহাভূতের কার্য হল মন, বুদ্ধি ও দশ ইন্দ্রিয় এবং দশ ইন্দ্রিয়র কার্য হল স্পর্শ, গন্ধ, রস, রূপ, শব্দ আদি পাঁচটি তন্মাত্র যা আমাদের ভোগের বিষয়। পরমাত্মা-প্রকৃতি ও তার কার্যের অতীত। এমনকি পরমাত্মা অবতাররূপে এলেও তিনি প্রকৃতির অতীত হয়ে, তাকে নিজের বশে রেখেই প্রকটিত হন। তাই পরমাত্মা প্রাকৃত ইন্দ্রিয়াদি বর্জিত অর্থাৎ জাগতিক জীবের ন্যায় হাত-পা-চক্ষু-মস্তক-কান ইত্যাদি ইন্দ্রিয়যুক্ত নন আবার ইন্দ্রিয়বর্জিত বলে ওইসব বিষয়ের আস্বাদনে সক্ষম নন, এমনও নয়। তাই শ্বেতাশ্বতর (শ্বেত—বিশুদ্ধ, অশ্বতর—দ্রুতগামী ইন্দ্রিয় যাঁহার) ঋষি কর্তৃক উপদিষ্ট উপনিষদে আছে—**'অপাণিপাদো জবনো গ্রহীতা পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ'** (শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ ৩।১৯)। পরমাত্মা হস্ত-পদরহিত হলেও গ্রহণ করতে এবং সবেগে চলতে সক্ষম। তিনি বিনা নেত্রেই দর্শন করেন এবং কর্ণ বিনাই শ্রবণ করে থাকেন।

অসক্তং সর্বভৃচ্চৈব—সকল প্রাণীতে ভগবানের আপনত্ব, প্রেম থাকে, যদিও কারোর প্রতি তাঁর আসক্তি নেই। আসক্তিরহিত হয়েও তিনি ব্রহ্মা থেকে পিপড়ে পর্যন্ত সমস্ত প্রাণীরই পালন-পোষণ করে থাকেন। প্রাণীরা যেখানেই থাকুক, পৃথিবীতে বা সমুদ্রে, আকাশে বা স্বর্গে অর্থাৎ ত্রিভুবনের যেখানে হোক না কেন, তা সে অতি বৃহৎ বা ক্ষুদ্র প্রাণী হলেও ভগবান তাদের পালন ও পোষণ করেন।

একটি আখ্যান—সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ। শিবাজী (১৬৩০-১৬৮০) তখন পশ্চিম ভারতে প্রবল প্রতাপশালী রাজা। তাঁর মহানুভবতা, প্রজাদের প্রতি সমদৃষ্টি, সুশৃঙ্খল শাসনের ফলে অল্পদিনেই তিনি প্রভূত জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন। কিন্তু তাঁর গুরু সমর্থ রামদাস অতি উচ্চস্তরের মহাত্মা ছিলেন। তিনি বুঝলেন এর ফলে যেন আবার শিবাজীর মনে কোনো অহংকার বোধ না জেগে ওঠে। তিনি শিবাজীর কাছে এলেন, বললেন 'মহারাজ আপনার রাজত্বে সবাই সুখী তো, সবাইকে সমভাবে আশ্রয় দান করেন তো ?' মহারাজ বললেন—গুরুদেব আপনার কৃপায় আমার রাজত্বে আমি সবাইকে সমভাবে আশ্রয় দান করে থাকি, কেউই অনাথ নয়। গুরুদেব বললেন, সামনের ওই জঙ্গলটা কার ? মহারাজ বললেন গুরুদেব আমার রাজত্ব অনেক বিস্তৃত, জঙ্গলটাও ওর মধ্যে পড়ে। গুরুদেব শিবাজীকে নিয়ে ওই জঙ্গলে এলেন, বললেন শিবাজী ওই বড় পাথরটা তোল । গুরুর আজ্ঞায় শিবাজী ওই পাথরটি তুললেন, দেখেন তার তলায় এক বড় ব্যাঙ। গুরুদেব বললেন, শিবাজী এই ব্যাঙটির ভরণপোষণও কি তুমি কর ? দেখ জগৎ চলে ওই এক নিয়ন্তার অধীনে, তারই আশ্রয়ে সমস্ত জীব-জগৎ বেঁচে থাকে, তুমিও তাদের একজন। কখনও ভেব না কেউ তোমার আশ্রয় বা তুমি কারোর আশ্রিত। এই জগৎ-সংসার, জীব সবই ওই এক জগদীশ্বরেরই আশ্রিত।

প্রাণীমাত্রেরই সুহৃদ ভগবান অনুকূল-প্রতিকূল পরিস্থিতি ভোগ করিয়ে, পাপ-পুণ্য নাশ করে প্রাণীদের শুদ্ধ পবিত্র করে তোলেন।

নির্গুণং গুণভোক্তৃ চ—পরমাত্মা সকল গুণরহিত হয়েও সর্বগুণের

ভোক্তা। তাৎপর্য হল এই যে, মাতা-পিতা যেমন শিশুদের ক্রিয়া দেখামাত্রই প্রসন্ন হয়ে ওঠেন, তেমনি পরমাত্মাও ভক্তদের দ্বারা সম্পাদিত কর্মসকল দেখে প্রসন্ন হন অর্থাৎ ভক্তগণ তার ভোক্তা হন।

বহিরন্তশ্চ ভূতানামচরং চরমেব চ—বরফ দ্বারা নির্মিত কলসকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করলে যেমন তার বাইরেও জল, ভেতরেও জল এবং সে নিজেও জল, সেইরকম সমস্ত চর-অচর প্রাণীদের বাইরেও পরমাত্মা, অন্তরেও পরমাত্মা, আর প্রাণী নিজেও পরমাত্মাস্বরূপ। জগতেও সেইরূপ পরমাত্মা ব্যতীত অন্য কোনো তত্ত্ব নেই।

পূর্ণ জ্ঞান ও পূর্ণ ভক্তিতে সমগ্রেরই প্রাধান্য—**'বাসুদেবঃ সর্বম্'** (গীতা ৭।১৯) ও **'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম'** (ছান্দোগ্য ৩।১৪।১) অর্থাৎ ভগবানই সব, তাঁকে ছাড়া আর কিছুই নেই আর কোনো কিছুই পরমাত্মা থেকে ভিন্ন নয়। সব কিছু বর্জিতও তিনি আবার সব কিছুর সঙ্গেও তিনি।

দূরস্থং চান্তিকে চ তৎ—কোনো বস্তুর দূরত্ব বা নৈকট্য দেশকৃত, কালকৃত ও বস্তুকৃত ভাবে হয় কিন্তু তিনভাবেই ভগবান দূরে থেকেও আরো দূরে আবার কাছে থেকেও আরো কাছে। যে ব্যক্তি বস্তু সংগ্রহ ও ভোগেচ্ছু তাদের কাছে পরমাত্মা (স্বরূপত নিকটস্থ হলেও) দূরে অবস্থিত। আবার যে ব্যক্তি কেবল পরমাত্মারই অভিমুখী তার কাছে পরমাত্মা অত্যন্ত নিকটে অবস্থিত। তাই সাধককে জাগতিক ভোগ ও সংগ্রহের ইচ্ছা ত্যাগ করে শুধুমাত্র পরমাত্মা প্রাপ্তির ইচ্ছা জাগ্রত করতে হয়।

সূক্ষ্মত্বাৎ তদবিজ্ঞেয়ম্—এই পরমাত্মা অতি সূক্ষ্ম তাই ইন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণের উর্ধ্বে অর্থাৎ ইহাদের সাধনায়ত্ত নন। দ্বাদশ শ্লোকে ভগবানকে 'জ্ঞেয়' বলা হয়েছে আর এই শ্লোকে বলা হল 'অবিজ্ঞেয়'। অর্থাৎ পরমাত্মা জ্ঞেয় হলেও জগৎ-সংসারের মতন জ্ঞেয় নন। জগৎ-সংসারকে যেমন ইন্দ্রিয়-মন-বুদ্ধি দিয়ে জানা যায় পরমাত্মাকে তেমন ইন্দ্রিয়-মন-বুদ্ধি দিয়ে জানা সম্ভব নয়। প্রকৃতির কার্য হল ইন্দ্রিয়-মন-বুদ্ধি তাই তাদের দ্বারা প্রকৃতিকে কিছুটা জানা সম্ভব হলেও প্রকৃতির অতীত পরমাত্মাকে কিভাবে জানা যাবে ? পরমাত্মাকে জানতে হলে তাঁকে মানতে হবে, স্বীকার করতে

হবে, এবং ইহা কেবল স্বয়ং এর দ্বারাই সম্ভব, কারণ স্বীকৃতি হয় স্বয়ং দ্বারা, করণের (মন-বুদ্ধি-ইন্দ্রিয়াদির) দ্বারা নয়। পরমাত্মার সঙ্গে স্বয়ং-এর ঐক্য, তাই পরমাত্মা প্রাপ্তিও হয় স্বয়ং-এর স্বীকৃতি দ্বারা ; চিন্তন, মনন বা বর্ণনার দ্বারা নয়।

অবিভক্তং চ ভূতেষু বিভক্তমিব চ স্থিতম্—ত্রিভুবনে যে সমস্ত স্থাবর জঙ্গম প্রাণী আছে তাদের মধ্যে পরমাত্মা নিজে বিভাগরহিত হয়ে অবস্থান করলেও বিভক্তর মতন প্রতীয়মান হন। এই বিভাগ শুধু প্রতীতিমাত্র। পরমাত্মা বিভিন্ন প্রাণীর দেহে ভিন্ন ভিন্ন মনে হলেও স্বরূপত একই। ভগবান অষ্টাদশ অধ্যায়ে সাত্ত্বিক ভাব বর্ণনায় বলেছেন—**'অবিক্তং বিভক্তেষু তজ্জ্ঞানং বিদ্ধি সাত্ত্বিকম্'** (গীতা ১৮।২০) অর্থাৎ পরমাত্মাকে অবিভক্তরূপে দর্শন করাকেই 'সাত্ত্বিক' জ্ঞান বলা হয়।

ভূতভর্তৃ চ তজ্জ্ঞেয়ং গ্রসিষ্ণু প্রভবিষ্ণু চ—পরমাত্মা রজোগুণের প্রাধান্য স্বীকার করে ব্রহ্মারূপে সকলের সৃষ্টি করেন, সত্ত্বঃগুণের প্রাধান্য স্বীকার করে বিষ্ণুরূপে তাদের ভরণপোষণ করেন এবং তমোগুণের প্রাধান্য স্বীকার করে সকলের সংহার করে থাকেন। এর তাৎপর্য হল যে পরমাত্মাই সৃষ্টি, পালন এবং সংহার করার জন্য ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব নাম ধারণ করেন।

সৃষ্টি স্থিত্যন্তকরণাদ্ ব্রহ্মাবিষ্ণুশিবাত্মকঃ।
স সংজ্ঞাং যাতি ভগবানেক এব জনার্দনঃ॥ (পদ্মপুরাণ, সৃষ্টি ২।১১৪)

তবে পরমাত্মা সৃষ্টির কার্যের জন্য নানাপ্রকার গুণাদি স্বীকার করলেও সেইসব গুণের বশীভূত হন না। উৎপন্নকারীও পরমাত্মা এবং উৎপন্ন যিনি হন তিনিও পরমাত্মা। ভরণপোষণকারীও পরমাত্মা, যাকে ভরণপোষণ করা হয় তিনিও পরমাত্মা। সংহারকারীও পরমাত্মা আর যাঁকে সংহার করা হয় তিনিও পরমাত্মা।

জ্যোতিষামপি তজ্জ্যোতি—প্রকাশ (জ্ঞান)কে বলা হয় জ্যোতি অর্থাৎ যার দ্বারা প্রকাশিত হয়, জ্ঞান হয়, তা সমস্তই জ্যোতি। ভৌতিক পদার্থ, সূর্য, চন্দ্র, নক্ষত্র, তারা, অগ্নি, বিদ্যুৎ ইত্যাদিতে প্রকাশ দেখা যায়, ইহারা পার্থিব প্রকাশক। বর্ণাত্মক এবং ধ্বনাত্মক শব্দগুলির জ্ঞান হয় কানের সাহায্যে,

তাই শব্দর জ্যোতি হল কান। এইরূপ অন্যান্য বিষয়ের প্রকাশকও হল 'ইন্দ্রিয়াদি'। ইন্দ্রিয়সকলের জ্যোতি বা প্রকাশক হল 'মন', আর মনের প্রকাশক হল 'বুদ্ধি'। বুদ্ধির জ্যোতি বা প্রকাশক হল 'স্বয়ং'। স্বয়ং হল পরমাত্মার অংশ এবং পরমাত্মা হলেন অংশী। সুতরাং স্বয়ং-এর জ্যোতি বা প্রকাশক হলেন 'পরমাত্মা'। এই স্বয়ং প্রকাশিত পরমাত্মাকে কেউ প্রকাশ করতে পারে না। তাৎপর্য হল এই যে পরমাত্মার প্রকাশ (জ্ঞান) স্বয়ং-এ ঘটে এবং তা ক্রমে বুদ্ধি, মন, ইন্দ্রিয় এবং বিষয়ে প্রকাশ পায়। এই সব জ্যোতির জ্যোতি, প্রকাশকের প্রকাশক হলেন একমাত্র পরমাত্মা। তাঁকে কেউ প্রকাশ করতে পারে না কিন্তু তিনি চর-অচর সমস্ত জগতের সমগ্র রূপে প্রকাশক। ভাগবতের দশম স্কন্ধে রাজা পরীক্ষিৎ বলছেন—**'যস্য ভাসা সর্বমিদং বিভাতি সচরাচরম্'**। এইখানে প্রকাশক, প্রকাশ ও প্রকাশ্য—এই ত্রিত্ব (এই তিন ভিন্ন ভাব) নেই।

তমসঃ পরমুচ্যতে—এই পরমাত্মা অজ্ঞানের অতীত অর্থাৎ সর্বতোভাবে অসম্বন্ধ ও নির্লিপ্ত। আর সূর্যে যেমন কখনো অন্ধকার আসতে পারে না, তেমনি পরমাত্মায় কখনো অজ্ঞানতা আসে না। তাই তাঁকে অজ্ঞানের অতীত বলা হয়েছে।

জ্ঞানং জ্ঞেয়ং জ্ঞানগম্যং—তিনি স্বয়ং জ্ঞানস্বরূপ এবং তার থেকেই সমস্ত কিছু প্রকাশিত হয়। তাই এই পরমাত্মাকে 'জ্ঞান' বা 'জ্ঞানস্বরূপ' বলা হয়েছে। ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি ইত্যাদির সাহায্যে বিষয়ের জ্ঞান হয় কিন্তু তা অপরিহার্য নয়। প্রকৃতপক্ষে একমাত্র পরমাত্মাই জানার যোগ্য। তাই ভগবান বলেছেন—জ্ঞানের দ্বারা অসৎ ত্যাগ হলেই পরমাত্মাকে তত্ত্বত জানা সম্ভব। তাই পরমাত্মাকে বলা হয়েছে 'জ্ঞানগম্য'।

হৃদি সর্বস্য বিষ্ঠিতম্—পরমাত্মা সর্বদাই সকলের হৃদয়ে বিরাজ করেন—এর অর্থ হল যদিও পরমাত্মা সমস্ত দেশ, কাল, বস্তু, ব্যক্তি, পরিস্থিতি ইত্যাদিতে পরিপূর্ণভাবে বিরাজ করেন, তা সত্ত্বেও হৃদয়ই হল তাঁর উপলব্ধির স্থান। আর পরমাত্মাকে নিজ হৃদয়ে অনুভব করার উপায় হল অন্তরের আর্তিভাব। যেমন অত্যন্ত ক্ষুধার্ত ব্যক্তি অন্ন ছাড়া এবং পিপাসার্ত

ব্যক্তি জল ছাড়া থাকতে পারে না, তেমনি ভক্তরও ভগবান ব্যতিরেকে সবকিছু অসহ্য হয়ে ওঠে ! পরমাত্মা ছাড়া আর কোথাও মন টেকে না। এইভাবে পরমাত্মাকে লাভ করার জন্য ব্যাকুল হলে তখঁন নিজ হৃদয় মধ্যে সেই পরমাত্মা অনুভূত হন। আর একবার যদি সাধকের হৃদয়ে পরমাত্মা অনুভূত হন, তাহলে সাধকের 'সর্বত্রই পরমাত্মা বিরাজমান'—এরূপ অনুভব হয়। এটিই হল প্রকৃত অনুভূতি।

পরমাত্মাকে তত্ত্বজ্ঞান সাহায্যেই জানা যায়, ক্রিয়া, বস্তু ইত্যাদির দ্বারা নয়। মানুষ কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ, ধ্যানযোগ ইত্যাদি যে সাধনার দ্বারাই পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হোন না কেন তা আসলে তত্ত্বজ্ঞানই।

এই প্রকরণের শেষে ভগবান বলছেন **'এতদ্বিজ্ঞায় মদ্ভাবায়োপ-পদ্যতে'** অর্থাৎ ক্ষেত্রকে ঠিকমতো জানলে ক্ষেত্র থেকে সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হয় আর জ্ঞানকে মানে সাধন-সমুদায় ঠিকমতো জানলে দেহাভিমান (অহং-কর্তৃত্ববোধ) দূর হয়।

দ্বিতীয় প্রকরণের অন্তিম চারটি শ্লোকে ভগবান আরো পাঁচটি বিভূতির বর্ণনা করে প্রকরণটি শেষ করেছেন পরমাত্মা প্রাপ্তির কথা বলে।

অনাদিত্বান্নির্গুণত্বাৎ অয়ম্ অব্যয়ঃ—ভগবান বলছেন পুরুষ অনাদি অর্থাৎ আরম্ভরহিত এবং প্রকৃতিকেও অনাদি বলা হয়েছে তবে পুরুষ ও প্রকৃতির মধ্যে পার্থক্য কী ? তার উত্তরে ভগবান বলছেন 'নির্গুণত্বাৎ' অর্থাৎ পুরুষ গুণাদিরহিত। এই পুরুষ সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক এই তিনটি গুণ এবং এর বিকার হতে সর্বতোভাবে মুক্ত এবং সাক্ষাৎ অবিনাশী পরমাত্মস্বরূপ।

শরীরস্থোঽপি ন করোতি ন লিপ্যতে—এই পুরুষ শরীরে অবস্থান করলেও তিনি কিছু করেন না বা কোনো কর্মে লিপ্ত হন না। এখানে 'শরীরস্থোঽপি' কথাটির তাৎপর্য হল এই যে যখন পুরুষ নিজেকে শরীরে অবস্থিত মনে করে, নিজেকে কার্যগুলির কর্তা, এবং সুখ-দুঃখের ভোক্তা বলে মনে করে, তখনও তিনি তটস্থ এবং প্রকাশক মাত্রই থাকেন। 'অপি' কথাটি যুক্ত হয়েছে এইজন্য যে অনাদিকাল থেকে নিজেকে শরীরে অবস্থিত

বলে মনে করা প্রতিটি প্রাণী (পিঁপড়ে থেকে ব্রহ্মা পর্যন্ত) স্বরূপত সর্বদাই নির্লিপ্ত এবং অসঙ্গ। ভগবান একুশতম শ্লোকে বলেছেন প্রকৃতিতে অবস্থানকারী পুরুষই ভোক্তা হয় **'পুরুষঃ প্রকৃতিস্থো হি ভুঙ্‌ক্তে'** (গীতা ১৩।২১) আর একত্রিশ শ্লোকে বলছেন পুরুষ গুণরহিত হওয়ায়, শরীরে অবস্থান করেও কোনো কিছু করেন না বা কোনো কিছুতে লিপ্ত হন না **'ন করোতি ন লিপ্যতে'**। প্রকৃতপক্ষে প্রকৃতি ও তার কার্য শরীর উভয়েই এক। পুরুষ কোনো একটি শরীরের সঙ্গে সম্পর্কিত হলেই সমগ্র প্রকৃতির সঙ্গে এবং তার ফলে অন্য শরীরাদির সঙ্গেও সম্বন্ধযুক্ত হয়। বাস্তবে পুরুষের সঙ্গে সম্বন্ধ ব্যষ্টি শরীরের সঙ্গেও থাকে না বা সমষ্টি প্রকৃতির সঙ্গেও থাকে না। কিন্তু পুরুষ কোনো শরীরের সঙ্গে নিজ সম্পর্ক মানলেই সে নিজেকে কর্তা বা ভোক্তা মনে করে **'কর্তাহমিতি মন্যতে'** (গীতা ৩।২৭)। আসলে সে কর্তাও নয়, ভোক্তাও নয়। প্রয়োজন হল কর্তৃত্ব ও ভোক্তৃত্বকে দূর করা নয়, এগুলিকে নিজের মধ্যে স্বীকার না করা।

পরবর্তী শ্লোকে ভগবান আত্মার অসঙ্গতা প্রসঙ্গে আকাশ তত্ত্ব ও সূর্যর উদাহরণ দিয়ে বলছেন—**'সর্বগতং সৌক্ষ্ম্যাদাকাশং নোপলিপ্যতে'** অর্থাৎ যেমন পঞ্চমহাভূতের মধ্যে আকাশের কার্য হল বায়ু, তেজ, জল ও পৃথিবী এবং এই চারটি ভূতেই আকাশ পরিব্যপ্ত থাকে না, সেইরকম সর্বত্র, সর্বদেহে অবস্থানকারী আত্মাও কোনো শরীরে লিপ্ত হন না, তিনি সর্বদাই নির্লিপ্ত থাকেন। চিন্ময় সত্তা একটিই, কিন্তু অহংবশত তা পৃথক পৃথক রূপে প্রতিভাত হয়। যদি অহংকে আশ্রয় না করা হয় তবে একটি মাত্র সত্তাই সর্ব জীবজগতে ব্যাপ্ত থাকে। এই সত্তার অস্তিত্ব ব্যতীত সবই কল্পনা। এটিই যোগীদের যোগ, জ্ঞানীদের জ্ঞান এবং ভক্তদের ভগবান। কিন্তু অহং-এর জন্যই চিন্ময় সত্তাতে পরিচ্ছিন্নতা (একদেশীয়তা) বা বিভক্ত ভাব দৃষ্ট হয়। আর সুখলিপ্সার ওপরেই এই অহং নির্ভরশীল। সাধারণ অবস্থাতেও সাধক সুখভোগে আকৃষ্ট হন—**'সুখসঙ্গেন বধ্নাতি'** (গীতা ১৪।৬)। গুণাতীত না হওয়া পর্যন্ত এই সুখলিপ্সা বজায় থাকে। অতএব সাধকদের এই বিষয়ে খুব সতর্ক থাকা উচিত এবং সাবধানে এই

'সুখলিপ্সা' থেকে নিজেকে রক্ষা করা উচিত।

ভগবান এবারে জানাচ্ছেন—**'যথা প্রকাশয়ত্যেকঃ কৃৎস্নং লোকমিমং রবিঃ'** অর্থাৎ আমাদের দৃষ্টিগ্রাহ্য সমগ্র জগৎ-সংসারকে একমাত্র সূর্যই প্রকাশ করে তাই জগতের সমস্ত ক্রিয়াই সূর্যের প্রকাশের অন্তর্গত। কিন্তু সূর্যের 'আমিই সবকিছুর প্রকাশক'—এই কর্তৃত্বভাব নেই। সূর্যের আলোতেই ব্রাহ্মণ বেদপাঠ করে আবার শিকারী পশুবধ করে, কিন্তু সূর্যের প্রকাশ কখনোই বেদপাঠ বা পশুবধের ক্রিয়াগুলির কারণ হয় না। সেইরকম একই ক্ষেত্রজ্ঞ বা আত্মা সকল ক্ষেত্রকে প্রকাশিত করেন। সূর্য কেবলমাত্র স্থূল জগতকে প্রকাশ করে কিন্তু ক্ষেত্রী শুধুমাত্র স্থূল শরীর নয় সূক্ষ্ম এবং কারণ-শরীরও প্রকাশ করে। কিন্তু সমস্ত জগৎকে প্রকাশিত করলেও সূর্যের অহং-অভিমানবোধ থাকে না তেমনি সমস্ত ক্ষেত্রগুলিকে প্রকাশিত করেও ক্ষেত্রীর মধ্যে কোনো অহংবোধ বা কর্তৃত্ব আসে না। ক্ষেত্রী সর্বদা একইভাবে নির্লিপ্ত এবং অসঙ্গ থাকেন।

কোনো কিছু করার জন্যই শরীরের প্রয়োজন হয়। স্থূল কাজ করার জন্য স্থূল শরীরের প্রয়োজন। চিন্তা করার জন্য প্রয়োজন সূক্ষ্ম শরীরের এবং সমাধিতে প্রয়োজন হয় কারণ শরীরের। শরীর এবং তার দ্বারা যে কাজ হয় তা শুধু জগৎ-সংসারের কাজেই লাগে। কিন্তু আমাদের স্বরূপ চিন্ময় সত্তা, সুতরাং তার জন্য শরীর বা তার দ্বারা সংঘটিত কোনো ক্রিয়ার প্রয়োজনই নেই। আসলে চিন্ময় সত্ত্বা ব্যতীত অন্য কিছুরই সত্ত্বা নেই। এই সত্ত্বা সদাই পূর্ণ, তাই তার নিজের জন্য কিছুর প্রয়োজন থাকে না, তার কোনো ক্রিয়ার সঙ্গে সম্বন্ধ (কর্তৃত্ব) থাকে না, অপ্রাপ্ত বস্তুর সঙ্গে কোনো সম্পর্ক (কামনা) থাকে না, এবং প্রাপ্ত বস্তুর সঙ্গে কোনো সম্পর্ক (মমত্ববোধ) থাকে না এবং প্রকৃতির সঙ্গেও কোনো একাত্মবোধও থাকে না। বিবেক-বিচার থেকেই জ্ঞানমার্গের আরম্ভ আর প্রকৃত বোধেই তার সমাপ্তি। বাস্তবিক বিবেক-বোধ হলে প্রকৃতি থেকে সর্বতোভাবে সম্বন্ধ-বিচ্ছেদ হয়ে স্বতঃসিদ্ধ পরমাত্মপ্রাপ্তি হয়। ত্রয়োদশ অধ্যায়ের অন্তিম শ্লোকে ভগবান 'জ্ঞানচক্ষু' বা বিবেক জাগ্রত হওয়ার কথা বলেছেন—**'ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োরেবমন্তরং জ্ঞানচক্ষুসা'**—যা লাভ

করলে সেই পরমাত্মাকে জানা যায়। এখানে সৎ-অসৎ, নিত্য-অনিত্য, ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞর প্রভেদ জানা বা অনুভব করাই হল জ্ঞানচক্ষু। বাস্তবিক বিবেকবোধ জাগ্রত হলে ভূত এবং প্রকৃতির থেকে অর্থাৎ প্রকৃতির প্রতিটি কার্য থেকেও সম্বন্ধ সর্বতোভাবে ছিন্ন হয়ে যায়। আর প্রকৃতির থেকে নিজের এই পৃথকত্ব অনুভব করলেই পরমাত্মা লাভ হয়। কিন্তু ক্ষেত্রজ্ঞ, যখন ক্ষেত্রর প্রতি আকর্ষিত হয়ে তার সঙ্গে ঐক্য মেনে নেয় তখন পরমাত্মার প্রতি বিমুখ হয়ে পড়ে। ভগবান তাই **'ক্ষেত্রজ্ঞং চাপি মাং বিদ্ধি'** (গীতা ১৩।২) পদ দ্বারা ক্ষেত্রজ্ঞর সঙ্গে পরমাত্মার ঐক্যর কথা বলেছেন। অন্ধকার দূর করার জন্য আলো আনতে হয়, কিন্তু পরমাত্মাকে কোথাও থেকে নিয়ে আসতে হয় না। তিনি সর্ব দেশ, কাল, বস্তু, ব্যক্তি, পরিস্থিতি ইত্যাদিতে পরিপূর্ণ। তাই সংসার হতে সম্বন্ধ বিচ্ছেদ হলে তাঁর অনুভব আপনাতেই হয়ে থাকে। ভগবান ত্রয়োদশ অধ্যায়ে প্রথমে বলেছেন —**'এতদ্বিজ্ঞায় মদ্ভাবায়োপপদ্যতে'** (গীতা ১৩।১৮) অর্থাৎ সদ্‌গুণ দ্বারা তাঁকে প্রাপ্তির কথা আর এখানে বলেছেন **'যে বিদুর্যান্তি তে পরম্'** (গীতা ১৩।৩৪) অর্থাৎ নির্গুণ দ্বারা তাঁকে প্রাপ্তির কথা। প্রকৃতপক্ষে 'মদ্ভাব' এবং 'পরম প্রাপ্তি' দুটিই এক।

পরমাত্মা-লাভের সাধন—(শ্লোক ২৪-২৫, ২৭-৩০)

আগের প্রকরণে পরমাত্মতত্ত্ব বিস্তৃতভাবে বলা হয়েছে আর বলা হয়েছে যে এই তত্ত্ব জানতে হলে পুরুষের (ক্ষেত্রজ্ঞর, জীবাত্মার) প্রকৃতির সঙ্গে মেনে নেওয়া সম্পর্ক ত্যাগ করে পরমাত্মার সঙ্গে স্থিত সম্পর্ক অনুভব করতে হবে। এই প্রকরণে চব্বিশ ও পঁচিশ শ্লোকে সাধনোপযোগী চারটি প্রকৃষ্ট পথের কথা বলা হয়েছে এবং সাতাশ-আটাশ শ্লোকে বিশেষরূপে পরমাত্মার সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের কথা বলা হয়েছে। ভগবান পরবর্তী দুই শ্লোকে অর্থাৎ উনত্রিশ ও ত্রিশ শ্লোকে প্রকৃতির সম্পর্ক ছেদনের কথা বলেছেন। প্রকৃতির দুইটি রূপ—ক্রিয়া ও পদার্থ। উনত্রিশতম শ্লোকে ক্রিয়া থেকে সম্বন্ধ ছেদ ও ত্রিশতম শ্লোকে পদার্থের থেকে সম্বন্ধ ছেদের কথা বলা হয়েছে।

ধ্যানেনাত্মনি পশ্যন্তি কেচিদাত্মানমাত্মনা।
অন্যে সাংখ্যেন যোগেন কর্মযোগেন চাপরে॥
অন্যে ত্বেবমজানন্তঃ শ্রুত্বান্যেভ্য উপাসতে।
তেঽপি চাতিতরন্ত্যেব মৃত্যুং শ্রুতিপরায়ণাঃ॥

(গীতা ১৩।২৪-২৫)

সমং সর্বেষু ভূতেষু তিষ্ঠন্তং পরমেশ্বরম্।
বিনশ্যৎস্ববিনশ্যন্তং যঃ পশ্যতি স পশ্যতি॥
সমং পশ্যন্ হি সর্বত্র সমবস্থিতমীশ্বরম্।
ন হিনস্ত্যাত্মনাত্মানং ততো যাতি পরাং গতিম্॥
প্রকৃত্যৈব চ কর্মাণি ক্রিয়মাণানি সর্বশঃ।
যঃ পশ্যতি তথাত্মানমকর্তারং স পশ্যতি॥
যদা ভূতপৃথগ্ভাবমেকস্থমনুপশ্যতি।
তত এব চ বিস্তারং ব্রহ্ম সম্পদ্যতে তদা॥

(গীতা ১৩।২৭-৩০)

'কোনো সাধক ধ্যানযোগের দ্বারা, কেহ সাংখ্যযোগের দ্বারা আবার কেহ বা কর্মযোগের দ্বারা পরমাত্মতত্ত্ব আপনাতেই অনুভব করেন।

অন্য কোনো কোনো সাধক যাঁরা এইরূপ যোগাদি সাধন জানে না, তাঁরা যদি জীবন্মুক্ত মহাপুরুষদের থেকে শুনে উপাসনা করেন, তাহলেও এই শ্রবণপরায়ণ সাধকগণ মৃত্যুকে অতিক্রম করেন। (গীতা ১৩।২৪-২৫)

যিনি বিনাশশীল সমস্ত প্রাণীতে পরমাত্মাকে অবিনাশীরূপে এবং সমভাবে অবস্থানরত দেখেন, তিনিই যথার্থদর্শী।

ঈশ্বরকে যেহেতু তিনি সর্বত্র সমান ও সমভাবে অবস্থিত দেখেন, তিনি নিজেকে হনন (হিংসা) করেন না, তাই তিনি পরমগতি প্রাপ্ত হন।

যিনি সমস্ত কর্মই প্রকৃতি দ্বারা সংঘটিত দেখেন এবং নিজেকে অকর্তা অনুভব করেন তিনিই যথার্থ দ্রষ্টা।

যখন সাধক প্রাণীসমূহর পৃথক পৃথক ভাবগুলি একমাত্র প্রকৃতিতে অবস্থিত দেখেন এবং সেই প্রকৃতি থেকেই বিস্তার অনুভব করেন তখন তিনি

ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন।' (গীতা ১৩।২৬-৩০)

প্রথম দুটি শ্লোকে ভগবান চারটি সাধনের কথা বলেছেন যা গীতায় আগেই বলা হয়েছে।

(১) **ধ্যানেনাত্মনি পশ্যন্তি**—ভগবান বলেছেন, প্রকৃতি ও পুরুষকে পৃথকভাবে জানলে প্রকৃতির সঙ্গে ঐক্য যেভাবে ছিন্ন হয়ে পরমাত্মার সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপিত হয়, তা ধ্যানের দ্বারাও হয়। চিত্তে মূঢ়তা থাকলে ধ্যান হয় না আবার ক্ষিপ্ততা থাকলেও ধ্যান হয় না। চিত্তের বিক্ষিপ্ত বৃত্তিতে ধ্যান আরম্ভ হয়। ক্রমে চিত্ত স্বরূপে একাগ্র হয় এবং পরে তা নিরুদ্ধ হয়, তখন সমাধি হয়। এই অবস্থায় চিত্তবৃত্তি সংসার, শরীর, অন্যান্য বৃত্তি, চিন্তা ইত্যাদি থেকেও উপরত হয়। সেইসময় ধ্যানযোগী আপনাতে আপনি, নিজের মধ্যে নিজেকে অনুভব করে সন্তোষ লাভ করেন। **'যত্র চৈবাত্মনাত্মানাং পশ্যন্নাত্মনি তুষ্যতি'** (গীতা ৬।২০)।

অর্থাৎ এই অবস্থায় পরমাত্মায় ধ্যান নিরত যোগী শুদ্ধচিত্ত সূক্ষ্ম বুদ্ধির সাহায্যে পরমাত্মাকে সাক্ষাৎ করে পরমাত্মাতেই সন্তুষ্ট হয়। ধ্যানযোগ সম্বন্ধে পূর্বেও পঞ্চম অধ্যায়ের সাতাশ-আঠাশতম শ্লোকে এবং ষষ্ঠ অধ্যায়ের দশম থেকে আঠাশতম শ্লোকে বলা হয়েছে।

(২) **অন্যে সাংখ্যেন যোগেন**—বিবেক হল বিপরীতধর্মী দুই বস্তুর জ্ঞান। বিবেকের সাহায্যে অ-সৎ থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করে সৎ-তত্ত্ব অর্থাৎ পরমাত্মায় যুক্ত হওয়ার সাধনাকে বলে সাংখ্যযোগ। এই বিবেকবোধ জাগ্রত হলে সৎ-অসৎ নিরূপণ করা যায়। যেমন 'সৎ' হল নিত্য, সর্বব্যাপী, অচল, অব্যক্ত ও অচিন্ত্য এবং 'অসৎ' হল অনিত্য, একদেশীয়, চলমান, বিকারশীল ও পরিবর্তনশীল। এইরূপ বিচার-বিবেচনার সাহায্যে সাংখ্যযোগী প্রকৃতি এবং তার কার্যাদি থেকে সম্পূর্ণভাবে নিঃস্পৃহ হয়ে থাকেন এবং আপনাতে আপনি পরমাত্মতত্ত্ব অনুভব করেন। দ্বিতীয় অধ্যায়ের একাদশ থেকে ত্রিশতম শ্লোক, চতুর্থ অধ্যায়ের তেত্রিশ থেকে উনচল্লিশতম শ্লোক, পঞ্চম অধ্যায়ের অষ্টম, নবম ও ত্রয়োদশ থেকে ছাব্বিশতম শ্লোক এবং দ্বাদশ অধ্যায়ের চতুর্থ-পঞ্চম শ্লোকে সাংখ্যযোগের

বিস্তৃত বর্ণনা আছে।

(৩) **কর্মযোগেন চাপরে**—প্রকৃতি ও পুরুষকে পৃথক পৃথক বলে জানলে যেমন প্রকৃতির সঙ্গে সম্বন্ধ ছিন্ন হয়, সেইরকম সম্পর্ক ছিন্ন কর্মযোগের দ্বারাও হয়। কর্মযোগী যে কাজই করেন না কেন, তা সংসারের হিতার্থেই করে থাকেন। তিনি যজ্ঞ, দান, তপস্যা, তীর্থ, ব্রত ইত্যাদি যা কিছুই করেন, তা সবই প্রাণীদের কল্যাণার্থে করেন, নিজের জন্য নয়। এইভাবে কর্ম করায় ওই সব ক্রিয়া, পদার্থ, শরীর ইত্যাদির সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিন্ন হয় এবং আপনাতে আপনিই পরমাত্মতত্ত্ব অনুভূত হয়। দ্বিতীয় অধ্যায়ের সাতচল্লিশ থেকে তিপ্পান্ন, তৃতীয় অধ্যায়ের সপ্তম থেকে ঊনবিংশতি, চতুর্থ অধ্যায়ের ষোড়শ থেকে বত্রিশতম এবং পঞ্চম অধ্যায়ের ষষ্ঠ-সপ্তম শ্লোকে কর্মযোগের সাধনার কথা বলা হয়েছে।

(৪) **শ্রুতিপরায়ণঃ**—কিছু সাধক আছেন যাঁরা আগ্রহসম্পন্ন, কিন্তু তাঁদের পক্ষে ধ্যানযোগ, সাংখ্যযোগ, কর্মযোগ অনুধাবন করা সুসাধ্য নয়। এই সব সাধনেচ্ছু ব্যক্তি শুধুমাত্র তত্ত্বজ্ঞ জীবন্মুক্ত মহাপুরুষদের নির্দেশ শুনে এবং তা পালন করে মৃত্যুকে অতিক্রম করতে পারে। শরীরের সঙ্গে সম্পর্ক রাখলেই জন্ম-মৃত্যুর অধীন হতে হয়। কিন্তু যাঁরা মহাপুরুষদের নির্দেশের প্রতি শ্রদ্ধাপরায়ণ হন, তাঁদের শরীরের সঙ্গে মেনে নেওয়া সম্পর্ক শীঘ্রই দূর হয়।

এরূপ শ্রবণপরায়ণ সাধক তিন প্রকারের হয়—

(ক) সাধকের যদি জাগতিক সুখভোগের আকাঙ্ক্ষা না থাকে, শুধুমাত্র তত্ত্বপ্রাপ্তির অভিলাষ থাকে এবং তিনি যদি তত্ত্বজ্ঞ মহাপুরুষের সংস্পর্শে আসতে পারেন এবং তাঁর নির্দেশ পালন করেন তবে তিনি শীঘ্রই পরমাত্মাকে লাভ করেন।

(খ) আবার যাঁর নির্দেশে সাধক চলেন তিনি যদি তত্ত্বজ্ঞ মহাপুরুষ না হন, তাহলেও সাধকের যদি বিন্দুমাত্র জাগতিক আকাঙ্ক্ষা না থাকে এবং তাঁর একমাত্র উদ্দেশ্য পরমাত্মা প্রাপ্তি হয় তাহলেও ভগবদ্‌কৃপায় তাঁর ভগবদ্‌প্রাপ্তি হয়।

(গ) আর সাধকের যদি কিছু সুখভোগের আকাঙ্ক্ষা বাকি থাকে কিন্তু তত্ত্বজ্ঞ মহাপুরুষের নির্দেশে চলেন, তাহলে ক্রমে তার সুখভোগ ইচ্ছা নাশ হয় এবং পরমাত্মা প্রাপ্তি হয়। যে সব সাধকের শাস্ত্র বোঝার ক্ষমতা নেই, বিবেক ততটা জাগ্রত নয়, কিন্তু জন্ম-মৃত্যু চক্র অতিক্রম করার প্রবল আগ্রহ আছে, তারাও যদি জীবন্মুক্ত তত্ত্বজ্ঞ মহাপুরুষদের কথা শুনে চলেন তবে তারাও মৃত্যু-সাগর অতিক্রান্ত করেন।

ছান্দোগ্য উপনিষদের একটি আখ্যান—জবালার পুত্র সত্যকাম গৌতম ঋষির কাছে উপদেশ গ্রহণ করতে গিয়েছিলেন। ঋষি তাঁকে চারশত দুর্বল ও ক্ষীণকায় গাভী প্রদান করে, তাদের পালন করতে বললেন। সত্যকাম উৎসাহিত হয়ে বললেন—**'তা অভিপ্রস্থাপয়ন্নুবাচ ন অসহস্রেন আবর্তেয় ইতি'** অর্থাৎ গাভীর সংখ্যা সহস্র পূর্ণ না হওয়া অবধি আমি ফিরব না। এই বলে সত্যকাম গাভীগুলো নিয়ে বনে চলে গেলেন এবং সেগুলিকে প্রতিপালন করতে লাগলেন। বেশকিছু বছর অতিক্রান্ত হলে যখন গাভীর সংখ্যা হাজারে পৌঁছল তখন একটি বৃষ তাঁকে জানাল যে গাভীর সংখ্যা হাজারে পৌঁছেছে, এখন তাদের আচার্যের কাছে নিয়ে যাওয়া উচিত। তৎপরে সেই বৃষ তাঁকে চতুষ্কল ব্রহ্মের একপাদের উপদেশ দিল—

'তস্মৈ হোবাচ—প্রাচী দিক্‌কলা, প্রতীচী দিক্‌কলা, দক্ষিণা দিক্‌কলা, উদীচী দিক্‌কলা। এষ বৈ সোম্য চতুষ্কলঃ পাদো ব্রহ্মণঃ প্রকাশবান্নাম্‌। অর্থাৎ পূর্ব দিকে এক কলা, পশ্চিম, দক্ষিণ ও উত্তর দিক এক এক কলা। এই চারটি দিকের চারটি কলা নিয়ে ব্রহ্মের একপাদ আর এর নাম হল 'প্রকাশবান্‌'। পরের দিন সত্যকাম গাভীগুলো সহ আচার্যের আশ্রমের উদ্দেশ্যে রওনা হলেন। পথে অগ্নি ব্রহ্মের আর একপাদ উপদেশ দিলেন—**'তস্মৈ হোবাচ পৃথিবী কলা, অন্তরীক্ষং কলা, দ্যৌঃ কলা, সমুদ্রঃ কলা।'** অর্থাৎ পৃথিবী, অন্তরীক্ষ, দ্যুলোক, সমুদ্র সকলই এক এক কলা এবং এই চতুষ্কল দিয়ে ব্রহ্মের এক পাদ তার নাম হল **'অনন্তবান্‌'**।

পরের দিন এক 'হংস' তাঁকে ব্রহ্মের আর এক পাদ শোনালেন—**'তস্মৈ হোবাচ অগ্নিঃ কলা, সূর্যঃ কলা, চন্দ্র কলা, বিদ্যুত কলা।'** অর্থাৎ

অগ্নি, সূর্য, চন্দ্র, বিদ্যুৎ আদি চতুষ্কল ব্রহ্মের এক পাদ ও এটির নাম 'জ্যোতিস্মান্'। চতুর্থ দিন এক মদ্গু পাখি (পানকৌড়ি) তাঁকে ব্রহ্মের চতুর্থ পাদের উপদেশ দিলেন— **'তস্মৈ হোবাচ প্রাণঃ কলা, চক্ষুঃ কলা, শ্রোতং কলা, মনঃ কলা।'** অর্থাৎ প্রাণ, চক্ষু, শ্রোত্র এবং মন এই চতুষ্কল দিয়ে ব্রহ্মের এক এক কলা এর নাম 'আয়তনবান্'। যে এটি জেনে ব্রহ্মোপাসনা করে সে ইহলোক ও পরলোকসমূহ জয় করে।

তিন দিন পরে সহস্র গরু নিয়ে সত্যকাম ফিরে এলেন আচার্য গৌতমের আশ্রমে। আচার্য দেখলেন প্রিয় শিষ্যকে, আবেগভরা কণ্ঠে বললেন—**'ব্রহ্ম-বিদিব বৈ সৌম্য ভাসি। কো নু ত্বানুশশাসেতা।'** তুমি ব্রহ্মবিদের মতো দীপ্তি পাচ্ছ। কে তোমাকে উপদেশ দিল ? সত্যকাম বললেন, মানুষ ছাড়া অন্যরা আমায় উপদেশ দিয়েছেন। কিন্তু শুনেছি গুরুমুখী জ্ঞানই শ্রেষ্ঠ। আপনি আমাকে ব্রহ্মবিদ্যা বলুন। সত্যকামের বিনীত প্রার্থনায় দ্রবীভূত হলেন আচার্য গৌতম। তিনি সত্যকামকে সেই সব উপদেশই দিলেন যা পূর্বে বৃষ, অগ্নি, হংস ও মদ্গু দিয়েছিল। পূর্ণ হল সত্যকামের প্রার্থনা। ব্রহ্মতেজে আরো দীপ্তিময় হয়ে উঠলেন তিনি। (ছান্দোগ্য ৪-৯ খণ্ড)। এইভাবে শুধুমাত্র তত্ত্বজ্ঞ, জীবন্মুক্ত মহাপুরুষদের নির্দেশ পালন করেই সত্যকাম তত্ত্বজ্ঞান লাভ করেন।

আখ্যানটির তত্ত্বব্যাখ্যা— উপরোক্ত 'গো' শব্দটির অর্থ জ্ঞান, বিদ্যা, বুদ্ধি। গুরু সত্যকামকে চারশত গরু পালন করতে দিয়েছিলেন। বিশালত্ব ও গুণবাহুল্য 'শত' প্রয়োগ করে গুরু সত্যকামকে চারিবেদের জ্ঞান প্রদান করেন এবং ইহার চর্চা করতে বলেন। চার জ্ঞানের জ্ঞানই পূর্ণজ্ঞান নয়, ইহা পূর্ণজ্ঞানের একটি সোপান মাত্র। সুতরাং চারশত গরু চরালেই যথেষ্ট নয়। সত্যকাম প্রতিজ্ঞা করলেন গরুর সংখ্যা একহাজার না হওয়া পর্যন্ত তিনি গোচারণভূমি ত্যাগ করবেন না। এখানে সহস্র গরু মানে সহস্র ধারার জ্ঞান অর্থাৎ অনন্ত জ্ঞান যা জানলে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড স্রষ্টা পরমপুরুষের স্বরূপ উপলব্ধি করা যায় তার চর্চায় তিনি রত হলেন।

ঐ পরমপুরুষের স্বরূপ মানব জীবনও ষোল কলা বা ধারায় বিকশিত

হয়। তাই তাঁকে ষোল অরযুক্ত এক চক্র, । ষোল পাপড়িযুক্ত একটি পদ্ম বা ষোল কলাযুক্ত চন্দ্রর সঙ্গে উপমা দিয়ে ষোড়শ কলা পুরুষ বলা হয়েছে। এই ষোল কলাকে চারভাগ করে প্রত্যেক পাদে চার কলা করা হয়েছে। এইভাবে বলা হয় 'পরম পুরুষের' চারপাদ ও প্রত্যেক পাদে চার কলা। সাধনমার্গের চারস্তরে পরমপুরুষের এই চারকলাযুক্ত চারপাদ উপলব্ধি করতে হয় বা প্রাপ্ত হতে হয়। এই চারস্তরকে জাগ্রত, নিদ্রা, সুষুপ্তি ও তুরীয়ও বলা হয়। ছান্দোগ্য উপনিষদে ষোড়শকলা সামান্য পৃথকভাবে উল্লেখিত হয়েছে—

১) মন্ত্র, কর্ম, লোক, নাম—পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ দিক জ্ঞান।

২) ক্ষিতি, অপ, মরু, ব্যোম—পৃথিবী, সমুদ্র, অন্তরীক্ষ, দ্যুলোক।

৩) জ্যোতিঃ, বীর্য, তপঃ, ইন্দ্রিয়—অগ্নি, সূর্য, চন্দ্র ও বিদ্যুৎ।

৪) প্রাণ, শ্রদ্ধা, অন্ন, মন—প্রাণ, মন, চক্ষু, কর্ণ।

যোগীর কায়া সাধন ব্যাপারে এই চারটি সাধনার ক্ষেত্র হল এইরূপ—

(ক) প্রথম স্তরে (মূলাধার চক্র)—মূলাধারে অবস্থিত পদ্ম চার দলযুক্ত। ওই চারদল চার দিক জ্ঞানের অর্থাৎ চার বেদস্থানের প্রতীক। সাধকের যখন মূলাধার সাধনে দিকজ্ঞান লয় হয়, তখন তার কাল, দেশ ও অবস্থানও লোপ পায়। প্রথম স্তরে বৃষভ সত্যকামকে দিকজ্ঞানের তত্ত্ব সম্পর্কে উপদেশ প্রদান করেন।

(খ) দ্বিতীয় স্তরে (নিম্নত্রিলোকী)—ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ এবং দেহের মধ্যে মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান ও মণিপুর চক্রের সাধনা। এখানকার দেবতা ভূরাগ্নি বা মণিপুর অগ্নিবীজের ('রং') স্থান। এখানে ব্রহ্মগ্রন্থি ভেদ করতে হয়। তখন ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ-তত্ত্ব লীন হয়। দ্বিতীয় স্তরে অগ্নি সত্যকামকে পৃথিবী, সমুদ্র, অন্তরীক্ষ ও দ্যুলোক সম্বন্ধে উপদেশ দিলেন।

(গ) তৃতীয় স্তরে (মধ্যত্রিলোকী)—স্বঃ, মহঃ, জনঃ এবং দেহের মধ্যে মণিপুর, অনাহত ও বিশুদ্ধ চক্রর স্থান। এখানকার দেবতা অন্তরীক্ষস্থ বৈশ্বানর অগ্নি, তথা প্রাণবায়ুর মধ্যে নিহিত অগ্নি শক্তি। ইহা অনাহত বায়ুবীজের (যং) স্থান ; এখানে বিষ্ণুগ্রন্থি ভেদ করতে হয়। এখানে অনাহত (বাধাহীন) প্রাণবায়ুর শ্বাস-প্রশ্বাস 'হং-সঃ' ক্রিয়া সাধিত হয়। এই ক্ষেত্রের

সাধনায় 'হং-সঃ'-এর সাধনাই প্রধান। তাই হংস সত্যকামকে অগ্নি, সূর্য, চন্দ্র ও বিদ্যুৎ তত্ত্ব সম্পর্কে উপদেশ প্রদান করেন।

(ঘ) চতুর্থ স্তর (উর্ধ্ব ত্রিলোকী)—জনঃ, তপঃ, সত্য এবং দেহের মধ্যেই বিশুদ্ধ, আজ্ঞা ও সহস্রারের সাধনা। এখানকার দেবতা দৌরগ্নি বা বিদ্যুৎ। এখানে আজ্ঞাচক্র বা রুদ্রগ্রন্থি ভেদ করতে হয়। আজ্ঞাচক্র বিন্দু মণিস্থান, ত্রিবেণীক্ষেত্র। আজ্ঞচক্র ভেদ করার ব্যাপারে গুরুও শিষ্যকে সাহায্য করতে পারে না। এখানে গুরু-শিষ্যর ভেদাভেদ নাই, কেবল গুরু আজ্ঞা বা শুভেচ্ছাই একমাত্র সহায়ক। সেই জন্য ইহার নাম আজ্ঞাচক্র। তাহলে এখানে সাধকের কর্তব্য কি ? সাধক রামপ্রসাদের একটি গান আছে—**'ডুব দে রে মন কালী বলে'** সাধক তখন একান্তী সাধনায় মগ্ন হন। পানকৌড়ি পক্ষীর আর এক নাম 'মদ্‌গু' যে সত্যকামকে ব্রহ্মের চতুর্থ পাদের উপদেশ দিয়েছেন। পানকৌড়ির স্বভাব হল জলের ওপর ভাসতে ভাসতে যখন কোনো স্থানে এসে টের পায় যে ঐ স্থানে নীচে কোনো একধারায় মৎস্যের গতি হচ্ছে তখনই সে ডুব মারে। সাধককেও এইভাবে সাধনের পথে উপযুক্ত সময় পানকৌড়ী বা মদ্‌গু বৃত্তি গ্রহণ করতে হয়। দাও ডুব, ঠিক ধারা বেয়ে সহস্র-ধারস্থ অলক-পুরে পৌঁছে যাবে। মদ্‌গু পক্ষী সত্যকামকে চক্ষু, কর্ণ, মন ও প্রাণের তত্ত্ব সম্পর্কে উপদেশ প্রদান করেছেন।

এই প্রকরণের দ্বিতীয় অংশের প্রথম দুটি শ্লোকে ভগবান জন্ম-মৃত্যুর থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য পরমাত্মার সঙ্গে একত্বের কথা বলেছেন। ভগবান বলছেন—**'সমং সর্বেষু ভূতেষু তিষ্ঠন্তং পরমেশ্বরম্'** অর্থাৎ ভগবান ছোট বা বড়, স্থাবর-জঙ্গম, সাত্ত্বিক-রাজসিক-তামসিক সবার মধ্যেই সমভাবে থাকেন। কোনো প্রাণীতেই ছোট বা বড় নয়, কম বা বেশি নয়। যদিও সকল প্রাণীই সৃষ্টি-স্থিতি-লয় এই তিন অবস্থাতেই পরিভ্রমণ করে, উচ্চ-নীচ যোনিতে গমন করে কিন্তু পরমাত্মা নিত্য-নিরন্তর ওই সব অস্থির প্রাণীতে একইভাবে বিরাজ করেন। ভগবান তাই বলছেন—**'বিনশ্যৎস্ববিনশ্যন্তং যঃ পশ্যতি স পশ্যতি'** অর্থাৎ যিনি পরিবর্তনশীল শরীরের সঙ্গে নিজেকে

সংযুক্ত দেখেন, তাঁর দেখা ঠিক নয়। কিন্তু যিনি সর্বদা একভাবে স্থিত এই পরমাত্মার সঙ্গে নিজেকে অভিন্নরূপে দেখেন, তিনিই প্রকৃত দ্রষ্টা।

ভগবান এখানে বলছেন **'যঃ পশ্যতি স পশ্যতি'** অর্থাৎ আত্মাকে পরমাত্মার সঙ্গে যিনি অভিন্ন দেখেন তিনি যথার্থদর্শী আর অষ্টাদশ অধ্যায়ে বলেছেন **'ন স পশ্যতি দুর্মতিঃ'** (গীতা ১৮।১৬) অর্থাৎ আত্মাকে যে শরীরজাত সমস্ত কর্মের কর্তা দেখে সে সঠিক দেখে না, অর্থাৎ সে দুর্মতি। যেমন আকাশ কখনো সূর্যালোকে ভরে যায়, কখনো বা অন্ধকারে ছেয়ে যায়, কখনো তাতে বিদ্যুৎ চমকায়, কখনো বর্ষণ হয় কিন্তু তাতে আকাশের কোনো তারতম্য হয় না, আকাশ নির্বিকার ও নির্লিপ্ত থাকে। তেমনি সর্বত্র পরিব্যাপ্ত সত্ত্বায় কখনো জন্ম-মৃত্যু, কখনো মহাসর্গ-মহাপ্রলয় হয়, কিন্তু সত্ত্বায় কোনো প্রভাব পড়ে না তা নির্লিপ্ত, নির্বিকার থাকে। প্রাণী বদ্ধই হোক বা মুক্তই হোক, পাপী হোক বা পুণ্যাত্মা হোক সেই নির্বিকার সত্তা পুরুষ (জীবাত্মা) সবেতেই সমভাবে অবস্থিত।

যেমন গঙ্গা নিরন্তর বহমান হলেও যার ওপর দিয়ে গঙ্গা বহমান সেই আধারশিলা স্থির থাকে। গঙ্গার জল কখনো স্বচ্ছ, কখনো ঘোলা, কখনো ক্ষীণকায়, কখনো বন্যার ফলে স্ফীত, কখনো বেগের জন্য শব্দময় কখনো আবার শান্ত নিস্তব্ধ থাকে কিন্তু আধারশিলা একইভাবে থাকে, তার তারতম্য হয় না। জলে কখনো মাছ, সাপ ভাসে, কখনো ফুল, কখনো নোংরা আসে, কখনো শব ভেসে যায় কখনো জীবিত ব্যক্তি সাঁতার কাটে কিন্তু শিলাগাত্র অচল, নির্বিকারভাবে থাকে। সেইরকম সমস্ত দেশ, কাল, বস্তু, ক্রিয়া, ঘটনাদি নিরন্তর ঘটে চলেছে কিন্তু স্ব-স্বরূপ (চিন্ময় সত্তা) সর্বদা অবিচল থাকেন। কিন্তু যিনি শরীরের সঙ্গে তাদাত্ম্য করে শারীরিক বৃদ্ধিতে নিজের বৃদ্ধি, শারীরিক কৃশতাতে নিজের কৃশতা, শারীরিক রোগকে নিজের রোগ, শরীরের মৃত্যুকে নিজের মৃত্যু বলে মনে করেন তিনি **'হিনস্ত্যাত্ম-নাত্মানাং'** মানে আপনাকে আপনি হত্যা করেন অর্থাৎ জন্ম-মৃত্যু চক্রে যুক্ত হন। কিন্তু যাঁর দৃষ্টি শরীরের দিকে না গিয়ে শুধুমাত্র সর্বব্যাপী পরমাত্মার দিকে যায় তিনি নিজেকে হনন করেন না অর্থাৎ জগৎ ও শরীরের কোনো

বিকারে প্রভাবিত হন না তাই তিনি জন্ম-মৃত্যু চক্রে পতিত হন না।

ভগবান বলছেন **'ততো যাতি পরাং গতিম্'** অর্থাৎ যখন জীবাত্মা শরীরের সঙ্গে অভিন্নতা অনুভব না করে পরমাত্মার সঙ্গে অভিন্নতা অনুভব করে তখন সে 'পরমগতি' অর্থাৎ নিত্যপ্রাপ্ত পরমাত্মাকে লাভ করে।

পরমাত্মাকে অনুভব না করে জগৎ-এর সঙ্গে জড়িয়ে পড়া, মনুষ্যত্ব নয়, ইহা হল পশুত্ব। ভাগবতের দ্বাদশ স্কন্ধের পঞ্চম অধ্যায়েই শুকোক্ত ভাগবতের পরিসমাপ্তি এবং পরীক্ষিতের ব্রহ্মশাপজনিত তক্ষক দংশনের সময়ও সন্নিহিত, তাই শুকদেব শেষ উপদেশ দিচ্ছেন—

ত্বং নু রাজন্ মরিষ্যেতি পশুবুদ্ধিমিমাং জহি।
ন জাতঃ প্রাগভূতোঽদ্য দেহবৎ ত্বং ন নঙ্ক্ষ্যসি।। (ভাগবত ১২।৫।২)

'হে রাজন্! 'আমি মরে যাব'—ইহা পশুবুদ্ধি, এই অবিবেক বুদ্ধি তুমি পরিত্যাগ কর। তোমার এই দেহ পূর্বে ছিল না, পরে জন্মলাভ করেছে এবং ভবিষ্যতে বিনষ্ট হবে সেরূপ কিন্তু তুমি পূর্বে ছিলে না, পরে জন্মগ্রহণ করেছ এবং ভবিষ্যতে মরে যাবে—তা ঠিক নয়।'

অন্তিমকালের ভাব জীবের অনুগত হয়। পরীক্ষিত যদি সর্পবিষয়ে ভীতিবিহ্বল হয়ে তনুত্যাগ করেন তবে তা তাঁর পরমধাম প্রাপ্তির পথে বিঘ্ন হতে পারে। তাই শ্রীশুকদেব বলছেন—

অহং ব্রহ্ম পরমং ধাম ব্রহ্মাহং পরমং পদম্।
এবং সমীক্ষ্য চাত্মানমাত্মন্যাধায় নিষ্কলে।।
দশন্তং তক্ষকং পাদে লেলিহানং বিষাননৈঃ।
ন দ্রক্ষ্যসি শরীরঞ্চ বিশ্বঞ্চ পৃথগাত্মনঃ।।

(ভাগবত ১২।৫।১১-১২)

'হে পরীক্ষিৎ ! আমি পরমধাম ব্রহ্ম, আমি পরমপদ ব্রহ্ম এইরূপ নিশ্চিত করে নির্লিপ্ত, নির্বিকার আত্মায় আত্মপ্রতিষ্ঠা কর, আর যদি দেহ-দেহীর এই ভাব অনুভূত হয় তবে তক্ষক ও তার বিষজ্বালাও তোমার অনুভূত হবে না। এমনকি তখন আত্মা হতেও শরীর ও জগৎও পৃথক দর্শন হবে না।

তখন সর্বত্র **'বাসুদেবম্ ইদং সর্বং'** অনুভূত হবে।' শ্রীশুকদেব মহারাজ পরীক্ষিতকে ভক্তিরাজ্যে প্রবেশ করিয়ে দিয়ে বললেন—**'বাসুদেবানুচিন্তয়া'** (ভাগবত ১২।৫।৯) অর্থাৎ সকল সময় বাসুদেবকে চিন্তা করবে।

গীতার পরবর্তী দুই শ্লোকে (উনত্রিশ-ত্রিশ) ভগবান প্রকৃতি থেকে সম্পর্ক ছিন্ন হওয়ার কথা বলেছেন। প্রথমটিতে প্রকৃতিজাত ক্রিয়াগুলির থেকে সম্বন্ধ ছিন্ন হওয়ার কথা বলেছেন এবং পরেরটিতে প্রকৃতিজাত পদার্থর (ভাব) থেকে সম্বন্ধ ছিন্ন হওয়ার কথা বলেছেন।

গীতার বর্তমান শ্লোকে ক্রিয়াগুলি প্রকৃতির দ্বারা সংঘটিত বলা হয়েছে। কোথাও আবার গুণাদির দ্বারা সংঘটিত বলা হয় আবার কোথাও ইন্দ্রিয়াদির দ্বারা সংঘটিত বলা হয়েছে—এই তিনটি আসলে একই। প্রকৃতিই হল সব কিছুর কারণ, গুণ হল প্রকৃতির কার্য আর গুণের কার্য হল ইন্দ্রিয়াদি। অতএব প্রকৃতি, গুণ ও ইন্দ্রিয়াদির দ্বারা যে ক্রিয়াই সংঘটিত হয় সবই প্রকৃতি দ্বারা সংঘটিত। আর এই ক্রিয়াশীল প্রকৃতির সঙ্গে যখন পুরুষ সম্পর্ক স্থাপন করে তখন শরীর দ্বারা (ব্যষ্টি প্রকৃতি দ্বারা) হওয়া স্বাভাবিক ক্রিয়াগুলি (তাদাত্ম্যের জন্য) নিজের বলে প্রতীত হতে থাকে। বাস্তবে প্রকৃতি ও তার কার্য স্থূল, সূক্ষ্ম এবং কারণ শরীরে যে সব ক্রিয়া সংঘটিত হয় যথা—খাওয়া-দাওয়া, চলা-ফেরা, চিন্তা করা, সমাধিস্থ হওয়া ইত্যাদি, সেসবই প্রকৃতির দ্বারাই হয়ে থাকে, স্বয়ং-এর দ্বারা নয়। কারণ স্বয়ং-এ কোনো ক্রিয়াই হয় না এটি কেবল দেখে অর্থাৎ অনুভব করে অর্থাৎ সাক্ষীভাবে অবস্থান করে। এরূপভাবে দেখলে নিজের মধ্যে অকর্তৃত্ব (অকর্তাভাব) অনুভূত হয়। আবার সমস্ত ক্রিয়াগুলিকে প্রকৃতিতে অবস্থিত অনুভব ছাড়াও যখন সাধক সমস্ত প্রাণীদের পৃথক পৃথক ভাবগুলি অর্থাৎ সকল প্রাণীদের স্থূল, সূক্ষ্ম এবং কারণ শরীরগুলি একই প্রকৃতিতেই অবস্থিত দেখেন তখনও তিনি ব্রহ্মলাভ করেন।

আসলে এই স্ব-স্বরূপ প্রথম থেকেই প্রাপ্ত ; শুধুমাত্র প্রকৃতিজাত বস্তুগুলির সঙ্গে সম্পর্ক মেনে নেওয়াতেই তাঁর প্রকৃত স্বরূপের অনুভূতি হয় না। কিন্তু যখন তিনি সকল শরীর (ব্যষ্টি প্রকৃতি) সমষ্টি প্রকৃতিতেই

স্থিত এবং প্রকৃতি থেকেই উদ্ভূত দেখেন, তখন তাঁর স্বতঃই নিজ স্বাভাবিক স্বরূপ অনুভূত হয়।

এখানে জ্ঞানের প্রকরণে তাই সব ভাবই প্রকৃতিতে অবস্থিত বলে জানিয়েছেন। আর ভক্তির প্রকরণে ভগবান সমস্ত ভাবই তাঁর মধ্যে স্থিত বলে জানিয়েছেন—**'ভবন্তি ভাবা ভূতানাং মত্ত এব পৃথকবিধাঃ'** (গীতা ১০।৫)। অর্থাৎ যেখানে সৎ-অসৎ-এর বিভাগ করেছেন, সেখানে সকাল ভাবই অসতের বলে বলেছেন, আর যেখানে সমগ্রর কথা বলেছেন সেখানে সবই তাঁর ভাব বলে জানিয়েছেন। সমগ্রতে সৎ-অসৎ সবই পরমাত্মা—**'সদসচ্চাহম্'** (গীতা ৯।১৯)।

প্রকৃতির গুণ বন্ধন থেকে মুক্তি

(চতুর্দশ অধ্যায়)

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার দ্বাদশ অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকে প্রশ্ন ছিল 'সগুণ' এবং 'নির্গুণ'—উভয় উপাসকদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে ? এই প্রশ্নের উত্তরে ভগবান সগুণ সাধকদেরই শ্রেষ্ঠ বলে জানিয়েছেন। পঞ্চম শ্লোকে সগুণ ও নির্গুণ উপাসনার তুলনাকালে ভগবান বলেছেন যে, দেহাভিমানীদের পক্ষে অব্যক্ত অর্থাৎ নির্গুণতত্ত্বর উপাসনা করা কঠিন। এই দেহাভিমান রূপ বাধা কীরূপে দূর হবে সেই বিষয়ে ত্রয়োদশ অধ্যায়ে প্রকৃতির বন্ধন থেকে মুক্তির কথা এবং চতুর্দশ অধ্যায়ে প্রকৃতির গুণবন্ধন থেকে মুক্তির কথা জানিয়েছেন। ত্রয়োদশ অধ্যায়ে ভগবান বলেছিলেন জ্ঞানচক্ষুর দ্বারা যিনি ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞর পার্থক্য অনুভব করেন, তিনি পরমাত্মা লাভ করেন। আর কি সেই জ্ঞান, কি তার মহিমা, তা প্রাপ্তির সরল উপায় এবং প্রকৃতির গুণত্রয়র বিভাগ এবং তাদের থেকে মুক্ত হওয়ার উপায় অর্থাৎ 'গুণাতীত' অবস্থার কথা চতুর্দশ অধ্যায়ে বলেছেন।

জ্ঞানের মহিমা ১-২

জগৎ সৃষ্টি ৩-৪

গুণ দ্বারা বন্ধন	৫, ৯-১০
গুণত্রয়ের লক্ষণ	৬-৮, ১১-১৩
গুণের বৃদ্ধি ও অন্তকাল অনুসারে ফল	১৪-১৮
গুণাতীত অবস্থা	১৯-২০

জ্ঞানের মহিমা—(শ্লোক ১-২)

প্রথম দুটি শ্লোকে ভগবান জ্ঞানের মহিমার কথা জানিয়ে বলেছেন যে অজ্ঞানী ব্যক্তিদের মতন প্রকৃতির সঙ্গে সম্পর্কিত না হলে জন্ম-মৃত্যু হয় না।

পরং ভূয়ঃ প্রবক্ষ্যামি জ্ঞানানাং জ্ঞানমুত্তমম্।
যজ্ জ্ঞাত্বা মুনয়ঃ সর্বে পরাং সিদ্ধিমিতো গতাঃ॥
ইদং জ্ঞানমুপাশ্রিত্য মম সাধর্ম্যমাগতাঃ।
সর্গেঽপি নোপজায়ন্তে প্রলয়ে ন ব্যথন্তি চ॥

(গীতা ১৪।১-২)

'ভগবান বলছেন—সমস্ত জ্ঞানের মধ্যে সেই উত্তম জ্ঞানের কথা পুনরায় বলছি, যা জেনে সকল মুনিগণ এই সংসার বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে পরম সিদ্ধি লাভ করেন।

এই জ্ঞান আশ্রয় করলে (ধারণ করলে) আমার স্বরূপ-প্রাপ্ত পুরুষ, সৃষ্টির প্রারম্ভে পুনরায় জন্মগ্রহণও করে না বা প্রলয়কালে উদ্বিগ্নও হয় না।' (গীতা ১৪।১-২)

এখানে ভগবান বলছেন—'**জ্ঞানানাং জ্ঞানমুত্তমম্**' অর্থাৎ লৌকিক ও পারলৌকিক যত প্রকার জ্ঞান আছে, অর্থাৎ যত প্রকার ভাষা, লিপি, কলা ইত্যাদি জাগতিক এবং যোগ, প্রাণায়ামাদি পারলৌকিক বিদ্যার জ্ঞান আছে, তাদের মধ্যে প্রকৃতি-পুরুষের পার্থক্য সম্পর্কে অবগত করানো, পুরুষকে প্রকৃতির অতীত করানো, পরমাত্মাকে প্রাপ্তি করানোর যে জ্ঞান, তা সর্বোৎকৃষ্ট। অন্য কোনো জ্ঞান এর সমকক্ষ নয়, কারণ সমস্ত জ্ঞানই সংসারে আবদ্ধ করে, বন্ধন করে। এখানে '**উত্তম**' ও '**পর**' দুটি শব্দের ব্যবহার করা হয়েছে। 'উত্তম' শব্দর অর্থ হল সেই জ্ঞান যা প্রকৃতি ও তার কার্য সংসার এবং শরীর থেকে সম্বন্ধ ছেদ করে আর 'পর' হল পরমাত্মা

প্রাপ্তকারী তাই তা সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞান। এই শ্লোকে 'পরাং সিদ্ধিং'ও বলা হয়েছে তার তাৎপর্য হল জাগতিক কার্যাদিতে যা সিদ্ধি অথবা যোগ-সাধনে যে সমস্ত অণিমা, লঘিমা, গরিমা, মহিমা আদি সিদ্ধি লাভ হয় প্রকৃতপক্ষে তা অসিদ্ধিই। কারণ সেগুলি সবই জন্ম-মৃত্যু আবর্তনে নিক্ষেপ করে, পরমপ্রাপ্তিতে বাধা দান করে। পরমাত্মা প্রাপ্তিরূপ যে সিদ্ধি তাই সর্বোৎকৃষ্ট, কেননা তা প্রাপ্ত হলে মানুষ জন্ম-মৃত্যু চক্র থেকে মুক্ত হয়। ভগবান বলেছেন—'**মম সাধর্ম্যমাগতাঃ**' অর্থাৎ এই জ্ঞান প্রাপ্ত হলে মানুষ আমার 'সাধর্ম্য' প্রাপ্ত হয়। আমার মধ্যে যেমন কর্তৃত্ব-ভোক্তৃত্ব নেই, সেইরকম তাদের মধ্যেও কর্তৃত্ব-ভোক্তৃত্ব থাকে না। আমি যেমনি সদাই নির্লিপ্ত থাকি, তেমনি তাঁরাও নির্লিপ্ততা, নির্বিকারত্ব লাভ করে। পরমাত্মা যেমন সৎ-চিৎ-আনন্দস্বরূপ সেইরকম তাঁকে প্রাপ্তকারী জ্ঞানী মহাপুরুষও সৎ-চিৎ-আনন্দস্বরূপ হয়ে ওঠেন। মহাসর্গ ও মহাপ্রলয় প্রকৃতিতেই হয়। প্রকৃতির অতীত পরমাত্মার প্রাপ্তি হলে মহাসর্গ বা মহাপ্রলয়ের কোনো প্রভাবই পড়ে না কারণ প্রকৃতির সঙ্গে তখন তার সম্পর্কই থাকে না।

জগৎ সৃষ্টি—(শ্লোক ৩-৪)

ভগবান প্রথম দুটি শ্লোকে বলেছেন প্রকৃতির সঙ্গে সম্পর্কিত না হলে জন্ম-মৃত্যু হয় না আর এখানে বলছেন প্রকৃতির সম্পর্কিত হলে জন্ম-মৃত্যু হয়। এর মধ্যে তৃতীয় শ্লোকে সমষ্টি জগতের সৃষ্টির কথা বলেছেন আর চতুর্থ শ্লোকে বলছেন ব্যষ্টি-শরীরের উৎপত্তির কথা।

মম যোনির্মহদ্ব্রহ্ম তস্মিন্ গর্ভং দধাম্যহম্।
সম্ভবঃ সর্বভূতানাং ততো ভবতি ভারত॥
সর্বযোনিষু কৌন্তেয় মূর্তয়ঃ সম্ভবন্তি যাঃ।
তাসাং ব্রহ্ম মহদ্‌যোনিরহং বীজপ্রদঃ পিতা॥

(গীতা ১৪।৩-৪)

'হে অর্জুন ! আমার মূল প্রকৃতি হল উৎপত্তি স্থান এবং তাতে আমি জীবরূপ গর্ভ স্থাপনা করি। ফলে সমস্ত প্রাণীর সৃষ্টি হয়।

এইরূপে সমস্ত যোনিতে যত প্রকার প্রাণীদেহ উৎপন্ন হয়, মূল

প্রকৃতি তাদের সকলেরই মাতা আর আমি বীজপ্রদানকারী পিতা।' (গীতা ১৪।৩-৪)

ভগবান বলছেন—**'মম যোনির্মহদ্‌ব্রহ্ম'** অর্থাৎ মূল প্রকৃতিকে মহদ্‌ব্রহ্ম বলা হয়েছে। এর কারণ—

১) পরমাত্মা ক্ষুদ্র-ভাব এবং বৃহৎ-ভাব বর্জিত। তিনি যেমন ক্ষুদ্রাতি-ক্ষুদ্র তেমনই মহৎ হতে মহত্তম—**'অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান্'** (শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ ৩।২০)। কিন্তু জাগতিক দৃষ্টিতে মূল প্রকৃতিই সব থেকে বৃহৎ বস্তু। অর্থাৎ জগতের সব থেকে বড় অর্থাৎ ব্যাপক তত্ত্ব হল মূল প্রকৃতি। পরমাত্মা ব্যতীত জগতে এর থেকে বড় ব্যাপক তত্ত্ব নেই। সেইজন্য এই মূল প্রকৃতিকে 'মহদ্‌ব্রহ্ম' বলা হয়েছে।

২) আর মহৎ (মহত্তত্ত্ব অর্থাৎ সমষ্টি বুদ্ধি) এবং 'ব্রহ্ম' (পরমাত্মা)-এর মধ্যবর্তী হওয়ায় মূল প্রকৃতিকে 'মহদ্‌ব্রহ্ম' বলা হয়েছে।

৩) জীবন্মুক্ত মহাপুরুষদের এই মূল প্রকৃতি থেকেই সম্পর্ক বিচ্ছেদ হয়, তাই তাঁরা মহাসর্গেও সৃষ্ট হন না এবং মহাপ্রলয়েও ব্যথিত হন না।[১] ভগবান এই মূল প্রকৃতির জন্য 'মম' পদটি প্রয়োগ করেছেন অর্থাৎ ভগবান বলছেন 'এই প্রকৃতি আমারই'। অর্থাৎ আমার ইচ্ছা ব্যতিরেকে এই প্রকৃতি নিজে কিছুই করতে সক্ষম নয়। প্রকৃতি যা কিছু করে, তা আমারই অধ্যক্ষতায় হয়। **'ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্'** (গীতা ৯।১০)। আমি সেই মূল প্রকৃতির (মহদ্‌ব্রহ্মের) থেকেও শ্রেষ্ঠ, সাক্ষাৎ পরমাত্মা। তাই প্রকৃতির সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করে জীবের নিজ পতন ডেকে আনা উচিত নয়।

ভগবান বলছেন **'তস্মিন্ গর্ভং দধাম্যহম্'** এখানে 'গর্ভম্' পদটি কর্ম-সংস্কার সহ জীবসমূহের বাচক। অনাদিকাল থেকে জীবগণ জন্ম-মরণের আবর্তে পড়ে আছে এবং মহাপ্রলয়ের সময় তাঁরা নিজ নিজ কর্মসংস্কার সহ

---

[১]জীব যতক্ষণ না মুক্ত হয় ততক্ষণ প্রকৃতির অংশ কারণ-শরীরের সঙ্গে তার সম্পর্ক বজায় থাকে এবং মহাপ্রলয়ে কারণ-শরীর সহ তারা প্রকৃতিতে লীন হয়।

মূল প্রকৃতিতে লীন হয়। **'সর্বভূতানি কৌন্তেয় প্রকৃতিং যান্তি মামিকাম্'** (গীতা ৯।৭)। প্রকৃতিতে লীনপ্রাপ্ত ওই জীবদের কর্ম যখন পরিপক্ব হয়ে ফল প্রদানের উপযুক্ত হয়, তখন ভগবান মহাসর্গের প্রারম্ভে ওই সকল জীবকে প্রকৃতির সঙ্গে পুনরায় যুক্ত করে দেন। **'কল্পক্ষয়ে পুনস্তানি কল্পাদৌ বিসৃজাম্যহম্'** (গীতা ৯।৭)। এইভাবেই ভগবান জীবসমূহরূপী গর্ভকে প্রকৃতিরূপ যোনিতে স্থাপন করেন। মহাসর্গের প্রারম্ভে এই উৎপন্ন হওয়াই হল ভগবানের বিসর্গ (ত্যাগ) বা আদিকর্ম। ভগবানের উপদেশের বিশেষ তাৎপর্য হল যে জন্ম-মৃত্যু চক্রে আবদ্ধ হলেও জীব তাঁর অংশ। জীবের সাধর্ম্য, ঐক্য সবই ভগবানের সঙ্গে, জগৎ-সংসার বা শরীরের সঙ্গে নয়।

ভগবান বলছেন—**'সর্বযোনিষু'** অর্থাৎ চুরাশী লক্ষ যোনি, দেবতা, পিতৃপুরুষ, গন্ধর্ব, ভূত-প্রেত-পিশাচ, ব্রহ্মরাক্ষস, স্থাবর-জঙ্গম, জলচর-স্থলচর-নভচর, জরায়ুজ-অণ্ডজ-স্বেদজ-উদ্ভিজ্জ ইত্যাদি সমস্ত জীবই 'সর্বযোনিষু'র অন্তর্গত। আর **'অহং বীজপ্রদঃ পিতা'** কথাটির অর্থ হল এই চুরাশী লক্ষ যোনির উৎপত্তির স্থান (মাতার স্থান) হল 'মহদ্‌ব্রহ্ম' অর্থাৎ মূল প্রকৃতি এবং এই বিভিন্ন বর্ণ এবং আকৃতিবিশিষ্ট নানা শরীরে, ভগবান তাঁর চেতন-অংশরূপ বীজ স্থাপন করেন।

গুণ দ্বারা বন্ধন (শ্লোক ৫, ৯-১০)

পরমাত্মা ও তাঁর শক্তি প্রকৃতির সংযোগে উৎপন্ন জীবসকল প্রকৃতি-সম্ভূত গুণাদিতে কি করে আবদ্ধ হয়, পরের প্রকরণে ভগবান তা বলেছেন।

> সত্ত্বং রজস্তম ইতি গুণাঃ প্রকৃতিসম্ভবাঃ।
> নিবধ্নন্তি মহাবাহো দেহে দেহিনমব্যয়ম্‌॥
>
> (গীতা ১৪।৫)

> সত্ত্বং সুখে সঞ্জয়তি রজঃ কর্মণি ভারত।
> জ্ঞানমাবৃত্য তু তমঃ প্রমাদে সঞ্জয়ত্যুত॥
> রজস্তমশ্চাভিভূয় সত্ত্বং ভবতি ভারত।
> রজঃ সত্ত্বং তমশ্চৈব তমঃ সত্ত্বং রজস্তথা॥
>
> (গীতা ১৪।৯-১০)

'প্রকৃতি হতে উৎপন্ন সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ—এই তিনটি গুণ অবিনাশী দেহীকে (জীবাত্মাকে) দেহে আবদ্ধ করে।

সত্ত্বগুণ সুখে, রজোগুণ কর্মে আসক্ত করে এবং তমোগুণ জ্ঞানকে আবৃত করে প্রমাদে অর্থাৎ কর্তব্যহীনতায় ব্যাপৃত করে মানুষকে আবদ্ধ করে।

আবার রজোগুণ তমোগুণকে দমিত করে সত্ত্বগুণ, সত্ত্বগুণ এবং তমোগুণকে দমন করে রজোগুণ এবং সত্ত্বগুণ ও রজোগুণকে দমিত করে তমোগুণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়।' (গীতা ১৪।৫, ৯-১০)

আগের শ্লোকগুলিতে যে মূল প্রকৃতিকে '**মহদ্‌ব্রহ্ম**' বলা হয়েছে, সেই মূল প্রকৃতি থেকে সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ—এই তিনটি গুণ উৎপন্ন হয়।

ভগবান বলছেন—'**নিবধ্নন্তি মহাবাহো দেহে দেহিনমব্যয়ম্**' অর্থাৎ এই তিনটি গুণ অবিনাশী দেহীকে নশ্বর দেহে আবদ্ধ করে। আসলে এই তিনটি গুণ নিজে থেকে কাউকে আবদ্ধ করে না, পুরুষই এই গুণগুলির সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করে নিজেই আবদ্ধ হয়। তাৎপর্য হল এই যে, ত্রিগুণ প্রধান কার্য, পদার্থ, ধন-সম্পদ, পরিবার, শরীর, স্বভাব, বৃত্তি, পরিস্থিতি, ক্রিয়া ইত্যাদিকে আপন বলে মেনে নেওয়ায় জীব স্বয়ং অবিনাশী হয়েও গুণে আবদ্ধ হয়ে পড়ে, বিনাশশীল পদার্থর বশীভূত হয়ে পড়ে এবং সর্বতোভাবে স্বাধীন হয়েও পরাধীন হয়ে যায়। গুণাদির দ্বারা দেহে আবদ্ধ হলেও জীবের যে স্বাভাবিক অবিনাশী স্বরূপ তা একইভাবে বিরাজ করে, ভগবান তাই '**অব্যয়ম্**' পদটির দ্বারা সেই কথা জানিয়েছেন।

জীব শরীরের সঙ্গে দুইভাবে নিজের সম্বন্ধ স্থাপন করে—(১) অভেদ রূপে অর্থাৎ নিজেকে শরীর বলে মনে করে এবং (২) ভেদ রূপে—শরীরকে নিজের বলে মনে করে। অভেদভাবে সম্বন্ধ স্থাপন করলে জীব নিজেকে শরীর বলে মনে করে এবং অহংভাব উৎপন্ন হয়। আবার ভেদ ভাবে সম্বন্ধ স্থাপন করলে জীব শরীরকে নিজের বলে মনে করে এবং মমতা উৎপন্ন হয়। আর এইভাবে একবার শরীরের সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপন করলেই সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ এই তিনটি গুণ তাদের নিজ নিজ বৃত্তির দ্বারা শরীরের প্রতি অহং ও

মমত্ববোধ দৃঢ় করে, যার ফলে জীব আবদ্ধ হয়।

যেমন বিবাহের পরে স্ত্রীর সম্পর্কিত হলে তার বাড়ির (শশুরবাড়ির) সকলের সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপিত হয় এবং স্ত্রীর বস্ত্র অলংকারের প্রয়োজন হলে তা নিজেরই প্রয়োজন বলে প্রতীয়মান হয়, সেইরকম শরীরের সঙ্গে 'আমি-আমার' সম্পর্ক স্থাপিত হলে স্বতঃই জগতের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপিত হয়, এবং শরীর নির্বাহর বস্তুগুলি নিজের আবশ্যক বলে মনে হতে থাকে। এই অনিত্য শরীরের সঙ্গে সম্পর্ক (একাত্মতা) মেনে নেওয়ার ফলে কী হয় ? (১) জীব স্বয়ং নিত্য তাই এই অনিত্য শরীরকে নিত্য করতে চায়, (২) কিন্তু শরীর বিনাশশীল তাই এই বিনাশশীল শরীরের সঙ্গে সম্পর্কিত হওয়ায় নিত্য জীবেরও মৃত্যুভয় জাগ্রত হয়। সুতরাং যতক্ষণ শরীরকে আশ্রয় করে নিত্য হয়ে থাকার ইচ্ছে থাকবে মৃত্যুভয়ও থাকবে, বুঝতে হবে সে গুণগুলিতে আবদ্ধ আছে। প্রকৃতপক্ষে গুণ জীবকে আবদ্ধ করে না, জীবই সেগুলির সঙ্গ করেই আবদ্ধ হয়ে পড়ে। পরের দুটি শ্লোকে এই গুণগুলি কিরূপে বন্ধন করে তা বর্ণনা করেছেন।

সত্ত্ব—'সত্ত্বং সুখে সঞ্জয়তি'—সত্ত্বগুণ সাধককে সুখে আসক্ত করে নিজের বশীভূত করে এবং তার সাধনকে আর অগ্রসর হতে দেয় না, যার ফলে সাধক সত্ত্বগুণের উর্ধ্বে উঠতে পারে না, গুণাতীত হতে পারে না। এর তাৎপর্য হল বাস্তবে অধিকাংশ সাধকই সুখের আসক্তিতে আবদ্ধ হন। যেমন যখন কোনো জ্ঞান হল, সাধকের মনে এই অহংভাব আসে যে 'আমি কত জানি'। এই অহংভাব থেকে যে একপ্রকার সুখ উৎপন্ন হয়, তাতে সাধক আবদ্ধ হন।

রজঃ—**'রজঃ কর্মনি ভারত'** রজোগুণ মানুষকে কর্মে ব্যাপৃত করে নিজের বিজয় সম্পন্ন করে। এর তাৎপর্য হল এই যে, কাজে মানুষের স্বাভাবিক আকর্ষণ থাকে, কাজ করে সে আনন্দ পায়। ছোট শিশু যেমন শুয়ে শুয়ে হাত পা নেড়ে আনন্দ পায়, তার হাত-পা নাড়া বন্ধ করে দিলে সে কাঁদতে থাকে। তেমনি মানুষ কাজ করতে ভালোবাসে আর তার কাজ মাঝ পথে থামিয়ে দিলে সে বিরক্ত হয়। এই হল ক্রিয়ার প্রতি আসক্তি,

ভালোবাসা—যার দ্বারা রজোগুণ মানুষের ওপর কর্তৃত্ব করে।

তাই সাধকদের কর্তব্য-কর্মে অনুরক্তি থাকলেও, আসক্তি, ভালোবাসা যেন না থাকে—**'ন কর্মস্বনুষজ্জতে'** (গীতা ৬।৪)।

তমঃ—**'জ্ঞানমাবৃত্য তু তমঃ প্রমাদে সঞ্জয়ত্যুত'**—যখন তমোগুণ আসে, তখন তা সৎ-অসৎ, কর্তব্য-অকর্তব্য, হিত-অহিতের জ্ঞানকে (বিবেককে) আবৃত, আচ্ছাদিত করে দেয় অর্থাৎ সেই জ্ঞানকে জাগরিত হতে দেয় না, কর্তব্য-কর্ম করতে দেয় না এবং অনুচিত কর্মে নিয়োজিত করে—এই হল তমোগুণের বিজয়লাভ করা। সত্ত্বগুণ থেকে জ্ঞান (বিবেক) এবং প্রকাশ (স্বচ্ছভাব)—এই দুই বৃত্তি উৎপন্ন হয়। তমোগুণ এই দুই বৃত্তির বিরোধী তাই এটি জ্ঞানকে আবৃত্য করে মানুষকে প্রমাদে নিমগ্ন করে এবং প্রকাশকে (ইন্দ্রিয় ও অন্তকরণের নির্মলতাকে) আচ্ছাদিত করে মানুষকে আলস্য ও অবসাদে এমনভাবে আচ্ছন্ন করে যে, জ্ঞানের চর্চা বা বিদ্যাভ্যাস করতে ইচ্ছা করে না বা করলেও তা বোধগম্য হয় না। এখানে বলা হয়েছে সত্ত্বগুণ কেবল সুখ উৎপাদন করেই ক্ষান্ত হয় না বরং সুখের আসক্তিতে লিপ্ত করে বিজয়লাভ করে। 'আমি খুব ভালো', 'আমি সুখী'—এই হল সুখের আসক্তি। 'আমি ভালো কর্ম করি', 'আমার কর্ম খুব ভালো'—এ হল কর্মের আসক্তি। আসক্তি আসলে অর্থাৎ এই ভাবগুলির সঙ্গে নিজের সম্পর্ক স্থাপন করলে মানুষ আবদ্ধ হয়। তমোগুণ কিন্তু স্বাভাবিকভাবেই বন্ধন করে তাই তমোগুণের বর্ণনায় 'আসক্তি' শব্দটি উদ্ধৃত হয়নি।

সত্ত্বগুণের বৃত্তি হল অন্তঃকরণের স্বচ্ছতা, নির্মলতা, নিবৃত্তি, নিস্পৃহতা, উদারতা ইত্যাদি উৎপন্ন করা। রজোগুণের বৃত্তি হল লোভ, প্রবৃত্তি, নতুন কর্মারম্ভ, অশান্তি, স্পৃহা, জাগতিক ভোগ, ধন-সংগ্রহের প্রতি ভালোবাসা ইত্যাদি। আর তমোগুণের বৃত্তি হল প্রমাদ, আলস্য, অনাবশ্যক নিদ্রা, মূর্খতা ইত্যাদি।

এদের মধ্যে দুটি গুণকে দমিত করে একটি গুণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় এবং যে গুণটি বৃদ্ধি পায়, সেটিই জীবের স্বভাবে প্রাধান্য পায়, অন্যগুলি গৌণ হয়ে যায়। গুণাদির স্বভাবই এইরূপ।

গুণত্রয়র লক্ষণ (শ্লোক ৬-৮, ১১-১৩)

(ক) সত্ত্বগুণ—(শ্লোক ৬,১১)

তত্র সত্ত্বং নির্মলত্বাৎ প্রকাশকমনাময়ম্।
সুখসঙ্গেন বধ্নাতি জ্ঞানসঙ্গেন চানঘ॥
সর্বদ্বারেষু দেহেঽস্মিন্ প্রকাশ উপজায়তে।
জ্ঞানং যদা তদা বিদ্যাদ্বিবৃদ্ধং সত্ত্বমিত্যুত॥

(গীতা ১৪।৬, ১১)

'সত্ত্বগুণ নির্মল (স্বচ্ছ) হওয়ায় প্রকাশক ও নির্বিকার। এই সত্ত্বগুণ সুখ ও জ্ঞানের আসক্তি দ্বারা দেহীকে আবদ্ধ করে।

আর যখন মনুষ্যদেহের সর্বদ্বারে (ইন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণে) প্রকাশ (নির্মলতা) এবং জ্ঞান (বিবেক) উৎপন্ন হয়, তখন বুঝতে হবে যে সত্ত্বগুণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েছে।' (গীতা ১৪।৬, ১১)

তিনটি গুণের মধ্যে সত্ত্বগুণ নির্মল (মলবিহীন স্বচ্ছ), অর্থাৎ রজোগুণ ও তমোগুণের ন্যায় সত্ত্বগুণে মালিন্য নেই। আর নির্মল ও স্বচ্ছ হওয়ায় এটি পরমতত্ত্বের সহায়ক তথা প্রকাশকারী। সত্ত্বগুণী ব্যক্তি রজোগুণ ও তমোগুণজাত বৃত্তিগুলি স্পষ্টভাবে বুঝতে পারে অর্থাৎ তার মধ্যে যদি কখনো কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য, প্রমাদ, আলস্য আদি দোষগুলি জাত হয় তবে তা তার কাছে পরিস্ফুট হয় ও বিকারগুলির সম্পর্কে স্পষ্ট জ্ঞান হয়। আবার পারমার্থিক বা লৌকিক বিষয়ে ভালোভাবে বুঝতেও সাত্ত্বিক বুদ্ধি সম্পূর্ণভাবে জাগ্রত থাকে এবং কর্তব্যপালনেও তার খুব উৎসাহ থাকে।

সত্ত্বগুণের দুটি রূপ—(ক) শুদ্ধ সত্ত্ব, যাতে উদ্দেশ্য থাকে পরমাত্মা, আর (খ) মলিন সত্ত্ব, যার উদ্দেশ্য থাকে জাগতিক ভোগ ও সংগ্রহ। ইহাতে রজোগুণের মিশ্রণ থাকায় এবং উদ্দেশ্য পরমাত্মা প্রাপ্তি না হওয়ায় ইহাকে বলে মলিন সত্ত্ব।

শুদ্ধ সত্ত্বে উদ্দেশ্য একমাত্র ঈশ্বর হওয়ায় ইহাতে পরমাত্মার প্রতি স্বাভাবিক মতি ও রুচি থাকে। কিন্তু মলিন সত্ত্বগুণে বুদ্ধি সাংসারিক বিষয়ে

আকৃষ্ট হওয়ায় সে জাগতিক বিষয়ে ভালোভাবে বুঝতে সক্ষম হয়। যেমন মলিন সত্ত্বগুণের বৃদ্ধিতে নতুন নতুন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার হয়, নতুন নতুন কলার সৃষ্টি হয় ইত্যাদি। কিন্তু তার উদ্দেশ্য পরমাত্মা প্রাপ্তি না হওয়ায় সে অহং-ভাব, সম্মান, অর্থ ইত্যাদির দ্বারা সংসারে আবদ্ধ হয়। সত্ত্বগুণকে 'অনাময়ম্' বলা হয়েছে অর্থাৎ সত্ত্বগুণ রজঃ এবং তমঃ অপেক্ষা বিকাররহিত। অবশ্য নিজস্বরূপ বা পরমাত্মতত্ত্বই সর্বতোভাবে নির্বিকার হয়, যা গুণাতীত কিন্তু এখানে পরমাত্মা প্রাপ্তিতে সহায়ক হওয়ায় ভগবান সত্ত্বগুণকেও বিকাররহিত বলেছেন।

আবার ভগবান সত্ত্বগুণের বন্ধনের কথা বলতে গিয়ে বলেছেন—**'সুখ-সঙ্গেন বধ্নাতি জ্ঞানসঙ্গেন চানঘ'** অর্থাৎ চিত্তে যখন সাত্ত্বিক বৃত্তি উৎপন্ন হয়, কোনো বিকার থাকে না, তখন এক প্রকার সুখ অনুভূত হয়, প্রশান্তিভাব জাগে। মনে হয় যেন এই সুখ, শান্তি চিরস্থায়ী থাকুক, ইহা না থাকলে যেন কিছুই ভাল লাগে না। এই ভাল লাগা আর না লাগাই হল সত্ত্বগুণের সুখেতে আসক্তি, যা বন্ধন কারক। আবার যখন সাধকের সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ গুণের বৃত্তির, বিকারের স্পষ্ট জ্ঞান হয়, নানা বিস্ময়কর ব্যাপার অনুভূত হয়, জ্ঞান হয় যা তার পূর্বে ছিল না তখন মনে হয় যেন এই জ্ঞান সর্বদা বজায় থাকুক। এই জ্ঞানে যে আসক্তি তাও বন্ধনকারক বা 'আমি অন্যর চেয়ে বেশি বা বিশেষ কিছু জানি'—এই অহংভাবও বন্ধনকারক।

সাধক যদি সত্ত্বগুণ থেকে উৎপন্ন সুখ ও জ্ঞানে আসক্ত না হন, তাহলে তিনি শীঘ্রই পরমাত্মা প্রাপ্তিলাভ করেন। কিন্তু তিনি যদি আসক্তি পরিত্যাগ না করতে পারেন কিন্তু ভগবৎ লক্ষ্যে অবিচল থাকেন তাহলেও উপযুক্ত সময়ে তার এই সুখ ও জ্ঞানে অরুচি জন্মায় এবং তিনি পরমাত্মাকে লাভ করেন। সাধকের সতর্ক থাকা উচিত যে, এই সুখ ও জ্ঞান তাঁর ভোগ্য নয়, উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত মাত্র। তাঁকে সেই লক্ষ্যে পৌঁছতে হবে যা এই সুখ ও জ্ঞানকেও প্রকাশ করে। কিন্তু তিনি যদি এই সুখ ও জ্ঞানকে ভোগ করেন এতে আসক্ত হয়ে পড়েন, তবে তিনি এই সুখ ও জ্ঞানেই আবদ্ধ হয়ে থাকেন 'গুণাতীত' হতে পারেন না।

ভগবান সত্ত্বগুণকে 'অনাময়' বা নির্বিকার বলেছেন। এ হল সত্ত্বগুণের বৈশিষ্ট। আবার তিনি পরমপদকেও 'অনাময়' বলেছেন—'**পদং গচ্ছন্ত্যনাময়ম্**' (গীতা ২।৫১)। এতে বুঝতে হবে যে সত্ত্বগুণ হল 'সাপেক্ষ অনাময়' এবং পরমপদ হল 'নিরপেক্ষ অনাময়'। সত্ত্বগুণ স্বভাবত নির্বিকার এবং গুণাতীতের নিকটতম হলেও আসক্তির জন্য তা বিকারী হয়ে উঠতে পারে। সুখ ও জ্ঞান বাধাস্বরূপ নয় কিন্তু ইহাদের প্রতি যে আসক্তি যা রজোগুণের কার্য তাই বাধাস্বরূপ হয়ে থাকে। আসক্তির তাৎপর্য হল কোনো জিনিসকে নিজের বলে মেনে নেওয়া। আসলে সত্ত্বগুণ কারো নিজস্ব নয়, তা হল প্রকৃতির। তাই এটি থেকেও অনাসক্ত থেকে সাধককে চরম লক্ষ্যে (পরমাত্মায়) পৌঁছতে হবে।

সাত্ত্বিক জ্ঞান ও তত্ত্বজ্ঞানে পার্থক্য—সাত্ত্বিক জ্ঞানে 'আমি জ্ঞানী' এই আসঙ্গ বা আসক্তি থাকে কিন্তু তত্ত্বজ্ঞান সর্বতোভাবে আসঙ্গবর্জিত। অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞান হলে 'আমি জ্ঞানী'—এই অহমিকা থাকে না। সাত্ত্বিক জ্ঞানে দ্রষ্টা বিরাজ করে এবং আত্মাভিমান থাকে। কিন্তু তত্ত্বজ্ঞানে কোনো দ্রষ্টা থাকে না এবং নিজের মধ্যে কোনো অভিমান থাকে না ; কারণ তখন স্বতন্ত্রবোধই লোপ হয়। নিজের সম্পর্কে বৈশিষ্ট অনুভব করাই হল আসঙ্গ। আর 'আমি জ্ঞানী'—এটি স্বীকার করলেই বিশিষ্টভাব আরোপ হয়। তত্ত্বজ্ঞান হলে জাগতিক বৈশিষ্ট লোপ পায় ও নিজানন্দ অনুভূত হয়।

ভগবান সত্ত্বগুণ সম্বন্ধে একাদশ শ্লোকে বলছেন '**সর্বদ্বারেষু দেহেঽস্মিন্ প্রকাশ উপজায়তে**' (গীতা ১৪।১১) অর্থাৎ যখন সত্ত্বগুণ অন্য দুই গুণ—রজো ও তমোগুণকে দমিত করে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় তখন সকল ইন্দ্রিয় ও অন্তকরণে স্বচ্ছতা ও নির্মলতা উৎপন্ন হয়। ভগবান সত্ত্বগুণ সম্বন্ধে 'দেহেঽস্মিন্' বলেছেন, এর অর্থ সত্ত্বগুণের বৃদ্ধি কেবল মনুষ্যদেহেই হওয়া সম্ভব, অন্যদেহে নয়। আবার অন্যত্র তমোগুণে আবদ্ধকারীদের জন্য বলেছেন 'সর্বদেহিনাম্' (গীতা ১৪।৮), যার অর্থ 'রজোগুণ' ও 'তমোগুণ' সর্বদেহেই বৃদ্ধি পায়। কিন্তু সত্ত্বগুণ কেবলমাত্র মনুষ্যদেহেই বৃদ্ধি পায়। ভগবান কৃপা করে মনুষ্যদেহ দিয়েছেন রজোগুণ ও তমোগুণকে জয়

করে সত্ত্বগুণেরও ঊর্ধ্বে উঠতে। এতেই মনুষ্যজীবনের সফলতা।

যখন সাত্ত্বিক বৃত্তির বৃদ্ধি হয়ে চিত্তে সচ্ছতা ও নির্মলতা আসে এবং বিবেক জাগরিত হয় তখন কী হয় ? তখন সংসার থেকে অনুরাগ দূর হয়ে বৈরাগ্য আসে। অশান্তি দূর হয়ে শান্তি আসে। লোভ দূর হয়ে ঔদার্য আসে ; প্রবৃত্তি নিষ্কাম হতে থাকে এবং ভোগ ও অর্থ সংগ্রহের জন্য নতুন নতুন কর্মাদি শুরু হয় না। মনে পদার্থ ও ভোগের প্রয়োজন উৎপন্ন না হয়ে কেবল শরীর নির্বাহের দিকে দৃষ্টি থাকে। সকল বিষয় বুঝতে পারার মতো বুদ্ধির বিকাশ হতে থাকে, প্রত্যেকটি কাজ সাবধানতার সঙ্গে এবং সুচারুরূপে সংঘটিত হতে থাকে। কাজে ভুল কম হয় বা কখনো ভুল হলেও তা শুধরে নেওয়া সম্ভব নয়। সৎ-অসৎ, কর্তব্য-অকর্তব্য বিবেক স্পষ্টভাবে জাগরিত হয়। এইসময় সাধককে বিশেষভাবে ধ্যানে-ভজনে ব্যাপৃত থাকতে হয়, তাহলে অল্প সাধনাতেও খুব তাড়াতাড়ি সাধনফল লাভ হয়।

(খ) *রজোগুণ* (শ্লোক ৭-১২)

সত্ত্বগুণের পরে ভগবান রজোগুণের স্বরূপ ও তাতে বন্ধনের প্রকার জানিয়েছেন।

রজো রাগাত্মকং বিদ্ধি তৃষ্ণাসঙ্গসমুদ্ভবম্।
তন্নিবধ্নাতি কৌন্তেয় কর্মসঙ্গেন দেহিনম্॥
লোভঃ প্রবৃত্তিরারম্ভঃ কর্মণামশমঃ স্পৃহা।
রজস্যেতানি জায়ন্তে বিবৃদ্ধে ভরতর্ষভ॥

(গীতা ১৪।৭, ১২)

'তৃষ্ণা ও সঙ্গ (আসক্তি) উৎপন্নকারী রজোগুণই রাগাত্মক। ইহা কর্মের আসক্তি দ্বারাই দেহীকে (জীবাত্মাকে) দেহে আবদ্ধ করে।

আর এই রজোগুণ বৃদ্ধি পেলে লোভ, কর্মপ্রবৃত্তি, কর্মে উদ্যম বা নতুন নতুন কর্ম সৃষ্টি, শান্তির অভাব এবং আসক্তি— এইসব বৃত্তি উৎপন্ন হয়।' (গীতা ১৪।৭, ১২)

রজোগুণকে 'রাগাত্মকম্' বলা হয়েছে অর্থাৎ সোনার গয়না যেমন স্বর্ণময় তেমনি রজোগুণও রাগময় (আসক্তিময়) হয়। যদিও পাতঞ্জল

যোগদর্শনে ক্রিয়াকে বলা হয় রজোগুণের স্বরূপ '**প্রকাশক্রিয়াস্থিতিশীলং ভূতেন্দ্রিয়াত্মকং ভোগাপবর্গার্থং দৃশ্যম্**' (যোগদর্শন ২।১৮)। অর্থাৎ রজোগুণের মুখ্য ধর্ম হল ক্রিয়া অর্থাৎ চঞ্চলতা।

কিন্তু শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা অনুযায়ী ক্রিয়ামাত্রই দোষ নয় দোষের আসল কারণ হল আসক্তি ও অনুরাগ। ভগবান তাই বলেছেন 'বীতরাগ' (গীতা ৪।১০) হলেই তাঁকে প্রাপ্ত হওয়া যায়। গুণাতীত ব্যক্তির কখনো কর্মে প্রবৃত্তি দেখা গেলেও তা আসক্তিযুক্ত হয় না। আবার গুণাতীত হওয়ার সহায়ক হলেও সত্ত্বগুণ সুখ ও জ্ঞান-এর প্রতি আসক্তিযুক্ত হলে তা বন্ধনকারক হয়। আর রজোগুণ সর্বদা কর্মের আসক্তি দ্বারাই দেহীকে আবদ্ধ করে। তখন তৃষ্ণা ও আসক্তি বৃদ্ধি পায় আর মানুষ দিবারাত্র নতুন নতুন কর্মচিন্তায় ব্যাপৃত থাকে। সুতরাং সাধক প্রাপ্ত পরিস্থিতি অনুযায়ী নিষ্কাম কর্তব্য-কর্ম করলেও কখনো যেন সম্পদ-সংগ্রহ ও সুখভোগের জন্য নতুন নতুন কর্মে প্রবৃত্ত না হন। তাই গীতায় কর্মযোগের সাহায্যে সহজে মুক্তিলাভের কথা বলা হয়েছে কারণ কর্ম ও তার ফলে আসক্তি না থাকলেই কর্মযোগ সিদ্ধ হয়।

(গ) *তমোগুণ* (শ্লোক ৮, ১৩)

পরবর্তী প্রকরণে ভগবান তমোগুণের স্বরূপ ও তার বন্ধনের প্রকার জানিয়েছেন।

তমস্ত্বজ্ঞানজং বিদ্ধি মোহনং সর্বদেহিনাম্।
প্রমাদালস্যনিদ্রাভিস্তন্নিবধ্নাতি ভারত॥
অপ্রকাশোঽপ্রবৃত্তিশ্চ প্রমাদো মোহ এব চ।
তমস্যেতানি জায়ন্তে বিবৃদ্ধে কুরুনন্দন॥

(গীতা ১৪।৮, ১৩)

'সমস্ত দেহীগণের মোহগ্রস্তকারী তমোগুণ অজ্ঞান হতে উৎপন্ন। এটি প্রমাদ, আলস্য ও নিদ্রার দ্বারা নিজের সম্বন্ধ মান্যকারী জীবগণকে আবদ্ধ করে।

তমোগুণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হলে অপ্রকাশ, অপ্রবৃত্তি, প্রমাদ, মোহ আদি

বৃত্তিগুলো জাগ্রত হয়।' (গীতা ১৪।৮, ১৩)

ভগবান বলেছেন **'তমঃ তু'** অর্থাৎ তমোগুণ সত্ত্ব ও রজ এই দুই গুণের থেকে নিকৃষ্ট। এই তমোগুণ অজ্ঞান হতে অর্থাৎ বোধহীনতা, মূর্খতা থেকে উৎপন্ন হয় এবং সকল দেহীকে মোহগ্রস্ত করে রাখে অর্থাৎ সৎ-অসৎ, কর্তব্য-অকর্তব্যের জ্ঞান হতে দেয় না। শুধু তাই নয় এটি জাগতিক সুখভোগ ও সম্পদ-সংগ্রহেও ব্যাপৃত হতে দেয় না অর্থাৎ রাজসিক সুখেও বঞ্চিত রাখে, সাত্ত্বিক সুখের তো কথাই নেই। এখানে 'সর্বদেহিনাম্' পদটি সেইসব মানুষকে লক্ষ্য করে বলা হয়েছে, যাদের মধ্যে সৎ-অসৎ, কর্তব্য-অকর্তব্যবোধ নেই, তারা মানুষ হলেও মনুষ্যেতর প্রাণীর সমান অর্থাৎ তারা পশুপাখি আদি ইতর প্রাণীদের মতন কেবল খায়-দায়-ঘুমায়।

তমোগুণীর আর কী হয়—**'প্রমাদালস্যনিদ্রাভিস্তন্নিবধ্নাতি ভারত'** প্রমাদ, আলস্য এবং নিদ্রার দ্বারা সমস্ত দেহীকে আবদ্ধ করে। প্রমাদ দুই প্রকারের হয়— ১) কর্তব্য কর্ম না করা অর্থাৎ যে কাজের দ্বারা নিজের ও জগতের হিতসাধন হয় এরূপ কর্তব্য-কর্মগুলি না করা এবং (২) না করার যোগ্য কাজ করা অর্থাৎ যে কাজে নিজের এবং জগতের, বর্তমানে বা পরিণামে অহিত হয়, সেরূপ কর্ম করা।

সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ—এই তিনটি গুণ মানুষকে আবদ্ধ করে, কিন্তু এই তিনটি বন্ধনের মধ্যে পার্থক্য থাকে। সত্ত্বগুণ ও রজোগুণ আসক্তির দ্বারা বন্ধন করে অর্থাৎ সত্ত্বগুণ সুখ এবং জ্ঞানের আসক্তির দ্বারা এবং রজোগুণ কর্মাদির আসক্তির দ্বারা বন্ধন করে। কিন্তু তমোগুণের ক্ষেত্রে আসক্তির কথা বলা হয়নি, ইহা স্বতঃই 'সম্মোহাত্মক' তাই স্বরূপতই বন্ধনকারক। যদি সুখের আসক্তি এবং জ্ঞানের অহংকার না থাকে তবে সুখ ও জ্ঞান কখনো বন্ধনকারক হয় না বরং তা গুণাতীত। তেমনি কর্ম ও কর্মফলে যদি আসক্তি না থাকে, তাহলে সেই কর্মই 'কর্মযোগ' হয় এবং সেই কর্মের দ্বারাই ভগবদ্‌প্রাপ্তি হয়—**'অসক্তো হ্যাচরন্ কর্ম পরমাপ্নোতি পূরুষঃ'** (গীতা ৩।১৯)। কিন্তু তমোগুণ আসক্তিজনিত নয়, বন্ধনাত্মক।

এই প্রকরণের পরের শ্লোকে তাই তমোগুণের চারটি লক্ষণের কথা বলা হয়েছে—**'অপ্রকাশোঽপ্রবৃত্তিশ্চ প্রমাদো মোহ এব চ'**। এর মধ্যে

অপ্রকাশ হল সত্ত্বগুণ বিরোধী, অপ্রবৃত্তি হল রজোগুণ বিরোধী আর প্রমাদ ও মোহ হল তমোগুণের নিজস্ব গুণ।

অপ্রকাশঃ—সত্ত্বগুণের প্রকাশক 'নির্মলতা' বৃত্তিকে অবদমিত করে যখন তমোগুণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় তখন ইন্দ্রিয়াদি ও চিত্তে নির্মলতা থাকে না, বুঝবার ক্ষমতা লুপ্ত হয়ে যায় অর্থাৎ বুদ্ধি জাগ্রত হয় না। নতুন করে চিন্তা-ভাবনা উৎপন্ন হয় না। ইহাই হল অপ্রকাশ অর্থাৎ সত্ত্বগুণ প্রকাশের বিরোধী বৃত্তি।

অপ্রবৃত্তিঃ—রজোগুণের বৃত্তি 'প্রবৃত্তি'কে অবদমিত করে যখন তমোগুণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় তখন কাজে উদ্যম, উৎসাহ থাকে না, তখন আবশ্যক কর্মে রুচি হয় না, অনর্থক শুয়ে বসে থাকতে ইচ্ছে করে—এসবই 'অপ্রবৃত্তি' বৃত্তির কাজ।

প্রমাদঃ—ইহা হল অকরণীয় কর্মে ব্যাপৃত হওয়া এবং করণীয় কর্ম না করা। যেসব কর্ম করলে পারমার্থিক উন্নতি হয় না, সাংসারিক উন্নতি হয় না, বা সামাজিক কোনো কাজ হয় না অথবা শরীরের পক্ষে প্রয়োজনীয় নয় এমন সব কাজ, যেমন বিড়ি-সিগারেট খাওয়া, তাস-দাবা খেলা, হাসি-তামাসা ইত্যাদিতে মগ্ন থাকার যে প্রবৃত্তি তা 'প্রমাদ' বৃত্তির অন্তর্গত।

মোহঃ—তমোগুণ বৃদ্ধির ফলে যখন 'মোহ' আসে তখন অন্তরে বিবেক-বিরোধী-ভাব উৎপন্ন হয়ে চিত্ত মূঢ়তায় আচ্ছাদিত হয় আর তখন পারমার্থিক বা ব্যবহারিক কাজ করার কোনো ক্ষমতা তো থাকেই না উল্টে অসামাজিক কাজ করার প্রবৃত্তি জন্মায়।

সত্ত্ব, রজঃ এবং তমঃ—এই তিনটি গুণই সূক্ষ্ম হওয়ায় ইহারা অতিন্দ্রিয় অর্থাৎ ইন্দ্রিয় ও চিত্তগোচর নয়। এগুলির পরিচয় ইহাদের থেকে উদ্ভুত বৃত্তির সাহায্যেই হয়ে থাকে কারণ বৃত্তিগুলো স্থূল এবং তা ইন্দ্রিয়র বিষয় হয়ে থাকে। আর পুরুষ এগুলি দেখেন বলে তিনি দ্রষ্টা হন আর দ্রষ্টা দৃশ্য থেকে (বৃত্তি থেকে) সর্বতোভাবে পৃথকই হন। কিন্তু পুরুষ কাম-ক্রোধ-আলস্য আদি বৃত্তিগুলোর সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করলে, সেগুলিকে নিজের বলে মেনে নিলে তাদের আমন্ত্রণ জানানো হয়, স্থায়ী করা হয়। মানুষ ভ্রমবশত ক্রোধান্বিত হলে তাকে অনেক সময় ঠিক বলে মনে করে এবং

বলে 'এতো সকলেরই হয়ে থাকে' বা অন্য সময়ে বলে 'আমি একটু ক্রোধী স্বভাবের' ইত্যাদি। 'আমি ক্রোধী' এটি মেনে নিলে 'ক্রোধ' ও তার অহংভাব স্থায়িত্ব লাভ করে। তখন ক্রোধরূপী এই বিকার ত্যাগ করাই কঠিন হয়ে যায়। এইভাবে গুণাদির সঙ্গে নিজ সম্পর্ক মেনে নিলেই গুণগুলির বৃত্তি নিজের বলে প্রতীয়মান হয়। এইভাবে সত্ত্বগুণেও উপভোগ হলে তা গুণাতীত হওয়ার পক্ষে বাধা সৃষ্টি করে এবং তখন তা রজোগুণের অংশ হয়ে যায়। সেইরকম রজোগুণে অনুরাগ বৃদ্ধি পেলে অনুরাগে বাধা প্রদানকারীদের প্রতি ক্রোধ জন্মায় এবং তাতে সম্মোহ হয়। এইভাবে সম্মোহ হলে সে রজোগুণ থেকে তমোগুণে গমন করে এবং তার পতন হয়—**ক্রোধাৎ ভবতি সম্মোহঃ সম্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ। স্মৃতিভ্রংশাদ্বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি॥** (গীতা ২।৬৩)

গুণের বৃদ্ধি ও অন্তকাল অনুসারে ফল (শ্লোক ১৪-১৮)

যদা সত্ত্বে প্রবৃদ্ধে তু প্রলয়ং যাতি দেহভৃৎ।
তদোত্তমবিদাং লোকানমলান্ প্রতিপদ্যতে॥
রজসি প্রলয়ং গত্বা কর্মসঙ্গিষু জায়তে।
তথা প্রলীনস্তমসি মূঢ়যোনিষু জায়তে॥
কর্মণঃ সুকৃতস্যাহুঃ সাত্ত্বিকং নির্মলং ফলম্।
রজসস্তু ফলং দুঃখমজ্ঞানং তমসঃ ফলম্॥
সত্ত্বাৎ সঞ্জায়তে জ্ঞানং রজসো লোভ এব চ।
প্রমাদমোহৌ তমসো ভবতোঽজ্ঞানমেব চ॥
ঊর্ধ্বং গচ্ছন্তি সত্ত্বস্থা মধ্যে তিষ্ঠন্তি রাজসাঃ।
জঘন্যগুণবৃত্তিস্থা অধো গচ্ছন্তি তামসাঃ॥

(গীতা ১৪।১৪-১৮)

'সত্ত্বগুণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত অবস্থায় যদি মানুষের মৃত্যু হয়, তাহলে তিনি উত্তম কর্মকারীগণের নির্মললোক প্রাপ্ত হন।

রজোগুণের বৃদ্ধিকালে মৃত্যুপ্রাপ্ত ব্যক্তি কর্মে আসক্ত মানুষ যোনিতে জন্মগ্রহণ করে এবং তমোগুণ বৃদ্ধিকালে মৃত্যুবরণকারী ব্যক্তি মূঢ়-

যোনিতে জন্মগ্রহণ করে।

বিবেকবান পুরুষেরা শুভকর্মের ফলকে সাত্ত্বিক ও নির্মল, রাজসিক কর্মের ফল দুঃখ ও তামস কর্মের ফলকে অজ্ঞান বা মূঢ়তা বলেছেন।

সত্ত্বগুণ থেকে জ্ঞান, রজোগুণ থেকে লোভ এবং তমোগুণ থেকে প্রমাদ, মোহ ও অজ্ঞান উৎপন্ন হয়।

সত্ত্বগুণে অবস্থিত ব্যক্তি উর্ধ্বলোকে গমন করে, রজোগুণে অবস্থিত ব্যক্তি মৃত্যুলোকে এবং নিকৃষ্ট তমোগুণে অবস্থিত ব্যক্তি অধোগতি প্রাপ্ত হয়।' (গীতা ১৪।১৪-১৮)

এই প্রকরণের পাঁচটি শ্লোকের মধ্যে ষোড়শ-সতেরোতম শ্লোকে তিনটি গুণের লক্ষণ বিশেষভাবে বলেছেন আর বাকিগুলোতে বলেছেন এই গুণবৃত্তির বৃদ্ধির সময় যদি মৃত্যু হয় তবে সেই ব্যক্তির অন্তিমকালে কী গতি হয়।

গুণগুলির বিশেষ লক্ষণ—কর্ম সাত্ত্বিক, রাজসিক বা তামসিক হয় না। আসলে যিনি কর্ম করেন সেই কর্তাই সাত্ত্বিক, রাজসিক বা তামসিক হয়ে থাকেন। সাত্ত্বিক ব্যক্তি দ্বারা কর্মই সাত্ত্বিক, রাজসিক ব্যক্তির কর্ম রাজসিক আর তামসিক ব্যক্তির কর্মই তামসিক হয়।

কর্মণঃ সুকৃতিস্যাহুঃ সাত্ত্বিকং নির্মলং ফলং—সত্ত্বগুণের স্বরূপ হল স্বচ্ছ, নির্মল ও নির্বিকার। তাই সত্ত্বগুণসম্পন্ন ব্যক্তি শুভকর্মই করেন তবে ফলেচ্ছারহিত হয়ে কর্ম করলেও যতক্ষণ কর্তার সত্ত্বগুণের সঙ্গে সম্বন্ধ থাকে, ততক্ষণ তাঁর 'সাত্ত্বিক কর্তা' সংজ্ঞা থাকে এবং তাঁর কর্মের ফল সৃষ্টিই হতে থাকে। কিন্তু যখন গুণগুলি থেকে সম্পর্ক ত্যাগ হয় তখন তাঁর আর 'সাত্ত্বিক কর্তা' সংজ্ঞা থাকে না, তাঁর দ্বারা আর কোনো কর্মের ফলও হয় না, কেননা তাঁর সমস্ত কর্মই তখন অকর্ম হয়ে যায়।

রজসস্তু ফলং দুঃখম্—রজোগুণের স্বরূপ হল 'রাগাত্মক'। আর রাজসিক কর্তা যে কর্ম করেন সেগুলি রাজসিকই হয় আর তাকে তার ফল ভোগ করতে হয়। তাৎপর্য হল রাজসিক কর্ম দ্বারা পদার্থর ভোগ হয়, শরীরে সুখ-আরাম হয়, জগতে সম্মান-প্রতিপত্তি হয় এবং মৃত্যুর পর স্বর্গভোগ প্রাপ্তি হয় বা হতে পারে কিন্তু সম্বন্ধজনিত এই যে যত ভোগ সেগুলি সবই

দুঃখের কারণ—'যে হি সংস্পর্শজা ভোগা দুঃখযোনয় এব তে' (গীতা ৫।২২)। কারণ রাজসিক কর্মে আসক্তিই হল প্রধান এবং তাই জন্ম-মৃত্যুর কারণ হয়ে থাকে সেইজন্য ভগবান এখানে রাজসিক কর্মের ফল দুঃখ বলে জানিয়েছেন। রজোগুণ থেকে দুটি জিনিস উৎপন্ন হয়—পাপ ও দুঃখ। রজোগুণসম্পন্ন ব্যক্তি বর্তমানে পাপ করে ও তার ফল হিসেবে ভবিষ্যতে দুঃখ ভোগ করে।

অজ্ঞানং তমসঃ ফলং—তমোগুণের স্বরূপ হল সম্মোহনাত্মক। সুতরাং তমোগুণসম্পন্ন ব্যক্তি পরিণাম, হিংসা, ক্ষতি এবং সামর্থ্য না জেনে মূর্খতাবশত যেসব কর্ম করে, সে সবই তামসিক কর্ম। সেইসকল তামসিক কর্মের ফল অজ্ঞান অর্থাৎ অজ্ঞান যোনি প্রাপ্ত করায়। ওই কর্ম অনুসারে তারা পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, বৃক্ষ, লতা আদি মূঢ় যোনিতে জন্মগ্রহণ করে যাতে অজ্ঞানতার অর্থাৎ মূঢ়তারই প্রাধান্য থাকে।

এই প্রকরণের সারমর্ম হল এই যে, সাত্ত্বিক পুরুষের নিকট যে পরিস্থিতিরই উদ্ভব হোক না কেন তাতে তিনি দুঃখিত হন না। রাজসিক ব্যক্তির নিকট যে কোনো পরিস্থিতিই আসুক না কেন তাতে তিনি সুখী হন না। আর তামসিক ব্যক্তির নিকট যে পরিস্থিতিই আসুক না কেন, তাতে তার বিবেক জাগ্রত হয় না, মূঢ়তা বজায় থাকে। জ্ঞান (বিবেক-বুদ্ধি) প্রকটিত হয় সত্ত্বগুণ থেকে এবং আসক্তি না থাকলে তা ক্রমশ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়ে তত্ত্ববোধ করায়। অপরপক্ষে লোভ, প্রমাদ, মোহ, অজ্ঞানতা বৃদ্ধি পেলে, তাতে আর কোনো ক্ষতি হতে বাকি থাকে না, কোনো দুঃখ হতে বাকি থাকে না এবং মূঢ়যোনি প্রাপ্তি বা নরক প্রাপ্তিও বাকি থাকে না।

গুণবৃদ্ধির অন্তকাল অনুসারে ফল—জন্মগ্রহণের পিছনে অন্তকালীন চিন্তাই প্রধান আর অন্তকালীন চিন্তার মূলে থাকে গুণাদির প্রাধান্য, আবার গুণাদি বৃদ্ধি পায় কর্মানুযায়ী। তাৎপর্য হল এই যে, মানুষের ভাব (গুণ) যেমন হবে সে তেমন কর্ম করবে আর যেমন কর্ম করবে, তার ভাবও সেইরূপ দৃঢ় হবে এবং তার মৃত্যুকালীন চিন্তাও সেই অনুযায়ী হবে। সুতরাং এর তাৎপর্য হল এই যে পরবর্তী জন্ম নেওয়ায় অন্তকালীন চিন্তাই প্রধান আর

চিন্তার মূলে থাকে ভাব এবং ভাবের মূলে থাকে কর্ম। এইভাবে দেখলে পরবর্তী জন্মপ্রাপ্তিতে অন্তিম চিন্তা, ভাব (স্বভাব গুণ) এবং কর্ম—এই তিনটিই হল কারণ।

সত্ত্বগুণ বৃদ্ধি অবস্থায় মৃত্যু—ভগবান বলছেন এই অবস্থায় লোকে **'উত্তমবিদাম্ লোকান্ অমলান্ প্রতিপদ্যতে'** অর্থাৎ উত্তম কর্মকারী নির্মল লোক প্রাপ্ত হয়। এর অর্থ হল যাদের ভাব উত্তম, কর্ম উত্তম এইরূপ নির্মল ব্যক্তিরা যে লোকে যান, সত্ত্বগুণ বৃদ্ধিকালে ব্যক্তিরাও সেই উচ্চলোক প্রাপ্ত হন। এর থেকে প্রমাণিত হয় যে গুণাদি হতে উৎপন্ন বৃত্তিগুলি কর্মের থেকে কম শক্তিশালী নয়। সাত্ত্বিক বৃত্তিও পুণ্যকর্মের সমান শ্রেষ্ঠ। এখানে একটি প্রশ্ন আসতে পারে যে, যে সব সাধু সারাজীবন শুভকর্ম করে যে লোক প্রাপ্ত হন, সত্ত্বগুণ বৃদ্ধিকালে মৃত্যুপ্রাপ্ত ব্যক্তিও তাহলে সেইলোক প্রাপ্ত হন ! এর কারণ ভগবান একটি বিশেষ সুযোগ দিয়েছেন—**'অন্তমতি অন্তগতি'** অর্থাৎ মৃত্যুর সময় মানুষের যেমন মতি হয় তার তেমন গতি হয়—

যং যং বাপি স্মরণং ভাবং ত্যজতন্তে কলেবরম্।
তং তমেবৈতি কৌন্তেয় সদা তদ্ভাবভাবিতঃ॥ (গীতা ৮।৬)

বিবেকশীল ব্যক্তি উত্তমবুদ্ধিসম্পন্ন হন। সত্ত্বগুণকে নিজস্ব মনে করে তাতে যদি সাধক আসক্ত না হন এবং ভগবানে শরণাগতি থাকে তাহলে সাত্ত্বিক ব্যক্তি ভগবানের পরমধাম প্রাপ্ত হন। কিন্তু যদি সত্ত্বগুণের সঙ্গে সম্পর্কিত হন তবে ব্রহ্মলোকের মতো উচ্চ স্থান প্রাপ্ত হন। ব্রহ্মলোক পর্যন্ত সমস্ত ধামই হল সাপেক্ষ নির্মললোক এবং পরমধাম হল নিরপেক্ষ নির্মল-লোক।

আঠারোতম শ্লোকে ভগবান বলেছেন **'উর্ধ্বং গচ্ছন্তি সত্ত্বস্থা'** অর্থাৎ যে সাধকদের জীবনে সত্ত্বগুণের প্রাধান্য তাঁরা 'উচ্চলোকে' গমন করেন। তাঁরা সাধারণত ভোগাদি সংযম করেন, তীর্থ, ব্রত, দান আদি শুভকর্ম করেন, অন্যের সুখ-সুবিধার জন্য জলসত্র, অন্নক্ষেত্র চালান, রাস্তা আদি নির্মাণ করেন, পশুপক্ষীর সুবিধার জন্য গাছপালা ইত্যাদি লাগান এবং তাই এখানে তাঁদের **'সত্ত্বস্থাঃ'** বলা হয়েছে। শাস্ত্রে সত্ত্বগুণের অসীম প্রভাব বলা হয়েছে। তাই সাত্ত্বিক গুণ বৃদ্ধি করতে হয়। সাত্ত্বিক গুণ বৃদ্ধির জন্য কী করা উচিত ?

যে স্থানে কোলাহল হয় সেইরকম রাজসিক স্থান এবং যে স্থানে মদ, মাংস, ডিম আদি বিক্রি হয় সেইরকম তামসিক স্থান পরিহার করা উচিত। প্রাতঃকাল ও সন্ধ্যাকালকে সাত্ত্বিক বলে ধরা হয়, এই সময়গুলিতে ধ্যান-ভজন ইত্যাদিতে অতিবাহিত করা উচিত। শাস্ত্রবিহিত শুভকর্মই করা উচিত, রাজসিক-তামসিক কর্ম কখনোই করা উচিত নয়, নিষিদ্ধ কর্ম তো নয়ই। এইভাবে সাত্ত্বিকভাবে সমস্ত কাজ করলে পুরানো সংস্কার দূর হয় এবং সাত্ত্বিক সংস্কার (সত্ত্বগুণ) বৃদ্ধি পায়।

ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণ-উদ্ধব সংবাদে ভগবান সত্ত্বগুণ সম্বন্ধে উদ্ধবকে বলছেন—

সত্ত্বাদ্ধর্মো ভবেদবৃদ্ধাৎ পুংসো মদ্ভক্তিলক্ষণঃ।
সাত্ত্বিকোপাসয়া সত্ত্বং ততো ধর্মঃ প্রবর্ততে॥
ধর্মো রজস্তমো হন্যাৎ সত্ত্ববৃদ্ধিরনুত্তমঃ।
আশু নশ্যতি তন্মূলো হ্যধর্ম উভয়ে হতে॥
আগমোহপঃ প্রজা দেশঃ কালঃ কর্ম চ জন্ম চ।
ধ্যানো মন্ত্রোহথ সংস্কারো দশৈতে গুণ হেতবঃ॥

(শ্রীমদ্ভাবত ১১।১৩।২-৪)

'সত্ত্বগুণ বৃদ্ধি পেলে পুরুষের আমাতে ভক্তিরূপ ধর্ম উদিত হয়। আবার সাত্ত্বিক উপাসনার দ্বারাও সেই সত্ত্বগুণ বর্ধিত হয় ও তাহা হতে ধর্মে প্রবৃত্তি হয়।

তাই সত্ত্ববৃদ্ধিজনিত সর্বোত্তম ধর্মই রজ ও তমোগুণ নাশ করে এবং অধর্মের মূল যে রজ ও তম, তা নাশ হলে অধর্মও আশু বিনষ্ট হয়।

শাস্ত্র, জল, সন্ততি, দেশ, কাল, কর্ম, জন্ম, ধ্যান, মন্ত্র এবং সংস্কার—এই দশটি সত্ত্বাদি গুণবৃত্তির কারণ।'

মানুষের মধ্যে সামান্যই সত্ত্বগুণ থাকে, কেননা এটির অর্জন বা সঞ্চয় বড় একটা হয় না। সত্ত্বগুণ সাধারণত নির্জিতই থাকে তাই সেটি জয় করা বড় একটা কঠিন নয়। কিন্তু জয় করা প্রয়োজন দুর্জয় রজো ও তমগুণ। যদিও অত্যন্ত কঠিন রজ ও তমোগুণ স্বভাবত প্রবল কিন্তু সত্ত্বগুণের সাড়া পেলেই সেগুলি ভীত ও লজ্জিত হয়ে পলায়ন করে। যেমন জাগ্রত ও সতর্ক দুর্বল

গৃহস্থের একটিমাত্র হাঁকডাকে বলবান ডাকাতদলও দূরে পলায়ন করে, সেইরকম জীব সতর্ক থাকলে অর্থাৎ সাধনাদি দ্বারা সত্ত্বগুণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হলে, রজ ও তমোগুণের পরাজয় সহজ হয়ে পড়ে। তিনটির জয় একসঙ্গে অসম্ভব তাই ভগবান আগে সত্ত্বগুণ দ্বারা রজ ও তমোগুণ জয়ের কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন সত্ত্ব দ্বারা রজ ও তমোগুণ জয় করবে এবং তৎপরে সত্ত্ব দ্বারা সত্ত্বকে জয় করবে। কিন্তু সত্ত্ব দ্বারা সত্ত্ব জয় কীরূপে সম্ভব। সত্ত্ব দ্বিবিধ—রাগাত্মক (আসক্তি সহ) ও উপসমাত্মক (শুদ্ধসত্ত্ব)। রাগাত্মক সত্ত্ব ধর্ম বৃদ্ধি করে আর উপসমাত্মক সত্ত্ব জ্ঞান এনে দেয়। তাই উপশমাত্মক সত্ত্ব দ্বারা রাগাত্মক সত্ত্ব জয় করতে হবে। এইভাবে সত্ত্বই হচ্ছে এ যুদ্ধজয়ের প্রধান অস্ত্র। আর এই সত্ত্ব বৃদ্ধির প্রধান উপায় হচ্ছে নিরন্তর সাত্ত্বিক সেবা, তাহা হতে ধর্ম, এবং ধর্ম হতে পাপরূপী রজ ও তমোগুণকে পরাজয় করা যায়।

সাত্ত্বিক সেবা কি ? ভগবান ভাগবতে এ সম্বন্ধে প্রধান কয়েকটির কথা উল্লেখ করেছেন—

১) **আগম বা শাস্ত্র**— নিবৃত্তিমূলক শাস্ত্র, মোক্ষ শাস্ত্রই অধ্যয়ন করতে হবে। এইসব শাস্ত্র সেবন করলে সত্ত্বগুণ বর্ধিত হয়। একই বেদশাস্ত্রের আধ্যাত্মিক উপনিষদ ভাগে আছে নিবৃত্তির সাত্ত্বিক উপায়, আধিযাজ্ঞিক কর্মকাণ্ড, কাম্যাদি কর্ম ও তদানুস্বজ্ঞিক বৈধ পশু হিংসাদি রাজস ধর্ম পালনের উপায় ইত্যাদি এবং অপরভাগে দুষ্কামনা পূর্ণ ও অবৈধ পশুহিংসাদির বিধিসমন্বিত আভিচারিক তামস কর্মর বিধি। কিন্তু ভগবান বলছেন— **'সাত্ত্বিকান্যেব সেবেত'** নিবৃত্তিমূলক সাত্ত্বিক শাস্ত্রই সেব্য।

২) **আপঃ বা জলসেবা**—তীর্থজল অর্থাৎ গঙ্গা, যমুনার জলই সেবন করবে, কৃত্রিম গন্ধযুক্ত জল যাতে রাজস ও তমোগুণ বৃদ্ধি পায় তাহা সেব্য নয়।

৩) **প্রজা অর্থাৎ পুত্রাদি (সন্ততি)**—সদাচারসম্পন্ন পুত্র হলে সত্ত্বগুণের পরিণামে উর্ধ্বগতি হয়। বংশে একটিমাত্র বিশুদ্ধ বৈষ্ণব জন্মগ্রহণ করলে শাস্ত্র বলেছেন— **'দশ পূর্বান দশাবরান্'** অর্থাৎ দশ উর্ধ্বতন ও দশ অধস্তন

পুরুষের সুগতির সহায়ক হয়। শ্রীকৃষ্ণ ও রুক্মীনি দেবীও উত্তম পুত্রলাভের জন্য একবছর ব্রত পালন করে 'প্রদ্যুম্ন'কে পুত্ররূপে লাভ করেছিলেন।[১]

৪) **দেশ**—নির্জন দেশবাসে বিকারের হেতু ভূত দ্রব্যাদির অভাবে ইন্দ্রিয়াদি আপনাআপনি নির্জিত হয় ; অতএব রজ ও তমোগুণ নিজ উপকরণ আহরণ করতে পারে না। মনোরম জনবহুল স্থানে রস-রূপাদির বিস্তারের হেতু ইন্দ্রিয়াদিগণ তাহা গ্রহণ করতে আগ্রহান্বিত হয় আর রজ ও তমোগুণের বিস্তার ঘটে। তাই সত্ত্বকামী মানব নির্জন দেশের সেবন করবে।

৫) **কাল বা সময় সেবা**—দিবসের তিনভাগে তিনটি গুণের প্রভাব বিস্তার হয়। ব্রাহ্মমুহূর্তাদি আর সান্ধ্যকাল বিশুদ্ধ সত্ত্ব তাই ইহা ধ্যানধারণার সময়। ক্রমে রৌদ্র উঠলে ও রাত্রিকালে কর্মপ্রবৃত্তি ও তদানুষঙ্গিক ক্ষুধার আকর্ষণ এসে পড়ে এবং রজোগুণের আগমন হয়। তারপর মধ্যাহ্ন ও নিশীথাদিতে নিদ্রা ও আলস্য এসে পড়ে তা তমোগুণের সময়। এই নিশীথাদি ভক্তগণের ধ্যানধারণায় বর্জনীয় বলে অপর মুহূর্তাদি সেব্য।

৬) **কর্মসেবা**— সাত্ত্বিক নিত্যকর্ম সন্ধ্যা-বন্দনাদিতে রজোগুণের কার্য কামনা-বাসনাদি থাকে না তাই ইহা সেব্য। আর কাম্যাদি কর্মে রজ ও অভিচারাদি কার্যে তমোগুণের বাহুল্য থাকে তাই ইহা বর্জনীয়।

৭) জন্ম—মনুষ্যের প্রথমে সাধারণ জন্ম, কিন্তু দীক্ষান্তে দ্বিতীয় জন্ম হয় সেই জন্মর কথা এখানে উল্লেখিত হয়েছে।

৮) **ধ্যান**—দেবতারাও সাত্ত্বিকাদি ভেদে ত্রিবিধ। সাত্ত্বিক দেবতার (বিষ্ণুর) ধ্যান করলে সাত্ত্বিক ভাবের বিকাশ হয়।

৯) **মন্ত্র**—প্রণব পরব্রহ্মের আকার তাই প্রণব মন্ত্রই সর্বোত্তম।

১০) **সংস্কার সেবা**—বাহিরের অঙ্গরাগাদি দ্বারা শরীর সংস্কার হয় কিন্তু ইহা রজ ও তমোগুণ বর্ধক তাই বর্জনীয়। অপরদিকে সত্ত্বশুদ্ধির দ্বারা আত্মার নির্মলীকরণ হয় এবং সত্ত্বগুণের সঞ্চয় হয় তাই ইহই আচরণীয়।

---

[১]মাতা কৃতার্থা পৃথিবী ধন্যা। পবিত্রং কুলানি চ তেন॥
নৃত্যন্তু স্বর্গে পিতরস্তু তেষাম্। যেষাম্ কুলে বৈষ্ণব নাম ধেয়॥

রজোগুণ বৃদ্ধি অবস্থায় মৃত্যু—এখানে সেইসব মানুষকে রাজসাঃ বলা হয়েছে যারা শাস্ত্র মর্যাদাতে থেকেও সম্পদ-সংগ্রহ ভোগ, আয়েশ-আরাম, বস্তুসমূহে মমত্ববোধ ও আসক্তি পোষণ করেন। কোনো কারণবশত যদি তাদের মধ্যে মৃত্যুকালে লোভ প্রবৃত্তি, অশান্তি, স্পৃহা ইত্যাদি বেড়ে যায় এবং সেই চিন্তায় তারা দেহত্যাগ করে তবে সেই ব্যক্তি কর্মাসক্ত মানুষ হয়ে জন্মগ্রহণ করে।

কর্মভেদে মানুষ-জন্ম হয় তিন প্রকারের—যিনি সারাজীবন ভালো কাজ করেছেন, ভালো আচরণ করেছেন, যাঁর ভাব ভালো, তাঁর যদি মৃত্যুর সময় রজোগুণের বৃদ্ধি হয় তবে তিনি মনুষ্য-যোনিতে জন্মগ্রহণ করলেও তার আচরণ, ভাব ভাল থাকে এবং তিনি শুভ কর্মই করে থাকেন। কিন্তু যিনি সাধারণ জীবন-যাপন করেছেন, তিনি যদি রজোগুণের বৃদ্ধিকালে মারা যান তবে মনুষ্য-জন্মে তিনি পদার্থ, ব্যক্তি, ক্রিয়াতে বিশেষ আসক্ত থাকেন। আবার যাঁর জীবনে কাম-ক্রোধ ইত্যাদির প্রাধান্য থাকে, তিনি যদি রজোগুণ বৃদ্ধিকালে মারা যান তবে তিনি মনুষ্য-জন্ম পেলেও বিশেষভাবে আসুরী-সম্পদ সম্পন্ন হন। তাৎপর্য হল এই যে, মনুষ্য-জন্ম গ্রহণ করলেও গুণাদির তারতম্য অনুযায়ী মানুষ ভিন্ন ভিন্ন স্বভাবসম্পন্ন হয়। তবে আচরণ যেমনই হোক না কেন, মানুষ হয়ে জন্মালে তার মধ্যে ভগবদপ্রদত্ত বিবেক কাজ করবেই। সুতরাং প্রত্যেক ব্যক্তিই এই বিবেককে গুরুত্ব দিয়ে, সৎসঙ্গ, স্বাধ্যায় ইত্যাদির দ্বারা বিবেক-বুদ্ধির সদুপযোগ করে উর্ধ্বে উঠতে পারে, পরমাত্মাকে লাভ করতে পারে। ভগবদ্প্রদত্ত এই বিবেকের জন্যই সকল মানুষই ঈশ্বর লাভের অধিকারী।

তমোগুণ বৃদ্ধি অবস্থায় মৃত্যু—যাদের জীবনে তমোগুণের প্রাধান্য থাকে এবং সেইজন্য যারা প্রমাদাদির বশীভূত হয়ে অনর্থক অর্থ ও সময় নষ্ট করে, যারা আলস্যে ও নিদ্রায় সময় কাটায়, আবশ্যক কার্যাদি সময় মতো করে না, অন্যের ক্ষতির কথা চিন্তা করে, অন্যকে দুঃখ দেয়, ছল, চাতুরী, কপটচারী, চুরি, ডাকাতি আদি নিন্দনীয় কাজ করে তাদের এখানে **'জঘন্যগুণ বৃত্তিস্থাঃ'** বলা হয়েছে। আবার কোনো মানুষের মৃত্যুকালেও

যদি কোনো কারণবশত তমোগুণ বৃদ্ধির ফলে প্রমাদ, মোহ, অপ্রকাশ আদি বেড়ে যায়, এইরূপ চিন্তায় সে দেহত্যাগ করে তবে সে অধোগতি প্রাপ্ত হয়।

অধোগতির দুটি ভাগ আছে—'যোনিবিশেষ' এবং 'স্থানবিশেষ'। যোনিবিশেষ অধোগতির মধ্যে পড়ে পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, সাপ, বিছে, ভূত, প্রেত ইত্যাদি আর স্থানবিশেষ অধোগতি হল বৈতরণী, অসিপত্র, লালাভক্ষ, কুম্ভীপাক, রৌরব, মহারৌরব আদি নরককুণ্ড। যাদের জীবনে সত্ত্বগুণ বা রজোগুণ থাকা সত্ত্বেও যদি কোনো কারণে মৃত্যুর সময় তাৎকালিক তমোগুণ বৃদ্ধি পায়, তবে তারা মৃত্যুর পর যোনিবিশেষে অধোগতিতে অর্থাৎ মূঢ়যোনিতে গমন করেন। আর যাদের জীবনে তমোগুণের প্রাধান্য থাকে এবং সেই তমোগুণ প্রাধান্যেই দেহত্যাগ করে তারা মৃত্যুর পর স্থানবিশেষে অধোগতি অর্থাৎ নরকে গমন করে।[১] এখানে বিশেষ বক্তব্য হল এই যে **সাত্ত্বিক, রাজসিক, তামসিক মানুষের অন্তিম চিন্তা অন্য দিকে গেলে, তার গতি তার অন্তিম চিন্তা অনুসারেই হবে। তবে সুখ-দুঃখ ভোগ তার কর্মানুসারে হবে।**

শুভকর্মকারী ব্যক্তিকে যদি অন্তকালে তমোগুণের তাৎকালিক বৃদ্ধির ফলে মৃত্যুর পর মূঢ়যোনিতে জন্ম নিতেও হয় তাহলেও সেই জন্মে তার গুণ, আচরণ ভাল হবে, সে ভাল কাজের স্বভাবযুক্ত হবে। যেমন, ভরত মুনির মৃত্যু সময় তমোগুণের বৃদ্ধির ফলে (হরিণ শিশুর প্রতি আসক্তিসহ চিন্তা করতে করতে দেহত্যাগ করার জন্য) তিনি মূঢ়যোনিসম্পন্ন হরিণ হয়ে জন্মান।

কিন্তু তাঁর মনুষ্য-জন্মে কৃত সৎকর্ম, ত্যাগ, তপস্যা, হরিণ জন্মেও বজায় ছিল। তিনি জন্মেও মাতার সঙ্গে বাস করেননি, সবুজ পাতার বদলে শুকনো পাতা খেতেন, মুনিদের আশ্রমের সন্নিকটে বাস করতেন ইত্যাদি।

---

[১]তমোগুণের সামান্য বৃদ্ধি হলে মানুষ মূঢ় যোনি প্রাপ্ত হয় এবং বেশি বৃদ্ধি হলে নরকগমন হয়।

ভরত মুনি হরিণ-জন্মে যেরূপ সজাগ সতর্ক থাকতেন, তা মনুষ্য-জন্মেও খুব কম দেখা যায়। এইভাবে পুণ্য চিন্তা করতে করতে দেহত্যাগ করায় পরের জন্মে তিনি ব্রাহ্মণ বংশে জন্মগ্রহণ করেন এবং অন্তিম তপস্যা করে পরমগতি লাভ করেন। সেইরকম আবার যদি কেউ জীবনভর খারাপ কর্ম করে কিন্তু মৃত্যুকালে তার সুচিন্তা হয় তবে অন্তিম চিন্তন অনুসারে সে মনুষ্য-জন্ম পাবে কিন্তু কর্মের ফল অনুসারে তার জীবনে ভয়ংকর পরিস্থিতি আসবে। দেহে রোগ-ব্যাধির প্রকোপ থাকবে, জীবন-নির্বাহের জন্য অন্ন-জল, বস্ত্রাদি পেতেও তার খুব কষ্ট হবে।

ভগবান বলছেন—উর্ধ্বগতিতে সত্ত্বগুণের প্রাধান্য, রজোগুণের গৌণভাব এবং তমোগুণের অত্যন্ত গৌণভাব থাকে। মধ্যগতিতে (মনুষ্য জন্মে) রজোগুণের প্রাধান্য, সত্ত্বগুণের গৌণভাব এবং তমোগুণের অত্যন্ত গৌণভাব থাকে। আর অধোগতিতে তমোগুণের প্রাধান্য, রজোগুণের গৌণভাব এবং সত্ত্বগুণের অত্যন্ত গৌণভাব থাকে। তাৎপর্য হল এই যে, সত্ত্ব, রজঃ এবং তমঃ এই তিনটি গুণের প্রাধান্যতেও অপর গুণগুলি অধিক, মধ্যম ও অল্পমাত্রায় বজায় থাকে। এইভাবে গুণগুলিতে শত-সহস্র সূক্ষ্মভেদ থাকে এবং এর তারতম্য অনুযায়ী প্রত্যেক প্রাণীর পৃথক পৃথক স্বভাব হয়ে থাকে। তাই ভগবান বলেছেন—

ন তদস্তি পৃথিব্যাং বা দিবি দেবেষু বা পুনঃ।
সত্ত্বং প্রকৃতিজৈর্মুক্তং যদেভিঃ স্যাৎত্রিভির্গুণৈঃ॥ (গীতা ১৮।৪০)

পৃথিবীতে বা ব্যোমলোকে বা দেবতাদের মধ্যেও এমন কোনো সত্ত্বা (প্রাণী বা বস্তু) নেই, যা প্রকৃতি হতে উৎপন্ন এই তিন গুণরহিত।

অপরদিকে ভগবান সাত্ত্বিক, রাজসিক বা তামসিক কর্ম করলেও গুণাতীতই থাকেন যদিও আমরা তাঁর ত্রিগুণাতীতসত্ত্বা জানতে পারি না— **'মোহিতং নাভিজানাতি মামেভ্যঃ পরমব্যয়ম্'** (গীতা ৭।১৩)। সেইরকম গুণাতীত মহাপুরুষদের অন্তঃকরণে সাত্ত্বিক, রাজসিক বা তামসিক বৃত্তি এলেও তিনি গুণাতীতই থাকেন—তিনি **'ন দ্বেষ্টি সম্প্রবৃত্তানি ন নিবৃত্তানি কাঙ্ক্ষতি'** (গীতা ১৪।২২) অর্থাৎ কোনো কারণবশত

গুণাতীত ব্যক্তি প্রকাশ, প্রবৃত্তি ও মোহতে প্রবৃত্ত দৃষ্ট হলেও তাতে তাঁরা দ্বেষ করেন না বা নিবৃত্ত হলেও তা আকাঙ্ক্ষা করেন না। তাই ভগবানের উপাসনা করা এবং গুণাতীত মহাপুরুষদের সঙ্গ করা—এই দুটিই নির্গুণ হওয়ার আকাঙ্ক্ষী সাধককে গুণাতীত করে তোলে।

গুণাতীত অবস্থা—(শ্লোক ১৯-২০)

এতাবধি অষ্টাদশ শ্লোক পর্যন্ত প্রকৃতির গুণাবলীর পরিচয় দিয়ে পরবর্তী দুই শ্লোকে ভগবান ত্রিগুণের অতীত অনুভব করার কথা বর্ণনা করেছেন।

নান্যং গুণেভ্যঃ কর্তারং যদা দ্রষ্টানুপশ্যতি।
গুণেভ্যশ্চ পরং বেত্তি মদ্ভাবং সোঽধিগচ্ছতি॥
গুণানেতানতীত্য ত্রীন্ দেহী দেহসমুদ্ভবান্।
জন্মমৃত্যুজরাদুঃখৈর্বিমুক্তোঽমৃতমশ্নুতে ॥

(গীতা ১৪।১৯-২০)

'যখন বিচারশীল মানুষ তিনটি গুণ ব্যতিরেকে অন্য কাউকে কর্তা বলে দেখেন না এবং নিজেকে ত্রিগুণের অতীত বলে মনে করেন, তখন তিনি আমার স্বরূপ (ব্রহ্মভাব) প্রাপ্ত হন।

আর বিবেকশীল মানুষ দেহের উৎপত্তির কারণরূপ এই তিনটি গুণ অতিক্রম করে জন্ম, মৃত্যু, জরারূপ দুঃখ থেকে মুক্ত হয়ে অমরত্ব অনুভব করেন।' (গীতা ১৪।১৯-২০)

দেহকে উৎপন্নকারী হল গুণ আর স্বয়ং যে গুণের সঙ্গে সম্পর্ক মেনে নেয়, সেই অনুসারেই তাকে উচ্চ-নীচ যোনিতে জন্মগ্রহণ করতে হয়। কিন্তু বিবেকবান সাধক নিজেকে গুণাদি অর্থাৎ ক্রিয়া ও পদার্থ থেকে আলাদা বলে অনুভব করেন। আর ক্রিয়া ও পদার্থ থেকে ভিন্ন অনুভবকারীদের সম্পর্কে ভগবান বলছেন —'মদ্ভাবং সোঽধিগচ্ছতি' (গীতা ১৪।১৯) অর্থাৎ সেই ব্যক্তি আমার ভাব অর্থাৎ ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন।

ভগবান আবার বলেছেন—'জন্মমৃত্যুজরাদুঃখৈর্বিমুক্তোঽমৃতমশ্নুতে' অর্থাৎ সাধক যখন এই তিনটি গুণ অতিক্রম করেন, তখন তাঁর আর জন্ম-মৃত্যু-জরা অবস্থার দুঃখ পেতে হয় না।

ভগবান গীতায় বিভিন্নভাবে এই কথাটি বলেছেন—**'জরামরণমোক্ষায়'** (গীতা ৭।২৯), **'জন্মমৃত্যুজরাব্যাধিদুঃখদোষানুদর্শনম্'** (গীতা ১৩।৮) আর এখানে বলছেন **'জন্মমৃত্যুজরাদুঃখৈর্বিমুক্তঃ'** (গীতা ১৪।২০)—এই তিনটি স্থানে বাল্য এবং যুবাবস্থার কথা না বলে জরা বা বৃদ্ধাবস্থার কথা বলা হয়েছে কারণ শৈশবে এবং যুবাবস্থায় মানুষ বেশি দুঃখ অনুভব করে না কেননা শরীরে তখন বল (শক্তি) থাকে। বৃদ্ধাবস্থায় শরীরে শক্তি কমে যাওয়ায় মানুষ অধিক ক্লেশ অনুভব করে। আবার যখন মানুষ প্রাণত্যাগ করে তখনও সে ভীষণ দুঃখ অনুভব করে। কিন্তু যে ব্যক্তি এই তিনটি গুণকে অতিক্রম করে সে সর্বতোভাবে জন্ম, মৃত্যু এবং বৃদ্ধাবস্থার দুঃখ থেকে মুক্ত হয়ে থাকে। এই মনুষ্যদেহ থাকাকালীনই যার বোধ লাভ হয়, তার আর জন্মগ্রহণ করার কথাই আসে না তবে তা যে শরীরকে নিজের বলে বলা হয়, সেটির বৃদ্ধাবস্থা ও মৃত্যু তো আসবেই কিন্তু তার জন্য তাঁর কোনো দুঃখবোধ আসে না।

স্বরূপত আত্মা বা স্বয়ং হচ্ছে অমর আর এই বোধলাভই হল তত্ত্বজ্ঞান। কিন্তু মানুষ যখন নিজ বিবেককে উপেক্ষা করে মৃত্যুধর্মী শরীরের সঙ্গে একাত্ম হয়ে ওঠে তখন সে 'আমি শরীর' এই মনে করে। আর এই তাদাত্ম্যের ফলে সে স্বয়ং-এর অমরত্ব বিনাশশীল শরীরের ওপর চাপাতে চায় কিন্তু যখন দেখে সেটা সম্ভব নয়, তখন তার মৃত্যুভয় উপস্থিত হয়। তাই যতক্ষণ মৃত্যুভয় আছে বুঝতে হবে ততক্ষণ তত্ত্বজ্ঞান লাভ হয়নি। আবার যখন সে নিজ বিবেককে গুরুত্ব দিয়ে অনুভব করে যে **'আমি শরীর নই, শরীর নিত্য মৃত্যুপথ যাত্রী আর আমি স্বয়ং নিত্য অমর,** তখন সে নিজ অমরত্ব অনুভব করে আর তার মৃত্যুভয় দূর হয়। তাই সাধকের কর্তব্য হল এই বিকারকে, পরিবর্তনকে প্রাধান্য না দিয়ে তার নিজস্ব সত্ত্বা ও অমরত্বকে প্রাধান্য দেওয়া।

এই বিংশতি শ্লোকটি হল চতুর্দশ অধ্যায়ের সার।

———o———

দশম প্রশ্ন

চতুর্দশ অধ্যায়ের ১৯-২০ শ্লোকে ভগবান ত্রিগুণাতীত মানুষের মহিমা বর্ণনা করেছেন—গুণাতীত ব্যক্তি **'মদ্ভাবং সোহধিগচ্ছতি'** অর্থাৎ আমার স্বরূপ (ব্রহ্মভাব) প্রাপ্ত হন। আর তাঁদের কী হয়—**'জন্ম-মৃত্যু-জরা-দুঃখৈ-র্বিমুক্তোহমৃতমশ্নুতে'** অর্থাৎ তিনি জন্ম, মৃত্যু, জরা দুঃখরূপ ভয় থেকে মুক্ত হয়ে অমরত্ব অনুভব করেন। গুণাতীত সাধকের এই মহিমার কথা শুনে অর্জুন পরবর্তী প্রশ্ন করছেন—(শ্লোক ২১)

কৈর্লিঙ্গৈস্ত্রীন্ গুণানেতানতীতো ভবতি প্রভো।
কিমাচারঃ কথং চৈতাং স্ত্রীন্ গুণানতিবর্ততে।।

'হে প্রভু ! এই তিনটি গুণের অতীত মানুষকে কোন্ কোন্ লক্ষণ দ্বারা জানা যায় ? তাঁদের আচরণ কেমন হয় ? আর এই তিনটি গুণকে তাঁরা অতিক্রম করেন কীভাবে ?' (গীতা ১৪।২১)

গুণাতীত ব্যক্তির কথা চতুর্দশ অধ্যায়ে বাকি অংশে বর্ণনা করে, ভগবান ভক্তপ্রসঙ্গ বর্ণনা করতে করতে পঞ্চদশ অধ্যায়ে **ভক্তের অব্যভিচারী ভক্তি** ও ষোড়শ অধ্যায়ে **ভক্তের দৈবীভাব** এবং **অন্যদের আসুরী ভাব** বিস্তৃতরূপে বলেছেন।

অর্জুনের পরবর্তী প্রশ্ন না হওয়া পর্যন্ত ভগবান চতুর্দশ থেকে ষোড়শ অধ্যায়ে ভক্তপ্রসঙ্গ বর্ণনা করেছেন।

গুণাতীত সম্বন্ধে অর্জুনের প্রশ্নে তিনটি ভাগ আছে—

(১) গুণাতীত মানুষকে কোন্ কোন্ লক্ষণ দ্বারা জানা যায়।

(২) গুণাতীত মানুষের আচরণ কীরূপ হয়।

(৩) এই তিনটি গুণ কীভাবে অতিক্রম করা যায়।

চতুর্দশ অধ্যায়ের পরবর্তী ছয় শ্লোকে ভগবান এর উত্তর দিয়েছেন—

গুণাতীতের লক্ষণ—২২, ২৩

গুণাতীতের আচরণ—২৪, ২৫

গুণাতীত হওয়ার সাধনা—২৬, ২৭

গুণাতীতের লক্ষণ—(শ্লোক ২২-২৩)

ভগবান এই দুই শ্লোকে গুণাতীত পুরুষের তটস্থ ও নির্লিপ্ত অবস্থার কথা বর্ণনা করেছেন—

> **প্রকাশং চ প্রবৃত্তিং চ মোহমেব চ পাণ্ডব।**
> **ন দ্বেষ্টি সম্প্রবৃত্তানি ন নিবৃত্তানি কাঙ্ক্ষতি॥**
> **উদাসীনবদাসীনো গুণৈর্যো ন বিচাল্যতে।**
> **গুণা বর্তন্ত ইত্যেব যোঽবতিষ্ঠতি নেঙ্গতে॥**
>
> (গীতা ১৪।২২-২৩)

ভগবান বলছেন—'হে পাণ্ডব ! যদিও কখনো গুণাতীত ব্যক্তির প্রকাশ, প্রবৃত্তি ও মোহ এই গুণগুলি প্রকাশ পায়, তিনি এতে দ্বেষ করেন না বা এগুলি নিবৃত্ত হলে আবার হোক এই ইচ্ছে রাখেন না।

তিনি উদাসীনের মতো থাকেন এবং গুণাদির কার্য দ্বারা বিচলিত হন না। গুণই কার্য করে থাকে—এই ভাবে ভাবিত থেকে তিনি নিজ-স্বরূপে স্থিত থাকেন এবং স্বয়ং কোনো চেষ্টা করেন না।' (গীতা ১৪।২২-২৩)

গুণের বিভাগ—

সত্ত্বগুণ—এর স্বভাব হল প্রকাশ ও জ্ঞান। প্রকাশের অর্থ হল ইন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণের স্বচ্ছতা ও নির্মল ভাবের (বিবেকের) প্রকাশ।

রজগুণ—এর অনেক বৃত্তি ; যথা লোভ, ক্রিয়াশীলতা, আসক্তিপূর্বক কর্মারম্ভ, অশান্তি, স্পৃহা ইত্যাদি। কিন্তু মুখ্যবৃত্তি হল 'আসক্তি' ও 'ক্রিয়া'। এইস্থলে গুণাতীতের রজোগুণে প্রবৃত্তির অর্থ আসক্তিও নয় ক্রিয়াও নয়, ইহা হল 'নিষ্কাম ক্রিয়ার প্রবৃত্তি'।

তমগুণ—তমগুণেরও অনেক বৃত্তি, তার মধ্যে নিত্য-অনিত্য বিবেক বা কর্তব্য-অকর্তব্য বিচারবোধ না হওয়া এবং ব্যবহারিক ভুল হওয়া আছে। এই স্থলে গুণাতীতের তমগুণের অর্থ ব্যবহারিক ভুল।

গুণাতীত ব্যক্তির মধ্যে সত্ত্বগুণের প্রকাশ, রজগুণের নিষ্কাম কর্মের বৃত্তি ও তমগুণের ব্যবহারিক ভুল হতে পারে, কিন্তু তিনি **'ন দ্বেষ্টি সম্প্রবৃত্তানি ন নিবৃত্তানি কাঙ্ক্ষতি'**। অর্থাৎ তাঁর ভেতর সত্ত্ব, রজ ও তমগুণ — এইরূপ ভাবের উদয় হলেও তিনি এই বৃত্তিগুলি কেন উদয় হচ্ছে এই চিন্তা বা এই বৃত্তিগুলি যেন না থাকে এইরূপ দ্বেষ অথবা এই বৃত্তিগুলি ফিরে আসুক বা বজায় থাকুক এইরূপ অনুরাগ পোষণ করেন না।

গুণাতীত অর্থাৎ সিদ্ধ ব্যক্তি উপলব্ধি করেন যে, যে সমষ্টি শক্তিদ্বারা জগৎ সঞ্চালিত হয়, সেই শক্তিদ্বারাই শরীর, ইন্দ্রিয়াদি, মন, বুদ্ধি চালিত হয়। তাই যেমন জগতে সংঘটিত ক্রিয়াগুলির দোষগুণ দ্বারা আমরা প্রভাবিত হই না, সেইরকম শরীরাদির ক্রিয়াগুলির দোষগুণ দ্বারাও তিনি প্রভাবিত হন না। বৃত্তিসমূহের প্রকাশ অন্তঃকরণেরই (করণ-যন্ত্র অর্থাৎ জ্ঞানেন্দ্রিয়াদিতে) হয় নিজের (স্বয়ং-এর) নয়। তাই অন্তঃকরণের বৃত্তিসমূহ পরিবর্তিত হতে থাকলেও স্বরূপভাবে স্থিত গুণাতীত ব্যক্তি তাতে নির্লিপ্ত থাকেন। এইরূপ সিদ্ধদের মতন সাধকদেরও উচিত দেহধর্মকে নিজের বলে মনে না করা এবং ভালো বা মন্দ বলেও না মানা।

কিন্তু সাধকেরা অনেক সময়ই এই স্বতঃ সংঘটিত ক্রিয়াগুলির কয়েকটির কর্তা হয়ে বসেন এবং তার ফলে এদের সঙ্গে তাঁর অনুরাগ বা দ্বেষপূর্বক সম্পর্ক স্থাপিত হয় এবং এর অবশ্যম্ভাবী ফল তাকে ভুগতে হয়।

ভগবান গীতায় বিভিন্ন জীবের মধ্যে ক্রিয়ার প্রকাশ সম্পর্কে এইরূপ বলেছেন—

(১) *মূঢ় ব্যক্তি*—এরা অহংকারবশত জগতে স্বতঃ অনুষ্ঠিত ক্রিয়াকে নিজের দ্বারা অনুষ্ঠিত মনে করে এবং তার কর্তা ভাবে। **'অহঙ্কার বিমূঢ়াত্মা কর্তাহমিতি মন্যতে'** (গীতা ৩।২৭), ফলে তাকে এর ফল ভোগ করতে হয় কারণ যে কর্তা তাকেই ভোক্তা হতে হয়।

(২) *সাধক*—যাদের মধ্যে বিবেক-বুদ্ধির প্রাধান্য আছে, সেইসব সাধক মনে করেন **'নৈব কিঞ্চিৎ করোমি ইতি'** (গীতা ৫।৮)। অর্থাৎ আমি

কিছুই করি না। এবং **'গুণা গুণেষু বর্তন্তে ইতি মত্বা ন সজ্জতে'** (গীতা ২।২৮)। অর্থাৎ এই সকল কর্ম বা কর্মপ্রবৃত্তি প্রকৃতিজাত গুণের দ্বারাই সংঘটিত হয়। এই উপলব্ধির ফলে তাঁরা কোনো কর্মে আসক্ত হন না।

(৩) *সিদ্ধ*—গুণাতীত বা সিদ্ধমহাপুরুষ উপলব্ধি করেন **'যোঽবতিষ্ঠতে নেঙ্গতে'** (গীতা ১৪।২৩)। অর্থাৎ সেই চিন্ময় সত্তা সকল ক্রিয়াতে একই ভাবে পূর্ণ। মহাত্মাদের দৃষ্টি ক্রিয়ার দিকে থাকে না। তাঁরা উদাসীনের ন্যায় (অর্থাৎ সাক্ষীরূপে) জগৎ ও পরমাত্মা উভয়কেই অবলোকন করেন। **'ন বিচাল্যতে'**, **'অবতিষ্ঠতি'**, **'নেঙ্গতে'**—এসবের অর্থ একই অর্থাৎ তিনি বিচলিতও হন না বা কেউ তাঁকে বিচলিত করতেও পারে না।

গুণাতীতের আচরণ—(শ্লোক ২৪-২৫)

ভগবান পরবর্তী দুই শ্লোকে গুণাতীত মহাপুরুষদের আচরণের কথা বলেছেন।

সমদুঃখসুখঃ স্বস্থঃ সমলোষ্টাশ্মকাঞ্চনঃ।
তুল্যপ্রিয়াপ্রিয়ো ধীরস্তুল্যনিন্দাত্মসংস্তুতিঃ।।
মানাপমানয়োস্তুল্যস্তুল্যো মিত্রারিপক্ষয়োঃ।
সর্বারম্ভপরিত্যাগী গুণাতীতঃ স উচ্যতে।।

(গীতা ১৪।২৪-২৫)

'যে ধৈর্যশীল ব্যক্তি সুখদুঃখে সমভাবাপন্ন ও নিজস্বরূপে স্থিত, যিনি মাটির ঢেলা, পাহাড় ও সোনায় সমভাবাপন্ন, যিনি প্রিয়-অপ্রিয় বিষয়ে এবং নিন্দা-স্তুতিতে সমভাব রাখেন।

যিনি মান-অপমান ও শত্রু-মিত্রে সমভাব রাখেন, যিনি সর্ব কর্মারম্ভ পরিত্যাগ করেন, তিনিই গুণাতীত।' (গীতা ১৪।২৪-২৫)

এখানে ভগবান আটটি এমন পরিস্থিতির উল্লেখ করেছেন যাতে সাধারণ মানুষের বৈষম্য তো হয়ই, এমনকি সাধকদের মধ্যেও বিষমতা হতে পারে অর্থাৎ তারাও মাঝে-মধ্যে এমন পরিস্থিতিতে বিচলিত হন। 'অসমতা' (বিচলিত হওয়া) সম্বন্ধে নিম্নলিখিত কথা বলা হয়েছে।

সুখ—দুঃখ প্রিয়—অপ্রিয়
নিন্দা—প্রশংসা মান—অপমান

(১) পূর্ব কর্ম অনুযায়ী অনুকূল-প্রতিকূল অবস্থাকে বলে সুখ ও দুঃখ।

(২) বর্তমান ক্রিয়মান কর্মগুলির সিদ্ধি-অসিদ্ধি ফলপ্রাপ্তিতে আসে প্রিয়-অপ্রিয় ভাব এবং শরীর সম্বন্ধীয় দুটি ভাব হল নিন্দা-প্রশংসা এবং মান-অপমান।

(৩) গুণাতীত মহাপুরুষ এই সব দ্বন্দ্ব বা প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তিতে সমভাবে থাকেন। যেহেতু তাঁদের শরীর সম্বন্ধে একাত্মতা থাকে না তাই তারা এতে সমভাবে বিরাজ করেন। এখানে সমভাব বলতে পক্ষালম্বীদের প্রতি ন্যায় ও বিপক্ষের প্রতি উদার ভাব বজায় রাখা।

এছাড়াও গুণাতীত ব্যক্তি শত্রু-মিত্রে সম এবং মাটির ঢেলা, পাথর ও সোনায় কোনো বিভেদ রাখেন না।

গুণাতীত ব্যক্তি সকল প্রকার কর্মারম্ভ (উদ্যোগ) অর্থাৎ ধন-সম্পত্তি বা ভোগাদির জন্য কোনো প্রকার নতুন কর্মও আরম্ভ করেন না।

জ্ঞান হওয়া দোষের নয়, দোষ হল বিকারের। তাই গুণাতীত ব্যক্তি পার্থিব জিনিসের ব্যবহারিক দিক সম্বন্ধে সচেতন থাকলেও এগুলির প্রতি অনুরাগ বা দ্বেষ রাখেন না। এখানে উল্লেখ্য যে রাগ-দ্বেষ আদি বিকার জড়েও থাকে না, চেতনেও থাকে না ; ইহা কেবল দেহাভিমানীদেরই থাকে। আসলে দেহাভিমান বা বিকার মানুষ নির্বুদ্ধিতাবশতই মেনে নেয়। কিন্তু সাধক যখন বিচার-বিবেচনা করে নিজের মধ্যে এই বিকারের অনস্তিত্ব অনুভব করেন তখন তিনি আর কর্তা থাকেন না এবং ভোক্তারূপে সুখ-দুঃখও অনুভব করেন না। আসলে গুণাতীত মানুষের যে স্বতঃসিদ্ধ নির্বিকার ভাব তাতেই তাঁর স্বাভাবিক স্থিতি থাকে।

গুণাতীত হওয়ার সাধনা—(শ্লোক ২৬-২৭)

ভগবান পরের দুই শ্লোকে গুণাতীত হওয়ার উপায় বর্ণনা করেছেন।

মাঞ্চ যোঽব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবতে।
স গুণান্ সমতীত্যৈতান্ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে॥

ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহমমৃতস্যাব্যয়স্য চ।
শাশ্বতস্য চ ধর্মস্য সুখস্যৈকান্তিকস্য চ।।

(গীতা ১৪।২৬-২৭)

'যে ব্যক্তি ঐকান্তিক ভক্তিযোগের সাহায্যে ভগবানের উপাসনা করেন, তিনি এইসকল গুণ অতিক্রম করে ব্রহ্মপ্রাপ্তির যোগ্য হয়ে ওঠেন।

যেহেতু ব্রহ্ম, অবিনাশী, অমৃত, সনাতন ধর্ম এবং ঐকান্তিক সুখ সকলেরই আশ্রয় তিনি — তাই তাঁর প্রতি অব্যভিচারী ভক্তিই গুণাতীত হওয়ার একমাত্র উপায়।' (গীতা ১৪।২৬-২৭)

এখানে অব্যভিচারেণ ভক্তির অর্থ হল, ভগবান ব্যতীত অন্য কারোর ওপর ভরসা না রাখা। জাগতিক সহায়তা তো দূরের কথা, জ্ঞানযোগ, কর্মযোগাদিতেও ভরসা না করে কেবল 'ভক্তিযোগেন' অর্থাৎ ভগবানের প্রতিই আশা, বিশ্বাস রাখা ও তাঁকেই ভরসা করা।

এ প্রসঙ্গে অম্বরীষ, গজেন্দ্র, দ্রৌপদী, উত্তরাদি ভক্তগণের জীবনী আদর্শ হওয়া উচিত।

পুনঃ ভক্তির বর্ণনা
(পঞ্চদশ অধ্যায়)

চতুর্দশ অধ্যায়ের ২২-২৭ শ্লোকে গুণাতীত মহাপুরুষদের লক্ষণ ও আচরণ বর্ণনা করে ভগবান বলছেন এই ত্রিগুণের অতীত হওয়ার অন্যতম উপায় হল অব্যভিচারী ভক্তি এবং এই অব্যভিচারী ভক্তিলাভের উপায়ই ভগবান সমগ্র পঞ্চদশ অধ্যায়ব্যাপী বর্ণনা করেছেন।

জগৎ-সংসারের বৃক্ষরূপে বর্ণনা	১-৫
জীবাত্মা-বর্ণনা—	৭-১১
পরমাত্মা—বিভূতি বর্ণনা	৬, ১২-১৫
পরমাত্মার স্বরূপ	১৬-২০

জগৎ-সংসারের বৃক্ষরূপে বর্ণনা (শ্লোক ১-৫)

ঊর্ধ্বমূলমধঃশাখমশ্বত্থং প্রাহুরব্যয়ম্।
ছন্দাংসি যস্য পর্ণানি যস্তং বেদ স বেদবিৎ।।

অধশ্চোর্ধ্বং প্রসৃতাস্তস্য শাখা গুণপ্রবৃদ্ধা বিষয়প্রবালাঃ।
অধশ্চ মূলান্যনুসন্ততানি কর্মানুবন্ধীনি মনুষ্যলোকে॥
ন রূপমস্যেহ তথোপলভ্যতে নান্তো ন চাদির্ন চ সম্প্রতিষ্ঠা।
অশ্বত্থমেনং সুবিরূঢ়মূলমসঙ্গশস্ত্রেন দৃঢ়েন ছিত্ত্বা॥
ততঃ পদং তৎ পরিমার্গিতব্যং যস্মিন্ গতা ন নিবর্তন্তি ভূয়ঃ।
তমেব চাদ্যং পুরুষং প্রপদ্যে যতঃ প্রবৃত্তিঃ প্রসৃতা পুরাণী॥
নির্মানমোহা জিতসঙ্গদোষা অধ্যাত্মনিত্যা বিনিবৃত্তকামাঃ।
দ্বন্দ্বৈর্বিমুক্তাঃ সুখদুঃখসংজ্ঞৈর্গচ্ছন্ত্যমূঢ়াঃ পদমব্যয়ং তৎ॥

(গীতা ১৫। ১-৫)

'জগৎরূপী অশ্বত্থবৃক্ষের মূল ঊর্ধ্বে এবং শাখাগুলি নিম্নে। বেদ এর পত্রসমূহ এবং একে যিনি জানেন তিনি বেদবিৎ।

এই জগৎ-বৃক্ষের পল্লববিশিষ্ট শাখাগুলি হচ্ছে বিষয়স্বরূপ এবং তা নীচে, মধ্যে ও ঊর্ধ্বে সর্বত্র বিস্তৃত। এই মনুষ্যলোকে কর্ম অনুসারেই বন্ধন হয় এবং তার ফলে জীব ঊর্ধ্ব ও নিম্নলোকে গমন করে।

এই সংসার বৃক্ষের আদি, অন্ত বা স্থিতি কিছুই নেই কিন্তু তা বিচার দ্বারা উপলব্ধ হয় না। কিন্তু অসঙ্গরূপ (বা অনাসক্তিরূপ) শস্ত্রদ্বারা এই জগৎ-সংসাররূপ অশ্বত্থবৃক্ষকে ছেদন করলে পরমাত্মার পরমপদ—

যাঁর দ্বারা অনাদিকাল থেকে এই সৃষ্টি বিস্তারলাভ করেছে এবং যাঁকে প্রাপ্ত হলে মানুষ আর ইহজগতে ফিরে আসে না তাঁকে লাভ করা যায়। 'আমি সেই আদিপুরুষের শরণ গ্রহণ করি' বলে তাঁকে অন্বেষণ করতে হয়।

তাঁকে কারা লাভ করেন—যাঁরা অভিমান ও মোহবর্জিত হয়েছেন, যাঁরা আসক্তিজনিত দোষগুলি জয় করেছেন, যাঁরা নিত্য পরমাত্মাতে প্রতিষ্ঠিত, যাঁরা কামনারহিত এবং যাঁরা সুখ-দুঃখরূপ দ্বন্দ্ব হতে মুক্ত—এইরূপ উচ্চাবস্থাপন্ন সাধকেরাই তাঁকে লাভ করেন।' (গীতা ১৫।১-৫)

সংসার-বৃক্ষের রহস্য বর্ণনা—(শ্লোক ১, ২)

জগৎ-সংসার বর্ণনা প্রসঙ্গে ভগবানের বিস্তৃত ব্যাখ্যা এইরূপ—

উর্ধ্বমূলম্—এই সংসার-বৃক্ষের মূল উর্ধ্বে অবস্থিত এবং তিনিই পরমাত্মা অর্থাৎ ভগবান।

অধঃশাখম্—মূলের পরেই জগৎবৃক্ষের প্রধান শাখা হচ্ছে কাণ্ড যা ব্রহ্মা। এই ব্রহ্মলোক (ব্রহ্মার লোক) স্থান, গুণ, পদ ও পরমায়ু সব দিক থেকে পরমধামের চেয়ে ন্যূন হওয়ায় এটিকে (অধঃ) নীচের দিকে বলা হয়েছে।

অশ্বত্থম্—ইহা জগৎ সংসারের স্বরূপ। ভগবান দশম অধ্যায়ে বলেছেন —**'অশ্বত্থঃ সর্ববৃক্ষাণাম্'** অর্থাৎ বৃক্ষদের মধ্যে আমি অশ্বত্থ, তাই পূজনীয়। পরমাত্মা হতে জগৎ উৎপন্ন এবং তিনিই এর নিমিত্ত কারণ এবং উপাদান কারণ। আর এই জগৎ-সংসাররূপ বৃক্ষের পূজা হল, এর থেকে সুখ পাওয়ার আশা ত্যাগ করে শুধুমাত্র এর সেবা করা। যাঁরা সংসারকে এই ভাবে দেখেন তাঁদের কাছে এই জগৎ-সংসার সাক্ষাৎ ভগবৎস্বরূপ—**'বাসুদেবঃ সর্বম্'** (গীতা ৭।১৯) রূপে প্রতীয়মান হয়। আর যারা জগৎ-সংসার থেকে সুখ পাওয়ার ইচ্ছা করেন তাদের কাছে জগৎ দুঃখের আকার হয় এবং মানুষ জন্ম-মৃত্যুর চক্রে আবর্তিত হতে থাকে।[১]

প্রাহুরব্যয়ম্—এই অশ্বত্থরূপী সংসার-বৃক্ষকে অব্যয় অর্থাৎ অবিনাশীও বলা হয় কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা (অব্যয়) নয়। ইহার মূল সর্বশক্তিমান পরমেশ্বর নিত্য ও অবিনাশী হওয়ায়, ইহার আদি ও অন্ত না জানায় এবং ইহার প্রবাহের নিত্যতার জন্য ইহাকে অব্যয় বলে। ইহা যেরূপ ভাষিত হয় তেমন উপলব্ধি হয় না। কারণ এই সংসারচক্র এত বেগে পরিবর্তিত হয় যে চলচ্চিত্রের ন্যায় অনবরত গতিশীল হয়েও পর্দায় স্থির চিত্রের মতো প্রতীয়মান হয়।

ছন্দাংসি যস্য পর্ণানি—এখানে বলা হয়েছে বেদের ছন্দগুলিই সংসার-

---

[১]আবার অশ্বত্থ অর্থে—**'শ্ব পর্যন্তং ন তিষ্ঠতীতি অশ্বত্থঃ'** মানে যা আগামীকাল পর্যন্তও স্থির থাকে না বা যা নিত্য পরিবর্তিত হয় এইরূপ ব্যাখ্যাও হয়।

বৃক্ষের পাতা। আসলে বেদের প্রকৃত তত্ত্ব হল পরমাত্মাকে লাভ করা—**'সর্বে বেদা যৎ পদমামনন্তি'** (ক. উ. ১। ২। ১৫) অর্থাৎ সমস্ত বেদ পরমাত্মার পরমপদই বারবার প্রতিপাদন করে। তবে বেদে সকাম ও জ্ঞানমার্গ—উভয়ের জন্যই সাধন প্রণালী বর্ণিত হয়েছে। বেদের একলক্ষ মন্ত্রের মধ্যে সকাম সাধনের মন্ত্রগুলির সংখ্যা আশি হাজার ও মুক্তিপ্রদানকারী মন্ত্রগুলির সংখ্যা কুড়ি হাজার। এর মধ্যে আবার চার হাজার মন্ত্র জ্ঞানকাণ্ডের ও ষোলো হাজার মন্ত্র উপাসনা কাণ্ডের অন্তর্গত। এখানে সকাম মন্ত্রগুলিকে বৃক্ষের পত্ররূপে বলা হয়েছে। পত্র যেমন বৃক্ষ থেকে উৎপন্ন হয় এবং বৃক্ষকে সুন্দর করে রক্ষা করে, বৃদ্ধি করে ও দৃঢ় করে সেইরকম বেদবিহিত সকাম কর্ম দ্বারা সংসারের রক্ষা ও বৃদ্ধি হয়। তাই বেদকে সংসার বৃক্ষের পত্র বলা হয়েছে। বেদবিহিত পুণ্যকর্মও সকামভাবে করলে যদিও তা নিষিদ্ধ কর্ম থেকে শ্রেষ্ঠ কিন্তু তার থেকে মুক্তিলাভ করা যায় না। পুণ্যকর্ম ফলভোগের পর ক্ষয়প্রাপ্ত হয় (**ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্যলোকং বিশন্তি**—গীতা ৯।২১) এবং তাকে পুনরায় জগতে ফিরে আসতে হয় (**গতাগতং কামকামা লভন্তে**—গীতা ৯।২১)। তাই বেদবর্ণিত সকাম কর্ম করলে বারংবার জন্ম-মৃত্যু হয় এবং তাতে সংসার-বৃক্ষ দৃঢ় হয়। ভগবান বলতে চেয়েছেন যে, সকাম-কর্মানুষ্ঠান রূপ পত্রাদিতে আকৃষ্ট না হয়ে, জগৎ-বৃক্ষের মূল পরমাত্মারই আশ্রয় গ্রহণ করা উচিত। পরমাত্মাতে আশ্রয় গ্রহণ করলেই বেদের প্রকৃত তত্ত্ব অবগত হওয়া যায়। জীবের সঙ্গে পরমাত্মার এই যে নিত্য সম্পর্ক যিনি জানেন তাঁকেই **'বেদবিৎ'** বলা হয়েছে।

প্রথম শ্লোকে উল্লিখিত **'উর্ধ্বমূলম্'**-এর অর্থ পরমাত্মা অর্থাৎ জগৎ-সংসারের রচয়িতা ও মূল আধার। পরের শ্লোকে উক্ত **'অধশ্চোর্ধ্বং প্রসৃতাঃ'**-এর অর্থ হচ্ছে—**'উর্ধ্ব'** অর্থাৎ উচ্চতর শাখা বা ব্রহ্মলোক, **'অধঃ'** মানে নিম্নতর শাখা বা নরক এবং চ মানে মনুষ্যলোক। এই সকল শাখার মধ্যে মনুষ্যযোনিরূপ শাখাই হচ্ছে মূল শাখা এবং ইহাই কেবল 'কর্মযোনি'। অন্য সব শাখাই 'ভোগযোনি' অর্থাৎ অন্যান্য যোনিতে কেবল পূর্বকৃত কর্মের ভোগই হয়ে থাকে, নতুন কর্মসৃষ্টি বা কর্মবন্ধন থেকে মুক্তি

হয় না। তাই দ্বিতীয় শ্লোকে ভগবান বলছেন—

'অধশ্চ মূলান্যনুসন্ততানি কর্মানুবন্ধীনি মনুষ্যলোকে'

অর্থাৎ মনুষ্যলোকের কর্ম অনুসারেই জীব বন্ধনে আবদ্ধ হয়। আর এই কর্ম বন্ধন অনুসারেই উর্ধ্ব ও অধঃলোক লাভ হয়। এখানে মূলানি শব্দের অর্থ তাদাত্ম্য, মমত্ববোধ ও কামনারূপে জগৎ-সংসারের প্রতি আসক্তি।

তাদাত্ম্য—অর্থ 'আমি এই শরীর' মেনে নেওয়া।

মমত্ববোধ—শরীরাদি পদার্থকে নিজের মনে করা।

কামনা—পুত্রৈষণা, বিত্তৈষণা ও লোকৈষণা।

মনুষ্যজন্মতেই নতুন কর্ম করার অধিকার থাকায় মানুষ কেবল নীচে (অধঃলোক) বা উপরে উঠতে পারে, শুধু তাই নয়—সে সংসার-বৃক্ষ ছেদন করে সবচেয়ে উর্ধ্বলোক (পরমাত্মা পর্যন্ত) গমন করতে সক্ষম হয়।

গুণপ্রবৃদ্ধা বিষয়প্রবালাঃ—শাখা থেকে যেমন কোমল মুকুল বেরিয়ে নতুন পত্র, ফুলাদির সৃষ্টি করে, সেইরকম কামনার স্ফূরণও ঘনীভূত হলে, মানুষ এই গুণদ্বারা বিভিন্ন বিষয়ে আসক্ত হয়। তার এই স্বভাবজাত আসক্তি, সংস্কাররূপে তার অন্তরে সঞ্চিত হয় এবং তা ভোগের জন্য তার ভবিষ্যৎ জন্ম-মৃত্যুর কারণ হয় এবং সংসারে আসক্তি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। এই বিষয়গুলির নিজস্ব কোনো সৌন্দর্য বা আকর্ষণ নাই কিন্তু স্বভাবজাত গুণের জন্য তাতে সৌন্দর্য ও আকর্ষণ প্রতিভাত হয়।

'দোষেণ তীব্রো বিষয়ঃ কৃষ্ণসর্পবিষাদপি।
বিষং নিহন্তি ভোক্তারং দ্রষ্টারং চক্ষুষাপ্যয়ম্ ।।' (বিবেকচূড়ামণি ৭৯)

বিষয়-দোষ কৃষ্ণসর্পের বিষ হতে তীব্র। কারণ বিষ ভক্ষণ করলে তবেই ভক্ষণকারীর মৃত্যু হয়, কিন্তু বিষয়ভোগী কেবল চক্ষু দিয়ে আস্বাদন করলেও তারা এর থেকে রেহাই পায় না।

মানুষ যখন পরিণামের দিকে দৃষ্টি না দিয়ে কেবল ভোগের দিকে দৃষ্টি রাখে, তাকে পশু বললেও পশুর নিন্দা করা হয়। কারণ পশুরা নিজ নিজ কর্মফল ভোগ করে মনুষ্য জন্মের দিকে অগ্রসর হচ্ছে আর মানুষ নিষিদ্ধভাবে

ভোগে লিপ্ত হয়ে পশুযোনির দিকে অগ্রসর হচ্ছে।

সংসার-বৃক্ষ ত্যাগের উপায় (শ্লোক ৩,৪)—

প্রথম দুই শ্লোকে সংসার-বৃক্ষের রহস্য বর্ণনা করে পরবর্তী দুই শ্লোকে ভগবান এর থেকে নিবৃত্তির উপায় বর্ণনা করেছেন। সংসার-বৃক্ষ থেকে নিজেকে মুক্ত করার উপায় হল সংসারে অনাসক্তি ও বৈরাগ্য।

বৈরাগ্যের অনেক শ্রেণীবিভাগ আছে—

বিষয়-বৈরাগ্য—প্রথমে আকর্ষণ অর্থ, গৃহ ও ভূসম্পত্তিতে হয়। আবার এইগুলি ত্যাগ করলে যদি 'আমি ত্যাগী' এই অভিমান আসে তবে সেটিও বৈরাগ্য নয়। যখন চিত্তে জড় পদার্থের কোনো গুরুত্ব বা আকর্ষণ থাকে না তখনই তাকে বিষয়-বৈরাগ্য বলে।

স্বজন-বৈরাগ্য—সকলেরই নিজ পিতা, মাতা, স্ত্রী, পুত্র ও পরিবারের প্রতি আকর্ষণ থাকে। কিন্তু তাদের সঙ্গে কিছু পাওয়ার সম্পর্ক না রেখে কেবল তাদের সেবা করার জন্য, তাদের সুখী করার জন্য সম্পর্কিত হলে তাকে বলে স্বজন-বৈরাগ্য।

কায়-বৈরাগ্য—প্রকৃত বৈরাগ্য হল শরীরে অনাসক্তি। শরীরের প্রতি একাত্মতার কারণ হল— (১) শরীরের জন্য কামনা, (২) শরীরের প্রতি মমতা ও (৩) তাদাত্ম্যের সূক্ষ্মভাব। মানুষ নানাভাবে অর্থ উপার্জন করে শারীরিক সুখের জন্য, কিন্তু শরীর ত্যাগের সঙ্গে সঙ্গেই পাপের দ্বারা অর্জিত অর্থের ইতি হয় কিন্তু অর্থপ্রাপ্তির যে ভাব অন্তঃকরণে আশ্রয় করে—পুণ্য বা পাপ যাই হোক না কেন তা সংস্কাররূপে আত্মার সঙ্গেই যায়।

ধনানি ভূমৌ পশবশ্চ গোষ্ঠে নারী গৃহদ্বারি সুতাঃ শ্মশানে।
দেহশ্চিতায়াং পরলোকমার্গে ধর্মানুগো গচ্ছন্তি জীব একঃ॥

অর্থাৎ শরীর ত্যাগের সময় অর্থ সিন্দুকে পড়ে থাকে, পশুগুলি (বাহনাদি) গোষ্ঠে থাকে, স্ত্রী গৃহদ্বার অবধি সঙ্গ দেয়, পুত্র শ্মশান অবধি যায় এবং শরীর চিতা অবধি সঙ্গ দেয়, কিন্তু পরলোক পথে ধর্মই একমাত্র সঙ্গী।

কামনা—শরীরের জন্য কামনা দূর করার উপায় হল বিষয়-বৈরাগ্য ও স্বজন-বৈরাগ্য। কিন্তু সাধকদের এব্যাপারে দৃঢ় নিশ্চয় হতে হবে যে

উপরোক্ত কামনা দূর করতে গিয়ে যেন মান, প্রতিষ্ঠা, আসক্তি ইত্যাদি না পেয়ে বসে। আসলে এগুলি দূর না করলে সত্যকার কামনা দূর হয় না।

মমত্ব—শরীরের প্রতি মমত্ববোধ তখনই যায় যখন বিবেকবোধ (নিত্য-অনিত্য বিবেক) জাগ্রত হয়।

তাদাত্মার সূক্ষ্মভাব— ভগবৎপ্রেম প্রাপ্ত হলেই সূক্ষ্ম অহংবোধ সর্বতোভাবে নাশ হয়। প্রকৃত বৈরাগ্য হলে অন্তরের সমস্ত বাসনাই নাশ হয়। তখন নিজ শরীরের প্রতি কোনো আসক্তিই থাকে না, কেবল মনে হয়—

সর্বে ভবন্তু সুখিনঃ সর্বে সন্তু নিরাময়াঃ।
সর্বে ভদ্রাণি পশ্যন্তু মা কশ্চিদ্ দুঃখভাগ্ ভবেৎ॥

অর্থাৎ সকলে সুখী থাক, নিরোগ থাক, সকলের কল্যাণ হোক, কারো যেন কোনো কষ্ট না হয়।

বৈরাগ্য লাভের উপায়—

১) শরীর ও সংসার থেকে আমি ও আমার ভাব ত্যাগ।

২) সাংসারিক সুখের (ভোগের ও সম্পদ গ্রহণের ইচ্ছা) আশা সর্বতোভাবে ত্যাগ।

৩) শরীরের জন্য জগৎ থেকে কোনো প্রাপ্তির আশা না করে, শরীর এবং জগৎ থেকে পাওয়া সমগ্র পদার্থ যেন জগতের সেবায় নিয়োজিত করা হয়।

৪) শাস্ত্রবিহিত নিজ নিজ কর্তব্য-কর্মগুলি তৎপরতার সঙ্গে পালন করা।

৫) আমি ভগবানের ও ভগবান আমার—এইরূপ বাস্তব সত্যকে দৃঢ়ভাবে পোষণ করা।

সাধকদের মধ্যে অবশ্য অনেক সময় দৃঢ় ধারণা থাকে যে, উদ্যোগ করলেই যেমন জাগতিক পদার্থগুলি পাওয়া যায়, সেরকম ধ্যান-ধারণা করলেই চিত্ত শুদ্ধি হয় এবং তার ফলে পরমাত্মা প্রাপ্তি সম্ভব। আসলে কিন্তু নিত্যস্থিত পরমাত্মার প্রাপ্তি কোনো বিনাশশীল কর্মের দ্বারা হয় না। সাধন দ্বারা শুধু অসাধনের (অর্থাৎ সংসারে একাত্মতা, মমতা ও পরমাত্মাতে

বিমুখতা) নাশ হয়। তাই সাধনের তাৎপর্য হল অসাধন দূর করা আর যদি অসাধন দূর করাই সত্য অভিপ্রায় থাকে তবে পরমাত্মাই কৃপা করে অসাধন দূর করার শক্তি দেন। আর সম্পর্ক ছেদ হলেই যে তত্ত্ব সদা বিরাজিত, নিত্যপ্রাপ্ত তা অনুভূত হয় বা তার স্মৃতি জাগরিত হয়। তাই শ্রীকৃষ্ণের কাছ থেকে ভগবদ্‌গীতা শোনার পর অর্জুন বলছেন **'স্মৃতির্লব্ধা'** অর্থাৎ পরমাত্মার স্মৃতি ফিরে পেয়েছি। আর এই যে শরীর ও সংসারকে নিজের (স্বয়ং) থেকে পৃথকভাবে জানা বা সংসারের উপর আসক্তি ত্যাগ, তাকেই বলা হয়েছে **'অসঙ্গ শস্ত্রেণ দৃঢ়েন ছিত্ত্বা'**।

ভাগবতের দশমস্কন্ধে ব্রহ্মাও কৃষ্ণস্তুতিতে বলছেন—

'অন্তর্ভবেঽনন্ত ভবন্তমেব হ্যতৎ ত্যজন্তো মৃগয়ন্তি সন্তঃ'

(ভাগবত ১০।১৪।২৮)

অর্থাৎ এ সংসারে বিবেকবান আপনাকে ছাড়া সংসারের অন্য সমস্ত বস্তুকেই অসার বোধে পরিত্যাগ করে, কেবল আপনার অনুসন্ধানেই রত থাকেন।

সাংসারিক বস্তু ত্যাগই পরমাত্মা অন্বেষণের প্রথম সোপান। তাই শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে ভক্তপ্রবর শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ বলছেন—

'কৃষ্ণভুলি সেই জীব অনাদি বহির্মুখ।
সে কারণে মায়া তারে দেয় সংসার দুখ॥
কভু স্বর্গে উঠায় কভু নরকে চুবায়।
দণ্ড্যজনে রাজা যেন নদীতে চুবায়॥'

চতুর্থ শ্লোকের শেষে ভগবান বলছেন—

'তমেব চাদ্যং পুরুষং প্রপদ্যে'

অর্থাৎ আমি সেই আদি পুরুষ ভগবানের শরণ গ্রহণ করি বলে তাঁর অন্বেষণ করতে হয়।

সংসার হতে সম্পর্ক ছেদন হলে সাধক স্বরূপে স্থিতিলাভ করেন এবং জন্মকর্ম বন্ধন হতে মুক্ত হন। কিন্তু সাধক মুক্ত হলে এবং তাঁর সাংসারিক বাসনা মিটলেও প্রেমের ক্ষুধা মেটে না। ব্রহ্মসূত্রে তাই

বলেছে—'**মুক্তোপসৃপ্যব্যপদেশাৎ**' (ব্রহ্মসূত্র ১।৩।২)। সেই প্রেমস্বরূপ ভগবান মুক্তপুরুষদেরও প্রাপ্তব্য। স্বরূপে থাকে '**অখণ্ড আনন্দ**' ও ভগবানে থাকে '**অনন্ত আনন্দ**'। যিনি মুক্তিতে বাঁধা পড়েন না, তাতে সন্তুষ্ট হন না, তিনিই প্রতিমুহূর্তে বর্ধমানরূপী প্রেমলাভ করেন।

পঞ্চম শ্লোকে ভগবান সেইসব মহাপুরুষদের কথা বলেছেন যাঁরা আদিপুরুষ পরমাত্মার শরণাগত হয়ে তাঁর পরমপদ প্রাপ্ত হন।

সেই মহাপুরুষদের লক্ষণ হল—

নির্মানমোহাঃ—অভিমান ও মোহবর্জিত অর্থাৎ 'আমি' ও 'আমার' ভাব বিবর্জিত। মহাপুরুষদের শুধু ভগবানের সঙ্গে সম্পর্ক থাকায় তাঁদের শরীরে আমি-আমার ভাব থাকে না। তাঁদের মধ্যে কোনো সাংসারিক আসক্তি এবং শরীরের প্রতি কোনো মোহ না থাকায় তাঁদের মান-সম্মানের ইচ্ছাও থাকে না বা দেহের আদর-আপ্যায়নেও খুশি হন না।

জিতসঙ্গদোষাঃ—ভগবানের প্রতি আকর্ষণকে বলে প্রেম আর সংসারের প্রতি আকর্ষণকে বলে আসক্তি। ভগবদ্‌পরায়ণ ভক্তদের সাংসারিক ভোগে আসক্তি না থাকায় ততোদ্ভূত মমতা ইত্যাদি দোষগুলিও তাঁদের মধ্যে থাকে না।

ভক্তি জ্ঞানযোগ বা কর্মযোগের অন্তর্গত নয় কিন্তু জ্ঞানযোগ ও কর্মযোগ উভয়ই ভক্তির অন্তর্গত। ভগবান তাই দশম অধ্যায়েও বলেছেন—

তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্বকম্।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে।। (গীতা ১০।১০)

'সর্বদা আমাতে আসক্তচিত্ত এবং আমাতে প্রেমপূর্বক ভজনাকারী ভক্তদের আমিই তত্ত্বজ্ঞানরূপ যোগ প্রদান করি, যাতে তাঁরা আমায় লাভ করেন।'

মহাপুরুষদের লক্ষণ সম্পর্কিত এই শ্লোকে '**আধ্যাত্মনিত্যাঃ**' (পরমাত্মায় নিত্যপ্রতিষ্ঠিত) পদ জ্ঞানযোগের ও '**বিনিবৃত্তকামাঃ**' (কামনা রহিত) পদ কর্মযোগের সূচক।

অধ্যাত্মনিত্যাঃ অর্থাৎ শুধুমাত্র ভগবানের শরণাগত ভক্তেরই

অহংবোধ পরিবর্তিত হয় । আর অহংবোধ পরিবর্তিত হওয়ায় সাধকের স্থিতি শুধুমাত্র ভগবানেই থাকে ; কেননা মানুষের অহংবোধ যেমন হয় তার স্থিতিও সেইরূপ হয়।

বিনিবৃত্তকামাঃ—সংসারই যদি ধ্যেয় বা লক্ষ্য হয় তবে কামনার সৃষ্টি হয়। কিন্তু যেসকল ভক্তের সাংসারিক বস্তু লাভের উদ্দেশ্য থাকে না, তাঁরা সর্বকামনা রহিত হন। তাঁদেরই **'বিনিবৃত্তকামাঃ'** বলা হয়েছে।

দ্বন্দ্বৈর্বিমুক্তাঃ সুখদুঃখসংজ্ঞৈঃ—ভক্ত মহাপুরুষরা অনুকূল-প্রতিকূল পরিস্থিতিকে ভগবদ্ প্রেরিত প্রসাদ বলে মনে করেন। তাঁদের দৃষ্টি থাকে ভগবৎকৃপার দিকে, অনুকূল-প্রতিকূল পরিস্থিতির দিকে নয়। তাই তাঁরা সুখ-দুঃখ, হর্ষ-বিষাদ ইত্যাদি দ্বন্দ্বরহিত হন।

গচ্ছন্তি অমূঢ়াঃ পদম্ অব্যয়ম্ তৎ—মূঢ় মানুষের কাছে সর্বত্র 'সংসার আছে' বলে প্রতীয়মান হয় এবং জ্ঞানী ভক্ত (মোহবর্জিত বলে) সর্বত্র 'পরমাত্মা আছেন' বলে স্পষ্ট অনুভব করেন।

জগৎ-সংসারকে স্থায়ী বলে মনে করাই মূঢ়তা (মোহ) এবং যাঁর এই মূঢ়তা দূর হয়েছে তিনি 'অমূঢ়' এবং কেবল তাঁর পক্ষেই ভগবানের পরমপদ পাওয়া সম্ভব। প্রকৃতপক্ষে মানুষমাত্রেরই পরমপদ স্বতঃই প্রাপ্ত কিন্তু সেদিকে দৃষ্টি না থাকায় তার অনুভূতি হয় না। যেমন রেলগাড়িতে যাওয়ার সময় গাড়ি কোনো স্টেশনে থামলে এবং পাশে অন্য গাড়ি চললে ভ্রমবশত নিজের গাড়িটি চলছে মনে হয়, কিন্তু চলন্ত গাড়ির থেকে চোখ তুলে স্টেশনের দিকে তাকালে বোঝা যায় আমি স্থির আছি। সেইরকম সংসার থেকে দৃষ্টি তুলে (সম্পর্ক সরিয়ে নিলে) স্বরূপের দিকে রাখলে বোঝা যায় আমি সংসার নই এবং স্বরূপে একই ভাবে বিরাজমান।

জীবাত্মার বর্ণনা—(শ্লোক ৭-১১)

ভগবান পঞ্চদশ অধ্যায়ের প্রথম পাঁচটি শ্লোকে জগৎ-সংসার বর্ণনা করার পর পরবর্তী পাঁচটি শ্লোকে (শ্লোক ৭-১১) জীবাত্মার বর্ণনা করেছেন।

জীবাত্মার অবস্থান—৭

জীবাত্মার নিষ্ক্রমণ—৮-১০

জীবাত্মার পরমাত্মা লাভ—১১

মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ।
মনঃষষ্ঠানীন্দ্রিয়াণি প্রকৃতিস্থানি কর্ষতি॥
শরীরং যদবাপ্নোতি যচ্চাপ্যুৎক্রামতীশ্বরঃ।
গৃহীত্বৈতানি সংযাতি বায়ুর্গন্ধানিবাশয়াৎ॥
শ্রোত্রং চক্ষুঃ স্পর্শনঞ্চ রসনং ঘ্রাণমেব চ।
অধিষ্ঠায় মনশ্চায়ং বিষয়ানুপসেবতে॥
উৎক্রামন্তং স্থিতং বাপি ভুঞ্জানং বা গুণান্বিতম্।
বিমূঢ়া নানুপশ্যন্তি পশ্যন্তি জ্ঞানচক্ষুষঃ॥
যতন্তো যোগিনশ্চৈনং পশ্যন্ত্যাত্মন্যবস্থিতম্।
যতন্তোঽপ্যকৃতাত্মানো নৈনং পশ্যন্ত্যচেতসঃ॥

(গীতা ১৫।৭-১১)

'এই জগতে আমারই সনাতন অংশ জীবরূপে অবস্থিত। কিন্তু এই জীব মন ও ইন্দ্রিয়াদিকে আকর্ষণ করে নিজের বলে মেনে নেয়।

বায়ু যেমন গন্ধের স্থান থেকে গন্ধ গ্রহণ করে নিয়ে যায়, তেমনি শরীরের অধিপতি জীবাত্মাও শরীর ত্যাগ করে অন্য দেহের আশ্রয়কালে মন সহ ইন্দ্রিয়াদিকে (অর্থাৎ তাদের সংস্কার) সঙ্গে নিয়ে যায়।

এই জীবাত্মা মনকে আশ্রয় করে এবং কর্ণ, চক্ষু, ত্বক, জিহ্বা ও নাসিকা—এই পঞ্চইন্দ্রিয়ের সাহায্যে বিষয়কে উপভোগ করে।

জীবাত্মা কীভাবে শরীরে অবস্থান করে, কীভাবে শরীর পরিত্যাগ করে আর কীভাবেই বা গুণসংযুক্ত হয়ে বিষয়াদি উপভোগ করে তা অজ্ঞ ব্যক্তিদের অজ্ঞাত। জ্ঞানরূপ নেত্রের সাহায্যে জ্ঞানীরাই তা জানতে পারেন।

যত্নশীল যোগিগণ আপনাতে অবস্থিত এই পরমাত্মতত্ত্ব অনুভব করেন, কিন্তু যাঁরা নিজের চিত্তশুদ্ধি করেননি এইরূপ মানুষ বিশেষ যত্নশীল হলেও ইহাকে অনুভব করতে পারে না।' (গীতা ১৫।৭-১১)

জীবাত্মার অবস্থান—(শ্লোক ৭)

ভগবান জীবাত্মাকে নিজের অংশ বলে ঘোষণা করেছেন। তবে জীবাত্মা এই জীবলোকে (অর্থাৎ ত্রিলোক সমন্বিত চতুর্দশ ভুবনে) জীবভূত হয়ে যায় অর্থাৎ ব্যষ্টি শরীরের (শরীর, ইন্দ্রিয়, প্রাণ, মন ইত্যাদির) সঙ্গে একাত্ম হয়ে যায়। জগতের একটি ছোট্ট অংশ হল শরীর আর পরমাত্মার অংশ হল জীবাত্মা (স্বয়ং)। জীবাত্মার ভুল হয় যে সে শরীরকে নিজের বলে মনে করে ও তাকেই পরমাত্মার সঙ্গে মেলাতে চায়। **এই ভুল দূর করাই হল সাধকের কাজ।**

কাজটা কী ? না জাগতিক বস্তুকে (শরীরসহ) জগৎকে দেওয়া (সেবায় নিয়োজিত করা) আর পরমাত্মার বস্তুকে (জীবাত্মা বা স্বয়ংকে) পরমাত্মায় সমর্পণ করা (অর্থাৎ তাঁর ইচ্ছা অনুযায়ী চলা)। এই হচ্ছে সততা, এরই নাম মুক্তি। আর এর বিপরীত করা অর্থাৎ জাগতিক বস্তু গ্রহণ করা (ভোগ করা) আর পরমাত্মার বস্তু তাঁকে না দেওয়া (ভগবদ্‌বৈমুখ্যতা) হচ্ছে কপটতা, এর নাম বন্ধন। মানুষ যে গৃহ, যে পরিজন, যে অর্থকে নিজের বলে মনে করে তার ওপরেই তার আসক্তি থাকে। কিন্তু পৃথিবীতে কোটি কোটি গৃহ আছে, অনেক মানুষ আছে, ব্যাঙ্কে টাকাও আছে কিন্তু যেহেতু সেগুলো নিজের নয় তাই সেগুলোকে নিয়ে সে চিন্তা করে না। তার মানে সেগুলো থেকে সে মুক্ত, তার বন্ধন কেবল অল্প কিছু জিনিসের প্রতি তার আসক্তির জন্য। আসুরী ভাবাপন্ন লোকেরা আবার সমস্ত জিনিসই আকাঙ্ক্ষা করে তাই তারা সবেতেই আসক্ত। জাগতিক বস্তু কিছুই স্থায়ী নয় কিন্তু তাদের সঙ্গে সম্পর্ক পাতালে তার সংস্কার জন্ম-জন্মান্তরেও স্থায়ী হয়।

সম্পর্ক ছিন্ন করার উপায় হল—

কর্মযোগ—শরীরকে সংসারের সেবায় অর্পণ করা।

মানুষ যদি কুকর্মরহিত হয় তবে সে সংসারের জন্য উপযুক্ত হয় আর যদি শরীরকে জগতের অংশ বলে বোধ করে তবে তার নিজ শরীর সম্বন্ধীয় হিত ভাবনা, সকল শরীর সম্বন্ধে হিত ভাবনায় পরিণত হয়। ইহা কর্মযোগের ফলে লাভ হয়।

জ্ঞানযোগ—নিজেকে (স্বয়ং বা জীবাত্মাকে) শরীর ও সংসার থেকে বিচারপূর্বক সর্বতোভাবে পৃথক হওয়া। যদি সকল শরীর সম্বন্ধে নির্লিপ্তভাব থাকে তবে নিজের শরীর সম্বন্ধেও নির্লিপ্তভাব উদয় হয়। ইহা জ্ঞানযোগ সাধনের ফল।

ভক্তিযোগ—নিজেকে ভগবানে সমর্পণ করা।

বদ্ধ অবস্থায় **জীব** মন ও ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে পঞ্চমহাভূতকে নিম্নে বর্ণিত উপায়ে ভোগ করে।

পঞ্চমহাভূত	জ্ঞানেন্দ্রিয় (সত্ত্ব)	কর্মেন্দ্রিয় (রজ)	বিষয় (তম)
ক্ষিতি (পৃথিবী)	ঘ্রাণ	গুহ্য	গন্ধ
অপ (জল)	রসনা	উপস্থ	রস
তেজ (অগ্নি)	নেত্র	পদ	রূপ
মরু (বায়ু)	ত্বক	হস্ত	স্পর্শ
ব্যোম (আকাশ)	শ্রোত্র	বাক্	শব্দ
সমগ্র	মন ও বুদ্ধি	প্রাণ	শরীর

এর মধ্যে শ্রবণেন্দ্রিয়র শক্তি প্রভূত। শ্রবণেন্দ্রিয় দ্বারা দুই প্রকার জ্ঞান হয়—(১) পরোক্ষ বিষয়ের জ্ঞান ও (২) অপরোক্ষ শব্দের জ্ঞান।

শ্রবণের মহিমা অপার। জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগ—উভয়েতেই শ্রবণের স্থানই প্রধান। যদিও নেত্রাদির সাহায্যে শাস্ত্র অবলোকন হয় এবং শাস্ত্র অধ্যয়ন করলে পরোক্ষ বিষয়ের জ্ঞান জন্মায়, তাহলেও ইহা শব্দের লিখিতরূপ হওয়ায় ইহা শব্দেরই শক্তি। শাস্ত্রজ্ঞান বা বিদ্যা অধ্যয়নও গুরুর মুখে শুনলেই তা সর্বাপেক্ষা বেশি ফলপ্রসূ হয়। শব্দে অচিন্ত্য শক্তি থাকে যা শুধু শ্রবণেন্দ্রিয় শুনতে সক্ষম কিন্তু অন্য ইন্দ্রিয়গুলি নয়।

তবে ইন্দ্রিয়গুলির ক্ষমতা যতই থাকুক জীবাত্মা কিন্তু মনের সংযোগেই জ্ঞানেন্দ্রিয় দ্বারা বিষয়সুখ অনুভব করে। আর বিষয়াদি সুখ উপভোগ শুরু হলে স্বরূপের প্রাধান্য কমে যায় আর জগৎ-সংসারের প্রাধান্য বৃদ্ধি পায়। তাই সহস্র বর্ষ বিষয়-সুখ উপভোগের পর রাজা যযাতি পুত্র পুরুকে বলছেন—

ন যাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি।
হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্ধতে॥

(ভাগবত ৯।১৯।১৪, মনুস্মৃতি ২।৯৪)

'বিষয়াদি উপভোগের দ্বারা (নিষ্কাম ভাবে ভোগ নয়) কামনা কখনো শান্ত হয় না। যেমন অগ্নিতে ঘৃতাহুতি দিলে অগ্নি জ্বলে ওঠে, সেইরকম ভোগ্যপদার্থ কামনা সহকারে ভোগ করলে ভোগবাসনাও বৃদ্ধি পেতে থাকে।'

তাই যযাতি পুত্রকে পুনঃ যৌবন প্রদান করে আর জরা গ্রহণ করে বানপ্রস্থ প্রস্থানের সময় বলছেন—

যৎ পৃথিব্যাং ব্রীহিয়বং হিরণ্যং পশবঃ স্ত্রীয়ঃ।
একস্যাপি ন পর্যাপ্তং তস্মাৎ তৃষ্ণাং পরিত্যজেৎ॥

(বিষ্ণুপুরাণ ৪।১০।২৪, মহাভারত আদিপর্ব ৮৫।১৩)

'অর্থাৎ এই পৃথিবীর সমস্ত ধন, ধান্য, যত উত্তম বস্তু, যত পশু, যত সুন্দরী নারী আছে, সবই যদি একজন ব্যক্তি একসঙ্গে পেয়ে যায় তাহলেও তিনি তাতে তৃপ্তিলাভ করেন না, তাঁর আরও বাসনা থেকে যায়।'

জীবাত্মার নিষ্ক্রমণ (শ্লোক ৮-১০)

জীবাত্মা যখন একদেহ পরিত্যাগ করে, তখন সে তার আগের শরীরের সংস্কারজনিত অতৃপ্ত ভোগবাসনা নিয়ে নতুন শরীর গ্রহণ করে এবং পুনঃ ভোগে আসক্ত হয়। এইভাবে জীবাত্মা বিষয়াসক্ত হওয়ার ফলে বারংবার উচ্চ-নীচ যোনিতে জন্মগ্রহণ করতে বাধ্য হয়। অষ্টম শ্লোকে ভগবান বলেছেন **'বায়ুর্গন্ধানিবাশয়াৎ'**—

এখানে বায়ু—জীবাত্মা
গন্ধ—মন, ইন্দ্রিয়, বাসনা আদি
আশয়—স্থূল শরীর

বায়ু যেমন আতরদান (আশয়) থেকে গন্ধ বহন করে নিয়ে যায় এবং আতরদান খালি পড়ে থাকে, সেইরকম জীবাত্মাও শরীর ত্যাগ করে অন্য শরীর গ্রহণের সময় সূক্ষ্ম-শরীর (মন, বুদ্ধি আদি) ও কারণ-শরীর গ্রহণ

করে নিয়ে যায় এবং স্থূল-শরীর পড়ে থাকে। জীবাত্মা ঈশ্বরের অংশ হলেও সংসারে আসক্ত হলে তার তিনটি ভুল হয়।

(১) নিজেকে মন, বুদ্ধি ও পদার্থ ইত্যাদি জড়পদার্থের প্রভু বলে মনে করে থাকে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সে তার দাস হয়ে যায়।

(২) নিজেকে প্রভু বলে মনে করায় নিজের প্রকৃত প্রভু পরমাত্মাকে ভুলে যায়।

(৩) জড় পদার্থের সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগে স্বাধীন হলেও সে সেগুলিকে ত্যাগ করতে চায় না।

জীবাত্মার জড়পদার্থের সঙ্গে সংযোগ ত্যাগ তখনই সম্ভব যখন সে বুঝতে পারে জড়পদার্থের মালিক হওয়ার চেষ্টা করলে তারই দাস ও বন্ধনে আবদ্ধ হতে হবে। যার কর্তৃত্ব বা অধিকারবোধ প্রবল সে মানুষের, বস্তুর বা পদের প্রভু হতে গিয়ে নিজের প্রভুকে ভুলে যায়। যেমন বালক প্রতিদিন মাকে নিজের বলে আঁকড়ে থাকতে চায়। কিন্তু যখনই নিজেকে স্ত্রী-পুত্রের প্রভু বলে মনে করে তখন মায়ের সঙ্গ তার আর ভালো লাগে না। প্রভু অর্থাৎ নিজেকে কর্তা মনে করার এই হল বিষম পরিণাম। কর্তা হওয়ার ইচ্ছাশক্তি নিরুদ্ধ করাই হল মানুষের আসল কর্তব্য।

জীব মনুষ্যদেহ লাভে দুটি শক্তি লাভ করে—

(১) প্রাণশক্তি বা জীবনীশক্তি—যার দ্বারা নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস হয়।

(২) ইচ্ছাশক্তি—যার দ্বারা ভোগাকাঙ্ক্ষা জন্মায়।

মানুষের প্রাণশক্তি কর্মফল দ্বারা প্রাপ্ত তাই তা অপরিবর্তনীয়। আর ইচ্ছাশক্তি পুরুষকার তাই তা পরিবর্তনসাধ্য। প্রাণশক্তি নিত্যক্ষয়প্রাপ্ত হতে থাকে এবং প্রাণশক্তি ফুরিয়ে যাওয়াকেই বলে মৃত্যু। প্রাণশক্তি বজায় থাকতে থাকতেই যদি ইচ্ছাশক্তি (বা জড়ের প্রতি আসক্তি বা ভোগাকাঙ্ক্ষা) দূর হয় তবে তাঁকে জীবন্মুক্ত বলে। আর যদি প্রাণশক্তি শেষ হলেও ইচ্ছা শক্তি বজায় থাকে তবে মানুষ বারংবার জন্মগ্রহণ করতে বাধ্য হয়। নবজন্ম হলে তার নতুন শরীরে পুরানো ইচ্ছাশক্তি সংস্কাররূপে বজায় থাকে কিন্তু প্রাণশক্তি নূতন করে লাভ হয়। তাই প্রাণশক্তি থাকতে থাকতেই

নিঃস্বার্থভাবে সকল প্রাণীর সেবা করা কর্তব্য, তাহলে আকাঙ্ক্ষাগুলি (অর্থাৎ ইচ্ছাশক্তি) দূর হয়। এই যে ভোগের আকাঙ্ক্ষা, তা জীবের প্রাক্তন সংস্কার বা ইচ্ছাশক্তির দ্বারা হলেও ভোগের নিবৃত্তি স্বতঃই হয় কিন্তু তার ফল হয় সুদূরপ্রসারী। যেমন ধূমপানকারী ইচ্ছেমতন ধূমপান করলে ধোঁয়া স্বতঃই নির্গত হয় কিন্তু তার অভ্যাস খারাপ করে দেয় আর সে ধূমপানে সুখ অনুভব করতে থাকে তার ফলে ধূমপান না করে থাকতে পারে না। সেইরকম জাগতিক বস্তু ভোগ করলে ভোগ্যবস্তু পড়ে থাকে না কিন্তু জীবের বাসনা সৃষ্টি হওয়ায় তার সংস্কার খারাপ হয়ে যায়। এই বাসনার সংস্কারের জন্যই জীব শরীরের সঙ্গে সম্পর্ক না থাকলেও তার সঙ্গে সম্পর্ক পাতিয়ে তার দ্বারা সুখ অনুভব করার ইচ্ছা প্রকাশ করে অবশেষে তার পরাধীনতা স্বীকার করে।

ভগবান নবম ও দশম শ্লোকে আটটি ক্রিয়ার কথা বলেছেন—শোনা, দেখা, স্পর্শ করা, স্বাদগ্রহণ করা, ঘ্রাণ নেওয়া, মনের সাহায্যে বিষয় উপভোগ করা, শরীর পরিত্যাগ করা, শরীরে অবস্থান করা। জীবাত্মা যেহেতু এই সকল বিকার থেকে সর্বতোভাবে নিবৃত্ত থাকে তাই জ্ঞানী ব্যক্তিরা স্বরূপকে গুণাদিরহিত ভাবেই দেখেন।

কিন্তু বদ্ধজীবগণ আসক্তগ্রস্ত (মোহগ্রস্ত) হওয়ায় দেহকে নিজের বলে মনে করে এবং তার থেকে ভোগাস্বাদনের আশা করে, তার ফলে শরীরের প্রতি আমি ভাবের (তাদাত্মতার) নিমিত্ত কর্মজনিত এই সব বিকার স্বয়ং-এর বলেই প্রতীত হয়। জীব আকাঙ্ক্ষা ও ভোগবাসনার ফলে বন্ধনে আবদ্ধ হয়। জড়ের অধীনতা স্বীকার করাকে বলে ব্যভিচার আর মানুষ যখন সুখ প্রাপ্তির আশা বা রসগ্রহণের ইচ্ছা পরিত্যাগ করে তখনই তার ব্যভিচার দোষ দূর হয় এবং ভগবানে প্রিয়বোধ স্বতঃই জাগ্রত হয়। তখন শুধু ক্রমবর্ধমান প্রেমই থাকে আর জীবের অন্তিম লক্ষ্যই হল এই প্রেমলাভ। এইরূপ প্রেমিক ভক্তকেই ভগবানও শ্রেষ্ঠ যোগী বলে বলেছেন—

যোগিনামপি সর্বেষাং মদ্‌গতেনান্তরাত্মনা।
শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং মে যুক্ততমো মতঃ॥ (গীতা ৬।৪৭)

সকল যোগীর মধ্যে যিনি শ্রদ্ধাবান ও মদ্‌গতচিত্তে আমাকে নিরন্তর

ভজনা করেন, তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ যোগী, এই আমার মত।

জীবাত্মার পরমাত্মা লাভ—(শ্লোক ১১)

এই পর্বের শেষ শ্লোকে জীবাত্মার পরমাত্মা লাভ প্রসঙ্গে ভগবান বলেছেন—

যতন্তো যোগিনশ্চৈনং পশ্যন্ত্যাত্মন্যবস্থিতম্।
যতন্তোঽপ্যকৃতাত্মানো নৈনং পশ্যন্ত্যচেতসঃ॥

(গীতা ১৫।১১)

এখানে ভগবান বলছেন 'যত্নপরায়ণ ব্যক্তি যদি জ্ঞানী (যোগিনঃ) হন তবে তিনি পরমাত্মতত্ত্ব অনুভব করতে পারেন কিন্তু অবিবেকী (মূঢ় ব্যক্তি অর্থাৎ যারা জড়ত্বের সঙ্গে সম্পর্ক রাখেন) যত্নশীল হলেও তাদের পক্ষে ওই আত্মতত্ত্ব সুদূরপরাহত।'

এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে দেহ, মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়াদি, তত্ত্ব প্রাপ্তির প্রাথমিক সহায়ক হলেও যদি চিত্তে জাগতিক পদার্থের গুরুত্ব থাকে তবে চেষ্টা করলেও পরমাত্মতত্ত্ব প্রাপ্ত হওয়া যায় না। সাধকদের সবচেয়ে বড় ভুল যে তাঁরা যে রীতিতে জগৎকে জানেন সেই রীতিতে পরমাত্মাকেও জানতে চান। জগৎ এবং পরমাত্মা—উভয়কে জানার রীতি বা নিয়ম কিন্তু একে অপরটি থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন।

জগৎকে জানার জন্য ইন্দ্রিয়াদি, মন, বুদ্ধি ইত্যাদির সাহায্য লাগে, কিন্তু পরমাত্মাকে মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়াদির দ্বারা জানা সম্ভব নয় বরং ইহাদের কার্যত সম্বন্ধ পরিত্যাগ করলেই তত্ত্বজ্ঞান স্বতঃই লাভ হয়।

তাই এখানে 'যতন্তো' অর্থাৎ সাধনপরায়ণ অর্থটি দুবার ব্যবহার করা হয়েছে। প্রথম সাধনপরায়ণ বলা হয়েছে যারা **'যোগিনঃ'** (সাংখ্যযোগী) অর্থাৎ বিবেকবান বা সদসৎ জ্ঞানসম্পন্ন (শরীরকে নিজের মনে করে মমতাবোধ রাখেন না বা নিজেকে শরীর মনে করে অহংবোধ করেন না)। এই প্রকার যোগী আপনাতে পরমাত্মার স্বাভাবিক স্থিতি অনুভব করেন।

'তমাত্মস্থং যেঽনুপশ্যন্তি ধীরাস্তেষাং সুখং শাশ্বতং নেতরেষাম্।'

(কঠ উ. ২।২।১৩, শ্বেতাশ্বেতর উ. ৬।১২)

আপনাতে আপনি অবস্থিত পরমাত্মাকে যে জ্ঞানী ব্যক্তি নিজের মধ্যে দর্শন করেন, তিনি নিত্যবিরাজমান সুখ অনুভব করেন, অন্যরা নয়। বাইরের যা কিছু দেখুন না কেন তখন মনে হয় এত সুখ, এত শান্তি, শান্তির পারাবার এত অসীম।

এখানে দ্বিতীয়বার **'যতন্তো'** (যত্নবান বা সাধনপরায়ণ) বলা হয়েছে যারা **'অকৃতাত্মনা'** (অশুদ্ধচিত্ত) এবং **'অচেতসঃ'** (অবিবেকী) তাদের সম্বন্ধে। তারা ভগবৎতত্ত্ব লাভ করে না—কারণ জড়ত্বের আশ্রয় থাকলে চিন্ময়তত্ত্ব অনুভব করা যায় না। উপনিষদ বলছেন—

'নৈব বাচা ন মনসা প্রাপ্তুং শক্যো ন চক্ষুষা।' (কঠ উ. ২।৩।১২)

এই পরমাত্মাকে কোনো বাক্য, মন বা নেত্রের সাহায্যে প্রাপ্ত করা সম্ভব নয়।

তাহলে **'বিজ্ঞাতারমরে কেন বিজানীয়াৎ'** (বৃ. আ. ২।৪।১৪)

যাঁর দ্বারা সব কিছু প্রকাশিত তাঁকে কীভাবে জানা যায়।

কঠ উপনিষদে যম-নচিকেতা সংবাদে এই প্রসঙ্গে যমরাজ নচিকেতাকে বলেছেন—

নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনুং স্বাম্॥
(মুণ্ডক ৩।২।৩, ক. উ. ১।২।২৩)

উত্তমরূপে বেদাধ্যায়ন, তীক্ষ্ণবুদ্ধি অথবা বহুজনের নিকট শ্রবণ করেও তাঁকে লাভ করা যায় না, কিন্তু এই আত্মা যাঁকে যোগ্য বলে বরণ করেন তারই নিকট তিনি স্বরূপ ও মহিমা প্রকাশ করেন।

পরমাত্মা কাকে যোগ্য মনে করেন ? উপনিষদের পরের শ্লোকে বলা হয়েছে—

নাবিরতো দুশ্চরিতান্নাশান্তো নাসমাহিতঃ।
নাশান্তমানসো বাপি প্রজ্ঞানেনৈনমাপ্নুয়াৎ॥ (ক. উ. ১।২।২৪)

যে ব্যক্তি দুষ্কার্য হতে বিরত নয়, জড় সংসারে প্রতি আসক্তবশত যিনি ইন্দ্রিয়পরায়ণ, যিনি চঞ্চলচিত্ত, ফলাকাঙ্ক্ষাবশত যার মন সদা অশান্ত তাকে পরমাত্মা বরণ করেন না। দিব্য ভাগবত জ্ঞান লাভের জন্য নিজেকে প্রস্তুত

করতে হবে, আত্মাকে পরমাত্মার নিকট সম্পূর্ণভাবে সমর্পণ করতে হবে। এইরূপে যার মন, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়-সংযত, সংস্কৃত ও নির্মল এবং জড়-সংসার আসক্তি থেকে মুক্ত, পরমাত্মা তারই হৃদয় জ্ঞানে, প্রেমে ও পবিত্রতায় মণ্ডিত করে দেন। তাঁর পার্থিব জীবন পুরো পরিবর্তিত হয়ে যায় এবং তিনি দিব্য ভাগবত জীবন লাভ করেন।

পরমাত্মার বিভূতি বর্ণনা (শ্লোক ৬,১২-১৫)

যেমন ছোট প্রভাব দূর করার জন্য বড় প্রভাবের কথা জানা প্রয়োজন, সেইরকম জীবের ওপর জড়-সংসারের প্রভাব দূর করার জন্য ভগবানের প্রভাব (বা বিভূতি) জানা অত্যন্ত প্রয়োজন। ব্যবসায়ীর যেমন অর্থপ্রাপ্তি উদ্দেশ্য থাকায় সমস্ত ক্রয়-বিক্রয়াদিতে বা ব্যবসা সম্পর্কিত ক্রিয়ায় অর্থই দেখে থাকে, সেইরকম পরমাত্মতত্ত্ব জিজ্ঞাসু ব্যক্তিরও পরমাত্মা প্রাপ্তি উদ্দেশ্য থাকায়, প্রত্যেক বস্তু বা ক্রিয়াতে পরমাত্মাই দৃষ্ট হন।

ভগবান তাই সমগ্র গীতায় তাঁর মোট ১৯৪টি বিভূতির বর্ণনা করেছেন।

সপ্তম অধ্যায়—৮ম-১২শ শ্লোকে প্রধান প্রধান পদার্থে কারণরূপে **১৭টি** বিভূতি।

'রসোঽহমপ্সু কৌন্তেয়......... তেষু তে ময়ি'। (গীতা ৭।৮-১২)

নবম অধ্যায়—১৬শ-১৯শ শ্লোকে ক্রিয়া, ভাব, পদার্থ ইত্যাদিতে কার্য-কারণরূপে **৩৭টি** বিভূতি।

'অহং ক্রতুরহং...........নিধানং বীজমব্যয়ম্'।

দশম অধ্যায়—বিভূতিযোগে **১২৭টি সামগ্রিক বিভূতির** বর্ণনা করেছেন।

৪র্থ ও ৫ম শ্লোকে প্রাণীদের মধ্যে নিহিত ২০টি ভগবৎ বিভূতি।

৬ষ্ঠ শ্লোকে ঋষিদের মধ্যে নিহিত ২৫টি ভগবৎ বিভূতি।

২০শ-৩৯তম শ্লোকে ৮২টি প্রধান ভগবৎ বিভূতি।

পঞ্চদশ অধ্যায়—৬ষ্ঠ এবং ১২শ-১৫শ শ্লোকে তাঁর প্রভাব জানাবার জন্য **১৩টি** বিভূতি।

পরমাত্মা ইন্দ্রিয়াতীত (শ্লোক ৬)

ষষ্ঠ শ্লোকে ভগবান বলছেন—

ন তদ্ভাসয়তে সূর্যো ন শশাঙ্কো ন পাবকঃ।

যদ্ গত্বা ন নিবর্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম॥ (গীতা ১৫।৬)

'জাগতিক সকল বস্তু যথা সূর্য (দেবতা হিসেবে নয়, প্রকাশকারী পদার্থ হিসেবে), চন্দ্র বা অগ্নিও তাঁকে প্রকাশ করতে পারে না। আর তাঁর পরমধাম প্রাপ্ত হলে এই জন্ম-মৃত্যুরূপ জড়-সংসার ফিরে আসে না।' (গীতা ১৫।৬)

উপনিষদেও তাই বলে—

ন তত্র সূর্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকং

নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ।

তমেব ভান্তমনুভাতি সর্বং

তস্য ভাসা সর্বমিদং বিভাতি॥

(ক. উ. ২।২।১৫, মু. ২।২।১০, শ্বে. ৬।১৪)

'ব্রহ্ম সন্নিধানে সূর্য দীপ্তি পায় না, চন্দ্রতারকাও দীপ্তি পায় না, বিদ্যুৎও দীপ্তি পায় না তবে অল্প দীপ্তিমান অগ্নি কীরূপে দীপ্তি পাবে?' এ সকল দীপ্যমান বস্তু তাঁর দীপ্তিতেই দীপ্তিমান।

আসল বক্তব্য এই যে আমাদের প্রাকৃত ইন্দ্রিয়-মন-বুদ্ধির ব্রহ্মকে প্রকাশ করার শক্তি তো নেই-ই বরং ইন্দ্রিয়াদির বিক্ষোভ মালিন্য দূর হলে অর্থাৎ সাধকের ইন্দ্রিয়াসক্তিরূপ সমস্ত অন্তরায় অপগত হলে, সাধকের হৃদয়ে ব্রহ্ম স্বতঃই প্রকাশিত হন। এখানে পরমধাম কথাটি পরমাত্মার ধাম ও পরমাত্মা উভয়ই নির্দেশ করে।

পরমপদ লাভ করলে জড়-সংসারে ফিরে না আসার কথা (অপুনরাবৃত্তি) জ্ঞানমার্গ ও ভক্তিমার্গ উভয়তেই বলা হয়েছে—

জ্ঞানমার্গ—**তদ্বুদ্ধয়স্তদাত্মানস্তন্নিষ্ঠাস্তৎপরায়ণাঃ ।**

গচ্ছন্ত্যপুনরাবৃত্তিং জ্ঞাননির্ধূতকল্মষাঃ॥ (গীতা ৫।১৭)

যাঁদের মন, বুদ্ধি তাঁহাতে স্থিত এবং যাঁরা পরমাত্মায় একত্বরূপে

অবস্থান করেন, তাঁরা জ্ঞান দ্বারা অর্থাৎ বিবেকপূর্বক সংসারে অনাসক্ত থেকে পাপবর্জিত হয়ে অপুনরাবৃত্তি অর্থাৎ পরমগতি প্রাপ্ত হন।'

ভক্তিমার্গ—'যং প্রাপ্য ন নিবর্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম' (গীতা ৮।২১)

'ততঃ পদং তৎ পরিমার্গিতব্যং যস্মিন্ গত্বা ন নিবর্তন্তি ভূয়ঃ' (গীতা ১৫।৪)

'যদ্গত্বা ন নিবর্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম' (গীতা ১৫।৬)

জ্ঞানমার্গে পরমাত্মা প্রাপ্তিতে জন্ম-মৃত্যু নিরোধ হয় আর ভক্তিমার্গে পরমধাম প্রাপ্তিতে প্রেমের বিশেষ আস্বাদন হয়। সাধক অবস্থায় সাধনার উচ্চ গতিতে সূক্ষ্ম অহংবোধ থাকতে পারে, কিন্তু মুক্তিলাভের পর সাধনায় প্রতিমুহূর্তে প্রেম বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় আর অহং সর্বতোভাবে দূর হয়।

পরমাত্মার বিভূতি—(শ্লোক ১২-১৫)

পঞ্চদশ অধ্যায়ের ১২শ-১৫শ শ্লোকে ভগবান তাঁর তেরোটি বিভূতির বর্ণনা করেছেন তার মধ্যে প্রথম তিনটি শ্লোকে ছয়টি বিভূতি আর ১৫শ শ্লোকে ৭টি বিভূতির কথা বলেছেন।

যদাদিত্যগতং তেজো জগদ্ভাসয়তেঽখিলম্।
যচ্চন্দ্রমসি যচ্চাগ্নৌ তত্তেজো বিদ্ধি মামকম্॥
গামাবিশ্য চ ভূতানি ধারয়াম্যহমোজসা।
পুষ্ণামি চৌষধীঃ সর্বাঃ সোমো ভূত্বা রসাত্মকঃ॥
অহং বৈশ্বানরো ভূত্বা প্রাণিনাং দেহমাশ্রিতঃ।
প্রাণাপানসমাযুক্তঃ পচাম্যন্নং চতুর্বিধম্॥

(গীতা ১৫।১২-১৪)

'সূর্যকে আশ্রয় করে যে তেজ সমস্ত জগৎ উদ্ভাসিত করে এবং যে তেজ চন্দ্র ও অগ্নিতে আছে, সেই তেজ আমারই বলে জানবে।

আমি পৃথিবীতে অনুপ্রবেশ করে নিজ শক্তির সাহায্যে সমস্ত প্রাণীকে ধারণ করি এবং আমিই রসযুক্ত চন্দ্ররূপে ঔষধি(বনস্পতি)সমূহকে পরিপুষ্ট করি।

প্রাণীগণের শরীরে অবস্থিত আমি প্রাণ ও অপান বায়ুর সঙ্গে মিলিত

হয়ে বৈশ্বানর (জঠরাগ্নি) রূপে চতুর্বিধ অন্ন পরিপাক করি।' (গীতা ১৫।১২-১৪)

ভগবান বলছেন—

১. সূর্যে অবস্থিত তেজ

২. চন্দ্রস্থিত তেজ

৩. অগ্নিস্থ তেজ (অর্থাৎ নেত্র, মন ও বাক্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা)

৪. পৃথিবীর ধারণ শক্তি

৫. চন্দ্রের পোষণ শক্তি এবং

৬. দশটি প্রাণবায়ুর সঙ্গে মিলিত হয়ে বৈশ্বানর অগ্নিরূপে চতুর্বিধ অন্ন পরিপাক ক্রিয়া—সবই পরমাত্মার শক্তিদ্বারা হয়।

দ্যৌঃ সচন্দ্রার্কনক্ষত্রা খং দিশো ভূর্মহোদধিঃ।
বাসুদেবস্য বীর্যেন বিধৃতানি মহাত্মনঃ॥

(মহাভারত, অনুশাসনপর্ব ১৪৯।১৩৪)

'স্বর্গ, সূর্য, চন্দ্র, নক্ষত্রখচিত আকাশ, দশদিক, পৃথিবী এবং মহাসাগর সবই বাসুদেবের শক্তিদ্বারা বিধৃত।'

আর বৈশ্বানর অগ্নি সম্বন্ধে বৃহদারণ্যক উপনিষদ বলছে—

অয়মগ্নির্বৈশ্বানরো যোঽয়মন্তঃ পুরুষে
যেনেদং অন্নং পচ্যতে যদিদম্ অদ্যতে। (বৃ. উ. ৫।৯।১)

'দেহের অভ্যন্তরে যে অগ্নি বিরাজ করে, তাকে বলা হয় জঠরাগ্নি, ইনিই বৈশ্বানর, ইনি ব্রহ্ম।' আমরা যে অন্ন গ্রহণ করি এই অগ্নিই তাকে জীর্ণ করে। অবিচ্ছিন্ন সমুদ্র গর্জনের ন্যায় ইনি শরীরের অভ্যন্তরে অনবরত ধ্বনিত হচ্ছেন। বাইরের শব্দ থেকে কানকে ঢেকে রাখলে যে ধ্বনি বা শব্দ শোনা যায় এ সেই বৈশ্বানরেরই ধ্বনি।

যে দশটি প্রাণবায়ুর দ্বারা খাদ্যদ্রব্য জীর্ণ হয় তার পাঁচটি প্রধান বায়ু ও পাঁচটি উপপ্রধান বায়ু।

১) *প্রাণ*—নিবাস হৃদয় এবং কার্য নিশ্বাস ফেলা ও ভক্ষদ্রব্য হজম করা।

২) *অপান*—নিবাস গুহ্য এবং কার্য প্রশ্বাস ভেতরে নেওয়া এবং মল-মূত্র ত্যাগ ও গর্ভ বাইরে আনা।

৩) *সমান*—নিবাস নাভি এবং কার্য হজম হওয়া খাদ্য সর্ব অঙ্গে সঞ্চারিত করা।

৪) *উদান*—নিবাস কণ্ঠ এবং কার্য সূক্ষ্মশরীরকে স্থূলশরীরের বাইরে আনা বা অন্য শরীর অথবা অন্যলোকে নিয়ে যাওয়া।

৫) *ব্যান*—নিবাস সম্পূর্ণ শরীর এবং কার্য সমস্ত দেহকে সংকুচিত ও প্রসারিত করা।

৬) *নাগ*—এর কাজ হিক্কা তোলা।

৭) *কূর্ম*—এর কাজ নেত্র খোলা ও বন্ধ করা।

৮) *কৃকর*—এর কাজ হাঁচি দেওয়া।

৯) *দেবদত্ত*—এর কাজ হাই তোলা।

১০) *ধনঞ্জয়*—ইহা মৃত্যুর পরেও দেহে থাকে যার ফলে শরীর ফুলে যায়।

আর চতুর্বিধ অন্ন হল—

চর্ব—যা চিবিয়ে খাওয়া হয় যেমন রুটি, তরকারি ইত্যাদি।

চোষ্য— দাঁত দিয়ে চিবিয়ে খাদ্যের খাদ্যরস শুষে নিয়ে চর্বিত অংশ ফেলে দেওয়া হয়। যেমন ইক্ষু, আম, পেয়ারা ইত্যাদি।

লেহ্য—যাহা লেহন করে খাওয়া হয়। যেমন চাটনি, মধু ইত্যাদি।

পেয়—যে খাদ্য গলাধঃকরণ করা হয়। যেমন দুধ, রাবড়ি, পায়েস, খিচুড়ি ইত্যাদি।

পঞ্চদশ অধ্যায়ের পঞ্চদশ শ্লোকে (শ্লোক ১৫)—৭টি বিভূতি

সর্বস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টো মত্তঃ স্মৃতির্জ্ঞানমপোহনঞ্চ।
বেদৈশ্চ সর্বৈরহমেব বেদ্যো বেদান্তকৃদ্বেদবিদেব চাহম্‌॥

(গীতা ১৫।১৫)

'আমি সকল প্রাণীর হৃদয়ে অধিষ্ঠিত। আমা হতেই সকলের স্মৃতি, জ্ঞান ও অপোহন (সংশয়াদি দোষের নাশ) হয়ে থাকে। আমি বেদসমূহের জ্ঞাতব্য বিষয়, তত্ত্ব নির্ণয়কারী এবং জ্ঞাতাও।' (গীতা ১৫।১৫)

ভগবান বলছেন—

১) আমি সকল প্রাণীর দেহে অবস্থিত অন্তর্যামী।

২) আমা হতেই সকলের স্মৃতি হয়ে থাকে।

৩) আমা হতেই জ্ঞান সৃষ্টি হয়।

৪) আমা হতেই অপোহন অর্থাৎ সংশয়াদি দোষের নাশ হয়।

৫) সমস্ত বেদের জ্ঞাতব্যও আমি।

৬) বেদের তত্ত্বও আমার দ্বারা নির্ণীত হয়।

৭) বেদের জ্ঞাতাও আমি।

সপ্তম শ্লোকে ভগবান বলছেন **'মমৈবাংশো জীবলোকে'** অর্থাৎ জীবদেহে জীবাত্মারূপে আমার অংশ থাকে, আর পঞ্চদশ শ্লোকে ভগবান বলছেন পরমাত্মারূপে আমি সকলের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত থাকি। এখানে জীবাত্মা ও পরমাত্মার পার্থক্য হিসেবে উপনিষদ বলছেন—

দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে।
তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্নন্যো অভিচাকশীতি॥

(মু. উ. ৩।১।১, শ্বে. উ. ৪।৬)

সবর্দা একত্রে বসবাসকারী এবং একত্রে সখ্যভাবে অবস্থিত দুটি পাখি জীবাত্মা ও পরমাত্মা একটিই দেহ-বৃক্ষকে আশ্রয় করে থাকে। উহাদের মধ্যে একজন (জীবাত্মা) বৃক্ষের ফলের (কর্মফল) স্বাদ গ্রহণ ও উপভোগ করে ; কিন্তু অপরজন (পরমাত্মা) তা উপভোগ না করে শুধু দর্শক হয়ে থাকে।

পরমাত্মার স্বরূপ—(শ্লোক ১৬-২০)

পঞ্চদশ অধ্যায়ে প্রথমে 'জগৎ', তারপর 'জীবাত্মা' ও তৎপরে 'পরমাত্মার বিভূতি' বর্ণনা করে অবশেষে শেষ পাঁচটি শ্লোকে ভগবান 'পরমাত্মার স্বরূপ' বর্ণনা করছেন—

দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে ক্ষরশ্চাক্ষর এব চ।
ক্ষরঃ সর্বাণি ভূতানি কূটস্থোঽক্ষর উচ্যতে॥
উত্তমঃ পুরুষস্ত্বন্যঃ পরমাত্মেত্যুদাহৃতঃ।
যো লোকত্রয়মাবিশ্য বিভর্ত্যব্যয় ঈশ্বরঃ॥

যস্মাৎ ক্ষরমতীতোঽহমক্ষরাদপি চোত্তমঃ।
অতোঽস্মি লোকে বেদে চ প্রথিতঃ পুরুষোত্তমঃ॥
যো মামেবমসংমূঢ়ো জানাতি পুরুষোত্তমম্।
স সর্ববিদ্ভজতি মাং সর্বভাবেন ভারত॥
ইতি গুহ্যতমং শাস্ত্রমিদমুক্তং ময়ানঘ।
এতদ্বুদ্ধ্বা বুদ্ধিমান্ স্যাৎ কৃতকৃত্যশ্চ ভারত॥

(গীতা ১৫।১৬-২০)

'এই জগতে ক্ষর (বিনাশশীল) ও অক্ষর (অবিনাশী) দুই প্রকার পুরুষ আছে। তারমধ্যে ক্ষর (প্রাণীর শরীর) বিনাশশীল আর কূটস্থ বা অক্ষর (জীবাত্মা) অবিনাশী।

কিন্তু উত্তম পুরুষ হলেন এদের থেকেও বিশিষ্ট একজন, যাঁকে পরমাত্মা হিসাবে অভিহিত করা হয়। এই অবিনাশী ঈশ্বর ত্রিলোকে প্রবিষ্ট থেকে সকলের পালন-পোষণ করেন।

ভগবান বলছেন যেহেতু তিনি ক্ষরের অতীত এবং অক্ষরের থেকে উত্তম, তাই তিনি জগতে এবং বেদে পুরুষোত্তম নামে প্রসিদ্ধ।

মোহবর্জিত হয়ে যে ব্যক্তি তাঁকে পুরুষোত্তম বলে জানতে পারেন তিনি সর্বোতভাবে তাঁরই ভজনা করেন এবং সর্বজ্ঞ হন।

ভগবান বলছেন—হে অর্জুন ! এ অত্যন্ত গোপনীয় রহস্য (শাস্ত্র) এবং তা তোমাকে জানালাম, যা জানলে জ্ঞানীও কৃত-কৃতার্থ হয়।' (গীতা ১৫।১৬-২০)

গীতায় বিভিন্ন অধ্যায়ে ক্ষর, অক্ষর ও পুরুষোত্তম বর্ণনা ঃ

অধ্যায়/শ্লোক	ক্ষর/শরীর	অক্ষর/জীবাত্মা	পুরুষোত্তম
৭।৪-৬	অপরা প্রকৃতি	পরা প্রকৃতি	অহম্
৮।৩-৪	কর্ম	অধ্যাত্ম	ব্রহ্ম
	অধিভূত	অধিদৈব	অধিযজ্ঞ
১৩।১-২	ক্ষেত্র	ক্ষেত্রজ্ঞ	মাম্
১৪।৩-৪	মহদ্ ব্রহ্ম ; যোনি	গর্ভ ; বীজ	অহম্ ; পিতা

ক্ষর— ক্ষর হচ্ছে পঞ্চ মহাভূত (ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম) এবং এর দ্বারা সৃষ্ট সমস্ত পদার্থ যথা—স্থূল-শরীর, সূক্ষ্ম-শরীর (দশ ইন্দ্রিয়, পঞ্চ প্রাণ, মন, বুদ্ধি) এবং কারণ-শরীর (স্বভাব, কর্ম সংস্কার) ইত্যাদি এবং ইহা হচ্ছে লৌকিক।

অক্ষর—অক্ষর হচ্ছে জীবাত্মা এবং ইহা পরমাত্মার অংশ হওয়ায় চেতন। কিন্তু ইহাও লৌকিক, কেননা—

১) জীবাত্মা প্রকৃতির গুণাদিতে মোহগ্রস্ত হয়ে পড়ে এবং ক্ষরের সঙ্গে নিজ পাতানো সম্পর্ক মেনে নেয়।

২) পরমাত্মা প্রকৃতিকে নিজের অধীন করে অবতাররূপে ইহলোকে আসেন কিন্তু জীবাত্মা প্রকৃতির বশীভূত হয়ে ইহলোকে আসে এবং কর্মফল ভোগ করে।

৩) পরমাত্মা সদাই নির্লিপ্ত থাকেন (**ন মাং কর্মাণি লিম্পন্তি ন মে কর্মফলে স্পৃহা**—গীতা ৪।১৪) কিন্তু জীবাত্মার নির্লিপ্ততার জন্য সাধনা করতে হয় (**মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে**—গীতা ৭।১৪)।

পরমাত্মা—পরমাত্মাকে বলা হয়েছে 'উত্তম পুরুষ' অর্থাৎ তিনি ক্ষর বা অক্ষর হতেও উত্তম।

'ক্ষরং ত্ববিদ্যা হি অমৃতং তু বিদ্যা বিদ্যাবিদ্যে ঈশতে যস্তু সোহন্যঃ॥'

(শ্বে. শ্বে. ৫।১)

'ক্ষরং প্রধানমমৃতাক্ষরং হরঃ ক্ষরাত্মানাবিশতে দেব একঃ॥'

(শ্বে. শ্বে. ১।১০)

'বিনাশশীল প্রকৃতি অবিদ্যা এবং একে যে ভোগ করেন সেই অমৃতস্বরূপ অবিনাশী জীবাত্মাই বিদ্যা এবং এই দুটিকে (ক্ষর ও অক্ষর) এক ঈশ্বর তাঁর শাসনে রাখেন।' গীতায় ভগবান বলেছেন (১৫।১৭), এই পরমাত্মা কেবল সকলকে শাসনেই রাখেন না, তিনি সমস্ত প্রাণীর মধ্যে থেকে 'বিভর্তি' অর্থাৎ ভরণ-পোষণও করেন। তিনি সকল প্রাণীতে সমদর্শীও।

অয়মুত্তমোঽয়মধমো জাত্যা রূপেণ সম্পদা বয়সা।
শ্লাঘ্যোঽশ্লাঘ্যো বেত্থং ন বেত্তি ভগবাননুগ্রহাবসরে॥
অন্তঃস্বভাবভোক্তা ততোঽন্তরাত্মা মহামেঘঃ।
খদিরশ্চম্পক ইব বা প্রবর্ষণং কিং বিচারয়তি॥

(প্রবোধসুধাকর ২৫২-২৫৩)

'কারোর উপর চিন্তা করার সময় ভগবান চিন্তা করেন না যে সে জাতি, রূপ, ধন ও বয়সে উত্তম না অধম, প্রশংসনীয় না নিন্দনীয়। এই অন্তরাত্মারূপী মহামেঘ ভাবেরই ভোক্তা (ভাবগ্রাহী), মেঘবর্ষণের সময় কি মেঘ চিন্তা করে যে এটি কণ্টক, গুল্ম না চম্পক।'

মানুষ যখন ভগবানকে ক্ষরের অতীত বলে জানতে পারে তখন তার মন বা অনুরাগ ক্ষরের (অর্থাৎ জগৎ সংসারের) থেকে অপসারিত হয়ে ভগবানে আকৃষ্ট হয়। আর জগৎ-সংসারকে নিজের বলে মনে করাই হল মূঢ়তা যা ভক্তিতে ব্যভিচারী অর্থাৎ ঐকান্তিক ভক্তির অভাব। যখন সাধক অসংমূঢ় হন তখন তাঁর ব্যভিচার ভাব দূর হয় আর তখন তিনি ভগবানকে 'অক্ষরের থেকে উত্তম' অর্থাৎ পুরুষোত্তম বলে অনুভব করেন। তখন তাঁর বুদ্ধি (অর্থাৎ শ্রদ্ধা) ভগবানে সমর্পিত হয় আর তখন তিনি **'সর্ববিদ্ ভজতে মাম্ সর্বভাবেন ভারত'**—অর্থাৎ তাঁর জানার কোনো তত্ত্ব বাকি থাকে না এবং তাঁর প্রত্যেক মনোবৃত্তি ও ক্রিয়ার দ্বারা স্বতঃ ভগবদ্‌ভজনা হয়ে থকে। এইরূপ ভগবদ্‌ভজনাই 'অব্যভিচারিণী ভক্তি'। **'তদক্ষরং বেদয়তে যস্তু সোম্য স সর্বজ্ঞঃ সর্বমেবাবিবেশেতি'** (প্রশ্ন. ৪।১১)। যিনি এই অবিনাশী পরমাত্মাকে জানেন তিনি সর্বজ্ঞ। তিনি সর্বরূপে পরমাত্মাতে প্রবিষ্ট হন।

গীতা সর্বশাস্ত্রময়ী তবুও পঞ্চদশ অধ্যায়ের শেষে **এই অধ্যায়কেই শাস্ত্র** বলে সম্বোধিত করা হয়েছে এবং এই অধ্যায়ে মুখ্যরূপে ভগবানকেই পুরুষোত্তম বলায় **ইহাকে গুহ্যতমও** বলা হয়েছে।

পঞ্চদশ অধ্যায়ে ভগবানের মুখ্য উপদেশগুলি হল—

১) তত্ত্বতঃ জগৎকে জানা।

ঊর্ধ্বমূলমধঃশাখমশ্বত্থং প্রাহুরব্যয়ম্।

ছন্দাংসি যস্য পর্ণানি যস্তং বেদ স বেদবিৎ॥ (শ্লোক ১)

অর্থাৎ জগৎ-সংসাররূপ অশ্বত্থবৃক্ষকে যিনি মূলের (পরমাত্মার) সহিত তত্ত্বত জানেন তিনিই বেদের প্রকৃত জ্ঞাতা।

২) জগতের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে ভগবানের শরণাগতি নেওয়া। (শ্লোক ৩, ৪)

ন রূপমস্যেহ তথোপলভ্যতে

নান্তো ন চাদির্ন চ সম্প্রতিষ্ঠা।

অশ্বত্থমেনং সুবিরূঢ়মূল-

মসঙ্গশস্ত্রেণ দৃঢ়েন ছিত্ত্বা॥ (শ্লোক ৩)

এই জগৎ-সংসারকে বৈরাগ্য শস্ত্র দ্বারাই ছেদন করবে।

ততঃ পদং তৎ পরিমার্গিতব্যং

যস্মিন্ গতা ন নিবর্তন্তি ভূয়ঃ।

তমেব চাদ্যং পুরুষং প্রপদ্যে

যতঃ প্রবৃত্তিঃ প্রসৃতা পুরাণী॥ (শ্লোক ৪)

যাঁর হতে এই অনাদি সংসার বিস্তার লাভ করেছে আমি সেই 'আদি পুরুষ নারায়ণের শরণাগত'—এই দৃঢ় নিশ্চয় করে তাঁকে অন্বেষণ করবে।

৩) নিজের মধ্যে অবস্থিত পরমাত্মাকে তত্ত্বত জানবে।

যতন্তো যোগিনশ্চৈনং পশ্যন্ত্যাত্মন্যবস্থিতম্।

যতন্তোঽপ্যকৃতাত্মানো নৈনং পশ্যন্ত্যচেতসঃ॥ (শ্লোক ১১)

৪) যত্নশীল যোগিগণ তাঁকে তত্ত্বত নিজ হৃদয়ে জানতে পারেন। বেদ অধ্যয়নের সাহায্যে তাঁকে তত্ত্বত জানা যায়।

সর্বস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টো

মত্তঃ স্মৃতির্জ্ঞানমপোহনঞ্চ।

বেদৈশ্চ সর্বৈরহমেব বেদ্যো

বেদান্তকৃদ্ বেদবিদেব চাহম্॥ (শ্লোক ১৫)

ভগবানই সর্ববেদের জ্ঞাতব্য, কর্তা ও অর্থবেত্তা।

৫) ভগবানকে পুরুষোত্তম জেনে সর্বভাবে ভজন করবে।

যো মামেবমসংমূঢ়ো জানাতি পুরুষোত্তমম্।

স সর্ববিদ্ ভজতি মাং সর্বভাবেন ভারত।। (শ্লোক ১৯)

'যে ব্যক্তি তত্ত্বত আমাকে পুরুষোত্তমরূপে জানেন তিনিই সর্বজ্ঞ এবং তিনিই নিত্য-নিরন্তর আমারই ভজনা করেন।'

৬) সমস্ত অধ্যায়টির তত্ত্ব জানলে মানুষ কৃতকৃত হয়।

ইতি গুহ্যতমং শাস্ত্রমিদমুক্তং ময়ানঘ।

এতদ্ বুদ্ধা বুদ্ধিমান্ স্যাৎ কৃতকৃত্যশ্চ ভারত।। (শ্লোক ২০)

ভগবান এখানে নিজেকে **'ক্ষরমতীতোঽহম্'** ও **'অক্ষরাদপিচোত্তমঃ'** বলেছেন, অর্থাৎ তিনি ক্ষরের (অপরা প্রকৃতি) অতীত এবং অক্ষরের (ভগবানের পরাবস্থার) থেকেও উত্তম। আবার সপ্তম অধ্যায়ে বর্ণিত তাঁর অষ্টবিধ অপরা প্রকৃতি (**ভূমিরাপোঽনলঃ বায়ু........**গীতা ৭।৪) ও তাঁর পরা প্রকৃতি (**বিদ্ধি মে পরাম্** গীতা ৭।৫)—এই দুইটিও তাঁর থেকে অভিন্ন।

এর তাৎপর্য হল, সাধক যতক্ষণ অপরা (জগৎ-সংসার) ও পরা (স্ব-স্বরূপ) উভয়কে পৃথক বলে মানেন ততক্ষণ ভগবান অপরার অতীত ও পরার থেকে উত্তম। কিন্তু সাধকের দৃষ্টিতে যখন পরা-অপরার পৃথক অস্তিত্ব থাকে না তখন অপরা-পরা-ভগবান—এই ত্রিপুটিই **'বাসুদেবঃ সর্বমিতি'** বলে প্রতিভাত হন। এটি অতিশয় গুহ্যকথা তাই এই অধ্যায়টিকে গুহ্যতম শাস্ত্র বলা হয়েছে।

দৈবাসুরসম্পদ বর্ণনার উপক্রম

ভগবান চতুর্দশ অধ্যায়ের ছাব্বিশতম শ্লোকে বলেছেন—

মাঞ্চ যোঽব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবতে।

স গুণান্ সমতীত্যৈতান্ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে।। (গীতা ১৪।২৬)

অর্থাৎ অব্যভিচারিণী ভক্তিকেই গুণাতীত হওয়ার উপায় হিসেবে বর্ণনা করেছেন। (এখানে অব্যভিচারিণী ভক্তি হচ্ছে দৈবীসম্পদ ও ব্যভিচারী ভক্তি হচ্ছে আসুরীসম্পদ।) ভগবান পঞ্চদশ অধ্যায়ে অব্যভিচারিণী ভক্তি

বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করেছেন আর ষোড়শ অধ্যায়ে সংক্ষিপ্তভাবে দৈবীসম্পদ ও বিস্তৃতভাবে আসুরী সম্পদ বর্ণনা করেছেন। পঞ্চদশ অধ্যায়ে আসুরী সম্পদ ত্যাগ ও অব্যভিচারিণী ভক্তি লাভের মূল সূত্রগুলি হল—

১) **'অসঙ্গশস্ত্রেন দৃঢ়েন ছিত্ত্বা।'** (গীতা ১৫।৩)

অর্থাৎ অনাসক্তি থেকে প্রকটিত হয় দৈবীসম্পদ আর সঙ্গ বা সাংসারিক আসক্তি হল আসুরীসম্পদের কারণ। তাই আসক্তি ত্যাগ দৃঢ়ভাবে ধারণ করতে হবে।

২) **'তমেব চাদ্যং পুরুষং প্রপদ্যে।'** (গীতা ১৫।৪)

অর্থাৎ ভগবানের শরণাগত হলে দৈবীসম্পদ স্ফুরিত হয় আর যারা শরণাগত নয় তারা আসুরীসম্পদসম্পন্ন হয়।

৩) **'সর্ববিত্তজতি মাম্।'** (গীতা ১৫।১৯)

অর্থাৎ ভগবানকে ভজনাকারী ব্যক্তি অব্যভিচারী ভক্তিসম্পন্ন (অধিকারী) আর যারা ভগবৎভজনা করে না তারা আসুরীসম্পদযুক্ত (অনধিকারী)।

দৈবাসুর সম্পদ বিভাগ বর্ণনা
(ষোড়শ অধ্যায়)

এইভাবে পঞ্চদশ অধ্যায়ে অব্যভিচারী ভক্তির বর্ণনা করে ভগবান ষোড়শ অধ্যায়ে দৈব-আসুরী সম্পদের ওপর বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

দৈবী বা সাত্ত্বিকসম্পদ	১-৩ শ্লোক
আসুরীসম্পদ	৪-২২ শ্লোক
শাস্ত্রবিধি অনুসরণকারীদের গতি	২৩-২৪ শ্লোক

দৈবী বা সাত্ত্বিকসম্পদ্—(শ্লোক ১-৩)

অভয়ং সত্ত্বসংশুদ্ধির্জ্ঞানযোগব্যবস্থিতিঃ।
দানং দমশ্চ যজ্ঞশ্চ স্বাধ্যায়স্তপ আর্জবম্॥ ১

অহিংসা সত্যমক্রোধস্ত্যাগঃ শান্তিরপৈশুনম্।
দয়া ভূতেষ্বলোলুপ্ত্বং মার্দবং হ্রীরচাপলম্॥ ২
তেজঃ ক্ষমা ধৃতিঃ শৌচমদ্রোহো নাতিমানিতা।
ভবন্তি সম্পদং দৈবীমভিজাতস্য ভারত॥ ৩

(গীতা ১৬।১-৩)

'শ্রীভগবান বলছেন—সর্বতোভাবে নির্ভরতা, সম্পূর্ণ চিত্তশুদ্ধি, জ্ঞানের জন্য দৃঢ় নিষ্ঠা, সাত্ত্বিক দান, ইন্দ্রিয়াদির সংযম, যজ্ঞ, স্বাধ্যায় (সৎ-শাস্ত্রাদির পঠনপাঠন), তপস্যা (কর্তব্য পালনের কষ্ট স্বীকার), কায়মনোবাক্যে সরলতা, অহিংসা (পরপীড়া বর্জন), ক্রোধহীনতা, সংসারের কামনা-ত্যাগ, চিত্তে রাগ-দ্বেষজনিত চাঞ্চল্য না হওয়া, পরনিন্দা বর্জন, জীবে দয়া, সাংসারিক পদার্থে লোভহীনতা, অন্তঃকরণের (চিত্তের) কোমলভাব, কুকর্মে লজ্জা, অচাপল্য এবং তেজস্বিতা (প্রভাব), ক্ষমা, ধৈর্য, শারীরিক শুদ্ধি, শত্রুভাব না রাখা এবং নিরভিমানিতা—এসবই দৈবীভাব। ভগবান এই তিনটি শ্লোকে যে ২৫টি দৈবীগুণের কথা বলেছেন তা অব্যভিচারী ভক্তের মধ্যে স্ফুরিত হয়।' (গীতা ১৬।১-৩)

এই পঁচিশটি দৈবী গুণের বর্ণনা এইরূপ—

১. *অভয়ম্*—অনিষ্টের আশঙ্কায় মানুষের মধ্যে যে উদ্বেগ জন্মায় তাকে বলে ভয়। যার বিন্দুমাত্র ভয় নাই সে হচ্ছে অভয়।

ভগবান দৈবীসম্পদের মধ্যে প্রথমেই বলেছেন অভয়, কারণ যিনি ভগবৎভজনা করেন তাঁকেই ভগবান অভয় প্রদান করে থাকেন। লঙ্কা সমরের প্রাক্‌কালে ভগবান রাম বিভীষণের উদ্দেশে বলছেন—একবার মাত্র বাক্যের দ্বারাও যে আমার প্রপন্ন অর্থাৎ 'আমি তোমার' এভাবে শরণাগত হয়, আমি সর্বভূত হতে তাকে 'অভয়দান' করি। ইহাই আমার ব্রত।

সকৃদেব প্রপন্নায় তবাস্মীতি চ যাচতে।
অভয়ং সর্বভূতেভ্যো দদাম্যেতদ্ ব্রতম্ মম॥ (বা. রামায়ণ ৬।১৮।৩৩)

ভয় দুই প্রকারের—১) বাহ্যিক ভয় ও ২) অভ্যন্তরীণ ভয়।

বাহ্যিক ভয়—চোর, ডাকাত, বাঘ, সাপ থেকে মানুষ ভয় পায় এবং

ভোগবিলাস থেকে চ্যুত হওয়ারও ভয় থাকে। এই সব ভয় শরীরের প্রতি আসক্তিবশত আসে। শরীর বিনাশশীল এবং মৃত্যু হবেই এই ভাব দৃঢ় হলেই আর এই ভয় আসে না।

অভ্যন্তরীণ ভয়— অভ্যন্তর থেকে ভয় তখনই উৎপন্ন হয় যখন মানুষ কোনো নিষিদ্ধ কর্ম করে। যেমন রাবণকে মানুষ, দেবতা, যক্ষ, গন্ধর্ব, রাক্ষস সবাই ভয় পেত, কিন্তু রাবণ যখন সীতা হরণ করল, তখন সেই সবাইকে ভয় পেতে লাগল। কংস ছিল মথুরার রাজা ও মগধরাজ জরাসন্ধের জামাতা। সে ছিল দুর্বিনীত ও অত্যাচারী। কিন্তু যখন শ্রীকৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করলেন, সে চারপাশে মৃত্যুভয় দেখতে লাগল। অর্থাৎ অন্যায়-অত্যাচারীর চিত্ত দুর্বল হয়, সেইজন্য তারা ভীত-সন্ত্রস্ত থাকে। আবার ভগবদ্মুখী সাধক যেমন যেমন ভগবানে আশ্রয় গ্রহণ করে তেমন তেমন তিনি ভয়হীন হন।

রাম মরে তো মৈঁ মরূঁ, নহি তো মরে বলায়।
অবিনাশী কা বালকা, মরে না মারা যায়॥

ভক্ত ভাবেন রাম যেমন চিরন্তন তেমনি আমি চিরন্তন কেবল সাংসারিক ঘাত-প্রতিঘাতই যায় আর আসে। আমি অবিনাশী সত্তা, না মরি না মারা যাই।

ভর্তৃহরি তাঁর বৈরাগ্যশতকে বলেছেন—

'সর্বং বস্তু ভয়াবহং ভুবি নৃণাং বৈরাগ্যমেবাভয়ম্।'

অর্থাৎ জগতের সর্ব বস্তুর মধ্যেই ভয় আছে কেবল বৈরাগ্যই ভয়হীন। শরীরকে বিনাশশীল মনে করে তার প্রতি আসক্তি না রাখলে বাহ্যিক ভয় এবং নিষিদ্ধ কর্ম না করে ভগবদ্ আশ্রয় গ্রহণ করলে অভ্যন্তরীণ ভয় থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়।

তবে নিজ বর্ণ ও আশ্রম অনুযায়ী কর্তব্যকর্ম করার সময় তা যেন ঈশ্বর-বিরুদ্ধ কাজ না হয়ে যায়, গুরু, সাধু-মহাত্মাদের বাক্য লঙ্ঘন না হয়, বা পিতা-মাতা-গুরুজন যেন দুঃখ না পান—এইরূপ যে ভয়, সেইগুলি আসলে অভয় সৃষ্টিকারী ভয়।

হরি-ডর, গুরু-ডর, জগৎ-ডর, ডর করনী মে সার।
রজ্জব ডর্‌য়া সো উবর্‌য়া গাফিল খায়ী মার॥

অর্থাৎ রজ্জব (এক সাধু-মহাত্মা) বলছেন যে ভগবৎ বিমুখতার ভয়, গুরু নির্দেশ না জানার ভয়, জগৎ-সংসারে বিধিনিষেধ না মানার ভয় হল প্রকৃতপক্ষে অভয় করার একটি সাধন। এই ভয়কে যে মান্য করে সেই জগৎ-সংসারের বন্ধন থেকে উত্তীর্ণ হয় কিন্তু বাকিরা এই নির্দেশ অমান্যের ফলে বন্ধনদশায় পতিত হয়।

২. সত্ত্বসংশুদ্ধিঃ—চিত্তের সম্যক্ শুদ্ধিকে বলা হয় সত্ত্বসংশুদ্ধি। যখন কারো চিন্তা, ভাব, উদ্দেশ্য শুধুমাত্র পরমাত্মা প্রাপ্তি হয় তখন তার চিত্ত অতি শীঘ্রই শুদ্ধ হয়ে ওঠে। আর যদি বিনাশশীল বস্তুর প্রাপ্তি করার উদ্দেশ্য থাকে তবে চিত্তে তিনপ্রকার দোষ আসে—

'মল', 'বিক্ষেপ' ও 'আবরণ'

মল—মলদোষ দূর করার উপায় হল নিষ্কাম ভাবে সেবা করা।

বিক্ষেপ—বিক্ষেপ দূর করার জন্য উপাসনা দরকার।

আবরণ—ইহা দূর করার জন্য দরকার জ্ঞান বা চিত্তকে নিজের বলে মনে না করা।

চিত্তশুদ্ধি সাধনের অন্যান্য উপায়—

১) পুরানো পাপের প্রায়শ্চিত্তর কথা চিন্তা না করে, ভ্রমবশত করা দুষ্কর্মগুলি আর না করা এবং উৎসাহ সহকারে সাধনায় ব্যাপৃত হওয়া।

২) সাধকের যেন কখনো মনে না হয়—সাধনভজন এক কাজ এবং সাংসারিক কাজ অন্য কাজ। মনে রাখতে হবে, উভয়ই সাধনার অঙ্গ তাই একটাতে সদাচার অন্যটাতে মিথ্যাচার করলে সাধনার অঙ্গহানি হয়, তাতে সাধন বিঘ্নিত হয়।

৩) যে ক্ষতি করে তাকে দোষী না মনে করে অযাচিতভাবে তাকে ক্ষমা করে দেওয়া। এইরূপ চিন্তায় অত্যন্ত চিত্তশুদ্ধি হয়।

৩. জ্ঞানযোগব্যবস্থিতি—পরমাত্মার জ্ঞানলাভের নিমিত্ত যোগস্থিত হওয়া আবশ্যক। এখানে যোগ বলতে ভগবান বলছেন— 'সমত্বং যোগ উচ্যতে' অর্থাৎ জাগতিক পদার্থের প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তি, মান-অপমান, নিন্দা-

স্তুতি বা সুস্থতা-অসুস্থতাতে সম থাকা বা চিত্তে হর্ষ-শোকাদি না হওয়াই হল সমত্ব বা যোগ এবং পরমাত্মা লাভের উপায়।

৪. **দানম্**—লোকদৃষ্টিতে যেগুলিকে নিজের বলে মনে করা হয় তা অপরকে বিতরণ করাকেই দান বলে।

দাতব্যমিতি যদ্দানং দীয়তেঽনুপকারিণে।
দেশে কালে পাত্রে চ তদ্দানং সাত্ত্বিকং স্মৃতম্॥ (গীতা ১৭।২০)

দানের মধ্যে শ্রেষ্ঠ দান হচ্ছে সাত্ত্বিক দান। গীতায় ভগবান বলছেন, সৎপাত্রে, দেশ-কাল-পরিস্থিতি বিচার করে এবং অনুপকারীকে বিতরণ করাই হচ্ছে সাত্ত্বিক দান। আবার নানা প্রকার পার্থিব দানের (ভূমিদান, অন্নদান, শিক্ষাদান, বস্ত্রদান) চেয়ে অভয় দানই শ্রেষ্ঠ।

যথা বদন্তীহ বুধাঃ প্রধানং সর্বপ্রদানেষ্বভয়প্রদানম্।
(পঞ্চতন্ত্র, মিত্রভেদ ৩১৩)

বিদ্বান ব্যক্তিগণ অভয় দানকেই সব দানের থেকে শ্রেষ্ঠ বলে অভিহিত করে থাকেন।

অভয়প্রদান দুই ভাবে হয়—

১) সাংসারিক বিপদ থেকে, বিঘ্ন থেকে ভীত ব্যক্তিদের নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী সাহস প্রদান করা, আশ্বাস দেওয়া, সাহায্য করা যা শরীরাদি জাগতিক পদার্থ দিয়ে সাহায্য করা।

২) সংসারে আবদ্ধ ব্যক্তিদের জন্ম-মৃত্যুর চক্র থেকে নিষ্কৃতি প্রদানের জন্য ভগবদ্কথা শোনানো, গীতা, ভাগবত সরলভাবে বুঝিয়ে দেওয়া প্রভৃতি হল শ্রেষ্ঠ দান।

ভাগবতে রাস পঞ্চাধ্যায়ীতে শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলা বর্ণিত হয়েছে। গোপিনীরা শ্রীকৃষ্ণ অন্বেষণের সময় ব্যাকুল হয়ে তাঁর স্তুতি করেছেন যা গোপীগীতা নামে খ্যাত—

তব কথামৃতং তপ্তজীবনং কবিভিরীড়িতং কল্মষাপহম্।
শ্রবণমঙ্গলং শ্রীমদাততং ভুবি গৃণন্তি তে ভূরিদা জনাঃ॥
(ভাগবত ১০।৩১।৯)

হে প্রভু ! আপনার কথামৃত সমস্ত পাপ (অর্থাৎ ভগবদ্‌বিমুখতা) নাশকারী, ইহা শ্রবণমাত্রই মঙ্গলদায়ক আর সন্ত-মহাপুরুষগণ এ বিষয়ে বিশদভাবে বর্ণনা করেছেন। আপনার এই কথামৃতকে যিনি শোনান তিনি মহাদাতা অর্থাৎ জগতের সবথেকে বেশি উপকার ও হিত তিনিই করেন।

গীতাতেও ভগবান বলেছেন—

য ইমং পরমং গুহ্যং মদ্ভক্তেষ্বভিধাস্যতি।
ভক্তিং ময়ি পরাং কৃত্বা মামেবৈষ্যত্যসংশয়ঃ॥ (গীতা ১৮।৬৮)

'যে ব্যক্তি আমাকে পরম ভক্তি সহকারে, এই পরম গুহ্যময় গীতাশাস্ত্র আমার ভক্তগণের কাছে জানাবেন, তিনি আমাকেই প্রাপ্ত হবেন—এতে কোনো সন্দেহ নেই।'

অবশ্যই ভগবদ্‌কথা শোনানোর সময় বা দানের সময় সাধক যেন নিজের মধ্যে কর্তাভাব বা কোনো বৈশিষ্ট না দেখেন এবং এটিকে ভগবদকৃপা বলে মনে করেন। তাঁর যেন সর্বদা মনে হয় ভগবানই শ্রোতার রূপ ধারণ করে তাঁর সময় সার্থক করে তুলেছেন বা গৃহীতারূপে বস্তু গ্রহণ করে তাঁকে ঋণমুক্ত করছেন। সাধক যেন মনে রাখেন তাঁর যে বস্তু, সামর্থ্য, যোগ্যতা আছে তা ভগবানই অন্যের সেবার নিমিত্ত তাঁকে দিয়েছেন। সুতরাং প্রয়োজন অনুসারে যাকে যা কিছু দেওয়া হয়, সেগুলি তাঁরই মনে করে দেওয়াই হল ভগবদ্ প্রীত্যার্থে দান।

৫. *দমঃ*—ইন্দ্রিয়গুলিকে সম্পূর্ণভাবে দমন করাকেই বলে দম।

১) শরীর, চিত্ত ও ইন্দ্রিয়াদির কোনো কর্ম বা প্রবৃত্তিই শাস্ত্রনিষিদ্ধ হওয়া উচিত নয়।

২) আর শাস্ত্রবিহিত কর্মও নিজ স্বার্থ ও অহংবোধ ত্যাগ করে অপরের হিতার্থে হওয়া উচিত। এইভাবে কর্ম করলে ইন্দ্রিয় পরাধীনতা থাকে না এবং শরীর ও চিত্ত শুদ্ধ ও নির্মল হয়।

৬. *যজ্ঞঃ*—যজ্ঞর সাধারণ অর্থ হল আহুতি প্রদান বা হোম ইত্যাদি করা। তবে গীতার মতে—

১) নিজ বর্ণ, আশ্রম অনুযায়ী যে কর্তব্যকর্ম প্রাপ্ত হয়, তা যদি স্বার্থ ও

অভিমান ত্যাগ করে এবং অপরের হিত চিন্তায় বা ভগবৎ প্রীত্যার্থে করা হয়, তাও যজ্ঞ।

২) জীবিকা সম্বন্ধীয় সমস্ত কর্ম যদি ঈশ্বর প্রীত্যার্থে করা হয় তবে তাও যজ্ঞ হয়।

৩) আবার পিতা-মাতা, আচার্য-গুরুজন এঁদের নির্দেশ পালন করা, তাঁদের সুখী করা, গো-ব্রাহ্মণ-দেবতা-পরমাত্মার পূজা ও সৎকার করাও যজ্ঞ।

৭. *স্বাধ্যায়ঃ*—গীতা, ভাগবত আদি শাস্ত্রপাঠকে বলে স্বাধ্যায়। আসলে স্বাধ্যায় হল 'স্বস্য অধ্যায়ঃ' অর্থাৎ নিজ চিত্তবৃত্তিকে জানা। সাধকের কর্তব্যই হল এই চিত্তবৃত্তিকে শুদ্ধ করা।

৮. *তপঃ*—ক্ষুৎ-পিপাসা, শীত-গ্রীষ্ম-বর্ষা ইত্যাদি সহ্য করা হল এক প্রকার তপস্যা। তবে জেনেশুনে এই কষ্ট সহ্য করার চেয়ে সাধনকালে বা জীবিকা নির্বাহের সময় দেশ-কাল-পরিস্থিতিতে যে বাধা-বিঘ্ন উপস্থিত হয়, সেগুলিকে প্রসন্নতা সহকারে সহ্য করাই হল আসল তপস্যা। জীবিকার সময়তো বটেই, সাধনের সময়ও যদি সাধক নানাপ্রকার বিঘ্ন অনুভব করেন এবং তাতেও অনুকূল পরিস্থিতি কামনা না করেন তবে তাও তপস্যা। যেমন সব সাধকই চেষ্টা করেন নির্জনস্থানে সাধন করার, কিন্তু নির্জন স্থান না পেলেও প্রাপ্ত অবস্থাকেই ভগবানের ইচ্ছা মনে করে উৎসাহ ও প্রসন্নতা সহকারে সেই অবস্থাতেই সাধনায় প্রবৃত্ত হওয়া তপস্যা। এতে পূর্বকৃত পাপ নাশ হয় ও সাধকের সহ্য করার নতুন শক্তি ও নতুন বল আসে।

আগতে স্বাগতং কুর্যাদ্ গচ্ছন্তং ন নিবারয়েৎ।
যথাপ্রাপ্তং সহেৎ সর্বং সা তপস্যোত্তমোত্তমা॥ (বোধসার)

অর্থাৎ যা পাওয়া গেছে তাকেই খুশিমনে মেনে নেওয়া, যা চলে যাচ্ছে তাকে নিবারণের ইচ্ছা না করা এবং যা পাওয়া গেছে তাকে সহ্য করাই সর্বোত্তম তপস্যা। সাধকের সর্বদা সতর্ক থাকা উচিত যে—তাঁর তপোবল যেন— ১) অপরের বর প্রদানে, ২) অভিশাপ প্রদান বা অপরের অনিষ্ট করায় এবং ৩) নিজ ইচ্ছাপূর্তির জন্য প্রয়োগ না করেন।

৯. *আর্জবম্* —আর্জবম্ মানে সরলতা। এই সরলতা সাধকের এক বিশেষ গুণ। সহজ-সরল লোককে বোকা মনে করলেও তার কোনো ক্ষতি হয় না বরং নিজ উদ্ধার প্রাপ্তির জন্য সরলতা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

মনস্যেকং বচস্যেকং কর্মণ্যেকং মহাত্মনাম্।
মনস্যন্যদ্ বচস্যন্যৎ কর্মন্যন্যদ্ দুরাত্মনাম্॥

মহাত্মাদের কর্মে, বাক্যে ও মনে সামঞ্জস্য থাকে আর দুরাচারীর তিনটি তিন রকমের হয়।

কপট গাঁঠ মন মেঁ নহীঁ, সবসোঁ সরল সুভাব।
'নারায়ন' তা ভক্ত কী, লগী কিনারে নাব॥

১০. অহিংসা— কায়মনোবাক্যে কারো অনিষ্ট না করা বা অনিষ্ট না চাওয়াই অহিংসা। যারা জগতের বিনাশশীল পদার্থগুলিকে নিজের বলে মনে করে সুখবুদ্ধিতে ভোগ করে তারাই হিংসা করে। আর সুখবুদ্ধিতে ভোগ করার ফলে অভাবী ব্যক্তিরা দুঃখিত ও সন্তপ্ত থাকে—এও এক প্রকার হিংসা। কিন্তু সাধু-মহাপুরুষরা অন্যের হিতের জন্যই জীবিকা নির্বাহ করে থাকেন, তাই তাঁদের দ্বারা কোনো হিংসা হয় না বা জীব দুঃখিত বা সন্তপ্ত হয় না। ভগবান গীতায় বলছেন—

নিরাশীর্যতচিত্তাত্মা ত্যক্তসর্বপরিগ্রহঃ।
শারীরং কেবলং কর্ম কুর্বন্নোপ্নোতি কিল্বিষম্॥ (গীতা ৪।২১)

যাঁর শরীর ও অন্তঃকরণ সম্পূর্ণরূপে বশীভূত, যিনি সর্বপ্রকার ভোগোপকরণ বর্জন করেছেন, সেই আশাশূন্য কর্মযোগী শরীর সম্বন্ধীয় কর্ম করেও পাপভাগী হন না। যাঁরা ভগবৎমুখী তাঁদের হিংসা হয় না কারণ তাঁরা **'সর্বভূতহিতে রতাঃ'**। সাধকদের সাধনাতে বাধা আসলে তাঁদের ক্রোধ আসে না, তাঁদের নিজের প্রতি ক্ষোভ হয়। ফুল থেকে যেমন স্বতঃই সুগন্ধ ছড়ায়, সাধক হতেও তেমন পারমার্থিকতা স্বতঃই ছড়িয়ে পড়ে এবং এতে স্বভাবতই প্রাণীকুলের অত্যন্ত হিত হয়।

১১. *সত্যম্*—নিজ স্বার্থ ও অভিমান ত্যাগ করে, অন্যের হিতার্থে যেমন যেমন দেখা, শোনা, পড়া বা বোঝা গেছে তার বেশি বা কম না করে

সেইগুলিই প্রিয় বাক্যে বলাকে বলা হয় 'সত্যম্'। সাধক শুধুই সত্য ব্যবহার ও সকলের হিতের জন্যই কাজ করে থাকেন।

১২. **অক্রোধ**—নিজের দুঃখে অন্যের অনিষ্ট করার জন্য চিত্তে যে জ্বালা বোধ হয়, তাকেই বলে ক্রোধ। কিন্তু দুঃখের সময় যদি অপরের অনিষ্ট চিন্তা না থাকে তবে তাকে বলে ক্ষোভ। সাধক পরমপ্রাপ্তির জন্য সাধন করেন, তাই তাঁর অপকারকারীর ক্ষতি চিন্তা করেন না। সাধকের অহিত চিন্তায় যদি কেউ তাঁর ক্ষতি বা দুঃখ প্রদান করেন তখন তাঁর মনে এই ভাবনার উদ্রেক হয় যে তাঁর যে দুঃখ তা তো পূর্বকৃত পাপেরই ফল এবং এই অপকারী আমাকে শুদ্ধ, নির্মল করার নিমিত্তমাত্র। তাই এর ওপর রাগ কীসের ? আবার যাঁরা সাধকদের হিতকারী হয়ে সাধকদের সেবা করে বা সুখ প্রদান করে, তাঁরা সাধকদের একপ্রকার পুণ্যনাশ করেন। সাধক তখন চিন্তা করেন, এরা কত উদার, আমার অনুকূল আচরণ করে আনন্দ পাচ্ছেন তাই হিতকারীদের ওপরও এঁরা প্রসন্ন থাকেন এবং তার ফলে এঁদের পুণ্যনাশ হয় না। কেননা পুণ্যনাশ তখনই হয় যখন সেবা থেকে সুখভোগ করা হয়। কিন্তু সাধকেরা সেবা থেকে সুখভোগ অনুভব করেন না, তাঁদের দৃষ্টি থাকে সেবাকারীর শুদ্ধ ব্যবহারের দিকে। তাই সাধকের না সুখ না দুঃখপ্রদানকারী কারোর ওপরই আসক্তি বা ক্রোধ কোনোটিই জাগ্রত হয় না। তিনি সকলকেই প্রীতিভাবে দেখেন।

১৩. *ত্যাগঃ*—ত্যাগ দুই প্রকার বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ।

বাহ্যিক ত্যাগ হল অন্যায়, অত্যাচার, দুরাচার ইত্যাদি পরিত্যাগ ছাড়াও সুখ-আরাম ইত্যাদি ত্যাগ।

অন্তরের ত্যাগ হল জাগতিক বস্তুর কামনা ত্যাগ বা সংসার থেকে বিমুখ হওয়া। কামনা সর্বতোভাবে পরিত্যাগ করলেই শান্তি লাভ হয়—'ত্যাগাৎ **শান্তিরনন্তরম্**'।

১৪. *শান্তিঃ*—চিত্তে রাগ-দ্বেষজনিত চাঞ্চল্য না আসাকেই বলে শান্তি। অনুকূল অবস্থায় পুণ্যের নাশ ও প্রতিকূল অবস্থায় পাপের নাশ এই উপলব্ধি হলেই মনে শান্তি আসে।

১৫. *অপৈশুনম্* —কারোর মনে অন্যের সম্বন্ধে বিরূপতা প্রবেশ করানো হল ক্রূরতা, তাকেই বলে পৈশুনতা। যে সাধকের পরমাত্মা প্রাপ্তির উদ্দেশ্য থাকে, তার দ্বেষদৃষ্টি ও দ্বেষপ্রবৃত্তি দূর হয়ে যায় এবং অপরের প্রতি স্বতঃ ভালোবাসা জন্মায় এবং ইহাই অপৈশুনতা। ভক্তিমার্গের সাধকেরা সর্বত্র প্রভুর দর্শন করেন, জ্ঞানমার্গের সাধকেরা সর্বত্র নিজস্বরূপ দর্শন করেন, এবং কর্মযোগের সাধকেরা সর্বত্র নিজ সেব্যকে দর্শন করে থাকেন। তাই যোগী সর্বদাই 'অপৈশুন'।

১৬. *দয়া সর্বভূতেষুঃ*—অন্যের দুঃখ দেখে তা দূর করার চিন্তাকে বলে 'দয়া'। তবে দয়ার প্রকারভেদ আছে।

১) **ভগবানের দয়া**— ভগবানের দয়া ও কৃপা, এই দুইভাবে আশীর্বাদ বর্ষিত হয়। তাঁর দয়া অনুকূল পরিস্থিতি সৃষ্টি করে মানুষকে কর্মফল ভোগ করায়। আর তাঁর কৃপা মানুষকে পাপ থেকে শুদ্ধ করার জন্য প্রতিকূল পরিস্থিতি উদ্ভব করে জীবকে কর্মফল ভোগ করায়।

২) **সন্ত-মহাত্মাদের দয়া**—সন্ত-মহাত্মাগণ তাঁদের অন্তরে অপরের দুঃখে দুঃখী হন না বা নিজের দুঃখেও দুঃখী হন না যদিও আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় তাঁরা অপরের দুঃখে দুঃখী ও অপরে সুখে সুখী।

এর তাৎপর্য এই যে তাঁদের নিজের উপর প্রতিকূল পরিস্থিতি এলে সেটিকে ভগবানের কৃপা বলে মেনে নেন কিন্তু অন্য কেউ দুঃখ পেলে নিজেদের স্বভাববশতই অপরের দুঃখ গ্রহণ করে তাদের দুঃখ দূর করার চেষ্টা করে থাকেন। সাধুসন্তদের দয়া বিশুদ্ধ ও নির্মল হয়—

কর্ণস্ত্বচং শিবির্মাংসং জীবং জিমূতবাহনঃ।
দদৌ দধীচিরস্থীনি নাস্ত্যদেয়ং মহাত্মনাম্॥

—পরহিতার্থে কর্ণ তাঁর দেহের ত্বচা, শিবি নিজের মাংস, দধীচি দেহের অস্থি এবং জীমূতবাহন তাঁর দেহকে বিসর্জন করেছিলেন। সত্যিই, মহাত্মাদের পক্ষে পরহিতের জন্য কিছুই অদেয় নয় অর্থাৎ তাঁরা কী না দিতে পারেন!

৩) **সাধকদের দয়া**—সাধকগণ সর্বদা অপরের দুঃখ দূর করার চেষ্টা করে

থাকেন। যে প্রাণীরা ভগবানের শরণাগত নয়, দুরাচারে ব্যস্ত থেকে নিজেদের পতন ঘটায়, তাদের প্রতিও সাধকদের ক্রোধ না হয়ে দয়া আসে। তাঁদের চেষ্টা থাকে কী করে এইসব পাপকাজ থেকে তাদের বিরত করা যায়! সকলের মঙ্গলের জন্য স্বাভাবিক ইচ্ছা থাকলেও তাতে তাদের কোনো অহংবোধ থাকে না।

৪) **সাধারণ মানুষের দয়া**—সাধারণ মানুষদের দয়ার মধ্যে মালিন্য থাকে। কারোর হিতের জন্য চেষ্টা করার সময় তাদের মনে হয় 'আমি কত দয়ালু', লোকে আমাকে কত মহৎ বলে মনে করে ইত্যাদি। নিজেদের মধ্যে মহৎবুদ্ধি আরোপিত হওয়ায় এই দয়ার মধ্যে মালিন্য থাকে। আবার তার থেকেও সাধারণ মানুষের মধ্যে দয়া কেবল নিজের লোকেদের বা পরিবারের লোকেদের ওপর থাকে। এই দয়া মমত্বযুক্ততা হেতু অত্যন্ত অশুদ্ধ। এর থেকেও নিম্নশ্রেণীর লোকেরা কেবলমাত্র নিজেদের সুখ ও স্বার্থের জন্য দয়া প্রদর্শন করে থাকে।

১৭. **অলোলুপ্ত্বম্**—অন্যের ভোগবিলাস দেখে, নিজের মনেও ভোগ-বিলাসের ইচ্ছা হওয়াকে বলে লোলুপতা আর সর্বতোভাবে তার অবিদ্যমানতাকে বলে 'অলোলুপ্তবতা'। অলোলুপ্তবতার উপায় হল—

১) ইন্দ্রিয়াদির দ্বারা ভোগবুদ্ধিতে বিষয়াসক্ত না হওয়া।

২) কখনো মনে এমনভাব না আনা যে ইন্দ্রিয়াদির ওপর আমার অধিকার আছে বা তারা আমার বশীভূত।

৩) মন কখনো বিষয়াদিতে আকৃষ্ট হলে ভগবানের শরণ নেওয়া।

১৮. *মার্দবম্*—শরীরের প্রাধান্য নিয়ে আর্জবম্ ও চিত্তের প্রাধান্য নিয়ে মার্দবম্ হয়ে থাকে। যারা বিনা কারণে দুঃখ দেয় বা শত্রুতা করে, তাদের প্রতিও স্বাভাবিক কোমল ব্যবহারকে বলে 'মার্দব'।

১৯. *হ্রীঃ*—শাস্ত্র ও লোকমর্যাদার বিরুদ্ধে কাজ করতে গেলে যে দ্বিধা আসে তাকে বলে হ্রীঃ (লজ্জা)। সাধকের সাধন-বিরুদ্ধ কাজ করায় যে লোকলজ্জা থাকে তার থেকেই সাধক মন্দ কাজ করার হাত থেকে রক্ষা পান।

২০. *অচাপলম্*—কোনো কাজ করার সময় তাড়াহুড়া না করাকে বলে 'অচাপলম্'। সাত্ত্বিক ব্যক্তি সমস্ত কর্ম ধৈর্য সহকারে করেন।

মুক্তসঙ্গোঽনহংবাদী ধৃত্যুৎসাহসমন্বিতঃ।
সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোর্নির্বিকারঃ কর্তা সাত্ত্বিক উচ্যতে।। (গীতা ১৮।২৬)

সাত্ত্বিক ব্যক্তি আসক্তিবর্জিত, অহংকারবর্জিত হয়ে ধৈর্য এবং উৎসাহ-পূর্ণভাবে কর্ম করেন এবং সিদ্ধি-অসিদ্ধিতে তিনি হর্ষ-বিষাদরহিত থাকেন। এইভাবে সাত্ত্বিক ব্যক্তির কর্তব্যকর্ম ছাড়া কিছুতে আগ্রহ না থাকায় তাঁর চিত্ত বিক্ষিপ্ত বা চঞ্চল হয় না।

২১. *তেজঃ*—মহাপুরুষের সংস্পর্শে এলে, তাঁদের প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে সাধারণ মানুষও তাদের দুর্গুণ-দুরাচার বৃত্তি ত্যাগ করে সগুণ-সদাচারে ব্যাপৃত হয়। মহাপুরুষদের এই শক্তিকেই তেজ বলে। আবার ক্রোধী বা শক্তিশালী ব্যক্তিদের সামনে লোকে যে তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধ কাজ (নিজ ইচ্ছার বিরুদ্ধ কাজ) করতে ভয় পায় তা হল ক্রোধরূপ দোষের তেজ।

২২. *ক্ষমাঃ*—অকারণে যারা অপরাধ করে তাদের শাস্তি দেওয়ার ক্ষমতা থাকলেও তা সহ্য করা বা অগ্রাহ্য করাকেই বলা হয় ক্ষমা। কারোর কাছ থেকে সুখের আশা না করা এবং ক্ষতিকারীর মন্দ কামনা না করলেই ক্ষমার ভাব প্রস্ফুটিত হয়।

তবে ক্ষমায় ও অক্রোধে পার্থক্য আছে। অক্রোধে নিজের ওপর দৃষ্টি থাকে যাতে অন্যের অপরাধের ফলে নিজের অন্তরে ক্রোধ সৃষ্টি না হয়। আর ক্ষমায় দৃষ্টি থাকে যে অপরাধ করেছে তার ওপর, যাতে তার কোনো শাস্তি না হয়।

২৩. *ধৃতিঃ*—কোনো অনুকূল-প্রতিকূল অবস্থায় বিচলিত না হওয়ার শক্তিকেই বলে ধৃতি।

ধৃত্যা যয়া ধারয়তে মনঃপ্রাণেন্দ্রিয়ক্রিয়াঃ।
যোগেনাব্যভিচারিণ্যা ধৃতিঃ সা পার্থ সাত্ত্বিকী।। (গীতা ১৮।৩৩)

সাত্ত্বিকী ধৃতিসম্পন্ন ব্যক্তি মন-প্রাণ-ইন্দ্রিয়াদির সাহায্যে শুধু ভগবৎ প্রাপ্তির জন্য (অব্যভিচারিণী) ভজন, ধ্যান ও নিষ্কাম কর্মে ব্যাপৃত হয়।

বৃত্তিগুলি যদি সাত্ত্বিক হয় তবে ধৃতির পুষ্টি হয় আর বৃত্তিগুলি যদি রাজসিক বা তামসিক হয় তবে ধৃতি ঠিক থাকে না। তাই বিবেক দৃঢ় রাখার জন্য সতত সাত্ত্বিক কর্মই করা উচিত।

২৪. *শৌচম্ঃ*—বাহ্য ও অন্তর শুচিকে বলে শৌচম্।

'শৌচাৎ স্বাঙ্গজুগুপ্সা পরৈরসংসর্গঃ।' (যোগদর্শন ২।৪০)

অর্থাৎ শৌচের দ্বারা সাধকের নিজ শরীরের প্রতি ঘৃণা, অপবিত্র বুদ্ধি ও অপরের সংসর্গে অনিচ্ছা জন্মায়।

বাহ্য শৌচ চার প্রকারের—

শারীরিক শুদ্ধি—জলদ্বারা স্নান করলে শারীরিক শুদ্ধি হয়। অন্যভাবে দেখলে আরাম, আলস্য, শৌখিনতা দ্বারা শরীর অশুদ্ধ হয় পক্ষান্তরে তৎপরতা, পুরুষার্থ ও উদ্যমী হয়ে কর্ম করলে শরীর শুদ্ধ হয়।

বাচিক শুদ্ধি—মিথ্যাবলা, কটুবাক্য বলা, নিন্দা করা বা কুৎসা রটনা করাতে বাণী অশুদ্ধ হয়।

অনাবশ্যক বাক্য না বলা আর সত্য, প্রিয় ও হিতকর বাক্য বলা যাতে দেশ, গ্রাম, লোকালয়ের মঙ্গল হয় এবং লোকের পারমার্থিক উন্নতি হয় তা হল বাচিক শুদ্ধি।

কৌটুম্বিক শুদ্ধি— নিজ সন্তানের বা অন্য কুটুম্ব যাদের আমাদের ওপর ন্যায়সংগত অধিকার আছে, নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী তাদের হিতসাধন করাই হল কৌটুম্বিক শুদ্ধি।

আর্থিক শুদ্ধি—ন্যায়সংগতভাবে ও সততার সঙ্গে অর্থ উপার্জন করে, তা যথাসাধ্য অরক্ষিত, অভাবগ্রস্ত দরিদ্র, রোগী, ক্ষুধার্থ বা অসহায় মহিলাদের বা গোব্রাহ্মণের সেবায় ব্যয় করলে দ্রব্যশুদ্ধি হয়। আবার এই অর্থ যদি ত্যাগী-বৈরাগী, সাধু-মহাত্মা বা ভগবদ্‌সেবায় ব্যয় করা যায় তবে অর্থ মহাশুদ্ধ হয়। পরমাত্মা প্রাপ্তির উদ্দেশ্য দৃঢ় হলে নিজের (স্বয়ং) শুদ্ধি হয় এবং স্বয়ংশুদ্ধি হলে শরীর, বাক্য, আত্মীয় বা অর্থ সবই পবিত্র হতে থাকে। ইহা দেহের অহং-মমত্ব বোধ ত্যাগে সাহায্য করে ও ভগবৎ সাধনের নিমিত্ত হয়।

২৫. *অদ্রোহ*—অনিষ্টকারীর প্রতি প্রতিশোধ নেওয়ার যে স্পৃহা তাকে বলে দ্রোহ। কিন্তু যাদের পরমাত্মা প্রাপ্তির উদ্দেশ্য থাকে তাদের মনে প্রতিশোধ নেওয়ার স্পৃহা আসেই না, তাঁরাই হলেন 'অদ্রোহ'।

'নিজ প্রভুময় দেখহিঁ জগৎ কেহি সন করহিঁ বিরোধ।' (রা.মা. ৭।১১২খ)

ক্রোধ হল তৎক্ষণাৎ জ্বালা আর দ্রোহ হল সুযোগ পেলে অনিষ্ট করব এই চিন্তা।

২৬. *নাতিমানিতাঃ*—মানিতা ও অতিমানিতা না থাকাই হল নাতিমানিতা। মানিতা দুই প্রকার।

সাংসারিক মানিতা— অর্থ, বিদ্যা, বুদ্ধি, অধিকার, পদ, বর্ণ, আশ্রম ইত্যাদির নিমিত্ত অন্যদের থেকে নিজেকে শ্রেষ্ঠ বোধই হল সাংসারিক মানিতা।

পরমার্থিক মানিতা— সাধনার প্রারম্ভে যখন নিজের মধ্যে দৈবীসম্পদ প্রকটিত হতে থাকে এবং অন্যদের প্রশংসাপ্রাপ্তি ঘটে, তখন সাধকের মনে যে বিশেষ ভাবের উদয় হয় তাকেই বলে পারমার্থিক মানিতা। সাধনার ন্যূনতা হলেই এরূপ হয়।

২৭. *অতিমানিতা*—জনসাধারণের কাছ থেকে মান আশা করা হল মানিতা ও যাদের কাছ থেকে শিক্ষা লাভ করেছি বা আদর্শ গ্রহণ করেছি তাদের কাছ থেকেও শ্রদ্ধা লাভের ইচ্ছা অতিমানিতা। যতক্ষণ সাধকের নিজের ব্যক্তিত্ব (অহংবোধ) থাকে ততক্ষণ সাধকের নিজেকে অন্যের থেকে বিশেষ বলে মনে হয়। কিন্তু যেমন যেমন অহংবোধ দূর হয় তেমন তেমন এই মানিতা দূর হয় এবং সাধকের দৈবীসম্পদের গুণ বৃদ্ধি পেলে নাতিমানিতা প্রকটিত হয়।

পরমাত্মা প্রাপ্তি উদ্দেশ্য হলে, সাধকের মধ্যে এই দৈবীসম্পদ স্বাভাবিকভাবেই ফুটে ওঠে। সাধক কিন্তু কখনো যেন এই গুণগুলি পূর্ব-জন্মের সংস্কার বা পুরুষার্থ দ্বারা উপার্জিত বলে মনে না করেন। এই দৈবীসম্পদের গুণগুলি সাধকদের নিজের বলে মনে করা উচিতও নয়, কারণ এইগুলি পরমাত্মার সম্পদ, কারো নিজের নয়।

দৈবীসম্পদ থেকে কখনো আসুরীসম্পদের উদয় হয় না, কিন্তু দৈবী-সম্পদের গুণগুলির মধ্যে কিছু অসাধন থাকায় অহং-অভিমান এসে যায়। কিন্তু শরণাগত ভক্তর মধ্যে এই দৈবীসম্পদ স্বাভাবিকভাবেই এসে যায়। আবার যাদের আত্মজ্ঞান হয়েছে তাদের দেহপ্রীতি শিথিল হয়ে যায় এবং যাদের কৃষ্ণজ্ঞান হয়েছে তাদেরও আত্মপ্রীতি শিথিল হয়।

রাজা পরীক্ষিত শ্রীশুকদেবকে জিজ্ঞাসা করছেন—

'ব্রহ্মন্ পরোদ্ভবে কৃষ্ণে ইয়ান্ প্রেমা কথং ভবেৎ।' (ভা. ১০।১৪।৪৯)

হে ব্রহ্মন্, ব্রজবাসীদের নিজপুত্রেও যে ভালোবাসা দেখা যায় না, তা পরপুত্র শ্রীকৃষ্ণের প্রতি কীকরে হল ? শ্রীশুকদেব বলছেন—যারা মূঢ়তাবশত দেহকেই আত্মা বলে মনে করে তাদেরই দেহ বা দেহাদিবস্তুতে অত্যন্ত প্রিয়ভাব থাকে, ভক্তদের নয়।

যজ্জীর্যত্যপি দেহেঽস্মিন্ জীবিতাশা বলীয়সী। (ভাঃ ১০।১৪।৫৩)

তাদের শরীর রুগ্ন ও শীর্ণপ্রায় হলেও আসক্তিবশত জীবিত থাকার প্রবল ইচ্ছা থাকে। ইহাই আসুরীসম্পদ।

আর ভগবানে অনন্য প্রেম হলে, প্রাণের মোহ তো থাকেই না, তখন আসুরীসম্পদ দূর হয়ে দৈবীসম্পদ স্বতঃ প্রকটিত হয়।

প্রেম ভগতি জল বিনু রঘুরাঈ। অভিঅন্তর মল কবহুঁ ন জাঈ॥

(শ্রীরামচরিতমানস ৭।৪৯।৩)

দৈবীসম্পদের লক্ষণ ভগবান গীতায় সিদ্ধ-সাধকদের লক্ষণ হিসাবে প্রায়শ স্থানেই বর্ণনা করেছেন—

স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ—

'প্রজহাতি যদা কামান্.......স শান্তিমধিগচ্ছতি।' (গীতা ২।৫৫-৭১)

কর্মযোগীর লক্ষণ—

'জিতাত্মনঃ প্রশান্তস্য.........সমবুদ্ধির্বিশিষ্যতে।' (গীতা ৬।৭-৯)

ভক্তের লক্ষণ—

'অদ্বেষ্টা সর্বভূতানাং......ভক্তিমান্ মে প্রিয়ো নরঃ।' (গীতা ১২।১৩-১৯)

জ্ঞানীর লক্ষণ—

'অমানিত্বমদম্ভিত্বমহিংসা.....অজ্ঞানং যদাতোঽন্যথা।' (গীতা ১৩।৭-১১)

গুণাতীতের লক্ষণ—

'প্রকাশং চ প্রবৃত্তিং চ.......গুণাতীতঃ স উচ্যতে।' (গীতা ১৪।২২-২৫)

আসুরী সম্পদ্ (শ্লোক ৪-২২)

স্বভাবের বিভাগ—

দৈব ও আসুর	৫-৬
আসুরীসম্পদের লক্ষণ	৪
আসুরীসম্পদের কারণ	
অশিক্ষা-অসদ্ভাব-অসদ্বিচার	৭-৯
আসুরীসম্পদের মূল স্বভাব—	
কামনা-দম্ভ-গর্ব	১০-১২
আসুরীসম্পদের অন্যান্য স্বভাব—	
লোভ-ক্রোধ-অহংকার	১৩-১৫
আসুরীসম্পদসম্পন্ন ব্যক্তির আচরণ	১৭-১৮
আসুরীসম্পদসম্পন্ন ব্যক্তির গতি	১৬, ১৯-২২
শাস্ত্রবিধি ত্যাগকারী ও অনুসরণকারীদের গতি	২৩-২৪

স্বভাবের বিভাগ—(শ্লোক ৫, ৬)

ভগবান এখানে মানুষের দুইটি স্বভাবের কথা উল্লেখ করেছেন, দৈবী ও আসুরী।

দৈবী সম্পদ্বিমোক্ষায় নিবন্ধায়াসুরী মতা।
মা শুচঃ সম্পদং দৈবীমভিজাতোঽসি পাণ্ডব॥
দ্বৌ ভূতসর্গৌ লোকেঽস্মিন্ দৈব আসুর এব চ।
দৈবো বিস্তরশঃ প্রোক্ত আসুরং পার্থ মে শৃণু॥ (গীতা ১৬।৫-৬)

'দৈবীসম্পদ মুক্তির হেতু এবং আসুরীসম্পদ সংসারে বন্ধনের হেতু। হে পাণ্ডব ! তুমি দৈবীসম্পদই লাভ করেছ, অতএব তোমার শোকের

কোনো কারণ নেই।

ইহলোকে (জগতে) দুই প্রকার স্বভাবযুক্ত প্রাণী আছে—দৈবী ও আসুর। দৈবী প্রকৃতির বর্ণনা বিস্তারিতভাবে বলেছি। হে পার্থ ! এখন আসুরী প্রকৃতির বিস্তারিত বর্ণনা আমার কাছে শোনো।' (গীতা ১৬।৫-৬)

এখানে ভূত অর্থ—মানুষ, দেবতা, অসুর, রাক্ষস, ভূত, প্রেত, পশু, পক্ষী, বৃক্ষ, লতা ইত্যাদি সব স্থাবর-জঙ্গমকে বোঝায়। তবে আসুরীভাব ত্যাগ করার বিচারশক্তি কেবল মানুষেরই আছে, তাই মানুষের আসুরী স্বভাব সর্বতোভাবে পরিত্যাগ করা উচিত। আর সেটি ত্যাগ হলে দৈবী-সম্পদ স্বতঃই প্রকট হয়। তবে যারা দৈবীসম্পদ বৃদ্ধির জন্য কিছু কিছু ভজন-স্মরণ, জপ-ধ্যান ইত্যাদি করেন আবার আসুরীসম্পদরূপী জাগতিক ভোগ এবং সংগ্রহেও ব্যাপৃত থাকেন তথা এটিকে প্রয়োজনীয় বলে মনে করেন তাঁরা প্রকৃত সাধক নন।

ভগবান এখানে **'লোকেঽস্মিন্'** অর্থাৎ ইহলোকে বা পৃথিবীর কথা বলেছেন যেখানে নতুন অধিকার পাওয়া যায়। এখানের মধ্যে আবার ভারতে জন্মগ্রহণও বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

ভাগবতের পঞ্চম স্কন্ধে শ্রীশুকদেব দেবতাদের কথা উদ্ধৃত করে বলছেন—

অহো অমীষাং কিমকারি শোভনং প্রসন্ন এষাং স্বিদুত স্বয়ং হরিঃ।
যৈর্জন্ম লব্ধং নৃষু ভারতাজিরে মুকুন্দসেবৌপয়িকং স্পৃহা হি নঃ॥

(ভাগবত ৫।১৯।২১)

'অহো ! যে জীবগণ ভারতবর্ষে ভগবানের সেবা করার যোগ্য মনুষ্য-জন্ম লাভ করেছেন, তারা এমন কী পুণ্য করেছেন যে তাঁদের ওপর স্বয়ং হরি প্রসন্ন হন। এই পরম সৌভাগ্য লাভের জন্য আমরাও নিরন্তর ব্যাকুল হই।'

বিষ্ণুপুরাণও বলছেন—

গায়ন্তি দেবাঃ কিল গীতকানি ধন্যাস্তু তে ভারতভূমিভাগে।
স্বর্গাপবর্গাস্পদমার্গভূতে ভবন্তি ভূয়ঃ পুরুষাঃ সুরত্বাৎ॥

(বিষ্ণুপুরাণ ২।৩।২৪)

দেবতাগণও নিরন্তর এই গীত করে থাকেন যে, যাঁরা স্বর্গ ও অপবর্গর (মোক্ষ) মার্গভূত ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করেছেন, সেইসব ব্যক্তি আমাদের মতো দেবতার থেকেও ধন্য।

মানুষের মধ্যে যারা সর্বভাবে দুর্গুণ-দুরাচারে ব্যাপৃত থাকে তারা চণ্ডাল বা পশু-পাখি ইত্যাদির থেকেও বেশি দোষী হয়। কারণ পাপযোনি সম্ভূত জীব পূর্বজন্মকৃত পাপবশত পাপযোনিতে জন্মগ্রহণ করে ও তার ফলভোগ করে উন্নতির দিকে অগ্রসর হয়। আর দুরাচারী ব্যক্তি নতুন নতুন পাপ করে পতনের দিকে নিপতিত হয়। কিছুটা দৈবীস্বভাব আর কিছুটা আসুরীস্বভাব অতি নীচ প্রাণীদের মধ্যেও স্বাভাবিকভাবে থাকে। দৃষ্টান্তস্বরূপ কয়েকটি ঘটনা উল্লেখ করা যায়।

(১) মহাভারতের শান্তিপর্বে শকুনিলুব্ধক নামে এক শিকারীর কথা আছে যাকে এক কপোত-কপোতি নিজ প্রাণত্যাগ করেও রক্ষা করেছিল ও স্বর্গলাভ করেছিল। শিকারীটিও তাদের মহানুভবতা দেখে তার শিকার জীবিকা ত্যাগ করে সাধনায় ব্যাপৃত হয় ও সদ্‌গতি লাভ করে।

(২) প্রসিদ্ধ জ্যোতিষাচার্য পণ্ডিত শ্রীরামশাস্ত্রী মহারাজ তাঁর ঘরের একটি পোষা কুকুরের কথা বলেছেন যার নাম নাগরীদাস। সেই কুকুরটি ভগবানের নাম-সংকীর্তনের সময় ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদত। প্রতি রবিবার, রামনবমী, জন্মাষ্টমী ও শিবরাত্রিতে সে উপোষ করত। এইরকম বহু জীবের মধ্যে সুসংস্কার দেখা যায়।

(৩) হৃষিকেশে স্বর্গাশ্রমে বটগাছের নীচে একটি সাপ থাকত। সেখানে এক সাধু থাকতেন। তিনি তাকে গীতা শোনাতেন আর সে গীতা শেষ হলেই চলে যেত।

পশু-পক্ষীদের মধ্যেও এরূপ দৈবীসম্পদ গুণ দেখা গেলেও এই সকল শরীরগুলি দৈবীসম্পদের বিকাশের ক্ষেত্র বা যোগ্যতাসম্পন্ন হয় না। কেবল মানুষের শরীরই সেই বিকাশের ক্ষেত্র বা তার যোগ্যতা থাকে। যেরকম পরিবারে বৃদ্ধ, বালক, পশু আদি সকলেরই ভরণপোষণের দায়িত্ব গৃহকর্তার, সেরকম মানুষেরও উচিত এগুলিকে রক্ষা করা—যার জন্যই

মানুষের সৃষ্টি হয়েছে। এগুলির মধ্যেও যে পশু-পক্ষী, বৃক্ষ-লতা সাত্ত্বিক, তাদের বিশেষভাবে রক্ষা করা উচিত যেমন গাভী, অশ্বত্থ ইত্যাদি। গাভীকে বলে **'গাবো বিশ্বস্য মাতরঃ'** অর্থাৎ গরু হচ্ছে জগৎ সৃষ্টির কারণ।

আর বৃক্ষদের মধ্যে ভগবান বলেছেন **'অশ্বত্থঃ সর্ববৃক্ষানাম্'** অর্থাৎ বৃক্ষদের মধ্যে আমি অশ্বত্থ বৃক্ষ। এইগুলিকে রক্ষা করলে দৈবীসম্পদ বিশেষ বৃদ্ধি পায়। আর ভগবান বলেছেন ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি, অর্থ, সম্পদাদি দ্বারা জীবের প্রতি যে কল্যাণভাব তাই দৈবীসম্পদ এবং ইহা **'বিমোক্ষায়'** অর্থাৎ মুক্তির কারণ। তবে মনে রাখতে হবে যে জীবমাত্রের প্রতি যে কল্যাণভাব তাও ভগবৎ প্রদত্ত বিভূতি, নিজের নয়। নিজের বলতে একমাত্র ভগবানই আছেন।

দৈবীসম্পদে মুক্তির কথা জানিয়ে ভগবান বলছেন আসুরীসম্পদ সংসার বন্ধনের হেতু। আসুরীসম্পদের মূল কথা হল জগৎ-সংসার বা শরীর ও প্রাণের ওপর আসক্তি, যেমন 'আমি সুখে থাকি, আমি মানসম্মান পেতে থাকি, আমার ভোগে বাধা না পড়ে' ইত্যাদি।

ভগবান এই অধ্যায়ে আসুরী-ব্যক্তিদের তিনটি ফলের কথা বলেছেন।

১) *আসুরীসম্পদের প্রথম ফল—*

(ক) পঞ্চম শ্লোকে **'নিবন্ধায়াসুরী মতাঃ'** অর্থাৎ আসুরীভাবাপন্নদের সাধারণ বন্ধনের কথা বলেছেন। যে ব্যক্তি কামনায় মগ্ন হয়ে বৈদিক যাগযজ্ঞাদি করেন তারাও পরমাত্মা-জ্ঞানরহিত হয়ে জন্ম-মৃত্যুরূপ বন্ধন-দশায় আবদ্ধ হন।

ভোগৈশ্বর্যপ্রসক্তানাং তয়াপহৃতচেতসাম্।
ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিঃ সমাধৌ ন বিধীয়তে।। (গীতা ২।৪৪)

(খ) আবার যিনি সংসারের ভোগবিলাস আকাঙ্ক্ষা না করে স্বর্গের দিব্য ভোগাদির নিমিত্ত শাস্ত্রবিহিত যজ্ঞ করেন, তিনিও স্বর্গ প্রাপ্ত হয়ে দিব্য ভোগ আস্বাদন করে পুণ্যক্ষয়ের পরে আবার জন্ম-মরণ চক্রে ফিরে আসেন।

তে তং ভুক্ত্বা স্বর্গলোকং বিশালং-
ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্যলোকং বিশন্তি।
এবং ত্রয়ীধর্মমনুপ্রপন্না
গতাগতং কামকামা লভন্তে॥ (গীতা ৯।২১)

(গ) যদি অহংভাব (আমি ভাব) রেখে যাবতীয় শুভকর্ম করা যায় তবে সেই সংস্কাররূপ বীজই পরিপুষ্ট হয়ে ফল দেয়। সকাম মানুষের অহংবোধের যে সংস্কার তাতে অনিমা, লঘিমা আদি সিদ্ধিলাভ এমনকি ব্রহ্মলোক পর্যন্ত উচ্চলোক লাভ হতে পারে কিন্তু মুক্তিলাভ বা প্রেমলাভ হয় না।

আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্তিনোঽর্জুন।
মামুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে॥ (গীতা ৮।১৬)

২) *আসুরীসম্পদের দ্বিতীয় ফল—*

'ততো যান্ত্যধমাং গতিম্' এবং 'আসুরীষ্বেব যোনিষু' (গীতা ১৬।১৯-২০)

অর্থাৎ যার মধ্যে দুর্গুণ-দুর্ভাব থাকে এবং তার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে মাঝে মাঝে দুরাচার করে, সে সেই কর্ম অনুসারে প্রথমে অধম যোনি প্রাপ্ত হয় এবং পরে নিকৃষ্ট কর্ম অনুসারে আরও অধমগতি (আসুরী যোনি) প্রাপ্ত হয়।

৩) *আসুরীসম্পদের তৃতীয় ফল—*

'পতন্তি নরকেঽশুচৌ' (গীতা ১৬।১৬)

যে ব্যক্তি কামনার বশবর্তী হয়ে নিত্য পাপ, অন্যায়, দুরাচার করে থাকে তার নরকপ্রাপ্তিই হয়।

আসুরীসম্পদসম্পন্ন ব্যক্তিদের যত দুর্গুণ-দুরাচার সবই বিনাশশীল পদার্থের আসক্তি থেকে উদ্ভূত। তারা প্রাণকে বাঁচিয়ে রাখতে চায়, প্রাণেতেই তাদের ভালোবাসা, প্রাণের পোষণেই তাদের আনন্দ 'আসুষু (প্রাণেষু) রমন্তে ইতি অসুরাঃ।' আমি সুখে থাকব, আমি বেঁচে থাকব এই আকাঙ্ক্ষা আসুরীসম্পদের প্রধান লক্ষণ।

আর দৈবীসম্পদসম্পন্নদের প্রধান লক্ষণ হল, তাদের সম্মুখে পরিস্থিতি অনুকূল বা প্রতিকূল যাই হোক না কেন, তাদের দৃষ্টি সর্বদা নিজ আত্মকল্যাণের দিকে থাকে। অর্জুনও যুদ্ধের সময় কৌটুম্বিক মোহ

(আসুরীসম্পদ) ও পাপের ভয় (দৈবীসম্পদ) সত্ত্বেও নিজ কল্যাণ সম্বন্ধে সচেতন। তাই অর্জুন বারংবার বলছেন **'অহো বত মহৎ পাপং কর্তুং ব্যবসিতা বয়ম্'** (গীতা ১।৩৫), **'যচ্ছ্রেয় স্যান্নিশ্চিতং ব্রুহি তন্মে'** (গীতা ২।৭), **'তদেকং বদ নিশ্চিত্য যেন শ্রেয়োঽহমাপ্নুয়াম্'** (গীতা ৩।২), **'যচ্ছ্রেয় এতয়োরেকং তন্মে ব্রুহি সুনিশ্চিতম্'** (গীতা ৫।১)।

ভগবান অর্জুনের আকুলতা দেখে **'মা শুচঃ'** বলে আশ্বাস দিয়েছেন। গীতায় ভগবান দুবার **'মা শুচঃ'** বলেছেন। একবার বর্তমান শ্লোকে (**মা শুচঃ সম্পদম্ দৈবীম্**) , আর একবার অষ্টাদশ অধ্যায়ে ৬৬ তম শ্লোকে (**অহং ত্বা সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ**)। একবার বলেছেন সাধনের জন্য চিন্তা করতে হবে না এবং অন্যবার বলেছেন সিদ্ধির জন্য চিন্তা করতে হবে না। তবে অর্জুন নিজের দৈবীসম্পদ দেখতে পাননি কেন ? কেননা শ্রেষ্ঠ পুরুষগণ নিজেদের ভালোগুণ দেখতে পান না, তাঁরা সদগুণের সঙ্গে অভিন্ন হয়ে যান। যতক্ষণ নিজ গুণ পরিলক্ষিত হয় ততক্ষণ বুঝতে হবে যে পূর্ণরূপে নিজের মধ্যে সদ্গুণ আসেনি অর্থাৎ সদ্গুণের সঙ্গে সামান্য পরিমাণে হলেও দুর্গুণ টিকে আছে। এক্ষেত্রে ভগবান তাই অর্জুনকে আশ্বাস দিয়েছেন যে তোমার মধ্যে স্বাভাবিক দৈবীসম্পদ বিরাজমান, তা যদি বুঝতে নাও পারো তার জন্য চিন্তা করো না।

অনেক সময় যখন সৎসঙ্গ, স্বাধ্যায় ইত্যাদি দ্বারা মানুষ পরমাত্মা প্রাপ্তির কথা চিন্তা করে, তখন সে দৈবীসম্পদ আশ্রয় করতে চায়। যখন সে এই দৈবীসম্পদ কর্ম (বা পুরুষার্থ) দ্বারা অর্জন করতে চায় তখন তার 'আমি সত্যবাদী', 'আমি ভালোলোক' ইত্যাদি অহংবোধ জাগে। ফলে দৈবীসম্পদ প্রাপ্তির চেষ্টা করলেও তার আসুরীভাব পরিত্যক্ত হয় না এবং সে সাধনের উচ্চস্তরে উঠতে পারে না। আসলে আসুরীসম্পদের মূল কারণ হল বিনাশশীল বস্তুর (জগৎ-সংসারের) প্রতি আসক্তি এবং তা ত্যাগ করলেই দৈবীসম্পদ স্বতঃই প্রকটিত হয়। অর্জুনের দৈবীসম্পদ প্রথম থেকেই ছিল ও আসুরীসম্পদ আগন্তুকরূপে এসেছিল, ভগবৎকৃপায় তা দূর হওয়ায় গীতার শেষ অধ্যায়ে অর্জুন বলছেন—**'নষ্টো মোহঃ স্মৃতির্লব্ধা**

তৎপ্রসাদাৎ ময়াচ্যুত' (গীতা ১৮।৭৩)। তাঁর দৈবীসম্পদরূপী স্মৃতি ফিরে এসেছে এবং আসুরীসম্পদরূপী মোহ নাশ হয়েছে।

ভগবান ইতিপূর্বে (প্রথম থেকে তৃতীয় শ্লোক পর্যন্ত) দৈবীসম্পদ বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন তাই তিনি এখন আসুরীসম্পদের বর্ণনা শুরু করলেন।

আসুরীসম্পদের লক্ষণ—(শ্লোক ৪)

ভগবান দৈবীসম্পদসম্পন্ন লোকের অর্থাৎ যাদের পরমার্থ লাভই উদ্দেশ্য থাকে তাদের কথা বলে এখন প্রাণপোষণ পরায়ন অর্থাৎ যাদের বিষয়ভোগ বা সম্পদ সংগ্রহই একমাত্র উদ্দেশ্য থাকে তাদের লক্ষণ বলেছেন।

দম্ভো দর্পোঽভিমানশ্চ ক্রোধঃ পারুষ্যমেব চ।
অজ্ঞানং চাভিজাতস্য পার্থ সম্পদমাসুরীম্॥ (গীতা ১৬।৪)

'হে পার্থ! দম্ভ, দর্প, অহংকার, ক্রোধ, কঠোরতা এবং অবিবেচকতা —এইগুলিই আসুরীসম্পদ প্রাপ্ত ব্যক্তির লক্ষণ।' (গীতা ১৬।৪)

ভগবান এখানে ৬টি আসুরী লক্ষণের কথা বলেছেন।

১) **দম্ভ**—মানুষ যখন প্রাণ, দেহ, অর্থ, সম্পদ, মানমর্যাদা ইত্যাদিকে প্রাধান্য দিতে থাকে, তখন নিজের অবস্থিতি সেরূপ না হলেও যে ভান দেখায় তাই দম্ভ।

সদগুণ-সদাচারের দম্ভ— নিজেকে ধর্মাত্মা, সাধক, বিদ্বান ভাবা এবং নিজে সেরূপ না হয়েও সেরূপ ভাব প্রকাশ করা, ভোগী হয়েও যোগীর ভাব দেখানো হল সদাচারের দম্ভ।

দুর্গুণ-দুরাচারের দম্ভ—যাদের আচার-ব্যবহার অশুদ্ধ নয় এরূপ ব্যক্তি সমাজে মানসম্মান পাওয়া বা প্রদর্শনের জন্য (সমাজে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার জন্য) দুর্গুণ-দুরাচারী লোকের সঙ্গে খাওয়াদাওয়া, তাদের আচার-ব্যবহার অনুকরণ করাকে বলে দুর্গুণ-দুরাচারের দম্ভ। তাদের এরূপ আচরণের কারণ হল যাতে তথাকথিত আধুনিক লোকেদের দৃষ্টিতে তারা হেয় না হয়ে যায়।

২) **দর্প**—অহংকারকে বলা হয় দর্প। এই অহংকার বাহ্যিক

জিনিস নিয়ে হয়, যেমন আমার এত অর্থ আছে, আমি এই পদে অধিষ্ঠিত আছি, আমার এত অনুগামী, আমার এত ক্ষমতা, আমার এত যশ-প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি।

৩) *অভিমান*—বিদ্যা, বুদ্ধি ইত্যাদি অভ্যন্তরীণ বিষয় নিয়ে যে শ্রেষ্ঠত্ব অনুভূতি হয় তাকে বলে অভিমান। আমি জাতিতে কুলীন, আমি খুব বিদ্বান, আমার অণিমা-লঘিমা আদি সিদ্ধিগুলো করায়ত্ব ইত্যাদি এই অভিমানের অঙ্গ।

৪) *ক্রোধ* — অন্যের অনিষ্ট করার জন্য চিত্তে যে জ্বালার সৃষ্টি হয় তাকেই বলে 'ক্রোধ'। মানুষের যখন স্বার্থ বা কামনায় বাধা পড়ে তখন 'ক্রোধ' সৃষ্টি হয়।

পিতামাতারা অনেক সময় বাচ্চাদের দুষ্টুমির জন্য তাড়না করেন—তা ক্রোধ নয়, সেটা হল ক্ষোভ। কিন্তু যখন উত্তেজিত হয়ে অপরের অনিষ্ট বা অহিত করা হয় বা তাদের দুঃখ দিয়ে আনন্দ অনুভব হয় সেটি হল ক্রোধ। ক্রোধান্বিত ব্যক্তি উত্তেজিত হয়ে নিজের তো ক্ষতি করেই, অপরেরও অপকার করে। ক্রোধী ব্যক্তি যার অপকার করে তার পাপক্ষয় হয় কিন্তু ক্রোধী নিজের জন্য পাপ সঞ্চয় করে।

> ক্রোধো হি শত্রুঃ প্রথমো নরাণাং দেহস্থিতো দেহবিনাশনায়।
> যথাস্থিতঃ কাষ্ঠগতো হি বহ্নিঃ স এব বর্হ্নিদহতে শরীরম্॥

ক্রোধই মানুষের প্রথম শত্রু যা দেহে অবস্থান করে দেহেরই বিনাশ করে। যেমন কাষ্ঠস্থিত অগ্নি কাঠকেই জ্বালায়, তেমনি দেহস্থিত ক্রোধরূপ অগ্নি দেহকেই দগ্ধ করে।

৫) *পারুষ্যম্*—কঠোরতাকে বলে পারুষ্য। এটির কয়েকটি ভাগ—

শারীরিক পারুষ্য—উদ্ধত ভাব।

চোখের পারুষ্য—কুটিলভাবে ও রাগতভাবে তাকানো।

বাক্যের পারুষ্য—কঠোর ভাষা ব্যবহার করা যাতে লোকে ভীতসন্ত্রস্ত হয়।

হৃদয় পারুষ্য—অন্যের বিপদ, সংকট, দুঃখ এলেও তাকে সাহায্য করতে না যাওয়া এবং খুশি হওয়া। স্বার্থভাব আধিক্যের জন্য এই প্রকার

মানুষের মধ্যে স্বতঃই ক্রূরতা এসে যায় আর তার ফলে তাদের আচার-ব্যবহারে কঠোরতা পরিলক্ষিত হয়।

৬) *অজ্ঞানম্*—অবিবেচনাকে বলা হয় অজ্ঞান।

অবিবেচক ব্যক্তিদের সৎ-অসৎ, সার-অসার, কর্তব্য-অকর্তব্য ইত্যাদির বোধ থাকে না। কেননা তাদের দৃষ্টি থাকে বিনাশশীল পদার্থের ভোগ ও সংগ্রহের দিকে। পশুর ন্যায় প্রাণধারণেই ব্যাপৃত থাকায় এঁরা কর্তব্য-অকর্তব্য জানতেও পারে না, জানতে চায়ও না।

আসুরীসম্পদের কারণ—(শ্লোক ৭-৯)

অশিক্ষা-অসদ্‌ভাব-অসদ্‌বিচার

প্রবৃত্তিঞ্চ নিবৃত্তিঞ্চ জনা ন বিদুরাসুরাঃ।
ন শৌচং নাপি চাচারো ন সত্যং তেষু বিদ্যতে॥
অসত্যমপ্রতিষ্ঠং তে জগদাহুরনীশ্বরম্।
অপরস্পরসম্ভূতং কিমন্যৎ কামহৈতুকম্॥
এতাং দৃষ্টিমবষ্টভ্য নষ্টাত্মানোঽল্পবুদ্ধয়ঃ।
প্রভবন্ত্যুগ্রকর্মাণঃ ক্ষয়ায় জগতোঽহিতাঃ॥

(গীতা ১৬।৭-৯)

'প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি কী তা আসুরীসম্পদসম্পন্ন ব্যক্তিগণ জানে না এবং তাদের মধ্যে বাহ্যশুদ্ধি, আচার শুদ্ধি বা সত্যপালন বলেও কিছু থাকে না।

আসুরী প্রকৃতির লোকেরা বলে থাকে যে এই জগৎ অসত্য, শৃঙ্খলাবিহীন এবং ঈশ্বরবিহীন আর এর সৃষ্টি স্ত্রী-পুরুষের কামের দ্বারাই হয়েছে।

এইরূপ মানুষেরা (নাস্তিকভাবসম্পন্ন) নিত্যস্বরূপ জানে না, তারা অল্পবুদ্ধি, উগ্রকর্মা ও জগতের শত্রু এবং তাদের সামর্থ্য জগতের বিনাশের জন্যই হয়ে থাকে।' (গীতা ১৬।৭-৯)

প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তিকে কীরূপে জানা যায় ?

এটি গুরুর সাহায্যে, গ্রন্থের সাহায্যে, মহাপুরুষের সংস্পর্শে এলে বা

তীর্থাদিতে গিয়ে বিবেক জাগ্রত হলে জানা যায়। প্রাণীমাত্রেরই বিবেক থাকে, কিন্তু পশু-পক্ষীর মধ্যে এটি বিকশিত করার অবকাশ, ব্যবস্থা বা যোগ্যতা নেই, যা মানুষের মধ্যে আছে। পশু-পক্ষী ভোগযোনি হওয়ায় কর্মফল ভোগে পরাধীন কিন্তু মনুষ্য যোনি সাধন-যোনি হওয়ায় সর্বতোভাবে স্বাধীন। অর্থাৎ প্রারব্ধ অনুসারে সুখ-দুঃখের পরিস্থিতি উপস্থিত হলেও সাধনার প্রভাবে তারা তাতে সমভাবাপন্ন থাকতে পারেন। ভগবান আসুরীসম্পদ বর্ণনা প্রসঙ্গে এই অধ্যায়ের সপ্তম (জনাঃ) থেকে ঊনবিংশ শ্লোক (নরাধমান্) অবধি কোথাও মনুষ্যবাচক শব্দ ব্যবহার করেননি। কারণ আসুরী ভাবসম্পন্ন ব্যক্তিরা নতুন নতুন পাপ করায় পশু ও নারকীয় প্রাণীদের থেকেও অধম। মানুষ যেমন যেমন আসুরীসম্পদের দিকে অগ্রসর হয় তেমন তেমন তার বিবেকও লোপ পেতে থাকে। ভোগপরায়ণ হওয়ায় আসুরী ব্যক্তি জানতেই পারে না তার কী করা উচিত, কী করা উচিত নয়।

পারমার্থিক উন্নতির ব্যাপারে তাদের বুদ্ধি শিথিল হলেও, জাগতিক ভোগের ব্যাপারে তারা কিন্তু খুবই সজাগ থাকে।

আসুরীসম্পদের মূল স্বভাব—(শ্লোক ১০-১২)

কামনা-দম্ভ-গর্ব

কামমাশ্রিত্য দুষ্পূরং দম্ভমানমদান্বিতাঃ।
মোহাদ্ গৃহীত্বাসদ্গ্রাহান্ প্রবর্তন্তেঽশুচিব্রতাঃ॥
চিন্তামপরিমেয়াঞ্চ প্রলয়ান্তামুপাশ্রিতাঃ।
কামোপভোগপরমা এতাবদিতি নিশ্চিতাঃ॥
আশাপাশশতৈর্বদ্ধাঃ কামক্রোধপরায়ণাঃ।
ঈহন্তে কামভোগার্থমন্যায়েনার্থসঞ্চয়ান্॥

(গীতা ১৬।১০-১২)

'এই আসুরীভাবাপন্ন ব্যক্তিরা অপূরণীয় কামনার বশবর্তী হওয়ায় দম্ভ, অহংভাব ও গর্বে মত্ত হয়ে জগতে বিচরণ করে।

তারা আমৃত্যু সম্পদ-সংগ্রহ ও ভোগের অশেষ চিন্তায় মগ্ন থেকে তাতেই জীবনের সাফল্য মনে করে।

এইরূপে আশার শতবন্ধনে আবদ্ধ থেকে কাম ও ক্রোধ পরায়ণ হয়ে

তারা অর্থ সংগ্রহ বা লোভে মত্ত থাকে।' (গীতা ১৬।১০-১২)

তারা মনে করে যেহেতু আমরা চিন্তা করি, বিচার করি, কামনা করি, উদ্যোগ করি তাই বস্তু লাভ হয়। কিন্তু তারা বোঝে না যে জীবন-নির্বাহ কোনো বস্তুর অধীন নয়, ইহা প্রারব্ধের অধীন। শ্রীরামচরিতমানসে তাই তুলসীদাসজী মহারাজ বলেছেন—

প্রারব্ধ পহলে রচা, পীছে রচা শরীর।
তুলসী চিন্তা কিঁউ করে, ভজ লে শ্রীরঘুবীর॥

তাই সাধুবাক্যেও আছে—

মুরদেকো হরি দেত হ্যায়, কপড়ো লকড়ী আগ।
জীবিত নর চিন্তা করে, উনকা বড়া অভাগ॥

আসুরীসম্পদের অন্যান্য ভাব—(শ্লোক ১৩-১৫)

লোভ-ক্রোধ-অহংকার

ইদমদ্য ময়া লব্ধমিমং প্রাপ্স্যে মনোরথম্।
ইদমস্তীদমপি মে ভবিষ্যতি পুনর্ধনম্॥
অসৌ ময়া হতঃ শত্রুর্হনিষ্যে চাপরানপি।
ঈশ্বরোঽহমহং ভোগী সিদ্ধোঽহং বলবান্ সুখী॥
আঢ্যোঽভিজনবানস্মি কোঽন্যোঽস্তি সদৃশো ময়া।
যক্ষ্যে দাস্যামি মোদিষ্য ইত্যজ্ঞানবিমোহিতাঃ॥

(গীতা ১৬।১৩-১৫)

'তারা এই মনোবাসনা পোষণ করে যে আমি এত বস্তু পেয়েছি এবং আমার বাকি ঈপ্সিত বস্তুও পেয়ে যাব। আমার এত ধন আছে আবার এত ধন আসবে।

আমি এই শত্রুকে নিধন করেছি ও অন্যদেরও মেরে ফেলব। আমি সব কিছু করতে সক্ষম। আমি সব রকমের সুখ-আরাম ভোগকারী, আমি সিদ্ধ, আমি বলবান ও সুখী।

আমি ধনবান, আমি বহুজন পরিবৃত, আমার সমান কে ? সর্বদা মোহাচ্ছন্ন হয়ে ভাবে, আমি যজ্ঞ করব, দান করব, মজা করব ইত্যাদি।' (গীতা ১৬।১৩-১৫)

এর মধ্যে ত্রয়োদশ শ্লোকটি, একাদশ শ্লোকের '**কামোগভোগপরমাঃ**'র ব্যাখ্যা। চতুর্দশ শ্লোকটি, দ্বাদশ শ্লোকের '**কামক্রোধপরায়নায়**'র ব্যাখ্যা এবং পঞ্চদশ শ্লোকটি আসুরীভাবাপন্ন লোকের মূঢ়তার লক্ষণ।

আসুরীসম্পদসম্পন্ন ব্যক্তির আচরণ—(শ্লোক ১৭-১৮)

আত্মসম্ভাবিতাঃ স্তব্ধা ধনমানমদান্বিতাঃ।
যজন্তে নামযজ্ঞৈস্তে দম্ভেনাবিধিপূর্বকম্॥
অহঙ্কারং বলং দর্পং কামং ক্রোধঞ্চ সংশ্রিতাঃ।
মামাত্মপরদেহেষু প্রদ্বিষন্তোঽভ্যসূয়কাঃ॥

(গীতা ১৬।১৭-১৮)

'এই আসুরীসম্পদসম্পন্ন লোকেরা নিজেকে সবথেকে শ্রদ্ধার পাত্র বলে মনে করে, তারা অবিনয়ী এবং ধন ও মানের গর্বে গর্বান্বিত হয়ে দম্ভ সহকারে অবিধিপূর্বক লোকদেখানো যাগযজ্ঞ করে থাকে।

তারা অহংকার, জেদ, দর্প, ক্রোধ ও কামনার বশবর্তী হয়ে নিজের ও অন্যদেহে অবস্থিত আমাকে দ্বেষ করে এবং সকলের গুণাবলীতেই দোষ দেখে।' (গীতা ১৬।১৭-১৮)

আসুরীসম্পদসম্পন্ন লোকেদের বিশেষ কিছু চারিত্রিক লক্ষণ ভগবান জানাচ্ছেন—

আত্মসম্ভাবিতা—নিজেকে সবচেয়ে শ্রদ্ধার পাত্র মনে করা।

স্তব্ধা—কারো কাছে নম্র বা নত না হওয়া।

ধনমানমদান্বিতাঃ—ধন ও অহংকারে সদা মত্ত হয়ে থাকা।

যজন্তে নামযজ্ঞৈস্তে দম্ভেন — নিজ মহিমা অর্জন করার নিমিত্ত লোক দেখানোর জন্য নামমাত্র যজ্ঞ করা।

অবিধিপূর্বকম্—শাস্ত্রবিধি অমান্য করা ও শাস্ত্র-নিষিদ্ধ কাজ করা।

মামাত্মপর দেহেষু প্রদ্বিষন্তঃ—আসুরীভাবাপন্ন লোকেরা নিজ হৃদয়ে বিরাজমান পরমাত্মার সঙ্গেও বিরোধিতা করে অর্থাৎ হৃদয়ে যে পবিত্রভাবের স্ফূরণ বা সুসিদ্ধান্তের উদয় হয় সেগুলিকে সঙ্গে সঙ্গেই অগ্রাহ্য করে বা অবদমিত রাখে। তারা অপরকে অবজ্ঞা করে, দুঃখ দেয় এবং দ্বেষ করে।

এইভাবে সকল প্রাণীদের প্রতি অনিষ্ট করার মাধ্যমেই ভগবানকে দ্বেষ করে।

আসুরীসম্পদসম্পন্ন ব্যক্তির গতি—(শ্লোক ১৬, ১৯-২২)

শ্রীভগবান আসুরীভাবাপন্ন ব্যক্তির জীবিত অবস্থায় নিত্য দুঃখ, জ্বালা, অশান্তির কথা বলে এবার তাদের মৃত্যুর পর নরকাদি প্রাপ্তির বিষয়ে জানাচ্ছেন—

অনেকচিত্তবিভ্রান্তা মোহজালসমাবৃতাঃ।
প্রসক্তাঃ কামভোগেষু পতন্তি নরকেঽশুচৌ॥

(গীতা ১৬।১৬)

তানহং দ্বিষতঃ ক্রূরান্ সংসারেষু নরাধমান্।
ক্ষিপাম্যজস্রমশুভানাসুরীষ্বেব যোনিষু॥
আসুরীং যোনিমাপন্না মূঢ়া জন্মনি জন্মনি।
মামপ্রাপ্যৈব কৌন্তেয় ততো যান্ত্যধমাং গতিম্॥
ত্রিবিধং নরকস্যেদং দ্বারং নাশনমাত্মনঃ।
কামঃ ক্রোধস্তথা লোভস্তস্মাদেতৎ ত্রয়ং ত্যজেৎ॥
এতৈর্বিমুক্তঃ কৌন্তেয় তমোদ্বারৈস্ত্রিভির্নরঃ।
আচরত্যাত্মনঃ শ্রেয়স্ততো যাতি পরাং গতিম্॥

(গীতা ১৬।১৯-২২)

'এই প্রকার অজ্ঞ, মোহগ্রস্ত এবং নানাভাবে বিভ্রান্তচিত্ত ও মোহজালে আচ্ছন্ন তথা বিষয়ভোগে অত্যধিক আসক্ত আসুরী প্রকৃতির ব্যক্তিগণ ভয়ানক অপবিত্র নরকে পতিত হয়। (গীতা ১৬।১৬)

আসুরীভাবসম্পন্ন, দ্বেষপরবশ, ক্রূর— এইসব নীচ অপবিত্র মানুষদের আমি বারংবার আসুরী যোনিতে নিক্ষেপ করি।

হে অর্জুন ! এই মূঢ়ব্যক্তিগণ তো আমাকে প্রাপ্ত হয়ই না, উল্টে জন্ম-জন্মান্তরে আসুরী যোনি প্রাপ্ত হয় এবং তার থেকেও অধোগতি অর্থাৎ নরকে গমন করে।

কাম, ক্রোধ এবং লোভ—এই তিনটিই নরকের দ্বারস্বরূপ এবং জীবাত্মার পতন ঘটায়, তাই এই তিনটিকেই ত্যাগ করা উচিত।

হে অর্জুন ! নরকের দ্বাররূপ এই তিনটি বৃত্তি থেকে মুক্ত হয়ে যে নিজ কল্যাণ আচরণে রত হয়, তিনিই পরমগতি প্রাপ্ত হন।' (গীতা ১৬।১৯-২২)

ভগবান বলছেন যে আসুরীসম্পদসম্পন্ন ব্যক্তিরা বিনা কারণে সকলের অনিষ্ট করার জন্য উদগ্রীব হয়ে থাকে, তারা অত্যন্ত ক্রূর, নির্দয় এবং হিংসুক হওয়ায় মানুষের মধ্যেও অতি নীচ অর্থাৎ নরাধাম হয়। এইসব মানুষকে অতি নীচ বলার অর্থ হল এই যে নরকস্থিত জীব বা পশু-পক্ষী আদি প্রাণী (চুরাশি লক্ষ যোনি) তাদের পূর্ব কর্মের ফল ভোগ করে শুদ্ধ হয়ে উঠছে আর এইসব আসুরীভাবসম্পন্ন ব্যক্তিরা অন্যায় পাপকর্ম করে পশু-পক্ষীর থেকেও অধম গতিতে গমন করছে।

কিন্তু এদের আসুরীযোনিতে নিক্ষেপ করার তাৎপর্য কী ?

ভগবান এইসব ক্রূর, নির্দয় মানুষের প্রতিও একাত্ম থাকেন। সাধারণ মানুষেরা যাদের প্রতি একাত্ম থাকে তাদের সুখ আরাম দিয়ে লৌকিক সুখে আবদ্ধ করে কিন্তু ভগবান যাকে আপন করেন, তাকে শুদ্ধ করার জন্য প্রতিকূল পরিস্থিতির (ভগবানের কৃপার) সাহায্য নেন, যাতে সে চিরকালের মতো সুখী থাকে এবং উদ্ধার লাভ করে। ভগবান এখানে বলেছেন **'মামপ্রাপ্যৈব'** অর্থাৎ অত্যন্ত কৃপা করে জীবেদের মনুষ্যজন্ম প্রদান করা হয় যাতে তারা নিজেদের উদ্ধার নিজে করতে পারে। কিন্তু নরাধমরা এত মূর্খ এবং বিশ্বাসঘাতক যে, যে শরীরের সাহায্য নিয়ে আমাকে পেতে পারত, তারা তার বিপরীত কর্ম করে অধমগতি প্রাপ্ত হয়। এই অধমগতি প্রাপ্তির পথে অনাচারী মানুষ যেসব কর্ম করে তার পরিণাম দুই প্রকারের হয়।

(১) বাহ্যিক ফলের অংশ, (২) অভ্যন্তরীণ সংস্কারের অংশ।

কাউকে দুঃখ দিলে দুঃখ প্রাপ্তকারীর যে কষ্ট হয় তা তার প্রারব্ধজনিত কর্মফল থেকে হয়। কিন্তু যে দুঃখ দেয় তার দুইপ্রকার ফল লাভ হয়।

(ক) নতুন পাপের সৃষ্টি হয় যার ফলে তার অধোগতি বা নরকভোগ হতে পারে।

(খ) আর অভ্যন্তরীণভাবে তাঁর চিত্তে দুষ্কর্মের সংস্কার প্রোথিত হয়, যার

ফলে তার আরো ভয়ঙ্কর ক্ষতি হয়। এই দুরাচারী সংস্কার তাঁকে জন্ম-জন্ম ধরে তাড়া করে এবং অপকর্মে প্ররোচিত করে যার ফলে সে বারংবার জন্ম-মৃত্যুর কবলে পড়ে। আর এই সংস্কার এতই প্রবল যে মানুষ ঊর্ধ্বগতিতে স্বর্গে গেলেও বা অধমগতিতে নরকে গেলেও তাদের সংস্কার বজায় থাকে কেননা এসবই 'ভোগযোনি'। তার সংস্কার পরিবর্তনের জন্য তাকে আবার মনুষ্য যোনির জন্য অপেক্ষা করতে হয়, কেননা মানব শরীরই কেবল নীচু সংস্কার থেকে উচ্চ সংস্কার তৈরি করতে পারে, যেহেতু মানুষই একমাত্র 'কর্মযোনি' বা 'সাধকযোনি'।

মানুষ পুণ্য কর্ম করলে স্বর্গে যায় ও তার শুভ সংস্কার থেকে যায়, আর পাপ কাজ করলে ইতরযোনি প্রাপ্ত হয় বা নরকে যায় এবং তার অশুভ সংস্কার বজায় থাকে। তাই কর্মফল ভোগের পর স্বর্গ ও নরক থেকে এরা কী সংস্কার নিয়ে আবার মনুষ্যলোকে আসে সে সম্বন্ধে বিষ্ণুপুরাণ বলেছেন—

স্বর্গভোগের পর মনুষ্যজন্ম নিলে তাদের সংস্কার এইরূপ হয়—

স্বর্গস্থিতানামিহ জীবলোকে চত্বারি তেষাং হৃদয়ে বসন্তি।
দানং প্রশস্তং মধুরা চ বাণী দেবার্চনং ব্রাহ্মণতর্পণং চ॥

(পদ্মপুরাণ সৃষ্টি. ৫১।১৩১)

এই সব লোকেদের মধ্যে চারটি লক্ষণ দেখা যায়—দানে প্রবৃত্তি, মধুর বাক্য, দেবতা ও ব্রাহ্মণদের পূজার্চনা দ্বারা সন্তুষ্ট করা।

আর নরক ভোগের পরে যখন প্রাণী মনুষ্যজন্ম গ্রহণ করে তার সংস্কার এইরূপ হয়—

কার্পণ্যবৃত্তিঃ স্বজনেষু নিন্দা কুচৈলতা নীচজনেষু ভক্তিঃ।
অতীব রোষঃ কটুকা চ বাণী নরস্য চিহ্নং নরকাগতস্য॥

(পদ্মপুরাণ সৃষ্টি. ৫১।১৩২)

এই মানুষেরা অত্যন্ত ক্রোধী, কটু বচন বলে, দরিদ্র আত্মীয়দের সঙ্গে শত্রুতা, নীচ লোকের সঙ্গ এবং নীচ ব্যক্তির সেবাই তাদের চরিত্র।

ভগবান আসুরী ভাবের কারণ সম্বন্ধে বলেছেন যে কাম, ক্রোধ ও লোভই এর মুখ্য কারণ। ভোগের ইচ্ছা হল কাম, সংগ্রহের ইচ্ছা হল লোভ এবং কাম ও লোভে বাধাদানকারীর ওপর হয় ক্রোধ। সমস্ত পাপই এই

তিনটি থেকে উৎপন্ন হয়।

মানুষ সাধনের দিকে যখন দৃষ্টি দেয় তখন জপ, ধ্যান, কীর্তন, সৎসঙ্গ, স্বাধ্যায়, তীর্থ, ব্রতাদি করে নিজেকে শুদ্ধ করে তোলার ব্যাপারে যত্নশীল হয় কিন্তু যেগুলি আমাদের নিত্য অশুদ্ধ করে থাকে সেই দুর্গুণ-দুরাচার (যথা কাম, ক্রোধ, লোভ) ত্যাগ করায় তত দৃষ্টি দেয় না। আর যদি আমাদের মধ্যে কাম, ক্রোধ, লোভ, মিথ্যা, কপটাচার প্রভৃত থাকে তবে নিত্যনতুন পাপ হতে থাকে, যার ফলে সাধনার সাক্ষাৎ ফল লাভ হয় না আর বহুবছর সাধনায় ব্যাপৃত থাকলেও সাধক তার উন্নতি বুঝতে পারে না বা বিশেষ কোনো পরিবর্তন অনুভব করে না।

ভগবান তাই বলেছেন **'এতৈর্বিমুক্ত'** হতে অর্থাৎ এইগুলি ত্যাগ করার আগ্রহ থাকা ও এদের বশীভূত হয়ে ক্রিয়াশীল না হওয়া। এই দোষগুলি বর্জিত হলে মানুষের শুদ্ধি স্বতঃ ও স্বাভাবিকভাবেই আসে। দৈবী-সম্পদশালী ব্যক্তিগণ তাই কাম-ক্রোধ-লোভ-এর বশবর্তী না হয়ে, নিজ কল্যাণের জন্য আচরণ করেন, তাতে জগতেরও হিতসাধন হয়।

আসুরীসম্পদের প্রধান কারণ হল কাম। এই অধ্যায়ের সপ্তম থেকে তেইশতম শ্লোকে ভগবান যে আসুরীভাবের কথা বলেছেন তাতে নয় বার কাম শব্দটি বলেছেন—১. **কামহৈতুকম্** (১৬।৮), ২. **কামমাশ্রিত্য** (১৬।১০), ৩. **কামোপভোগপরমাঃ** (১৬।১১), ৪. **কামক্রোধপরায়ণাঃ** (১৬।১২), ৫. **কামভোগার্থম্** (১৬।১২), ৬. **কামভোগেষু** (১৬।১৬), ৭. **কামম্** (১৬।১৮), ৮. **কামঃ** (১৬।২১), ৯. **কামকারতঃ** (১৬।২৩)। ইহাতেই বোঝা যায় কামনা কতটা ক্ষতিকারক।

শাস্ত্রবিধি ত্যাগকারী ও অনুসরণকারীদের গতি—(শ্লোক ২৩-২৪)

যঃ শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য বর্ততে কামকারতঃ।
ন স সিদ্ধিমবাপ্নোতি ন সুখং ন পরাং গতিম্॥
তস্মাচ্ছাস্ত্রং প্রমাণং তে কার্যাকার্যব্যবস্থিতৌ।
জ্ঞাত্বা শাস্ত্রবিধানোক্তং কর্ম কর্তুমিহার্হসি॥

(গীতা ১৬।২৩-২৪)

'যেসব ব্যক্তি শাস্ত্রবিধি পরিত্যাগ করে নিজের মতো আচরণ করে তারা

সিদ্ধিলাভ করে না, সুখও পায় না, পরমগতি বা মোক্ষলাভ তো দূরের কথা।

অতএব কর্তব্য-অকর্তব্য নিরূপণে শাস্ত্রই প্রমাণ এই জেনে শাস্ত্রবিধি অনুসারেই কর্তব্য পালন করা উচিত।' (গীতা ১৬।২৩-২৪)

যাদের মধ্যে দম্ভ, অহংকার বা কামনা, লোভ, ক্রোধ আদি আসুরী গুণগুলি প্রবল তারা শাস্ত্রবিধি অনুসরণ না করে বাহ্যিক আচরণপূর্বক কর্ম করাকেই শ্রেষ্ঠ মনে করে। তার কারণ লোকেরা বাহ্যিক আচরণই বিশেষভাবে লক্ষ করে, অন্তরের ভাব জানার লোক খুবই কম হয়।

অন্তরে যদি দুর্গুণ-দুর্ভাবনা থাকে আর বাহ্যিকভাবে মস্ত বড় ত্যাগী তপস্বী হয় তবে সে অহংকারবশত অন্যের সঙ্গে রূঢ় ব্যবহার করে আর তার বৃদ্ধিপ্রাপ্ত এই দেহাভিমানের ফলে তার গুণগুলি দোষে, মহিমা নিন্দায়, ত্যাগ রাগে ও যোগ ভোগে পরিণত হয় এবং শীঘ্রই তার পতন হয়। তাই আসুরীসম্পদসম্পন্ন লোকেরা শাস্ত্রবিধি পরিত্যাগ করে যদি কিছু শুভ কাজও করে তবু তাদের অন্তরের শুদ্ধিরূপ যে সিদ্ধি তা না থাকায় পরমগতি অর্থাৎ মোক্ষ কিছুতেই লাভ হয় না। তারা অহংকারবশত নিজেদের সফল ও সুখী মনে করলেও (**'সিদ্ধোঽহং বলবানসুখী'** গীতা ১৬।১৪), তারা সুখী হতে পারে না, কেননা তাদের মনে অহংকার ও হিংসার আগুন জ্বলতে থাকে। প্রকৃতপক্ষে যেসব মহাপুরুষ পরমতত্ত্ব প্রাপ্ত হয়েছেন, তাঁদের আচরণ, আদর্শ ও ভাব নিয়েই শাস্ত্র তৈরি হয়। তাই ইহলোক-পরলোকের আশ্রয় নিয়ে যারা চলেন, তাদের কর্তব্য-অকর্তব্যের ব্যবস্থাতে শাস্ত্রই হল প্রমাণ।

অর্জুনের ধারণা ছিল যুদ্ধ করলেই পাপ হবে। কিন্তু ভগবান বললেন, নিষ্কামভাবে শাস্ত্র অনুসারে যুদ্ধরূপ ক্রিয়া বন্ধনকারী নয়। আবার স্বার্থ ও অভিমান নিয়ে যজ্ঞ, দানাদি শাস্ত্রসম্মত ক্রিয়াও বন্ধনকারক হয় আর শাস্ত্রবিরুদ্ধ কর্ম করলে তা তো পতনের কারণ হয়ই। সপ্তম শ্লোকে ভগবান বলেছেন আসুরীভাবাপন্ন ব্যক্তিগণ কর্তব্য-অকর্তব্য কী জানে না। আর এখানে বলছেন, শাস্ত্র অনুসারে কর্ম করলে কর্তব্য-অকর্তব্য সম্বন্ধে জ্ঞান হয় এবং ওই আসুরীস্বভাব দূর হয়।

———o———

একাদশ প্রশ্ন

(সপ্তদশ অধ্যায়—ত্রিবিধ শ্রদ্ধা বর্ণন)

ষোড়শ অধ্যায়ের তেইশতম শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ বলেছিলেন যে, যারা শাস্ত্রবিধি ত্যাগ করে ইচ্ছানুসারে কর্ম করেন তারা সিদ্ধি, সুখ ও পরমগতি প্রাপ্ত হন না। তখন অর্জুনের মনে হল শাস্ত্রবিধি না জানা মানুষের সংখ্যাই তো বেশি তবু যে সব মানুষ বংশপরম্পরায়, বর্ণ, আশ্রম বা সংস্কার অনুসারে দেবতাদের শ্রদ্ধা সহকারে যজন-পূজন করে থাকে সেই সকল ব্যক্তি শাস্ত্রবিধি অনুসারে কর্ম না করায় আসুরী গতি (অধোগতি) প্রাপ্ত হবে, না দৈবীগতি প্রাপ্ত হবে ?

সপ্তদশ অধ্যায়ের প্রারম্ভেই অর্জুনের প্রশ্ন হল—

যে শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।
তেষাং নিষ্ঠা তু কা কৃষ্ণ সত্ত্বমাহো রজস্তমঃ॥ (গীতা ১৭।১)

অর্থাৎ অর্জুন বলছেন—হে কৃষ্ণ ! যেসব ব্যক্তি শাস্ত্রবিধি পরিত্যাগ করে অথচ না জেনে শ্রদ্ধা সহকারে দেবতাদিগের পূজা করে তাদের নিষ্ঠা কীরূপ ? তা সাত্ত্বিকী না রাজসী বা তামসী। (গীতা ১৭।১)

ভগবান এই প্রশ্নের উত্তর এইভাবে সমগ্র সপ্তদশ অধ্যায়ব্যাপী দিয়েছেন—

শ্রদ্ধার প্রকার ভেদ	২,৩
শ্রদ্ধাভেদে যজন ভেদ	৪
শাস্ত্রবিধি রহিত কর্ম	৫,৬
শ্রদ্ধাভেদে ব্যবহারিক ও শাস্ত্রীয় ক্রিয়ার বিভিন্নতা	৭
শ্রদ্ধাভেদে আহারের প্রকার ভেদ	৮-১০

নিষ্ঠাভেদে যজ্ঞের প্রকার ভেদ	১১-১৩
নিষ্ঠাভেদে তপস্যার প্রকার ভেদ	১৪-১৬
তপস্যার গুণভেদ	১৭-১৯
নিষ্ঠাভেদে দানের প্রকার ভেদ	২০-২২
ওঁ তৎ সৎ-এর তাৎপর্য	২৩-২৭
শ্রদ্ধারহিত কর্মই অসৎ	২৮

শ্রদ্ধার প্রকার ভেদ—(শ্লোক ২,৩)

অর্জুনের বক্তব্য এই যে আসন্ন কলিযুগে মানুষের শাস্ত্রজ্ঞান অত্যন্ত কম হবে এবং সাধুসঙ্গ লাভ করাও অত্যন্ত দুরূহ হবে, কেননা উচ্চকোটির সাধু-মহাত্মা আগের যুগেও অত্যন্ত কম ছিলেন এবং কলিযুগে আরও কম হবেন। এই পরিস্থিতিতে যেসব মানুষের ভাব অতি উচ্চ, শ্রদ্ধাভক্তিও আছে কিন্তু শাস্ত্রবিধি ঠিকমতো জানেন না অথচ শাস্ত্রবিধি অগ্রাহ্য বা অনাদর করেন না, তাঁদের নিষ্ঠা কী প্রকার হবে !

ভগবান তার উত্তরে বলছেন, শাস্ত্রবিধি না জানলেও মানুষের মধ্যে কোনো না কোনো স্বভাবজাত শ্রদ্ধা থাকেই। তাই ভগবান দ্বিতীয়-তৃতীয় শ্লোকে শ্রদ্ধার প্রকারভেদ (শ্লোক ২-৩) জানাচ্ছেন।

ত্রিবিধা ভবতি শ্রদ্ধা দেহিনাং সা স্বভাবজা।
সাত্ত্বিকী রাজসী চৈব তামসী চেতি তাং শৃণু॥
সত্ত্বানুরূপা সর্বস্য শ্রদ্ধা ভবতি ভারত।
শ্রদ্ধাময়োঽয়ং পুরুষো যো যচ্ছ্রদ্ধঃ স এব সঃ॥

(গীতা ১৭।২-৩)

'মানুষের স্বভাবজাত শ্রদ্ধা তিন প্রকারের—সাত্ত্বিকী, রাজসী ও তামসী। সেগুলি বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হচ্ছে।

সকল ব্যক্তিরই শ্রদ্ধা তার অন্তকরণ (বা সংস্কার) অনুযায়ী হয়ে থাকে। মানুষ শ্রদ্ধাময়, তাই যার যেমন শ্রদ্ধা সেটিই তার স্বরূপ।' (গীতা ১৭।২-৩)

ভগবান বলছেন, মানুষের শ্রদ্ধা সঙ্গ থেকে বা শাস্ত্র থেকে জাত নয়, তা সবসময়ই স্বভাবজাত এবং স্বাভাবিকভাবেই প্রবাহিত হয়, এবং সেই অনুসারে সে সমস্ত কর্মাদি বা দেবার্চনা করে থাকে। শাস্ত্রবিধি মানা বা সৎসঙ্গ কেবলমাত্র এই স্বভাবজাত শ্রদ্ধাকে পরিপুষ্ট করে। সেইজন্য মানুষের সদাসর্বদা সাত্ত্বিক সঙ্গ ও শাস্ত্রীয় পরিমণ্ডলের মধ্যে থাকা উচিত যাতে সাত্ত্বিক ভাব প্রবল হয়। অপরপক্ষে যদি মানুষ রাজসিক-তামসিক সঙ্গ বা অশাস্ত্রীয় পরিমণ্ডলের সংস্পর্শে আসে তবে তার শ্রদ্ধা রাজসিক তামসিক ভাবদ্বারা প্রভাবিত হয়। তবে জীব পরমাত্মার অংশ তাই কোনো গুণের (রজ বা তম) প্রাধান্য দেখে তাকে নীচ ভাবা উচিত নয়। কোন্ ব্যক্তি কখন উন্নতি লাভ করবে বলা যায় না। অনেক সময় শুধুমাত্র শাস্ত্র পাঠ, সৎসঙ্গ বা শুদ্ধ পরিবেশেও চিত্তে তরঙ্গ ওঠে এবং স্বাভাবিক শ্রদ্ধার কোনো একটি গুণ প্রাধান্য পেয়ে যায়।

এই স্বাভাবিক শ্রদ্ধা আবার তিন প্রকারের—

সাত্ত্বিক—অনাসক্ত	দৈবীসম্পদ
রাজসিক—সকাম অনুষ্ঠানকারী	আসুরীসম্পদ
তামসী—তমোগুণী	

(ক) এর মধ্যে সাত্ত্বিক শ্রদ্ধা হল পারমার্থিক। যেসব মানুষ নিজ কল্যাণার্থে অপরের কল্যাণ কামনা করে তাদের মধ্যে এই শ্রদ্ধা পরিস্ফুট হয়।

(খ) রজগুণী ব্যক্তি সকামভাবে শাস্ত্রবিহিত কর্ম করে তাই **'ক্ষীনপুণ্যে মর্ত্যলোকং বিশন্তি'** (গীতা ৯।২১) অর্থাৎ পুণ্যক্ষয়ে মর্তলোকে পুনর্বার জন্মগ্রহণ করে। রাজসিক শ্রদ্ধা হলে সাংসারিক ও জাগতিক বিষয়ে আসক্তি জাগ্রত হয় তাই তা আসুরীসম্পদসম্পন্ন। রাজসিক লোক ইহজন্মে বা পরজন্মে সুখ-সম্পদ আকাঙ্ক্ষা করে।

(গ) তমোগুণী ব্যক্তি শাস্ত্রবিহিত কর্ম করে না তাই তারা কামনা ও মূঢ়তার জন্য অধোগতি লাভ করে—**'অধোগচ্ছন্তি তামসাঃ'** (গীতা ১৪।১৮)। তামসিক লোক পশুর ন্যায় কেবল খাওয়াদাওয়া, ভোগ-

প্রমোদ, হাসি-তামাসা, খেলাধুলা, আলস্য-নিদ্রাদিতে ব্যস্ত থাকে।

মানুষ শ্রদ্ধাময়, তাই যে যেমন শ্রদ্ধাযুক্ত, তেমন হয় তার স্বরূপ বা নিষ্ঠা। জীব পরমাত্মা থেকে বিমুখ হয়ে সংসারের প্রতি আকৃষ্ট হয় কারণ সংসারের প্রতি তার শ্রদ্ধা থাকে। এটি বৈষয়িক শ্রদ্ধা। আসলে এটি প্রকৃত শ্রদ্ধা নয়, শ্রদ্ধার অপব্যবহারক। এর চাইতে উচ্চ শ্রেণীর শ্রদ্ধা হল ধর্মীয় শ্রদ্ধা, যা বর্ণ ও আশ্রমভিত্তিক। সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ শ্রদ্ধা হল 'পারমার্থিক শ্রদ্ধা' অর্থাৎ শাস্ত্র, সাধু, মাহাত্মা, তত্ত্বজ্ঞ বা জীবন্মুক্তদের প্রতি যে শ্রদ্ধা তাই পারমার্থিক শ্রদ্ধা। যাদের শাস্ত্রজ্ঞান নেই বা সাধুমাহাত্মাদের সঙ্গও তেমন প্রাপ্তি হয়নি, তাদেরও সংস্কারবশত স্বভাবজাত পারমার্থিক শ্রদ্ধা থাকতে পারে। কিন্তু সেটি জানা যায় কীভাবে ? এইরূপ মানুষের পারমার্থিক আলোচনা স্বাভাবিকভাবেই অত্যন্ত প্রিয় হয় এবং এরা স্বাভাবিকভাবেই যজ্ঞ-দান-তীর্থ-ব্রত-সৎসঙ্গ ইত্যাদি শুভকর্মে প্রবৃত্ত হয় বা সাত্ত্বিক আহারে স্বাভাবিক রুচি রাখে ।

শ্রদ্ধাভেদে যজন ভেদ—(শ্লোক ৪)

ভগবান পরের শ্লোকে মানুষের স্বভাবজাত শ্রদ্ধার ফলে কোন্ শ্রদ্ধাযুক্ত ব্যক্তি কীরূপ পূজা-অর্চনা করে তা বর্ণনা করেছেন।

যজন্তে সাত্ত্বিকা দেবান্ যক্ষরক্ষাংসি রাজসাঃ।
প্রেতান্ ভূতগণাংশ্চান্যে যজন্তে তামসা জনাঃ॥

(গীতা ১৭।৪)

'সাত্ত্বিকগণ ইষ্টরূপে দেবতাদের পূজা করেন, রাজসিক ব্যক্তিরা যক্ষ ও রাক্ষসাদির এবং তামসিক ব্যক্তিরা ভূত ও প্রেতের পূজা করে থাকেন। (গীতা ১৭।৪)

এখানে বক্তব্য যে, যে দৈবীসম্পদবিশিষ্ট ব্যক্তিরা দেবতাদের অর্থাৎ পঞ্চ ঈশ্বরকোটি দেবতাদের যথা বিষ্ণু, শিব, গণেশ, শক্তি ও সূর্য বা অন্যান্য দেবতাদিগের নিষ্কামভাবে যজনা করেন, যা তাঁদের মুক্তি-প্রদায়িনী হয় (**দৈবীসম্পদ বিমোক্ষায়** গীতা ১৬।৫)।

রাজসিক ব্যক্তিরা যক্ষ-রাক্ষসদের যজনা করে। যক্ষদের অর্থসংগ্রহের

ও রাক্ষসদের অন্যকে ক্ষতি করার ইচ্ছা থাকে। তাই রাজসিক ব্যক্তিরা নিজ কামনা পূর্তির জন্য বা অন্যের বিনাশের নিমিত্ত যক্ষ-রাক্ষসাদির পূজা করেন।

তামসিক ব্যক্তিরা ভূত বা প্রেতের পূজা করে থাকেন। যাদের মৃত্যু হয়েছে তাদের বলে প্রেত আর যারা ভূতযোনিতে জন্মগ্রহণ করেছে তাদের বলে ভূত। আমাদের পিতৃপুরুষ অন্যের কাছে ভূত এবং অন্যের পিতৃপুরুষ আমাদের কাছে ভূত। যাঁরা পিতৃলোকের উদ্ধারলাভের জন্য কর্তব্য মনে করে নিষ্কামভাবে পিতৃকর্ম করেন তারা কিন্তু হলেন সাত্ত্বিক পুরুষ—রাজসিক বা তামসিক নন। আর **'পিতৃ ন যান্তি পিতৃব্রতাঃ'** (গীতা ৯।২৫)—অর্থ হল যাঁরা সকামভাবে পিতৃপুরুষের পূজন করেন অর্থাৎ তাঁরা আমাদের রক্ষা করবেন ও আমাদের সন্তানেরাও আমাদের নিমিত্ত শ্রাদ্ধ-তর্পণাদি করবেন এই চিন্তা করেন তাঁরা রাজসিক ও তামসিক ব্যক্তি হন।

শাস্ত্রবিধি-রহিত কর্ম—(শ্লোক ৫, ৬)

পরবর্তী দুইটি শ্লোকে (শ্লোক ১৭। ৫-৬) শাস্ত্রবিধি বিরোধ বা তা পরিত্যাগ করে এবং শ্রদ্ধাবর্জিত চিত্তে কর্ম কিরূপ, ভগবান তার বর্ণনা করেছেন।

অশাস্ত্রবিহিতং ঘোরং তপ্যন্তে যে তপো জনাঃ।
দম্ভাহঙ্কারসংযুক্তাঃ কামরাগবলান্বিতাঃ।।
কর্শয়ন্তঃ শরীরস্থং ভূতগ্রামমচেতসঃ।
মাং চৈবান্তঃশরীরস্থং তান্ বিদ্ধ্যাসুরনিশ্চয়ান্।।

(গীতা ১৭।৫-৬)

'যে ব্যক্তিরা দম্ভ, অহংকার, ভোগ এবং আসক্তিতে বলগর্বিত থাকে ও শাস্ত্রবিধির বিরুদ্ধে অকারণে কঠোর তপস্যা করে নিজ শরীর ও তদস্থিত আত্মারূপে আমাকে কষ্ট দেয় তারা আসুরীসম্পদসম্পন্ন।' (গীতা ১৭।৫-৬)

শাস্ত্রবিধি ত্যাগ তিন কারণে হয়—

(১) অজ্ঞতাবশত, (২) উপেক্ষা করে ও (৩) বিরোধিতা করে।

অজ্ঞতা—অর্জুন সপ্তদশ অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকে অজ্ঞতাপূর্বক শাস্ত্রবিধি ত্যাগকারী ভক্তদের কথা জিজ্ঞাসা করেছেন[১]। ভগবান এইরূপ ব্যক্তিদের যজন-যাজন সম্পর্কে চতুর্থ শ্লোকে বলেছেন।

'যজন্তে সাত্ত্বিকা দেবান্.........তামসা জনাঃ।'

এরূপ ব্যক্তি কামনা অনুসারে বিনাশশীল ফল প্রাপ্ত হয়।

উপেক্ষা—ষোড়শ অধ্যায়ের ২৩শ শ্লোকে ভগবান উপেক্ষাপূর্বক শাস্ত্রবিধি ত্যাগের কথা বলেছেন—**'যঃ শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য..........ন পরাং গতিম্'** (গীতা ১৭।২৩)। এরূপ ব্যক্তিরা শাস্ত্রবিধি উপেক্ষার ফলে ইহলোকে সিদ্ধি, সুখ বা মৃত্যুর পরে পরমগতি কিছুই পায় না।[২]

বিরোধকারী—আর বর্তমানের দুই শ্লোকে (৫,৬) ভগবান শাস্ত্রবিধি বিরোধকারী ব্যক্তি, যারা শাস্ত্রবিধি, শ্রদ্ধা, জীব ও ভগবান এই চারেরই বিরুদ্ধকারী তাদের কথাই বলেছেন। এদের শাস্ত্রবিধি পরিত্যাগ অজ্ঞতা বা উপেক্ষাবশত না হয়ে দম্ভ, অহংকারযুক্ত বিরোধিতা হওয়ায় এইসব ব্যক্তিরা নীচ যোনি ও নরক প্রাপ্ত হয়।

শ্রদ্ধাভেদে ব্যবহারিক ও শাস্ত্রীয় ক্রিয়ার বিভিন্নতা—(শ্লোক ৭)

আহারস্ত্বপি সর্বস্য ত্রিবিধো ভবতি প্রিয়ঃ।
যজ্ঞস্তপস্তথা দানং তেষাং ভেদমিমং শৃণু॥ (গীতা ১৭।৭)

'ভগবান বলছেন সকলের প্রিয় আহার বা যজ্ঞ, দান ও তপস্যাও শ্রদ্ধানুসারে তিন প্রকারের হয়।' (গীতা ১৭।৭)

চতুর্থ শ্লোকে ভগবান সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক—তিন প্রকারের পূজা-অর্চনার কথা বলেছেন। কিন্তু যাদের পূজাতে শ্রদ্ধা নেই তাদের নিষ্ঠা কীভাবে জানা যায় ? মানুষের ক্রিয়া দুই প্রকারের হয়—ব্যবহারিক ও শাস্ত্রীয়। এখানে আহার হচ্ছে ব্যবহারিক এবং যজ্ঞ, তপ, দান হচ্ছে শাস্ত্রীয় ক্রিয়াসমূহ। উভয় ক্রিয়াই সত্ত্ব, রজ ও তমরূপে তিন প্রকারের হয়।

---

[১]যে শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য..............সত্ত্বমাহো রজস্তমঃ। (গীতা ১৭।১)

[২]তার অন্তরে কাম-ক্রোধ-লোভ-অহংকার থাকায় গুণগুলি দোষ ও মহিমা নিন্দায় পর্যবসিত হয়ে তার পতনের কারণ হয়।

শ্রদ্ধাভেদে আহারের প্রকার ভেদ— (শ্লোক ৮-১০)

আয়ুঃসত্ত্ববলারোগ্যসুখপ্রীতিবিবর্ধনাঃ ।
রস্যাঃ স্নিগ্ধাঃ স্থিরা হৃদ্যা আহারাঃ সাত্ত্বিকপ্রিয়াঃ ॥
কট্বম্ললবণাত্যুষ্ণতীক্ষ্ণরুক্ষবিদাহিনঃ ।
আহারা রাজসস্যেষ্টা দুঃখশোকাময়প্রদাঃ ॥
যাতযামং গতরসং পূতি পর্যুষিতঞ্চ যৎ ।
উচ্ছিষ্টমপি চামেধ্যং ভোজনং তামসপ্রিয়ম্ ॥

(গীতা ১৭।৮-১০)

'আয়ু, সত্ত্বগুণ, বল, আরোগ্য, সুখ, চিত্তপ্রসন্নতা বর্ধক এবং সারবান, হৃদয়ে শক্তিবর্ধক, সরস ও স্নিগ্ধ এরূপ আহার সাত্ত্বিক ব্যক্তিগণের প্রিয়।

অতি কটু, অতি টক, অতি লবণাক্ত, অতি উষ্ণ, অতি তীক্ষ্ণ, অতি শুষ্ক ও অতি প্রদাহকারক আহার রাজসিক ব্যক্তিগণের প্রিয়। এই আহার দুঃখ, শোক ও রোগ উৎপন্ন করে।

যে খাদ্য অর্ধপক্ক, রসহীন, দুর্গন্ধযুক্ত, বাসী, উচ্ছিষ্ট এবং অপবিত্র, তাই তামস ব্যক্তিদের প্রিয়।' (গীতা ১৭।৮-১০)

সাত্ত্বিক আহার—সাত্ত্বিক ব্যক্তি ব্যবহারের আগেই তার পরিণাম চিন্তা করে খাদ্য চয়ন করে। তাই শ্লোকের প্রথমেই পরিণামের কথা বলা হয়েছে। যে খাদ্যের গুণে আয়ু, সত্ত্বভাব, চিত্তে প্রসন্নতা, বল, নিরোগ আদি বৃদ্ধি পায় সেইসব খাদ্য যথা রস্যাঃ (রসালো ফল, দুধ ইত্যাদি), স্নিগ্ধাঃ (ঘি, মাখন ইত্যাদি), স্থিরা (সুপাচ্য) এবং হৃদ্যা (হৃদয়ে শক্তি ও বুদ্ধিতে সাম্যভাব আনে) সাত্ত্বিক ব্যক্তির প্রিয়খাদ্য হয়।

রাজসিক আহার—রাজসিক গুণসম্পন্ন ব্যক্তিদের দৃষ্টি ইন্দ্রিয়ভোগের দিকে থাকে তাই তারা প্রথমে আহার্য ঠিক করে, পরিণামের কথা চিন্তা করে না। রাজসিক ভাবাপন্ন লোকেদের আহার হচ্ছে কটু (করলা, নিমপাতা আদি তেতো), অম্ল (তেঁতুল আদি টক পদার্থ), লবণ (অতিরিক্ত লবণাক্ত), অতি উষ্ণ (ধোঁয়া উঠছে এরূপ গরম), তীক্ষ্ণ (লঙ্কা আদি অতি ঝাল), রুক্ষ

(শুকনো পদার্থ আদি—ভাজা ছোলা, ছাতু ইত্যাদি) এবং বিদাহিনঃ (প্রদাহকারী পদার্থ—সুরা ইত্যাদি)।

রাজসিক ব্যক্তি বাছবিচার না করে আহারের পরিণামে দৃষ্টি দেয় না ফলে তার দেহ হয়ে ওঠে **'শরীরম্ ব্যধিমন্দিরম্'** অর্থাৎ সে শোক, দুঃখ ও ব্যধিগ্রস্থ হয়ে কষ্ট ভোগ করে।

তামসিক আহার—তামসিক আহারে ফলের কথা বলাই হয়নি কেননা মূঢ়তাবশত তামসিক ব্যক্তিরা পশুর ন্যায় খাদ্যগ্রহণে প্রবৃত্ত হয় এবং পরিণাম নিয়ে চিন্তা করে না। তামসিক আহার্যকে ভগবান 'অমেধ্য' অর্থাৎ আহারের অনুপযুক্ত বলেছেন তাই এই বস্তুগুলির উল্লেখ করেননি। এর মধ্যে 'পুতি' অর্থাৎ পচে যাওয়া জিনিস হতে তৈরি মদকে উল্লেখ করা হয়েছে।

শাস্ত্রে মদ্যপানকারীকে মহাপাপী বলা হয়েছে—

'স্তেনো হিরণ্যস্য সুরাং পিবংশ্চ গুরোস্তল্পমাবসন্ ব্রহ্মহা চৈতে পতন্তি চত্বারঃ পঞ্চমশ্চারংস্তৈরিতি॥' (ছা. উ. ৫।১০।৬)

অর্থাৎ স্বর্ণচোর, মদ্যপায়ী, গুরুপত্নী গমনকারী ও ব্রাহ্মণের হত্যাকারী —এই চারজন মহাপাপী এবং এদের সঙ্গ যারা করে সেই পঞ্চম জনও এদেরই সমান মহাপাপী।

গঙ্গা সব শুদ্ধ করলেও মদিরা পাত্রকে শুদ্ধ করতে পারে না। মদিরা পাত্রই যখন এত অশুদ্ধ তখন মদ্যপানকারী যে কত অশুদ্ধ তার শেষ নেই। আসলে মদ্যপান করলে চিত্তে স্থিত ধর্মের বীজ নষ্ট হয়ে যায় আর তার ফলে মানুষের মধ্যে যে সদ্ভাব, চিন্তা ও সংস্কার থাকে তা নষ্ট হয়ে যায়।

আহারের ফলে জাত শ্রদ্ধা সম্বন্ধে শাস্ত্রে নানাভাবে বলা হয়েছে।

'অন্নময়ং হি সৌম্য মনঃ' (ছা. উ. ৬।৫।৪)

আহার যেমন হয়ে থাকে মনও সেইরূপ হয়।

অন্নের সূক্ষ্ম সারভাগ অনুযায়ী মন বা অন্তঃকরণের সংস্কার তৈরি হয়। দ্বিতীয় ভাগ থেকে বীর্য, তৃতীয় ভাগ থেকে রক্ত ইত্যাদি এবং চতুর্থ স্থূল ভাগ থেকে মলাদি তৈরি হয়ে দেহ থেকে নির্গত হয়। তাই আহার শুদ্ধিতে মনও

শুদ্ধ হয়—আহারশুদ্ধৌ সত্ত্বশুদ্ধিঃ (ছা. উ. ২।২৬।২)।

অন্নগ্রহণের সময়েও প্রতি গ্রাসে গ্রাসে ভগবৎ নাম জপ করলে অন্ন দোষ দূর হয়।

কবলে কবলে কুর্বন রামনামানুকীর্তনম্।
যঃ কশ্চিৎ পুরুষোঽশ্নাতি সোঽন্নদোষৈর্ন লিপ্যতে॥

আহারের সময় অন্ন পরিপাক কালে প্রাণ রোমকূপের দ্বারা আশপাশের পরমান্ন আকর্ষণ করে গ্রহণ করে। সুতরাং খাদ্যগ্রহণের স্থান, পরিবেশ, খাদ্য প্রস্তুতকারক ও পরিবেশকের ভাব ও চিন্তা শুদ্ধ হলে প্রাণও সেইভাবে পরমাণু আকর্ষণ করে ও মনও সেইরূপ সৃষ্ট হয়।

উদাহরণ—(১) দুধে হিংসার প্রয়োগ, (২) ঘোড়াকে গরু ও মহিষের দুধ খাওয়ানো এবং (৩) মোষ ও বলদের গাড়ি টানা।

(১) সাত্ত্বিক খাদ্যও কিন্তু ভাবের পরিবর্তনে রাজসিক হয়ে ওঠে। যেমন দুধ অতি উপকারী এবং সাত্ত্বিক ভাব বৃদ্ধিকারী। অথচ এমন শোনা যায় যে একবার সৈনিকেরা গাভী দোহন করার আগে বাছুরকে ছেড়ে দিয়ে তার পেছনে কুকুর লেলিয়ে দেয়। নিজের বাচ্চার পেছনে কুকুরকে ছুটতে দেখতে গাভী রাগান্বিত হলে বাছুরকে এনে বেঁধে রেখে গরুকে দোয়ানো হয়। সৈনিকদের সেই দুধ খাওয়ানো হয়, তার ফলে তাদের মধ্যে হিংস্রতা বৃদ্ধি পায়।

(২) একবার বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার জন্য কিছু ঘোড়াকে মহিষের দুধ ও কিছু ঘোড়াকে গরুর দুধ খাইয়ে প্রস্তুত করা হয়। একদিন যখন ঘোড়াগুলি যাচ্ছিল, পথে এক ছোট নদী এসে পড়ে। দেখা গেল গরুর দুধ খাওয়া ঘোড়াগুলো নদী পার হয়ে গেল কিন্তু মোষের দুধ খাওয়া ঘোড়াগুলো জলে বসে পড়ল। এতে প্রমাণিত হল যে, খাদ্যের রকম ফেরে প্রাণীর স্বভাবে ও কর্মের বদল হয়।

(৩) মহিষ ও বলদের যুদ্ধ লাগিয়ে দেওয়া হলে বলদ পরাস্ত হবে, কিন্তু যদি উভয়কে গাড়িতে জুড়ে দেওয়া হয়, তাহলে মহিষ গরমে জিভ বার করে ফেলবে কিন্তু বলদ চলতেই থাকবে। কারণ গরুর দুধে সাত্ত্বিক বল লাভ হয়

যা মোষের দুধে হয় না।

কর্তাভেদে খাদ্যভেদ—

উত্তম খাদ্য—যিনি ভোজন করান তাঁর যদি সাত্ত্বিক অর্থাৎ 'সর্বভূত হিতে রতাঃ' ভাব থাকে তবে সেটি সর্বশ্রেষ্ঠ খাদ্যরূপে গণ্য হয়।

মধ্যম খাদ্য—যিনি ভোজন করান তাঁর খাদ্যবস্তু যদি সাত্ত্বিকও হয় কিন্তু তাঁর মধ্যে যদি স্বার্থভাব থাকে তবে তা মধ্যম ভোজন।

অধম খাদ্য—যিনি ভোজন করান ও যিনি ভোজন করেন উভয়েরই যদি স্বার্থভাব থাকে তবে তা অধম ভোজন।

গীতা অনুযায়ী—

যজ্ঞ—অন্যের হিতার্থে কর্ম করা।

তপ—সর্বক্ষণ প্রসন্ন থাকা, সর্বাবস্থা সহ্য করা।

দান—দেওয়ার সময় মনে করা, যার জিনিস তাকেই দিলাম।

নিষ্ঠাভেদে যজ্ঞের প্রকার ভেদ—(শ্লোক ১১-১৩)

অফলাকাঙ্ক্ষিভির্যজ্ঞো বিধিদৃষ্টো য ইজ্যতে।
যষ্টব্যমেবেতি মনঃ সমাধায় স সাত্ত্বিকঃ॥
অভিসন্ধায় তু ফলং দম্ভার্থমপি চৈব যৎ।
ইজ্যতে ভরতশ্রেষ্ঠ তং যজ্ঞং বিদ্ধি রাজসম্॥
বিধিহীনমসৃষ্টান্নং মন্ত্রহীনমদক্ষিণম্।
শ্রদ্ধাবিরহিতং যজ্ঞং তামসং পরিচক্ষতে॥

(গীতা ১৭।১১-১৩)

'সাত্ত্বিক যজ্ঞ তাকেই বলে যখন 'যজ্ঞ করা উচিত' এই কর্তব্যবোধে, ফলেচ্ছা ত্যাগ করে এবং শাস্ত্রবিধি অনুযায়ী যজ্ঞ করা হয়।

রাজসিক যজ্ঞ ফলের আশা করে বা দম্ভ সহকারে (লোককে দেখাবার জন্য) করা হয়।

তামসিক যজ্ঞ শাস্ত্রবিধিরহিত, অন্নদানবিহীন, মন্ত্রহীন, দক্ষিণাবিহীন ও শ্রদ্ধাবর্জিত হয়।' (গীতা ১৭।১১-১৩)

এখানে সাত্ত্বিক যজ্ঞের ফলেচ্ছা ত্যাগের অর্থ হল বর্তমানে মান-সম্ভ্রম,

শ্রদ্ধা, অর্থ ইত্যাদি প্রাপ্ত হওয়া এবং মৃত্যুর পর স্বর্গপ্রাপ্তি হওয়া। এইরূপ ইচ্ছা থাকলে যজ্ঞের সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্পর্ক স্থাপন হয়। কিন্তু কর্তব্যবোধে কর্ম করলে সম্পর্ক তো স্থাপিতই হয় না বরং কর্তা কর্মের থেকে মুক্ত হয় এবং কর্তার অহংবোধও শুদ্ধ হয়। কর্তব্যবোধে কর্ম মানে হচ্ছে নিজের জন্য কিছু না করা এবং কোনো কিছুর সঙ্গে যথা দেশ, কাল, পাত্র ইত্যাদির সম্পর্ক না রেখে নিপুণভাবে কাজ করে যাওয়া।

রাজসিক যজ্ঞে ফলের আশা হল—১) ইচ্ছা প্রাপ্তির আশা যথা অর্থ-সম্পদ যেন প্রাপ্তি হয়, স্ত্রী-পুত্র পরিবার যেন ইচ্ছেমতো পাই, শরীর নিরোগ থাকে, যশ-মর্যাদা বৃদ্ধি পায়, মৃত্যুর পরে স্বর্গলোকের দিব্যভোগ প্রাপ্তি হয় ইত্যাদি।

২) অনিষ্ট নিবৃত্তির আশা যথা আমাদের শত্রু যেন নাশ পায়। সংসারে যেন কখনো অপমান বা নিন্দা না হয়, প্রতিকূল পরিস্থিতি যেন না আসে ইত্যাদি। আর 'দম্ভার্থমপি' মানে হল লোকে যেন আমাকে মান্য করে, দানশীল, যজ্ঞকারী বলে জানে ইত্যাদি।

নিষ্ঠাভেদে তপস্যার প্রকার ভেদ—(শ্লোক ১৪-১৬)

ভগবান পরবর্তী ৬টি শ্লোকের মধ্যে প্রথম তিনটি শ্লোকে তপস্যার প্রকার ভেদ ও পরবর্তী তিনটি শ্লোকে তপস্যার গুণভেদ বর্ণনা করেছেন।

দেবদ্বিজগুরুপ্রাজ্ঞপূজনং শৌচমার্জবম্।
ব্রহ্মচর্যমহিংসা চ শারীরং তপ উচ্যতে॥
অনুদ্বেকরং বাক্যং সত্যং প্রিয়হিতং চ যৎ।
স্বাধ্যায়াভ্যসনং চৈব বাঙ্ময়ং তপ উচ্যতে॥
মনঃপ্রসাদঃ সৌম্যত্বং মৌনমাত্মবিনিগ্রহঃ।
ভাবসংশুদ্ধিরিত্যেতৎ তপো মানসমুচ্যতে॥

(গীতা ১৭।১৪-১৬)

'শারীরিক তপস্যা হল দেবতা, ব্রাহ্মণ, গুরুজন এবং জীবন্মুক্ত মহাপুরুষদের পূজা করা, শুদ্ধভাবে থাকা, সরলতা, ব্রহ্মচর্য পালন এবং অহিংসা।

বাচিক তপস্যা হল অনুদ্বেগকারী, সত্য, প্রিয়, হিতকর বাক্য এবং স্বাধ্যায় ও নামজপদাদি করা।

মানসিক তপস্যা হল চিত্তের প্রসন্নতা, অক্রূরতা, মননশীলতা (মৌনতা), মনঃসংযম, ভাবশুদ্ধি বা অকপট ব্যবহার।' (গীতা ১৭। ১৪-১৬)

শারীরিক তপস্যা–

এখানে শারীরিক তপস্যা সম্বন্ধে বলা হচ্ছে যে, যে তপস্যা শরীরকে কষ্ট করে করা হয় তা উচ্চশ্রেণীর তপস্যা নয়। ভগবান তাদের **'আসুর নিশ্চয়ান্'** (গীতা ১৭।৬) বলেছেন। সেই তপস্যাই শ্রেষ্ঠ যা উচ্ছৃঙ্খল বৃত্তিকে রোধ করে মানুষকে শাস্ত্র, কুল ও পরম্পরার মধ্যে চালনা করে। আবার সাধনকালে যদিপ্রতিকূল অবস্থায় পড়তে হয় তবে প্রসন্ন অবস্থায় তা সহ্য করাই হল সত্যিকারের তপস্যা।

পাতঞ্জল যোগে সাধনার আটপ্রকার অঙ্গের কথা বর্ণনা করা হয়েছে।

যমনিয়মাসনপ্রাণায়ামপ্রত্যাহারধারণাধ্যানসমাধয়োঽষ্টাবঙ্গানি॥

(পাতঞ্জলযোগ ২।২৯)

যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান, সমাধি—এই আটটিকে যোগের অঙ্গ বলা হয়। বাহ্যবিষয়ে বৈরাগ্য করে এদের অভ্যাস করতে হয়।

যম পাঁচ প্রকার—**অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য এবং অপরিগ্রহ।**

আবার নিয়মও পাঁচটি—

শৌচ-সন্তোস-তপঃ-স্বাধ্যায়েশ্বরপ্রণিধানানি নিয়মাঃ।

(পাতঞ্জলযোগ ২।৩২)

শৌচ, সন্তোষ, তপঃ, স্বাধ্যায় এবং ঈশ্বর স্মরণ হল নিয়ম। এর মধ্যে নিয়ম অপেক্ষা যমের মহিমাই বেশি, কারণ নিয়মে ব্রত পালন করতে হয় আর যমে ইন্দ্রিয়াদি ও মনের সংযম করতে হয়।

হিরণ্যকশিপু, হিরণ্যাক্ষ, রাবণ আদিদের মধ্যে কিছু নিয়ম দেখা গেলেও যম দেখা যায় না।

বাচিক তপস্যা—নিজ স্বার্থ ও অহংকার পরিত্যাগ করে যেমন দেখা ও শোনা হয়েছে তাই বলা হচ্ছে সত্য। তবে সত্যর সঙ্গে বাক্য প্রিয় ও হিতকারীও হওয়া উচিত—

সত্যং ব্রূয়াৎ প্রিয়ং ব্রূয়ান্ন ব্রূয়াৎ সত্যমপ্রিয়ম্।
প্রিয়ং চ নানৃতং ব্রূয়াদেষ ধর্মঃ সনাতনঃ ॥

(মনুস্মৃতি ৪।১৩৮)

মানুষের সত্য ও প্রিয় কথা বলা উচিত। তার মধ্যেও যেন সত্য অপ্রিয় না হয় আর প্রিয় হলেও তা যেন অসত্য না হয়। এই হল সনাতন ধর্ম।

আর আত্মিক উন্নতির সহায়ক গীতা, রামায়ণ, ভাগবত ইত্যাদি গ্রন্থ পড়া ও অন্যকে পড়ানো এবং ভগবান ও তার ভক্তদের চরিত পাঠ করা হল স্বাধ্যায়। ভগবৎ নাম জপ, স্তুতি, প্রার্থনা করা হল 'অভ্যাসন'।

মানসিক তপস্যা—মানসিক প্রসন্নতা লাভের উপায়—

১) জাগতিক বস্তু, ব্যক্তি বা পরিস্থিতি যেন কখনো মনে রাগ বা দ্বেষ উৎপাদন না করে।

২) নিজ স্বার্থ বা অহংভাবের জন্য পক্ষপাতিত্ব না করা।

৩) মনকে সর্বদা দয়া, ক্ষমা ও উদার ভাবে পূর্ণ করা।

৪) প্রাণী মাত্রেরই হিত ভাবনা করা।

যার অন্তরে একমাত্র ভগবানের প্রতিই আশা-ভরসা থাকে এবং যিনি ভগবানের চিন্তাতেই থাকেন তাঁর অন্তরের ভাব অতি শীঘ্রই পরিশুদ্ধ হয়।

তপস্যার গুণভেদ—(শ্লোক ১৭-১৯)

পরবর্তী তিনটি শ্লোকে ভগবান সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক তপস্যা বর্ণনা করেছেন—

শ্রদ্ধয়া পরয়া তপ্তং তপস্তৎ ত্রিবিধং নরৈঃ।
অফলাকাঙ্ক্ষিভির্যুক্তৈঃ সাত্ত্বিকং পরিচক্ষতে॥
সৎকারমানপূজার্থং তপো দম্ভেন চৈব যৎ।
ক্রিয়তে তদিহ প্রোক্তং রাজসং চলমধ্রুবম্॥

মূঢ়গ্রাহেণাত্মনো যৎ পীড়য়া ক্রিয়তে তপঃ।
পরস্যোৎসাদনার্থং বা তত্তামসমুদাহৃতম্॥

(গীতা ১৭।১৭-১৯)

'সাত্ত্বিক তপস্যা তাকেই বলে যা পরম শ্রদ্ধা সহকারে এবং ফলাকাঙ্ক্ষাবর্জিত ব্যক্তির দ্বারা কায়মনোবাক্যে পালন করা হয়।

রাজসিক তপস্যা সৎকার, মান, পূজা পাবার জন্য এবং কপটভাব নিয়ে ইহলোকে অনিশ্চিত ও বিনাশশীল ফলের জন্য করা হয়।

তামসিক তপস্যা মূঢ়তাবশত নিজ শরীরকে পীড়া প্রদান ও অন্যদের কষ্ট দেওয়ার জন্য করা হয়।' (গীতা ১৭।১৭-১৯)

সাত্ত্বিক তপস্যা—

১) কায়মনোবাক্যে তপস্যা সাত্ত্বিকের মধ্যে ফুটে ওঠে।

২) ১৩ অধ্যায়ে সপ্তম থেকে একাদশ শ্লোক পর্যন্ত ২০টি জ্ঞান সাধনার কথা ও ১৬ অধ্যায়ে প্রথম থেকে তৃতীয় শ্লোক পর্যন্ত ২৬টি দৈবীলক্ষণ বলা হয়েছে তার অনেকগুলিই শ্লোক ১৪ থেকে ১৬ পর্যন্ত উল্লিখিত ত্রিবিধ তপস্যার অন্তর্গত। যে জ্ঞানের সাধন ও দৈবীসম্পদের দ্বারা মুক্তিলাভ হয় তা সাত্ত্বিক গুণের দ্বারাই অর্জন করা সম্ভব।

রাজসিক তপস্যা—

এই তপস্যায় রত ব্যক্তি সাধারণ লোক থেকে নিজেকে বিশেষ বলে মনে করে। আবার হৃদয়ে তপস্যার ওপর শ্রদ্ধা না থাকলেও লোক দেখানোর জন্য মালা জপ করা, পূজা করা, সহজ-সরলভাবে চলা (অর্থৎ দম্ভ দেখানো) ইত্যাদি করে থাকে। ফলেচ্ছা থাকায় তারা দেবপূজা করতে পারে, তাদের সহজ-সরল ভাবও থাকতে পারে, পুস্তকাদিতে মনসংযোগও হওয়া সম্ভব। তবে রজোগুণসম্পন্ন হওয়ায় তাদের ব্রহ্মচর্য রক্ষা করা বা অহিংসক হওয়া শক্ত। তারা সবসময় সৌম্য নয় এবং মন সবসময় প্রসন্নভাবে থাকতে পারে না। এরা সৎকার-মান-দম্ভর নিমিত্ত তপস্যা করে তাই এদের ভাব পরিশুদ্ধ নয়। এরা পূর্বোক্ত তিন প্রকারের তপস্যা সর্বাঙ্গীণভাবে করতে সক্ষম হয় না।

তামসিক তপস্যা—

তামসিক ব্যক্তিরা মূর্খতাবশত নিজেকে কষ্ট দেয় এবং তাদের অন্যতম উদ্দেশ্য থাকে অপরকে কষ্ট দেওয়া বা অনিষ্ট করা। এই তপস্যাকে তামস তপস্যা বলে।

নিষ্ঠাভেদে দানের প্রকার ভেদ—(শ্লোক ২০-২২)

ভগবান পরবর্তী তিনটি শ্লোকে সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক দানের কথা বলেছেন।

> দাতব্যমিতি যদ্দানং দীয়তেঽনুপকারিণে।
> দেশে কালে চ পাত্রে চ তদ্দানং সাত্ত্বিকং স্মৃতম্॥
> যত্তু প্রত্যুপকারার্থং ফলমুদ্দিশ্য বা পুনঃ।
> দীয়তে চ পরিক্লিষ্টং তদ্দানং রাজসং স্মৃতম্॥
> অদেশকালে যদ্দানমপাত্রেভ্যশ্চ দীয়তে।
> অসৎকৃতমবজ্ঞাতং তত্তামসমুদাহৃতম্॥

(গীতা ১৭।২০-২২)

'সাত্ত্বিক দান তাকেই বলে যখন 'দান করা কর্তব্য' এই মনোভাব নিয়ে, নিষ্কামভাবে, অনুপকারী ব্যক্তিকে, ও দেশ, কাল, পাত্র বিবেচনা করে দান করা হয়।

রাজসিক দান ফলের উদ্দেশ্যে, প্রতি উপকারের আশায় বা ক্লেশ সহকারে করা হয়।

তামসিক দান দেশ, কাল বা অনুপযুক্ত পাত্রে করা হয় এবং তা অবজ্ঞা সহকারে ও সৎকারবর্জিত হয়।' (গীতা ১৭।২০-২২)

সাত্ত্বিক দান—এখানে সাত্ত্বিক ব্যক্তির দান প্রসঙ্গে বলা হয়েছে সাত্ত্বিক ব্যক্তি ফলের আশায় দান করে না, ত্যাগ হিসেবে দান করে। আর তা নিষ্কামভাবে কোনো আশা না রেখে অনুপকারী ব্যক্তিকেই করা হয়। তবে উপকারী ব্যক্তি সম্বন্ধে তার নিজের কী ভাব হয় ? সে মনে করে সত্যকার উপকারী ব্যক্তির দান কখনই শোধ করা যায় না। উপকারী ব্যক্তির সহায়তা করা বা সেবা করা উচিত, দান নয় ; কেননা উপকারীর দান অপরিশোধ্য।

সাত্ত্বিক ব্যক্তি দেশ, কাল ও পাত্র বুঝে অর্থাৎ যে দেশে যে বস্তুটি নেই, যে সময় সেটি আবশ্যক বা যার যে বস্তুর প্রয়োজন তাই তাকে দান করেন। আবার স্থানবিশেষ অর্থাৎ গঙ্গা, যমুনা আদি পবিত্র নদী, প্রয়াগ, কাশী আদি পুণ্য ক্ষেত্রে বা অমাবস্যা, পূর্ণিমা, অক্ষয় তৃতীয়া, সংক্রান্তি আদি পুণ্যতিথিতে অথবা সদ্ব্রাহ্মণ, সদাচারী ভিক্ষুক ইত্যাদি সৎপাত্রে দান করে থাকেন। এই দান আসলে **'এক গুণ দান সহস্র গুণ পুণ্য'** হিসাবে নয়, ত্যাগ হিসেবে দান হয় এবং এর ফলে দানের সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ হয়।

রাজসিক দান—রাজসিক ব্যক্তি তাকেই দান করে যার কাছ থেকে কিছু উপকার পাওয়া গেছে বা ভবিষ্যতে কিছু পাওয়ার আশা আছে। এখানে ব্যক্তির বিষয়ে প্রথমে, পরে দান-এর কথা আসে। এই প্রকার দানে কামনার আধিক্য থাকায় মানুষ সংসারের জন্ম-মৃত্যুর থেকে মুক্ত হতে পারে না। তার জন্ম-মৃত্যু চক্রে বন্ধন হয় **'গতাগত কামকামা লভন্তে'** (গীতা ৯।২১)।

সুপাত্র ও কুপাত্রে দানের ফল—

সুপাত্রদানাচ্চ ভবেদ্ধনাঢ্যো ধনপ্রভাবেণ করোতি পুণ্যম্।
পুণ্যপ্রভাবাৎ সুরলোকবাসী পুনর্ধনাঢ্যঃ পুনরেব ভোগী॥
কুপাত্রদানাচ্চ ভবেদ্দরিদ্রো দারিদ্র্যদোষেণ করোতি পাপম্।
পাপপ্রভাবান্নরকং প্রয়াতি পুনর্দরিদ্রং পুনরেব পাপী॥

রজগুণসম্পন্ন লোকেরা সাধারণত ব্যক্তি বেছে দান করে এবং যদি তা সুপাত্রে হয়, তবে দানের ফল হিসেবে সে প্রভূত ধনের অধিকারী হয় এবং তার আবার দানের ইচ্ছে জাগে এইভাবে তার পুনঃপুন ইচ্ছা ও দানের পুণ্যফলে সে স্বর্গলোক লাভ করে এবং সেই পুণ্যক্ষয় হলে আবার ধনীগৃহেই জন্মলাভ করে। এই জন্মেও যদি সে ভোগী হয়ে বা রজগুণী দানী হয়ে কাটায় তবে সে সংসার-বন্ধন হতে মুক্ত হতে পারে না।

তামসিক দান—তামস গুণসম্পন্ন লোকেরা সাধারণত দেশ, কাল, পাত্র না বুঝে দান করেন। তাই কুপাত্রে দান করলে তার অবশ্যম্ভাবী ফল হয় দরিদ্রতা এবং তার ফলে সে পর-পীড়ন শুরু করে এবং ফলতঃ নরক ভোগ করে পুনরায় দরিদ্র জন্মগ্রহণ করে এবং পুনঃপুনঃ পাপকর্মে নিরত থাকে।

ভাগবতে শ্রীশুকদেব মহারাজ পরীক্ষিৎকে বলছেন, ধর্মের চারটি চরণ—

'সত্যং দয়া তপো দানম্' (মহাভারত ১২।৩।১৮)

কিন্তু কলিযুগে একটিই প্রবল **'দানমেকং কলৌ যুগে'** (মনুস্মৃতি ১।৮৬) আর এই দান, যে কোনোভাবেই করা হোক তাতে কল্যাণই হয়। উপনিষদ্ও তাই বলছেন—**'শ্রদ্ধয়া দেয়ম্ অশ্রদ্ধয়াদেয়ম্'** (তৈ. উ. ১।১১)। অন্ন, জল, বস্ত্র এবং ঔষধ অবশ্য কোনো পাত্র-অপাত্র বিচার না করে কেবল প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী দেওয়া উচিত। ভগবৎ ভক্তগণ যেহেতু সকলের মধ্যেই তাঁদের প্রিয় প্রভুকে দর্শন করেন তাই কোনো বস্তু প্রদানের সময়েই পাত্র-অপাত্র বিচার করেন না। তাদের সব কর্ম **'স্বকর্মণা তমভ্যর্চ্য'** (গীতা ১৮।৪৬) হয়ে প্রকাশ পায় অর্থাৎ সমস্ত কর্মই ভগবৎ-কর্ম হয়।

ওঁ তৎ সৎ-এর তাৎপর্য—(শ্লোক ২৩-২৭)

ভগবান পরবর্তী ৫টি শ্লোকে দৈবীসম্পদধারী সাত্ত্বিক ব্যক্তিরা পরমাত্মা প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে কীভাবে যজ্ঞ-তপ-দান করেন তা বর্ণনা করেছেন।

ওঁ তৎসদিতি নির্দেশো ব্রহ্মণস্ত্রিবিধঃ স্মৃতঃ।
ব্রাহ্মণাস্তেন বেদাশ্চ যজ্ঞাশ্চ বিহিতাঃ পুরা॥
তস্মাদোমিত্যুদাহৃত্য যজ্ঞদানতপঃক্রিয়াঃ।
প্রবর্তন্তে বিধানোক্তাঃ সততং ব্রহ্মবাদিনাম্॥
তদিত্যনভিসন্ধায় ফলং যজ্ঞতপঃক্রিয়াঃ।
দানক্রিয়াশ্চ বিবিধাঃ ক্রিয়ন্তে মোক্ষকাঙ্ক্ষিভিঃ॥
সদ্ভাবে সাধুভাবে চ সদিত্যেতৎ প্রযুজ্যতে।
প্রশস্তে কর্মণি তথা সচ্ছব্দঃ পার্থ যুজ্যতে॥
যজ্ঞে তপসি দানে চ স্থিতিঃ সদিতি চোচ্যতে।
কর্ম চৈব তদর্থীয়ং সদিত্যেবাভিধীয়তে॥

(গীতা ১৭।২৩-২৭)

'ওঁ, তৎ, সৎ—এই তিনটি নামই পরমাত্মাকে নির্দেশ করে। আর এই পরমাত্মা দ্বারাই পুরাকালে বেদ, ব্রাহ্মণ ও যজ্ঞাদি সৃষ্টি হয়েছে।

সেইজন্য যজ্ঞ, দান ও তপরূপ ক্রিয়াগুলি সর্বদা 'ওঁ' পরমাত্মার এই নাম উচ্চারণ দ্বারাই আরম্ভ হয়।

'তৎ' এই নামের দ্বারা পরমাত্মাই নির্দেশিত এবং মুমুক্ষু ব্যক্তিরা ফলেচ্ছা বর্জনপূর্বক নানাপ্রকার যজ্ঞ, তপস্যা ও দানাদি ক্রিয়া অনুষ্ঠিত করেন।

'সৎ' এই নামটিও পরমাত্মার অস্তিত্ব ও শ্রেষ্ঠত্বর কারণে প্রয়োগ করা হয়। মঙ্গলজনক কার্যেও সৎ শব্দটি ব্যবহৃত হয়।

যেমন যজ্ঞ, তপস্যা ও দানের প্রতি যে নিষ্ঠা তাকে 'সৎ' বলা হয় সেইরূপ পরমাত্মার উদ্দেশ্যে যে কর্ম তাকেও সৎ বলা হয়।' (গীতা ১৭।২৩-২৭)

ভগবান বেদ, ব্রাহ্মণ ও যজ্ঞ সৃষ্টি করেছেন তার মধ্যে বিধি জানার জন্য বেদ, অনুষ্ঠান করার জন্য ব্রাহ্মণ ও ক্রিয়ার জন্য যজ্ঞ সৃষ্টি হয়েছে। এই শুভকর্মে যদি কখনো কোনো অভাব হয় তবে সেই পরমাত্মার নাম স্মরণ করলেই সে অভাব অঙ্গহানি পূরণ হয়ে যায়।

'ওঁ'—ব্রহ্মবাদী বা বেদবাদীগণের কাছে 'ওঁ' উচ্চারণই প্রধান, কারণ সর্বপ্রথম 'ওঁ'-ই প্রকট হয়েছিল। এর তিনটি মাত্রা এবং সেই মাত্রা থেকে ত্রিপাদ গায়ত্রী এবং তার থেকে ঋক্, সাম, যজুঃ আদি ত্রিবেদ প্রকটিত হয়েছেন। তাই বেদের যত মন্ত্র ও শ্রুতি আছে এবং তাতে যত যজ্ঞ, তপস্যা ও দান ইত্যাদি শাস্ত্রবিহিত কার্য আছে তা 'ওঁ' উচ্চারণ ব্যতীত ফলপ্রসূ হয় না।

'তৎ'—তৎ অর্থ হচ্ছে পরমাত্মা। ভগবানের ভক্তগণ তৎ-পদের বোধক সকল নাম (রাম, কৃষ্ণ, গোবিন্দ, নারায়ণ ইত্যাদি) উচ্চারণপূর্বক সকল কর্ম করেন। তাঁরা সবসময় আমি তাঁর ও তিনি আমার—এইভাব নিয়ে সমস্ত ক্রিয়াই ভগবানের প্রসন্নতার জন্য করেন।

'সৎ'—পরমাত্মার সত্তা বা অস্তিত্বকে 'সৎ' বলে। সপ্তদশ অধ্যায়ের ২৬ ও ২৭ শ্লোকে 'সৎ'-এর অর্থ ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এখানে ৫টি ভাবের দ্বারা ভগবানের (পরমাত্মা) সঙ্গে যুক্ত হওয়ার কথা বলা হয়েছে।

'সদ্ভাব'—পরমাত্মা নিত্য বিরাজমান, এই ভাবকে বলে সদ্ভাব।

'সাধুভাব'—অন্তঃকরণের শ্রেষ্ঠভাবগুলি যা সমস্ত সাধন প্রণালীর অন্তর্গত যথা— দয়া, ক্ষমা, প্রশান্তি, ত্যাগ, উদারতা, সারল্য, বীত-রাগ-দ্বেষ ইত্যাদি সাধুভাবের অন্তর্গত।

'প্রশস্তে কর্মণি'—সমস্ত সাধনগুলির মধ্যে যে ক্রিয়াগুলি শ্রেষ্ঠ যথা অন্নদান, ভূমিদান, যজ্ঞ, তপস্যা, দান, যজ্ঞোপবীত, বিবাহাদি মঙ্গল কার্য, সদাচার, সৎ কর্ম ইত্যাদি **'প্রশস্ত কর্মনি'**র অন্তর্গত। কিন্তু এই শাস্ত্রবিহিত কর্মগুলিও যদি ভগবৎ সম্পর্কিত না হয়, তবে তা কেবলই শাস্ত্রকর্ম হয় 'সৎকর্ম' হয়ে ওঠে না। অসুর-দানবেরাও কঠিন তপস্যা ইত্যাদি প্রশংসনীয় কর্ম করে কিন্তু তাতে ভগবৎ সম্পর্কিত শ্রদ্ধাভাব না থাকায় এবং নিজ স্বার্থ এবং অপরের অহিত ভাব থাকায় তা বন্ধনকারক অসদ্‌কর্ম হয়ে ওঠে। সেই কর্মগুলির দ্বারা যদি ব্রহ্মলোকও প্রাপ্ত হয় তবু সেখান থেকে ফিরে আসতে হয়—

'আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্তিনোঽর্জুনঃ'। (গীতা ৮।১৬)

সৎ ভাব গ্রহণ করাও সৎ এবং অসতের ত্যাগও সৎ। তবে প্রকৃতপক্ষে অসৎ ত্যাগ করা যত প্রয়োজন, সৎ গ্রহণ করা তত প্রয়োজন নয়। কেননা অসৎ ত্যাগ করলেই সৎ-এর উন্মেষ আপনিই হয়।

যজ্ঞ-তপস্যা-দান—ভগবান বলেছেন যজ্ঞ, তপস্যা ও দান ইত্যাদি প্রশংসনীয় কার্যে যে নিষ্ঠা (সাত্ত্বিক ভাবে) তাও সৎরূপে পরিগণিত।

কর্ম চৈব তদীয়র্থম্—ভগবান বা পরমাত্মার জন্য ক্রিয়াকেও সৎ বলে। এখানে দুইপ্রকার ক্রিয়ার কথা বলা হয়েছে।

১) সাংসারিক বা লৌকিক কর্ম। যথা বর্ণ, আশ্রম অনুযায়ী কর্তব্যকর্ম, বা খাওয়াদাওয়া ইত্যাদি শারীরিক কর্ম।

২) ভগবৎ সম্পর্কীয় বা পারমার্থিক কর্ম। যথা জপ-ধ্যান-পূজা-শ্রবণ-কীর্তন-মনন ইত্যাদি কর্ম।

তবে উভয় কর্মই যদি নিষ্কামভাবে এবং বিশ্বাস সহকারে ভগবৎ প্রীত্যার্থে করা হয় তবে তা **'তদর্থীয় কর্ম'** হয় এবং দৈবীসম্পদরূপে

মুক্তিপ্রদানে সহায়ক হয়।

শ্রদ্ধারহিত কর্মই অসৎ—(শ্লোক ২৮)

অধ্যায়ের শেষ শ্লোকে ভগবান অশ্রদ্ধা সহকারে বা পরমাত্মার উদ্দেশ্য-রহিত কর্মের কথা বলেছেন।

অশ্রদ্ধয়া হুতং দত্তং তপস্তপ্তং কৃতঞ্চ যৎ।
অসদিত্যুচ্যতে পার্থ ন চ তৎ প্রেত্য নো ইহ॥

(গীতা ১৭।২৮)

'হোম, দান, তপস্যা বা আর যা কিছুই অশ্রদ্ধা সহকারে করা হয় তাই হল 'অসৎ'। এর ফল না ইহজন্মে পাওয়া যায়, না পরজন্মে পাওয়া যায়।' (গীতা ১৭।২৮)

ভগবান বলেছেন 'যঃ যচ্ছ্রদ্ধঃ স এব সঃ' (গীতা ১৭।৩) অর্থাৎ যার যেমন শ্রদ্ধা তার স্বরূপও সেইপ্রকার এবং তার ফলে তার গতিও সেইরকম হয়।

১) শাস্ত্রীয় কর্ম শ্রদ্ধা ও বিধিপূর্বক অথচ সকামভাবে করলে তা ফল প্রদানেই নষ্ট হয়ে যায়। যেমন ইহকালে ধনসম্পদ, পরিজন লাভ এবং পরজন্মে স্বর্গপ্রাপ্তি লাভ হয়।

২) আবার এইসব শুভকর্ম যদি তা ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বা অত্যন্ত সাধারণও হয় এবং তা নিষ্কামভাবে এবং শ্রদ্ধা ও বিধিপূর্বক করা হয় তবে তা 'সৎকর্মে' পরিণত হয় এবং তার ফলে চিত্তশুদ্ধি ও পরমগতি লাভ হয়।

৩) আবার এই সব কর্মই যদি অশ্রদ্ধাপূর্বক করা হয় তবে তা 'অসৎ কর্মে' পরিণত হয় এবং তার দ্বারা কোনো ফল লাভ হয় না।

এখানে বিশেষ তাৎপর্য হল পরমাত্মা প্রাপ্তিতে ক্রিয়ার প্রাধান্য থাকে না শ্রদ্ধাভাবেরই প্রাধান্য থাকে।

সপ্তদশ অধ্যায়ের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

অর্জুন-এর প্রশ্ন ছিল শাস্ত্রবিধি জানা লোক খুবই কম তাই শাস্ত্রবিধি অজ্ঞব্যক্তি যে কর্ম করে তাতে তার নিষ্ঠা কীরূপ বা সে কীরূপ শ্রদ্ধা

নিয়ে কর্ম করে।

ভগবান তাই সমগ্র সপ্তদশ অধ্যায়ে মানুষের শ্রদ্ধা বা ভাব নিয়ে বিশদ বর্ণনা করেছেন।

১) *বিধিসম্পন্ন কর্ম—*

২) *বিধি বা শাস্ত্রবহির্ভূত কর্ম তিন প্রকার—*

ক) অজ্ঞতাপূর্বক (শ্লোক ৪)

খ) উপেক্ষাপূর্বক (শ্লোক ১৭, ২৮)

গ) বিরোধিতা পূর্বক (শ্লোক ৫ এবং ৬)

৩) *লৌকিক ব্যবহারেও (ভজনা ছাড়া) শ্রদ্ধা তিন প্রকার—*

ক) সাত্ত্বিক ভাবে কর্ম
খ) রাজসিক ভাবে কর্ম
গ) তামসিক ভাবে কর্ম
} (শ্লোক ৭-২৩)

—o—

দ্বাদশ প্রশ্ন

(অষ্টাদশ অধ্যায়ের প্রারম্ভে অর্জুনের প্রশ্নের উত্তর তথা উপদেশের নির্যাস ও সমাপ্তি)

শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতার শেষ অধ্যায়ে (অষ্টাদশ) এসে অর্জুন বুঝতে পেরেছেন সাধন-জীবনে তিনটি পথই প্রশস্ত—কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগ।

অর্জুনের শেষ প্রশ্ন তাই কর্মযোগ ও জ্ঞানযোগের পার্থক্য বিষয়ে। এই বিষয়ে অর্জুন ভগবানকে তিনবার প্রশ্ন করছেন—

১) প্রথম বারের জিজ্ঞাসা (তৃতীয় অধ্যায়ের প্রারম্ভে) জ্ঞানযোগ ও কর্মযোগের শ্রেষ্ঠত্ব বিষয়ে—

জ্যায়সী চেৎ কর্মণস্তে মতা বুদ্ধির্জনার্দন।
তৎ কিং কর্মণি ঘোরে মাং নিয়োজয়সি কেশব॥ (গীতা ৩।১)

'হে জনার্দন ! যদি আপনার মতে কর্ম অপেক্ষা জ্ঞান শ্রেষ্ঠ হয় তবে আমাকে এই ঘোর কর্মে কেন নিযুক্ত করেছেন ?'

তারপরেই বলছেন—

ব্যামিশ্রেণেব বাক্যেন বুদ্ধিং মোহয়সীব মে।
তদেকং বদ নিশ্চিত্য যেন শ্রেয়োঽহমাপ্নুয়াম্॥ (গীতা ৩।২)

'আপনার সংশয়পূর্ণ বাক্যে আমার বুদ্ধি মোহগ্রস্থ হচ্ছে। আমাকে একটি পথ নিশ্চিত করে বলুন যাতে আমার কল্যাণ লাভ হয়।'

২) দ্বিতীয়বার জ্ঞানযোগ ও কর্মযোগের মধ্যে কোন্‌টি বেশি কল্যাণকামী সে বিষয়ে পঞ্চম অধ্যায়ের প্রারম্ভে—

সন্ন্যাসং কর্মণাং কৃষ্ণ পুনর্যোগং চ শংসসি।
যচ্ছ্রেয় এতয়োরেকং তন্মে ব্রূহি সুনিশ্চিতম্॥ (গীতা ৫।১)

অর্থাৎ অর্জুনের প্রশ্ন হল—'আপনি কর্মের সন্ন্যাস অর্থাৎ ত্যাগ ও কর্মযোগ উভয়েরই প্রশংসা করছেন। এই দুটির মধ্যে যে সাধন আমার পক্ষে নিশ্চিতরূপে কল্যাণকর তাই বলুন।'

৩) এবং বর্তমানে অষ্টাদশ অধ্যায়ের প্রারম্ভে পুনরায় জ্ঞানযোগ ও কর্মযোগের তত্ত্ব বিষয়ে শেষ প্রশ্নে অর্জুন জ্ঞানযোগ ও কর্মযোগের পার্থক্য জিজ্ঞাসা করেছেন—

সন্ন্যাসস্য মহাবাহো তত্ত্বমিচ্ছামি বেদিতুম্।
ত্যাগস্য চ হৃষীকেশ পৃথক্ কেশিনিষূদন্॥ (গীতা ১৮।১)

অর্জুন জিজ্ঞাসা করছেন—'হে কৃষ্ণ! আমি সন্ন্যাস (সাংখ্যযোগ) ও ত্যাগের (কর্মযোগ) তত্ত্ব পৃথকভাবে জানতে চাই।' (গীতা ১৮।১)

এখানে সাংখ্যযোগ বা জ্ঞানযোগ বা সন্ন্যাস একই অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। সেইরকম কর্মযোগ বা ফলত্যাগ বা ত্যাগী একই অর্থে প্রযুক্ত হয়।

ভগবান সমগ্র অষ্টাদশ অধ্যায়ে কর্মযোগ (বা ত্যাগ), সাংখ্যযোগ (বা জ্ঞান), ভক্তিযোগ (বা পরাভক্তি) এবং শরণাগতি ও গীতার মাহাত্ম্য বর্ণনা করেছেন। অর্জুনের দ্বাদশ প্রশ্নে সন্ন্যাস ও ত্যাগ সম্পর্কিত টুকরো টুকরো জিজ্ঞাসা অনুমান করে, ভগবান সামগ্রিকভাবে সমগ্র অধ্যায়ে তা পর পর বর্ণনা করেছেন—

সন্ন্যাস—সন্ন্যাসস্য মহাবাহো তত্ত্বমিচ্ছামি বেদিতুম্।

১) *সন্ন্যাস কাকে বলে?*

যস্য নাহঙ্কৃতো ভাবো বুদ্ধির্যস্য ন লিপ্যতে।
হত্বাপি স ইমাঁল্লোকান্ ন হন্তি ন নিবধ্যতে॥ (গীতা ১৮।১৭)

'কোনো কর্মের প্রতি যার কর্তৃত্বভাব (আমি কর্তা বা আমি করেছি এইভাব) থাকে না এবং যাঁর বুদ্ধি সাংসারিক পদার্থে বা কর্মে লিপ্ত হয় না তিনিই সন্ন্যাসী এবং তিনি সমগ্র জগৎ হত্যা করলেও পাপে আবদ্ধ হন না।'

২) *সন্ন্যাসী কেমন হওয়া উচিত?*

মুক্তসঙ্গোঽনহংবাদী ধৃত্যুৎসাহসমন্বিতঃ।
সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোর্নির্বিকারঃ কর্তা সাত্ত্বিক উচ্যতে॥ (গীতা ১৮।২৬)

'যিনি আসক্তিবর্জিত, অহংকারমুক্ত, ধৈর্য ও উৎসাহপূর্ণ, কার্যের সিদ্ধি-অসিদ্ধিতে হর্ষ-বিষাদ রহিত তিনিই সন্ন্যাসী (সাত্ত্বিক কর্তা)।'

৩) *সন্ন্যাসীর সাধন কেমন হওয়া উচিত ?*

বুদ্ধ্যা বিশুদ্ধয়া যুক্তো ধৃত্যাত্মানং নিয়ম্য চ।
শব্দাদীন্ বিষয়াংস্ত্যক্ত্বা রাগদ্বেষৌ ব্যুদস্য চ॥
বিবিক্তসেবী লঘ্বাশী যতবাক্ কায়মানসঃ।
ধ্যানযোগপরো নিত্যং বৈরাগ্যং সমুপাশ্রিতঃ॥
অহঙ্কারং বলং দর্পং কামং ক্রোধং পরিগ্রহম্।
বিমুচ্য নির্মমঃ শান্তো ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে॥

(গীতা ১৮।৫১-৫৩)

সন্ন্যাসী ব্যক্তি সাত্ত্বিক বুদ্ধিযুক্তো, বৈরাগ্যবান, কায়-মনো-বাক্যে সংযমী, অহংকার-বল-দর্প-কাম-ক্রোধ ত্যাগী ও মমত্ব শূন্য হয়ে ব্রহ্মসাধনে রত হবে।

৪) *সন্ন্যাসীর আচরণ কেমন হওয়া উচিত ?*

নিয়তং সঙ্গরহিতমরাগদ্বেষতঃ কৃতম্।
অফলপ্রেপ্সুনা কর্ম যত্তৎ সাত্ত্বিকমুচ্যতে॥ (গীতা ১৮।২৩)

সন্ন্যাসী কর্তৃত্বাভিমান ও রাগ-দ্বেষরহিত হয়ে কর্ম করবে।

৫) *সন্ন্যাসীর ভাব কেমন হওয়া উচিত ?*

সর্বভূতেষু যেনৈকং ভাবমব্যয়মীক্ষতে।
অবিভক্তং বিভক্তেষু তজ্জ্ঞানং বিদ্ধি সাত্ত্বিকম্॥ (গীতা ১৮।২০)

ভিন্ন-ভিন্ন সর্বপ্রাণীতে এক অবিনাশী পরমাত্মাকে অবিভক্তরূপে অবস্থিত দেখবে।

৬) *সন্ন্যাসের ফল কী ?*

ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ।
ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্॥ (গীতা ১৮।৫৫)

ব্রহ্মে একান্তভাবে স্থিত যোগী সর্বত্র সমভাবযুক্ত হয়ে আমার পরাভক্তি লাভ করেন এবং আমাকে তত্ত্বতঃ জেনে আমাতেই প্রবেশ করেন।

ত্যাগ—ত্যাগস্য চ হৃষীকেশ পৃথক্ কেশিনিসূদন।

১) *ত্যাগ কাকে বলে ?*

এতান্যপি তু কর্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ফলানি চ।

কর্তব্যানীতি মে পার্থ নিশ্চিতং মতমুত্তমম্॥ (গীতা ১৮।৬)

কর্মে ও কর্মফলে আসক্তি ত্যাগ করে, যজ্ঞ, দান, তপস্যারূপ কর্ম এবং অন্যান্য সমস্ত কর্ম, কর্তব্য হিসেবে করা।

২) *ত্যাগী কেমন হওয়া উচিত ?*

ন হি দেহভৃতা শক্যং ত্যক্তুং কর্মাণ্যশেষতঃ।

যস্তু কর্মফলত্যাগী স ত্যাগীত্যভিধীয়তে॥ (গীতা ১৮।১১)

ত্যাগী মানে যিনি কর্মফল ত্যাগী। এখানে 'দেহভৃতা' দ্বারা বলা হয়েছে, দেহাভিমানী নয়, গুণাতীত মহাপুরুষরাই প্রকৃত ত্যাগী।

৩) *ত্যাগের সাধন কেমন হওয়া উচিত ?*

কার্যমিত্যেব যৎ কর্ম নিয়তং ক্রিয়তেঽর্জুন।

সঙ্গং ত্যক্ত্বা ফলঞ্চৈব স ত্যাগঃ সাত্ত্বিকো মতঃ॥ (গীতা ১৮।৯)

গীতার (১৮।৬) শ্লোকের মতো ভগবান এখানেও বলেছেন যে, ত্যাগীর কর্মে ও কর্মফলে আসক্তিহীন হওয়া উচিত এবং শুধু কর্তব্য হিসাবেই কর্ম সম্পাদন করা উচিত।

৪) *ত্যাগীর আচরণ কীরূপ হওয়া উচিত ?*

ন দ্বেষ্ট্যকুশলং কর্ম কুশলে নানুষজ্জতে। (গীতা ১৮।১০)

ত্যাগী অকুশল কর্মে দ্বেষ করেন না ও কুশল কর্মে আসক্ত হন না। আসক্তি ও দ্বেষ না থাকায় তিনি নিজ স্বরূপে স্থিত থাকেন।

৫) *ত্যাগীর ভাব কেমন হওয়া উচিত ?*

কার্যমিত্যেব যৎ কর্ম। (গীতা ১৮।৯)

শুধুমাত্র কর্তব্য পালন নিমিত্ত কর্ম করেন।

৬) *ত্যাগের ফল কী ?*

ত্যাগী সত্ত্বসমাবিষ্টো মেধাবী ছিন্নসংশয়ঃ॥ (গীতা ১৮।১০)

ত্যাগের ফল হল পরমাত্মতত্ত্বে স্থিত হওয়া।

অষ্টাদশ অধ্যায়ের নিম্নোক্ত শ্লোকে গীতার যোগ সম্বন্ধে ভগবান এইভাবে বর্ণনা করেছেন—

ত্যাগ ও সন্ন্যাসের দার্শনিক ব্যাখ্যা	২—৩
কর্মযোগ	৪—১২
ভগবানের মত	৪—৬
গুণানুসারে ত্যাগের ভেদ	৭—৯
ত্যাগীর ভাব	১০—১১
কর্মফল ত্যাগ না করার ফল	১২
সাংখ্যযোগ	১৩—৫৩
কর্মের হেতু	১৩—১৫
সাংখ্যযোগে মতির বিচার	১৬-১৭
দুর্মতি—আত্মায় কর্তৃত্ব ভাব আরোপ করা	১৬
সুমতি—অহংকারহীন কর্তা	১৭
কর্মের প্রেরণা ও কর্মসংগ্রহ	১৮—১৯
গুণানুযায়ী বিভাগ (জ্ঞান, কর্ম, কর্তা, বুদ্ধি, ধৃতি ও সুখ)	২০—৩৯
প্রকৃতিজাত সবই ত্রিগুণাত্মক	৪০
বর্ণ-অনুসারে নির্দিষ্ট কর্ম	৪১—৪৪
স্বধর্মানুযায়ী কর্ম	৪৫—৪৮
সাংখ্যযোগের সাধন ও অধিকারী	৪৯-৫৩
ভক্তিযোগ	৫৪-৬৭
পরাভক্তি কীভাবে লাভ হয় ও তার ফল	৫৪—৫৫
শরণাগতির ফল	৫৬-৫৭, ৬১-৬২
অ-শরণাগতির ফল	৫৮—৬০
গীতার গুহ্যতত্ত্ব	৬৩—৬৬
গীতা শ্রবণের অনধিকারীর বর্ণনা	৬৭
গীতার মাহাত্ম্য	৬৮-৭১
অর্জুন ও সঞ্জয়ের ভগবদনুভূতি	৭৩—৭৮

ত্যাগ ও সন্ন্যাসের দার্শনিক ব্যাখ্যা—(শ্লোক ২-৩)

কাম্যানাং কর্মণাং ন্যাসং সন্ন্যাসং কবয়ো বিদুঃ।
সর্বকর্মফলত্যাগং প্রাহুস্ত্যাগং বিচক্ষণাঃ॥
ত্যাজ্যং দোষবদিত্যেকে কর্ম প্রাহুর্মনীষিণঃ।
যজ্ঞদানতপঃকর্ম ন ত্যাজ্যমিতি চাপরে॥

(গীতা ১৮।২-৩)

'ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলছেন—পণ্ডিত ব্যক্তিদের মধ্যে কেউ কাম্য কর্মের ত্যাগকেই সন্ন্যাস বলে মনে করেন, আবার কোনো বিচারশীল ব্যক্তি সর্ববিধ কর্মের ফলত্যাগকেই ত্যাগ বলে অভিহিত করেন।

আবার কোনো কোনো বিদ্বান ব্যক্তি বলেন সমস্ত কর্মই দোষযুক্ত অতএব তা ত্যাজ্য। অন্য পণ্ডিতরা বলেন যজ্ঞ, দান ও তপস্যারূপ কর্ম কোনো ক্রমেই পরিত্যাজ্য নয়।' (গীতা ১৮।২-৩)

ভগবান যে সব কর্ম জানিয়েছেন তা পাঁচপ্রকার।

নিত্যকর্ম—শাস্ত্রানুযায়ী কর্ম যথা সন্ধ্যাহ্নিক, উপাসনা ইত্যাদি।

নৈমিত্তিক কর্ম—দেশ, কাল, পরিস্থিতি অনুযায়ী যেসব শুভকর্ম করা হয়, তা হল নৈমিত্তিক কর্ম।

দেশকৃত নৈমিত্তিক কর্ম হল গঙ্গা, প্রয়াগ, হরিদ্বার ইত্যাদি তীর্থে যেসব শাস্ত্রবিহিত কর্ম করা হয়।

কালকৃত নৈমিত্তিক কর্ম হল একাদশী, পূর্ণিমা, গ্রহণ ইত্যাদিতে যে শাস্ত্রবিহিত কর্ম করা হয়।

পরিস্থিতিকৃত নৈমিত্তিক কর্ম হল পুত্রের জন্ম, বিবাহ, কারোর মৃত্যু, সাধু-মহাত্মাদের সৎসঙ্গের আয়োজন কালে যে শাস্ত্রবিহিত কর্ম করা হয়।

কাম্যকর্ম—যাতে আমাদের যশ, সম্মান হয়, পুত্র-অর্থ সম্পদাদি লাভ হয়, রোগ-বিপদ আপদাদি দূর হয় এই সবের জন্য যে শাস্ত্রীয় কর্মের অনুষ্ঠান সেইগুলি হল কাম্যকর্ম।

প্রায়শ্চিত্ত কর্ম—আমাদের করা পাপগুলি দূর করার জন্য যে কর্ম করা হয়, সেগুলি প্রায়শ্চিত্ত কর্ম।

এরমধ্যে ইঁদুর, বিড়াল আদি মৃত্যুর কারণে যে পাপজনিত কর্ম হয় এবং তার ফলে যে প্রায়শ্চিত্ত করতে হয় তা হল 'বিশেষ প্রায়শ্চিত্ত'। আর জ্ঞাত-অজ্ঞাতজনিত পাপ দূর করার জন্য একাদশীব্রত, গঙ্গাস্নান, নামজপাদি ও সেবা ইত্যাদি যেসব শুভকর্ম করা হয় তাকে বলে 'সাধারণ প্রায়শ্চিত্ত'।

আবশ্যক কর্তব্য কর্ম—খাওয়া-পরা, শোওয়া-জাগা, চাষবাস, ব্যবসা, চাকরি ইত্যাদি 'আবশ্যক কর্তব্য কর্ম'।

এই শ্লোক দুটির বিষদ ব্যাখ্যায় ভগবান প্রথম ও তৃতীয় পঙ্ক্তিতে সন্ন্যাস এবং দ্বিতীয় ও চতুর্থ পঙ্ক্তিতে ত্যাগ সম্বন্ধে বলেছেন—

সন্ন্যাস—প্রথম মতানুসারে (প্রথম পঙ্ক্তিতে) সমস্ত 'কাম্য কর্মই' ত্যাগের কথা বলা হয়েছে কিন্তু নিত্ত, নৈমিত্তিক বা আবশ্যিক কর্তব্য-কর্ম সম্বন্ধে কিছু বলা হয়নি। আবার দ্বিতীয় মতে (তৃতীয় পঙ্ক্তিতে) সমস্ত কর্মই দোষণীয় বলে ত্যাগ করতে বলা হয়েছে। যদিও ভগবান কর্মের ত্যাগ সম্বন্ধে আগেই নিষেধ করেছেন **'ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্মকৃৎ'** (গীতা ৩।৫) এবং **'শরীরযাত্রাপি চ তে ন প্রসিদ্ধ্যেদকর্মণঃ'** (গীতা ৩।৮) অর্থাৎ কর্ম বিনা কেউ থাকতে পারে না ও শরীর রাখাও সম্ভব নয়।

ত্যাগ—প্রথম মতানুসারে (দ্বিতীয় পঙ্ক্তিতে) কর্মফলের কামনা ত্যাগকারীই আসল ত্যাগী ও দ্বিতীয় মতে (চতুর্থ পঙ্৬ক্তিতে) যজ্ঞ, দান, তপস্যা অবশ্যই করবে, কখনো পরিত্যাগ করবে না। ভগবানের কথার তাৎপর্য হল কেবল কর্মফলে আসক্তি নয়, কর্মের আসক্তিও ত্যাগ করতে হবে। আবার যজ্ঞ ইত্যাদি ছাড়াও তীর্থ ব্রতাদিও করতে হবে তবে সব কর্মই ফল ও আসক্তি ত্যাগপূর্বক করা কর্তব্য। এখানে কর্মফল ত্যাগের অর্থ কর্মফলের কামনার ত্যাগই বোঝায়।

কর্মযোগ (শ্লোক ৪—১২)

ভগবানের মত (শ্লোক ৪-৬)

নিশ্চয়ং শৃণু মে তত্র ত্যাগে ভরতসত্তম।
ত্যাগো হি পুরুষব্যাঘ্র ত্রিবিধঃ সম্প্রকীর্তিতঃ॥

যজ্ঞদানতপঃকর্ম ন ত্যাজ্যং কার্যমেব তৎ।
যজ্ঞো দানং তপশ্চৈব পাবনানি মনীষিণাম্॥
এতান্যপি তু কর্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ফলানি চ।
কর্তব্যানীতি মে পার্থ নিশ্চিতং মতমুত্তমম্॥

(গীতা ১৮।৪-৬)

'ভগবান সন্ন্যাস ও ত্যাগের মধ্যে প্রথমে ত্যাগের কথাই বলেছেন। ত্যাগ তিন প্রকারের হয় (গীতা ৭-৯ শ্লোকে দ্রষ্টব্য)।

আর ত্যাগের মধ্যেও যজ্ঞ, দান ও তপস্যারূপ কর্ম কখনই ত্যাগ করা উচিত নয়। কারণ এই কর্মগুলি মনীষীদেরও পবিত্র করে।

তবে এই সব পুণ্য কর্ম এবং অন্যান্য সব কর্মই করতে হবে কর্মে ও তার আনুষাঙ্গিক ফলে আসক্তি ত্যাগ করে। (**সঙ্গং ত্যক্ত্বা ফলানি চ**) এই হল ভগবানের উত্তম ও নিশ্চিত মত।' (গীতা ১৮।৪-৬)

মানুষের নিকট কর্তব্যরূপে যেসব কর্ম উপস্থিত হয়, তা আসক্তি ও কর্মফলেচ্ছা পরিত্যাগপূর্বক যথাযথভাবে করাকেই বলে '**কর্তব্যানি**'। তবে কর্মযোগে বিধি-নিষেধ মেনে কাজ করা উচিত অর্থাৎ এই কাজ করা উচিত বা এই কাজ করা উচিত নয় এই চিন্তা করবে, কিন্তু কখনো এই কাজটি বড় বা ওই কাজটি ছোট এইরূপ চিন্তা করবে না। ফলেচ্ছা থেকেই কর্মটি ছোট না বড় এই চিন্তা আসে আর ত্যাগী লোকের ফলেচ্ছা না থাকায় তাঁদের দৃষ্টিতে কর্মের ছোট বড় বিচার থাকে না।

যদিও কর্মের উদ্দেশ্য আসক্তি পূরণের জন্যও হয় আবার আসক্তি নিবৃত্তির জন্যও কিন্তু কর্মযোগী তাঁর সকল কর্তব্যকর্মই করেন আসক্তি নিবৃত্তির উদ্দেশ্যে। নিজের জন্য কর্ম করলে তাতে আসক্তি আসে, তাই কর্মযোগী নিজের জন্য কর্ম করেন না, তিনি কর্ম করেন অপরের হিতার্থে। তিনি স্থূলদেহ দ্বারা অপরের জন্য কর্ম, সূক্ষ্ম-শরীর দ্বারা অপরের হিতার্থে চিন্তা করেন এবং তাঁর কারণ-শরীরের স্থিরতাও অপরের হিতার্থের জন্য হয়ে থাকে। শুভকর্ম নিষ্কামভাবে করলে তা কল্যাণকারক হয়, আর নিষ্কামভাবে না করলে তা বন্ধনকারক হয়। কর্মযোগের মহত্ত্ব প্রসঙ্গে ভগবান

গীতার চতুর্থ অধ্যায়ের ৩৮তম শ্লোকে বলেছেন—

ন হি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহ বিদ্যতে।
তৎ স্বয়ং যোগসংসিদ্ধঃ কালেনাত্মনি বিন্দতি॥ (গীতা ৪।৩৮)

উক্ত অধ্যায়ের ৩৩ থেকে ৩৭ শ্লোক পর্যন্ত জ্ঞানের মহিমা কীর্তন করে ৩৮তম শ্লোকের প্রথম চরণে বলেছেন— জ্ঞানের চেয়ে পবিত্র কিছু নেই। আর দ্বিতীয় চরণে বলছেন যে জ্ঞানমার্গের যে উচ্চ আসন বা বোধ তা **'যোগসংসিদ্ধ'** ব্যক্তি (যারা কর্মযোগে সিদ্ধ) কোনো সাধনা ছাড়া আপনিই প্রাপ্ত হন।

গুণানুসারে ত্যাগের ভেদ—(শ্লোক ৭-৯)

এই অধ্যায়ের চতুর্থ শ্লোকের দ্বিতীয় চরণে তিন প্রকার ত্যাগ-এর কথা বলা হয়েছে। ভগবান পরবর্তী ৩টি শ্লোকে এই ত্রিবিধ ত্যাগের কথা বিস্তারিতভাবে বলেছেন—

নিয়তস্য তু সন্ন্যাসঃ কর্মণো নোপপদ্যতে।
মোহাত্তস্য পরিত্যাগস্তামসঃ পরিকীর্তিতঃ॥
দুঃখমিত্যেব যৎ কর্ম কায়ক্লেশভয়াৎ ত্যজেৎ।
স কৃত্বা রাজসং ত্যাগং নৈব ত্যাগফলং লভেৎ॥
কার্যমিত্যেব যৎ কর্ম নিয়তং ক্রিয়তেঽর্জুন।
সঙ্গং ত্যক্ত্বা ফলঞ্চৈব স ত্যাগঃ সাত্ত্বিকো মতঃ॥
(গীতা ১৮।৭-৯)

'নিষিদ্ধ ও কাম্যকর্ম পরিত্যাগ করা উচিত কিন্তু যদি নির্দিষ্ট কর্তব্যকর্ম মোহবশত ত্যাগ করা হয় তবে তাকে তামস ত্যাগ বলে।

আর যদি দৈহিক ক্লেশ ও কর্মই দুঃখকর এই ভয়ে কর্তব্যকর্ম ত্যাগ করা হয় তবে তা রাজসিক ত্যাগ এবং এর ফল কোনোভাবেই লাভ হয় না।

আর শাস্ত্রবিহিত কর্মসকল যদি কর্তব্য হিসেবে এবং আসক্তি ও ফলাকাঙ্ক্ষা বর্জিত হয়ে করা হয় তবে তাকে সাত্ত্বিক ত্যাগ বলে।' (গীতা ১৮।৭-৯)

শাস্ত্র নির্দেশিত সকল কর্মকে বিহিত কর্ম বলা হয়। কিন্তু সমস্ত বিহিত

কর্ম একজন ব্যক্তির দ্বারা কখনই করা সম্ভব নয়। তাই সমস্ত বিহিত কর্মের মধ্যেও পরিস্থিতি অনুযায়ী যার পক্ষে যা কর্তব্য সেটাই তার 'নির্দিষ্ট' বা 'নিয়ত' কর্ম হয়ে থাকে।

তামস ত্যাগ—সৎসঙ্গে বা সভা-সমিতিতে যাওয়ার প্রয়োজন থাকলেও না গিয়ে আলস্য বশে শুয়ে থাকা বা বিশ্রাম করা, মাতা-পিতার অসুস্থতার জন্য ঔষধ সংগ্রহ করতে গিয়ে কোথাও আমোদ-প্রমোদ ব্যস্ত থাকা, অফিস বা কোর্ট-মোকদ্দমার সময় হাজিরা না দিয়ে হাসি-ঠাট্টায় সময় কাটানো বা আলস্যবশত স্নানাদি না করা তামসিক ত্যাগের উদাহরণ। এই ত্যাগের ফল অতি কঠোর তাই তামসিক লোকের অধোগতি গতি হয়—**'অধো গচ্ছন্তি তামসাঃ'**।

রাজস ত্যাগ—রাজসিক লোক উপস্থিত কর্মসকল শারীরিক কষ্টের চিন্তায় ত্যাগ করে। যেহেতু এই ত্যাগের কোনো মূল্য নেই তাই তারা ত্যাগের ফল লাভ করে না। তারা ত্যাগের ফলে শান্তি (**ত্যাগাৎ শান্তিরনন্তরম্**) লাভ করেই না, বরং শুভ কর্ম ত্যাগের ফলস্বরূপ দণ্ড ও কর্মের আসক্তির জন্য দুঃখ পায়। রাজসিক ব্যক্তির নিকট যজ্ঞ ও দানাদি শাস্ত্রীয় কর্ম করতে কষ্টসাধ্য ও পরিশ্রম বোধযুক্ত হয়। আবার পিতা মাতা বা গুরুর নির্দেশ পালন করতে পরাধীনতা ও ক্লেশ অনুভব করে। তাদের ভাব এইরকম হয়—

ঘরে কোনো আরাম নেই, স্ত্রী-পুত্র মনের মতো নয়, সাহায্য করার কেউ নেই, সবই নিজেকে করে নিতে হয়। এমন চাকরি যদি পাওয়া যায় যেখানে কাজ কম অথচ মাইনে বেশি আবার কাজ না করলেও কেউ কিছু বলবে না (যেমন সরকারি চাকরি) তবে ভালো হয়। এই সব চিন্তার ফলে এদের কর্তব্যকর্মও ভালো লাগে না আর ঘরের কাজও অবহেলিত হয়।

তবে সৎসঙ্গ, ভগবদ্কথা, ভক্তচরিতাদি শুনে যদি কারোর মনে ভগবানকে লাভ করার তীব্র বাসনা জাগে এবং সে কর্তব্যকর্ম ত্যাগ করে শুধু ভগবানের ভজনা করে, তবে তা রাজসিক বা তামসিক ত্যাগের মধ্যে পড়ে না। কেননা মনুষ্যজন্মের উদ্দেশ্যই হল ঈশ্বর লাভ, আর তাঁর জন্য জাগতিক কর্তব্যকর্ম ত্যাগ করায় সে কোনো প্রকারেই দোষের ভাগী হয় না।

ভক্তের মধ্যে কর্তব্য পালনে আলস্য, প্রমাদ আসতেই পারে না, কেননা তার সদা রুচি থাকে ভগবানের দিকে। আর রাজস-তামস ত্যাগীদের মধ্যে প্রমাদ আসতে বাধ্য, কেননা তাদের রুচি থাকে ভোগের দিকে।

সাত্ত্বিক ত্যাগ—সাত্ত্বিক ব্যক্তি সমস্ত কাজ করে প্রমাদ, আলস্য, উদাসীনতা ত্যাগ করে এবং তৎপরতা ও উৎসাহ সহকারে। ভগবান তাই কর্মযোগ প্রসঙ্গে **'সমাচার'** শব্দটি ব্যবহার করেছেন (গীতা ৩।১৯)। সাত্ত্বিক ব্যক্তি কাজ করেন **'সঙ্গং ত্যক্ত্বা ফলং চৈব'** অর্থাৎ কর্ম ও কর্ম করার যন্ত্রাদিতে (শরীর, মন, বুদ্ধি ইত্যাদি) আসক্তি, ভালোবাসা ও মমত্ববোধ না রেখে এবং কর্মের ফলের সঙ্গে সংযুক্ত না থেকে অর্থাৎ ফলাকাঙ্ক্ষা না করে। এই দুটি থাকলে কি হয়—**'ফলে সক্তো নিবধ্যতে'** (গীতা ৫।১২) অর্থাৎ কর্মে ও কর্মফলে আসক্ত থাকলে মানুষ বন্ধনে আবদ্ধ হয়।

তমগুণে মূঢ়তা (নির্বুদ্ধিতা) থাকে আর রজগুণে থাকে স্বার্থবুদ্ধি। কিন্তু সত্ত্বগুণে মূঢ়ভাবও থাকে না বা স্বার্থবুদ্ধিও থাকে না। বরং সত্ত্বগুণী নিত্যকর্মসমূহকে কর্তব্যকর্ম মনে করে (অর্থাৎ কর্মে আসক্তি ও ফলেচ্ছা ত্যাগ করে) পালন করে তাই তার কর্মসম্পর্ক ছিন্ন হয়।

কর্মযোগ ও জ্ঞানযোগ সাধনে শরীর এবং জগৎ-সংসার থেকে সম্পর্ক ছেদই প্রধান লক্ষ থাকে তাই সাধক প্রতিটি কর্মকেই কর্তব্য ভেবে সম্পন্ন করেন। আবার ভক্তিযোগে ভগবানের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনই হল মূল উদ্দেশ্য, জগৎ-সংসারের সম্পর্ক ছিন্ন মুখ্য নয়। তাই ভক্তিযোগের সাধনা অর্থাৎ জপ-ধ্যান-কীর্তন ইত্যাদি কর্তব্য হিসাবে নয় বরং নিজ প্রিয়তমের (সেবা বা পূজা) মনে করে এবং ব্যগ্রতা ও প্রেম সহকারে এবং তাঁরই প্রসন্নতার জন্য করা হয়। ভক্তিযোগীর ভগবানের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত সমস্ত বিষয়ে (নাম ও রূপ ইত্যাদি) ও তাঁর উপলক্ষ্যে সম্পাদিত সমস্ত কর্মই ভালো লাগে ও আনন্দপ্রদানকারী হয়।

কর্মযোগ ও জ্ঞানযোগের সাধনা যেন কর্তব্যবোধে ঔষধ খাওয়ার মতন হয়। ঔষধ খাওয়ার সময় যত্ন করে খাওয়া হয় কিন্তু খেয়ে লোকে 'সেটা ভুলে যায়', সেইরকম কর্মযোগী নিষ্ঠা সহকারে সব কর্ম করে কিন্তু কর্মে আসক্তি

বা কর্মফলের আশা রাখে না। কর্ম করে তা ভুলে যায়। আবার ভোজনাদি আমরা কর্তব্য হিসাবে করি না, সেটি আমাদের জীবনের আধার। সেটি ছাড়া আমরা বাঁচতে পারি না তাই অত্যন্ত প্রিয়তার সঙ্গে তা গ্রহণ করি, অশ্রদ্ধাভাবে নয়। সেইরকম জপ-ধ্যান-কীর্তন আদি যদি কর্তব্য মনে করা হয় তবে তার দ্বারা ভগবানের সঙ্গে সম্পর্ক বা প্রেম জাগ্রত হতে পারে না। সাত্ত্বিক ব্যক্তির ভক্তিযোগ যেন ভোজনের মতো, তাই ভগবানকে আসক্তি সহকারে ডাকতে হয় ও আত্মবৎ সেবা করতে হয়। তা না হলে ভগবানের সঙ্গে সম্পর্ক জাগ্রত হতে পারে না, প্রেমের উদয় হয় না।

ত্যাগীর ভাব—(শ্লোক ১০-১১)

পরবর্তী দুই শ্লোকে ত্যাগীর ভাব সম্বন্ধে বলেছেন—

ন দ্বেষ্ট্যকুশলং কর্ম কুশলে নানুষজ্জতে।
ত্যাগী সত্ত্বসমাবিষ্টো মেধাবী ছিন্নসংশয়ঃ॥
ন হি দেহভৃতা শক্যং ত্যক্তুং কর্মাণ্যশেষতঃ।
যস্তু কর্মফলত্যাগী স ত্যাগীত্যভিধীয়তে॥

(গীতা ১৮।১০-১১)

'কর্মযোগী অকুশল-কর্মে দ্বেষ করেন না এবং কুশল কর্মে আসক্ত হন না। ত্যাগী সাধক বুদ্ধিমান, সংশয় বর্জিত এবং নিজ স্বরূপে স্থিত।

দেহধারী ব্যক্তির পক্ষে কর্ম সম্পূর্ণভাবে ত্যাগ সম্ভব নয়। তাই যিনি কর্মফল ত্যাগ করেছেন তাঁকেই ত্যাগী বলে।' (গীতা ১৮।১০-১১)

প্রকৃত ত্যাগী কর্মে আসক্ত হন না এবং কর্মফলে নির্লিপ্ত থাকেন। তিনি মেধাবী অর্থাৎ তাঁর কর্ম সর্বাঙ্গীন হয়। তিনি জগৎ-সংসারে অনাসক্ত তাই চিন্ময় তত্ত্বে স্থিতিলাভ করেন এবং ছিন্নসংশয় হন।

এখানে দেহধারী ব্যক্তির অর্থ হল যাদের মধ্যে নিজেকে শরীর বলে মনে করায় 'অহংভাব' ও শরীরকে নিজের বলে মনে করায় 'মমত্ববোধ' প্রবল। এই অহংবোধ ও মমত্ববোধে আবিষ্ট হওয়াই দেহধারীর লক্ষণ। দেহধারী ব্যক্তি কর্মকে সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করতে পারে না তাই কর্মফলের আকাঙ্ক্ষা ত্যাগই হল ত্যাগীর প্রকৃত লক্ষণ। আসলে কর্মফল

ত্যাগ করা যায় না—যেমন শরীর আমাদের প্রারব্ধের কর্মফল, তা কি করে ত্যাগ করা যাবে অথবা আহার করলে তার তৃপ্তি বা চাষ করলে তার ফসল কি করে ত্যাগ করা যায়। তাই গীতা জানিয়েছে যে, যে ফলেচ্ছা ত্যাগ করে তাকেই ত্যাগী বলে।

কর্মফল ত্যাগ না করার ফল—(শ্লোক ১২)

পরের শ্লোকে ভগবান বলছেন—

অনিষ্টমিষ্টং মিশ্রঞ্চ ত্রিবিধং কর্মণঃ ফলম্।
ভবত্যত্যাগিনাং প্রেত্য ন তু সন্ন্যাসিনাং ক্বচিৎ॥

(গীতা ১৮।১২)

'যারা অত্যাগী অর্থাৎ কর্মফল ত্যাগ করে না তারা ইষ্ট, অনিষ্ট ও মিশ্র এই ত্রিবিধ ফল ভোগ করে। কিন্তু যাঁরা কর্মফল ত্যাগ করেন তাঁদের কোনো কর্মফলই ভোগ করতে হয় না।' (গীতা ১৮।১২)

এখানে ইষ্ট মানে শরীর বা মনের অনুকূল পরিস্থিতি এবং অনিষ্টের অর্থ হল প্রতিকূল পরিস্থিতি যা অত্যাগী বা ফলাসক্তদের ক্ষেত্রে উপস্থিত হয় এবং তারা এই পরিস্থিতি থেকে সুখ বা দুঃখ আহরণ করে বন্ধনে আবদ্ধ হয়। আসলে অনুকূল অবস্থাতে আসক্তিসহ সুখভোগ করলে সুখভোগের সংস্কার জন্মায় এবং তাই হয় প্রতিকূল অবস্থায় দুঃখ পাওয়ার মূল কারণ। যতক্ষণ সুখভোগের লালসা থাকবে ততক্ষণই সে প্রতিকূল পরিস্থিতির সম্মুখীন হওয়ামাত্রই চিন্তা-শোক-ভয়-উদ্বেগ অনুভব করে এবং তাতে দুঃখ বোধ করে। এখানে 'প্রেত্য ভবতি'র অর্থ ত্যাগী জন ইহলোক-পরলোকে কর্মফল যুক্ত বন্ধনে আবদ্ধ হন না, কিন্তু অ-ত্যাগীগণ কর্মফলে আসক্তিবশত ইহলোকে তো বটেই পরলোকেও বা জন্মান্তরেও কর্মফল প্রাপ্ত হন অর্থাৎ দুঃখ ভোগ করতে থাকেন।

সন্ন্যাসী বা ত্যাগীদের কেন কর্মফল ভোগ করতে হয় না ? কারণ ত্যাগীর স্পষ্ট ধারণা থাকে যে তিনি যদি নিজের জন্য কিছু করেন তবে সেটি তাঁর অহংকার পোষণে সাহায্য করবে এবং তখন নিজের হিতসাধনকে জগতের হিতসাধন থেকে পৃথক করা সম্ভব নয়। তাই ত্যাগী নিজের জন্য

কিছু করেন না, বা নিজের হিতকে সংসারের হিত থেকে পৃথক মনে করেন না। শরীরাদি সকল সামগ্রীই জগতের সঙ্গে অভিন্ন অতএব সেই সামগ্রী দ্বারা নিজের স্বার্থসিদ্ধি করার কামনাই হল বন্ধনের মূল কারণ। ত্যাগী তাই স্বতঃই 'সর্বভূতহিতে রতাঃ' হয়ে ওঠেন।

অর্জুন ত্যাগী ও সন্ন্যাসীর মধ্যে তত্ত্বগত পার্থক্য জানতে চেয়েছিলেন। ভগবান এখানে উভয়ের ঐক্যের কথা বলেছেন।

কর্মযোগী কর্মে আসক্তিবিহীন হওয়ায় ফলেচ্ছা ত্যাগ করেন অর্থাৎ কর্মফলে মমত্ববোধ ত্যাগ করেন, তার ফলে তাঁর কোনো কর্মেই অহংবোধ আসে না। আবার সন্ন্যাসী বা সাংখ্যযোগীও কর্মে নির্লিপ্ততাবশত কর্তৃত্বাভিমান বা অহংবোধ ত্যাগ করেন ফলে কর্মফলে মমত্ববোধ স্বতঃই পরিত্যাগ হয়। প্রকৃতির ক্রিয়াগুলির (যা শরীর সম্পর্কিত) ওপর অহংভাব ও মমত্ব বা আসক্তি জন্মালে তা পুরুষের পক্ষে কর্ম হয়ে দেখা দেয়। এই একাত্মতা দূর হয়ে গেলে সেই একই কর্ম পুরুষের পক্ষে 'অকর্ম' হয়ে ওঠে বা প্রকৃতির ক্রিয়ামাত্র হয় এবং ফলপ্রদ হয় না। একেই বলে 'কর্মে অকর্ম'।

কর্মণ্যকর্ম যঃ পশ্যেদকর্মণি চ কর্ম যঃ।
স বুদ্ধিমান্ মনুষ্যেষু স যুক্তঃ কৃৎস্নকর্মকৃৎ॥ (গীতা ৪।১৮)

কর্মের ভেদ—

কর্ম তিন প্রকারের—প্রারব্ধ, সঞ্চিত ও ক্রিয়মান।

কোনো কর্ম একবার করলে তার কর্মফল অবশ্যম্ভাবী। আর এই কর্মফল ভোগ না করে কোটি জন্ম গ্রহণ করলেও তা ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না।

'নাভুক্তং ক্ষীয়তে কর্ম জন্মকোটিশতৈরপি।'

এই ক্রিয়মান কর্মের যে ফল তা সঞ্চিত হিসাবে জমা পড়ে। সঞ্চিতের মধ্যে যে সব কর্ম ফল দেওয়ার জন্য উপস্থিত হয়, তাকে বলে প্রারব্ধ আর এই প্রারব্ধ কর্ম (ভাগ্য) কেউ খণ্ডন করতে পারে না।

'অবশ্যমেব ভোক্তব্যং কৃতং কর্ম শুভাশুভম্।'

প্রারব্ধ কর্মফল অর্থাৎ ভাগ্য ইষ্ট, অনিষ্ট ও মিশ্র পরিস্থিতিরূপে মানুষের

জীবনে উপস্থিত হয়[১]। পরিস্থিতি মানুষকে সুখী অথবা দুঃখী করতে পারে না কিন্তু পরিস্থিতির সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করা অর্থাৎ কোনো পরিস্থিতিকে আকাঙ্ক্ষা করা বা কোনো পরিস্থিতিকে দ্বেষ করাই সুখী ও দুঃখী হওয়ার প্রধান কারণ।

আকাঙ্ক্ষার ভেদ—

মানুষের মধ্যে চারপ্রকার আকাঙ্ক্ষা জাগে—ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ।

ধর্ম — সকাম বা নিষ্কামভাবে যজ্ঞ (পরোপকার)—দান-তপ-ব্রত-তীর্থাদিকে বলা হয় ধর্ম।

অর্থ—স্থাবর বা অস্থাবর সম্পত্তির অধিকারী হওয়া।

কাম—জাগতিক সুখবোধ হল কাম।

মোক্ষ — আত্মসাক্ষাৎকার, তত্ত্বজ্ঞান, মুক্তি, ভগবদ্প্রেম ইত্যাদি মোক্ষবাচক।

কামনার ভেদ—

কাম বা সুখভোগ হল আটপ্রকার—

শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ, মান, মর্যাদা ও আরাম।

শব্দ—ইহা দুই প্রকার বর্ণাত্মক ও ধ্বন্যাত্মক। এর মধ্যে ব্যাকরণ, সাহিত্য, উপন্যাস, গল্প ইত্যাদি হল বর্ণাত্মক। আর এই বর্ণাত্মক শব্দে দশটি রস থাকে। শৃঙ্গার, হাস্য, করুণ, রৌদ্র, বীর, ভয়ানক, বীভৎস, অদ্ভুত, শান্ত ও বাৎসল্য। চিত্ত দ্রবীভূত হলে এই দশটি রস উৎপন্ন হয়।

যদি এই দশটি রস ভগবানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয় তবে তা কল্যাণকামী হয় আর যদি সুখভোগের জন্য হয় তবে তা পতনকারক হয়।

ধ্বনাত্মক শব্দ হল সাড়ে তিনপ্রকারের (বাদ্যযন্ত্র) যথা—

চর্মজ—ঢোল, তবলা, পাখোয়াজ, মৃদঙ্গ ইত্যাদি। তার—সেতার, সারেঙ্গী, তানপুরা ইত্যাদি। **ফুৎকার**—হারমোনিয়াম, বাঁশী ইত্যাদি এবং **অর্ধেক বাদ্যযন্ত্র** (অর্থাৎ দুটি একসঙ্গে না হলে কার্যকারী হয় না) যেমন ঝাঁঝ,

[১]কর্মের ফল কর্ম হয় না, কর্মের ফল হয় পরিস্থিতি।

করতাল ইত্যাদি তালবাদ্য।

এই বর্ণাত্মক ও ধ্বনাত্মক শব্দগুলি শুনে যে সুখ তাকে বলে শব্দজ সুখ।

স্পর্শ—স্ত্রী-পুত্র-মিত্রর মিলনে এবং ঠাণ্ডা-গরম বা কোমলতার সঙ্গে ত্বকের সংযোগের ফলে যে সুখ তা হল স্পর্শজ সুখ।

রস—মিষ্ট, অম্ল, লবণ, কটু, তিক্ত ও কষা এই ছয়প্রকার স্বাদ যা জিহ্বা দ্বারা অনুভূত হয় তা রসাত্মক সুখ।

গন্ধ—নাকদ্বারা আতর, তেল, পুষ্পজাত সুগন্ধী বা পিঁয়াজ, রসুন আদি খাদ্যদ্রব্যের গন্ধগ্রহণে যে সুখ, তা গন্ধজ সুখ।

রূপ—চক্ষুদ্বারা খেলাধুলা, সিনেমা, সার্কাস বা সুন্দর দৃশ্য দেখে যে সুখ তা রূপজ সুখ।

মান—কেহ শরীরের আদরযত্ন করলে যে সুখ তাকে বলে সম্মান সুখ।

মর্যাদা—নামের প্রশংসা হলে যে সুখ তাকে বলে মর্যাদা সুখ।

আরাম—পরিশ্রম না করতে হলে যে সুখ তাকে আরাম বলে।

আকাঙ্ক্ষার পরিপূরকতা—

এই আকাঙ্ক্ষার মধ্যে কোন্‌টি কিসের পরিপূরক তা পরবর্তী আলোচনায় বোঝা যাবে।

১) কাম ও অর্থ—অর্থকে যদি কামনা পূরণের জন্য লাগানো হয় তবে তা কামনা পূরণ করেই শেষ হয়ে যায়। কিন্তু অর্থকে যদি কামনা ত্যাগ করে অন্যের উপকার বা হিতার্থে ব্যয় করা হয় তবে তা চিত্তশুদ্ধি করে (কর্মযোগ) মুক্তিপ্রদানে সাহায্য করে।

২) কাম ও ধর্ম—যদি ধর্মকে কামনা পূরণের জন্য ব্যয় করা হয় তবে সেই 'ধর্মকৃত পুণ্য' কামনা পূরণ করেই শেষ হয়ে যায়। কিন্তু যদি কামনা না রেখে ধর্মকার্য করা হয় তবে তা চিত্তশুদ্ধি করে (বিধিভক্তি) মুক্তিপ্রদান করে।

৩) ধর্ম ও অর্থ—উভয়ই উভয়ের পরিপূরক। ধর্মভাবে (নিষ্কামভাবে) উপার্জিত অর্থকে যদি ধর্মভাব বৃদ্ধির জন্য ব্যয় করা হয় তবে উভয়েই

সার্থকতা লাভ করে।

তাৎপর্য হল যেখানেই কামনার প্রাধান্য সেখানেই বদ্ধতা অর্থাৎ কামনা—ধর্ম ও অর্থ উভয়কেই গ্রাস করে। তাই ভগবান একে মহাশন (বিশেষ গ্রাসকারী অথবা অগ্নির ন্যায় অতৃপ্ত) ও মহাপাপ্মা (অতি পাপকারক) বলেছেন (গীতা ৩।৩৭-৪৩) এবং এটিকে বিশেষভাবে ত্যাগ করার কথা বলেছেন।

অনুকূল ও প্রতিকূল পরিস্থিতির প্রয়োগ—

সাধকদের উচিত অনুকূল ও প্রতিকূল অবস্থার সদ্ব্যবহার করা, অপব্যবহার নয়।

সদ্ব্যবহার—অনুকূল পরিস্থিতির সময় উপলব্ধ বস্তু অন্যের হিতার্থে সেবাবুদ্ধি দিয়ে ব্যয় করাই হল অনুকূল পরিস্থিতির সদ্ব্যবহার। আর প্রতিকূল অবস্থা এলে তখন সুখের আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করে প্রসন্ন থাকাই হল প্রতিকূল অবস্থার সদ্ব্যবহার।

অপব্যবহার—অনুকূল পরিস্থিতিকে সুখবুদ্ধিতে ভোগ করা ও প্রতিকূল অবস্থার সময় দুঃখবোধ করাই হল পরিস্থিতির অপব্যবহার। সুখ দুঃখ ভোগ করার জন্য মনুষ্যযোনি নয়, মনুষ্যযোনি হল কর্মযোনি বা সাধন যোনি আর অন্য সব যোনি হল ভোগ যোনি অর্থাৎ সেগুলি পূর্বজন্মে মনুষ্য কৃত ভাল-খারাপ কর্মের ফল ভোগ করার জন্যই প্রাপ্ত হয়েছে। তাই মানুষের অনুকূল বা প্রতিকূল পরিস্থিতিতে সুখ বা দুঃখ ভোগ করে তাতে আসক্ত হওয়া উচিত নয়। **অনুকূল পরিস্থিতিতে সুখভোগ করাই হল প্রতিকূল পরিস্থিতিতে দুঃখভোগের মূল কারণ।**

কর্ম সম্বন্ধে উদাহরণসহ গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা—

কর্মের ফল অনুযায়ী দুটি ভাগ—শুভ (পুণ্য) ও অশুভ (পাপ)। শুভ কর্মের ফল হল অনুকূল পরিস্থিতি ও অশুভ কর্মের ফল হল প্রতিকূল পরিস্থিতি লাভ। আবার কাল অনুযায়ী কর্মের তিনটি ভাগ—সঞ্চিত, ক্রিয়মান ও প্রারব্ধ।

সঞ্চিত কর্ম—অনেক জন্ম ধরে মানুষ যে সকল ভালো-মন্দ কর্ম করেছে

এবং এ পর্যন্ত যার ফলভোগ করা হয়নি সে সবই হল সঞ্চিত কর্ম। এই সঞ্চিত কর্মের ফল অংশ থেকে সৃষ্ট হয় 'প্রারব্ধ' যা সঞ্চিত কর্মর একটি ক্ষুদ্র অংশ এবং তা এই জন্মেই ভোগ করতে হয় আর সংস্কার অংশ থেকে সৃষ্ট হয় 'স্ফূরণ'। সাধারণত বর্তমানে কৃত কর্মের সংস্কারের প্রভাবজাত স্ফূরণই অধিক বলশালী হয়। তবে সঞ্চিত সংস্কারেরও স্ফূরণ হয়।

ক্রিয়মাণ কর্ম—ক্রিয়মান কর্মেরও দুটি ভাগ—একটি ফল অংশ অপরটি সংস্কার অংশ। এই ফল অংশ কখনো কখনো প্রারব্ধর ফল হিসেবে লৌকিক ফল প্রাপ্ত করায় আবার কখনো পারলৌকিক (অন্য জন্মের) ফল হিসেবে সঞ্চিত কর্মে জমা পড়ে।

কর্মফলের ভোগ—পাপ-পুণ্য বা শুভ-অশুভ কর্মের ফলে উদ্ভূত কর্মফলের কোন্‌টি লৌকিক (প্রারব্ধ) বা কোন্‌টি পারলৌকিক (সঞ্চিত কর্ম) হবে অথবা লৌকিক কর্মফলেরও বা কতটুকু ভোগ হয়েছে ও কতটুকু বাকি আছে তা জানার কোনো উপায় মানুষের নেই। তবে তার সম্পূর্ণ হিসাব ভগবানের কাছে আছে এবং তিনি তাঁর নিয়ম অনুযায়ী যতটুকু অংশ কম ভোগ হয়েছে (শুভ অথবা অশুভ) তা ইহজন্মের পরবর্তীকালে বা পর-জন্মে ভোগের পরিস্থিতি সৃষ্টি করে ফল ভোগ করতে বাধ্য করেন।

কর্মের সংস্কার—ক্রিয়মান কর্মের সংস্কার অংশেরও দুটি ভাগ আছে শুদ্ধ সংস্কার ও অশুদ্ধ সংস্কার। শাস্ত্রবিহিত কর্ম করলে শুদ্ধ ও পবিত্র সংস্কার হয় এবং শাস্ত্রবিরুদ্ধ ও লোকমর্যাদার বিরুদ্ধ কর্ম করলে সংস্কার হয় অশুদ্ধ ও অপবিত্র। এই শুদ্ধ বা অশুদ্ধ সংস্কার নিয়ে লোকের স্বভাব বা প্রকৃতি তৈরি হয়। যেসব নতুন কর্ম এবং তার সংস্কার তৈরি হয়, সেগুলি সবই মনুষ্যজন্মের জন্যই নির্দিষ্ট (**'কর্মানুবন্ধীনি মনুষ্যলোকে'** ১৫।২)। পশুপাখি-বৃক্ষ-দেবতাদি ইত্যাদি যোনিগুলো কেবল কর্মফল ভোগ করার জন্য, নতুন কর্মফল তৈরি বা সংস্কার পরিবর্তনের জন্য নয়। সংস্কার অংশের জন্য যে স্বভাব সৃষ্ট হয়, তা এক দৃষ্টিতে প্রবল হয়—**'স্বভাবো মূর্ধ্নি বর্ততে'** অর্থাৎ তাকে দূর করা সম্ভব নয়।

ভগবান তাই অর্জুনকে বলেছেন—**'করিষ্যস্যবশোঽপি তৎ'** (গীতা

১৮।৬০)। যা মোহবশত করতে চাইছ না, তা তুমি নিজ স্বভাববশত অবশ হয়েই করবে। এখানে চিন্তার বিষয় এই যে একদিকে স্বভাবের অত্যন্ত প্রাবল্য যা মানুষ ত্যাগ করতে পারে না, অন্যদিকে মনুষ্যজন্মে উদ্যোগের প্রাধান্য, যাতে মনুষ্য স্বাধীন, এই দুইয়ের মধ্যে কেই বা জয়ী হবে, কেই বা পরাজিত হবে। এ বিষয়ে বক্তব্য এই যে, উভয়ই নিজ নিজ স্থানে প্রধান। অনাদিকাল থেকে জীবের অসৎ-এর সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করার স্বভাব রয়ে গেছে, যার ফলে জীব জন্ম-মৃত্যু চক্রে আবর্তিত হয় এবং নিজ কর্মফল অনুযায়ী উচ্চ-নীচ কুলে জন্ম নিয়ে থাকে। জন্ম অনুসারে মানুষ প্রারব্ধবশত প্রাপ্ত যে স্বভাব পায় তার পরিবর্তন কেউ করতে পারে না এবং শাস্ত্রও তা পরিবর্তন করতে বলে না।

তবে মানুষ তার স্বভাবজাত দোষকে শুদ্ধ করে তুলতে পারে অর্থাৎ তার মধ্যে বস্তুর প্রতি যে কামনা-বাসনা-মমতা-একাত্মতা বোধ থাকে সে তা দূর করতে সক্ষম। এইভাবে প্রকৃতি বা স্বভাবের প্রবলতা যেমন প্রমাণিত হয় তেমনি মানুষের স্বাতন্ত্র্যতাও প্রমাণিত হয়।

কর্মযোগ দ্বারা যখন মানুষের রাগ-দ্বেষ দূর হয় তখন তার স্বভাব শুদ্ধ হয় আর তার ফলে আত্মস্বার্থ ত্যাগ করে পরহিতের ভাব স্বতঃই প্রকটিত হয়। আর তখনই ভগবানের সর্বসুহৃৎ শক্তি তার মধ্যে প্রকাশিত হয়, তিনি হন—

সুহৃদং সর্বভূতানাম্ (গীতা ৫।২৯)

সুহৃদং সর্বদেহিনাম্ (শ্রীমদ্ভাগবত ৩।২৫।২১)

প্রারব্ধ—ভোগী ও জ্ঞানী—

মনুষ্যজন্মের প্রারম্ভে তার ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট প্রারব্ধ (ভাগ্য) ভোগ অবশ্যম্ভাবী। প্রারব্ধের ফলে সৃষ্ট অনুকূল পরিস্থিতির যে সুখ অর্থাৎ মান-যশ-প্রতিষ্ঠা-ধন-দৌলত-স্ত্রী-পুত্রাদি লাভ ও প্রতিকূল পরিস্থিতির যে কষ্ট অর্থাৎ অপমান-দারিদ্র্য-জেল-জরিমানা ইত্যাদি যদি এই জন্মেই ভোগ হয়ে যায় তবে তা আর পরজন্মে ভোগ করতে হয় না। তবে গীতায় ভগবান বলেছেন **'গহনা কর্মণো গতিঃ'** (গীতা ৪।১৭)। অর্থাৎ কর্মের গতি

(কর্মফল প্রদান) খুব গভীর। ভগবানের ঋত বা প্রকৃতির নিয়ম অনুযায়ী পুণ্য বা পাপের যতটুকু অংশ কম ভোগ হয়েছে ততটুকুই ইহজন্মে পরবর্তীকালে বা পরজন্মে ভোগ করতে হয়। তবে কোন্‌টি এ জন্মে হবে, কোন্‌টি পর-জন্মে তা বলা সম্ভব নয়।

একটি সত্য ঘটনা— পুত্তাপুত্তিতে সাঁইবাবার আশ্রম। প্রচুর ভক্ত তাঁর দর্শনে এসেছেন। সামনের সারিতে হুইল চেয়ারে বসে আছেন এক অভিজাত সৌম্যদর্শন বৃদ্ধ ভদ্রলোক। কয়দিন ধরেই উনি আসছেন বাবার সঙ্গে নিভৃতে কথা বলার জন্য। সাঁইবাবা ভক্তদের প্রতিদিনই দর্শন দেন আর ডেকে নেন কিছু ভক্তদের, তাঁর আশীর্বাদ প্রদানের জন্য। একদিন সেই বৃদ্ধরও ডাক পড়ল। বাবা বললেন, বলো তোমার জন্য কী করতে পারি। বৃদ্ধ ভদ্রলোক বললেন, বাবা জীবনে আমি অনেক প্রতিষ্ঠা, সম্মান, প্রাচুর্য, অর্থ পেয়েছি তবে এই বয়সে শারীরিক নানা কষ্টর মধ্যে আছি। আমার আর বাঁচার ইচ্ছা নেই, দয়া করে যদি আমাকে শান্তিতে মৃত্যু আশীর্বাদ করেন। সাঁইবাবা একটু চিন্তা করে বললেন—দেখুন আপনার প্রারব্ধর পুণ্য কর্মের ভোগ হয়ে গেছে, এখন তো পাপ অংশর ভোগ করতেই হবে। তবে যদি শারীরিক খুবই কষ্ট হয় এবং এ জীবন রাখার ইচ্ছে একেবারই না থাকে তাহলে আমি সাহায্য করতে পারি, কিন্তু এই কর্মফল অবশ্যই ভোগ করতে হবে এবং তা হবে পরের জন্মে। আজকে যান, কাল আবার আপনার কি ইচ্ছা বলবেন। পরের দিন সেই বৃদ্ধ ভদ্রলোক বললেন, বাবা আমি কাল সারারাত ধরে চিন্তা করেছি। কিন্তু ঠিক করেছি ভগবদ্দত্ত যে প্রারব্ধের ফলে এই কষ্ট তা আমি এই জন্মেই ভোগ করতে চাই, ভগবদ্ ইচ্ছার ব্যতিক্রম চাই না। তবে আপনি আশীর্বাদ করুন যাতে কষ্ট সহ্য করার শক্তি পাই। সাঁইবাবা হেসে বললেন ভগবদ্ ইচ্ছাই পূর্ণ হোক তুমি সহ্যশক্তি পাবে।

আরও একটি সত্য ঘটনা—এক গ্রামে এক ভদ্রলোকের প্রতিবেশী ছিল এক স্বর্ণকার। একবার গ্রামেরই এক সিপাহী অর্থের লোভে সেই স্বর্ণকারকে হত্যা করে তার সোনার বাক্সটি নিয়ে পলায়নরত অবস্থায় সেই ভদ্রলোকের হাতে ধরা পড়ে। তখন সিপাহী সেই ভদ্রলোককে বলে, দেখো,

তুমি গোলমাল পাকিওনা আমি তোমাকে অর্ধেক দিচ্ছি। ভদ্রলোক কিন্তু তাতে রাজি হয় না বরং লোক ডাকাডাকি শুরু করলে সেই সিপাহীটি অন্য সিপাহীদের ডেকে ভদ্রলোককেই হত্যার অপরাধে ফাঁসিয়ে দেয়। বিচারে ভদ্রলোকের ফাঁসির আদেশ হয়। কিন্তু ভদ্রলোক জজসাহেবকে কাতরভাবে বললেন—ভগবানের বিচারে ন্যায় নেই। আমি খুন না করেই শাস্তি পাব আর ওই সিপাহীটি খুন করেও মুক্তি পেল ! কি অন্যায়। জজের ওপর এই কথার প্রভাব পড়ল। তিনি এক উপায় বার করলেন।

সকালেই একটি লোক কাঁদতে কাঁদতে এসে বলল, জজসাহেব আমার ভাই খুন হয়েছে, তার বিচার চাই। জজসাহেব তখন সেই সিপাহী ও দণ্ডপ্রাপ্ত ভদ্রলোককে সেই মৃতদেহ আনতে পাঠালেন। দুজনে মৃতদেহসহ খাটটি তুলে হাঁটতে শুরু করল। চলতে চলতে সিপাহী দণ্ডপ্রাপ্ত লোকটিকে বলল— দেখো, যদি তুমি তখন আমার কথা শুনতে তবে স্বর্ণালংকারও পেতে আর ফাঁসিতেও ঝুলতে হত না। দণ্ডপ্রাপ্ত ভদ্রলোক বললেন আমি সত্য কথা বলেই ফাঁসিতে চড়ছি, এতে ভগবানের ন্যায়বিচার হয়নি। খাটের ওপর মৃত সেজে শুয়ে থাকা লোকটি দুজনার কথাই শুনছিল। খাটটি জজের সামনে নামানো মাত্রই সে উঠে এসে সমস্ত কথা ব্যক্ত করল। জজসাহেব তক্ষুনি সিপাইকে গ্রেফতারের আদেশ দিলেন। তারপর জজসাহেব দণ্ডপ্রাপ্ত ভদ্রলোকটিকে আলাদা করে ডেকে নিয়ে বললেন— এই মামলাতে তুমি নির্দোষ, কিন্তু সত্যি করে বলতো তুমি আর কাউকে খুন করেছো কি না ? সেই ভদ্রলোকটি তখন বলল, জজসাহেব সত্যিকথা বলতে কি অনেক দিন আগের কথা, আমার স্ত্রীর এক গুপ্ত প্রণয়ীকে আমি বারংবার নিষেধ সত্ত্বেও কথা না শোনায় তাকে হত্যা করে জলে ভাসিয়ে দিই, কেউ তা জানতে পারেনি। জজসাহেব তখন বললেন, এইবার আমি বুঝতে পারলাম কেন আমার হাত দিয়ে ফাঁসির হুকুম বেরোল। এখন তোমার আগের পাপের ফলে ফাঁসি হবে আর সিপাহীর ফাঁসি হবে বর্তমান হত্যার জন্য।'

দণ্ডপ্রাপ্ত ভদ্রলোকটি কর্তব্য-পালন করে চোর-সিপাহীকে ধরেছিলেন কিন্তু তাঁর ফাঁসি হল অনেক আগে যে হত্যা করেছিলেন তার ফল হিসাবে।

মানুষের নিজেকে রক্ষার অধিকার আছে কিন্তু কাউকে হত্যা করার অধিকার নেই, সেই অধিকার কেবল রক্ষক ও রাজার। ভদ্রলোকটি ইহজন্মেই হত্যার সাজা পেয়ে পরলোকের ভীষণ সাজা থেকে মুক্তি পেল। ইহজন্মে যে দণ্ডভোগ হয় তাতে কৃত পাপ থেকে অল্পেই মুক্তি হয়, শুদ্ধি আসে। ভগবানের বিচিত্র বিধান। কোনো পাপের শাস্তি বা কোনো পুণ্যের ভোগ, কখন হবে তা কারোর জানা নেই। তবে যতক্ষণ পুণ্য প্রবল থাকে, ততক্ষণ উগ্র পাপের ফলও তৎক্ষণাৎ মেলে না। তাই যদি পূর্বের পুণ্য প্রবল হয় তাহলে বর্তমানের পাপকর্মের ফল পাওয়ার পূর্বে সেই পুণ্যের ফলরূপে সুখ ভোগ হতে থাকে এবং সেই পুণ্যের ভোগ শেষ হলে তবেই পাপ ভোগের সময় আসে। যেমন যেমন প্রারব্ধ উপস্থিত হয়, তা ভোগের জন্য বুদ্ধিও অনুরূপভাবে তেমন তেমন পরিবর্তিত হয়। ব্যবসায়ে কারোর লাভ কারোর ক্ষতি হয়, কিন্তু সেইসময় প্রারব্ধ কর্ম অনুযায়ী বুদ্ধি তৈরি হয় ও পরিবেশ সৃষ্ট হয় যাতে প্রারব্ধ ভোগ সম্ভব হয়। তবে ব্যবসা বা অন্যান্য কর্ম ন্যায়যুক্ত হবে না অন্যায়যুক্ত হবে তার সিদ্ধান্ত নিয়ে মানুষ স্বাধীন কারণ এটি নতুন কর্ম (ক্রিয়মান), প্রারব্ধ নয়।

অজ্ঞানীরা (বদ্ধজীব) প্রারব্ধের ফলে উদ্বুদ্ধ অনুকূল ও প্রতিকূল পরিস্থিতিতে সুখ ও দুঃখ আহরণ করে কিন্তু জ্ঞানী এইরূপ পরিস্থিতিতে নির্বিকার থাকে।

প্রারব্ধ ও উদ্যম—ভাগ্য ও পুরুষকার

প্রারব্ধ ও উদ্যম দিয়ে দেখলে মানুষের চারটি মূল আকাঙ্ক্ষা দুই ভাবে ভাগ করা যায়।

প্রারব্ধের ক্ষেত্র—অর্থ ও কামের মুখ্যতা এবং ধর্ম ও মোক্ষের গৌণতা।

উদ্যমের ক্ষেত্র—ধর্ম ও মোক্ষের মুখ্যতা এবং অর্থ ও কামের গৌণতা।

প্রারব্ধ ও উদ্যমের ক্ষেত্র ভিন্ন ভিন্ন এবং তারা নিজ নিজ স্থানে (স্বক্ষেত্রে) প্রধান।

প্রারব্ধ—**অর্থ ও ভোগ** এই দুটিতেই প্রারব্ধের প্রাধান্য থাকে তবে এর মধ্যে কারোর অর্থের প্রাধান্য আর কারোর ভোগের প্রারব্ধ থাকতে পারে।

যার অর্থের প্রারব্ধ থাকে, ভোগের প্রারব্ধ নয় তার জীবনে লক্ষ লক্ষ টাকা আসলেও সে ভোগ করতে পারে না, অসুখবিসুখেই টাকা নষ্ট হয়ে যায়। আর যার ভোগের প্রারব্ধ আছে তার অর্থের অভাব থাকলেও সুখের বা আরামের অভাব হয় না।

ধান নহি ধীনোঁ নহিঁ, নহিঁ রূপৈয়ো রোক।
জীমণ বৈঠে রামদাস, আন মিলৈ সব থোক॥

সন্ত রামদাস বলেছেন—কাছে টাকা-পয়সা, গবাদি পশু কিংবা অর্থ প্রভৃতি কিছুই নেই, কিন্তু ক্ষুধা পেলে (বস্তুর প্রয়োজন উপস্থিত হলে) প্রয়োজন মতো সামগ্রী স্বতঃই এসে যায়। আবার যার প্রারব্ধে অর্থ ও ভোগ নেই, সে যদি নানা উপায়—যেরকম আয়কর ফাঁকি, ঘুষ, চুরি ইত্যাদির দ্বারা অর্থাদি সংগ্রহ করেও তবে তা থাকে না অর্থাৎ অসুখ-বিসুখ, মামলা-মোকদ্দমা ইত্যাদিতেই নষ্ট হয়ে যায় আর থাকলেও ধরা পড়ে গিয়ে সঞ্চিত অর্থ তো যায়ই, শাস্তিও হয়। সর্বোপরি চুরি করার যে প্রবৃত্তি ভেতরে তৈরি হয়, সেই সংস্কার তাকে জন্ম-জন্মান্তর ধরে চুরি করতে প্ররোচিত করে ও বারংবার দণ্ডপ্রাপ্ত করায়।

শ্রীমদ্ভাগবতে অবধূত (দত্তাত্রেয়) ও মহারাজ যদু সংবাদ বর্ণনাক্রমে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলছেন—

সুখমৈন্দ্রিয়কং রাজন্ স্বর্গে নরক এব চ।
দেহীনাং যদ্ যথা দুঃখং তস্মান্নেচ্ছেত তদ্ বুধঃ॥

(শ্রীমদ্ভাগবত ১১।৮।১)

'ইন্দ্রিয় সুখ বা দুঃখ স্বর্গ বা নরকেও পাওয়া যায়। সুতরাং বুদ্ধিমান ব্যক্তির সুখের আকাঙ্ক্ষা করা উচিত নয়।'

নিজের দেহযাত্রার জন্য অত্যন্ত যত্ন কর্তব্য নয়, কারণ যত্ন করার ফলও কিছু নেই। দুঃখ কে চায়, তবু দুঃখ আপনি এসে উপস্থিত হয় আর সুখ কেই বা না চায় তবু তা পায় কে ? সুতরাং ইচ্ছা বা অনিচ্ছায় কী লাভ ?

ধর্ম ও মোক্ষের ক্ষেত্রে পুরুষার্থই প্রধান। তবে কেউ ধর্মের জন্য পুরুষকার (উদ্যম) প্রয়োগ করে কেউ বা করে মোক্ষের জন্য। তবে

ধর্মানুষ্ঠানে শরীর ও অর্থের প্রাধান্য থাকে এবং মোক্ষলাভে ভাব ও বিচারের প্রাধান্য থাকে।

তাই বলা হয়—

সন্তোষস্ত্রিষু কর্তব্যঃ স্বদারে ভোজনে ধনে।
ত্রিষু চৈব ন কর্তব্যঃ স্বধ্যায়ে জপদানয়োঃ॥

অর্থাৎ **প্রারব্ধজনিত কর্মফলের** ফলে পাওয়া নিজ স্ত্রী, পুত্র, পরিজন, খাদ্য ও অর্থে সদাই সন্তুষ্ট থাকবে, কেননা প্রারব্ধ অনুসারে যতটা পাওয়ার ততটাই পাবে, বেশিও নয় কমও নয়। আবার **পুরুষার্থজনিত কর্ম** যথা ধর্মানুষ্ঠান বা নিজ আত্মজ্ঞানজনিত কল্যাণের পথে সদাই প্রচেষ্ট থাকবে কখনই সন্তুষ্ট হবে না। কারণ এগুলি নতুন শুভ পুরুষার্থ এবং এর জন্যই মনুষ্যদেহ লাভ হয়েছে।

একটি কাহিনী—এক ডাক্তারের কাছে এক রোগী গেছে। তার উদরের পীড়া (ভোগ—প্রারব্ধ দ্বারা প্রাপ্ত) কোনো চিকিৎসাতেই সারছে না আর দৃষ্টিশক্তিও ক্ষীণ (দৃষ্টি—ধর্ম ও মোক্ষ যা পুরুষকার দ্বারা প্রাপ্তব্য), তাই তার ঔষধ দরকার।

ডাক্তারবাবু ভালভাবে দেখে এক পুরিয়া ঔষধ পেটের রোগে খাওয়ার জন্য আর এক শিশি ঔষধ চোখে দেওয়ার জন্য দিলেন এবং এক সপ্তাহ পরে আসতে বললেন। কিছু পরে আর একজন রোগীও এল একই রকম রোগ নিয়ে। ডাক্তারবাবুও তাকে একই ঔষধ দিয়ে এক সপ্তাহ পরে আসতে বললেন। পরের সপ্তাহে দুইজন রোগীই ডাক্তারবাবুর কাছে উপস্থিত। প্রথম জন সম্পূর্ণ সুস্থ কেননা সে ডাক্তারবাবুর কথামতো ঔষধ খেয়েছে। কিন্তু দ্বিতীয় জন এর অবস্থা খুব খারাপ। পেটের অবস্থার দারুণ অবনতি হয়েছে এবং চোখ লাল লাল ও দৃষ্টিশক্তি অতি ক্ষীণ। ডাক্তারবাবু জিজ্ঞাসা করলেন ঔষধ ঠিকমতো খেয়েছো তো ? রোগী বলল ঔষধ খুব যত্ন করে খেয়েছি। ডাক্তারবাবু জিজ্ঞাসা করলেন কিভাবে খেয়েছো ? রোগী বলল, শিশির ঔষধটা পেটের জন্য খেয়েছি আর পুরিয়ার ঔষধ চোখে লাগিয়েছি। ডাক্তারবাবু বললেন আরে সর্বনাশ করেছো ! এ যে ঠিক উল্টো ঔষধ

খেয়েছো, এতে তো রোগ বাড়বেই। এখন অনেকদিন ঠিকমতো ঔষধ খেলে তবেই তোমার উন্নতি হবে।

আমরা যারা বদ্ধজীব তাদের অবস্থাও অনেকটা দ্বিতীয় রোগীর মতো, যারা উল্টো পথে চলে। আমরা সবাই, যা প্রারব্ধজনিত ভোগ যথা অর্থ ও ভোগের ওপর পুরুষকার প্রয়োগ করি যাতে অর্থ ও কামনার জিনিসের প্রাচুর্য হয়। কিন্তু কখনই তা প্রারব্ধের বেশি না পাওয়াতে মনস্তাপ করি আর ভগবানকে দোষ দিই। আর আবার যা পুরুষকারজনিত কর্মে প্রাপ্য যথা—ধর্ম ও মোক্ষ, তা প্রারব্ধ বা দৈবের ওপর ছেড়ে দিয়ে বসে থাকি। ভাবি ভগবানের যখন কৃপা হবে তখন ধর্মে মতি হবে, নিজের থেকে কিছু করার দরকার নেই। এই চিন্তাধারা না পাল্টালে অর্থাৎ প্রারব্ধ ও পুরুষকারের প্রকৃতস্থানে প্রাধান্য না দিলে জীব সংসার বন্ধনে আবদ্ধই থাকবে।

পুণ্য ও পাপের ফল—

পুণ্য ও পাপের ফল এক নয়। পুণ্য নিষ্কামভাবে ভগবানে অর্পণ করলে তা নিঃশেষ হতে পারে কেননা ভগবানের বিধি মেনে কর্ম করলেই পুণ্য হয় আর তা অনুকূল পরিস্থিতি সৃষ্টি করে। মানুষ যদি এই অনুকূল পরিস্থিতিকে ভোগ না করে বা তাতে আসক্ত না হয় এবং সেটির ফল ভগবানকে পুনঃ নিবেদন করে তাহলে সুউচ্চ সংস্কার সৃষ্ট হয় ও বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে ভগবানেরও আরাধ্য হতে পারে। কিন্তু পাপ ভগবানে অর্পণ করা যায় না। পাপ হয় নিষিদ্ধ কর্ম করলে এবং পাপের ফল ভোগ করতেই হয়। ভগবানের নির্দেশের বিরুদ্ধে কর্ম করলে পাপ হয়, তাই তা কোনোভাবেই ভগবানকে অর্পণ করা যায় না। শুভ ও অশুভ কর্মের ভোগ কখনো এক নিয়মে চলে না।

একটি উদাহরণ—এক রাজা প্রজাদের নিয়ে হরিদ্বার গিয়েছিলেন। তাঁর সঙ্গে সব শ্রেণীর মানুষ ছিল। এক ব্যবসায়ীও ছিল আর এক চর্মকারও ছিল। হরিদ্বারে ব্রহ্মকুণ্ডে যখন পাণ্ডা ব্যবসায়ীটিকে দান ও পুণ্যের সংকল্প করাচ্ছিলেন তখন সেই ব্যবসায়ী বলল—'আমি গ্রামের এক ব্রাহ্মণকে

একশো টাকা ধার দিয়েছিলাম, আজ সেই টাকাই তাকে দানরূপে অর্পণ করলাম।' চর্মকারটি ভাবল—এতো খুব ভাল ব্যবস্থা, এক পয়সা খরচ না করে একশো টাকা দানের পুণ্য অর্জন হল। এবার পাণ্ডা চর্মকারটিকে সংকল্প করানোর সময় সে বলল 'আমি এক ব্যবসায়ীর কাছ থেকে একশো টাকা ধার নিয়েছিলাম, আজ সেই টাকা তাকে দান করলাম।' চর্মকারটি ভাবল আমিও একশো টাকা দানের পুণ্য অর্জন করলাম।

সবাই বাড়ি ফিরে এল। সেবার খুব ভাল চাষবাস হল আর ব্রাহ্মণটি তার ক্ষেতের শস্য নিয়ে ব্যবসায়ীটিকে প্রত্যার্পণ করতে গেলে, ব্যবসায়ীটি তা বিনয়ের সঙ্গে প্রত্যাখান করে বলল—হে ব্রহ্মন্! আমি আপনার ঋণের টাকা হরিদ্বারে গঙ্গার ঘাটে দান হিসেবে অর্পণ করেছি, ওটা ভগবানের নামে নিবেদিত, তাই আর ভোগ করা যাবে না।

চর্মকারও ফিরে এসে সেই কথা শুনল। তাই যখন ব্যবসায়ী তার কাছ থেকে তার ঋণের টাকা ফেরত চাইতে এল, সে বলল—'আমি ওই টাকা সংকল্প করে গঙ্গার ঘাটে অর্পণ করেছি, তাই আমি ঋণের টাকা দিতে পারব না।' কিন্তু ব্যবসায়ীটি সে কথা শুনল না। সে বলল—'তুমি আমার কাছ থেকে টাকা ঋণ নিয়ে কি করে তা দানরূপে অর্পণ করতে পারো?' এই বলে সে চর্মকারের কাছ থেকে সুদসহ সমস্ত টাকার শস্য আদায় করে নিয়ে গেল।

এর দ্বারা প্রমাণিত যে আমরা আমাদের ঋণ এড়িয়ে যেতে পারি না। তাই ভগবদ্ নির্দেশিত শুভকর্ম আমরা ভগবানে অর্পণ করে বন্ধন থেকে মুক্তি পেতে পারি কিন্তু অশুভ কর্মের ফল আমাদের ভোগ করতেই হবে। তাৎপর্য এই যে শুভকর্ম বা পুণ্যও বন্ধন আর অশুভকর্ম বা পাপও বন্ধন। আর তার থেকে মুক্ত হওয়ার পথ ভিন্ন। তবে সর্বতোভাবে ভগবানের শরণাগত হলে, নিজেকে তাঁর চরণে অর্পণ করলে পাপ-পুণ্য চিরতরে দূর হয়।

সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বা সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥ (গীতা ১৮।৬৬)

পুণ্য ও পাপের ক্ষেত্র—

পুণ্য ও পাপ—উভয় উভয়ের ক্ষেত্র লঙ্ঘন করে না। অর্থাৎ পাপ করলে পুণ্য ক্ষয় হয় না বা অধিক পুণ্য করলেও পাপ দূর হয় না।

একটি ঘটনা—একবার রাম শ্যামের কাছ থেকে একশো টাকা ধার নিয়েছিল। মাসের পর মাস চলে গেলেও রাম টাকা শোধ না করায় একদিন তাদের মধ্যে প্রচণ্ড তর্কাতর্কি হল ও শ্যাম আচ্ছা করে রামকে পিটাল। রাম গিয়ে পুলিসে অভিযোগ জানালে পুলিশ শ্যামের বিরুদ্ধে ফৌজদারি কেস করল। কোর্টে শ্যাম বলল—হুজুর অভিযোগ সবই সত্য এবং আমার টাকা পাইনি বলে আমি একে মেরেছি। এখন যখন কোর্টে কেস এসে গেছে তখন আমার মারের বদলা স্বরূপ কিছু টাকা কেটে রেখে আমাকে বাকি টাকা ফেরত দেওয়া হোক।

জজসাহেব হেসে বললেন—এটা ফৌজদারি কোর্ট। এখানে টাকা পাইয়ে দেওয়ার নিয়ম নেই। এখানে শাস্তি দেওয়াই নিয়ম। তুমি বর্তমানে মারের শাস্তি ভোগ করো এবং টাকা পেতে হলে আলাদাভাবে দেওয়ানী আদালতে নালিশ জানাও।

এইভাবে অশুভ কর্মের যে ফল তা প্রতিকূল পরিস্থিতি সৃষ্টি করে এবং তা ফৌজদারি মামলার মতো এবং একে (বাহ্যত) পরিত্যাগ করা যায় না। শুভ কর্মের ফলে যে অনুকূল পরিস্থিতি আসে তা হল দেওয়ানী মামলার মতো এবং তা ভোগ করা যায় কিংবা না চাইলে তাকে বাহ্যিকরূপে ত্যাগ করাও সম্ভব। স্বভাবতই শুভকর্মের ও অশুভ কর্মের ফলও পৃথক পৃথক হয় এবং একটি অপরটিকে লঙ্ঘন করে না অর্থাৎ পাপের সাহায্যে পুণ্যফল কমানো যায় না এবং পুণ্যফল অধিক হলেও পাপের ফল ভোগ করতেই হয়। তবে মানুষ যদি পাপ স্খালন করার নিমিত্ত প্রায়শ্চিত্ত আদি পুণ্য কর্ম করে তবে তা তার পাপ দূর হতে সাহায্য করে। তবে অনুকূল পরিস্থিতি মানেই যে সুখ তাও নয়, কেননা এইরকম পরিস্থিতি মনে অহংভাব আনে, নিজের চেয়ে নীচ লোকদের প্রতি ঘৃণা ও উঁচু লোকেদের প্রতি হিংসা ভাব শেখায়। আর

প্রতিকূল পরিস্থিতিতে মানুষ সহ্য করতে শেখে, তার ভগবৎ বুদ্ধি হয় আর অহং ভাব দূর হয়।

প্রারব্ধ সম্বন্ধে কয়েকটি কথা—

প্রশ্ন—একটি লোকের হাত থেকে গ্লাস পড়ে ভেঙে গেল, তা কি অসতর্কতা না প্রারব্ধ ?

উত্তর—প্রকৃতপক্ষে যা হয়ে যায় তাকে অসতর্ক না ভেবে, প্রারব্ধ বলে মনে করাই শ্রেয়। এর থেকে শিক্ষা নিতে হয় যে সব কাজ সতর্ক হয়ে করাই উচিত এবং যা ফল প্রাপ্তি হয় তাতেই প্রসন্ন থাকা উচিত।

প্রশ্ন—প্রারব্ধজনিত ও কুপথ্যজনিত রোগে পার্থক্য কী ?

উত্তর— কুপথ্যজনিত অসুখ ঔষধে ভাল হয় কিন্তু প্রারব্ধজনিত অসুখ ঔষধে সারে না তার ফলে অর্থনাশ ও মনস্তাপ ভোগ করতেই হয়। তবে মহামৃত্যুঞ্জয়াদি জপ ও যজ্ঞাদি অনুষ্ঠান যথাযথভাবে করলে এই প্রকার অসুখ প্রশমিত ও প্রারব্ধ দমিত হতে পারে।

একটি সত্য ঘটনা—ভোলাগিরি মহারাজের এক রায়বাহাদুর শিষ্য ছিলেন, তিনি চট্টগ্রামের জমিদার। একবার মহারাজের কাছে হরিদ্বারে টেলিগ্রাম গেল 'শিষ্য খুব অসুস্থ আশীর্বাদ পাঠান'। প্রায় ১৫০ বছর আগেকার কথা, তখন টেলিফোন ছিল না, সবে কলকাতা থেকে ট্রেন হরিদ্বারে যাওয়া শুরু হয়েছে। টেলিগ্রাফই ছিল যোগাযোগের একমাত্র ভরসা। মহারাজও টেলিযোগে উত্তর পাঠালেন 'আরো বড় বড় ডাক্তার দেখাও'। কদিন পরে আবার টেলিগ্রাম এল 'মহারাজ, কলকাতায় সব বড় বড় ডাক্তার দেখানো হয়েছে কিন্তু অবস্থার অবনতিই হচ্ছে, শিষ্যকে বাঁচান।' মহারাজ আবার উত্তর দিলেন 'বড় ডাক্তার দেখাও'। কিছুদিন বাদে সেই অসুস্থ শিষ্যকে নিয়ে তার পরিবারবর্গ ট্রেনে করে হরিদ্বারে হাজির। জমিদারের স্ত্রী তার স্বামীকে গুরুর পায়ের তলায় ফেলে দিয়ে বললেন, বাবা আমাকে বৈধব্যের হাত থেকে রক্ষা করুন। ভোলাগিরি মহারাজ খুব বিরক্ত হয়ে উঠে চলে গেলেন। শিষ্যদের দিয়ে বলে পাঠালেন—'ওদের এখানে থাকতে বারণ কর। আজকেই যেন কলকাতা

ফিরে যায় আর ভাল ডাক্তার দেখায়।'

জমিদারের পরিবারে তো হাহাকার পড়ে গেল। কিন্তু গুরুর আদেশ শিরোধার্য তাই সন্ধ্যের ট্রেনেই সবাই কলকাতা রওনা হলেন। কলকাতা গিয়েই আবার সেই পুরনো বড় বড় ডাক্তারদের, যারা আগেই জবাব দিয়েছিল, ডাকা হল। তারা যথাবৎ উচ্চ পারিশ্রমিকের বিনিময়ে জমিদার-বাবুকে দেখতে লাগল। কিন্তু কিছুদিন পরেই এক আশ্চর্য ঘটনা ঘটল। সেই পুরানো ডাক্তার, পুরানো ঔষধেই জমিদারবাবুর জীবনে নতুন প্রাণ সঞ্চার হল। কিছুদিন বাদেই হরিদ্বারে টেলিগ্রাম গেল, জমিদারবাবু সম্পূর্ণ সুস্থ আছেন। আরো কিছুদিন পর জমিদারবাবু সস্ত্রীক গুরুর চরণে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করতে এলেন। জমিদারবাবুর অশেষ ভরসা যে গুরুকৃপাতেই তাঁর রোগ দূর হয়েছে।

জমিদারবাবুর স্ত্রী অনুযোগ করলেন—বাবা কৃপা করে সবই যদি করলেন তবে হরিদ্বারে আপনার চরণে থাকতে দিলেন না কেন।

ভোলাগিরি মহারাজ হেসে বললেন—মাইয়া, তোমার পতির অনেক প্রতিকূল প্রারব্ধ ছিল যা কেবলমাত্র ভোগেই ক্ষয় করা সম্ভব। আর অর্থনাশ ও মনস্তাপ ব্যতীত কোনো প্রারব্ধ নাশ হয় না। তাই বলেছিলাম কলকাতায় বড় বড় ডাক্তার দেখাও যাতে জলদি জলদি বেশি অর্থ নাশ হয় আর তাড়াতাড়ি সেরে ওঠে। এ জগতে ভগবানের নিয়ম অলঙ্ঘনীয়।

প্রশ্ন—আকস্মিক মৃত্যু ও আত্মহত্যার পার্থক্য কী ?

উত্তর—সাপেকাটা, জলে ডোবা বা অনুরূপ মৃত্যুকে বলে আকস্মিক মৃত্যু এবং তা প্রারব্ধ অনুসারে আয়ুষ্কাল পূর্ণ হলেই হয়। আর আত্মহত্যা হল অকালমৃত্যু এবং এটি নতুন সৃষ্ট পাপকর্ম, প্রারব্ধজনিত নয়। যেহেতু মনুষ্যদেহের সৃষ্টি পরমপ্রাপ্তির জন্যই, তাই আত্মহত্যা করলে মনুষ্যহত্যার পাপ হয়। অবশ্য অনেক ব্যক্তি আত্মহত্যা করার চেষ্টা করলেও তাতে সফল হয় না কেননা তাদের অন্যদের সঙ্গে প্রারব্ধের যোগ আছে। কারোর পুত্র-লাভের যোগ, কারোর দ্বারা বিশেষ কাজের যোগ বা নিজের উৎকট ভোগ (সুখ বা দুঃখ) যোগ আছে, তাই আত্মহত্যার প্রচেষ্টাতেও তার মৃত্যু হয় না।

প্রশ্ন—একজন আরেকজনকে হত্যা করল। এটা কি প্রারব্ধ ? এটা কি হতে পারে না, একজন আগের জন্মের শোধ নিল ও অন্যজন তার পুরাতন কর্মের ফল পেল।

উত্তর—না। এটি প্রারব্ধ নয়। শাস্তিদান কর্তব্য হিসেবে শাসকের কাজ, সাধারণের কাজ নয়। একজন ফাঁসির আসামীকে যদি প্রতিহিংসাবশত আরেকজন (ফাঁসুড়ে নয়) হত্যা করে তবে তারও ফাঁসি হয়। আগের জন্মের হত্যাকারীকে এজন্মে দেখলে আমাদের স্বাভাবিকভাবেই ভাল না লাগতে পারে কিন্তু তাই বলে তাকে দ্বেষ করা বা তার ক্ষতি করা নতুন কর্ম।

সঞ্চিত ও প্রারব্ধ কর্মের পার্থক্য—

জীব যা কিছু প্রায় প্রারব্ধ অনুসারেই পায়। কিন্তু সেই প্রারব্ধের বিধান করেন স্বয়ং বিধাতা। কোনো পরিচারক যদি অত্যন্ত তৎপরতা, বুদ্ধি ও উৎসাহ নিয়ে প্রভুর প্রসন্নতা লাভের উদ্দেশ্যে কাজ করে তখন প্রভু তাকে তার প্রাপ্য অংশেরও বেশি দিতে পারেন এবং যদি তার মধ্যে অতিশয় সাধুতা, নিষ্ঠা, তৎপরতা ইত্যাদি গুণ দেখেন, তখন তাকে নিজ ব্যবসার অংশীদারও করতে পারেন।

সেইরকম মানুষ যদি ভগবানের নির্দেশকে তাঁর আশীর্বাদ মনে করে কার্য করেন, তবে ভগবানও তাকে প্রাপ্যের বেশি দেন এবং যখন সর্বতোভাবে সে ভগবানের সমর্পিত হয় তখন ভগবানও সেই ভক্তের ভক্ত হয়ে যান।

ভাগবতের দশম স্কন্ধের ছিয়াশি অধ্যায়ে মিথিলার রাজা বহুলাশ্ব ও শ্রুতদেব (ব্রাহ্মণ)-এর উপাখ্যানে এর বর্ণনা আছে। সেখানে ভগবান তার পরমভক্তদ্বয়কে দর্শন দেওয়ার জন্য নারদ, বামদেব, অত্রি, ব্যাসদেব, শুকদেব, বৃহস্পতি আদি মুনিদের নিয়ে মিথিলায় গমন করেছিলেন। কিন্তু শ্রুতদেব আদি নিষ্কামভাবে কেবল ভগবানের স্তুতি করায় ভগবান ভক্তজন সম্বন্ধে তাঁর শ্রদ্ধার কথা বুঝিয়ে দিয়েছেন। এ বিষয়ে শ্রীশুকদেব পরীক্ষিৎকে বলছেন **'এবং স্বভক্তয়ো রাজন্ ভগবান ভক্ত ভক্তিমান্'** (ভা. ১০।৮৬।৫১)। জগতে কেউ পরিচারককে নিজের প্রভু

বলে মানে না কেবল ভগবানই ভক্তের ভক্ত হয়ে থাকেন।

সাংখ্যযোগ—(শ্লোক ১৩-৫৩)

পরবর্তী ৪১ টি শ্লোকে ভগবান সাংখ্যযোগের বিষয় বিশদভাবে বর্ণনা করেছেন।

কর্মের হেতু—(শ্লোক ১৩-১৫)

পঞ্চৈতানি মহাবাহো কারণানি নিবোধ মে।
সাংখ্যে কৃতান্তে প্রোক্তানি সিদ্ধয়ে সর্বকর্মণাম্॥
অধিষ্ঠানং তথা কর্তা করণঞ্চ পৃথগ্বিধম্।
বিবিধাশ্চ পৃথক্ চেষ্টা দৈবং চৈবাত্র পঞ্চমম্॥
শরীরবাঙ্মনোভির্যৎ কর্ম প্রারভতে নরঃ।
ন্যায্যং বা বিপরীতং বা পঞ্চৈতে তস্য হেতবঃ॥

(গীতা ১৮।১৩-১৫)

'সাংখ্যশাস্ত্র মতে কর্মগুলির সিদ্ধির জন্য পাঁচটি কারণ বলা হয়েছে।

কর্মসিদ্ধির এই পাঁচটি কারণ হল—অধিষ্ঠান, কর্তা, নানাপ্রকার করণ, বহুপ্রকার চেষ্টা এবং দৈব।

মানুষ কায়মনোবাক্যে শাস্ত্রবিহিত বা শাস্ত্ররহিত যা কিছু কর্ম করে পূর্বোক্ত পাঁচটি কারণই তার হেতু।' (গীতা ১৮।১৩-১৫)

১) **অধিষ্ঠান**—শরীর

২) **কর্তা**—জীবাত্মা (বদ্ধজীব)

যে অহংকারবশত নিজেকে শরীর বলে মনে করে ও প্রকৃতিকৃত ক্রিয়াকে নিজের বলে মনে করে।

৩) **করণ**—কর্ম করার তেরোটি উপকরণ।

বহিঃকরণ {
পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়—পানি, পাদ, বাক্, উপস্থ ও পায়ু।
পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়—শ্রোত্র, চক্ষু, ত্বক, জিহ্বা ও নাসিকা।

অন্তঃকরণ—মন, বুদ্ধি ও অহংকার।

৪) **চেষ্টা**—এই করণদের কাজও পৃথক পৃথক ।

পানি—আদান-প্রদান

পাদ—আসা-যাওয়া, চলা-ফেরা

বাক্—কথা বলা

উপস্থ—মূত্র ত্যাগ

পায়ু—মল ত্যাগ

শ্রোত্র—শোনা

চক্ষু—দেখা

ত্বক—স্পর্শ

জিহ্বা—আস্বাদন

নাসিকা—গন্ধগ্রহণ

মন—চিন্তা করা

বুদ্ধি—সিদ্ধান্ত নেওয়া

অহংকার—অহং বা কর্তৃত্বভাব।

৫) দৈব—মানুষের কর্মাদিতে পঞ্চম হেতু হল দৈব বা সংস্কার। শুভকর্মের সংস্কার শুভ হয় ও অশুভ কর্মের সংস্কার অশুভ হয়। যে কর্মের সংস্কার যত বেশি হয় সেই কর্ম তত অনায়াসে করা যায়।

এখানে যে পাঁচটি মাধ্যমের কথা বলেছেন তা সবই প্রকৃতিজাত। গীতাতে তাই ভগবান বলেছেন—

'প্রকৃত্যৈব চ কর্মাণি ক্রিয়মাণানি সর্বশঃ।' (গীতা ১৩।২১)

'প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্মাণি সর্বশঃ।' (গীতা ৩।২৭)

সকল কর্মই প্রকৃতি ও তার গুণের দ্বারা সংঘটিত হয়।

সাংখ্যযোগে মতির বিচার—(শ্লোক ১৬-১৭)

তত্রৈবং সতি কর্তারমাত্মানং কেবলং তু যঃ।
পশ্যত্যকৃতবুদ্ধিত্বান্ ন স পশ্যতি দুর্মতিঃ॥
যস্য নাহঙ্কৃতো ভাবো বুদ্ধির্যস্য ন লিপ্যতে।
হত্বাপি স ইমাঁল্লোকান্ ন হন্তি ন নিবধ্যতে॥

(গীতা ১৮।১৬-১৭)

'এইরূপ কর্মের হেতুস্বরূপ পাঁচটি কারণ থাকলেও যে ব্যক্তি কর্মের ব্যাপারে শুধু আত্মাকেই কর্তা বলে মনে করে সে প্রকৃত তত্ত্ব বুঝতে পারে না ও তার জ্ঞানও পরিমার্জিত নয়, তাই সে দুর্মতি।

আবার যাঁর অহং বা কর্তৃত্ব ভাবও নেই এবং বুদ্ধি কর্মফলে লিপ্ত হয় না, সে সকল প্রাণীকে বধ করলেও তাদের বধ করেন না বা আবদ্ধও হন না—তিনি সুমতি।' (গীতা ১৮।১৬-১৭)

দুর্মতি (শ্লোক ১৬)—আত্মায় কর্তৃত্ব ভাব আরোপ করা

দুর্মতি—যে ক্রিয়া ও পদার্থকে গুরুত্ব দেয় এবং বিবেককে গুরুত্ব দেয় না (বুদ্ধি-বিবেক বর্জিত) সেই দুর্মতি। শুদ্ধ আত্মা কিছুই করে না '**ন করোতি ন লিপ্যতে**' (গীতা ১৩।১১), কিন্তু শরীরের প্রতি জীবাত্মার একাত্মবোধের ভ্রমবশত 'আমি করি' এই বোধ হয়। আসলে কর্তা বলে কেউ নেই। চেতনও কর্তা নয়, আবার জড়ও কর্তা নয়। কর্ম প্রকৃতির দ্বারা সংঘটিত হয়। কিন্তু জীব প্রকৃতির (শরীরের) ওপর নিজ কর্তৃত্ববোধবশত নিজেকেই কর্তা বলে মনে করে—

'**অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্তাহমিতি মন্যতে।**' (গীতা ৩।২৭)

আর বিবেকী চিন্তা করে—

'**শরীরস্থোঽপি কৌন্তেয় ন করোতি ন লিপ্যতে।**' (গীতা ১৩।৩১)

'**নৈব কিঞ্চিৎ করোমীতি যুক্তো মন্যেৎ তত্ত্ববিৎ।**' (গীতা ৫।৮)

তবে অনেক সময় বিবেকী সাধকগণও খাওয়াদাওয়া, শোয়া-বসা ইত্যাদি জাগতিক ক্রিয়াগুলিকে প্রকৃতির বলে মেনে নিলেও, জপ-ধ্যান, সমাধি ইত্যাদি পারমার্থিক ক্রিয়াগুলিকে নিজে করেন বলে মনে করেন ও অবশেষে তাই সাধকের বাধাস্বরূপ হয়ে দাঁড়ায়। প্রকৃতির সম্পর্ক ব্যতীত কোনো ক্রিয়া সম্ভব নয়, তাই সাধকদের উচিত সাধন পথে পারমার্থিক ক্রিয়াদি ত্যাগ না করা বরং এই ক্রিয়াতে নিজের কর্তৃত্ব স্থাপন না করা। পারমার্থিক ক্রিয়াগুলির প্রকৃত উদ্দেশ্যই পরমাত্মা হওয়ায় তা কল্যাণকর। তবে যেমন যেমন ক্রিয়ার গৌণতা হয় আর ভগবান সম্পর্কের প্রাধান্যতা পেতে থাকে, তেমন তেমন সাধনার উন্নতি হয়। ক্রিয়াগুলির প্রাধান্য থাকলে বহু বৎসর ধরে সাধনা করলেও তাতে বিশেষ লাভ হয় না। ক্রিয়াতে

গুরুত্ব না দিয়ে, তা ভগবানের প্রীতিতেই হওয়া উচিত। ভগবানের প্রীতিই হল ভজন, ক্রিয়া নয়।

সুমতি—(শ্লোক ১৭) অহংকারহীন কর্তা

সুমতি—সুমতিসম্পন্ন সাধকের অহং ও লিপ্ততা থাকে না। অহং বা কর্তৃত্ব বোধ হল—আমি ক্রিয়া করি এই ভাব আর লিপ্ততা হল—কামনা, মমতা ও স্বার্থবুদ্ধি। এর ফলে এটা চাই, ওটা চাই না, এটা ঘটুক, ওটা যেন না ঘটে এই ইচ্ছা জাগে। জ্ঞানযোগ দ্বারা অহংভাব নাশ হয় আর কর্মযোগ দ্বারা লিপ্ততা দূর হয়। উভয়ের মধ্যে একটি নাশ হলেই অপরটি স্বতঃই দূর হয়। এই অনাসক্তির উদাহরণ হল—গঙ্গায় বা বর্ষায় কত লোক ডুবে মরে, আবার কতজন স্নান বা জলপান করে বেঁচে থাকে কিন্তু তাতে গঙ্গার বা বর্ষার কোনো পাপ বা পুণ্যও হয় না।

কর্মের প্রেরণা ও কর্মসংগ্রহ—(শ্লোক ১৮-১৯)

পরবর্তী দুই শ্লোকে ভগবান কর্মের প্রেরণা ও কর্মসংগ্রহ (কর্মবন্ধন) সম্পর্কে বলেছেন।

> জ্ঞানং জ্ঞেয়ং পরিজ্ঞাতা ত্রিবিধা কর্মচোদনা।
> করণং কর্ম কর্তেতি ত্রিবিধঃ কর্মসংগ্রহঃ॥
> জ্ঞানং কর্ম চ কর্তা চ ত্রিধৈব গুণভেদতঃ।
> প্রোচ্যতে গুণসংখ্যানে যথাবচ্ছৃণু তান্যপি॥
>
> (গীতা ১৮।১৮-১৯)

'জ্ঞান, জ্ঞেয় ও পরিজ্ঞাতা এই তিনটি হতে কর্মে প্রেরণা আসে এবং করণ, কর্ম ও কর্তা এই তিনটি হতে কর্মসংগ্রহ হয়।

সাংখ্যশাস্ত্রে গুণাদি ভেদে জ্ঞান, কর্ম ও কর্তাকে তিনপ্রকার বলা হয়েছে।' (গীতা ১৮।১৮-১৯)

কর্মের প্রেরণা দ্বারাই কর্মসংগ্রহ (কর্মবন্ধন) হয়।

কর্ম প্রেরণা—

জ্ঞান—প্রবৃত্তির সম্বন্ধে জানা। যেমন—পিপাসা ইত্যাদি।

জ্ঞেয়—যার সম্বন্ধে জানা যায়। যেমন—জল।

পরিজ্ঞাতা—যিনি জানেন। তার ক্রিয়ার স্ফূরণ-এর জ্ঞান হয় কিন্তু তিনি

কখনই কর্তৃত্বভাব পোষণ করেন না।

কর্ম সংগ্রহ—

করণ—ক্রিয়ার সাধন যার দ্বারা হয় অর্থাৎ ইন্দ্রিয়।

কর্ম—যে ক্রিয়াটি সম্পন্ন হল অর্থাৎ খাওয়া, শোয়া ইত্যাদি।

কর্তা—ইহাই কর্মসংগ্রহের মুখ্য অর্থাৎ 'অহংবোধ'। অহংবোধ না থাকলে কর্মের সংজ্ঞা ক্রিয়া হয়ে থাকে এবং তা বন্ধনকারক হয় না। মানুষের মধ্যে অহংকার (কর্তৃত্বভাব) ও আসক্তি (ফলেচ্ছা) থাকলে তবেই কর্মপ্রেরণা দ্বারা কর্মসংগ্রহ হয়। অর্থাৎ ফল লাভের ইচ্ছা হয় এবং পাপপুণ্য হতে থাকে।

পরবর্তী ২০টি শ্লোকে ভগবান তিন গুণানুযায়ী পৃথক পৃথকভাবে জ্ঞান, কর্ম, কর্তা, ধৃতি, বুদ্ধি ও সুখের বিভাগ বর্ণনা করেছেন।

গুণানুযায়ী বিভাগ—(শ্লোক ২০-৩৯)

জ্ঞানের বিভাগ—(শ্লোক ২০—২২)

সর্বভূতেষু যেনৈকং ভাবমব্যয়মীক্ষতে।
অবিভক্তং বিভক্তেষু তজ্জ্ঞানং বিদ্ধি সাত্ত্বিকম্॥
পৃথক্ত্বেন তু যজ্জ্ঞানং নানাভাবান্ পৃথগ্‌বিধান্।
বেত্তি সর্বেষু ভূতেষু তজ্জ্ঞানং বিদ্ধি রাজসম্॥
যত্তু কৃৎস্নবদেকস্মিন্ কার্যে সক্তমহৈতুকম্।
অতত্ত্বার্থবদল্পঞ্চ তত্তামসমুদাহৃতম্॥

(গীতা ১৮।২০-২২)

'সাত্ত্বিক জ্ঞানী ভিন্ন ভিন্ন রূপে বিভক্ত প্রাণীতে এক অবিনাশী সত্তা পরিদর্শন করেন।

রাজসিক জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি সমস্ত প্রাণীতে ভিন্ন ভিন্ন ভাবগুলিকে পৃথক পৃথক বলে মনে করেন।

আর তামসিক জ্ঞানযুক্ত লোকেরা নিজের শরীরেই সম্পূর্ণরূপে আসক্ত থাকে যা যুক্তিবিরোধী ও প্রকৃতজ্ঞানের বিরোধী হয়।' (গীতা ১৮।২০-২২)

সাত্ত্বিক—সাত্ত্বিক জ্ঞানীর দৃষ্টি পরিবর্তনশীল বস্তুগুলির রহস্য ভেদ করে

পরিবর্তনরহিত এক স্বতঃসিদ্ধ নির্বিকার তত্ত্বের দিকে যায়। তবে এই দৃষ্টিতে প্রাণীদের পৃথক সত্ত্বা থাকে এবং এই পরিবর্তনশীল বস্তুগুলির মধ্য থেকেই এক অবিনাশী সত্ত্বা উপলব্ধি হয়। তবে যদি তাঁর দৃষ্টিতে পৃথক সত্ত্বা না থাকে তবে তিনি গুণাতীত অবস্থায় বিরাজ করেন অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞানী হন।

রাজসিক—রাজসিক জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি ক্রিয়া ও পদার্থ উভয়তেই আসক্তি সহকারে সম্পর্ক স্থাপন করেন ফলে তাঁর কাছে সব কিছুই পৃথক পৃথকরূপে পরিদৃষ্ট হয়।

তামসিক—তামস জ্ঞানযুক্ত ব্যক্তির শরীর ও আমি এই পৃথক বোধ একেবারেই থাকে না। তার বুদ্ধি তুচ্ছতার দিকে ধাবিত হয়, যাতে মূঢ়তার প্রাধান্য থাকে ও যা প্রকৃত জ্ঞানের বিরোধী। ভগবান তাই এই শ্লোকে তামসবোধকে জ্ঞানই বলেননি।

শ্রীশুকদেব তাই পরীক্ষিতকে বলছেন—

ত্বং তু রাজন্ মরিষ্যেতি পশুবুদ্ধিমিমাং জহি।
ন জাতঃ প্রাগভূতোঽদ্য দেহবত্ত্বং ন নঙ্ক্ষ্যসি॥ (ভাগবত ১২।৫।২)

হে রাজন্! তুমি যে মারা যাবে, ইহা পশুবুদ্ধি, এটি ত্যাগ করো। দেহ সম্বন্ধে যেমন—ইহা আগে ছিল না, এখন হয়েছে ও পরে নাশ হবে ইহা সত্য, তেমনি আত্মা সম্বন্ধে কিন্তু তুমি (জীবাত্মা) আগে ছিলে না, পরে জন্মেছ ও অবশেষে তার নাশ হবে—মোটেই সত্য নয়।

কর্মের বিভাগ—(শ্লোক ২৩—২৫)

নিয়তং সঙ্গরহিতমরাগদ্বেষতঃ কৃতম্।
অফলপ্রেপ্সুনা কর্ম যত্তৎ সাত্ত্বিকমুচ্যতে॥
যত্তু কামেপ্সুনা কর্ম সাহঙ্কারেণ বা পুনঃ।
ক্রিয়তে বহুলায়াসং তদ্রাজসমুদাহৃতম্॥
অনুবন্ধং ক্ষয়ং হিংসামনবেক্ষ্য চ পৌরুষম্।
মোহাদারভ্যতে কর্ম যত্তত্তামসমুচ্যতে॥

(গীতা ১৮।২৩-২৫)

'যে কর্ম শাস্ত্রবিধি দ্বারা অবশ্য কর্তব্য বলে নির্দিষ্ট, কর্তৃত্বাভিমান রহিত

ও ফলাকাঙ্ক্ষা বর্জিত ও রাগ-দ্বেষশূন্য হয়ে করা হয় তাকে সাত্ত্বিক কর্ম বলা হয়।

যে কর্ম অহংকারপূর্বক, অত্যন্ত পরিশ্রম সহকারে ভোগাকাঙ্ক্ষার আশায় করা হয়, তাকে বলে রাজস কর্ম।

পরিণাম ক্ষতি, হিংসা, সামর্থ্য আদির কথা না ভেবে অবিবেকবশত যে কর্ম করা হয় তা হল তামস কর্ম।' (গীতা ১৮।২৩-২৫)

সাত্ত্বিক—বৃক্ষ মূঢ়, তাই তার মধ্যে কর্তৃত্বাভিমান নেই, কিন্তু তার ফলে তার শাখা-প্রশাখা বৃদ্ধি পাওয়া, ফল-ফুল হওয়া, ঋতু বদলে পাতা ঝরে যাওয়া বা নতুন পাতার উদ্‌গম হওয়া অথবা ডাল কাটলে তা শুকিয়ে যাওয়া কিছুই আটকায় না। এসবই সমষ্টি শক্তি (প্রকৃতি) দ্বারা আপনিই সাধিত হয়।

তেমনি আমাদের হ্রাস-বৃদ্ধি, খাওয়াদাওয়া, চলাফেরা ইত্যাদি সমষ্টি শক্তি বা প্রকৃতি দ্বারা আপনিই হয়ে থাকে আর সাধক যখন এটি প্রত্যক্ষভাবে অনুভব করেন তখন তার মধ্যে কোনো কর্তৃত্বভাব থাকে না। তবে সাত্ত্বিক কর্ম সূক্ষ্মভাবে হলেও প্রকৃতির সঙ্গে সম্পর্ক থাকে এবং সেটি তখনই অকর্ম হয় যখন প্রকৃতির সঙ্গে সম্পর্ক সম্পূর্ণ ছেদ হয়।

রাজসিক—রাজসিক ব্যক্তি শরীরের প্রতি আসক্তি থাকায় আরামের কামনা করেই কর্ম করে, তাই তাদের অল্প কাজও বেশি মনে হয়। আবার রাজসিক ব্যক্তি তাঁদের প্রয়োজনীয়তা আবশ্যকের বেশি বাড়িয়ে তোলেন এর ফলে প্রত্যেক কাজে তাঁদের অধিক বস্তুর প্রয়োজন হয় এবং তাতে পরিশ্রমও বৃদ্ধি পায়।

তামসিক—তামস বুদ্ধিযুক্ত ব্যক্তি মূঢ়তাবশত কার্য করে এবং তাতে নিজের ও অন্যের প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। যেমন পথের মধ্যে দাঁড়িয়ে কথা বলা, রাস্তার মাঝখানে সাইকেল রেখে দাঁড়ানো ইত্যাদি প্রতিবন্ধকতা করার সময় তাদের খেয়ালই থাকে না যে অন্যের অসুবিধা হচ্ছে।

সাত্ত্বিক স্বভাব হল স্বতঃ উন্নত হওয়া, রাজসিক স্বভাবে উন্নতি বাধা প্রাপ্ত হয়, এবং তামসিকের স্বভাব স্বতঃই পতনোন্মুখ হয়।

কর্তার বিভাগ—(শ্লোক ২৬—২৮)

মুক্তসঙ্গোঽনহংবাদী ধৃত্যুৎসাহসমন্বিতঃ।
সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোর্নির্বিকারঃ কর্তা সাত্ত্বিক উচ্যতে॥
রাগী কর্মফলপ্রেপ্সুর্লুব্ধো হিংসাত্মকোঽশুচিঃ।
হর্ষশোকান্বিতঃ কর্তা রাজসঃ পরিকীর্তিতঃ॥
অযুক্তঃ প্রাকৃতঃ স্তব্ধঃ শঠোঽনষ্কৃতিকোঽলসঃ।
বিষাদী দীর্ঘসূত্রী চ কর্তা তামস উচ্যতে॥

(গীতা ১৮।২৬-২৮)

'সাত্ত্বিক কর্তা হল আসক্তিবর্জিত, অহং-কর্তৃত্ব রহিত, ধৈর্য ও উৎসাহযুক্ত এবং সিদ্ধি ও অসিদ্ধিতে নির্বিকার।

রাজস কর্তা হল বিষয়ানুরাগী, কর্মফলাকাঙ্ক্ষী, লোভী, হিংসাপরায়ণ, শৌচাচারহীন এবং হর্ষ-শোকযুক্ত।

তামস কর্তা হল অসতর্ক, অভদ্র, অনম্র, জেদী, উপকারী ব্যক্তির অপকার-সাধনকারী, অলস, সর্বদা বিষাদী এবং দীর্ঘসূত্রী।' (গীতা ১৮।২৬-২৮)

সাত্ত্বিক কর্তা—সাত্ত্বিক ব্যক্তির কর্মের প্রতি আসক্তি বা কর্ম করার জন্য কোনো অহংকার থাকে না। রাজসিক অহংকারে যেমন পদার্থ, বস্তু বা নিজ শক্তি সম্পর্কে বিশেষ ভাব থাকে, সাত্ত্বিক ব্যক্তির তো উপরোক্ত অহংকার থাকেই না অপরপক্ষে আমি ত্যাগী, আমি নিরহংকারী, আমি নিষ্কাম এইরূপ ভাবও থাকে না।

সাত্ত্বিক মানুষ কখনো মুখে বা হৃদয়েও এরূপ মনে করেন না যে, 'আমি করি' বা 'আমার মতো কেউ করতে পারে না'। নিজের মধ্যে কোনোরূপ বৈশিষ্ট্য দেখাই হল অন্তর (হৃদয়) থেকে বলা। আর সাত্ত্বিক কর্তার ধৃতি হল কর্তব্য করতে গেলে যে বাধাবিঘ্ন আসে, তাতে ধৈর্য ধারণ করে থাকা। সাধারণ মানুষ কর্মে আশানুরূপ ফল পেলে উৎসাহ বোধ করে, আবার বিফল হলে হতোদ্যম হয়ে পড়ে। কিন্তু আশানুরূপ সাফল্য পেলে বা না পেলেও সমভাবে থাকা হল সাত্ত্বিক ব্যক্তির উৎসাহ।

সিদ্ধি-অসিদ্ধিতে নির্বিকার থাকার কথা ভগবান বারবার বলেছেন—

'সিদ্ধ্যাসিদ্ধ্যোঃ সমো ভূত্বা' (গীতা ২।৪৮)

'সমঃ সিদ্ধাবসিদ্ধৌ চ' (গীতা ৪।২২)

'সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোর্নির্বিকারঃ' (গীতা ১৮।২৬)

অর্থাৎ এর তাৎপর্য হল সিদ্ধি-অসিদ্ধি নিজের আয়ত্তের মধ্যে নয়, তবে নির্বিকার থাকা নিজের আয়ত্তের মধ্যে।

রাজসিক কর্তা — রাজসিক কর্তার ৬টি দোষ থাকে—প্রথম দোষ তাঁর **তীব্র বিষয়াসক্তি**। দ্বিতীয় দোষ হল তাঁর **কর্মফলে আসক্তি**। রাজস ব্যক্তি যা কর্ম করেন তা ফলের আকাঙ্ক্ষাতেই করেন। কর্মের থেকে তিনি ইহজন্মে অর্থ-যশ-মান ও পরজন্মে স্বর্গলাভ ও সুখলাভ আশা করেন। তৃতীয় দোষ হল তাঁর অত্যাধিক লোভ। তিনি কিছুতেই সন্তুষ্ট হন না। যেন আরও পাই, মান-মর্যাদা-প্রতিষ্ঠা বাড়তে থাকুক, পুত্র-পরিবার আরও সমৃদ্ধি পাক, এইরূপ আশা, লোভ লেগেই থাকে। রাজসিকের চতুর্থ দোষ তার **হিংসাপরায়ণতা**। তামসিক লোকের হিংসা হয় তার মূঢ়তার জন্য, তাদের অচৈতন্য বা অসর্তকতার জন্য কিন্তু রাজসিক ব্যক্তি হিংসা করে নিজের স্বার্থের জন্য। সে নিজের জন্য অর্থ সংগ্রহ করতে অপরের দুঃখের পরোয়া করে না। সে এমনভাবে ভোগ করে যে অভাবগ্রস্ত লোকের অন্তরে জ্বালা সৃষ্টি হয়। তামসিক লোকের মূঢ় কর্মে হিংসার প্রকাশ পায় আর রাজসিক ব্যক্তি হিংসাত্মক হয় স্বভাবে। তার পঞ্চম দোষ হল **অশুচিতা**। রাজসিক ব্যক্তি ভোগবুদ্ধিতে বস্তু সংগ্রহ করে, তার ফলে সেইসব বস্তু অপবিত্র হয়ে ওঠে। তিনি যে স্থানে থাকেন তার বায়ুমণ্ডল, তার পরিধানের কাপড়, এমনকি বিনাশশীল বস্তুতে তার আসক্তি ও মমত্বর ফলে তার মন, বুদ্ধি, শরীর, অস্থি-মজ্জা সবই কলুষিত হয়ে যায়। তাই এই সব লোক মারা গেলে কেউ তার কাপড় নিতে চায় না, তার দাহস্থানে ভজনে মন বসে না এমনকি সেখানে নিদ্রা গেলে দুঃস্বপ্ন দেখে। রাজসিক লোকের ষষ্ঠ দোষ তার **হর্ষ-শোকে কাতরতা**। জীবনের নিত্য সফলতা-বিফলতার সঙ্গে সঙ্গে তারাও হর্ষশোকান্বিত হতে থাকে এবং শোক-দুঃখে পীড়িত হয়।

তামসিক কর্তা—তামসিক লোকের আটটি দোষ থাকে—প্রথম দোষ হল **অসতর্কতা**। তমগুণ মানুষকে নির্বুদ্ধি করে **'তমস্ত্বজ্ঞানং বিদ্ধি'** (গীতা ১৪।৮)। কী কাজ করা উচিত, কিভাবে কাজ করলে লাভ বা ক্ষতি হয় এই বোধ তামস গুণসম্পন্ন ব্যক্তিদের থাকে না তাই তারা কর্তব্য-অকর্তব্য নিরূপণ করতে পারে না। তামসিক ব্যক্তির দ্বিতীয় দোষ হল **অভদ্রতা**। তারা নিজের জীবন শাস্ত্র, সৎসঙ্গ ও সুশিক্ষা দ্বারা সুগঠিত করে না, তই তাদের ব্যবহার, কর্তব্য-অকর্তব্য বোধ শিক্ষারহিত হয়ে থাকে। তামসিক লোকেদের তৃতীয় দোষ **অনম্রতা**। তাদের স্বভাবে তমোগুণের প্রাধান্য থাকায় তাদের শরীর, মন, বাক্য উদ্ধত হয়। তামস ব্যক্তির চতুর্থ দোষ তারা **'জেদী'** হয়। তারা অন্যের সুশিক্ষা সুচিন্তিত মতামত গ্রহণ করে না। তারা নিজেদের সিদ্ধান্তই সঠিক বলে মনে করে তাই তাদের শঠ বা জেদী বলা হয়। তামসিক ব্যক্তির পঞ্চম দোষ হল তারা **'অনৈষ্কৃতিকঃ'** অর্থাৎ তামস ব্যক্তি অন্যের কাছ থেকে উপকার পেলেও তার প্রত্যুপকার তো করেই না বরং তাদের অপকারই করে থাকে। এদের ষষ্ঠ দোষ হল **'অলসঃ'**। তামস ব্যক্তির মূঢ়তার নিমিত্ত বর্ণাশ্রম অনুসারে প্রাপ্ত কর্তব্যকর্ম ভাল লাগে না। তাদের নিরন্তর অনর্থক চিন্তা বা শুয়ে বসে থাকতেই ভাল লাগে। তামস ব্যক্তির সপ্তম দোষ হল **'বিষাদী'**। তারা সদা সুপথ থেকে ও কর্তব্য থেকে দূরে থাকায় তাদের মনে একটা বিষাদ (অবসন্নতা) থাকে। এদের অষ্টম দোষ হল **'দীর্ঘসূত্রীতা'**। তারা অবিবেচনাপূর্বক কাজে ব্যাপৃত হলেও তা যে স্বল্পসময়ে সমাপন সম্ভব তা বিবেচনা করে না, সুচারুরূপে করে না এবং স্বল্পসময়ে সম্পন্ন হওয়া কাজও দীর্ঘকাল ধরে ফেলে রেখে দেয়, কিছুতেই শেষ করতে চায় না।

গুণ তিনটি—সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক।

কর্তা যেসব গুণ স্বীকার করেন সেই গুণানুসারে কর্ম ও করণেরও রূপ হয়ে থাকে। এর মধ্যে সাত্ত্বিক ব্যক্তি কর্ম, বুদ্ধি ইত্যাদিকে সাত্ত্বিকতায় পরিণত করায় আসক্তিবর্জিত হয়ে সাত্ত্বিক সুখ অনুভব করেন। তখন যদি তিনি পরমাত্মতত্ত্বে অভিন্ন হয়ে যান— **দুঃখান্তং চ নিগচ্ছতি** (গীতা

১৮।৩৬)। কিন্তু রাজসিক ও তামসিক ব্যক্তি আসক্তি সহকারে শারীরিক সুখে লিপ্ত হয়, তাই তারা পরমাত্মতত্ত্ব হতে অভিন্ন হতে পারে না।

বুদ্ধি ও ধৃতির বিভাগ—(শ্লোক ২৯-৩৫)

পরবর্তী সাত শ্লোকে ভগবান বুদ্ধি ও ধৃতির পার্থক্য ও লক্ষণ বিশদভাবে বর্ণনা করেছেন। ভগবান গীতায় ইন্দ্রিয়গুলির মধ্যে বুদ্ধির স্থান সর্বোচ্চ রেখেছেন **'মনসস্তু পরা বুদ্ধিঃ'** (গীতা ৩।৪২)। ইন্দ্রিয়গুলি বুদ্ধি সহকারেই কাজ করে এবং বুদ্ধিদ্বারাই নিজ ধ্যেয় (লক্ষ্য) ঠিকমতো বোঝা যায়। আর বুদ্ধির স্থিরতা এবং লক্ষ্য থেকে বিচ্যুতি প্রতিহত করার যে নিয়ন্ত্রিকা শক্তি তাকে বলে 'ধৃতি'। ধারণা শক্তি বা ধৃতি ব্যতীত বুদ্ধি দৃঢ়ভাবে থাকে না। ভগবান তাই এই সব শ্লোকে বলেছেন, সাধকের কীরূপ বুদ্ধি ও ধৃতি থাকলে তিনি সংসার সাগরের থেকে উত্তীর্ণ হন এবং কিরূপ বুদ্ধি ও ধৃতি থাকলে তাতে বাধা আসে—এটা জানা সাধকের অত্যন্ত প্রয়োজন। সাংখ্যযোগ ছাড়াও পরমাত্মা প্রাপ্তির সমস্ত সাধনে বুদ্ধি ও ধৃতির অত্যন্ত প্রয়োজনীয়তা থাকে। সেইজন্য গীতায় বুদ্ধি ও ধৃতিকে একই সঙ্গে বলা হয়েছে।

'শনৈঃ শনৈরুপরমেদ্ বুদ্ধ্যা ধৃতিগৃহীতয়া' (গীতা ৬।২৫)

'বুদ্ধ্যা বিশুদ্ধয়া যুক্তো ধৃত্যাত্মানং নিয়ম্য চ' (গীতা ১৮।৫১)

সাধকের বুদ্ধি ও ধৃতি দুই-ই যদি সাত্ত্বিক হয়, তবেই সাধক তাঁর সাধনে দৃঢ়ভাবে লেগে থাকতে পারে।

বুদ্ধের্ভেদং ধৃতেশ্চৈব গুণতস্ত্রিবিধং শৃণু।
প্রোচ্যমানমশেষেণ পৃথক্‌ত্বেন ধনঞ্জয়॥
প্রবৃত্তিঞ্চ নিবৃত্তিঞ্চ কার্যাকার্যে ভয়াভয়ে।
বন্ধং মোক্ষঞ্চ যা বেত্তি বুদ্ধিঃ সা পার্থ সাত্ত্বিকী॥
যয়া ধর্মমধর্মঞ্চ কার্যং চ কার্যমেব চ।
অযথাবৎ প্রজানাতি বুদ্ধিঃ সা পার্থ রাজসী॥
অধর্মং ধর্মমিতি যা মন্যতে তমসাবৃতা।
সর্বার্থান্ বিপরীতাংশ্চ বুদ্ধিঃ সা পার্থ তামসী॥

ধৃত্যা যয়া ধারয়তে মনঃপ্রাণেন্দ্রিয়ক্রিয়াঃ।
যোগেনাব্যভিচারিণ্যা ধৃতিঃ সা পার্থ সাত্ত্বিকী॥
যয়া তু ধর্মকামার্থান্ ধৃত্যা ধারয়তেঽর্জুন।
প্রসঙ্গেন ফলাকাঙ্ক্ষী ধৃতিঃ সা পার্থ রাজসী॥
যয়া স্বপ্নং ভয়ং শোকং বিষাদং মদমেব চ।
ন বিমুঞ্চতি দুর্মেধা ধৃতিঃ সা পার্থ তামসী॥

(গীতা ১৮।২৯-৩৫)

'ভগবান অর্জুনকে গুণানুসারে বুদ্ধি ও ধৃতির তিন প্রকার ভেদের কথা বর্ণনা করছেন।

সাত্ত্বিকী বুদ্ধি দ্বারা প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি, কর্তব্য ও অকর্তব্য, ভয় ও অভয়, বন্ধন ও মোক্ষকে জানা যায়।

রাজসী বুদ্ধি হলে মানুষ ধর্ম ও অধর্ম, কর্তব্য ও অকর্তব্য ঠিকভাবে বুঝতে পারে না।

তমোগুণে বুদ্ধি আচ্ছন্ন থাকে, তাই অধর্মকে ধর্ম দেখে এবং সমস্ত জিনিসকে বিপরীত দেখে।

ধৃতি সাত্ত্বিকী হলে তা সমত্বযুক্ত ও অব্যভিচারিণী হয় এবং মন, প্রাণ ও ইন্দ্রিয়াদি ধারণ করে।

ধৃতি রাজসী হলে তা দ্বারা ফলাকাঙ্ক্ষী মানুষ ধর্ম, অর্থ ও কাম উপভোগে একান্তভাবে লেগে থাকে।

ধৃতি তামসী হলে ব্যক্তি নিদ্রা, ভয়, চিন্তা, দুঃখ, অহংকার ত্যাগ করতে পারে না।' (গীতা ১৮।২৯-৩৫)

সাত্ত্বিক বুদ্ধির ভেদ—ভগবান প্রথমেই বলেছেন সাত্ত্বিক বুদ্ধিধারী ব্যক্তি প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি সম্বন্ধে অবগত থাকেন। কামনাযুক্ত প্রবৃত্তি ও বাসনাযুক্ত নিবৃত্তি উভয়ই প্রবৃত্তির মধ্যে পড়ে এবং কামনারহিত প্রবৃত্তি ও বাসনারহিত নিবৃত্তি—উভয়ই নিবৃত্তির অন্তর্গত।

মান, সম্মান, প্রশংসা এবং লোকে জ্ঞানী, ধ্যানী, সাধক মনে করবে এই ভাব বা সূক্ষ্ম-আকাঙ্ক্ষাকেই বাসনা বলে। সাত্ত্বিক সাধক কামনা-বাসনা

রহিত বুদ্ধিই গ্রহণ করেন। কার্য-অকার্য সম্বন্ধেও সাত্ত্বিক বুদ্ধিমান ব্যক্তির প্রকৃত জ্ঞান থাকে। শাস্ত্র ও মর্যাদা অনুযায়ী যে কর্ম এবং যাতে জীবের কল্যাণ অবশ্যম্ভাবী তাকে বলা হয় কর্তব্য। আর যা শাস্ত্র-মর্যাদার বিরুদ্ধে এবং যা করলে জীব বদ্ধ হয় তাকে বলে অকর্তব্য। যা আমরা করতে সক্ষম নই তা অকর্তব্য নয়, তাকে বলে অসামর্থ্য।

যে কর্মের দ্বারা এখন বা পরে নিজের বা জগতের অনিষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা থাকে তা ভয়দায়ক। মানুষ অকার্যে প্রবৃত্ত হলে তার নিন্দা-অপমান ও মানমর্যাদা হানির ভয় উৎপন্ন হয়। আর যে কর্মে নিজের ও জগতের মঙ্গল হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, যিনি কারোর অমঙ্গল কামনা করেন না এবং সর্বদা মন পরমাত্মাতে নিবিষ্ট রাখেন তাঁর মনে সর্বদা অভয় বিরাজ করে। এই অভয়ই তাকে সর্বতোভাবে অভয়পদরূপী পরমাত্মা প্রাপ্তি করায়। সাত্ত্বিক বুদ্ধিযুক্ত ব্যক্তির বন্ধন-মুক্তি সম্বন্ধেও সম্যক্ ধারণা থাকে। জাগতিক কামনা থেকেই বন্ধন হয় আর পরমাত্মা ব্যতীত অন্য বস্তু, ব্যক্তি, ঘটনা, পরিস্থিতি ইত্যাদিতে কামনা না থাকলেও মুক্তি হয়।

মনে যদি কামনা থাকে তবে বস্তু কাছে থাকুক বা না থাকুক—দুয়েতেই বন্ধন আর যদি কামনা না থাকে তবে বস্তু কাছে থাকলেও মুক্তি, না থাকলেও মুক্তি। প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি, কার্য-অকার্য, ভয়-অভয়, বন্ধন-মুক্তি এগুলি জানার অর্থ হল জগৎ-সংসারের থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করা। যদি জগৎ-সংসার থেকে সম্পর্ক ছিন্ন না হয় তবে তা অনুভব নয়, শোনা মাত্র।

রাজসিক বুদ্ধি—রাজসী বুদ্ধিযুক্ত মানুষের আসক্তি ও দ্বেষ প্রবল হয়। যার প্রতি আসক্ত তার দোষ ও যার প্রতি বিদ্বেষ তার গুণগুলি তার লক্ষ্যে আসে না। আর মানুষ রাগ ও দ্বেষ এই দুটির সাহায্যেই সংসারের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করে থাকে। ফলে রাজসিক বুদ্ধিযুক্ত ব্যক্তি তার বিবেক, ধর্ম-অধর্ম, কর্তব্য-অকর্তব্য আদি ঠিকমতো জানতে পারে না। সংসারের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করলে সংসারকে (বিনাশশীল বস্তু হিসাবে) জানা যায় না আর ভগবানের থেকে পৃথক হলে ভগবানকে জানা যায় না। অর্থাৎ সংসার থেকে পৃথক হলেই সংসারকে (বা তার অসারত্বকে) জানা যায়। আর

পরমাত্মার সঙ্গে একাত্ম হলে তবেই ভগবানকে জানা যায়। এই একাত্মতা প্রেম থেকেও হতে পারে বা জ্ঞান থেকেও হতে পারে। রাজসী লোকের বুদ্ধিতে বিবেক-শক্তি অন্ধকারাচ্ছন্ন থাকে। যেমন জলে মাটি মিশে গেলে জলের সচ্ছতা নির্মলতা থাকে না, সেইরকম বুদ্ধিতে রজগুণের প্রাবল্য হলে বুদ্ধির স্বচ্ছতা নির্মলতা থাকে না। তার ফলে রাজসী বুদ্ধিসম্পন্ন লোক বিষয়ের দোষগুণ বুঝে উঠতে পারে না। সে গ্রাহ্যবস্তু ঠিকমতো গ্রহণ করতে পারে না ও ত্যজ্যবস্তুও ত্যাগ করতে পারে না।

তামসিক বুদ্ধি—তমোগুণে আচ্ছন্ন লোকেরা অধর্মকে ধর্ম বলে মনে করে এবং সমস্ত জিনিসেই বিপরীত বোধ হয়। অধর্মকে ধর্ম বোধ কী ? লোক-মর্যাদার বিরুদ্ধ কাজ করা, মা-বাবা, সাধু-মাহাত্মাদের মান্য না করা, ছলনা, বেঁইমানি, কপটতা ইত্যাদি পাপকর্মকে বৈধ বলে মান্য করা ইত্যাদি। এরা আত্মাকে স্বরূপ না ভেবে শরীরকেই স্বরূপ ভাবে, ঈশ্বরকে চিরন্তন না ভেবে জগৎকে সত্য ভাবে, প্রকৃত সুখের দিকে নজর না দিয়ে সংযোগ-জনিত সুখকে আসল সুখ বলে মনে করে।

এর ফলে কী হয় না—**'অধো গচ্ছন্তি তামসাঃ'** অর্থাৎ মানুষ অধোগতিতে চলে যায়। তাই উদ্ধার পেতে হলে তামসী বুদ্ধি সর্বতোভাবে পরিত্যাগ করতে হবে।

ধৃতি—

নিজেকে ধারণা, সিদ্ধান্ত, লক্ষ্য, ভাব, ক্রিয়া, বৃত্তি, বিচার ইত্যাদিতে অটল রাখার শক্তিই হল ধৃতি।

সাত্ত্বিক ধৃতি—সাত্ত্বিক ধৃতি হল সমত্বযুক্ত অর্থাৎ লাভ-ক্ষতি, জয়-পরাজয়, সুখ-দুঃখে, সিদ্ধি-অসিদ্ধিতে সম থাকা। তাই গীতায় ভগবান বলেছেন **'সমত্বং যোগ উচ্যতে'** (গীতা ২।৪৮)।

সাত্ত্বিক ধৃতি হল অব্যভিচারিণী। যেহেতু জীব ভগবানের অংশ তাই পরমাত্মা ব্যতীত অন্য কোনো জিনিসে আসক্তি বা মন দেওয়াই হল ব্যভিচার, আর পরমাত্মার দিকে দৃঢ়ভাবে এগিয়ে যাওয়াই হল অব্যভিচারী ধৃতি।

এইরূপ সাত্ত্বিক ধৃতি থাকলে তা মন, প্রাণ, ইন্দ্রিয়াদিকে কীভাবে সাহায্য করে ?

মন—মনে রাগদ্বেষ থেকে হওয়া চিন্তা থেকে মুক্ত করে। মনকে যেখানে ইচ্ছে সেখানে নিযুক্ত করা বা সরিয়ে নিয়ে যাওয়া ধৃতির কাজ।

প্রাণ—শ্বাস-প্রশ্বাস প্রাণায়ামের নিয়ম মতো ধারণ করা।

ইন্দ্রিয়—যে ধৃতি মন, প্রাণ ছাড়াও ইন্দ্রিয়াদিকে নিরন্তর নিয়ন্ত্রণে রাখতে সাহায্য করে অর্থাৎ রূপ, রস, গন্ধ আদি পঞ্চ বিষয়ের উপর আবিষ্ট হতে না দিয়ে যে বিষয়ে প্রবৃত্ত ও যে যে বিষয়ে নিবৃত্ত হওয়া উচিত তাতে সাহায্য করে, তাই সাত্ত্বিকী ধৃতি।

রাজসিক ধৃতি—

রাজসী ধৃতি মানুষকে উপভোগ পূর্বক ধারণায় লিপ্ত করায়।

ধর্ম—রাজসিক ব্যক্তি কখনো কখনো তীর্থাদি ভ্রমণ, পর্বাদিতে উৎসব, দান, ধ্যান, ভগবৎকথা শ্রবণ, কীর্তন ইত্যাদি কামনা পূরণের জন্য করে থাকে এবং তা হল ধৃতিপূর্বক ধর্মকে ধারণ করা।

কাম—সাংসারিক ভোগ উপকরণ প্রাপ্ত হওয়াই জীবনের একমাত্র কাম্য, যে ভোগ্যবস্তু পায় না তার জীবনই ব্যর্থ, এইরূপে যে ভোগ-কামনা পূরণে ব্যস্ত থাকে তা হল কামনার ধৃতি।

অর্থ— অর্থ বিনা কোনো কাজ হয় না। আজ পর্যন্ত যারা বড় হয়েছে সবাই অর্থের জন্য হয়েছে। যার অর্থ নেই, তাকে কেউ মান্য করে না, এইরূপ অর্থের মধ্যে ডুবে যাওয়াকে বলে অর্থের ধৃতি। এইরূপ ফলাকাঙ্ক্ষী ও সংসারে আসক্তিসম্পন্ন মানুষের ধারণ শক্তি রাজসী হয়।

এখানে উল্লেখ্য যে যদি ধর্মানুষ্ঠান অর্থের নিমিত্ত হয় এবং সেই অর্থ আবার ধর্মের জন্য ব্যয়িত হয় তবে ধর্মের দ্বারা অর্থ ও অর্থের দ্বারা ধর্ম দুই বৃদ্ধি পায়। কিন্তু যদি ধর্মের অনুষ্ঠান বা অর্থের ব্যয় শুধু কামনা পূরণের জন্য ব্যয় হয় তবে কামনা পূরণের পর উভয়ই নষ্ট হয়ে যায়।

তামসিক ধৃতি—

তামসিক ধৃতিসম্পন্ন ব্যক্তির অতিনিদ্রা, দুঃখ, ভয়, চিন্তা, অহংকার

তো থাকেই, উপরন্তু তারা ভাবে এগুলি দূর করা সম্ভব নয়। পরিত্যাগ করার সাহসও তাদের নেই, বরং এগুলিকে তারা স্বাভাবিক বলে মেনে নেয়। রাজসিক ব্যক্তির ধৃতিতে সাংসারিক পদার্থ ও ভোগের প্রতি আসক্তি থাকায় বিবেক অস্ফুট থাকে কিন্তু তামসী ব্যক্তির বিবেক একেবারে সুপ্ত থাকে। ভগবান বুদ্ধি ও ধৃতির ছটি শ্লোকের (৩০-৩৫) প্রতিটিতে একবার করে পার্থ বলে ডেকে অর্জুনকে উজ্জীবিত করতে চেয়েছেন, যেন কখনই তার মনে রাজসিক বা তামসিক বুদ্ধি বা ধৃতির উদয় না হয়।

সুখের বিভাগ—(শ্লোক ৩৬—৩৯)

ভগবান পরবর্তী চারটি শ্লোকে (৩৬-৩৯) সুখের সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন।

সুখ কী ? তার সংজ্ঞায় ভগবান বলছেন—

সুখং ত্বিদানীং ত্রিবিধং শৃণু মে ভরতর্ষভ।
অভ্যাসাদ্রমতে যত্র দুঃখান্তঞ্চ নিগচ্ছতি ॥ (শ্লোক ১৮।৩৬)

'হে অর্জুন ! এ জগতে সুখও তিনপ্রকারের। অভ্যাস দ্বারাই ক্রমে ক্রমে প্রকৃত সুখলাভ হয় এবং এর দ্বারা দুঃখের অন্ত হয়।' (গীতা ১৮।৩৬)

তবে এই অভ্যাসের প্রয়োজন সাত্ত্বিক সুখলাভের জন্যই, কিন্তু রাজসিক বা তামসিক সুখের জন্য অভ্যাসের প্রয়োজন নেই। কারণ এগুলি সকল প্রাণীমাত্রেরই স্বাভাবিক প্রবৃত্তি। রাজসিক জনের স্বাভাবিক বৃত্তি হল বিষয়জনিত সুখ, অহংকারজনিত সুখ বা প্রশংসাজনিত সুখ। আর তামসিক জনের স্বাভাবিক বৃত্তি হল নিদ্রা ও আলস্যজনিত সুখ। কুকুর বা ইতর প্রাণীদেরও আদর করলে তারা খুশি হয় এবং অবহেলা করলে দুঃখিত হয়। কারণ রাজস ও তামস সুখের জন্য অভ্যাসের কোনো প্রয়োজন নেই, সকল প্রাণীই এইসব সুখ পূর্ব পূর্ব জন্ম থেকে আস্বাদন করে এসেছে। কিন্তু সাত্ত্বিক সুখের সংস্কার ক্বচিৎ পুনর্জন্মে থাকে তাই সাত্ত্বিক সুখ-এর জন্য অভ্যাস প্রয়োজন। এই অভ্যাস কেমন ? শ্রবণ-মননও অভ্যাস, শাস্ত্রচর্চাও অভ্যাস আবার রাজসিক ও তামসিক বৃত্তি দূর করাও অভ্যাস। অর্থাৎ রাজসিক ও তামসিক সুখ—যা প্রাণীমাত্রেরই স্বাভাবিক বৃত্তি, তা ব্যতীত নতুন সুপ্রবৃত্তি

সৃষ্টির প্রচেষ্টাই অভ্যাস। সাত্ত্বিক সুখের প্রতি যেমন যেমন রুচি ও ভালবাসা বৃদ্ধি পেতে থাকে, তেমন তেমন দুঃখ দূর হতে থাকে এবং প্রসন্নভাব, সুখ ও আনন্দ বৃদ্ধি পায়।

ভগবান দ্বিতীয় অধ্যায়ে বলেছেন—

প্রসাদে সর্বদুঃখানাং হানিরস্যোপজায়তে।

প্রসন্নচেতসো হ্যাশু বুদ্ধি পর্যবতিষ্ঠতে।। (গীতা ২।৬৫)

অন্তঃকরণের প্রসন্নতার ফলে (সাত্ত্বিক সুখ উদ্ভূত হলে) তার সমস্ত দুঃখ নাশ হয় এবং এই প্রসন্নচিত্ত যোগীর বুদ্ধি ক্রমে পরমাত্মাতে স্থির হয়।

ভগবান অর্জুনকে ভরতর্ষভ বলে বর্ণনা করেছেন অর্থাৎ ভরতবংশীয় শ্রেষ্ঠ পুরুষ। তিনি অর্জুনকে এই বলে উজ্জীবিত করার চেষ্টা করেছেন যে রাজসিক বা তামসিক বৃত্তি জয় তাঁর কাছে কোনো ব্যাপারই নয়।

অর্জুন যখন স্বর্গে গিয়েছিলেন, সেখানে উর্বশীর মতন সুন্দরী অপ্সরাকে প্রত্যাখ্যান করে তাঁর রাজসিক বৃত্তি জয়ের পরিচয় দিয়েছিলেন। আবার অর্জুন তামস সুখ জয় করেও দেখিয়েছেন। তিনি গুড়াকেশ অর্থাৎ তামস সুখকারী নিদ্রাকে জয় করেছেন।

সাত্ত্বিক সুখ—(শ্লোক ৩৭)

যত্তদগ্রে বিষমিব পরিণামেঽমৃতোপমম্।

তৎ সুখং সাত্ত্বিকং প্রোক্তমাত্মবুদ্ধিপ্রসাদজম্।। (গীতা ১৮।৩৭)

'যে সুখ পরমাত্মা-বিষয়বুদ্ধির নির্মলতা থেকে উৎপন্ন এবং প্রথমে বিষতুল্য মনে হলেও পরে তা অমৃততুল্য বোধ হয় তাকে সাত্ত্বিক সুখ বলে।' (গীতা ১৮।৩৭)

রাজস ও তামস সুখ দেহের ইন্দ্রিয়াদি সংপৃক্ত তাই এই সুখ সাথে সাথেই অনুভব করা যায়। কিন্তু সাত্ত্বিক সুখ নিরন্তর পরিশ্রম ও অভ্যাসলব্ধ। আর রাজস ও তামস সুখ বহু জন্ম ধরে ভোগ করা হয়েছে এবং এখনো ভোগ হচ্ছে তাই সেই ভোগসুখের সংস্কার অন্তরে জাগ্রত থাকায় রাজস ও তামস সুখে স্বভাবতই মন আকৃষ্ট হয়। কিন্তু সাত্ত্বিক সুখ কষ্টোপার্জিত এবং না পূর্ব পূর্ব জন্মে, না এ জন্মে, কোথাও এই সুখের বিশেষ অনুভব হয়নি,

তাই এতে শীঘ্র মন আকর্ষিত হয় না। আসলে সাত্ত্বিক সুখ বিষের মতো লাগে না, কিন্তু সাত্ত্বিক সুখ পাওয়ার জন্য যে রাজসিক ও তামসিক সুখ ত্যাগ করতে হয় এবং সাত্ত্বিক সুখ পাওয়ার জন্য যে প্রয়াস করতে হয় তাই মানুষের কাছে বিষের মতো লাগে। যেমন শিশুদের খেলাধুলা ত্যাগ করে পড়তে বসতে বললে তার একদিকে কষ্ট হয় পড়াশুনার অভ্যাস করায়ত্ত করতে এবং অন্যদিকে খেলাধুলা না করতে পারার কষ্ট—তাই পড়াশুনাকে তার কাছে বিষবৎ বলে মনে হয়। কিন্তু সে যদি পড়াশুনার অভ্যাস চালিয়ে যায় এবং ফলও ভাল করতে থাকে তবে ক্রমে তার পড়াশুনা ভাল লাগে এবং তাতে রুচি ও ভালোবাসা জন্মায়। প্রকৃতপক্ষে রাজস ও তামস সুখ ভোগের আসক্তি ত্যাগ করা এবং সাত্ত্বিক সুখের প্রয়াসই প্রথম প্রথম বিষবৎ মনে হয়। তবে ক্বচিৎ যাদের সংস্কারবশত স্বাভাবিক বৈরাগ্য থাকে তাদের সৎসঙ্গ, সাধন-ভজন-কীর্তন, শাস্ত্রাধ্যায়াদি অধ্যয়নে স্বাভাবিক রুচি থাকে অথবা যাদের জ্ঞান, কর্ম, বুদ্ধি ও ধৃতি সাত্ত্বিক তাদের এই সাত্ত্বিক সুখ আরম্ভ থেকেই অমৃতের মতন আনন্দদায়ী হয়। সাত্ত্বিক সুখও দুইভাবে বর্ণিত হয়েছে।

চতুর্দশ অধ্যায়ে সাত্ত্বিক সুখকে বলা হয়েছে **'সুখসঙ্গেন বধ্নাতি জ্ঞানসঙ্গেন ভারত'** (গীতা ১৪।৬) অর্থাৎ সাত্ত্বিক সুখ বন্ধনকারক হয় আবার অষ্টাদশ অধ্যায়ে এই সুখকে বলা হয়েছে **'দুঃখান্তং নিগচ্ছতি'** (গীতা ১৮।৩৬) অর্থাৎ সাত্ত্বিক সুখ-দুঃখের অন্তলাভের পথ। এর তাৎপর্য হল, যদি সাত্ত্বিক সুখে আগ্রহ (আসক্তি) থাকে তবে সেটি গুণাতীত হতে বিলম্বের কারণ হয়। অতএব সাত্ত্বিক বৃত্তিতে সাধককে সজাগ থাকতে হবে যে, এটি তার চরম লক্ষ্য নয়, এবং সে সময়ে বিশেষভাবে ভজন-ধ্যানে ব্যাপৃত হতে হবে এবং ভগবানের কৃপার প্রতি ভরসা রাখতে হবে। তাহলে সাধক শীঘ্রই গুণাতীত হবে[১]।

---

[১]প্রকৃতির সঙ্গে অল্পবিস্তর সম্পর্কিত হয়ে যে উচ্চ থেকে উচ্চতর সুখ লাভ করা যায় তাকে বলে সাত্ত্বিক সুখ। কিন্তু স্বরূপের প্রকৃত সুখ হল গুণাতীত, অনুপম ও অলৌকিক।

রাজস সুখ—(শ্লোক ৩৮)

ভগবান রাজস সুখ সম্বন্ধে বলেছেন—

বিষয়েন্দ্রিয়সংযোগাদ্ যত্তদগ্রেঽমৃতোপমম্।

পরিণামে বিষমিব তৎ সুখং রাজসং স্মৃতম্॥ (গীতা ১৮।৩৮)

'রাজস সুখ বিষয় ও ইন্দ্রিয় সংযোগে হয় এবং প্রথমে ভোগকালে অমৃতবৎ মনে হলেও পরিণামে বিষতুল্য হয়।' (গীতা ১৮।৩৮)

বিষয়-ইন্দ্রিয় সংযোগের সুখ প্রথমে অমৃততুল্য হয় কেন ? ভগবান এখানে সাত্ত্বিক সুখ সম্বন্ধে **'প্রোক্তম্'** বলেছেন এবং রাজসিক সুখকে বলেছেন **'স্মৃতম্'** অর্থাৎ রাজসিক সুখের স্মৃতি আগের জন্মেও ছিল আর তাই এই জন্মেও সেই সুখ সংযোগের জন্য লালায়িত হয়ে উঠেছে।

তার ওপর বিষয়-ইন্দ্রিয়র আসক্তিবশত মনে সংযোগের প্রভাব পড়েছে তাই সে পরিণামের প্রভাব স্বীকার করে না। যদি সে পরিণামের কথা চিন্তা করে তবে সে রাজস সুখের ফাঁদে পড়ে না। আবার রাজসিক সুখকে অমৃতের মতো বলার অর্থ হল এই যে সংসারে বিষয় প্রাপ্তির সম্ভাবনায় যত সুখ, আনন্দ ও সন্তোষবিধান হয়, বিষয় প্রাপ্ত হয়ে গেলে বা ভোগপ্রাপ্ত হলে তত হয় না। তাই রাজসিক সুখের কথা আরম্ভে অমৃতের মতো মনে হয়—**'যামিমাং পুষ্পিতাং বাচং প্রবদন্ত্যবিপশ্চিতঃ'** (গীতা ২।৪২)। আর প্রাপ্ত হয়ে গেলে রাজস সুখকে বলা হয়েছে **'পরিণামে বিষমিব'**, আবার বিষ কেবল এক জন্মেই মারে কিন্তু রাজসিক সুখ জন্মজন্মান্তর ধরে মারে। রাজসিক ব্যক্তি যদি আসক্ত হয়ে শুভ কর্ম করে তবে স্বর্গে গিয়েও উচ্চাবস্থার লোকেদের প্রতি ঈর্ষা, সমপর্যায়দের দেখে দুঃখ, নিম্নাবস্থার লোকেদের দেখে অহংবোধ করে এবং শেষে **'ক্ষিণে পুণ্যে মর্ত্যলোকং**

সুখমাত্যন্তিকং যত্তদ্বুদ্ধি গ্রাহ্যমতীন্দ্রিয়ম্।

বেত্তি যত্র ন চৈবায়ং স্থিতশ্চলতি তত্ত্বতঃ॥ (গীতা ৬।২১)

ইন্দ্রিয়াদির অতীত যে শুদ্ধ, সূক্ষ্ম বুদ্ধিপ্রাপ্ত অনন্ত আনন্দ, সে অবস্থায় উপনীত হয়ে যোগী পরমাত্মস্বরূপ থেকে বিচলিত হন না।

বিশন্তি' (গীতা ৯।২১) অর্থাৎ পুণ্যক্ষয় হয়ে গেলে মর্ত্যলোকে জন্মগ্রহণ করে। আবার আসক্তিবশত যদি পাপকর্ম করে, তবে হয় চুরাশি লক্ষ যোনি ভ্রমণ অথবা নরকে গমন। এইভাবে জন্ম-মরণ চক্রে আবর্তিত হতে থাকে।

রাজস সুখভোগকারী ব্যক্তিরা বিষয় ভোগজনিত আপাত অবস্থাকে গুরুত্ব দেয়। এই আপাত অবস্থা কখনই সর্বদা স্থায়ী নয় কিন্তু তা যে যে কামনা থেকে উদ্ভূত সেই সংস্কার থেকে যায় এবং সেটাই হয় সকল দুঃখের কারণ। মানুষের পরিণাম বিচার করার যোগ্যতা আছে, আর তা না করাই হল পশুত্ব।

তামস সুখ—

ভগবান তামস সুখ সম্বন্ধে বলেছেন—

যদগ্রে চানুবন্ধে চ সুখং মোহনমাত্মনঃ।
নিদ্রালস্যপ্রমাদোত্থং তত্তামসমুদাহৃতম্ ॥ (গীতা ১৮।৩৯)

'তামস সুখ নিদ্রা, আলস্য ও প্রমাদ (কর্তব্য বিস্মৃতি) থেকে উৎপন্ন হয় এবং আরম্ভ ও পরিণাম—উভয়তেই মোহাচ্ছন্ন করে রাখে।' (গীতা ১৮।৩৯)

চতুর্দশ অধ্যায়ে তমগুণের বন্ধন প্রসঙ্গে ভগবান বলেছেন **'প্রমাদালস্যনিদ্রা'** (গীতা ১৪।৮) অর্থাৎ মানুষের সবচেয়ে বড় শত্রু হল প্রমাদ, তারপর আলস্য এবং তারপরে নিদ্রা বন্ধনের কারণ হয়। আর এখানে বলছেন তমোগুণকে সুখ হিসেবে গ্রহণ করলেও তা বন্ধনকারক হয়। ভগবান বলেছেন **'নিদ্রালস্যপ্রমাদ'** (গীতা ১৮।৩৯) অর্থাৎ প্রথমে নিদ্রা, তারপর আলস্য এবং সর্বশেষে প্রমাদ। এর তাৎপর্য হল নিদ্রার সুখ তেমন বন্ধনকারী নয়, কিছু আবশ্যক নিদ্রা মহাপুরুষগণেরও অন্তঃকরণে হয়ে থাকে। প্রয়োজনের অতিরিক্ত নিদ্রা হল দোষের। তারপর আলস্যের সুখ বন্ধন করে এবং সর্বাধিক বন্ধনকারী হয় প্রমাদের সুখ।

যখন মানুষের আসক্তি বৃদ্ধি পায় তখন তা তমোগুণ ধারণ করে আর তাকে বলে মোহ। তমোগুণী মানুষের মোহের প্রকাশ পায় অতিনিদ্রার মধ্যে দিয়ে এবং তারা তন্দ্রা ও স্বপ্নের মধ্যে অনেক সময় নষ্ট করে এবং তাতেই সুখ পায়, একে বলে নিদ্রা থেকে উৎপন্ন সুখ।

তমোগুণের আধিক্যে মোহও প্রবল হয় এবং আলস্য বৃদ্ধি পায় ও মন অবসাদগ্রস্থ থাকে। তাদের ইন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণে শৈথিল্যবশত প্রয়োজনীয় কর্ম 'পরে করব', 'এখন বিশ্রাম করব' এইরূপ ভাব আসে। মনও বিক্ষিপ্ত থাকার ফলে নানারকম বাজে চিন্তার কারণে অশান্তি, শোক, বিষাদ, চিন্তা ও দুঃখ হতে থাকে।

তমোগুণের অত্যন্ত আধিক্যে মানুষ পূর্ণ মোহগ্রস্ত বা প্রমাদে কাল কাটায়। এই প্রমাদও দুই প্রকারের—

নিষ্ক্রিয় প্রমাদ ও সক্রিয় প্রমাদ।

নিষ্ক্রিয় প্রমাদে লোকে ঘর-সংসার, শরীর ইত্যাদি সম্পর্কিত আবশ্যিক কর্ম করে না এবং নিষ্ক্রিয় থাকতে ভালবাসে। আর সক্রিয় প্রমাদে মানুষ অনর্থক কাজ, যথা—নেশা ও মাদক দ্রব্যের সেবন, খেলাধুলো, তামাসা ইত্যাদি দুর্ব্যসনে মত্ত থাকা এবং ছল, কপট, চুরি, ডাকাতি, বেঈমানি, মিথ্যাচার, ব্যভিচার ইত্যাদিতে ব্যাপৃত থাকতে ভালবাসে।

তমোগুণের কার্য নিদ্রা, আলস্য প্রভৃতির বৃদ্ধি হলে সেটি সত্ত্বগুণের বিবেকবোধকে আবৃত করে দেয়।

মানুষের নিদ্রাসক্তি প্রবল হলে বৃক্ষাদি মূঢ় যোনি প্রাপ্ত করায় আর আলস্য, প্রমাদাদির ফলে কর্তব্যচ্যুত হলে দুরাচারী হয়ে নরকগামী হয়।

প্রকৃতিজাত সবই ত্রিগুণাত্মক—(শ্লোক ৪০)

ভগবান বলছেন—

> ন তদস্তি পৃথিব্যাং বা দিবি দেবেষু বা পুনঃ।
> সত্ত্বং প্রকৃতিজৈর্মুক্তং যদেভিঃ স্যাৎ ত্রিভির্গুণৈঃ॥
>
> (গীতা ১৮।৪০)

'প্রকৃতি হতে জাত পৃথিবী, স্বর্গ, দেবতাদি বা এমন কোনো প্রাণী বা বস্তু নাই যা এই তিন গুণ হতে মুক্ত বা রহিত।' (গীতা ১৮।৪০)

ভগবান বলতে চেয়েছেন যে ত্রিলোক, অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড এবং তথায় বসবাসকারী সকলই যথা মানুষ, দেবতা, অসুর, রাক্ষস, নাগ, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, বৃক্ষাদি সমস্ত চর ও অচর সকল প্রাণীই প্রকৃতি জাত এবং সবই

এই ত্রিগুণাত্মক।

সত্ত্বগুণে ইন্দ্রিয় ও অন্তকরণ স্বচ্ছতা, নির্মলতা, জ্ঞানের দীপ্তি, শরীরের প্রতি নির্বিকার ইত্যাদি সদ্‌ভাব প্রকটিত হয়। তবে ভগবান সাত্ত্বিক সুখকেও **'আত্মবুদ্ধি প্রসাদজম্'** অর্থাৎ সেটি জাত (যা উৎপন্ন হয়) হয় বলেছেন মানে তা নিত্য হয় না। তাই এই উপজাত সুখের ঊর্ধ্বে উঠে প্রকৃতির গুণরহিত পরমাত্মাকে প্রাপ্ত করতে হয়। অর্থাৎ সাত্ত্বিক সুখ পরমাত্মা-বিষয়ক প্রসন্নতা থেকে উদ্ভূত হলেও এই উচ্চ হতে উচ্চতর সুখের উপভোগ বা রসগ্রহণ (যা আসক্তিবশত হয়) ত্যাগ না করলে প্রকৃত অক্ষয় সুখ লাভ করা যায় না।

রজোগুণী লোকেরা পার্থিব বিষয়, মান, আকাঙ্ক্ষা, যশ ইত্যাদি বিষয় পাওয়ার কামনা করে থাকে। প্রার্থিত বস্তু লাভ হলে প্রাপ্তির ইচ্ছা মন থেকে দূর হয় এবং বস্তুটির প্রতি আকর্ষণও দূর হয়। তাই তখন যে সুখলাভ হয় তা প্রকৃতপক্ষে পাওয়ার জন্য নয় বরং তা হচ্ছে তাৎকালিক আসক্তি দূর হওয়ার কারণে। এর তাৎপর্য এই যে— অন্তরের প্রসন্নতা, বাহ্যিক বস্তুর সংযোগে উৎপন্ন হয় না বরং বস্তু প্রাপ্তি হওয়ার পরে তার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন হলেই নিত্যবিরাজিত স্বাভাবিক সুখের আভাস পাওয়া যায়।

আর তমোগুণীর নিদ্রার সময় যখন বুদ্ধি তমোগুণে লীন হয় তখন বুদ্ধির স্থিরতার জন্য সুখ প্রকটিত হয়। এই সময় পদার্থগুলির সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন হয় এবং এই বিচ্ছেদের ফলে স্বাভাবিক সুখের যে আভাস হয় তাই হল নিদ্রাসুখ।

সার কথা হল ত্রিগুণযুক্ত বস্তুর সঙ্গে সম্পর্ক ছেদেই হয় প্রকৃত সুখ। প্রকৃতি ও তার কার্য সবই ত্রিগুণাত্মক এবং এগুলির সঙ্গে সম্বন্ধস্থাপন করলেই বন্ধন ও সম্বন্ধ ছেদেই মুক্তি। কিন্তু বিচিত্র ব্যাপার এই যে প্রকৃতির সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করলেই অহং ও কর্তৃত্ব ভাবের উৎপত্তি হয় এবং তা স্বাধীনতা বলে মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে তা পরাধীনতা। কারণ অহংভাবের জন্যই প্রকৃতিজনিত পদার্থে আসক্তি, কামনা ইত্যাদি অনুভূত হয় এবং তখন তাই পরাধীনতাকেও স্বাধীনতা বলে মনে হয়। তাই প্রকৃতিজনিত গুণরহিত

হওয়ার জন্য রজগুণ ও তমগুণ পরিত্যাগ করে সত্ত্বগুণ বাড়ানোর প্রয়োজন আছে। সত্ত্বগুণের প্রসন্নভাব এবং বিবেক-বিচারের প্রয়োজন থাকলেও সাত্ত্বিক সুখ ও জ্ঞানের প্রতিও আসক্ত হওয়া উচিত নয়, কারণ এই আসক্তি বন্ধনকারক আর ইহা পরিত্যাগ করলে তবেই মানুষ সত্ত্বগুণের অতীত হয়।

সাধকদের সাত্ত্বিক জ্ঞান, কর্ম, কর্তা, বুদ্ধি, ধৃতি ও সুখ—এগুলির ওপর দৃষ্টি রেখে নিজেদের জীবন গঠন করা উচিত এবং সতর্কতার সঙ্গে রাজস ও তামস গুণ ত্যাগ করা উচিত এবং ইহাই সাধনা। প্রকৃতির সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করতে সাত্ত্বিকতার বিশেষ প্রয়োজন, কারণ এতে বিবেক-বুদ্ধি জাগ্রত হয় ও প্রকৃতি থেকে মুক্ত হওয়া সহজ হয়।

বর্ণ অনুসারে নির্দিষ্ট কর্ম—(শ্লোক ৪১—৪৪)

ভগবান পরের চারটি শ্লোকে বর্ণ অনুযায়ী কর্মের ভেদ বর্ণনা করেছেন।

ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশাং শূদ্রাণাঞ্চ পরন্তপ।
কর্মাণি প্রবিভক্তানি স্বভাবপ্রভবৈর্গুণৈঃ।।

(গীতা ১৮।৪১)

'ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রদের কর্মসকল তাদের গুণানুসারে গঠিত স্বভাব অনুযায়ী হয়।' (গীতা ১৮।৪১)

চতুর্থ অধ্যায়ের ত্রয়োদশ শ্লোকে ভগবান বলেছেন **'চাতুর্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্মবিভাশঃ'** অর্থাৎ পুনর্জন্মলব্ধ গুণ ও কর্ম অনুসারেই চতুর্বর্ণ মানুষের সৃষ্টি বা জন্ম হয়। আর অষ্টাদশ অধ্যায়ে ভগবান বলেছেন—**'কর্মানি প্রবিভক্তানি স্বভাবপ্রভবৈগুণৈঃ'** অর্থাৎ চার বর্ণের সৃষ্টির পর তাদের কর্ম বিভাগ হয় ত্রিগুণাদিভেদে তাদের স্বভাব অনুযায়ী।

মানুষ যে কর্ম করে, তার চিত্তে সেই কর্মের সংস্কার পড়ে আর সেই সংস্কার তার স্বভাব গড়ে উঠতে সাহায্য করে। এইভাবে বহু জন্মের সংস্কারের প্রভাবে একজনের স্বভাব গড়ে ওঠে এবং পূর্ব পূর্ব জন্মের সঞ্চিত কর্মফল ও সংস্কার অনুযায়ী তার প্রারব্ধ (ভাগ্য) তৈরি হয় আর সেই অনুসারে তার বর্ণ ও বৃত্তি নির্দিষ্ট হয়। তবে অনেক সময় অভিশাপ, আশীর্বাদ বা আসক্তি বা বিশেষ কারণবশত সংস্কারের বিপরীতেও উচ্চ বা নীচ বর্ণে

জন্ম হয়। কিন্তু তখন উচ্চ বা নীচ বর্ণে জন্মগ্রহণ করলেও তাঁরা নিজ পূর্ব-স্বভাব অনুযায়ী কর্ম করে থাকেন। যেমন উচ্চবংশে জন্মেও ধুন্ধুকারী প্রভৃতি নীচ কাজ করতেন ও নীচ বংশে জন্মেও বিদুর[১], কবীর, রবিদাস আদি মহাপুরুষ ছিলেন।

কর্ম দুই প্রকারের—১) জন্মারম্ভক ও ২) ভোগদায়ক।

যে কর্মদ্বারা উচ্চ-নীচ যোনিতে জন্ম হয় তাকে বলে জন্মারম্ভক কর্ম এবং যে কর্মদ্বারা সুখ-দুঃখাদি ভোগ হয়ে থাকে তাকে ভোগদায়ক কর্ম বলে। জন্মারম্ভক কর্ম মানুষের হাতে না থাকলেও ভোগদায়ক কর্মের সদুপযোগ ও দুরুপযোগ করায় মানুষমাত্রই স্বাধীন। অনুকূল-প্রতিকূল পরিস্থিতিকে সাধন-সামগ্রী করাই হল সাধকের কাজ। তা কিভাবে করা যায় ? আসলে অনুকূল পরিস্থিতিকে অন্যের সেবায় নিয়োজিত করা ও প্রতিকূল পরিস্থিতির সময় সুখের আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করাই হল সাধনা। মানুষের স্বভাবে পূর্ব সংস্কারই প্রধান কিন্তু জন্মানোর পর স্বভাব পরিবর্তনে সঙ্গ, স্বাধ্যায় অভ্যাসাদিও প্রধান ভূমিকা নিতে পারে।

পরবর্তী ৩টি শ্লোকে ব্রাহ্মণাদি চারটি বর্ণর স্বভাবজাত কর্মর কথা বলা হয়েছে—

ব্রাহ্মণ—(শ্লোক ৪২)

শমো দমস্তপঃ শৌচং ক্ষান্তিরার্জবমেব চ।
জ্ঞানং বিজ্ঞানমাস্তিক্যং ব্রহ্মকর্ম স্বভাবজম্॥ (গীতা ১৮।৪২)

'মনসংযম, ইন্দ্রিয়সংযম, ধর্মপালনের জন্য কষ্ট স্বীকার, অন্যের অপরাধে ক্ষমা, কায়মনোবাক্যে সারল্য, শাস্ত্রজ্ঞান, যজ্ঞবিধি পালন, পরমাত্মা, বেদ ইত্যাদিতে শ্রদ্ধা—এ সবই হল ব্রাহ্মণের স্বভাবজাত কর্ম।' (গীতা ১৮।৪২)

ব্রাহ্মণের যে নয়টি কর্মের কথা বলা হয়েছে তা সবই তার ধর্ম ও আত্মনিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধীয়, কোনোটিই বৃত্তি বা জীবিকা সম্পর্কিত নয়।

---

[১]বিদুর ধর্মরাজের অংশে জন্মগ্রহণ করেন। মাণ্ডব্য মুনির শাপে তিনি মনুষ্যযোনি প্রাপ্ত হন।

শমো—মনকে ইচ্ছেমতন সং ঃযত করা ও ইচ্ছেমতন নিয়োগ করা হল মনসংযম (শমো)।

দম—ইচ্ছেমতন ইন্দ্রিয় সংযম্ভম করা ও ইচ্ছেমতন তা নিয়োগ করা হল ইন্দ্রিয় সংযম (দম)।

শৌচম্—নিজ শরীর, মন, ইন্দ্রিন্দ্রিয়, খাওয়াদাওয়া, ব্যবহার আদি পবিত্র রাখাই হল শৌচম্।

ক্ষান্তি (ক্ষমা)—অন্যে যতই অপমান বা নিন্দা করুক এবং তাকে শাস্তি দেওয়ার ক্ষমতা থাকলেও বা সে ক্ষক্ষমা প্রার্থনা না করলেও তাকে ক্ষমা করা হল ক্ষান্তি।

আর্জবম্—কায়মনোবাক্যে এবং ব্যাবহারে ছল কপটতা না রেখে সহজ সরল থাকা হল আর্জবম্।

জ্ঞানম্—বেদ, শাস্ত্র, পুরাণাদি দি ভালভাবে অধ্যয়ন ও অধিগত করা।

বিজ্ঞানম্—যজ্ঞানুষ্ঠান ঠিকমতোতো জানা ও ভালভাবে পালন করা।

আস্তিক্যং—পরমাত্মা, বেদ ইত্যত্যাদিতে সহজ শ্রদ্ধা। বর্ণ-পরম্পরা ঠিক থাকলে এইসব গুণ ব্রাহ্মণদের মধ্যেধ্য সহজভাবেই আসে।

তবে ব্রাহ্মণের ধর্ম উল্লিখিত হলেও তাদের জীবিকার বিষয় উল্লিখিত হয়নি। তবে ব্রাহ্মণদের জীবিকা কী কি হবে?

ঋতামৃতাভ্যাং জীবেত্তু মৃতেনন প্রমৃতেন বা।
সত্যানৃতাভ্যামপি বা ন শ্বক্বৃত্ত্যা কদাচন॥ (মনুস্মৃতি ৪।৪)

ব্রাহ্মণদের পাঁচটি বৃত্তির কথা মনুস্মৃতিতে বলা হয়েছে—

ঋত—বা কপোত বৃত্তি হল চাষেষের ক্ষেতে বা বাজারে যে ধান পড়ে থাকে তাই কুড়িয়ে খাওয়া।

অমৃত—বা অযাচক বৃত্তি হল কিছু না চেয়ে বা ঈশারা-ইঙ্গিত ছাড়া কোনো দান পেলে তাই দিয়ে জীবিকিকা নির্বাহ।

মৃত—সকালে ভিক্ষার দ্বারা জীজীবিকা অর্জন।

প্রমৃত—চাষ করে জীবিকা নির্বার্বাহ।

সত্যানৃত—ব্যবসার দ্বারা জীবিবিকা নির্বাহ।

ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয়ের জন্য সেবাবৃত্তি নিষেধ করা হয়েছে, কিন্তু সেবা নয়। মাতা, পিতা বা যে কোনো বর্ণের সেবা স্বার্থত্যাগ সহকারে করলে তাতে বাধা নেই। কিন্তু ব্রাহ্মণের বৃত্তি হিসাবে বা মান, সম্মান বা উপার্জনের নিমিত্ত সেবা নিষেধ।

শ্রীকৃষ্ণ-উদ্ধব সংবাদে শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে বলছেন—

'ব্রাহ্মণস্য হি দেহোহয়ং ক্ষুদ্রকামায় নেষ্যতে'। (ভাগবত. ১১।১৭।৪২)

ব্রাহ্মণের শরীর তুচ্ছ দেহভোগের জন্য নয়। এই শরীর ইহজন্মে কষ্টকর তপস্যা ও পরজন্মে অনন্ত সুখের জন্য লাভ হয়েছে।

ক্ষত্রিয়—(শ্লোক ৪৩)

শৌর্যং তেজো ধৃতির্দাক্ষ্যং যুদ্ধে চাপ্যপলায়নম্।
দানমীশ্বরভাবশ্চ ক্ষাত্রং কর্ম স্বভাবজম্॥

(গীতা ১৮।৪৩)

'ক্ষত্রিয়ের স্বভাবজাত কর্ম হচ্ছে শৌর্য (বা পরাক্রম), তেজ, ধৈর্য, প্রজা পরিচালনার ক্ষমতা, যুদ্ধে অপরাঙ্মুখতা, দানে মুক্ত হস্ত, শাসনক্ষমতা ইত্যাদি।' (গীতা ১৮।৪৩)

এখানে ক্ষত্রিয়ের সাতটি স্বভাবজ কর্মর কথা বলা হয়েছে তার মধ্যে মাত্র দুটি জীবিকা নির্বাহের আর বাকি সব পরহিতকারী।

শৌর্যং—অন্তরে নিজ ধর্মপালনে তৎপর থাকা এবং ধর্মযুদ্ধে (নিজ স্বার্থে নয়, কেবল কর্তব্যবোধে যে যুদ্ধ), আঘাত পেলেও মনে উৎসাহ ও প্রসন্ন ভাব বজায় রাখা।

তেজঃ—যে প্রভাব বা শক্তির কাছে পাপী বা দুরাচারী ব্যক্তিও পাপ ও দুরাচার করতে ভয় পায়।

ধৃতিঃ—নানা প্রতিকূলতার মধ্যেও নিজ ধর্মে অবিচলিত থাকা এবং ধর্ম ও নীতিরক্ষাপূর্বক মর্যাদা অনুযায়ী কাজ করা।

দাক্ষ্যম্—প্রজাপালন ও যথাযোগ্য শাসনের যোগ্যতাকে বলে দাক্ষ্য।

যুদ্ধে চাপ্যপলায়নম্—যুদ্ধে কখনো পরাঙ্মুখ না হওয়া বা পলায়ন না করা এবং মনে মনেও পরাজয় স্বীকার না করাই অপলায়নম্।

দানম্—উদারতাপূর্বক দান করা।

ঈশ্বর ভাব—শাসন করা বা লোকেদের নীতি, ধর্মে চালিত করা ক্ষত্রিয়ের স্বাভাবিক বৃত্তি।

বৈশ্য ও শূদ্র—(শ্লোক ৪৪)

কৃষিগৌরক্ষ্যবাণিজ্যম্ বৈশ্যকর্ম স্বভাবজম্।
পরিচর্যাত্মকং কর্ম শূদ্রস্যাপি স্বভাবজম্॥

(গীতা ১৮।৪৪)

'বৈশ্যদের স্বভাবজ কর্ম হল চাষ করা, গোরক্ষা ও বাণিজ্য করা। (এগুলি সবই বৃত্তিমূলক)। আর শূদ্রদের স্বভাবজ কর্ম হল চারিবর্ণের সেবা করা। (ইহাও বৃত্তিমূলক)।' (গীতা ১৮।৪৪)

বৈশ্যদের শুদ্ধ ব্যবসার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে অর্থাৎ যে দেশে, যে সময়ে, যে বস্তুটির প্রয়োজন থাকে অন্যের হিতার্থে সেই বস্তু আনয়ন করা, কেউ যাতে কষ্ট না পায় সেই মনোভাব নিয়ে সততার সঙ্গে বিপণন করা।

মনুঋষি বৈশ্যবৃত্তি সম্পর্কে বলেছেন—

'পশূনাং রক্ষণম্' (মনুস্মৃতি ১।৯০)।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নিজেকে বৈশ্য বলে মনে করতেন। তিনি বলেছেন—

কৃষিবাণিজ্যগোরক্ষং কুসীদং তুর্যমুচ্যতে।
বার্তা চতুর্বিধা তত্র বয়ং গোবৃত্তয়োঽনিশম্॥ (ভা. ১০।২৪।২১)

'বৈশ্যগণের বৃত্তি চারপ্রকারের—কৃষি, বাণিজ্য, গো-রক্ষা এবং সুদগ্রহণ। এই চারটির মধ্যে আমরা সর্বদা গো-পালনই করে এসেছি।'

শূদ্র সম্বন্ধে ভগবান বলেছেন—চারবর্ণের লোকের সেবা করা, সেবার সামগ্রী প্রস্তুত করা এবং চারবর্ণের কাজে যাতে কোনো বাধা না আসে সকলে যাতে সুখে-আরামে থাকে সেই ভাবনাতে নিজ শক্তি, সামর্থ্য, যোগ্যতা দ্বারা সকলের কাজে ব্যাপৃত থাকাই শূদ্রর স্বভাবজ কর্ম।

এখানে একটি সংশয় থাকতে পারে যে শূদ্রদের মধ্যে তমোগুণের আধিক্য থাকায় তাদের মধ্যে অজ্ঞান, প্রমাদ, আলস্য, নিদ্রা, অপ্রকাশ, অপ্রবৃত্তি ও মোহ আদি সাতটি দোষ প্রবলভাবে থাকার সম্ভাবনা (গীতা

১৪।৮, ১৭)। কিন্তু সেবা অতি উচ্চ ব্যাপার তাই ইহা তমোগুণসম্পন্ন শূদ্রদের দ্বারা কীভাবে হওয়া সম্ভব? এর উত্তর হল শূদ্রদের বিবেকবোধ সুপ্ত থাকায়, তাদের পক্ষে সেবাকার্য—যেখানে চিন্তা শক্তির প্রাধান্য থাকে না, তাই হয় স্বভাবজ। সংস্কৃতে সেবাপরায়ণ ব্যক্তিকে বলা হয় '**কিংকর**' অর্থাৎ তারা সব সময় বলে '**কিং করোমি**' বা কী করব—এই আদেশের অপেক্ষায় থাকে। তাই শূদ্রদের পরিচর্যাত্মক বা সেবামূলক কর্ম স্বাভাবিক কর্ম।

মনুস্মৃতি শাস্ত্রে উপরোক্ত স্বধর্ম ছাড়াও বর্ণানুযায়ী নিম্নলিখিত জীবিকামূলক ও কর্তব্যমূলক কর্ম উল্লিখিত আছে।

ব্রাহ্মণ—'**অধ্যাপনমধ্যয়নং যজনং যাজনং তথা।**
দানং প্রতিগ্রহং চৈব ব্রাহ্মণানামকল্পয়ৎ॥' (মনুস্মৃতি ১।৮৮)

এর মধ্যে অধ্যাপন, যজ্ঞ করানো ও দানগ্রহণ—এই তিনটি কর্ম হল জীবিকার এবং অধ্যয়ন, যজ্ঞ করা ও দান করা এই তিনটি কর্তব্যকর্ম। এই ছয়টি শাস্ত্র নির্দিষ্ট কর্ম ও গীতায় উক্ত শম-দমাদি নয়টি স্বভাবজ কর্ম হল ব্রাহ্মণের স্বকর্ম।

ক্ষত্রিয়—'**প্রজানাং রক্ষণং দানমিজ্যাধ্যয়নমেব চ।**
বিষয়েস্বপ্রসক্তিশ্চ ক্ষত্রিয়স্য সমাসতঃ॥' (মনুস্মৃতি ১।৮৯)

ক্ষত্রিয়ের পাঁচটি কর্মের কথা বলা হয়েছে। যথা—প্রজাপালন ও রক্ষা হল জীবিকা এবং চারটি কর্তব্যকর্ম—দান করা, যজ্ঞ করা, অধ্যয়ন এবং বিষয়ে অনাসক্তি। এইগুলি সহ গীতায় উক্ত শৌর্য, তেজাদি স্বভাবজ কর্ম ক্ষত্রিয়র স্বধর্ম।

বৈশ্য—'**পশূনাং রক্ষণং দানমিজ্যাধ্যয়নমেব চ।**
বণিক্‌পথং কুসীদং চ বৈশ্যস্য কৃষিমেব চ॥' (মনুস্মৃতি ১।৯০)

বৈশ্যরা গীতায় উল্লিখিত কৃষি, গোরক্ষা, বাণিজ্য এবং সুদগ্রহণ ইত্যাদি জীবিকা এবং যজ্ঞ, অধ্যয়ন ও দান ইত্যাদি কর্তব্যকর্ম করবে।

শূদ্র—'**একমেব তু শূদ্রস্য প্রভুঃ কর্ম সমাদিশৎ।**
এতেষামেব বর্ণানাং শুশ্রূষামনসূয়য়া॥' (মনুস্মৃতি ১।৯১)

শূদ্রের জীবিকা ও স্বধর্ম উভয়ই সেবামূলক কার্য।

স্বধর্মানুযায়ী কর্ম—(শ্লোক ৪৫-৪৮)

পরবর্তী চার শ্লোকে ভগবান স্বভাবজ বা স্বধর্মানুযায়ী কর্মের প্রয়োজনীয়তা, বিধি ও ফল বলেছেন।

> **স্বে স্বে কর্মণ্যভিরতঃ সংসিদ্ধিং লভতে নরঃ।**
> **স্বকর্মনিরতঃ সিদ্ধিং যথা বিন্দতি তচ্ছৃণু॥**
> **যতঃ প্রবৃত্তির্ভূতানাং যেন সর্বমিদং ততম্।**
> **স্বকর্মণা তমভ্যর্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ॥**
> **শ্রেয়ান্ স্বধর্মো বিগুণঃ পরধর্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।**
> **স্বভাবনিয়তং কর্ম কুর্বন্নাপ্নোতি কিল্বিষম্॥**
> **সহজং কর্ম কৌন্তেয় সদোষমপি ন ত্যজেৎ।**
> **সর্বারম্ভা হি দোষেণ ধূমেনাগ্নিরিবাবৃতাঃ॥**
>
> (গীতা ১৮।৪৫-৪৮)

'নিজ নিজ কর্মে তৎপর ব্যক্তি সিদ্ধিলাভ (পরমাত্মা লাভ) করে। স্বকর্মে নিরত ব্যক্তি কিভাবে সিদ্ধিলাভ করে তা পরবর্তী শ্লোকে বলা হয়েছে।

যে ভগবান হতে জীবসমূহের উৎপত্তি এবং যিনি এই চরাচরে ব্যাপ্ত তাঁকেই নিজকর্ম দ্বারা পূজা করলে, মানুষ সিদ্ধিলাভ করে।

সম্যকভাবে সু অনুষ্ঠিত পরধর্ম অপেক্ষা গুণরহিত নিজ ধর্ম শ্রেষ্ঠ। কারণ স্বভাবজাত স্বধর্ম করলে মানুষ পাপভাগী হয় না।

তাই স্বভাবজ কর্ম দোষযুক্ত হলেও ত্যাগ করা উচিত নয়। কেননা যেমন ধোঁয়া দ্বারা অগ্নি আবৃত থাকে, তেমনি সমস্ত কর্মই কোনো না কোনো দোষযুক্ত।' (গীতা ১৮।৪৫-৪৮)

এখানে **'স্বে স্বে কর্মণি'**র অর্থ হচ্ছে মানুষ স্বাভাবিকভাবে যে প্রকৃতি বা স্বভাব পায়, সেই প্রবাহরূপে স্বতঃই প্রাপ্ত কর্ম, রাগ-দ্বেষ ও ফলেচ্ছা বর্জনপূর্বক ক্রিয়ারূপে করলে 'কর্মের বেগ' প্রশমিত হয় ও নতুন বেগ উৎপন্ন হয় না। আর নিজ স্বাভাবিক কর্ম শুধুমাত্র অপরের হিতার্থে তৎপরতা ও উৎসাহপূর্বক করলে মনে যে প্রশান্তি আসে তাকে বলে **অভিরতি**। আর আকাঙ্ক্ষা বা কিছু পাওয়ার জন্য কর্ম করলে তাকে বলে 'আসক্তি'।

অভিরতিতে মানুষের কল্যাণ হয় এবং আসক্তিতে বন্ধন হয়। ভগবান তাই বলেছেন **'ন কর্মস্বনুষজ্যতে'** (গীতা ৬।৪) অর্থাৎ কোনো কর্মে বা কর্মফলে আসক্ত হবে না।

সিদ্ধিলাভের উপায় হিসাবে ভগবান পরের শ্লোকে বলেছেন **'স্বকর্মণা তমভ্যর্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ'**। অর্থাৎ উপরোক্তভাবে কর্মদ্বারা ভগবানকে অর্চনা করলেই ভগবৎ লাভ হয়। শাস্ত্রে মানুষের জন্য বর্ণ ও আশ্রম অনুযায়ী যেসব কর্তব্যকর্ম বলা হয়েছে সবই সংসাররূপ পরমাত্মার পূজার জন্য। তবে লৌকিক ও পারমার্থিক কর্মের দ্বারা পরমাত্মার পূজা করলেও তাতে মমত্ব রাখা উচিত নয়, কারণ আসক্ত বস্তুর দ্বারা ক্রিয়াদি অপবিত্র হয়ে ওঠে ও তা পূজাসামগ্রী হয় না (যেমন অপবিত্র ফুল ও ফল ভগবানে নিবেদন করা যায় না)।

কর্মযোগে কর্মের দ্বারা জড়ের আসক্তি ত্যাগ হয় **'যোগিনঃ কর্ম কুর্বন্তি সঙ্গং ত্যক্ত্বাত্মশুদ্ধয়ে'** (গীতা ৫।১১)। কর্মযোগী তাঁর শরীর, ইন্দ্রিয়াদি, মন, বুদ্ধি ইত্যাদি দ্বারা স্বার্থ, অহংকার, কামনা ত্যাগ করে নিজে জগতের সেবায় ব্যাপৃত থাকেন। এতে বস্তুর ওপর থেকে আপনবোধ দূর হয় এবং অনাসক্তি বোধ প্রবল হয়।

জ্ঞানযোগী বিচার-বিবেচনা পূর্বক জড়ত্ব ত্যাগ করেন এবং তিনি **'মুক্তসঙ্গোঽনহংবাদী'** (গীতা ১৮।২৬) অর্থাৎ আসক্তিরহিত ও অহংকার বর্জিত হন।

ভক্তেরও স্বাভাবিক বর্ণ ও আশ্রম অনুযায়ী খাওয়াদাওয়া আদি লৌকিক কাজ-কর্মাদি এবং জপ ধ্যান, সৎসঙ্গ-স্বাধ্যায় ইত্যাদি পারমার্থিক ক্রিয়াদিও (অনন্যভাবে ভগবানে শরণাগত হওয়ার ফলে) ভগবানে সমর্পিত হয়। তাঁদের লৌকিক ও পারমার্থিক ক্রিয়াগুলি বাহ্যত পৃথক হলেও প্রকৃতপক্ষে তাতে কোনো পার্থক্য থাকে না, সবই ভগবতময়। তিনি **'সঙ্গবর্জিত'** (গীতা ১১।৫৫) অর্থাৎ সর্বত্র আসক্তিশূন্য হন।

অর্থাৎ কর্মযোগী, জ্ঞানযোগী ও ভক্তিযোগী সকল সাধনমার্গীই আসক্তিশূন্য হন। আর এই ভাব নিয়ে কর্ম করায় কর্মযোগীর **'যজ্ঞায়াচরতঃ**

কর্ম সমগ্রং প্রবিলীয়তে' (গীতা ৪।২৩) অর্থাৎ তাঁর সমগ্র কর্মবন্ধন নষ্ট হয়ে যায় অর্থাৎ ফলদায়ক হয় না। জ্ঞানযোগীর ক্ষেত্রে 'জ্ঞানাগ্নিঃ সর্বকর্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে যথা' (গীতা ৪।৩৭) অর্থাৎ জ্ঞানরূপ অগ্নি সমস্ত কর্মকেই দগ্ধ করে দেয়। তৎপরে ভগবানের কৃপায় তাঁদের মধ্যে প্রেম প্রকাশ পায়। ফলত কর্মযোগী ও জ্ঞানযোগী শেষকালে উভয়েই এক হয়ে ভক্তিযোগীই হন।

ভগবান অতঃপর স্বধর্মের প্রশংসা করেছেন। এখানে স্বধর্ম দ্বারা প্রধানত বর্ণ-ধর্মই ধরা হয়েছে। তাৎপর্য হল এই যে, বর্তমান বর্ণে জন্মগ্রহণ করার আগে পূর্বের জন্মগুলিতে সেই জীবের যেমন কর্ম ও গুণ ছিল সেই গুণ ও কর্ম অনুসারে তার বর্তমান বর্ণে জন্ম হয়েছে। অর্থাৎ তার পূর্ব পূর্ব জন্মকৃত স্বভাব অনুযায়ী জন্ম ও বর্ণ প্রাপ্ত হয়। কর্ম সমাপ্ত হলেও গুণরূপে তার সংস্কার থেকে যায়। আর এই সংস্কার অনুযায়ী তার আচরণ উৎপন্ন হওয়ায় এইসব বর্ণ-ধর্ম পালনে তাকে বিশেষ পরিশ্রম করতে হয় না, তাই এগুলিকে তার স্বভাবজ ও স্বভাব নির্দিষ্ট কর্ম বলা হয়।

শাস্ত্রে দুই প্রকার কর্মের কথা বলা হয়েছে—বিহিত কর্ম ও নিষিদ্ধ কর্ম। বিহিত কর্ম করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং নিষিদ্ধ কর্ম করতে নিষেধ আছে। ব্রাহ্মণের শম, দমাদি যদিও তার স্বভাবজ ধর্ম কিন্তু তা সাধারণ ধর্ম হওয়ায়, চারবর্ণের কাছেই স্বধর্ম। দৈবীসম্পদের যত সগুণ-সদাচার আছে তা সবই সব বর্ণেরই স্বধর্ম এবং আসুরীসম্পদের যত দুর্গুণ-দুরাচার, এগুলি কেবল পরধর্ম নয় ইহা সব বর্ণেরই নিষিদ্ধ কর্ম। এই বিহিত কর্মের বা শাস্ত্র নির্দিষ্ট কর্মের মধ্যে যা স্বভাব অনুসারী তাকেই স্বধর্ম বা স্বভাবজ কর্ম বলে।

ভগবান বলছেন এই স্বভাবজাত কর্ম করলে কোনো পাপ হয় না। **'স্বভাবনিয়তং কর্ম কুর্বন্নাপ্নোতি কিল্বিষম্'** (গীতা ১৮।৪৭)। ভগবান আগেও বলেছেন—**'শারীরং কেবলং কর্ম কুর্বন্নাপ্নোতি কিল্বিষম্'** (গীতা ৪।২১)। আসক্তিরহিত ব্যক্তি শরীর নির্বাহের জন্য যে কর্ম করে তাতে তার পাপ হয় না।

বিহিত কর্ম স্বভাবজ হলেও তা তখনই দোষের হয় যদি তাতে কামনা, সুখবুদ্ধি ও ভোগবাসনা থাকে। কারণ দোষ হওয়া বা না হওয়া নির্ভর করে কর্তার উদ্দেশ্যের উপর। আসলে বিহিত কর্ম কঠিন বলে মনে হয় যদি নিষিদ্ধ কর্মে আসক্তি জন্মায় বা নিষিদ্ধ কর্ম ভোগ করে। বাস্তবে নিজ নিজ স্বভাব অনুযায়ী বিহিত কর্ম সহজ ও স্বাভাবিক, পরিশ্রম সাধ্য নয়।

ভগবান ছেচল্লিশতম শ্লোকের দ্বিতীয় পংক্তিতে বলেছেন **'স্বকর্মণা তমভ্যর্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ'**। কিন্তু এই বিহিত কর্ম দ্বারা ভগবানের অর্চনা কীভাবে করবে ? ভাগবত বলছেন—ভগবানের অসংখ্য অবতারের মধ্যে জগৎ-সংসারই ভগবানের বিগ্রহ বা প্রথম অবতার। **'আদ্যোঽবতারঃ পুরুষঃ পরস্য'** (ভাগবত ২।৬।৪১) এইরূপ ভগবানকে কীভাবে সেবা করবে—

১) আমরা মূর্তিতে ভগবৎ পূজন করি, পুষ্প-চন্দন সাজাই তখন কিন্তু আমরা ভাবদ্বারা ভগবানেরই পূজা করি, মূর্তির নয়, সেইরকম আমরা যখন প্রতিটি ক্রিয়াদ্বারা সংসাররূপ জগতের সেবা করি তখন কিন্তু মনের ভাব হওয়া উচিত ভগবানের পূজা করছি, জগতের নয়।

২) পূজার প্রকৃত ভাব হল সব কিছু ভগবানের ও ভগবানের জন্য। গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজার মতো বলতে হয় **'গোবিন্দ তুভ্যম্ বস্তু তুভ্যম্ সমর্পয়ে'** অর্থাৎ গোবিন্দ তোমার জিনিস তোমাকেই সমর্পন করলাম। আর এই ভাব থাকলে স্বার্থবুদ্ধি, ভোগের ইচ্ছা, কিছু পাওয়ার ইচ্ছা দূর হয়। আর নিজ শক্তি-সামর্থ্যকেও ভগবানের দান মনে করলে, সমস্ত কর্মের থেকে নিজ কর্তৃত্বও দূর হয়। এর ফলে ভগবৎ উপলব্ধি সহজ হয়।

৩) প্রকৃতপক্ষে 'শ্রদ্ধার সঙ্গে করা সকল কার্যই ভগবানের পূজা' এই ভাবনায় কাজ করলে মনের ভ্রম দূর হয়। জগতের সকল কার্যের মধ্যে ভগবানকে রাখবে কিন্তু ভগবৎ চিন্তার সময় জগতকে রাখবে না। যেমন পুষ্পান্ন, ডাল, ব্যঞ্জনাদিতে ঘৃত দিলে তা উৎকৃষ্ট হয় কিন্তু ঘৃতে ডাল দিলে তা নষ্ট হয়ে যায়।

৪) প্রকৃতপক্ষে একদৃষ্টিতে মূর্তিপূজার থেকে মানুষের বা সর্বপ্রাণীর

সেবা বিশেষ মূল্যবান, কেননা মূর্তিপূজা করলে মূর্তির প্রসন্নরূপ দেখা যায় না, কিন্তু প্রাণীর সেবা করলে তাদের প্রসন্ন বা সুখীভাব প্রত্যক্ষ করা যায়।

৫) ভাগবতে ভগবান বলেছেন—

নরেষ্বভীক্ষ্ণং মদ্ভাবং পুংসো ভাবয়তোঽচিরাৎ।

স্পর্ধাসূয়াতিরস্কারাঃ সাহঙ্কারা বিয়ন্তি হি।। (ভা. ১১।২৯।১৫)

ভক্ত যখন সমস্ত স্ত্রী-পুরুষে নিরন্তর আমার ভাবই প্রত্যক্ষ করেন, তখন অচিরাৎ তাঁর চিত্ত থেকে ঈর্ষা, দোষ দৃষ্টি, সঙ্কোচ, ভয় এবং অহংকারাদি দোষ দূর হয়ে যায়।

তাই সর্বপ্রাণীকে অনাসক্তভাবে কর্ম (নিজশক্তি দ্বারা) ও বস্তু (অর্থ ও অন্যদ্রব্য) দ্বারা সেবা করলে, জগৎ-সংসার অবলোকন লুপ্ত হয়ে যায় ও সম্মুখে ভগবানই বিরাজ করেন।

মহাপ্রভু রঘুনাথ দাসকে (শান্তিপুরে) বলেছেন—

'যথাযোগ্য বিষয়ভুঞ্জ অনাসক্ত হইয়া'

আসক্তিসহ কর্ম করলে অনুকূল পরিস্থিতি (বা ফলের) সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপিত হয়। অনাসক্তভাবে কর্ম করলে কারোর সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপিত হয় না। সাধক যদি জগৎকে নিজের মনে না করে জগৎরূপে দেখেন তবে তিনি জগৎ-সংসারের সেবা করেন এবং সংসারের থেকে তাঁর সম্পর্ক ছিন্ন হয় (কর্মযোগ)।

আর যদি তিনি জগৎ-সংসারকে ভগবৎরূপে দেখেন তবে ভগবানের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন হয় (ভক্তিযোগ)। আর নিজের জন্য কর্ম করলে কেবল বন্ধনই হয়।

এখানে বর্ণ, কর্ম ও জন্ম সম্বন্ধে বলা যায় যে, স্থূল শরীরের দৃষ্টিতে জাগতিক কর্মাদি অর্থাৎ ভোজন, বিবাহ, সন্তান ইত্যাদি বর্ণ বা জাতি অনুযায়ী বিচার করে এবং পারমার্থিক দৃষ্টিতে সৎসঙ্গ, স্বাধ্যায়, জপ, ধ্যান, কীর্তনাদি, ভগবৎ সম্বন্ধীয় কাজ সাধারণ ধর্ম বা লক্ষণ দিয়ে বিচার করতে হবে।

নীচ বর্ণের উচ্চাবস্থা—

যদি পারমার্থিক কাজে কোনো ব্যক্তির লক্ষণ অন্য লক্ষণের সঙ্গে মেলে

তবে তাকে সেই বর্ণের বলে জানবে। ভাগবতে নীচ বর্ণের পারমার্থিক ভাব সম্বন্ধে বলা হয়েছে—

১) মাতা দেবাহুতি পুত্র কপিলকে বলছেন—

অহো বত শ্বপচোঽতো গরীয়ান্ যজ্জিহ্বাগ্রে বর্ততে নাম তুভ্যম্।
তেপুস্তপস্তে জুহুবুঃ সস্নুরার্যা ব্রহ্মানূচুর্নাম গৃণন্তি যে তে॥

(ভা. ৩।৩৩।৭)

'বড়ই আশ্চর্যের বিষয় যে, কোনো লোক তোমার নাম উচ্চারণ করলেই তার তপস্যা, হোম, তীর্থাদি স্নান, বেদাধ্যয়ন প্রভৃতি সকল সম্পন্ন হয়। অতএব যার জিহ্বাগ্রে তোমার নাম বিদ্যমান, তিনি অতি অধম অন্ত্যজ হলেও অত্যন্ত পূজ্য হয়ে থাকেন।'

২) শ্রীনৃসিংহদেব হিরণ্যকশিপুর বক্ষোবিদারণের পরে প্রহ্লাদ জোড়হাতে স্তুতি করে বলছেন—হে প্রভো ! ভগবদ্ভক্তজনবিমুখ অথচ সর্বগুণ বিভূষিত দ্বাদশ গুণযুক্ত ব্রাহ্মণ অপেক্ষা ভগবদ্ভক্তপরায়ণ চণ্ডালও শ্রেষ্ঠ। আমি এই বাক্য গুরুমুখ হতে অবগত আছি বলেই অসুরযোনি হলেও আপনার কৃপালাভে অগ্রসর হতে ভীত হইনি।

৩) দেবর্ষি নারদ প্রহ্লাদ চরিত্র বর্ণনা করে যুধিষ্ঠিরকে বলছেন—

যস্য যল্লক্ষণং প্রোক্তং পুংসো বর্ণাভিব্যঞ্জকম্।
যদন্যত্রাপি দৃশ্যেত তৎ তেনৈব বিনির্দিশেৎ॥

(ভাগবত ৭।১১।৩৫)

'কোনো বর্ণ-নির্দিষ্ট ব্যক্তির যদি অন্য বর্ণের লক্ষণের সঙ্গে মেলে তবে তাকে সেই বর্ণের বলেই জানতে হবে।'

উচ্চ বর্ণের নীচাবস্থা—

১) মহাভারতে যুধিষ্ঠির-নহুষ সংবাদে বলা হয়েছে—

শূদ্রে তু যদ্ ভবেল্লক্ষ্ম দ্বিজে তচ্চ ন বিদ্যতে।
ন বৈ শূদ্রো ভবেচ্ছূদ্রো ব্রাহ্মণো ন চ ব্রাহ্মণঃ॥

(মহাভারত, বনপর্ব ১৮০।২৫)

'যে শূদ্র আচার-আচরণে শ্রেষ্ঠ তাকে শুদ্র বলে মানা উচিত নয়, এবং

যে ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণোচিত আচার-আচরণ বর্জিত তাকে ব্রাহ্মণ বলেও মানা উচিত নয় অর্থাৎ আচারে গুণ-কর্মই প্রাধান্য পাবে, জন্ম নয়।'

২) চাণ্ডালোঽপি মুনেঃ শ্রেষ্ঠো বিষ্ণুভক্তিপরায়ণঃ।
বিষ্ণুভক্তিবিহীনস্তু দ্বিজোঽপি শ্বপচোঽধমঃ॥ (পদ্মপুরাণ)

'হরিভক্তিতে লীন চণ্ডাল মুনিদের থেকেও শ্রেষ্ঠ এবং হরিভক্তিরহিত ব্রাহ্মণ চণ্ডালেরও অধম।'

সাংখ্যযোগের সাধন ও অধিকারী—(শ্লোক ৪৯-৫৩)

পরবর্তী চারটি শ্লোকে ভগবান সাংখ্যযোগীর সাধন ও সাংখ্যযোগের অধিকারীদের বিষয় বলেছেন।

অসক্তবুদ্ধিঃ সর্বত্র জিতাত্মা বিগতস্পৃহঃ।
নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধিং পরমাং সন্ন্যাসেনাধিগচ্ছতি॥
সিদ্ধিং প্রাপ্তো যথা ব্রহ্ম তথাপ্নোতি নিবোধ মে।
সমাসেনৈব কৌন্তেয় নিষ্ঠা জ্ঞানস্য যা পরা॥
বুদ্ধ্যা বিশুদ্ধয়া যুক্তো ধৃত্যাত্মানং নিয়ম্য চ।
শব্দাদীন্ বিষয়াংস্ত্যক্ত্বা রাগদ্বেষৌ ব্যুদস্য চ॥
বিবিক্তসেবী লঘ্বাশী যতবাক্কায়মানসঃ।
ধ্যানযোগপরো নিত্যং বৈরাগ্যং সমুপাশ্রিতঃ॥
অহঙ্কারং বলং দর্পং কামং ক্রোধং পরিগ্রহম্।
বিমুচ্য নির্মমঃ শান্তো ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে॥
(গীতা ১৮।৪৯-৫৩)

'ভগবান অর্জুনকে বলছেন—যে সাংখ্যযোগীর শরীর বশীভূত, মন স্পৃহাশূন্য, বুদ্ধি সর্ববিষয়ে আসক্তিশূন্য, তিনিই কর্মবন্ধন থেকে মুক্তি (নৈষ্কর্ম সিদ্ধি) লাভ করেন।

শুদ্ধচিত্ত সাধক নিম্নলিখিত সাধন দ্বারা ব্রহ্ম প্রাপ্ত হন—সাত্ত্বিক বুদ্ধি, বৈরাগ্য অবলম্বন, একান্তে অবস্থান, মিতাহারী, ধৈর্য সহকারে ইন্দ্রিয়দমন, শরীর-বাক্য-মন বশীভূত করা, শব্দাদি বিষয় ত্যাগ, রাগ-দ্বেষ বর্জন, নিত্য-নিরন্তর ধ্যান, অহংকার বল, কাম, ক্রোধ, পরিগ্রহ পরিত্যাগ এবং

মমত্ব-বুদ্ধি ত্যাগ ও প্রশান্ত চিত্তে স্থিতি।' (গীতা ১৮।৪৯-৫৩)

সাংখ্যযোগের অধিকারী—

ভগবান এই প্রকরণে সাংখ্যযোগের অধিকারীদের কুড়িটি লক্ষণের কথা বলেছেন—

১. **অসক্তবুদ্ধিঃ সর্বত্র**—যার বুদ্ধি সর্ববিষয়ে অর্থাৎ দেশ, কাল, ঘটনা, বস্তু, ব্যক্তি বা ক্রিয়া কিছুতেই লিপ্ত বা আসক্ত হয় না।

২. **জিতাত্মা**— যিনি শরীরকে বা আলস্য, প্রমাদাদিকে জয় করেছেন অর্থাৎ তিনি কাজ সিদ্ধান্তমতো করতে চাইলে শরীর তৎপরতার সঙ্গে তাতে যুক্ত হয় বা কোন ঘটনা বা ক্রিয়া হতে দূরে থাকতে চাইলে শরীর অবলীলায় তার থেকে দূরে থাকে।

৩. **বিগতস্পৃহ**— জীবনধারণের জন্য যা কিছু বিশেষ প্রয়োজন তাকে বলে 'স্পৃহা'। সাংখ্যযোগের সাধকদের এই প্রয়োজনীয় জীবননির্বাহের বস্তুর প্রতি বিন্দুমাত্র চিন্তা থাকে না।

৪. **বুদ্ধ্যা বিশুদ্ধয়া**—তাদের সাত্ত্বিক বুদ্ধি প্রবল হয়। সাংখ্যযোগীর বিচারশক্তির বিশেষ প্রয়োজন তাই বিশুদ্ধ বুদ্ধি-বিবেকের কথাই প্রথমে বলা হয়েছে।

৫. **ধৃত্যাত্মানং নিয়ম্য চ**— জাগতিক যত প্রলোভনই আসুক না কেন তাঁর মন-বুদ্ধি পরমাত্মতত্ত্বের থেকে বিচলিত হয় না। অষ্টপ্রহর তাদের এই চিন্তা থাকে, সাধনার বিরুদ্ধ কোনো কাজ যেন ইন্দ্রিয়াদির দ্বারা না হয়।

৬. **শব্দাদীন্ বিষয়াংস্ত্যক্ত্বা**—যা হতে সংযোগজনিত সুখ হয় যথা শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ তা স্বরূপত পরিত্যাগ করা উচিত। আসক্তি সহকারে বিষয়ভোগ করলে, ধ্যানে বৃত্তি লাগে না ও বিষয়-চিন্তা হতে থাকে।

৭. **রাগদ্বেষৌ ব্যুদস্য চ**—জাগতিক বস্তুগুলি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, নিজের কাজের অত্যন্ত উপযোগী—এই মনোভাবই হল রাগ বা আসক্তি। আর এগুলির প্রাপ্তিতে কেউ বাধা প্রদান করলে হয় দ্বেষ। জগতের সঙ্গে সম্পর্ক কেবল আসক্তি বা দ্বেষপূর্বক চিন্তার মাধ্যমেই তৈরি হয় তাই সাধকের কখনো রাগ বা দ্বেষ করা উচিত নয়।

৮. **বিবিক্তসেবী**—সাংখ্যযোগীর স্বভাব স্বতঃই একান্তভাবে থাকার হয়ে থাকে। অবশ্য তাদের একান্তে থাকার প্রতি রুচি থাকলেও আগ্রহ থাকে না অর্থাৎ নির্জন স্থান না পেলেও তাদের মনে বিক্ষেপ বা চাঞ্চল্য আসে না, যা ধ্যানযোগের বাধাস্বরূপ।

৯. **লঘ্বাশী**—সাংখ্যযোগীর সাধক পরিমিত ও নিয়মিত ভোজন করেন। তাঁরা আহারে হিত, মিত ও মেধ্য মেনে চলেন। হিত মানে শরীরের অনুকূল, মিত মানে যতটুকু দরকার ততটুকুই এবং মেধ্য মানে আহার্য বস্তু যেন পবিত্র হয়।

১০. **যতবাক্কায়মানসঃ**—শরীর, বাক্য ও মনকে বশীভূত করা অর্থাৎ অনাবশ্যক কথা না বলা, অসত্য না বলা, নিন্দা-কুৎসা না করা, আসক্তিপূর্বক সংসারের চিন্তা না করা ও পরমাত্মাকে সতত চিন্তা করা —সাংখ্যযোগী সাধকের এইসব অবশ্য প্রয়োজন।

১১. **ধ্যানযোগপরো নিত্যম্**—সাধক নিত্য ধ্যানপরায়ণ হবেন, অর্থাৎ ধ্যানের সময় তো ধ্যান করবেনই, অন্য কাজের সময় যেমন খাওয়া, শোওয়া, চলা-ফেরা ইত্যাদির সময়ও যেন ধ্যানভাব বজায় থাকে অর্থাৎ প্রকৃতপক্ষে পরমাত্মা ভিন্ন যেন আর কোনো চিন্তা না থাকে।

১২. **বৈরাগ্যং সমুপাশ্রিতঃ**—সাংসারিক ব্যক্তির যেমন বস্তু বা ব্যক্তির প্রতি আসক্তি থাকে এবং সেগুলিকেই আশ্রয় ও ভরসা বলে মনে করে, সাংখ্যযোগী কিন্তু তার বিপরীত অর্থাৎ সমস্ত লৌকিক বা পারলৌকিক ভোগের প্রতি দৃঢ় বৈরাগ্য অবলম্বন করেন।

১৩-১৮. **অহংকার, বলং, দর্পং, কাম, ক্রোধ, পরিগ্রহ বিমুচ্য**—অন্যদের থেকে নিজেকে এক বিশেষভাবে দেখা হল অহংকার। জোর করে ইচ্ছা পূর্ণ করার যে আগ্রহ তা হল জেদ। জমি-বাড়ি-বাহ্যবস্তুর অধিকারের ফলে জন্মে দর্প। ভোগ্য অনুকূল বস্তু লাভ ও প্রতিকূল বস্তু প্রাপ্ত না হওয়ার ইচ্ছা হল কাম। স্বার্থ ও অহং-এ আঘাত লাগলে অন্যকে অনিষ্ট করার ইচ্ছার জন্য যে জ্বালা তা হল ক্রোধ। ভোগ-বুদ্ধিতে ভোগ বা আরামের বস্তুর সংগ্রহ হল পরিগ্রহ। ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থী ও সন্ন্যাসী তো অবশ্যই পরিগ্রহ

ত্যাগ করবেন আর গৃহস্থ কেবল অন্যের সেবা ও হিতার্থে সংগ্রহ করবেন। জ্ঞানমার্গী উপরোক্ত সমস্ত গুণ সমন্বিত স্বভাব স্বতঃই ত্যাগ করে থাকেন।

১৯. **নির্মম**—জীবিকানির্বাহের সামগ্রী জাগতিক বস্তু বা কর্ম করার সামগ্রী শরীর-ইন্দ্রিয়াদিতে মমত্ববোধ বা আপনবোধ না রেখে সেগুলি চিরকালের জন্য নয়—এরূপ ভাবাই হল নির্মম।

২০. **শান্ত**—জগতের সঙ্গে সম্পর্ক রাখলেই অশান্তি। রাগ-দ্বেষ সহকারে উহাদের চিন্তা না করলেই মানুষ শান্ত হয়। এইরূপে অসৎ-এর সঙ্গে সম্পর্ক সর্বতোভাব পরিত্যাগী ব্যক্তি, মমত্বহীন ও শান্ত হওয়ায় পরমাত্মা প্রাপ্তিতে সমর্থ হন।

ভক্তিযোগ—(শ্লোক ৫৪-৬০)

পরাভক্তি কীভাবে লাভ হয় ও তার ফল—(শ্লোক ৫৪-৫৫)

ভগবান সাংখ্যযোগ দ্বারা ব্রহ্মভূত (বা ব্রহ্মভাব) প্রাপ্ত হওয়ার কথা বলে পরবর্তী দুই শ্লোকে ব্রহ্মভূত অবস্থা থেকে পরাভক্তি লাভের কথা বলেছেন—

ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
সমঃ সর্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্।।
ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ।
ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্।।

(গীতা ১৮।৫৪-৫৫)

'ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হলে সাধক শোকও করেন না, কিছু আকাঙ্ক্ষাও করেন না। এইরূপ সর্বভূতে সমদর্শী সাধক আমার পরাভক্তি লাভ করেন।

এই পরাভক্তি প্রাপ্ত হলে সাধক আমাকে স্বরূপত জানতে পারেন—আমি কে এবং আমার স্বরূপ কী ? আমাকে তত্ত্বত জেনে তাঁরা আমাতেই প্রবেশ করেন।' (গীতা ১৮।৫৪-৫৫)

আগের শ্লোকে ভগবান সাংখ্যযোগীকে ব্রহ্মভূত অর্থাৎ ব্রহ্মলাভের অধিকারী বলেছেন। আর এই অবস্থায় 'আমিই ব্রহ্মস্বরূপ' ও 'ব্রহ্মই আমার স্বরূপ' এই উপলব্ধি হয়ে থাকে। কামনা উৎপন্ন হলেই চিত্তের শান্তি নষ্ট হয়

ও চঞ্চলতা আসে। ব্রহ্মভূত সাধকের পার্থিব বস্তুতে কামনা না থাকায় চিত্তে স্বতঃই প্রসন্নতা আসে, তাই তিনি শোকও করেন না বা বিশেষ কোনো পরিস্থিতি লাভের ইচ্ছাও করেন না।

ব্রহ্মভূত সাধক এইভাবে হর্ষশোকাদির থেকে দ্বন্দ্বরহিত হয়ে পরমাত্মার সঙ্গে স্বাভাবিক অভিন্নতা বোধ করেন। তখন তাঁর নিজের আর কোনো ব্যক্তিত্ব (অহংবোধ) থাকে না। ব্যক্তিত্ব তাকেই বলে যখন মানুষ নিজ সত্ত্বাকে অন্যের থেকে ভিন্ন বলে মনে করে এবং তার ফলে বন্ধন হয়। তখন পরমাত্মা যেমন সর্বপ্রাণীতে সম—**'সমোহহং সর্বভূতেষু'** (গীতা ৯।২৯), তেমনি সাধকও সর্বপ্রাণীতে সম হয়ে থাকেন। আর পরমাত্মাতেও অভিন্নতা অনুভবের ফলে সাধকের ভগবানের প্রতি, প্রতি মুহূর্তে বর্ধমান আকর্ষণ ও অনুরাগ জন্মায় তাকেই পরাভক্তি বলে।

দেবর্ষি নারদ এই পরাভক্তি সম্বন্ধে বলেছেন—

'গুণরহিতং কামনারহিতং প্রতিক্ষণবর্ধমানমবিচ্ছিন্নং সূক্ষ্মতরমনুভবরূপম্' (নারদভক্তিসূত্র ৫৪)

এই প্রেম গুণরহিত, কামনারহিত, প্রতিক্ষণ বর্ধমান, বিচ্ছেদরহিত, সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম এবং অনুভবরূপ। বিনা প্রেমে ভগবৎ অনুভব হয় না আর সাধন বিনা প্রেমও হয় না। আর এই সাধন ও প্রেমলাভ মায়ামুগ্ধ জীবের সাধ্যাতীত এবং ইহা কেবল ভগবৎকৃপা সাপেক্ষ।

অস্তি (বা সৎ) রূপে ভগবানের সত্ত্বা সর্বত্র বিরাজিত, চিৎরূপ তাঁর স্বরূপভূত জ্ঞানও স্বপ্রকাশ, কিন্তু আনন্দরূপ ভগবৎপ্রেম তাঁর গুপ্তধনের ভাণ্ডার। তা সকলকে ভগবান দেন না। **'মুক্তিং দদাতি কর্হিচিৎ ন ভক্তিযোগং।'**

সংসারের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপিত হলেই মন অশান্ত হয়। তাই কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগ মার্গে ভগবান পরম প্রাপ্তির পথ নির্দেশ করেছেন।

১. **কর্মযোগ**—কর্মযোগ দ্বারা সংসার থেকে সম্পর্কচ্যুত (ফলের আশা ও কর্তৃত্বাভিমান ত্যাগ) হলে শান্তি-আনন্দ লাভ হয়।

কর্মজং বুদ্ধিযুক্তা হি ফলং ত্যক্তা মনীষিণঃ।
জন্মবন্ধবিনির্মুক্তাঃ পদং গচ্ছন্ত্যনাময়ম্।। (গীতা ২।৫১)

যোগবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ কর্মফল পরিত্যাগ করে এবং জন্মবন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে অনাময় পদ লাভ করেন।

২. **জ্ঞানযোগ**—জ্ঞানযোগ দ্বারা আপন স্বরূপে স্থিত হলে অখণ্ড-আনন্দ লাভ হয়।

যোঽন্তঃসুখোঽন্তরারামস্তথান্তর্জ্যোতিরেব যঃ।
স যোগী ব্রহ্মনির্বাণং ব্রহ্মভূতোঽধিগচ্ছতি।। (গীতা ৫।২৪)

'যে মানুষ অন্তরাত্মাতেই সুখযুক্ত, আত্মারাম এবং আত্মাতেই জ্ঞানযুক্ত সেই জ্ঞানযোগী নির্বাণ ব্রহ্ম প্রাপ্ত হন।' (গীতা ৫।২৪)

৩. **ভক্তিযোগ**—ভক্তিযোগে ভগবানের সঙ্গে অভিন্ন সম্পর্ক স্থাপন হলে প্রেম বা পরম আনন্দ বা অনন্ত-আনন্দ লাভ হয়।

অষ্টাদশ অধ্যায়ের পঞ্চান্নতম শ্লোকে অর্থাৎ এই প্রকরণের অন্তিম শ্লোকে ভগবান বলছেন—জ্ঞানমার্গীদের প্রেমভক্তি লাভ হলে তাঁকে তত্ত্বত জানা (তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা) এবং তাঁতে প্রবিষ্ট হওয়া (বিশতে) এই দুইই লাভ হয় কিন্তু ভগবানের দর্শন লাভ হয় না এবং তাঁদের তাঁকে দর্শনের আকাঙ্ক্ষাও থাকে না। আর ভক্তিমার্গের সাধকদের প্রেমভক্তি লাভ হলে তাঁদের সম্বন্ধে ভগবান একাদশ অধ্যায়ের চুয়ান্নতম শ্লোকে বলছেন—

ভক্ত্যা ত্বনন্যয়া শক্য অহমেবংবিধোঽর্জুন।
জ্ঞাতুং দ্রষ্টুঞ্চ তত্ত্বেন প্রবেষ্টুঞ্চ পরন্তপ।।

ভক্তিমার্গের সাধকদের তত্ত্বত জানা (জ্ঞাতুং), প্রবেশ করা (প্রবেষ্টুম্) তো হয়ই উপরোক্ত ভগবদ্দর্শন (দ্রষ্টুম্)ও হয়ে থাকে।

প্রেমের দুইরকম অবস্থা হয়—

১) কখনো ভক্ত প্রেমে ডুবে যান এবং তখন প্রেমিক এবং প্রেমাস্পদ আর দুজন থাকে না, এক হয়ে যান।

২) কখনো ভক্তর মধ্যে উচ্ছলতা আসে, তখন প্রেমিক ও প্রেমাস্পদ এক হয়েও লীলার জন্য দুইরূপ ধারণ করেন।

এখানে প্রথমটির (শ্লোক ১৮।৫৫) জন্য 'বিশতে' ও পরেরটির (শ্লোক ১১।৫৪) জন্য 'দ্রষ্টুম্' পদটি ব্যবহার করা হয়েছে।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের মধ্যলীলায় 'মহাপ্রভু-রায় রামানন্দ সংবাদ'-এ সাধ্য-সাধন তত্ত্ব বর্ণিত হয়েছে। সাধ্যতত্ত্বর বর্ণনার শেষে রামানন্দ প্রেমভক্তি লাভের কথা বললেন—

এই প্রেমার অনুরূপ না পারে ভজিতে।
অতএব ঋণী হয় কহে ভাগবতে॥

মহাপ্রভু বলছেন—

প্রভু কহে এই সাধ্যাবধি সুনিশ্চয়।
কৃপা করি কহ যদি আগে কিছু হয়॥

রামানন্দ উত্তর দিলেন—

ইহার মধ্যে রাধার প্রেম সাধ্য শিরোমণি।
যাঁহার মহিমা সর্বশাস্ত্রেতে ব্যাখানি॥

কিন্তু মহাপ্রভু ভগবত তত্ত্বের শেষ সীমা নির্ধারণের জন্য পুনরায় প্রশ্ন করলেন—প্রভু কহে 'এহ হয় আগে কহো আর'।

তখন রায় রামানন্দ অদ্বৈত তত্ত্বর ওপর স্বরচিত এক গীত গাইলেন আর প্রভু তা প্রকাশে নিষেধ করলেন।

গীত–এত কহি আপনকৃত গীত এক গাইল।
প্রেমে প্রভু সহস্তে তার মুখ আচ্ছাদিল॥

পহিলহি রাগ নয়নভঙ্গ ভেল।
অনুদিন বাঢ়ল—অবধি না গেল॥
ন সো রমণ ন হাম রমণী।
দুঁহু মন মনোভব পেষল জানি॥

রাধিকা বলছেন—দর্শনের পূর্বেই শ্রীকৃষ্ণে তাঁর প্রীতির উদয় হয়েছিল, পরে দৃষ্টি বিনিময় হয় এবং এই অঙ্কুরিত পূর্বরাগ দিন দিন বেড়েই চলে, তার সীমা নেই। শ্রীকৃষ্ণ তখন আর রমন-স্বরূপ নন আর আমিও রমণী-স্বরূপ নই। সেই প্রেম তাঁহার ও আমার মনকে যেন পেষণ করে অভিন্ন করেছে।

প্রভু কহে সাধ্যবস্তু-অবধি এই হয়।
তোমার প্রসাদে ইহা জানিল নিশ্চয়॥

রামানন্দ বললেন—

রায় কহে ইহা আমি কিছুই না জানি।
যে তুমি কহাও সেই কই আমি বাণী॥

শরণাগতির ফল—(শ্লোক ৫৬-৫৭, ৬১-৬২)

পরবর্তী কয়েকটি শ্লোকে ভগবান শরণাগতির বিষয়ে বলেছেন—

সর্বকর্মাণ্যপি সদা কুর্বাণো মদ্ব্যপাশ্রয়ঃ।
মৎপ্রসাদাদবাপ্নোতি শাশ্বতং পদমব্যয়ম্॥
চেতসা সর্বকর্মাণি ময়ি সন্ন্যস্য মৎপরঃ।
বুদ্ধিযোগমুপাশ্রিত্য মচ্চিত্তঃ সততং ভব॥

(গীতা ১৮।৫৬-৫৭)

ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জুন তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ন্ সর্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া॥
তমেব শরণং গচ্ছ সর্বভাবেন ভারত।
তৎ প্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্স্যসি শাশ্বতম্॥

(গীতা ১৮।৬১-৬২)

'আমার আশ্রয় গ্রহণকারী ভক্ত সর্বদা সর্বকর্ম করলেও আমার কৃপায় শাশ্বত অবিনাশী পদ লাভ করে।

অতএব মনে মনে সমস্ত কর্ম আমাতে অর্পণ করে মৎপরায়ণ হয়ে, সমবুদ্ধি অবলম্বন করে, নিরন্তর আমাতে নিবিষ্ট চিত্ত হও। (গীতা ৫৬-৫৭)

ঈশ্বর সমস্ত প্রাণীর হৃদয়ে অধিষ্ঠিত থাকেন এবং নিজ মায়াদ্বারা শরীররূপী যন্ত্রে আরূঢ় হয়ে সমস্ত প্রাণীকে তাদের স্বভাব অনুসারে পরিভ্রমণ করান।

তাই সর্বতোভাবে ঈশ্বরেরই শরণ গ্রহণ করা উচিত। তাঁর কৃপায় পরম শান্তি ও অবিনাশী পরমপদ প্রাপ্তি সম্ভব।' (গীতা ১৮।৬১-৬২)

জ্ঞানযোগীদের জন্য ভগবান বলেছেন যদি তাঁরা সমস্ত বিষয়-আশয়,

অহংবোধ, মমত্ব, কাম, ক্রোধ ইত্যাদি পরিত্যাগ করে নিত্য ধ্যানপরায়ণ হন, তবেই তাঁরা ব্রহ্মলাভের উপযুক্ত হন (গীতা ১৮।৫১, ৫২, ৫৩)।

আর শরণাগতির প্রথম শ্লোকে (শ্লোক ৫৬) ভগবান বলেছেন **'মদ্ব্যপাশ্রয়'** অর্থাৎ ভগবানের সঙ্গে সম্পর্কের প্রাধান্যের কথা, আর পরের শ্লোকে (শ্লোক ৫৭) বলেছেন **'বুদ্ধিযোগমুপাশ্রিত্য'** অর্থাৎ জড় সংসার থেকে বিচ্ছিন্নতার প্রাধান্যের কথা।

ভগবান ভগবৎ পদাশ্রয় ভক্তদের সম্পর্কে বলেছেন যে—যিনি কর্মের, কর্মফলের, পরিস্থিতি বা ব্যক্তির আশ্রয়ে না থেকে কেবলমাত্র ভগবানের আশ্রয়ে থাকেন তিনি নিজ বর্ণ-আশ্রম অনুযায়ী বিহিত, লৌকিক, পারলৌকিক, সামাজিক, শারীরিক সকল কর্ম করেও ভগবানের পরমপদ প্রাপ্ত হন। কারণ—**'মদ্প্রসাদাদবাপ্নোতি শাশ্বতং পদমব্যয়ম্'**। তাঁর প্রসাদেই শাশ্বত পদ লাভ হয়।

অর্থাৎ নিজের কর্মের দ্বারা, পুরুষার্থ দ্বারা বা সাধনার দ্বারা স্বতঃসিদ্ধভাবে এই পরমপদ লাভ করা যায় না। শুধুমাত্র ভগবদ্কৃপাতেই পরমপদ লাভ সম্ভব। একেই ভক্তিমার্গে পরমধাম, বৈকুণ্ঠ, গোলক এবং জ্ঞানমার্গে বিদেহ, কৈবল্য, মুক্তি, স্বরূপস্থিতি ইত্যাদি বলে। এই শ্লোকে (শ্লোক ৫৭) ভগবান শরণাগতির চারটি লক্ষণ বলেছেন—

১. **চেতসা সর্বকর্মাণি ময়ি সন্ন্যস্য**—অর্থাৎ মনে মনে সমস্ত কর্ম ভগবানে সমর্পণ করা। এর অর্থ হল যে দৃঢ়তার সঙ্গে মেনে নেওয়া যে মন, ইন্দ্রিয়াদি, শরীর, ব্যক্তি, পদার্থ, পরিস্থিতি সবই ভগবানের। এইগুলির সদ্ব্যবহারের জন্যই ভগবান আমাদের শুধু ব্যক্তিগত অধিকার প্রদান করেছেন। এই অধিকারও ভগবানে সমর্পণ করতে হয়।

২. **মৎপর**—ভগবানই পরম আশ্রয়। তিনি ছাড়া সাধকের কিছু পাওয়ারও নেই, করারও নেই। এইরূপ অনন্যভাবই হল মৎপর। আসলে অর্থ-সম্পদ, আত্মীয়-স্বজন ইত্যাদিকে নিজের মনে করা এবং আমি এদের প্রভু এই ভাব নিয়ে থাকাই হল ভ্রম। যে ব্যক্তি কোনো বস্তু বা ব্যক্তিকে নিজের বলে মনে করে, সে সেই বস্তু বা ব্যক্তি বিনা থাকতে

পারে না এবং সেই বস্তুই তার ওপর আধিপত্য বিস্তার করে ; তা শরীরই হোক, বিদ্যা-বুদ্ধি হোক বা আত্মীয়-কুটুম্বই হোক। এদের অধীন হওয়াই পরাধীনতা বা অন্যাশ্রয়।

৩. **বুদ্ধিযোগমুপাশ্রিত্য**—শরণাগত ভক্ত হবে সমবুদ্ধিসম্পন্ন। গীতায় সমত্ববুদ্ধির অত্যন্ত মহিমা গীত হয়েছে। মানুষ ধ্যানী, যোগী বা ভক্ত সবই হতে পারেন কিন্তু সমত্ববোধ না থাকলে ভগবান তাঁকে পূর্ণ বলে মনে করেন না। এই সমত্ববোধই ভগবানের আরাধনা—

'সমত্বমারাধানমচ্যুতস্য' (বিষ্ণুপুরাণ ১।১৭।৯০)

৪. **মচ্চিত্তঃ সততং ভব**—যিনি সর্বতোভাবে নিজেকে ভগবানের পাদপদ্মে সমর্পণ করেন, তাঁর চিত্তে ভগবান সততই বিরাজ করেন। সততং-এর অর্থ হল সাধক সাংসারিক যে কোনো কাজই করুক না কেন তার চিত্ত সেই সব কাজে জড়িয়ে পড়ে না। সাধক জাগতিক বস্তু, পদার্থাদির ব্যবহারে কঠোরতা রাখবেন অর্থাৎ অনাসক্ত থাকবেন কিন্তু ভগবদ্নাম জপ, কীর্তন, ভগবদ্‌কথা, চিন্তনাদি, ভগবদ্ সম্পর্কীয় কার্যে কোমল থাকবেন অর্থাৎ চিত্তকে ব্যাপৃত রাখবেন।

'কাঠিন্যং বিষয়ে কুর্যাদ্ দ্রবত্বং ভগবৎপদে।
উপায়ৈঃ শাস্ত্রনির্দিষ্টৈরনুক্ষণমতো বুধঃ॥' (ভক্তিরসায়ন ১।৩২)

শরণাগতির লক্ষণ সম্বন্ধে বলা হয়েছে—

আনুকুল্যস্য সঙ্কল্পং প্রতিকুল্যস্য বর্জনম্।
রক্ষয়সিতি বিশ্বাসো গোপৃত্বে বরণং তথা॥
আত্মনিক্ষেপ কার্পণ্যং ষড়বিধা শরণাগতি॥ (হরিভক্তিবিলাস ১১।৪১৭)

আনুকূল্যের সংকল্প অর্থাৎ ভগবদ্ভজনের কর্তব্যের নিয়মালম্বন, তদ্বিপরীত কর্ম পরিত্যাগ, পতিত্বের প্রার্থনা, আত্মসমর্পণ অর্থাৎ আমাকে রক্ষা করুন এইরূপ আর্ত ভাব এবং ভগবান আমার রক্ষাকর্তা এই বলে বিশ্বাস—এই ছয়টি শরণাগতের লক্ষণ।

পূর্ণ শরণাগতি হলে অর্থাৎ সকল কর্ম ভগবানে সমর্পণ করে ভগবদ্‌পরায়ণ হলে ভগবদ্‌প্রেম উৎপন্ন হয়। এই অবস্থায় চারটি চিত্তবৃত্তি হয়—

১. **নিত্যযোগে যোগ**—শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণের মিলন।

২. **নিত্যযোগে বিয়োগ**—রাধাকৃষ্ণের মিলনের সময়ও রাধার এইরূপ ভাব থাকে যে এই বুঝি শ্রীকৃষ্ণ কোথায় গেল। তিনি বলে ওঠেন প্রিয়তম তুমি কোথায় !

৩. **বিয়োগে নিত্যযোগ**—শ্যামসুন্দর কাছে নেই তাই মনে মনে তাঁর জন্য গভীর চিন্তা হচ্ছে আবার মনে প্রত্যক্ষ মিলন হচ্ছে।

৪. **বিয়োগে বিয়োগ**—শ্যামসুন্দর অল্পক্ষণের জন্য অন্তর্হিত হয়েছেন অথচ মনে হচ্ছে অনন্তকাল শ্যামসুন্দরকে দেখতে পাইনি। কি করি, কোথা যাই, তাকে কোথা পাই—এই ভাব।

প্রকৃতপক্ষে এই চারপ্রকার অবস্থাতেই ভগবানের সঙ্গে নিত্যযোগ বজায় থাকে, বিচ্ছেদ কখনো হয় না, হওয়া সম্ভবই নয়। এই প্রেম নিত্য বর্ধমান এবং প্রেমের আদান-প্রদানের জন্যই ভক্ত ও ভগবানের সংযোগ ও বিয়োগ লীলা সংঘটিত হয়। যোগ বিয়োগের ফলে প্রেমরস বৃদ্ধি পায়। সর্বত্রই যদি যোগ থাকে, বিয়োগ (বিচ্ছেদ) না থাকে তবে প্রেমরস বৃদ্ধি পায় না, প্রত্যুত তা অখণ্ডরসে পরিণত হয়। তাই প্রেমরস বর্ধিত করার জন্যই ভগবান নিজেকে অন্তর্ধান করে থাকেন।

অদ্বৈতভাব একটি তত্ত্ব যাকে বলে **'অভেদ'** আর দুটি হয়েও এক থাকাকে বলে **'অভিন্নতা'**। এই অভিন্নতা যত গভীর হয় ততই মাধুর্য রস প্রকট হয়। এই হল প্রেম-রস। ভগবানও এই প্রেম-রস লোভী। এই প্রেমরস আস্বাদনের জন্যই তাঁর এক থেকে বহুরূপ ধারণ ।

'একাকী ন রমতে' (বৃ. ১।৪।৩)

'সদৈক্ষত বহু স্যাং প্রজায়েয়েতি' (ছা. ৬।২।৩)

এই প্রকরণের পরবর্তী অংশে ভগবান প্রথমে শরীরারূঢ় জীবের (বদ্ধজীবের) বদ্ধাবস্থা এবং পরে তা দূর করার উপায় বর্ণনা করেছেন।

শরীরের তিনটি ভাগ। স্থূল-শরীর কর্ম করে, সূক্ষ্ম-শরীর নির্দেশ দেয় আর স্বভাব (বা সংস্কার যা কারণ-শরীরে থাকে) তা পরিচালনা করে এবং তাই স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীরে প্রকটিত হয়।

এই অংশের একষষ্টিতম শ্লোকে শরীরারূঢ় জীবের সম্বন্ধে ভগবান তিনটি বাক্য বলেছেন।

যন্ত্রারূঢ়ানি—যতক্ষণ জীব শরীররূপী যন্ত্রকে 'আমি' ও 'আমার' এই বোধে বরণ করে, ততক্ষণই ভগবান তাকে তার স্বভাব—যা প্রকৃতির বশীভূত, সেই অনুসারে তাকে চালনা করেন।

যেমন কেউ যদি যন্ত্রচালিত রেলগাড়িতে ওঠে তবে সে ট্রেনের সঙ্গে যেতে বাধ্য। কিন্তু যখন সে ট্রেন থেকে নেমে পড়ে তখন তাকে আর ট্রেনের চলার অনুসারে চলতে হয় না। সেইরকম মানুষও যতক্ষণ 'আমি' ও 'আমার' বোধে শরীরকে আকড়ে ধরে, ততক্ষণই সে স্বভাবের বশে থেকে জন্ম-মরণ চক্রে আবর্তিত হতে থাকে। এই 'আমি' ও 'আমার' বোধই 'রাগ-দ্বেষ' উৎপন্নের কারণ এবং এরজন্যই স্বভাব অশুদ্ধ হয় এবং মানুষ স্বভাব বা প্রকৃতির বশীভূত হয়। কিন্তু শরীরের প্রতি 'আমি' বা 'আমার' বোধ না থাকলে শরীরের সঙ্গে সম্পর্ক সর্বতোভাবে ছিন্ন হয় এবং স্বভাব রাগ-দ্বেষ রহিত হয় অর্থাৎ মানুষের আর প্রকৃতির বশ্যতা থাকে না। আর তখনই ঈশ্বরের মায়া আর তাকে যন্ত্রের মতো সঞ্চালিত করতে পারে না।

হৃদ্দেশে তিষ্ঠতি—অর্থাৎ শরীরকে ভগবান পরিচালনা করেন হৃৎদেশ থেকে। পঞ্চদশ অধ্যায়েও ভগবান বলেছেন—

'সর্বস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টঃ' (গীতা ১৫।১৫)

মানে ভগবান সর্বত্র পূর্ণ হলেও হৃদয়েই সদা প্রাপ্ত হন। যেমন পৃথিবীর সর্বত্র জল থাকলেও কুয়োতে তা পাওয়া যায়, সেইরূপ ভগবান মানুষের হৃদয়ে বা ভাবদ্বারাই প্রাপ্ত হন।

ভ্রাময়ন্ সর্বভূতানি—সাধক রামপ্রসাদ বলেছেন—

আমি যন্ত্র তুমি যন্ত্রী আমি ঘর তুমি ঘরণী
আমি রথ তুমি রথী যেমন চালাও তেমনি চলি
তোমার কর্ম তুমি করো মা লোকে বলে করি আমি।

এইসব বাক্যে মনে হয় ভগবানই যখন আসল সঞ্চালক, আসল নিয়ন্তা এবং যন্ত্রারূঢ় হওয়ায় আমরা যন্ত্রের দাস ; তখন দৈব, পুরুষকার এসব

কথা আসে কেন ? এর ব্যাখ্যা হল যন্ত্র চলে তার স্বভাব অনুযায়ী। কোনো যন্ত্র বাষ্প তৈরি করে (হিটার), অন্য যন্ত্রে জল বরফ হয় (ফ্রিজ), একযন্ত্রে ঘর গরম হয় তো আর এক যন্ত্রে ঘর ঠাণ্ডা হয়। কোনো যন্ত্র ঘর আলোকিত করে আবার কোনো যন্ত্রে পাখা চলে। কিন্তু সকল যন্ত্রেরই মূল চালিকা শক্তি হল বিদ্যুৎশক্তি যার সাহায্যে যন্ত্র চলে, কিন্তু কোন্ যন্ত্রে কী উৎপাদন হচ্ছে তা যন্ত্রের নিজস্ব বৃত্তি। চালিকাশক্তি বিদ্যুতের সে সম্বন্ধে কোনো আগ্রহ থাকে না। সেইরকম মানুষ, পশু, পাখি, দেবতা, যক্ষ, রাক্ষস সবই শরীররূপ যন্ত্রে আরূঢ় থাকে ও সেগুলিকে সঞ্চালিত করেন ঈশ্বর। তবে এই সব শরীর তাদের কর্মের অনুপ্রেরণা পায় তাদের স্বভাব অনুযায়ী (যতক্ষণ তার প্রকৃতি বশ্যতা থাকে) আর ভগবান কেবল কর্মফল অনুযায়ী অনুকূল-প্রতিকূল পরিস্থিতি সৃষ্টি করেন।

এষ হ্যেব সাধু কর্ম কারয়তি তং যমেভ্যো লোকেভ্য উন্নিনীষত। এষ হ্যেবাসাধু কর্ম কারয়তি তং যমধো নিনীষতে॥

(কৌষীতকিব্রাহ্মণোপনিষদ্ ৩।৮)

ভালো স্বভাবের (সজ্জন) ব্যক্তিদ্বারা ভালো কাজ হয় আর মন্দ স্বভাবের (দুষ্ট) ব্যক্তিদ্বারা অসৎ কাজ হয়।

বিদ্যুৎ যেমন যন্ত্রের স্বভাব অনুযায়ী তাকে চালায়, সেইরকম ঈশ্বরও মানুষ বা জীবের স্বভাব অনুযায়ী তাকে সঞ্চালন করেন। এটি হল জাগতিক মানুষের কথা। তবে উল্লেখনীয় যে, স্বভাব শোধরাতে বা উন্নত করতে অথবা খারাপ করতে মানুষ যেরূপ স্বাধীন আর কোনো জীব সেরূপ নয়। তাই এই অমূল্য দেহ লাভ করে স্বাধীনতার সদ্ব্যবহার করে স্বভাব শুদ্ধ করার বা অপব্যবহার করে স্বভাব নষ্ট করার মূল হেতু মানুষ নিজেই। আর মানুষ শরীরের আশ্রয় ত্যাগ করে ভগবানের শরণাগত হলে, ভগবান তাঁদের বিশেষভাবে অনুগ্রহ করেন **'বিশেষানুগ্রহশ্চ'** (ব্রহ্মসূত্র ৩।৪।৪৮)। তাঁদের অহংভাব না থাকায় তাঁরা যা কিছু করেন সবই ভগবানের প্রেরণা অনুসারে করেন। শরণাগত ভক্ত ভগবানকে নিজের মনে করলে এবং নিজের মধ্যে ভগবান দেখলে তাঁর সঙ্গে

তাদের অভিন্ন ভাব হয় এবং এর ফলে প্রেম প্রকট হয়।

ভগবান পরের শ্লোকে জীবের শরীরারূঢ় অবস্থা দূর করার কথা বলেছেন—

'ত্বমেব শরণং গচ্ছ সর্বভাবেন'—ভগবানে সর্বভাবে শরণাগত হওয়ার অর্থ হল শরীরের সঙ্গে একাত্ম না হয়ে ভগবানের সঙ্গে একাত্ম হওয়া। আর একাত্ম হওয়ার অর্থ হল মনে মনে পরমাত্মার কথা চিন্তা করা, প্রেমপূর্বক তাঁরই ভজনা করা এবং তাঁর প্রত্যেক বিধান—তা তার শরীর, মন, ইন্দ্রিয়ের অনুকূলই হোক বা প্রতিকূলই হোক, প্রসন্নতাপূর্বক মেনে নেওয়া।

তৎপ্রসাদাৎপরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্স্যসি শাশ্বতম্—এখানে **'পরাং শান্তি'** হল শরীরের সঙ্গে বা সংসারের সঙ্গে সর্বতোভাবে আসক্তি ত্যাগ করা আর 'শাশ্বত স্থান' হল তাঁর 'পরম পদ'—যা কেবল তাঁর কৃপাতেই লাভ হয়।

অ-শরণাগতির ফল—(শ্লোক ৫৮-৬০)

শরণাগতি বর্ণনার মাঝে ভগবান অর্জুনকে অ-শরণাগতির ফল সম্বন্ধেও বলেছেন কারণ যারা প্রকৃতির বশ, স্বভাবই তাদের নিয়ন্তা হয়।

মচ্চিত্তঃ সর্বদুর্গাণি মৎপ্রসাদাৎ তরিষ্যসি।
অথ চেত্ত্বমহঙ্কারান্ ন শ্রোষ্যসি বিনঙ্ক্ষ্যসি॥
যদহঙ্কারমাশ্রিত্য ন যোৎস্য ইতি মন্যসে।
মিথ্যৈষ ব্যবসায়স্তে প্রকৃতিস্ত্বাং নিযোক্ষ্যতি॥
স্বভাবজেন কৌন্তেয় নিবদ্ধঃ স্বেন কর্মণা।
কর্তুং নেচ্ছসি যন্মোহাৎ করিষ্যস্যবশোঽপি তৎ॥

(গীতা ১৮।৫৮-৬০)

'মদগতচিত্ত হলে আমার কৃপায় সমস্ত বিঘ্ন থেকে উত্তীর্ণ হবে আর যদি অহংকারবশত তুমি আমার কথা না শোনো তবে তোমার পতন হবে।

যদিও অহংকারবশ হয়ে তুমি মনে করছ তুমি যুদ্ধ করবে না, কিন্তু তোমার চিন্তা মিথ্যায় পরিণত হবে কেননা তোমার ক্ষত্রিয় স্বভাবই তোমাকে যুদ্ধে উদ্বুদ্ধ করাবে।

আর যেহেতু তুমি স্বভাবজ কর্মদ্বারা বাঁধা হয়ে আছ তাই তুমি মোহবশত যা করতে চাইছ না ওইরূপ কর্ম বাধ্য হয়েই করবে।' (গীতা ১৮।৫৮-৬০)

জাগতিক সংসারে থাকলে, পারমার্থিক সাধনায় বিঘ্ন এবং ভগবৎপ্রাপ্তিতে বাধাপ্রাপ্তির সম্ভাবনা থাকে তাই ভগবান উপায় বলেছেন—**'মৎপ্রসাদাৎ তরিষ্যসি'** (গীতা ১৮।৫৮) অর্থাৎ আমার কৃপায় সাধনার বিঘ্ন দূর হয়, আর **'মদপ্রসাদাদবাপ্নোতি'** (গীতা ১৮।৫৬), আমার কৃপায় পরমপদ লাভ হয়। ভগবানের কৃপায় যে শক্তি থাকে, সে শক্তি কোনো সাধনাতেই নেই। ভগবানের শরণাগত হলে কী হয় তা ভাগবতে নবযোগীদের অন্যতম 'চমস' ঋষি, নিমি রাজাকে বলছেন—

দেবর্ষিভূতাপ্তনৃণাং পিতৃণাং ন কিঙ্করো নায়মৃণী চ রাজন্।
সর্বাত্মনা যঃ শরণং শরণ্যং গতো মুকুন্দং পরিহৃত্য কর্তম্॥

(ভাগবত ১১।৫।৪১)

'যিনি সমস্ত কার্য পরিত্যাগ করে সম্পূর্ণরূপে ভগবানের শরণাগত হন, তিনি দেব, ঋষি, প্রাণী, প্রতিপাল্য আত্মীয়স্বজন, পিতৃপুরুষ কারোরই ঋণী বা সেবক থাকেন না।'

স্বপাদমূলং ভজতঃ প্রিয়স্য ত্যক্তান্যভাবস্য হরিঃ পরেশঃ।
বিকর্ম যচ্চোৎপতিতং কথঞ্চিদ্ ধুনোতি সর্বং হৃদি সন্নিবিষ্টঃ॥

(ভাগবত ১১।৫।৪২)

আর সেই শরণাগত ভক্ত যিনি ভগবানের চরণে অনন্যভাবে সেবা করেন, তাঁর যদি অকস্মাৎ কোনো পাপকর্ম ঘটে যায় তবে তাঁর হৃদয়ে বিরাজমান শ্রীহরি সেই পাপকর্ম সর্বতোভাবে নাশ করেন।

ব্রহ্মাদি দেবগণ কংস-কারাগারে কৃষ্ণকে স্তুতিপূর্বক বলছেন—

তথা ন তে মাধব তাবকাঃ ক্বচিদ্ ভ্রশ্যন্তি মার্গাত্ত্বয়ি বদ্ধসৌহৃদাঃ।
ত্বয়াভিগুপ্তা বিচরন্তি নির্ভয়া বিনায়কানীকপমূর্ধসু প্রভো॥

(ভাগবত ১০।২।৩৩)

'হে মাধব ! ভক্তিশূন্য ব্যক্তিরা নিজ সাধনপথ বা সিদ্ধাবস্থা থেকে কখনো যদি বা বিচ্যুত হন, কিন্তু আপনার চরণাশ্রিত (শরণাগত) ভক্তগণ

কখনই নিজ সাধনপথ থেকে বিচ্যুত হন না। আপনি তাঁহাদিগকে সর্বদা রক্ষা করেন যাতে তারা সর্ববিধ বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করে আপনার শ্রীচরণ লাভ করতে পারে।' আবার অশরণাগতদের সম্বন্ধে স্তুতিতে আরও বলছেন—

যেঽন্যেঽরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিনস্ত্বয্যস্তভাবাদবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ।
আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ পতন্ত্যধোঽনাদৃতযুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ॥

(ভাগবত ১০।২।৩২)

'হে অরবিন্দাক্ষ ! যে সব ব্যক্তি আপনার শরণাগত নয় এবং ভক্তিরহিত তাদের বুদ্ধি শুদ্ধি হয় না এবং নিজেদের মুক্ত মনে করলেও প্রকৃতপক্ষে তারা বদ্ধই থাকে। সাধনার উচ্চপদে আরোহণ করলেও তাদের পতনই হয়।'

অর্জুন দ্বিতীয় অধ্যায়ে বলেছেন '**শিষ্যস্তেঽহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্**' (গীতা ২।৭)। অর্থাৎ আমি তোমার শরণাগত, আমায় শিক্ষা দাও। আবার তার পরপরই যুদ্ধের ভয়াবহতার কথা ভেবে বলছেন—'**ন যোৎস্যে**' অর্থাৎ 'আমি যুদ্ধ করব না' (গীতা ২।৯)।

ভগবান দেখলেন এতো প্রকৃত শরণাগতি নয়। এই শরণাগতি হল অহংকারে মোড়া। প্রকৃত শরণাগতি হলে আমি এটা করব না, ওটা করব না, বলে না। তখন সে জাগতিক বস্তুর ও কর্মের অধীন না হয়ে এদের থেকে সর্বতোভাবে স্বাধীন হয়ে ভগবানের অধীন হয়ে যান।

কিন্তু যিনি শরণাগত নন, অহংকার আশ্রিত তিনি বিনষ্ট হন (বিনঙ্ক্ষসি গীতা ১৮।৫৮) অর্থাৎ মৃত্যুর দিকে, মানে সংসারের পথে অগ্রসর হন **নিবর্তন্তে মৃত্যুসংসারবর্ত্মনি** (গীতা ৯।৩)।

ভগবান বদ্ধজীব সম্বন্ধে বলেছেন—'**স্বভাবজেন কৌন্তেয় নিবদ্ধঃ স্বেন কর্মণা**' অর্থাৎ এই প্রকার জীব নিজের স্বভাবজ কর্মদ্বারা বাঁধা।

স্বভাবজ কর্ম হল— জীবের পূর্ব পূর্ব জন্মপ্রাপ্ত গুণ ও কর্মাদির সংস্কার এবং এই জন্মে তার ওপর পিতা-মাতার প্রভাব, পরিবেশ, শিক্ষার এবং এ জন্মে যেমন কর্ম করা হয়েছে তার ফলে গড়ে ওঠা অভ্যাস থেকে প্রাপ্ত সংস্কার—এইসব মিলে গড়ে ওঠে স্বধর্ম। এই স্বধর্ম যদি শাস্ত্র-নির্দিষ্ট বা

নিষ্কামভাবে করা হয় তবে তা অন্য কর্মের থেকে শ্রেষ্ঠ।

শ্রেয়ান্ স্বধর্মো বিগুণঃ পরধর্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ। (গীতা ৩।৩৫, ১৮।৪৭)

আবার যিনি জীবন্মুক্ত মহাপুরুষ তার স্বভাব সর্বতোভাবে শুদ্ধ হয় কেননা তাঁর ওপর স্বভাবের আধিপত্য থাকে না অর্থাৎ তিনি স্বভাবের বশ হন না।

এখন বক্তব্য এই যে, যদি সকলের স্বভাবেরই প্রাধান্য বা বশ্যতা থাকে তাহলে শাস্ত্রবিধিহি বা কার ওপর জারি হবে, গুরুজনদের শিক্ষাই বা কোন্ কাজে আসবে এবং মানুষই বা কিভাবে দুর্গুণ-দুরাচার থেকে নিবৃত্ত হবে। এর উত্তর হল—মানুষ তার বর্ণোচিত স্বভাব ত্যাগ করতে না পারলেও, ভগবৎ প্রাপ্তির উদ্দেশ্য থাকলে তার স্বভাব ক্রমশ রাগ-দ্বেষ মুক্ত হয়ে নির্মল করতে পারে। ভগবান এই স্বভাব পরিবর্তনের দুটি পথ বলেছেন—কর্মযোগ ও ভক্তিযোগ।

কর্মযোগ—তৃতীয় অধ্যায়ে ভগবান বলেছেন—

ইন্দ্রিয়স্যেন্দ্রিয়স্যার্থে রাগদ্বেষৌ ব্যবস্থিতৌ।
তয়োর্ন বশমাগচ্ছেৎ তৌ হ্যস্য পরিপন্থিনৌ॥

(গীতা ৩।৩৪)

'প্রত্যেক ইন্দ্রিয়েরই বিষয়ের প্রতি রাগ ও দ্বেষ প্রচ্ছন্ন থাকে। এই দুটি মহাবিঘ্নকারক মহাশত্রু তাই এদের বশবর্তী হওয়া উচিত নয়।' মানুষ নিজের ইচ্ছে অনুযায়ী কর্ম করলে রাগ-দ্বেষ পুষ্টি লাভ করে আর সেইমতো স্বভাব গড়ে ওঠে। আর সিদ্ধান্ত অনুসারে (শাস্ত্রানুসারে) কর্ম করলে রাগ-দ্বেষ দূর হয় ও স্বভাবও সেই মতো উন্নত হয়।

ভক্তিযোগ—মানুষ যখন তার সকল মমত্বসম্পন্ন বস্তুসহ ভগবানের শরণাপন্ন হয়, তখন ভগবানের ইচ্ছা অনুসারেই তার কর্ম সম্পন্ন হয় এবং রাগ-দ্বেষ দূরীভূত হয়। ভগবান এখানে অষ্টাদশ অধ্যায়ের বাষট্টি শ্লোকে এই বিষয়ে বলেছেন—**তমেব শরণং গচ্ছ**। ভগবান বলেছেন—রাগ-দ্বেষ বশীভূত না হয়ে কার্য করা কর্মযোগ এবং এতে স্বভাব শুদ্ধ হয় (গীতা ৩।৩৪) এবং ভগবানে সর্বতোভাবে সমর্পিত হওয়া ভক্তিযোগ এবং

এতেও স্বভাব শুদ্ধ হয়, যা বলা হয়েছে বর্তমান শ্লোকে (গীতা ১৮।৬২)।

গীতার গুহ্যতত্ত্ব— (শ্লোক ৬৩-৬৬)

পরবর্তী চার শ্লোকে ভগবান গীতার গুহ্যরহস্য ব্যাখ্যা করেছেন।

ইতি তে জ্ঞানমাখ্যাতং গুহ্যাদ্ গুহ্যতরং ময়া।
বিমৃশ্যৈতদশেষেণ যথেচ্ছসি তথা কুরু॥
সর্বগুহ্যতমং ভূয়ঃ শৃণু মে পরমং বচঃ।
ইষ্টোঽসি মে দৃঢ়মিতি ততো বক্ষ্যামি তে হিতম্॥
মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে॥
সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বা সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥

(গীতা ১৮।৬৩-৬৬)

'গুহ্য হতে গুহ্যতর তত্ত্বজ্ঞান আমি তোমার কাছে বর্ণনা করেছি এখন তুমি বিশেষভাবে চিন্তা করে যেমন ইচ্ছা তেমন করো।

তুমি আমার অত্যন্ত প্রিয় বলে এখন আমি তোমাকে সর্বাপেক্ষা গুহ্যতম বাক্য বলছি।

আমি সত্য প্রতিজ্ঞা করে বলছি যদি তুমি আমার ভক্ত হও, আমাকে পূজা করো, আমাতে চিত্ত নিবেশ করো, আমাকে নমস্কার করো, তবে তুমি আমাকেই পাবে।

তুমি যদি সকল ধর্মের আশ্রয় ত্যাগ করে কেবল আমার আশ্রয় গ্রহণ করো তবে আমিই তোমাকে সমস্ত পাপ হতে মুক্ত করব। তোমার আর চিন্তার কারণ থাকবে না।' (গীতা ১৮।৬৩-৬৬)

গীতা একটি রহস্য শাস্ত্র যা মানুষকে নিগূঢ় ও উচ্চ পারমার্থিক রহস্যের সন্ধান দেয়। সমস্ত গীতাব্যাপী ভগবান গুহ্য সাধনের কথা বলে এই অধ্যায়ে পরম গুহ্য সাধনের রহস্য বলেছেন।

গুহ্য সাধন—বা কর্মযোগ দ্বারা পরমপদ প্রাপ্তি।

১) কর্মজং বুদ্ধিযুক্তা হি ফলং ত্যক্ত্বা মনীষিণঃ।
জন্মবন্ধবিনির্মুক্তাঃ পদং গচ্ছন্ত্যনাময়ম্॥
(গীতা ২।৫১)

যোগযুক্ত মানুষ কর্মফল ত্যাগ করে পরমপদ লাভ করে।

২) ন হি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহ বিদ্যতে।
তৎ স্বয়ং যোগসংসিদ্ধঃ কালেনাত্মনি বিন্দতি॥
(গীতা ৪।৩৮)

কর্মযোগী জ্ঞানকে আপনিই অন্তরে লাভ করেন।

৩) সন্ন্যাসস্তু মহাবাহো দুঃখমাপ্তুমযোগতঃ।
যোগযুক্তো মুনির্ব্রহ্ম নচিরেণাধিগচ্ছতি॥ (গীতা ৫।৬)

যোগযুক্ত মুনিগণ সহজেই পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হন।

৪) যুক্তঃ কর্মফলং ত্যক্ত্বা শান্তিমাপ্নোতি নৈষ্ঠিকীম্।
অযুক্তঃ কামকারেণ ফলে সক্তো নিবধ্যতে॥
(গীতা ৫।১২)

কর্মফল ত্যাগ করলে সদা বিরাজমান শান্তি পাওয়া যায়।

গুহ্যতর সাধন—জড়ত্বের (সংসারের) সঙ্গে সম্পর্ক বিচ্ছেদ।

গুহ্যতম সাধন—ভগবানের স্বরূপ প্রকটিত হওয়া।

১) অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোঽপি সন্।
প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া॥ (গীতা ৪।৬)

আমি প্রকৃতিকে অধীন করে যোগমায়া দ্বারা প্রকটিত হই।

২) ময়া ততমিদং সর্বং জগদব্যক্তমূর্তিনা।
মৎস্থানি সর্বভূতানি ন চাহং তেম্ববস্থিতঃ॥ (গীতা ৯।৪)

সমস্ত জগতে আমি ব্যাপ্তি স্বরূপে স্থিত হয়ে আছি।

৩) যস্মাৎ ক্ষরমতীতোঽহমক্ষরাদপি চোত্তমঃ।
অতোঽস্মি লোকে বেদে চ প্রথিতঃ পুরুষোত্তমঃ॥
(গীতা ১৫।১৮)

ক্ষরের অতীত, অক্ষরেরও উত্তম আমি সেই পুরুষোত্তম।

সর্বগুহ্যতম—ভগবানে শরণাগত হওয়া। (শ্লোক ৬৬)

১) সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বা সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥

সব ধর্মের আশ্রয় ত্যাগ করে আমার শরণ গ্রহণ করো।

পরমগুহ্যম্—গীতা যোগশাস্ত্র যাতে সমগ্র কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগের সাধনা বর্ণনা করা হয়েছে এবং এটি পরমগুহ্যতম।

য ইমং পরমং গুহ্যং মদ্ভক্তেষ্বভিধাস্যতি।
ভক্তিং ময়ি পরাং কৃত্বা মামেবৈষ্যত্যসংশয়ঃ॥

(গীতা ১৮।৬৮)

ব্যাসপ্রসাদাচ্ছ্রুতবানেতদ্ গুহ্যমহং পরম্।
যোগং যোগেশ্বরাৎ কৃষ্ণাৎ সাক্ষাৎ কথয়তঃ স্বয়ম্॥

(গীতা ১৮।৭৫)

(সঞ্জয় বলছেন) ব্যাসের কৃপায় আমি এই পরমগুহ্য তত্ত্ব সাক্ষাৎ যোগেশ্বর কৃষ্ণের কাছ থেকে শুনেছি।

ভক্তি—ভক্তির কথা ভগবান সমগ্র গীতাব্যাপী বলেছেন।

১) যোগিনামপি সর্বেষাং মদ্‌গতেনান্তরাত্মনা।
শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ॥

(গীতা ৬।৪৭)

সকল যোগীর মধ্যে ভক্তিযোগীই শ্রেষ্ঠ।

২) দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে॥

(গীতা ৭।১৪)

আমার শরণাগত ভক্তই আমার মায়া অতিক্রম করে।

৩) বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে।
বাসুদেবঃ সর্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্লভঃ॥ (গীতা ৭।১৯)

ভগবানের শরণাগত মাহাত্ম্য অতিশয় দুর্লভ।

৪) অনন্যচেতাঃ সততং যো মাং স্মরতি নিত্যশঃ।
তস্যাহং সুলভঃ পার্থ নিত্যযুক্তস্য যোগিনঃ॥ (গীতা ৮।১৪)

অনন্য ভক্তিতে আমি সুলভে প্রাপ্ত হই।

৫) পুরুষঃ স পরঃ পার্থ ভক্ত্যা লভ্যস্ত্বনন্যয়া।
যস্যান্তঃস্থানি ভূতানি যেন সর্বমিদং ততম্॥ (গীতা ৮।২২)

পরমপুরুষকে অনন্য ভক্তির সাহায্যেই লাভ করা যায়।

৬-৭) মহাত্মানস্তু মাং পার্থ দৈবীং প্রকৃতিমাশ্রিতাঃ।
ভজন্ত্যনন্যমনসো জ্ঞাত্বা ভূতাদিমব্যয়ম্॥
সততং কীর্তয়ন্তো মাং যতন্তশ্চ দৃঢ়ব্রতাঃ।
নমস্যন্তশ্চ মাং ভক্ত্যা নিত্যযুক্তা উপাসতে॥
(গীতা ৯।১৩-১৪)

দৈবীসম্পন্ন ভক্তগণ অনন্য মনে আমার ভজনা করেন এবং নিরন্তর আমার নাম ও গুণ কীর্তন করে আমার প্রেমে মজে থাকেন।

৮) পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি।
তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামি প্রযতাত্মনঃ॥

৯) যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
যৎ তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্॥

১০) শুভাশুভফলৈরেবং মোক্ষ্যসে কর্মবন্ধনৈঃ।
সন্ন্যাসযোগযুক্তাত্মা বিমুক্তো মামুপৈষ্যসি॥
(গীতা ৯।২৬-২৮)

ভক্তদের প্রেমপূর্বক অর্পিত ফল, জল, পুষ্পও আমি ভক্ষণ করি। তুমি যা করো, হোম, দান, তপস্যা সব আমাতে অর্পণ করো। সমস্ত কর্ম আমাতে অর্পণ করলে শুভাশুভ ফল থেকে মুক্ত হবে।

১১) অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্যুপাসতে।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্॥
(গীতা ৯।২২)

অনন্যভক্তের আমি যোগক্ষেম বহন করে থাকি।

১২) মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি যুক্ত্বৈবমাত্মানং মৎপরায়ণঃ॥ (গীতা ৯।৩৪)

আমাতে চিত্ত সমর্পিত হলে আমাকেই প্রাপ্ত হবে।

১৩) মচ্চিত্তা মদ্‌গতপ্রাণা বোধয়ন্তঃ পরস্পরম্।
কথয়ন্তশ্চ মাং নিত্যং তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ॥

১৪) তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্বকম্।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে॥

১৫) তেষামেবানুকম্পার্থমহমজ্ঞানজং তমঃ।
নাশয়াম্যাত্মভাবস্থো জ্ঞানদীপেন ভাস্বতা॥ (গীতা ১০।৯-১১)

সর্বপ্রকারে আমাতে চিত্ত রাখলে আমি তার অজ্ঞানতা দূর করে আমাকে প্রাপ্ত করাই।

১৬) ভক্ত্যা ত্বনন্যয়া শক্য অহমেবংবিধোঽর্জুন।
জ্ঞাতুং দ্রষ্টুঞ্চ তত্ত্বেন প্রবেষ্টুঞ্চ পরন্তপ॥ (গীতা ১১।৫৪)

অনন্য ভক্তি দ্বারাই আমাকে দেখা, জানা ও আমাতে প্রবেশ করা যায়।

১৭) মৎকর্মকৃন্মৎপরমো মদ্ভক্তঃ সঙ্গবর্জিতঃ।
নির্বৈরঃ সর্বভূতেষু যঃ স মামেতি পাণ্ডব॥ (গীতা ১১।৫৫)

আমার অনন্যভক্ত আমাকেই প্রাপ্ত হয়।

১৮) ময্যাবেশ্য মনো যে মাং নিত্যযুক্তা উপাসতে।
শ্রদ্ধয়া পরয়োপেতাস্তে মে যুক্ততমা মতাঃ॥ (গীতা ১২।২)

আমার ভজনাকারী ভক্তই উত্তম যোগী।

১৯) যে তু সর্বাণি কর্মাণি ময়ি সন্ন্যস্য মৎপরাঃ।
অনন্যেনৈব যোগেন মাং ধ্যায়ন্ত উপাসতে॥
(গীতা ১২।৬)

যে সমস্ত কর্ম আমাকে সমর্পণ করে তাকে আমি উদ্ধার করি।

২০) ময্যেব মন আধৎস্ব ময়ি বুদ্ধিং নিবেশয়।
নিবসিষ্যসি ময্যেব অত ঊর্ধ্বং ন সংশয়ঃ॥ (গীতা ১২।৮)

তুমি আমাতে মন-বুদ্ধি অর্পণ করো তাহলে আমাকেই প্রাপ্ত হবে।

২১) **মাঞ্চ যোঽব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবতে।**

স গুণান্ সমতীত্যৈতান্ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে।। (গীতা ১৪।২৬)

অব্যভিচারী ভক্তিযোগে মানুষ গুণাতীত হয়।

২২) **যো মামেবমসংমূঢ়ো জানাতি পুরুষোত্তমম্।**

স সর্ববিদ্ভজতি মাং সর্বভাবেন ভারত।। (গীতা ১৫।১৯)

সর্বতোভাবে আমায় ভজনাকারী ভক্ত সর্ববিদ্ হয়।

ভগবান এখানে তাঁর ব্যতিক্রমী স্বভাবের কথা বলেছেন। অর্জুন দ্বিতীয় অধ্যায়ে বলেছিলেন **'শিষ্যস্তেঽহম্'** অর্থাৎ আমি তোমার শিষ্য, কিন্তু ভগবান তাকে বলছেন **'ইষ্টোঽসি'** (গীতা ১৮।৬৪) তুমি আমার মিত্র (বা প্রিয়) অর্থাৎ মানুষ গুরু-শিষ্য তৈরি করে কিন্তু ভগবান ভক্তকে নিজের মিত্র করে নেন।

এই প্রকরণের শেষে পঁয়ষট্টি শ্লোকে ভগবান নিজেকে (ভগবানকে) পাওয়ার চারটি উপদেশ দিয়েছেন—

মদ্ভক্তঃ—অর্থাৎ অহংবোধের এইরূপ পরিবর্তন যাতে মনে হয় যে আমি ভগবানের আর ভগবান আমার। যেমন বিবাহের পর কন্যার অহং পরিবর্তিত হয়ে মনে হয় আমি শশুরবাড়ির। সেইরকম ভক্তরও যেন মনে হয় 'আমি সংসারের নই আর সংসারও আমার নয়'—'আমি ভগবানের'। অহংবোধ পরিবর্তন হলেই সাধনা সহজ হয় ও স্বাভাবিকভাবে হতে থাকে। তাই সাধকের সর্বপ্রথম 'মদ্ভক্ত' হওয়া উচিত।

মন্মনা ভব—মদ্ভক্ত হলে স্বাভাবিকভাবেই মন ভগবানে স্থিত হয় ও তাঁকে স্বভাবতই প্রিয় বলে মনে হয়। তখন ভগবানের নাম, গুণ, প্রভাব, লীলা ইত্যাদির চিন্তা ও জপ, ধ্যান অত্যন্ত তৎপরতার সঙ্গে হতে থাকে।

মদ্‌যাজী—অহংবোধের পরিবর্তন হলে সংসারে সমস্ত কাজই ভগবানের সেবারূপে পরিবর্তিত হয়। আর ভগবানের সঙ্গে সম্পর্ক যতই দৃঢ় হয়ে উঠতে থাকে ততই তার সেবাভাব-পূজাভাবে পরিণত হতে থাকে। তিনি সংসারের যে কাজই করুন তাতে পূজাভাবই বজায় থাকে।

মাং নমস্কুরু—ভগবানের চরণে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করে সর্বতোভাবে তাঁর সমর্পিত হওয়া উচিত। এখানে প্রণাম করার অর্থ হল শরণাগত হওয়া অর্থাৎ যদি কোনো অনুকূল-প্রতিকূল পরিস্থিতি উদ্ভব হয় তবে তা ভগবানের মঙ্গলময় বিধান মনে করে প্রসন্ন থাকা উচিত। স্বয়ং ভগবানের শরণাগত হওয়া হল সব সাধনার সারকথা। শরণাগত ভক্তের তখন আর কিছুই করার থাকে না। ভগবান এখানে **'সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য'** বলেছেন যেখানে 'ধর্ম' হল 'কর্তব্য-কর্ম' আর **'সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য'** হল 'কর্তব্য-কর্ম' ত্যাগ নয়, কর্তব্য-কর্ম করা কিন্তু তার আশ্রয় ত্যাগ করে ভগবানের আশ্রয় গ্রহণ। কর্তব্য-কর্ম পালনের কথা গীতার তৃতীয় অধ্যায়ে অতি স্পষ্টভাবে বর্ণিত আছে।

গীতায় কর্তব্য—কর্মের স্থান—(শ্লোক ৩।৪-১৩)

১) **ন কর্মণামনারম্ভান্নৈষ্কর্ম্যং পুরুষোঽশ্নুতে।**
ন চ সন্ন্যসনাদেব সিদ্ধিং সমধিগচ্ছতি॥ (গীতা ৩।৪)

কর্মত্যাগ করলে নৈষ্কর্ম বা সিদ্ধিলাভ হয় না।

২) **ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্মকৃৎ।**
কার্যতে হ্যবশঃ কর্ম সর্বঃ প্রকৃতিজৈর্গুণৈঃ॥ (গীতা ৩।৫)

কোনো ব্যক্তিই এক মুহূর্ত কর্ম না করে থাকতে পারে না।

৩) **কর্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য য আস্তে মনসা স্মরন্।**
ইন্দ্রিয়ার্থান্ বিমূঢ়াত্মা মিথ্যাচারঃ স উচ্যতে॥ (গীতা ৩।৬)

যে বাহ্যত কর্মত্যাগ করে অন্তরে বিষয় চিন্তা করে সে মিথ্যাবাদী।

৪) **যস্ত্বিন্দ্রিয়াণি মনসা নিয়ম্যারভতেঽর্জুন।**
কর্মেন্দ্রিয়ৈঃ কর্মযোগমসক্তঃ স বিশিষ্যতে॥ (গীতা ৩।৭)

যিনি ইন্দ্রিয়-বশীভূত করে কর্তব্য-পালন করেন তিনিই শ্রেষ্ঠ।

৫) **নিয়তং কুরু কর্ম ত্বং কর্ম জ্যায়ো হ্যকর্মণঃ।**
শরীরযাত্রাপি চ তে ন প্রসিদ্ধ্যেদকর্মণঃ॥ (গীতা ৩।৮)

কর্ম বিনা শরীর নির্বাহ হয় না তাই কর্ম করা উচিত।

৬) যজ্ঞার্থাৎ কর্মণোঽন্যত্র লোকোঽয়ং কর্মবন্ধনঃ।
তদর্থং কর্ম কৌন্তেয় মুক্তসঙ্গঃ সমাচর॥ (গীতা ৩।৯)
যজ্ঞ নিমিত্ত ভিন্ন অন্য কর্ম করলে তা মানুষের বন্ধনের কারণ হয়।

৭) সহযজ্ঞাঃ প্রজাঃ সৃষ্ট্বা পুরোবাচ প্রজাপতিঃ।
অনেন প্রসবিষ্যধ্বমেষ বোঽস্ত্বিষ্টকামধুক্॥ (গীতা ৩।১০)
কল্পারম্ভে ব্রহ্মা যজ্ঞসহ সৃষ্টি করেন যা মানুষকে অভিষ্ট ফল প্রদান করে।

৮) দেবান্ ভাবয়তানেন তে দেবা ভাবয়ন্তু বঃ।
পরস্পরং ভাবয়ন্তঃ শ্রেয়ঃ পরমবাপ্স্যথ॥ (গীতা ৩।১১)
মানুষ ও দেবতা উভয়ই কর্তব্য পালন দ্বারা কল্যাণ লাভ করে।

৯-১০) ইষ্টান্ ভোগান্ হি বো দেবা দাস্যন্তে যজ্ঞভাবিতাঃ।
তৈর্দত্তানপ্রদায়ৈভ্যো যো ভুঙ্ক্তে স্তেন এব সঃ॥
যজ্ঞশিষ্টাশিনঃ সন্তো মুচ্যন্তে সর্বকিল্বিষৈঃ।
ভুঞ্জতে তে ত্বঘং পাপা যে পচন্ত্যাত্মকারণাৎ॥
(গীতা ৩।১২-১৩)

যে ব্যক্তি কর্তব্য-পালন না করে কেবল ভোগ করে সে চোরতুল্য। যজ্ঞ অর্থাৎ কর্তব্য পালনকারী পাপমুক্ত হয় আর শরীর পোষণকারী কেবল পাপ ভক্ষণ করে।

১১) এবং প্রবর্তিতং চক্রং নানুবর্তয়তীহ যঃ।
অঘায়ুরিন্দ্রিয়ারামো মোঘং পার্থ স জীবতি॥ (গীতা ৩।১৬)
কর্তব্য পালন দ্বারাই সৃষ্টিচক্র পালন হয় আর যে কর্তব্য পালন করে না সেই ইন্দ্রিয় সুখাসক্ত ব্যক্তি বৃথাই জীবন ধারণ করে।

১২) তস্মাদসক্তঃ সততং কার্যং কর্ম সমাচর।
অসক্তো হ্যাচরন্ কর্ম পরমাপ্নোতি পূরুষঃ॥ (গীতা ৩।১৯)
আসক্তিবর্জিত হয়ে কর্তব্য করলে মানুষ পরমাত্মা প্রাপ্ত হয়।

১৩) কর্মণৈব হি সংসিদ্ধিমাস্থিতা জনকাদয়ঃ।
লোকসংগ্রহমেবাপি সংপশ্যন্ কর্তুমর্হসি॥ (গীতা ৩।২০)

জনকাদি জ্ঞানীগণও কর্তব্য-কর্ম করে সিদ্ধিলাভ করেছেন ; তদনুসারে লোকসংগ্রহের জন্যও কর্তব্য পালন করা উচিত।

১৪) যদি হ্যহং ন বর্তেয়ং জাতু কর্মণ্যতন্দ্রিতঃ।
মম বর্ত্মানুবর্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্বশঃ।।
উৎসীদেয়ুরিমে লোকা ন কুর্যাং কর্ম চেদহম্।
সঙ্করস্য চ কর্তা স্যামুপহন্যামিমাঃ প্রজাঃ।।
সক্তাঃ কর্মণ্যবিদ্বাংসো যথা কুর্বন্তি ভারত।
কুর্যাদ্বিদ্বাংস্তথাসক্তশ্চিকীর্ষুর্লোকসংগ্রহম্ ।।
ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্মসঙ্গিনাম্।
জোষয়েৎ সর্বকর্মাণি বিদ্বান্ যুক্তঃ সমাচরন্।।

(গীতা ৩।২৩-২৬)

ভগবান নিজের উদাহরণ দিয়েই বলেছেন আমিও সতর্ক হয়ে কর্তব্য পালন না করলে সংকরের উৎপাদক ও লোকনাশকারী হব। জ্ঞানী ব্যক্তিদের আসক্তি পরিত্যাগ করে পরহিতের জন্য কর্তব্য করা উচিত। অজ্ঞানী ব্যক্তিগণ নিজ স্বার্থের জন্য একাত্ম হয়ে কর্ম করে। নিজের কোনো স্বার্থ না থাকলেও জ্ঞানীদেরও তৎপরতার সঙ্গে নিজ কর্তব্য কর্ম শাস্ত্রবিহিতভাবে এবং ঠিকমতো পালন করা উচিত, যাতে অজ্ঞানীদের বুদ্ধিভেদ না হয়।

সকাম ভাব রেখে কর্তব্য-কর্মের আশ্রয় গ্রহণকারীর নিন্দা—আবার সকামভাব নিয়ে কর্তব্য-কর্মের আশ্রয় গ্রহণকারীদের নিন্দা করে ভগবান বলেছেন—

তে তং ভুক্ত্বা স্বর্গলোকং বিশালং
ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্যলোকং বিশন্তি।
এবং ত্রয়ীধর্মমনুপ্রপন্না
গতাগতং কামকামা লভন্তে।। (গীতা ৯।২১)

অর্থাৎ সকাম ভাবে স্বধর্মের আশ্রয়কারী ব্যক্তিগণ বারংবার জন্ম-মৃত্যু প্রাপ্ত হতে থাকেন।

তবে সাধক স্বধর্ম (কর্তব্য-কর্মের) আশ্রয় ত্যাগ করে কী করবেন ? ভগবান বর্তমান শ্লোকে বলেছেন **'মামেকং শরণং ব্রজ'**। অর্থাৎ কেবল আমারই শরণ গ্রহণ করো।

শরণাগত ভক্তর লক্ষণ হল—

নির্ভয় হওয়া—শরণাগতের অন্তর ও বাহ্যিক ভয় দূর হয়। যোগদর্শন যে অবিদ্যাজনিত পঞ্চক্লেশের কথা বলেছেন **'অবিদ্যাস্মিতারাগদ্বেষা-ভিনিবেশাঃ ক্লেশাঃ'** (যোগদর্শন ২।৩) এবং বিদ্বানের ভীতির কারণ যে মৃত্যুভয় (অভিনিবেশ) **'স্বরসবাহী বিদুষোঽপি তথারূঢ়োঽভিনিবেশঃ'** (যোগদর্শন ২।৯) তাও শরণাগত ভক্তর সর্বতোভাবে দূরীভূত হয়। আবার নিজবৃত্তিগুলি খারাপ হয়ে যাবে এই ভয়ও শরণাগত ভক্তর থাকে না, কেননা তখন মনেই হয় না এগুলি নিজের। তখন তো শুধু ভগবানের কৃপাই সর্বত্র পরিপূর্ণভাবে পরিলক্ষিত হতে থাকে।

শোকহীন হওয়া— ঘটে যাওয়া ঘটনার জন্য শোক করা অত্যন্ত ভুল, কেননা যা অবশ্যম্ভাবী তাই হয়। প্রভুর এই মঙ্গলময় বিধান জেনে ভক্ত সর্বদা শোকহীন থাকে। ভগবান তাই বলেছেন **'মা শুচঃ'**।

নিশ্চিন্ত হওয়া—শরণাগত ভক্ত তার মমত্বের সব বস্তুসহ নিজেও ভগবানে সমর্পিত থাকেন তাই তার কোনো লৌকিক ও পারলৌকিক চিন্তা থাকে না।

নিঃশঙ্ক হওয়া—ভগবান সম্বন্ধে কখনই যেন সন্দেহ না হয় আমি ভগবানের কি না ? ভগবান তো নিজেই বলেছেন **'মমৈব অংশ জীবলোকে'** (গীতা ১৫।৭)।

পরীক্ষা না করা—ভগবানের শরণাগত হলে কখনই পরীক্ষা করতে নেই যে, ভক্তের এই এই লক্ষণ আমার মধ্যে আছে কি না ? সত্যিই শরণাগত হলে ভক্তের লক্ষণ বিনা যত্নে আপনিই প্রকাশিত হতে থাকে। ভগবান ভক্তর একাত্মবোধই দেখেন, দোষগুলি নয়। দ্রৌপদীর কৌরবদের প্রতি কত দ্বেষ ও ক্রোধই না ছিল ! দুঃশাসনের রক্তে চুল ধোব তবে বাঁধব ইত্যাদি। কিন্তু দ্রৌপদী যখনই ভগবানকে ডাকতেন, ভগবান তৎক্ষণাৎ আসতেন কারণ

তাঁর সঙ্গে ভগবানের গভীর একাত্মতা ছিল।

একটি আখ্যান—ভগবানে শরণাগত ভক্তের সমস্ত দায়িত্বই ভগবানের। একবার বিভীষণ কোনো কারণে সমুদ্র পার হয়ে এসে বিপ্রঘোষ নামক এক গ্রামে জনৈক ব্রাহ্মণের মৃত্যুর কারণ হন। তখন গ্রামের ব্রাহ্মণরা বিভীষণকে নিগ্রহ করে শৃঙ্খলিত করে বেঁধে রেখে দেয়। শ্রীরামচন্দ্র তা জানতে পেরে নিজে অযোধ্যা থেকে বিপ্রঘোষ গ্রামে এসে সকলকে শান্ত করে বলেন—

বরং মমৈব মরণং মদ্ভক্তো হন্যতে কথম্।
রাজ্যমায়ুর্ময়া দত্তং তথৈব স ভবিষ্যতি॥
ভৃত্যাপরাধে সর্বত্র স্বামিনে দণ্ড ইষ্যতে।
রামবাক্যং দ্বিজাঃ শ্রুত্বা বিস্ময়াদিদমব্রুবন্॥

(পদ্মপুরাণ, পাতালখণ্ড ১০৪।১৫০-১৫১)

'হে ব্রাহ্মণগণ! বিভীষণ আমার পরমভক্ত। ওকে মারার প্রয়োজন কী? ওকে আমি এক কল্প আয়ু দিয়েছি, সেইজন্য ও বেঁচে আছে। দাসের অপরাধের দায়িত্ব প্রকৃতপক্ষে মালিকেরই হয়, তাই মালিকই দণ্ড পাওয়ার অধিকারী। অতএব বিভীষণের পরিবর্তে আপনারা আমাকেই দণ্ড প্রদান করুন। শ্রীরামচন্দ্রের শরণাগত বাৎসল্য দেখে সকল ব্রাহ্মণই আশ্চর্যান্বিত হল এবং তাঁর শরণ গ্রহণ করল।'

শরণাগত ভক্তের নিজের জন্য কিছু করার বাকি থাকে না। তিনি সর্বদা প্রভুর অপার কৃপা অনুভব করেন এবং ভয়ঙ্কর ও কঠিন পরিস্থিতিতেও সর্বদা প্রসন্ন থাকেন।

কাকভুষণ্ডি আখ্যান—কাকভুষণ্ডি পূর্বের জন্মের কথা গরুড়কে বলার সময় বলেছিলেন যে, তিনি পূর্বজন্মে ব্রাহ্মণ ছিলেন এবং লোমশ মুনির শাপে তাঁকে পক্ষিকুলের নীচ চণ্ডাল পক্ষী কাকরূপে জন্মগ্রহণ করতে হয়। কিন্তু কাকভুষণ্ডির মনে তাঁর জন্য কোনো ভয় বা দীনতা আসেনি। তিনি নীচ কুলে জন্মগ্রহণের মধ্যেই ভগবানেরই শুদ্ধ বিধান অনুভব করেছিলেন। ভীষণ শাপগ্রস্ত হয়েও যখন কাকভুষণ্ডির প্রসন্নভাব একটুও বিচলিত হল না

তখন লোমশ মুনি তাকে ভগবানের প্রিয় ভক্ত মনে করে নিজের কাছে ডেকে নিয়ে বালক রামের ধ্যানমন্ত্র দিলেন। তারপর প্রসন্নচিত্তে কাকভুষণ্ডির মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদ করে বললেন যে—আমার কৃপায় তোমার হৃদয়ে অবাধ রামভক্তি থাকবে, তুমি শ্রীরামের প্রিয় হবে এবং সমস্ত গুণের আকর হবে, যে রূপ চাইবে তাই ধারণ করতে পারবে এবং যেস্থানে থাকবে তার এক যোজন পর্যন্ত কোনো মায়াকণ্টক থাকবে না ইত্যাদি।

চিন্তা দীনদয়ালকো মো মন সদা আনন্দ।
জায়ো সো প্রতিপালসী রামদাস গোবিন্দ॥

বিদ্যাপতির ভাষায়—

কিয়ে মানুষ পশু পাখী কিয়ে জনমিয়ে অথবা কীটপতঙ্গে।
করম-বিপাকে গতাগতি পুন পুন মতি রহু তুয়া পরসঙ্গে॥

নরোত্তম দাসের ভাষায়—

হরি হরি কবে এমন দশা হব।
ছাড়িয়া পুরুষ দেহ কবে বা প্রকৃতি হব
দোঁহারে নুপুর পরাইব॥

শরণাগত ভক্ত নিজেকে সম্পূর্ণরূপে ভগবানের শ্রীচরণে সমর্পণ করে। যেমন কুমার মাটির পাত্র তৈরি করার সময় প্রথমে মাটি মাথায় করে আনে, পরে সেটিকে পায়ে করে দলন করে। তারপরে তাকে চাকে তুলে ঘোরায়। কুমোর মাটির প্রতি যেরূপ ব্যবহারই করুক না কেন, মাটি সবকিছুই প্রসন্ন মনে মাথা পেতে নেয়। কখনো বলে না তুমি আমাকে দিয়ে কলসী করো, হাঁড়ি করো বা ভাঁড় তৈরি করো। শরণাগত ভক্তও তেমনি নিজের মনে কোনো ইচ্ছা বা আকাঙ্ক্ষা রাখেন না। তিনি ভগবানের প্রতি যত বেশি নিশ্চিন্ত এবং নির্ভয় হন, তাঁর প্রতি ভগবদ্‌কৃপা ততই তা অবাধগতিতে বর্ষিত হতে থাকে। আবার তিনি যত নিজ শক্তির ওপর নির্ভর করেন ততই ভগবদ্‌কৃপার পথে বাধা সৃষ্টি হয়।

শরণাগতর উদাহরণ—শরণাগত হবে যেন খাওয়ার পর এঁটো পাতা। তার কোনো ইচ্ছা-অনিচ্ছা নেই। পাতায় রাজা খেয়েছিল না ভিখারী

খেয়েছিল তারও কোনো হিসাব সে রাখে না। আর এঁটো পাতাখানি কোন ডাস্টবিনে ফেলবে তাতেও তার কোনো ইচ্ছে-আপত্তি নেই।

শরণাগত হবে যেন 'রাধা-কৃষ্ণের' পায়ে খেলার বল। যখন রাধা পায়ে ঠেলবে তখন শ্রীকৃষ্ণের কাছে যাবে আর যখন শ্রীকৃষ্ণ ঠেলবে তখন রাধার কাছে যাবে। তার ইচ্ছা-অনিচ্ছা কিছু নেই। কিন্তু যখন বল মাঠের বাইরে যায় (সাধনে বাধা-বিঘ্ন আসে) তখন রাধা-কৃষ্ণ উভয়েই বল নিতে দৌড়ে আসেন (উদ্ধার করেন)।

শরণাগতির রহস্য—

১) ভগবানের গুণ, ঐশ্বর্য ইত্যাদির দিকে দৃষ্টি না দিয়ে সর্বতোভাবে ভগবানের শরণ নেওয়া। যেখানে গুণ, প্রভাবের জন্য ভগবানে শরণাগতি আসে, সেখানে শুধু ভগবানের শরণ নেওয়া হয় না বরং তার গুণ, প্রভাবেরই শরণ নেওয়া হয়। কোনো ব্যক্তির (ধনী বা মন্ত্রী) যদি সম্মান করা হয় তবে সেগুলি তার ধন ও পদের জন্যই করা হয়। কিন্তু ভক্তর দৃষ্টি ভগবানের দিকেই থাকে, ভগবানের ঐশ্বর্যের দিকে নয়। যাঁরা ভগবানের প্রভাব লক্ষ না করে কেবল তাঁকেই ভালবাসেন, সেই প্রেমিক ভক্ত তাঁকে প্রেমে বন্ধন করতে পারে।

২) ভগবানের শরণাগত হওয়ার আর এক রহস্য হল আমি বিদ্বান, আমি যশস্বী, আমি বুদ্ধিমান বা আমার মন শুদ্ধ-নির্মল ইত্যাদি ভেবে ভগবানের শরণাগত হওয়ার ইচ্ছে বা এগুলি নেই বলে নৈরাশ্যবশত ভগবানের শরণাগতভাব ত্যাগ যেন কখনো না হয়। আসল কথা হল প্রকৃত শরণাগত হলে এইসব গুণের দিকে তাকাবারও প্রয়োজন নেই। ভগবানের শরণ গ্রহণ করলে সকল গুণ স্বতঃই সঞ্চারিত হবে। কেবল সৎসঙ্গই প্রয়োজন। ভগবান ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণ-উদ্ধব সংবাদে উদ্ধবকে বলছেন—

সৎসঙ্গেন হি দৈত্যেয়া যাতুধানা মৃগাঃ খগাঃ।
গন্ধর্বাপ্সরসো নাগাঃ সিদ্ধাশ্চারণগুহ্যকাঃ॥
বিদ্যাধরা মনুষ্যেষু বৈশ্যাঃ শূদ্রাঃ স্ত্রিয়োহন্ত্যজাঃ।
রজস্তমঃ প্রকৃতয়স্তস্মিংস্তস্মিন্ যুগেহনঘ॥

বহবো মৎপদং প্রাপ্তাস্ত্বাষ্ট্রকায়াবধাদয়ঃ।
বৃষপর্বা বলির্বাণো ময়শ্চাথ বিভীষণঃ॥
সুগ্রীবো হনুমানৃক্ষো গজো গৃধ্রো বণিক্‌পথঃ।
ব্যাধঃ কুব্জা ব্রজে গোপ্যো যজ্ঞপত্ন্যস্তথাপরে॥
তে নাধীতশ্রুতিগণা নোপাসিতমহত্তমাঃ।
অব্রতাতপ্ততপসঃ সৎসঙ্গান্মামুপাগতাঃ॥

(ভাগবত ১১।১২।৩-৭)

হে উদ্ধব ! এ এক যুগের নয়, সমস্ত যুগেরই এক কথা। সৎসঙ্গের প্রভাবেই দৈত্য-রাক্ষস পশু-পক্ষী, গন্ধর্ব-অপ্সরা, নাগ-সিদ্ধ, চারণ-গুহ্যক এবং বিদ্যাধরগণ আমাকে প্রাপ্ত হয়েছে। যুগে যুগে বৃষপর্বা, প্রহ্লাদ, বৃত্তাসুর, বলী, বানাসুর, ময়দানব, বিভীষণ, সুগ্রীব, হনুমান, জাম্বুবান, গজেন্দ্র, জটায়ু, তুলাধার বৈশ্য ধর্মব্যাধ, কুব্জা, ব্রজগোপীগণ, যজ্ঞপত্নী এবং অন্যান্যরা আমাকে লাভ করেছে। এই সব জনেরা বেদ অধ্যয়নও করেনি, বিধিপূর্বক ভজনও করেনি, কোনো কৃচ্ছ্রসাধন-ব্রত-তপস্যাদিও করেনি, কেবল সাধুসঙ্গই করেছিল। ভগবান শরণাগত ভক্তের জাতি, বর্ণ, স্ত্রী-পুরুষ, মনুষ্য-প্রাণী এসব বিচার করেন না।

ব্রহ্মসংহিতা বলছে—

কিং জন্মনা সকলবর্ণজনোত্তমেন কিং বিদ্যয়া সকলশাস্ত্রবিচারবত্যা।
যস্যাস্তি চেতসি সদা পরমেশভক্তিঃ কোঽন্যস্ততস্ত্রিভুবনে পুরুষোঽস্তি ধন্যঃ॥

(ব্র. সং. ভ. ১৭)

সকল বর্ণের মধ্যে উত্তম বর্ণ অথবা সকল শাস্ত্র গভীরভাবে অধ্যয়ন করলে কী হয় ? যার হৃদয়ে ভগবান বিরাজ করে তার মতো ধন্য আর কে হতে পারে।

পুংস্তে স্ত্রীত্বে বিশেষো বা জাতিনামাশ্রমাদয়ঃ।
ন কারণং মদ্ভজনে ভক্তিরেব হি কারণম্॥

(অধ্যাত্ম. অরণ্যকাণ্ড ১০।২০)

আমার ভজনে পুরুষ বা স্ত্রী, জাতি, নাম বা আশ্রয় কোনো কারণই নয়

বরং আমার ভক্তিই একমাত্র কারণ।

শাস্ত্র আরও বলছেন—

ব্যাধস্যাচরণং ধ্রুবস্য চ বয়ো বিদ্যা গজেন্দ্রস্য কা
কা জাতির্বিদুরস্য যাদবপতেরুগ্রস্য কিং পৌরুষম্।
কুব্জায়াঃ কিমু নাম রূপমধিকং কিং তৎসুদাম্নো ধনং
ভক্ত্যা তুষ্যতি কেবলং ন চ গুণৈর্ভক্তিপ্রিয়ো মাধবঃ॥

(পদাবলী ৮)

ব্যাধের কোন্ আচরণটি শ্রেষ্ঠ ছিল, ধ্রুবের কত বয়স হয়েছিল, গজেন্দ্রর কী বিদ্যা ছিল, বিদুর কোন্ উচ্চ জাতির ছিলেন, যদুপতি উগ্রসেনের কী পরাক্রম ছিল, কুব্জা কিরূপ সুন্দরী ছিলেন, সুদামার কাছে কী ধন ছিল ?

ভগবান এসব কিছুই দেখেন না। এরা কেবল ভক্তির দ্বারাই ভগবান প্রাপ্ত হয়েছিল। তিনি গুণ নয়, কেবল ভক্তিতেই সন্তুষ্ট। আবার কেবল ভক্তিই নয় কাম, ক্রোধ, ভয়, দ্বেষ, স্নেহ ইত্যাদি যে কোনো দ্বারাই ভগবানের সঙ্গে সম্পর্ক পাতানো হোক না কেন তা জীবের মঙ্গল সাধন করে।

ভাগবতে নারদ-যুধিষ্ঠির সংবাদে বলা হয়েছে—

কামাদ্ দ্বেষাদ্ ভয়াৎ স্নেহাদ্ যথা ভক্ত্যেশ্বরে মনঃ।
আবেশ্য তদঘং হিত্বা বহবস্তদ্ গতিং গতাঃ॥
গোপ্যঃ কামাদ্ ভয়াৎ কংসো দ্বেষাচ্চৈদ্যাদয়ো নৃপাঃ।
সম্বন্ধাদ্ বৃষ্ণয়ঃ স্নেহাদ্ যূয়ং ভক্ত্যা বয়ং বিভো॥

(ভাগবত ৭।১।২৯-৩০)

দু-একজন নয়, বহু ব্যক্তিই কাম, দ্বেষ, ভয়, স্নেহদ্বারা ভগবানকে আকাঙ্ক্ষা করে নিজেদের পাপ স্খালন করে, ভক্ত যেমন ভগবানকে লাভ করে সেরূপ ভগবৎ প্রাপ্ত হয়েছেন। গোপীরা কাম, কংস ভয়, শিশুপাল-দন্তবক্রাদিরা দ্বেষ, যদুবংশীয়রা সম্পর্ক, যুধিষ্ঠির এবং নারদাদি ভক্তিদ্বারা ভগবানে মন নিবিষ্ট করেছেন তবে কলিযুগে ভক্তিদ্বারা ভজনাই শ্রেষ্ঠ।

৩) শরণাগতের তৃতীয় রহস্য হল শরণ্যকে (যার শরণাগত হয়েছি)

একমাত্র তাঁকেই অবলম্বন করা—

অসুন্দরঃ সুন্দরশেখরো বা গুণৈর্বিহীনো গুণিনাং বরো বা।
দ্বেষী ময়ি স্যাৎ করুণাম্বুধির্বা শ্যামঃ স এবাদ্য গতির্মমায়ম্॥

আমার প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণ অসুন্দর হোন বা সুন্দর-শিরোমণি হন, গুণহীন হোন বা গুণীশ্রেষ্ঠ হোন, আমার প্রতি দ্বেষভাবাপন্ন হন বা কৃপাসিন্ধুরূপে কৃপা করুন, তিনি যেমনই হোন না কেন, তিনি আমার একমাত্র গতি।

চৈতন্য মহাপ্রভু শিক্ষাষ্টকে বলেছেন—

আশ্লিষ্য বা পাদরতাং পিনষ্টু মামদর্শনান্মর্মহতাং করোতু বা।
যথা তথা বা বিদধাতু লম্পটো মৎপ্রাণনাথস্তু স এব নাপরঃ॥

(শিক্ষাষ্টক ৮)

তিনি আমাকে হৃদয়ে ধারণ করে আনন্দিত করুন বা শ্রীচরণে ফেলে দলিত করুন অথবা দর্শন না দিয়ে মর্মাহত করুন, সেই পরম প্রভু শ্রীকৃষ্ণ যেমন ইচ্ছা তেমন করুন, তিনিই একমাত্র আমার প্রাণনাথ আর কেউ নয়।

৪) শরণাগত ভক্তর চতুর্থ রহস্য হল শরণাগত ভক্ত ভজন ব্যতীত বাঁচতে পারে না। শরণাগত ভক্তকে সাধন-ভজন করতেও হয় না। তার দ্বারা ভজন স্বতঃ স্বাভাবিকভাবেই হয়ে থাকে। ভগবানের নাম তার অতি মিষ্ট লাগে। যাঁকে সব কিছু সমর্পণ করে দিয়েছে তাঁর বিরহে বা বিস্মরণে পরম-ব্যাকুলতা, মহাচাঞ্চল্য উপস্থিত হয়—

তদ্বিস্মরণে পরমব্যাকুলতেতি (নারদ ভক্তিসূত্র ১৯)

ভাগবতে নব যোগীন্দ্রের অন্যতম শ্রীহরি মহারাজ নিমিকে বলছেন—

ন যস্য স্বঃ পর ইতি বিত্তেষ্বাত্মনি বা ভিদা।
সর্বভূতসমঃ শান্তঃ স বৈ ভাগবতোত্তমঃ॥

ত্রিভুবনবিভবহেতবেঽপ্যকুণ্ঠস্মৃতিরজিতাত্মসুরাদিভির্বিমৃগ্যাৎ।
ন চলতি ভগবৎ পদারবিন্দাৎ লবনিমিষার্ধমপি যঃ স বৈষ্ণবাগ্র্যঃ॥

(ভা. ১১।২।৫২-৫৩)

উত্তমকুলে জন্ম, জপধ্যানাদি কর্ম, শৌর্য প্রদর্শন আদি সংসারে গর্বের

কারণ। কিন্তু এতে যার অহংকারাদি হয় না তিনিই উত্তম ভাগবত। ত্রিলোকের রাজ্য, ব্রহ্মপদ, ইন্দ্রপদ ইত্যাদি প্রাপ্তি তারই কাম্য যার ভোগবাসনা বলবতী। তেলে জলে যেমন মিশ খায় না সেইরকম ভোগবাসনা ও ভগবৎ প্রীতির একত্র অবস্থাও অসম্ভব। কিন্তু ভক্তর ভোগবাসনা নাই, তাই তিনি ক্ষণার্ধও ভগবৎ সেবা ব্যতীত ব্যয় করেন না। ত্রিলোক্যরাজ ইন্দ্রপদও তুচ্ছ করতে ভগবৎ পদরেণু দ্বারা মন রঞ্জিত করে রাখেন।

শ্রীকৃষ্ণ-উদ্ধব সংবাদে ভগবান উদ্ধবকে বলছেন—

ন পারমেষ্ঠ্যং ন মহেন্দ্রধিষ্ণ্যং ন সার্বভৌমং ন রসাধিপত্যম্।
ন যোগসিদ্ধীরপুনর্ভবং বা ময্যর্পিতাত্মেচ্ছতি মদ্ বিনান্যৎ॥

(ভাগবত ১১।১৪।১৪)

যিনি আমাতে নিজেকে সমর্পণ করেছেন, সেই ভক্ত আমা বিনা ব্রহ্মপদ, ইন্দ্রপদ, সমস্ত পৃথিবী, পাতালরাজ্য বা যোগের সকল সিদ্ধি ও মোক্ষেরও ইচ্ছা রাখেন না। সবার সঙ্গে প্রেম-প্রীতির সম্পর্ক থাকলেও তা যেন বহিরঙ্গেই থাকে, অন্তরে কারো প্রতি মমত্ব বন্ধন বা প্রত্যাশা থাকে না, আর আশ্রয় শুধু ভগবানেরই থাকে।

গীতার সার হল এই শরণাগতি যা ভগবান বিশেষ কৃপা করে বলেছেন। অর্জুন '**করিষ্যে বচনং তব**' (গীতা ১৮।৭৩) বলে সর্বতোভাবে শরণাগত হলে ভগবান গীতার উপদেশ দান সমাপ্ত করেছেন।

গীতা শ্রবণের অনধিকারীর বর্ণনা—(শ্লোক ৬৭)

পরবর্তী শ্লোকে অনধিকারীকে এই শরণাগতির রহস্য জানাতে নিষেধ করা হয়েছে—

ইদং তে নাতপস্কায় নাভক্তায় কদাচন।
ন চাশুশ্রূষবে বাচ্যং ন চ মাং যোঽভ্যসূয়তি॥ (গীতা ১৮।৬৭)

'ভগবান এখানে অনধিকারীদের অর্থাৎ অতপস্বী, অভক্ত, অনাগ্রহী ও দোষদৃষ্টিসম্পন্নদের এই গুহ্যতম বচন অর্থাৎ শরণাগতির কথা বলতে নিষেধ করেছেন।' (গীতা ১৮।৬৭)

অতপস্বী—নিজ কর্তব্যপালনকালে যে স্বাভাবিক কষ্ট উপস্থিত হয়,

প্রসন্নতা সহকারে তা সহ্য করাই হল তপস্যা। তপ ব্যতীত চিত্তে পবিত্রতা আসে না আর পবিত্রতা না এলে সদুপদেশ ধারণ করা যায় না। ভগবান তাই তপস্বী নয় এমন ব্যক্তিকে এই রহস্য জানাতে নিষেধ করেছেন।

যে অতপস্বী তার মধ্যে সহিষ্ণুতা নেই। এই সহিষ্ণুতা চার প্রকার—

১) *দ্বন্দ সহিষ্ণুতা*—রাগ-দ্বেষ, হর্ষ-শোক, সুখ-দুঃখ, মান-অপমান, নিন্দা-স্তুতিতে সম থাকা। **'তে দ্বন্দমোহবিনির্মুক্তাঃ'** (গীতা ৭।২৮)।

২) *বেগ সহিষ্ণুতা*—কাম, ক্রোধ, লোভ, দ্বেষ ইত্যাদি বেগ হতে না দেওয়া—**'কামক্রোধোদ্ভবং বেগম্'** (গীতা ৫।২৩)।

৩) *পরমত সহিষ্ণুতা*—অন্যের মত শুনে উদ্বিগ্ন না হওয়া বা নিজ মতের উপর সন্দেহ না করা—**'এক সাংখ্যং চ যোগশ্চ যঃ পশ্যতি স পশ্যতি'** (গীতা ৫।৫)।

৪) *পরোৎকর্ষ সহিষ্ণুতা*— নিজের পদ, যোগ্যতা অধিকার, ত্যাগ, তপস্যার ন্যূনতা জেনেও এবং অপরের যোগ্যতা, অধিকার ইত্যাদির প্রশংসা শুনেও মনে কোনো বিকার না আসা **'বিমৎসরঃ'** (গীতা ৪।২২), **'হর্ষামর্ষভয়োদ্বেগৈর্মুক্তঃ'** (গীতা ১২।১৫) সিদ্ধদের এই চার প্রকার সহিষ্ণুতা থাকে, তাঁরা হলেন তপস্বী। তাই ভগবান বলেছেন যারা অতপস্বী, যাদের এই সহিষ্ণুতা নেই, তাদের এই শরণাগতির রহস্য বললে তারা এটিকে গ্রহণ করতে পারবে না এবং অশ্রদ্ধাভাব আসবে এবং নিজের পতন ডেকে আনবে।

অভক্ত—যে ভক্তিরহিত তাকেও শরণাগতির কথা বলবে না, কারণ তাতে ভগবানের উপর অশ্রদ্ধা আসতে পারে।

অশুশ্রূষবে—যারা ভগবানের কথা শুনতে চায় না, উপেক্ষা করে, তাদেরও এই মহান উপদেশ শোনাবে না।

অভ্যসূয়তি—যে গুণের মধ্যে দোষ আরোপ করে তার চিত্ত অত্যন্ত মলিন হওয়ায় তাকেও এই উপদেশ দিতে নিষেধ করা হয়েছে। কারণ সে এর বিপরীত অর্থ করে নিজের পতন ডেকে আনবে। ভগবান ভগবৎ কৃপা লাভের জন্য বারংবার বলেছেন—**'শ্রদ্ধাবন্তঃ অনসূয়ন্তঃ'** (গীতা ৩।৩১) ও

'শ্রদ্ধাবাননসূয়শ্চ' (গীতা ১৮।৭১) অর্থাৎ সাধক দোষদৃষ্টিবর্জিত হবেন। এখানে 'অভক্ত' মানে 'ভক্তি-বিরোধী' (তমোগুণী)—যাদের ভক্তি কম বা ভক্তি নেই তারা নয়। আর 'অশুশ্রূষবে'র অর্থ হল যারা অহংকারবশত (রজোগুণী) কিছু শুনতে চায় না বা দোষদৃষ্ট দেখে, ভুলবশত বা বুদ্ধিহীনতার কারণে নয়।

গীতার মাহাত্ম্য—(শ্লোক ৬৮-৭১)

ভগবান পরবর্তী চারটি শ্লোকে গীতা প্রচার, অধ্যয়ন, শ্রবণের মাহাত্ম্য কীর্তন করেছেন।

> **য ইদং পরমং গুহ্যং মদ্ভক্তেষ্বভিধাস্যতি।**
> **ভক্তিং ময়ি পরাং কৃত্বা মামেবৈষ্যত্যসংশয়ঃ॥**
> **ন চ তস্মান্মনুষ্যেষু কশ্চিন্মে প্রিয়কৃত্তমঃ।**
> **ভবিতা ন চ মে তস্মাদন্যঃ প্রিয়তরো ভুবি॥**
> **অধ্যেষ্যতে চ য ইমং ধর্ম্যং সংবাদমাবয়োঃ।**
> **জ্ঞানযজ্ঞেন তেনাহমিষ্টঃ স্যামিতি মে মতিঃ॥**
> **শ্রদ্ধাবাননসূয়শ্চ শৃণুয়াদপি যো নরঃ।**
> **সোঽপি মুক্তঃ শুভাঁল্লোকান্ প্রাপ্নুয়াৎ পুণ্যকর্মণাম্॥**

(গীতা ১৮।৬৮-৭১)

'যিনি পরাভক্তি সহকারে গীতাগ্রন্থ (পরম গুহ্যশাস্ত্র) আমার ভক্তদের নিকট ব্যাখ্যা করেন, তিনি আমাকে পাবেনই।

মনুষ্যগণের মধ্যে তাঁর চেয়ে প্রিয় আমার এ জগতে কেউ নেই এবং ভবিষ্যতে কেউ হবেও না। তিনিই আমার সর্বাধিক প্রিয়।

যিনি আমাদের কথোপকথনরূপ ধর্মময় গীতাগ্রন্থ পাঠ করেন, তিনিও জ্ঞানযজ্ঞ দ্বারা আমায় পূজা করেন।

যিনি শ্রদ্ধা ও দোষবর্জিত হয়ে গীতা পাঠ-শ্রবণ করেন তিনি পুণ্যাত্মাদের ন্যায় শুভলোক প্রাপ্ত হন।' (গীতা ১৮।৬৮-৭১)

গীতার প্রচার—ভগবান গীতার মাহাত্ম্য বর্ণনায় আটষষ্ঠিতম শ্লোকের প্রথমেই বলেছেন—'**ভক্তিং ময়ি পরাং কৃত্বা**' এবং '**মদ্ভক্তেষ্বভিধাস্যতি**'

অর্থাৎ যিনি গীতা ব্যাখ্যা করবেন তিনি যেন অর্থ, মান-সম্মান, পূজা-উপহার, মান-মর্যাদা ইত্যাদির দিকে দৃষ্টি না দেন। তাঁর উদ্দেশ্য হবে যাতে ভগবানে ভক্তির উদ্রেক হয়, ভগবদ্ভাবের মনন হয়, লোকেদের মধ্যে ভগবদ্ভাব জাগ্রত হয়, তাঁর (ভগবানের) কথা প্রচার হয় এবং লোকেদের দুঃখ, জ্বালা, শোকাদি দূর হয়। এই ভাব নিয়ে গীতা প্রচার করাই হল পরাভক্তি।

কাদের ভগবদ্কথা শোনাবেন ? যাঁদের ভগবানে ও তাঁর বচনে পূজ্যভাব আছে, তাঁর বচনে শ্রদ্ধা-বিশ্বাস, সম্মানভাব আছে, শোনার আগ্রহ আছে তিনিই ভক্ত এবং ভগবদ্কথা শোনার অধিকারী।

ভগবান পূর্ববর্তী অধ্যায়ে বলেছেন—

শুভাশুভফলৈরেবং মোক্ষ্যসে কর্মবন্ধনৈঃ।
সন্ন্যাসযোগযুক্তাত্মা বিমুক্তো মামুপৈষ্যসি॥ (গীতা ৯।২৮)

সমস্ত কর্ম ভগবানে সমর্পণ করে, শুভাশুভরূপ ফল থেকে মুক্ত হয়ে আমাকে প্রাপ্ত হবে।

যতঃ প্রবৃত্তির্ভূতানাং যেন সর্বমিদং ততম্।
স্বকর্মণা তমভ্যর্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ॥ (গীতা ১৮।৪৬)

পরমেশ্বরকে নিজ স্বভাব (স্বধর্ম) অনুযায়ী, কর্মদ্বারা অর্চনা করলে পরম সিদ্ধি লাভ হয়। সুতরাং ভগবৎপ্রীতির উদ্দেশ্যে গীতা প্রচার করলে তাঁকে অবশ্যই লাভ করবে।

গীতা দেশ (স্থান), আশ্রম, অবস্থা বা কার্য পরিবর্তনের কথা বলে না, বলে পরিমার্জনের কথা। তাই গীতা সমস্ত ধর্মের অনুগামীদের কাছেই গ্রহণযোগ্য এবং সকলেরই সকল প্রশ্নের সমাধানপূর্বক সাধন পথের প্রতিবন্ধকতা, পারমার্থিক পথের বাধা দূর করে। আর গীতা ব্যাখ্যার দ্বারা যিনি সাধকদের এই প্রভূত উন্নতিতে সাহায্য করেন তিনি ভগবানের প্রিয় হন এবং তিনি কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগ—এই তিনটিই লাভ করেন।

গীতার অধ্যয়ন—ভগবান সত্তরতম শ্লোকে দুটি শব্দ বলেছেন। **'অধ্যেষ্যতে'** এবং **'জ্ঞানযজ্ঞেন'**। অধ্যেষ্যতে কথাটির অর্থ হল, যে ব্যক্তি

যেমনভাবে গীতা পড়বেন, যেমনভাব নিয়ে বোঝার চেষ্টা করবেন, স্মরণ-মনন করবেন, তেমন তেমনই তাঁর হৃদয়ে আগ্রহ, ব্যাকুলতা বাড়তে থাকবে। তিনি যেমন যেমন বুঝবেন তেমন তেমন তাঁর জিজ্ঞাসারও সমাধান হবে। তাঁর এই ভাব কর্মে, ব্যবহারে প্রতিফলিত হবে। ক্রমে তিনি গীতার প্রতিমূর্তি হয়ে উঠবেন।

যজ্ঞও অনেক রকমের তার মধ্যে দুটি প্রধান। যথা দ্রব্যযজ্ঞ ও জ্ঞানযজ্ঞ।

যে যজ্ঞ পদার্থাদি এবং ক্রিয়ার প্রাধান্যে হয় তা হল 'দ্রব্যযজ্ঞ'। আর ভগবৎ প্রাপ্তির ব্যাকুলতার জন্য যে গভীরভাবে চিন্তা বা মনন হয় তাই হল 'জ্ঞানযজ্ঞ'। ভগবান বলেছেন যে, গীতা অধ্যয়ন করলে তিনি সেটিকে জ্ঞানযজ্ঞের দ্বারা পূজিত হওয়ার সমজ্ঞান করবেন। যিনি গীতা পাঠ করেন তাঁর হৃদয়ে তাঁর ভাব অনুসারে ভগবানের নিত্যজ্ঞান বিশেষভাবে স্ফূরিত হয়।

ভগবান 'দ্রব্যময় যজ্ঞ' অপেক্ষা 'জ্ঞানযজ্ঞকে' শ্রেষ্ঠ বলেছেন— **শ্রেয়ান্ দ্রব্যময়াদ্ যজ্ঞাৎ জ্ঞানযজ্ঞঃ পরন্তপ।** (গীতা ৪।৩৩)

গীতা শ্রবণ—একাত্তরতম শ্লোকে ভগবান গীতা শ্রবণের ব্যাপারে দুটি কথা বলেছেন—**'শ্রদ্ধাবান্'** ও **'অনসূয়ঃ'** অর্থাৎ ভক্ত গীতার বাক্যকে যদি প্রত্যক্ষর চেয়েও বেশি শ্রেয় মনে করে এবং পূজ্যভাবে শোনে তবে সে শ্রদ্ধাবান। এবং এই বিষয়কে কোনো রকমে ন্যূন বা কম মনে না করে, তবে তা হল **'অনসূয়'** বা 'দোষবর্জিত দৃষ্টি'।

সাধারণ বক্তার চারপ্রকার দোষ থাকে—

ভ্রম—বক্তার নিজ বক্তব্যে সম্পূর্ণভাবে নিঃসন্দেহ না হওয়া।

প্রমাদ—বক্তার বুদ্ধিতে শিথিলতা, উপেক্ষা, তৎপরতার অভাব এবং তার লোকে বুঝুক বা না বুঝুক পরোয়া না করে বলা।

লিপ্সা—বক্তার অর্থ, মান, মর্যাদা, সম্মান, সুখ-আরাম ইত্যাদি লৌকিক ও পারলৌকিক পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা হল লিপ্সা।

করণাপাটব—বক্তা যে মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়াদির সাহায্যে তাঁর ভাব প্রকট করেন সেই ইন্দ্রিয়গুলিতে অ-পটুত্ব এবং শ্রোতার ভাষা, ভাব বা যোগ্যতা না

জানা হল করণাপাটব। ভগবানের দিব্যবাণীতে এর কোনো দোষই থাকে না কারণ তিনি 'নির্দোষেণ পরাকাষ্ঠা'। শ্রবণকারী যদি কোনো বিষয় বুঝতে না পারে এবং যদি সে মনে করে এটি তার বুদ্ধির অভাব বা অযোগ্যতা তাহলে তার অসূয়াভাব দূর হয়।

শ্রদ্ধাভক্তির তারতম্য অনুযায়ী শুভলোকাদি প্রাপ্ত হয়। শ্রদ্ধাভক্তি বেশি হলে এবং ভক্তি অহৈতুকি হলে মানুষ ভগবদ্‌ধাম প্রাপ্ত হন আর শ্রদ্ধাভক্তি কম হলে অন্য লোক প্রাপ্ত হয়।

বাসুদেবে কথা প্রশ্ন পুরুষস্ত্রিন পুনাতি হি।
বক্তারং প্রচ্ছকং শ্রোতৃন্ তৎ পাদ সলীলং যথা॥

অর্জুন ও সঞ্জয়ের ভগবৎ অনুভূতি—(শ্লোক ৭৩-৭৮)

পরবর্তী ছয়টি শ্লোকে অর্জুন ও সঞ্জয় তাঁদের উত্তরণের কথা বলেছেন এবং এই সিদ্ধিলাভে সাধনারও সমাপ্তি এবং গীতারও এইখানে পূর্ণচ্ছেদ হয়েছে।

অর্জুনের অনুভূতি—(শ্লোক ৭৩)

নষ্টো মোহঃ স্মৃতির্লব্ধা ত্বৎপ্রসাদান্ময়াচ্যুত।
স্থিতোঽস্মি গতসন্দেহঃ করিষ্যে বচনং তব॥ (গীতা ১৮।৭৩)

'হে অচ্যুত! আপনার কৃপায় আমার মোহ দূর হয়েছে, আমি স্মৃতি ফিরে পেয়েছি এবং নিঃসংশয় হয়ে স্থির হয়েছি। এখন আমি আপনার নির্দেশানুসারে কাজ করব।' (গীতা ১৮।৭৩)

শরণাগতি প্রসঙ্গে দ্বিতীয় অধ্যায়ে অর্জুন বলেছেন—**'শিষ্যস্তেঽহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্'** (গীতা ২।৭) অর্থাৎ আমি আপনার শিষ্য, আপনার শরণাগতি স্বীকার করলাম। বর্তমান শ্লোকে সেই শরণাগতি পূর্ণতা লাভ করেছে।

আবার নিজ মোহ দূর করা প্রসঙ্গে অর্জুন আগেও একবার বলেছেন—**'মোহোঽয়ং বিগতো মম'** (গীতা ১১।১) অর্থাৎ আমার মোহ দূর হয়েছে। কিন্তু ভগবান জানেন এ সত্যকার মোহ দূর হওয়া নয়, তাই ভগবান অর্জুনকে বিরাটরূপ দর্শন দান করেন এবং অর্জুনের হৃদয়ে চাঞ্চল্য হওয়ায় ভগবান

বলছেন—'**মা তে ব্যথা মা চ বিমূঢ়ভাবঃ**' (গীতা ১১।৪৯)। অর্থাৎ এ তোমার মূঢ়তা, তুমি মোহগ্রস্ত হয়ো না। এর থেকে প্রমাণিত হয় যে অর্জুনের তখনও সম্পূর্ণ মোহ দূর হয়নি। আর বর্তমান অধ্যায়ের শেষে ভগবান নিজেই বলেছেন '**কচ্চিদজ্ঞানসংম্মোহঃ প্রনষ্টস্তে ধনঞ্জয়**' (গীতা ১৮।৭২) অর্থাৎ তোমার অজ্ঞানজনিত মোহ নাশ হয়েছে তো ? এখানে ভগবান অর্জুনকে 'ধনঞ্জয়' বলে সম্বোধন করেছেন অর্থাৎ লৌকিক ধন প্রাপ্ত হওয়ার জন্য তোমার নাম ধনঞ্জয় এখন বাস্তবিক তত্ত্বস্বরূপ ধন প্রাপ্ত করে, নিজ মোহ নাশ করে প্রকৃত অর্থে ধনঞ্জয় হও।

অর্জুনও তত্ত্বজ্ঞান লাভ করে বলেছেন '**নষ্টো মোহঃ স্মৃতির্লব্ধা**'। অর্থাৎ আমার মোহ দূর হয়েছে এবং আমি তত্ত্বের অনাদি স্মৃতি প্রাপ্ত হয়েছি। স্মৃতি হল প্রথম থেকেই যা রয়েছে তা প্রকটিত হওয়া এবং লব্ধা হল আবরণ থেকে মুক্ত হওয়া।

সংস্কারজনিত স্মৃতি হল চিত্তের একটি বৃত্তি যা বদ্ধজীবের পক্ষে তার সত্ত্বা বা সারূপ্যের অনুরূপ।

পাতঞ্জল যোগদর্শনে বলেছেন—

'**বৃত্তিসারূপ্যমিতরত্র**' (যোগদর্শন ১।৪)

যতক্ষণ না সাধনার দ্বারা চিত্তবৃত্তির নিরোধ হয়, ততক্ষণ নিজের সত্ত্বাকেই (আত্মাকেই) চিত্তবৃত্তির অনুরূপ মনে হয়।

এই বৃত্তি হল পাঁচপ্রকার এবং ক্লিষ্ট (অবিদ্যা) ও অক্লিষ্ট (বিদ্যা) ভেদে দ্বিবিধ।

'**বৃত্তয়ঃ পঞ্চতয্যঃ ক্লিষ্টাক্লিষ্টাঃ**' (যোগদর্শন ১।৫)

আর পাঁচটি বৃত্তি হচ্ছে—'**প্রমাণ বিপর্যয় বিকল্প নিদ্রা স্মৃতয়ঃ**'।

(যোগদর্শন ১।৬)

১. প্রমাণ ২. বিপর্যয় ৩. বিকল্প ৪. নিদ্রা ৫. স্মৃতি—এই পাঁচটি হল বৃত্তি।

আর সংস্কারজনিত স্মৃতির সম্বন্ধে বলা হয়েছে—

'**অনুভূতবিষয়াসম্প্রমোষঃ স্মৃতিঃ**' (যোগদর্শন ১।১১)

পূর্ব অনুভূত বিষয়টি প্রকাশিত হওয়াই হল স্মৃতি।

আবার এর মধ্যে যা স্মরণে মানুষের মধ্যে ভোগের প্রতি বৈরাগ্য উৎপন্ন হয়, সাধনে শ্রদ্ধা উৎসাহ বর্ধিত হয়, ভগবৎ চেতনা বৃদ্ধি পায় তা অক্লিষ্ট স্মৃতি। আর যার স্মৃতিতে ভোগের প্রতি রাগদ্বেষ বর্ধিত হয় তা হল ক্লিষ্ট স্মৃতি।

সাধকের রুচি অনুসারে অক্লিষ্ট স্মৃতি তিন ভাগে বিভক্ত—

১) কর্মযোগ অর্থাৎ নিষ্কামভাবের স্মৃতি।

২) জ্ঞানযোগ অর্থাৎ স্ব-স্বরূপের স্মৃতি।

৩) ভক্তিযোগ অর্থাৎ ভগবানের স্মৃতি।

এইভাবে এই তিন যোগের স্মৃতির জাগরূপ হয়ে ওঠে। স্বরূপত এই তিনটিই নিত্য। আর যখন যোগ তিনটি, স্বরূপের বৃত্তির বিষয় হয় তখন তাকে সাধন বলে। সাধনের ফলে নিত্যের প্রাপ্তিকেই বলা হয় স্মৃতি। এই সাধনার বিস্মৃতি ঘটেছিল তার অবলুপ্তি হয়নি।

স্বরূপ হল নিষ্কাম, নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত। এই স্বরূপের বিস্মৃতিতেই জীব সকাম, বদ্ধ ও সংসারে আসক্ত হয়। এই স্বরূপের স্মৃতি বৃত্তির অপেক্ষা রাখে না অর্থাৎ চিত্তের বৃত্তি দ্বারা স্বরূপের স্মৃতি জাগ্রত হওয়া সম্ভব নয়, তার নিরোধেই সম্ভব।

'যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ' (যোগদর্শন ১।২)

যেমন একটি পুষ্করিণীতে যদি পরিষ্কার ও স্থির জল থাকে তবে তাতে স্ব-প্রতিবিম্ব দেখা যায়। কিন্তু যদি পুকুরের জলে একটি লাট্টু নিক্ষেপ করা যায় তবে তাতে জলে যে আলোড়ন ওঠে তাতে প্রতিবিম্বিত দর্শন বিঘ্নিত হয়। আলোড়ন শান্ত হলে, জল স্থির হলে আবার পরিষ্কার প্রতিবিম্ব দেখা যায়।

সেইরকম ভগবৎস্মৃতি তখনই জাগ্রত হয় যখন চিত্তবৃত্তি নিরোধ হয়, অন্তঃকরণ থেকে সম্পর্ক সর্বতোভাবে ছিন্ন হয়। স্মৃতি তখন নিজেই নিজের মধ্যে জাগ্রত হয়। জড়ের সাহায্য ছাড়া অভ্যাস হয় না আর স্বরূপের সঙ্গে জড়ের কোনো সম্পর্ক নেই। ভগবৎস্মৃতি হল অনুভবসিদ্ধ—অভ্যাসসাধ্য

নয়। ভগবানের কৃপাতেই স্মৃতি জাগ্রত হয় আর তাঁর কৃপা আসে শরণাগতির দ্বারা এবং শরণাগতি আসে সংসার বৈরাগ্যে জড়ের সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগে। তাই তখন অর্জুন বলেছেন—'**করিষ্যে বচনং তব**' অর্থাৎ আমি কেবল 'তোমার আদেশই পালন করব'।

এই স্মৃতি দুই প্রকার '**সংস্কারমাত্রজন্যং জ্ঞানং স্মৃতিঃ**' (তর্ক সংগ্রহ) সংস্কারজনিত স্মৃতি ও জ্ঞানজনিত স্মৃতি।

সঞ্জয়ের অনুভূতি—(শ্লোক ৭৪-৭৮)

পরের পাঁচটি শ্লোকে সঞ্জয় বললেন—

ইত্যহং বাসুদেবস্য পার্থস্য চ মহাত্মনঃ।
সংবাদমিমমশ্রৌষমদ্ভুতং রোমহর্ষণম্॥
ব্যাসপ্রসাদাচ্ছ্রুতবানেতদ্ গুহ্যমহং পরম্।
যোগং যোগেশ্বরাৎ কৃষ্ণাৎ সাক্ষাৎ কথয়তঃ স্বয়ম্॥
রাজন্ সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য সংবাদমিমমদ্ভুতম্।
কেশবার্জুনয়োঃ পুণ্যং হৃষ্যামি চ মুহুর্মুহুঃ॥
তচ্চ সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য রূপমত্যদ্ভুতং হরেঃ।
বিস্ময়ো মে মহান্ রাজন্ হৃষ্যামি চ পুনঃ পুনঃ॥
যত্র যোগেশ্বরঃ কৃষ্ণো যত্র পার্থো ধনুর্ধরঃ।
তত্র শ্রীর্বিজয়ো ভূতির্ধ্রুবা নীতির্মতির্মম॥

(গীতা ১৮।৭৪-৭৮)

'হে ধৃতরাষ্ট্র! এইভাবে আমি ভগবান বাসুদেব ও মাহাত্মা অর্জুনের এই অদ্ভুত ও রোমাঞ্চকর কথোপকথন শুনেছি।

সাক্ষাৎ যোগেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের এই পরমগুহ্য যোগ আমি 'ব্যাসদেবের' করুণার ফলেই শুনতে পেয়েছি।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনের এই পবিত্র ও অদ্ভুত কথোপকথন শ্রবণ করে আমি বারংবার হর্ষান্বিত হয়ে উঠছি।

আর ভগবান শ্রীহরির সেই অদ্ভুত বিরাটরূপ বারংবার স্মরণ করে

অত্যন্ত আশ্চর্য বোধ হচ্ছে ও আমি বারংবার হর্ষান্বিত হচ্ছি।

যেখানে যোগেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এবং গাণ্ডীব ধনুর্ধারী অর্জুন আছেন, সেখানেই শ্রী, বিজয়, বিভূতি ও অচল নীতি সদা বিদ্যমান—এই হল আমার অভিমত।' (গীতা ১৮।৭৪-৭৮)

সঞ্জয় শ্রীকৃষ্ণ-অর্জুনের যে সংবাদ গীতার প্রথম অধ্যায়ে শুরু করেছিলেন **'অর্থ ব্যবস্থিতান্ দৃষ্টা ধার্তরাষ্ট্রান্ কপিধ্বজ'** (গীতা ১।২০) বলে, সেটি অষ্টাদশ অধ্যায়ে **'ইত্যহং বাসুদেবস্য পার্থস্য চ মহাত্মনঃ'** (গীতা ১৮।৭৪) বলে সমাপ্ত করেছেন। এখানে অর্জুনকে **'মহাত্মনঃ'** বলার কারণ অর্জুনের ভক্তভাব। ভগবান আগেও অর্জুনকে বলেছেন **'ভক্তোঽসি মে'** (গীতা ৪।৩)। ভগবান ভক্তের কথা সদাই পালন করেন তাই অর্জুনের কথামতো তিনি রথটিকে উভয় সেনার মধ্যে স্থাপনা করেছেন এবং অর্জুন যেমন যেমন প্রশ্ন করেছেন ভগবান অত্যন্ত স্নেহের সঙ্গে তার উত্তর দিয়েছেন।

অর্জুন আগের শ্লোকে (১৮।৭৩) বলেছেন **'ত্বৎপ্রাসাদাৎ'** এবং পরে এই শ্লোকে সঞ্জয় বলেছেন **'ব্যাসপ্রাসাদাৎ'** (গীতা ১৮।৭৫)। ভগবানের কৃপায় অর্জুন দিব্যদৃষ্টি লাভ করেছেন আর সঞ্জয় করেছেন ব্যাসদেবের কৃপায়। তাই উভয়েই তাঁদের গুরু। জীবের সঙ্গে ভগবানের যে নিত্যসম্পর্ক এবং তাঁকে জানাকে (স্মৃতিকে স্মৃতির) বলে 'যোগ'। সেই নিত্যযোগকে চেনাবার জন্য 'কর্মযোগ', 'জ্ঞানযোগ, 'ভক্তিযোগ' ইত্যাদির অবতারণা এবং গীতায় এই সমস্ত যোগের কথাই বলা হয়েছে। আর এই সব যোগের বর্ণনা গীতাতে থাকায় গীতাকে বলা হয় 'যোগশাস্ত্র'। 'যোগীশ্বর' অর্থাৎ যোগীদের ঈশ্বর হওয়া সহজ কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকে বলা হয়েছে—'যোগেশ্বর' অর্থাৎ সমস্ত যোগাদির ঈশ্বর বা শেষ কথা— **'সা কাষ্ঠা সা পরা গতিঃ'**। গীতায় ভগবানকে বহুবার **'যোগেশ্বর'** ও **'মহাযোগেশ্বর'** হিসাবে সম্বোধন করা হয়েছে। তিনি কেবল সকল যোগীর শিক্ষাগুরুই নন, তিনিই জ্ঞেয়তত্ত্ব।

যোগেশ্বর ভগবান ও মাহাত্মা (ভক্ত) অর্জুনের এই অদ্ভুত কথোপকথন অত্যন্ত বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। যুদ্ধক্ষেত্রে শরণাগত হওয়ায় আবার ভগবানের কৃপা বিশেষভাবে লাভ করেছিলেন। কিন্তু কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের শেষে হস্তিনাপুরের সভাভবনে অর্জুন শ্রীকৃষ্ণকে আবার বলেছিলেন—

যত্তু তদভবতাং প্রোক্তং পুরা কেশব সৌহৃদ্যাৎ।
মম কৌতুহলং ত্বস্তি তেষ্বর্থেষু পুনঃ পুনঃ॥

(মহাভারত, আশ্বমেধিক পর্ব ৬৭।৬-৭)

'হে কেশব! সৌহার্দ্যবশত পূর্বে যে সকল কথা যুদ্ধের সময় বলেছিলে, সে সকল বিষয় পুনরায় শোনার জন্য আমার প্রবল কৌতুহল হচ্ছে।'

—ভগবান তার উত্তরে বলছেন—

ন শক্যং তন্ময়া ভূয়স্তথা বক্তুমশেষতঃ।
পরং হি ব্রহ্ম কথিতং যোগযুক্তেন তন্ময়া॥

(মহাভারত, আশ্বমেধিক পর্ব ১৬।১২-১৩)

'হে অর্জুন! তৎকালে আমি যোগযুক্ত হয়ে পরব্রহ্মের বিষয়ে বলেছিলাম, যা বর্তমানে বলতে সমর্থ নই।'

ভগবান সেই সময় অর্জুনের অনন্য চিন্তা, উৎকণ্ঠার ফলে যোগস্থ হয়েছিলেন অর্থাৎ ঐশ্বর্যে স্থিত না থেকে শুধু তাঁর প্রেম-তত্ত্বে আপ্লুত হয়েছিলেন তাই তাঁর সেই সময়কার আলাপন **'সংবাদমিমমদ্ভুতম্'** অর্থাৎ অদ্ভুত। আবার পরবর্তী শ্লোকে সঞ্জয় ভগবানের 'বিরাট' রূপকে অত্যন্ত অদ্ভুত বলেছেন—**'রূপমত্যাদ্ভুতং'**। ভগবান রাম অবতারে কৌশল্যাকে বিরাটরূপ দেখিয়েছেন কিন্তু কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের সময় দর্শিত বিরাটরূপ অর্জুন দেখেছেন ভগবানের চোয়ালে সমস্ত যোদ্ধাগণ সংশ্লিষ্টও দুই পক্ষের সেনা সংহার হচ্ছে। অতি ভয়ানক এমন বিরাটরূপ ভগবান কখনো কাউকে দেখাননি। তাই সঞ্জয় এই রূপকে অতি অদ্ভুত বলেছেন। যদিও ভগবান এইরূপ সীমিতাকারে দেখিয়েছিলেন, কেননা অর্জুন এইরূপ দেখেই হতচকিত হয়ে পড়েছিলেন। তা না হলে ভগবান হয়তো আরও অনেক

অলৌকিক রূপের দর্শন করাতেন। সঞ্জয়ও এই রূপরাশি দেখেই আশ্চর্যান্বিত হয়েছিলেন।

গীতার সর্বশেষ শ্লোকে সঞ্জয়, কৃষ্ণ ও পার্থ সম্বোধন করে তাঁর বক্তব্য শেষ করেছেন। সঞ্জয় যেমন গীতার প্রারম্ভে (শঙ্খবাদন ক্রিয়াতে)—**'পাঞ্চজন্যং হৃষীকেশো দেবদত্তং ধনঞ্জয়ঃ'** (গীতা ১।১৫) বলে শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুন উভয়ের প্রাধান্য শুচিত করে গীতা শুরু করেছিলেন। তেমনি কৃষ্ণ ও পার্থ সম্বোধন করার উদ্দেশ্যও বোধহয় এই নামে পরস্পরের প্রিয়তা। শ্রীকৃষ্ণ সমগ্র গীতায় আটত্রিশবার অর্জুনকে পার্থ নামে সম্বোধন করেছেন এবং কৃষ্ণ নামটিও অর্জুনের প্রিয় তাই তিনি ন-বার এই নামে শ্রীকৃষ্ণকে সম্বোধন করেছেন।

অবশেষে সঞ্জয় ঘোষণা করেছেন যেখানে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুন বিদ্যমান সেখানে শ্রী, বিজয়, বিভূতি ও ধ্রুবা নীতি সতত থাকে।[১]

শ্রী—লক্ষ্মী, শোভা, সম্পত্তি ইত্যাদি শ্রী শব্দের অন্তর্গত। যেখানে ভগবান কৃষ্ণ বিরাজমান, সেখানে শ্রী থাকবেনই।

বিজয়—অর্জুনকেও বিজয় বলে এবং শৌর্যকেও বিজয় বলা হয়। যেখানে বিজয়রূপ অর্জুন বিরাজমান সেখানে শৌর্য, উৎসাহ ইত্যাদি ক্ষাত্র-ঐশ্বর্য অবশ্যম্ভাবী।

বিভূতি—যেখানে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বিরাজিত সেখানে বিভূতি-ঐশ্বর্য, মহত্ত্ব, প্রভাব, সামর্থ্য ইত্যাদি ঐশ্বরীয় গুণ অবশ্যম্ভাবী।

ধ্রুবানীতি—আর যেখানে ধর্মাত্মা অর্জুন থাকেন সেখানে ধ্রুবানীতি অর্থাৎ অটল নীতি ন্যায়, ধর্ম থাকবেই।

এই অধ্যায়ের নাম 'মোক্ষসন্ন্যাস-যোগ' অর্থাৎ মোক্ষের সন্ন্যাস হয় অর্থাৎ মোক্ষেরও ত্যাগ হয়। মানে পরাভক্তি লাভ হয়। এইরূপ পরাভক্তির প্রাধান্য থাকায় এই অন্তিম অধ্যায়ের নাম 'মোক্ষসন্ন্যাসযোগ'।

---

[১]অনন্ত সৌশিল্য, অনন্ত সৌজন্য অনন্ত সৌন্দর্য সতত বিরাজমান।

গীতা মাহাত্ম্য

সর্বশাস্ত্রময়ী গীতা সর্বদেবময়ো হরিঃ।
সর্বতীর্থময়ী গঙ্গা সর্ববেদময়ো মনুঃ॥
গীতা গঙ্গা চ গায়ত্রী গোবিন্দেতি হৃদি স্থিতে।
চতুর্গকারসংযুক্তে পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে॥

(মহাভারত, ভীষ্মপর্ব ৪৩।২-৩)

সর্ববেদময়ী গীতা সর্বধর্মময়ো মনুঃ।
সর্বতীর্থময়ী গঙ্গা সর্বদেবময়ো হরিঃ॥

(স্কন্দপুরাণ, গীতা মাহাত্ম্য ৯)

———o———

শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা

অথ প্রথমোঽধ্যায়ঃ

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ

ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে সমবেতা যুযুৎসবঃ।
মামকাঃ পাণ্ডবাশ্চৈব কিমকুর্বত সঞ্জয়॥ ১ ॥

সঞ্জয় উবাচ

দৃষ্ট্বা তু পাণ্ডবানীকং ব্যূঢ়ং দুর্যোধনস্তদা।
আচার্যমুপসঙ্গম্য রাজা বচনমব্রবীৎ॥ ২ ॥

পশ্যৈতাং পাণ্ডুপুত্রাণামাচার্য মহতীং চমূম্।
ব্যূঢ়াং দ্রুপদপুত্রেণ তব শিষ্যেণ ধীমতা॥ ৩ ॥

অত্র শূরা মহেষ্বাসা ভীমার্জুনসমা যুধি।
যুযুধানো বিরাটশ্চ দ্রুপদশ্চ মহারথঃ॥ ৪ ॥

ধৃষ্টকেতুশ্চেকিতানঃ কাশিরাজশ্চ বীর্যবান্।
পুরুজিৎ কুন্তিভোজশ্চ শৈব্যশ্চ নরপুঙ্গবঃ॥ ৫ ॥

যুধামন্যুশ্চ বিক্রান্ত উত্তমৌজাশ্চ বীর্যবান্।
সৌভদ্রো দ্রৌপদেয়াশ্চ সর্ব এব মহারথাঃ॥ ৬ ॥

অস্মাকং তু বিশিষ্টা যে তান্নিবোধ দ্বিজোত্তম।
নায়কা মম সৈন্যস্য সংজ্ঞার্থং তান্ ব্রবীমি তে॥ ৭ ॥

ভবান্ ভীষ্মশ্চ কর্ণশ্চ কৃপশ্চ সমিতিঞ্জয়ঃ।
অশ্বত্থামা বিকর্ণশ্চ সৌমদত্তিস্তথৈব চ॥ ৮ ॥

অন্যে চ বহবঃ শূরা মদর্থে ত্যক্তজীবিতাঃ।
নানাশস্ত্রপ্রহরণাঃ সর্বে যুদ্ধবিশারদাঃ॥ ৯ ॥

অপর্যাপ্তং তদস্মাকং বলং ভীষ্মাভিরক্ষিতম্।
পর্যাপ্তং ত্বিদমেতেষাং বলং ভীমাভিরক্ষিতম্॥১০॥

অয়নেষু চ সর্বেষু যথাভাগমবস্থিতাঃ।

ভীষ্মমেবাভিরক্ষন্তু ভবন্তঃ সর্ব এব হি॥১১॥
তস্য সঞ্জনয়ন্ হর্ষং কুরুবৃদ্ধঃ পিতামহঃ।
সিংহনাদং বিনদ্যোচ্চৈঃ শঙ্খং দধ্মৌ প্রতাপবান্॥১২॥
ততঃ শঙ্খাশ্চ ভের্যশ্চ পণবানকগোমুখাঃ।
সহসৈবাভ্যহন্যন্ত স শব্দস্তুমুলোঽভবৎ॥১৩॥
ততঃ শ্বেতৈর্হয়ৈর্যুক্তে মহতি স্যন্দনে স্থিতৌ।
মাধবঃ পাণ্ডবশ্চৈব দিব্যৌ শঙ্খৌ প্রদধ্মতুঃ॥১৪॥
পাঞ্চজন্যং হৃষীকেশো দেবদত্তং ধনঞ্জয়ঃ।
পৌণ্ড্রং দধ্মৌ মহাশঙ্খং ভীমকর্মা বৃকোদরঃ॥১৫॥
অনন্তবিজয়ং রাজা কুন্তীপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ।
নকুলঃ সহদেবশ্চ সুঘোষমণিপুষ্পকৌ॥১৬॥
কাশ্যশ্চ পরমেষ্বাসঃ শিখণ্ডী চ মহারথঃ।
ধৃষ্টদ্যুম্নো বিরাটশ্চ সাত্যকিশ্চাপরাজিতঃ॥১৭॥
দ্রুপদো দ্রৌপদেয়াশ্চ সর্বশঃ পৃথিবীপতে।
সৌভদ্রশ্চ মহাবাহুঃ শঙ্খান্ দধ্মুঃ পৃথক্ পৃথক্॥১৮॥
স ঘোষো ধার্তরাষ্ট্রাণাং হৃদয়ানি ব্যদারয়ৎ।
নভশ্চ পৃথিবীং চৈব তুমুলো ব্যনুনাদয়ন্॥১৯॥
অথ ব্যবস্থিতান্ দৃষ্ট্বা ধার্তরাষ্ট্রান্ কপিধ্বজঃ।
প্রবৃত্তে শস্ত্রসম্পাতে ধনুরুদ্যম্য পাণ্ডবঃ॥২০॥
হৃষীকেশং তদা বাক্যমিদমাহ মহীপতে।

অর্জুন উবাচ

সেনয়োরুভয়োর্মধ্যে রথং স্থাপয় মেঽচ্যুত॥২১॥
যাবদেতান্ নিরীক্ষেঽহং যোদ্ধুকামানবস্থিতান্।
কৈর্ময়া সহ যোদ্ধব্যমস্মিন্ রণসমুদ্যমে॥২২॥
যোৎস্যমানানবেক্ষেঽহং য এতেঽত্র সমাগতাঃ।
ধার্তরাষ্ট্রস্য দুর্বুদ্ধের্যুদ্ধে প্রিয়চিকীর্ষবঃ॥২৩॥

সঞ্জয় উবাচ

এবমুক্তো হৃষীকেশো গুড়াকেশেন ভারত।

সেনয়োরুভয়োর্মধ্যে স্থাপয়িত্বা রথোত্তমম্॥২৪॥
ভীষ্মদ্রোণপ্রমুখতঃ সর্বেষাং চ মহীক্ষিতাম্।
উবাচ পার্থ পশ্যৈতান্ সমবেতান্ কুরূনিতি॥২৫॥
তত্রাপশ্যৎ স্থিতান্ পার্থঃ পিতৃনথ পিতামহান্।
আচার্যান্ মাতুলান্ ভ্রাতৃন্ পুত্রান্ পৌত্রান্ সখীংস্তথা॥২৬॥
শ্বশুরান্ সুহৃদশ্চৈব সেনয়োরুভয়োরপি।
তান্ সমীক্ষ্য স কৌন্তেয়ঃ সর্বান্ বন্ধূনবস্থিতান্॥২৭॥
কৃপয়া পরয়াবিষ্টো বিষীদন্নিদমব্রবীৎ।

অর্জুন উবাচ

দৃষ্ট্বেমং স্বজনং কৃষ্ণ যুযুৎসুং সমুপস্থিতম্॥২৮॥
সীদন্তি মম গাত্রাণি মুখং চ পরিশুষ্যতি।
বেপথুশ্চ শরীরে মে রোমহর্ষশ্চ জায়তে॥২৯॥
গাণ্ডীবং স্রংসতে হস্তাৎ ত্বক্ চৈব পরিদহ্যতে।
ন চ শক্নোম্যবস্থাতুং ভ্রমতীব চ মে মনঃ॥৩০॥
নিমিত্তানি চ পশ্যামি বিপরীতানি কেশব।
ন চ শ্রেয়োঽনুপশ্যামি হত্বা স্বজনমাহবে॥৩১॥
ন কাঙ্ক্ষে বিজয়ং কৃষ্ণ ন চ রাজ্যং সুখানি চ।
কিং নো রাজ্যেন গোবিন্দ কিং ভোগৈর্জীবিতেন বা॥৩২॥
যেষামর্থে কাঙ্ক্ষিতং নো রাজ্যং ভোগাঃ সুখানি চ।
ত ইমেঽবস্থিতা যুদ্ধে প্রাণাংস্ত্যক্ত্বা ধনানি চ॥৩৩॥
আচার্যাঃ পিতরঃ পুত্রাস্তথৈব চ পিতামহাঃ।
মাতুলাঃ শ্বশুরাঃ পৌত্রাঃ শ্যালাঃ সম্বন্ধিনস্তথা॥৩৪॥
এতান্ন হন্তুমিচ্ছামি ঘ্নতোঽপি মধুসূদন।
অপি ত্রৈলোক্যরাজ্যস্য হেতোঃ কিং নু মহীকৃতে॥৩৫॥
নিহত্য ধার্তরাষ্ট্রান্নঃ কা প্রীতিঃ স্যাজ্জনার্দন।
পাপমেবাশ্রয়েদস্মান্ হত্বৈতানাততায়িনঃ॥৩৬॥
তস্মান্নার্হা বয়ং হন্তুং ধার্তরাষ্ট্রান্ স্ববান্ধবান্।
স্বজনং হি কথং হত্বা সুখিনঃ স্যাম মাধব॥৩৭॥

যদ্যপ্যেতে ন পশ্যন্তি লোভোপহতচেতসঃ।
কুলক্ষয়কৃতং দোষং মিত্রদ্রোহে চ পাতকম্।।৩৮।।

কথং ন জ্ঞেয়মস্মাভিঃ পাপাদস্মান্নিবর্তিতুম্।
কুলক্ষয়কৃতং দোষং প্রপশ্যদ্ভির্জনার্দন।।৩৯।।

কুলক্ষয়ে প্রণশ্যন্তি কুলধর্মাঃ সনাতনাঃ।
ধর্মে নষ্টে কুলং কৃৎস্নমধর্মোঽভিভবত্যুত।।৪০।।

অধর্মাভিভবাৎ কৃষ্ণ প্রদুষ্যন্তি কুলস্ত্রিয়ঃ।
স্ত্রীষু দুষ্টাসু বার্ষ্ণেয় জায়তে বর্ণসঙ্করঃ।।৪১।।

সঙ্করো নরকায়ৈব কুলঘ্নানাং কুলস্য চ।
পতন্তি পিতরো হ্যেষাং লুপ্তপিণ্ডোদকক্রিয়াঃ।।৪২।।

দোষৈরেতৈঃ কুলঘ্নানাং বর্ণসঙ্করকারকৈঃ।
উৎসাদ্যন্তে জাতিধর্মাঃ কুলধর্মাশ্চ শাশ্বতাঃ।।৪৩।।

উৎসন্নকুলধর্মাণাং মনুষ্যাণাং জনার্দন।
নরকেঽনিয়তং বাসো ভবতীত্যনুশুশ্রুম।।৪৪।।

অহো বত মহৎ পাপং কর্তুং ব্যবসিতা বয়ম্।
যদ্রাজ্যসুখলোভেন হন্তুং স্বজনমুদ্যতাঃ।।৪৫।।

যদি মামপ্রতীকারমশস্ত্রং শস্ত্রপাণয়ঃ।
ধার্তরাষ্ট্রা রণে হন্যুস্তন্মে ক্ষেমতরং ভবেৎ।।৪৬।।

সঞ্জয় উবাচ

এবমুক্ত্বার্জুনঃ সংখ্যে রথোপস্থ উপাবিশৎ।
বিসৃজ্য সশরং চাপং শোকসংবিগ্নমানসঃ।।৪৭।।

ওঁ তৎসদিতি শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে অর্জুনবিষাদযোগো নাম প্রথমোঽধ্যায়ঃ ।।১।।

অথ দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ

সঞ্জয় উবাচ

তং তথা কৃপয়াবিষ্টমশ্রুপূর্ণাকুলেক্ষণম্।

বিষীদন্তমিদং বাক্যমুবাচ মধুসূদনঃ॥ ১ ॥

শ্রীভগবানুবাচ

কুতস্ত্বা কশ্মলমিদং বিষমে সমুপস্থিতম্।
অনার্যজুষ্টমস্বর্গ্যমকীর্তিকরমর্জুন ॥ ২ ॥

ক্লৈব্যং মা স্ম গমঃ পার্থ নৈতত্ত্বয্যুপপদ্যতে।
ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্বল্যং ত্যক্ত্বোত্তিষ্ঠ পরন্তপ॥ ৩ ॥

অর্জুন উবাচ

কথং ভীষ্মমহং সংখ্যে দ্রোণং চ মধুসূদন।
ইষুভিঃ প্রতি যোৎস্যামি পূজার্হাবরিসূদন॥ ৪ ॥

গুরূনহত্বা হি মহানুভাবান্
শ্রেয়ো ভোক্তুং ভৈক্ষ্যমপীহ লোকে।
হত্বার্থকামাংস্তু গুরূনিহৈব
ভুঞ্জীয় ভোগান্ রুধিরপ্রদিগ্ধান্॥ ৫ ॥

ন চৈতদ্বিদ্মঃ কতরন্নো গরীয়ো-
যদ্বা জয়েম যদি বা নো জয়েয়ুঃ।
যানেব হত্বা ন জিজীবিষাম-
স্তেঽবস্থিতাঃ প্রমুখে ধার্তরাষ্ট্রাঃ॥ ৬ ॥

কার্পণ্যদোষোপহতস্বভাবঃ
পৃচ্ছামি ত্বাং ধর্মসংমূঢ়চেতাঃ।
যচ্ছ্রেয়ঃ স্যান্নিশ্চিতং ব্রূহি তন্মে
শিষ্যস্তেঽহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্॥ ৭ ॥

ন হি প্রপশ্যামি মমাপনুদ্যাদ্
যচ্ছোকমুচ্ছোষণমিন্দ্রিয়াণাম্ ।
অবাপ্য ভূমাবসপত্নমৃদ্ধং
রাজ্যং সুরাণামপি চাধিপত্যম্॥ ৮ ॥

সঞ্জয় উবাচ

এবমুক্ত্বা হৃষীকেশং গুড়াকেশঃ পরন্তপ।
ন যোৎস্য ইতি গোবিন্দমুক্ত্বা তূষ্ণীং বভূব হ॥ ৯ ॥

তমুবাচ হৃষীকেশঃ প্রহসন্নিব ভারত।
সেনয়োরুভয়োর্মধ্যে বিষীদন্তমিদং বচঃ॥১০॥

শ্রীভগবানুবাচ

অশোচ্যানন্বশোচস্ত্বং প্রজ্ঞাবাদাংশ্চ ভাষসে।
গতাসূনগতাসূংশ্চ নানুশোচন্তি পণ্ডিতাঃ॥১১॥

ন ত্বেবাহং জাতু নাসং ন ত্বং নেমে জনাধিপাঃ।
ন চৈব ন ভবিষ্যামঃ সর্বে বয়মতঃ পরম্॥১২॥

দেহিনোঽস্মিন্ যথা দেহে কৌমারং যৌবনং জরা।
তথা দেহান্তরপ্রাপ্তির্ধীরস্তত্র ন মুহ্যতি॥১৩॥

মাত্রাস্পর্শাস্তু কৌন্তেয় শীতোষ্ণসুখদুঃখদাঃ।
আগমাপায়িনোঽনিত্যাস্তাংস্তিতিক্ষস্ব ভারত॥১৪॥

যং হি ন ব্যথয়ন্ত্যেতে পুরুষং পুরুষর্ষভ।
সমদুঃখসুখং ধীরং সোঽমৃতত্বায় কল্পতে॥১৫॥

নাসতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সতঃ।
উভয়োরপি দৃষ্টোঽন্তস্ত্বনয়োস্তত্ত্বদর্শিভিঃ॥১৬॥

অবিনাশি তু তদ্বিদ্ধি যেন সর্বমিদং ততম্।
বিনাশমব্যয়স্যাস্য ন কশ্চিৎ কর্তুমর্হতি॥১৭॥

অন্তবন্ত ইমে দেহা নিত্যস্যোক্তাঃ শরীরিণঃ।
অনাশিনোঽপ্রমেয়স্য তস্মাদ্ যুধ্যস্ব ভারত॥১৮॥

য এনং বেত্তি হন্তারং যশ্চৈনং মন্যতে হতম্।
উভৌ তৌ ন বিজানীতো নায়ং হন্তি ন হন্যতে॥১৯॥

ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিন্
নায়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ।
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো
ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে॥২০॥

বেদাবিনাশিনং নিত্যং য এনমজমব্যয়ম্।
কথং স পুরুষঃ পার্থ কং ঘাতয়তি হন্তি কম্॥২১॥

বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়

নবানি গৃহ্ণাতি নরোঽপরাণি।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণা-
ন্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী॥২২॥
নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ।
ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ॥২৩॥
অচ্ছেদ্যোঽয়মদাহ্যোঽয়মক্লেদ্যোঽশোষ্য এব চ।
নিত্যঃ সর্বগতঃ স্থাণুরচলোঽয়ং সনাতনঃ॥২৪॥
অব্যক্তোঽয়মচিন্ত্যোঽয়মবিকার্যোঽয়মুচ্যতে।
তস্মাদেবং বিদিত্বৈনং নানুশোচিতুমর্হসি॥২৫॥
অথ চৈনং নিত্যজাতং নিত্যং বা মন্যসে মৃতম্‌।
তথাপি ত্বং মহাবাহো নৈবং শোচিতুমর্হসি॥২৬॥
জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যুর্ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ।
তস্মাদপরিহার্যেঽর্থে ন ত্বং শোচিতুমর্হসি॥২৭॥
অব্যক্তাদীনি ভূতানি ব্যক্তমধ্যানি ভারত।
অব্যক্তনিধনান্যেব তত্র কা পরিদেবনা॥২৮॥
আশ্চর্যবৎ পশ্যতি কশ্চিদেন-
মাশ্চর্যবদ্বদতি তথৈব চান্যঃ।
আশ্চর্যবচ্চৈনমন্যঃ শৃণোতি
শ্রুত্বাপ্যেনং বেদ ন চৈব কশ্চিৎ॥২৯॥
দেহী নিত্যমবধ্যোঽয়ং দেহে সর্বস্য ভারত।
তস্মাৎ সর্বাণি ভূতানি ন ত্বং শোচিতুমর্হসি॥৩০॥
স্বধর্মমপি চাবেক্ষ্য ন বিকম্পিতুমর্হসি।
ধর্ম্যাদ্ধি যুদ্ধাচ্ছ্রেয়োঽন্যৎ ক্ষত্রিয়স্য ন বিদ্যতে॥৩১॥
যদৃচ্ছয়া চোপপন্নং স্বর্গদ্বারমপাবৃতম্‌।
সুখিনঃ ক্ষত্রিয়াঃ পার্থ লভন্তে যুদ্ধমীদৃশম্‌॥৩২॥
অথ চেৎ ত্বমিমং ধর্ম্যং সংগ্রামং ন করিষ্যসি।
ততঃ স্বধর্মং কীর্তিং চ হিত্বা পাপমবাপ্স্যসি॥৩৩॥
অকীর্তিং চাপি ভূতানি কথয়িষ্যন্তি তেঽব্যয়াম্‌।

সম্ভাবিতস্য চাকীর্তির্মরণাদতিরিচ্যতে॥৩৪॥

ভয়াদ্রণাদুপরতং মংস্যন্তে ত্বাং মহারথাঃ।
যেষাং চ ত্বং বহুমতো ভূত্বা যাস্যসি লাঘবম্॥৩৫॥

অবাচ্যবাদাংশ্চ বহূন্ বদিষ্যন্তি তবাহিতাঃ।
নিন্দন্তস্তব সামর্থ্যং ততো দুঃখতরং নু কিম্॥৩৬॥

হতো বা প্রাপ্স্যসি স্বর্গং জিত্বা বা ভোক্ষ্যসে মহীম্।
তস্মাদুত্তিষ্ঠ কৌন্তেয় যুদ্ধায় কৃতনিশ্চয়ঃ॥৩৭॥

সুখদুঃখে সমে কৃত্বা লাভালাভৌ জয়াজয়ৌ।
ততো যুদ্ধায় যুজ্যস্ব নৈবং পাপমবাপ্স্যসি॥৩৮॥

এষা তেঽভিহিতা সাংখ্যে বুদ্ধির্যোগে ত্বিমাং শৃণু।
বুদ্ধ্যা যুক্তো যয়া পার্থ কর্মবন্ধং প্রহাস্যসি॥৩৯॥

নেহাভিক্রমনাশোঽস্তি প্রত্যবায়ো ন বিদ্যতে।
স্বল্পমপ্যস্য ধর্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ॥৪০॥

ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিরেকেহ কুরুনন্দন।
বহুশাখা হ্যনন্তাশ্চ বুদ্ধয়োঽব্যবসায়িনাম্॥৪১॥

যামিমাং পুষ্পিতাং বাচং প্রবদন্ত্যবিপশ্চিতঃ।
বেদবাদরতাঃ পার্থ নান্যদস্তীতি বাদিনঃ॥৪২॥

কামাত্মানঃ স্বর্গপরা জন্মকর্মফলপ্রদাম্।
ক্রিয়াবিশেষবহুলাং ভোগৈশ্বর্যগতিং প্রতি॥৪৩॥

ভোগৈশ্বর্যপ্রসক্তানাং তয়াপহৃতচেতসাম্।
ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিঃ সমাধৌ ন বিধীয়তে॥৪৪॥

ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদা নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জুন।
নির্দ্বন্দ্বো নিত্যসত্ত্বস্থো নির্যোগক্ষেম আত্মবান্॥৪৫॥

যাবানর্থ উদপানে সর্বতঃ সংপ্লুতোদকে।
তাবান্ সর্বেষু বেদেষু ব্রাহ্মণস্য বিজানতঃ॥৪৬॥

কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।
মা কর্মফলহেতুর্ভূর্মা তে সঙ্গোঽস্ত্বকর্মণি॥৪৭॥

যোগস্থঃ কুরু কর্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ধনঞ্জয়।

সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমো ভূত্বা সমত্বং যোগ উচ্যতে॥৪৮॥

দূরেণ হ্যবরং কর্ম বুদ্ধিযোগাদ্ ধনঞ্জয়।
বুদ্ধৌ শরণমন্বিচ্ছ কৃপণাঃ ফলহেতবঃ॥৪৯॥

বুদ্ধিযুক্তো জহাতীহ উভে সুকৃতদুষ্কৃতে।
তস্মাদ্ যোগায় যুজ্যস্ব যোগঃ কর্মসু কৌশলম্॥৫০॥

কর্মজং বুদ্ধিযুক্তা হি ফলং ত্যক্ত্বা মনীষিণঃ।
জন্মবন্ধবিনির্মুক্তাঃ পদং গচ্ছন্ত্যনাময়ম্॥৫১॥

যদা তে মোহকলিলং বুদ্ধির্ব্যতিতরিষ্যতি।
তদা গন্তাসি নির্বেদং শ্রোতব্যস্য শ্রুতস্য চ॥৫২॥

শ্রুতিবিপ্রতিপন্না তে যদা স্থাস্যতি নিশ্চলা।
সমাধাবচলা বুদ্ধিস্তদা যোগমবাপ্স্যসি॥৫৩॥

অর্জুন উবাচ

স্থিতপ্রজ্ঞস্য কা ভাষা সমাধিস্থস্য কেশব।
স্থিতধীঃ কিং প্রভাষেত কিমাসীত ব্রজেত কিম্॥৫৪॥

শ্রীভগবানুবাচ

প্রজহাতি যদা কামান্ সর্বান্ পার্থ মনোগতান্।
আত্মন্যেবাত্মনা তুষ্টঃ স্থিতপ্রজ্ঞস্তদোচ্যতে॥৫৫॥

দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ।
বীতরাগভয়ক্রোধঃ স্থিতধীর্মুনিরুচ্যতে॥৫৬॥

যঃ সর্বত্রানভিস্নেহস্তত্তৎ প্রাপ্য শুভাশুভম্।
নাভিনন্দতি ন দ্বেষ্টি . তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা॥৫৭॥

যদা সংহরতে চায়ং কূর্মোঽঙ্গানীব সর্বশঃ।
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেভ্যস্তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা॥৫৮॥

বিষয়া বিনিবর্তন্তে নিরাহারস্য দেহিনঃ।
রসবর্জং রসোঽপ্যস্য পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ততে॥৫৯॥

যততো হ্যপি কৌন্তেয় পুরুষস্য বিপশ্চিতঃ।
ইন্দ্রিয়াণি প্রমাথীনি হরন্তি প্রসভং মনঃ॥৬০॥

তানি সর্বাণি সংযম্য যুক্ত আসীত মৎপরঃ।

বশে হি যস্যেন্দ্রিয়াণি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা॥৬১॥

ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গস্তেষূপজায়তে।
সঙ্গাৎ সঞ্জায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোঽভিজায়তে॥৬২॥

ক্রোধাদ্ভবতি সম্মোহঃ সম্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ।
স্মৃতিভ্রংশাদ্ বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি॥৬৩॥

রাগদ্বেষবিযুক্তৈস্তু বিষয়ানিন্দ্রিয়ৈশ্চরন্।
আত্মবশ্যৈর্বিধেয়াত্মা প্রসাদমধিগচ্ছতি॥৬৪॥

প্রসাদে সর্বদুঃখানাং হানিরস্যোপজায়তে।
প্রসন্নচেতসো হ্যাশু বুদ্ধিঃ পর্যবতিষ্ঠতে॥৬৫॥

নাস্তি বুদ্ধিরযুক্তস্য ন চাযুক্তস্য ভাবনা।
ন চাভাবয়তঃ শান্তিরশান্তস্য কুতঃ সুখম্॥৬৬॥

ইন্দ্রিয়াণাং হি চরতাং যন্মনোঽনুবিধীয়তে।
তদস্য হরতি প্রজ্ঞাং বায়ুর্নাবমিবাম্ভসি॥৬৭॥

তস্মাদ্ যস্য মহাবাহো নিগৃহীতানি সর্বশঃ।
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেভ্যস্তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা॥৬৮॥

যা নিশা সর্বভূতানাং তস্যাং জাগর্তি সংযমী।
যস্যাং জাগ্রতি ভূতানি সা নিশা পশ্যতো মুনেঃ॥৬৯॥

আপূর্যমাণমচলপ্রতিষ্ঠং-
সমুদ্রমাপঃ প্রবিশন্তি যদ্বৎ।
তদ্বৎকামা যং প্রবিশন্তি সর্বে
স শান্তিমাপ্নোতি ন কামকামী॥৭০॥

বিহায় কামান্ যঃ সর্বান্ পুমাংশ্চরতি নিঃস্পৃহঃ।
নির্মমো নিরহঙ্কারঃ স শান্তিমধিগচ্ছতি॥৭১॥

এষা ব্রাহ্মী স্থিতিঃ পার্থ নৈনাং প্রাপ্য বিমুহ্যতি।
স্থিত্বাস্যামন্তকালেঽপি ব্রহ্মনির্বাণমৃচ্ছতি॥৭২॥

ওঁ তৎসদিতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে সাংখ্যযোগো নাম দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ॥ ২

———o———

অথ তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ

অর্জুন উবাচ

জ্যায়সী চেৎ কর্মণস্তে মতা বুদ্ধির্জনার্দন।
তৎ কিং কর্মণি ঘোরে মাং নিয়োজয়সি কেশব॥ ১ ॥

ব্যামিশ্রেণেব বাক্যেন বুদ্ধিং মোহয়সীব মে।
তদেকং বদ নিশ্চিত্য যেন শ্রেয়োঽহমাপ্নুয়াম্॥ ২ ॥

শ্রীভগবানুবাচ

লোকেঽস্মিন্ দ্বিবিধা নিষ্ঠা পুরা প্রোক্তা ময়ানঘ।
জ্ঞানযোগেন সাংখ্যানাং কর্মযোগেন যোগিনাম্॥ ৩ ॥

ন কর্মণামনারম্ভান্নৈষ্কর্ম্যং পুরুষোঽশ্নুতে।
ন চ সন্ন্যসনাদেব সিদ্ধিং সমধিগচ্ছতি॥ ৪ ॥

ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্মকৃৎ।
কার্যতে হ্যবশঃ কর্ম সর্বঃ প্রকৃতিজৈর্গুণৈঃ॥ ৫ ॥

কর্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য য আস্তে মনসা স্মরন্।
ইন্দ্রিয়ার্থান্ বিমূঢ়াত্মা মিথ্যাচারঃ স উচ্যতে॥ ৬ ॥

যস্ত্বিন্দ্রিয়াণি মনসা নিয়ম্যারভতেঽর্জুন।
কর্মেন্দ্রিয়ৈঃ কর্মযোগমসক্তঃ স বিশিষ্যতে॥ ৭ ॥

নিয়তং কুরু কর্ম ত্বং কর্ম জ্যায়ো হ্যকর্মণঃ।
শরীরযাত্রাপি চ তে ন প্রসিদ্ধ্যেদকর্মণঃ॥ ৮ ॥

যজ্ঞার্থাৎ কর্মণোঽন্যত্র লোকোঽয়ং কর্মবন্ধনঃ।
তদর্থং কর্ম কৌন্তেয় মুক্তসঙ্গঃ সমাচর॥ ৯ ॥

সহযজ্ঞাঃ প্রজাঃ সৃষ্ট্বা পুরোবাচ প্রজাপতিঃ।
অনেন প্রসবিষ্যধ্বমেষ বোঽস্ত্বিষ্টকামধুক্॥১০॥

দেবান্ ভাবয়তানেন তে দেবা ভাবয়ন্তু বঃ।
পরস্পরং ভাবয়ন্তঃ শ্রেয়ঃ পরমবাপ্স্যথ॥১১॥

ইষ্টান্ ভোগান্ হি বো দেবা দাস্যন্তে যজ্ঞভাবিতাঃ।
তৈর্দত্তানপ্রদায়ৈভ্যো যো ভুঙ্‌ক্তে স্তেন এব সঃ॥১২॥

যজ্ঞশিষ্টাশিনঃ সন্তো মুচ্যন্তে সর্বকিল্বিষৈঃ।
ভুঞ্জতে তে ত্বঘং পাপা যে পচন্ত্যাত্মকারণাৎ॥১৩॥

অন্নাদ্ ভবন্তি ভূতানি পর্জন্যাদন্নসম্ভবঃ।
যজ্ঞাদ্ ভবতি পর্জন্যো যজ্ঞঃ কর্মসমুদ্ভবঃ॥১৪॥

কর্ম ব্রহ্মোদ্ভবং বিদ্ধি ব্রহ্মাক্ষরসমুদ্ভবম্।
তস্মাৎ সর্বগতং ব্রহ্ম নিত্যং যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতম্॥১৫॥

এবং প্রবর্তিতং চক্রং নানুবর্তয়তীহ যঃ।
অঘায়ুরিন্দ্রিয়ারামো মোঘং পার্থ স জীবতি॥১৬॥

যস্ত্বাত্মরতিরেব স্যাদাত্মতৃপ্তশ্চ মানবঃ।
আত্মন্যেব চ সন্তুষ্টস্তস্য কার্যং ন বিদ্যতে॥১৭॥

নৈব তস্য কৃতেনার্থো নাকৃতেনেহ কশ্চন।
ন চাস্য সর্বভূতেষু কশ্চিদর্থব্যপাশ্রয়ঃ॥১৮॥

তস্মাদসক্তঃ সততং কার্যং কর্ম সমাচর।
অসক্তো হ্যাচরন্ কর্ম পরমাপ্নোতি পূরুষঃ॥১৯॥

কর্মণৈব হি সংসিদ্ধিমাস্থিতা জনকাদয়ঃ।
লোকসংগ্রহমেবাপি সংপশ্যন্ কর্তুমর্হসি॥২০॥

যদ্ যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ।
স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ততে॥২১॥

ন মে পার্থাস্তি কর্তব্যং ত্রিষু লোকেষু কিঞ্চন।
নানবাপ্তমবাপ্তব্যং বর্ত এব চ কর্মণি॥২২॥

যদি হ্যহং ন বর্তেয়ং জাতু কর্মণ্যতন্দ্রিতঃ।
মম বর্ত্মানুবর্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্বশঃ॥২৩॥

উৎসীদেয়ুরিমে লোকা ন কুর্যাং কর্ম চেদহম্।
সঙ্করস্য চ কর্তা স্যামুপহন্যামিমাঃ প্রজাঃ॥২৪॥

সক্তাঃ কর্মণ্যবিদ্বাংসো যথা কুর্বন্তি ভারত।
কুর্যাদ্বিদ্বাংস্তথাসক্তশ্চিকীর্ষুর্লোকসংগ্রহম্ ॥২৫॥

ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্মসঙ্গিনাম্।
জোষয়েৎ সর্বকর্মাণি বিদ্বান্ যুক্তঃ সমাচরন্॥২৬॥

প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্মাণি সর্বশঃ।
অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্তাহমিতি মন্যতে॥২৭॥

তত্ত্ববিত্তু মহাবাহো গুণকর্মবিভাগয়োঃ।
গুণা গুণেষু বর্তন্ত ইতি মত্বা ন সজ্জতে॥২৮॥

প্রকৃতের্গুণসম্মূঢ়াঃ সজ্জন্তে গুণকর্মসু।
তানকৃৎস্নবিদো মন্দান্ কৃৎস্নবিন্ন বিচালয়েৎ॥২৯॥

ময়ি সর্বাণি কর্মাণি সন্ন্যস্যাধ্যাত্মচেতসা।
নিরাশীর্নির্মমো ভূত্বা যুধ্যস্ব বিগতজ্বরঃ॥৩০॥

যে মে মতমিদং নিত্যমনুতিষ্ঠন্তি মানবাঃ।
শ্রদ্ধাবন্তোঽনসূয়ন্তো মুচ্যন্তে তেঽপি কর্মভিঃ॥৩১॥

যে ত্বেতদভ্যসূয়ন্তো নানুতিষ্ঠন্তি মে মতম্।
সর্বজ্ঞানবিমূঢ়াংস্তান্ বিদ্ধি নষ্টানচেতসঃ॥৩২॥

সদৃশং চেষ্টতে স্বস্যাঃ প্রকৃতের্জ্ঞানবানপি।
প্রকৃতিং যান্তি ভূতানি নিগ্রহঃ কিং করিষ্যতি॥৩৩॥

ইন্দ্রিয়স্যেন্দ্রিয়স্যার্থে রাগদ্বেষৌ ব্যবস্থিতৌ।
তয়োর্ন বশমাগচ্ছেৎ তৌ হ্যস্য পরিপন্থিনৌ॥৩৪॥

শ্রেয়ান্ স্বধর্মো বিগুণঃ পরধর্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।
স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্মো ভয়াবহঃ॥৩৫॥

অর্জুন উবাচ

অথ কেন প্রযুক্তোঽয়ং পাপং চরতি পূরুষঃ।
অনিচ্ছন্নপি বার্ষ্ণেয় বলাদিব নিয়োজিতঃ॥৩৬॥

শ্রীভগবানুবাচ

কাম এষ ক্রোধ এষ রজোগুণসমুদ্ভবঃ।
মহাশনো মহাপাপ্মা বিদ্ধ্যেনমিহ বৈরিণম্॥৩৭॥

ধূমেনাব্রিয়তে বহ্নির্যথাদর্শো মলেন চ।
যথোল্বেনাবৃতো গর্ভস্তথা তেনেদমাবৃতম্॥৩৮॥

আবৃতং জ্ঞানমেতেন জ্ঞানিনো নিত্যবৈরিণা।
কামরূপেণ কৌন্তেয় দুষ্পূরেণানলেন চ॥৩৯॥

ইন্দ্রিয়াণি মনো বুদ্ধিরস্যাধিষ্ঠানমুচ্যতে।
এতৈর্বিমোহয়ত্যেষ জ্ঞানমাবৃত্য দেহিনম্॥৪০॥

তস্মাৎ ত্বমিন্দ্রিয়াণ্যাদৌ নিয়ম্য ভরতর্ষভ।
পাপ্মানং প্রজহি হ্যেনং জ্ঞানবিজ্ঞাননাশনম্॥৪১॥

ইন্দ্রিয়াণি পরাণ্যাহুরিন্দ্রিয়েভ্যঃ পরং মনঃ।
মনসস্তু পরা বুদ্ধির্যো বুদ্ধেঃ পরতস্তু সঃ॥৪২॥

এবং বুদ্ধেঃ পরং বুদ্ধা সংস্তভ্যাত্মানমাত্মনা।
জহি শত্রুং মহাবাহো কামরূপং দুরাসদম্॥৪৩॥

ওঁ তৎসদিতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে
শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে কর্মযোগো নাম তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ॥ ৩ ॥

অথ চতুর্থোঽধ্যায়ঃ

শ্রীভগবানুবাচ

ইমং বিবস্বতে যোগং প্রোক্তবানহমব্যয়ম্।
বিবস্বান্ মনবে প্রাহ মনুরিক্ষ্বাকবেঽব্রবীৎ॥ ১ ॥

এবং পরম্পরাপ্রাপ্তমিমং রাজর্ষয়ো বিদুঃ।
স কালেনেহ মহতা যোগো নষ্টঃ পরন্তপ॥ ২ ॥

স এবায়ং ময়া তেঽদ্য যোগঃ প্রোক্তঃ পুরাতনঃ।
ভক্তোঽসি মে সখা চেতি রহস্যং হ্যেতদুত্তমম্॥ ৩ ॥

অর্জুন উবাচ

অপরং ভবতো জন্ম পরং জন্ম বিবস্বতঃ।
কথমেতদ্বিজানীয়াং ত্বমাদৌ প্রোক্তবানিতি॥ ৪ ॥

শ্রীভগবানুবাচ

বহূনি মে ব্যতীতানি জন্মানি তব চার্জুন।
তান্যহং বেদ সর্বাণি ন ত্বং বেত্থ পরন্তপ॥ ৫ ॥

অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোঽপি সন্।
প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া॥ ৬ ॥

যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।

অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥ ৭ ॥
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥ ৮ ॥
জন্ম কর্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ।
ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি সোঽর্জুন॥ ৯ ॥
বীতরাগভয়ক্রোধা মন্ময়া মামুপাশ্রিতাঃ।
বহবো জ্ঞানতপসা পূতা মদ্ভাবমাগতাঃ॥১০॥
যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।
মম বর্ত্মানুবর্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্বশঃ॥১১॥
কাঙ্ক্ষন্তঃ কর্মণাং সিদ্ধিং যজন্ত ইহ দেবতাঃ।
ক্ষিপ্রং হি মানুষে লোকে সিদ্ধির্ভবতি কর্মজা॥১২॥
চাতুর্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্মবিভাগশঃ।
তস্য কর্তারমপি মাং বিদ্ধ্যকর্তারমব্যয়ম্॥১৩॥
ন মাং কর্মাণি লিম্পন্তি ন মে কর্মফলে স্পৃহা।
ইতি মাং যোঽভিজানাতি কর্মভির্ন স বধ্যতে॥১৪॥
এবং জ্ঞাত্বা কৃতং কর্ম পূর্বৈরপি মুমুক্ষুভিঃ।
কুরু কর্মৈব তস্মাৎ ত্বং পূর্বৈঃ পূর্বতরং কৃতম্॥১৫॥
কিং কর্ম কিমকর্মেতি কবয়োঽপ্যত্র মোহিতাঃ।
তত্তে কর্ম প্রবক্ষ্যামি যজ্ জ্ঞাত্বা মোক্ষ্যসেঽশুভাৎ॥১৬॥
কর্মণো হ্যপি বোদ্ধব্যং বোদ্ধব্যং চ বিকর্মণঃ।
অকর্মণশ্চ বোদ্ধব্যং গহনা কর্মণো গতিঃ॥১৭॥
কর্মণ্যকর্ম যঃ পশ্যেদকর্মণি চ কর্ম যঃ।
স বুদ্ধিমান্ মনুষ্যেষু স যুক্তঃ কৃৎস্নকর্মকৃৎ॥১৮॥
যস্য সর্বে সমারম্ভাঃ কামসঙ্কল্পবর্জিতাঃ।
জ্ঞানাগ্নিদগ্ধকর্মাণং তমাহুঃ পণ্ডিতং বুধাঃ॥১৯॥
ত্যক্ত্বা কর্মফলাসঙ্গং নিত্যতৃপ্তো নিরাশ্রয়ঃ।
কর্মণ্যভিপ্রবৃত্তোঽপি নৈব কিঞ্চিৎ করোতি সঃ॥২০॥
নিরাশীর্যতচিত্তাত্মা ত্যক্তসর্বপরিগ্রহঃ।

শারীরং কেবলং কর্ম কুর্বন্নাপ্নোতি কিল্বিষম্।।২১।।
যদৃচ্ছালাভসন্তুষ্টো দ্বন্দ্বাতীতো বিমৎসরঃ।
সমঃ সিদ্ধাবসিদ্ধৌ চ কৃত্বাপি ন নিবধ্যতে।।২২।।
গতসঙ্গস্য মুক্তস্য জ্ঞানাবস্থিতচেতসঃ।
যজ্ঞায়াচরতঃ কর্ম সমগ্রং প্রবিলীয়তে।।২৩।।
ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্ম হবির্ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণা হুতম্।
ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যং ব্রহ্মকর্মসমাধিনা।।২৪।।
দৈবমেবাপরে যজ্ঞং যোগিনঃ পর্যুপাসতে।
ব্রহ্মাগ্নাবপরে যজ্ঞং যজ্ঞেনৈবোপজুহ্বতি।।২৫।।
শ্রোত্রাদীনীন্দ্রিয়াণ্যন্যে সংযমাগ্নিষু জুহ্বতি।
শব্দাদীন্ বিষয়ানন্য ইন্দ্রিয়াগ্নিষু জুহ্বতি।।২৬।।
সর্বাণীন্দ্রিয়কর্মাণি প্রাণকর্মাণি চাপরে।
আত্মসংযমযোগাগ্নৌ জুহ্বতি জ্ঞানদীপিতে।।২৭।।
দ্রব্যযজ্ঞাস্তপোযজ্ঞা যোগযজ্ঞাস্তথাপরে।
স্বাধ্যায়জ্ঞানযজ্ঞাশ্চ যতয়ঃ সংশিতব্রতাঃ।।২৮।।
অপানে জুহ্বতি প্রাণং প্রাণেঽপানং তথাপরে।
প্রাণাপানগতী রুদ্ধ্বা প্রাণায়ামপরায়ণাঃ।।২৯।।
অপরে নিয়তাহারাঃ প্রাণান্ প্রাণেষু জুহ্বতি।
সর্বেঽপ্যেতে যজ্ঞবিদো যজ্ঞক্ষপিতকল্মষাঃ।।৩০।।
যজ্ঞশিষ্টামৃতভুজো যান্তি ব্রহ্ম সনাতনম্।
নায়ং লোকোঽস্ত্যযজ্ঞস্য কুতোঽন্যঃ কুরুসত্তম।।৩১।।
এবং বহুবিধা যজ্ঞা বিততা ব্রহ্মণো মুখে।
কর্মজান্ বিদ্ধি তান্ সর্বানেবং জ্ঞাত্বা বিমোক্ষ্যসে।।৩২।।
শ্রেয়ান্ দ্রব্যময়াদ্ যজ্ঞাজ্ জ্ঞানযজ্ঞঃ পরন্তপ।
সর্বং কর্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে।।৩৩।।
তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ।।৩৪।।
যজ্ জ্ঞাত্বা ন পুনর্মোহমেবং যাস্যসি পাণ্ডব।

যেন ভূতান্যশেষেণ দ্রক্ষ্যস্যাত্মন্যথো ময়ি॥৩৫॥
অপি চেদসি পাপেভ্যঃ সর্বেভ্যঃ পাপকৃত্তমঃ।
সর্বং জ্ঞানপ্লবেনৈব বৃজিনং সন্তরিষ্যসি॥৩৬॥
যথৈধাংসি সমিদ্ধোঽগ্নির্ভস্মসাৎ কুরুতেঽর্জুন।
জ্ঞানাগ্নিঃ সর্বকর্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা॥৩৭॥
ন হি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহ বিদ্যতে।
তৎ স্বয়ং যোগসংসিদ্ধঃ কালেনাত্মনি বিন্দতি ॥৩৮॥
শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানং তৎপরঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ।
জ্ঞানং লব্ধা পরাং শান্তিমচিরেণাধিগচ্ছতি॥৩৯॥
অজ্ঞশ্চাশ্রদ্দধানশ্চ সংশয়াত্মা বিনশ্যতি।
নায়ং লোকোঽস্তি ন পরো ন সুখং সংশয়াত্মনঃ॥৪০॥
যোগসন্ন্যস্তকর্মাণং জ্ঞানসংছিন্নসংশয়ম্।
আত্মবন্তং ন কর্মাণি নিবধ্নন্তি ধনঞ্জয়॥৪১॥
তস্মাদজ্ঞানসম্ভূতং হৃৎস্থং জ্ঞানাসিনাত্মনঃ।
ছিত্ত্বৈনং সংশয়ং যোগমাতিষ্ঠোত্তিষ্ঠ ভারত॥৪২॥

ওঁ তৎসদিতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে জ্ঞানকর্মসন্ন্যাসযোগো নাম চতুর্থোঽধ্যায়ঃ ॥

অথ পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ

অর্জুন উবাচ

সন্ন্যাসং কর্মণাং কৃষ্ণ পুনর্যোগং চ শংসসি।
যচ্ছ্রেয় এতয়োরেকং তন্মে ব্রূহি সুনিশ্চিতম্॥ ১ ॥

শ্রীভগবানুবাচ

সন্ন্যাসঃ কর্মযোগশ্চ নিঃশ্রেয়সকরাবুভৌ।
তয়োস্তু কর্মসন্ন্যাসাৎ কর্মযোগো বিশিষ্যতে॥ ২ ॥
জ্ঞেয়ঃ স নিত্যসন্ন্যাসী যো ন দ্বেষ্টি ন কাঙ্ক্ষতি।
নির্দ্বন্দ্বো হি মহাবাহো সুখং বন্ধাৎ প্রমুচ্যতে॥ ৩ ॥

সাংখ্যযোগৌ পৃথগ্বালাঃ প্রবদন্তি ন পণ্ডিতাঃ।
একমপ্যাস্থিতঃ সম্যগুভয়োর্বিন্দতে ফলম্॥ ৪ ॥

যৎ সাংখ্যৈঃ প্রাপ্যতে স্থানং তদ্‌যোগৈরপি গম্যতে।
একং সাংখ্যং চ যোগং চ যঃ পশ্যতি স পশ্যতি॥ ৫ ॥

সন্ন্যাসস্তু মহাবাহো দুঃখমাপ্তুমযোগতঃ।
যোগযুক্তো মুনির্ব্রহ্ম নচিরেণাধিগচ্ছতি॥ ৬ ॥

যোগযুক্তো বিশুদ্ধাত্মা বিজিতাত্মা জিতেন্দ্রিয়ঃ।
সর্বভূতাত্মভূতাত্মা কুর্বন্নপি ন লিপ্যতে॥ ৭ ॥

নৈব কিঞ্চিৎ করোমীতি যুক্তো মন্যেত তত্ত্ববিৎ।
পশ্যন্ শৃণ্বন্ স্পৃশন্ জিঘ্রন্ অশ্নন্ গচ্ছন্ স্বপন্ শ্বসন্॥ ৮ ॥

প্রলপন্ বিসৃজন্ গৃহ্নন্ উন্মিষন্ নিমিষন্নপি।
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেষু বর্তন্ত ইতি ধারয়ন্॥ ৯ ॥

ব্রহ্মণ্যাধায় কর্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা করোতি যঃ।
লিপ্যতে ন স পাপেন পদ্মপত্রমিবাম্ভসা॥১০॥

কায়েন মনসা বুদ্ধ্যা কেবলৈরিন্দ্রিয়ৈরপি।
যোগিনঃ কর্ম কুর্বন্তি সঙ্গং ত্যক্ত্বাত্মশুদ্ধয়ে॥১১॥

যুক্তঃ কর্মফলং ত্যক্ত্বা শান্তিমাপ্নোতি নৈষ্ঠিকীম্।
অযুক্তঃ কামকারেণ ফলে সক্তো নিবধ্যতে॥১২॥

সর্বকর্মাণি মনসা সন্ন্যস্যাস্তে সুখং বশী।
নবদ্বারে পুরে দেহী নৈব কুর্বন্ ন কারয়ন্॥১৩॥

ন কর্তৃত্বং ন কর্মাণি লোকস্য সৃজতি প্রভুঃ।
ন কর্মফলসংযোগং স্বভাবস্তু প্রবর্ততে॥১৪॥

নাদত্তে কস্যচিৎ পাপং ন চৈব সুকৃতং বিভুঃ।
অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানং তেন মুহ্যন্তি জন্তবঃ॥১৫॥

জ্ঞানেন তু তদজ্ঞানং যেষাং নাশিতমাত্মনঃ।
তেষামাদিত্যবজ্ জ্ঞানং প্রকাশয়তি তৎ পরম্॥১৬॥

তদ্‌বুদ্ধয়স্তদাত্মানস্তন্নিষ্ঠাস্তৎপরায়ণাঃ।
গচ্ছন্ত্যপুনরাবৃত্তিং জ্ঞাননির্ধূতকল্মষাঃ॥১৭॥

বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি।
শুনি চৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ॥১৮॥

ইহৈব তৈর্জিতঃ সর্গো যেষাং সাম্যে স্থিতং মনঃ।
নির্দোষং হি সমং ব্রহ্ম তস্মাদ্ ব্রহ্মণি তে স্থিতাঃ॥১৯॥

ন প্রহৃষ্যেৎ প্রিয়ং প্রাপ্য নোদ্বিজেৎ প্রাপ্য চাপ্রিয়ম্।
স্থিরবুদ্ধিরসম্মূঢ়ো ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মণি স্থিতঃ॥২০॥

বাহ্যস্পর্শেষ্বসক্তাত্মা বিন্দত্যাত্মনি যৎ সুখম্।
স ব্রহ্মযোগযুক্তাত্মা সুখমক্ষয়মশ্নুতে॥২১॥

যে হি সংস্পর্শজা ভোগা দুঃখযোনয় এব তে।
আদ্যন্তবন্তঃ কৌন্তেয় ন তেষু রমতে বুধঃ॥২২॥

শক্নোতীহৈব যঃ সোঢ়ং প্রাক্ শরীরবিমোক্ষণাৎ।
কামক্রোধোদ্ভবং বেগং স যুক্তঃ স সুখী নরঃ॥২৩॥

যোঽন্তঃসুখোঽন্তরারামস্তথান্তর্জ্যোতিরেব যঃ।
স যোগী ব্রহ্মনির্বাণং ব্রহ্মভূতোঽধিগচ্ছতি॥২৪॥

লভন্তে ব্রহ্মনির্বাণমৃষয়ঃ ক্ষীণকল্মষাঃ।
ছিন্নদ্বৈধা যতাত্মানঃ সর্বভূতহিতে রতাঃ॥২৫॥

কামক্রোধবিযুক্তানাং যতীনাং যতচেতসাম্।
অভিতো ব্রহ্মনির্বাণং বর্ততে বিদিতাত্মনাম্॥২৬॥

স্পর্শান্ কৃত্বা বহির্বাহ্যাংশ্চক্ষুশ্চৈবান্তরে ভ্রুবোঃ।
প্রাণাপানৌ সমৌ কৃত্বা নাসাভ্যন্তরচারিণৌ॥২৭॥

যতেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধির্মুনির্মোক্ষপরায়ণঃ।
বিগতেচ্ছাভয়ক্রোধো যঃ সদা মুক্ত এব সঃ॥২৮॥

ভোক্তারং যজ্ঞতপসাং সর্বলোকমহেশ্বরম্।
সুহৃদং সর্বভূতানাং জ্ঞাত্বা মাং শান্তিমৃচ্ছতি॥২৯॥

ওঁ তৎসদিতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে কর্মসন্ন্যাসযোগো নাম পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ ॥

অথ ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ

শ্রীভগবানুবাচ

অনাশ্রিতঃ কর্মফলং কার্যং কর্ম করোতি যঃ।
স সন্ন্যাসী চ যোগী চ ন নিরগ্নির্ন চাক্রিয়ঃ॥ ১ ॥

যং সন্ন্যাসমিতি প্রাহুর্যোগং তং বিদ্ধি পাণ্ডব।
ন হ্যসন্ন্যস্তসঙ্কল্পো যোগী ভবতি কশ্চন॥ ২ ॥

আরুরুক্ষোর্মুনের্যোগং কর্ম কারণমুচ্যতে।
যোগারূঢ়স্য তস্যৈব শমঃ কারণমুচ্যতে॥ ৩ ॥

যদা হি নেন্দ্রিয়ার্থেষু ন কর্মস্বনুষজ্জতে।
সর্বসঙ্কল্পসন্ন্যাসী যোগারূঢ়স্তদোচ্যতে॥ ৪ ॥

উদ্ধরেদাত্মনাত্মানং নাত্মানমবসাদয়েৎ।
আত্মৈব হ্যাত্মনো বন্ধুরাত্মৈব রিপুরাত্মনঃ॥ ৫ ॥

বন্ধুরাত্মাত্মনস্তস্য যেনাত্মৈবাত্মনা জিতঃ।
অনাত্মনস্তু শত্রুত্বে বর্তেতাত্মৈব শত্রুবৎ॥ ৬ ॥

জিতাত্মনঃ প্রশান্তস্য পরমাত্মা সমাহিতঃ।
শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু তথা মানাপমানয়োঃ॥ ৭ ॥

জ্ঞানবিজ্ঞানতৃপ্তাত্মা কূটস্থো বিজিতেন্দ্রিয়ঃ।
যুক্ত ইত্যুচ্যতে যোগী সমলোষ্টাশ্মকাঞ্চনঃ॥ ৮ ॥

সুহৃন্মিত্রার্যুদাসীনমধ্যস্থদ্বেষ্যবন্ধুষু।
সাধুষ্বপি চ পাপেষু সমবুদ্ধির্বিশিষ্যতে॥ ৯ ॥

যোগী যুঞ্জীত সততমাত্মানং রহসি স্থিতঃ।
একাকী যতচিত্তাত্মা নিরাশীরপরিগ্রহঃ॥১০॥

শুচৌ দেশে প্রতিষ্ঠাপ্য স্থিরমাসনমাত্মনঃ।
নাত্যুচ্ছ্রিতং নাতিনীচং চৈলাজিনকুশোত্তরম্॥১১॥

তত্রৈকাগ্রং মনঃ কৃত্বা যতচিত্তেন্দ্রিয়ক্রিয়ঃ।
উপবিশ্যাসনে যুঞ্জ্যাদ্ যোগমাত্মবিশুদ্ধয়ে॥১২॥

সমং কায়শিরোগ্রীবং ধারয়ন্নচলং স্থিরঃ।
সম্প্রেক্ষ্য নাসিকাগ্রং স্বং দিশশ্চানবলোকয়ন্॥১৩॥

প্রশান্তাত্মা বিগতভীর্ব্রহ্মচারিব্রতে স্থিতঃ।
মনঃ সংযম্য মচ্চিত্তো যুক্ত আসীত মৎপরঃ॥১৪॥

যুঞ্জন্নেবং সদাত্মানং যোগী নিয়তমানসঃ।
শান্তিং নির্বাণপরমাং মৎসংস্থামধিগচ্ছতি॥১৫॥

নাত্যশ্নতস্তু যোগোঽস্তি ন চৈকান্তমনশ্নতঃ।
ন চাতি স্বপ্নশীলস্য জাগ্রতো নৈব চার্জুন॥১৬॥

যুক্তাহারবিহারস্য যুক্তচেষ্টস্য কর্ম্মসু।
যুক্তস্বপ্নাববোধস্য যোগো ভবতি দুঃখহা॥১৭॥

যদা বিনিয়তং চিত্তমাত্মন্যেবাবতিষ্ঠতে।
নিঃস্পৃহঃ সর্বকামেভ্যো যুক্ত ইত্যুচ্যতে তদা॥১৮॥

যথা দীপো নিবাতস্থো নেঙ্গতে সোপমা স্মৃতা।
যোগিনো যতচিত্তস্য যুঞ্জতো যোগমাত্মনঃ॥১৯॥

যত্রোপরমতে চিত্তং নিরুদ্ধং যোগসেবয়া।
যত্র চৈবাত্মনাত্মানং পশ্যন্নাত্মনি তুষ্যতি॥২০॥

সুখমাত্যন্তিকং যত্তদ্ বুদ্ধিগ্রাহ্যমতীন্দ্রিয়ম্।
বেত্তি যত্র ন চৈবায়ং স্থিতশ্চলতি তত্ত্বতঃ॥২১॥

যং লব্ধা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ।
যস্মিন্ স্থিতো ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে॥২২॥

তং বিদ্যাদ্দুঃখসংযোগবিয়োগং যোগসংজ্ঞিতম্।
স নিশ্চয়েন যোক্তব্যো যোগোঽনির্বিণ্ণচেতসা॥২৩॥

সঙ্কল্পপ্রভবান্ কামান্ ত্যক্তা সর্বানশেষতঃ।
মনসৈবেন্দ্রিয়গ্রামং বিনিয়ম্য সমন্ততঃ॥২৪॥

শনৈঃ শনৈরুপরমেদ্বুদ্ধ্যা ধৃতিগৃহীতয়া।
আত্মসংস্থং মনঃ কৃত্বা ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েৎ॥২৫॥

যতো যতো নিশ্চরতি মনশ্চঞ্চলমস্থিরম্।
ততস্ততো নিয়ম্যৈতদাত্মন্যেব বশং নয়েৎ॥২৬॥

প্রশান্তমনসং হ্যেনং যোগিনং সুখমুত্তমম্।
উপৈতি শান্তরজসং ব্রহ্মভূতমকল্মষম্॥২৭॥

যুঞ্জন্নেবং সদাত্মানং যোগী বিগতকল্মষঃ।
সুখেন ব্রহ্মসংস্পর্শমত্যন্তং সুখমশ্নুতে॥২৮॥

সর্বভূতস্থমাত্মানং সর্বভূতানি চাত্মনি।
ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্বত্র সমদর্শনঃ॥২৯॥

যো মাং পশ্যতি সর্বত্র সর্বং চ ময়ি পশ্যতি।
তস্যাহং ন প্রণশ্যামি স চ মে ন প্রণশ্যতি॥৩০॥

সর্বভূতস্থিতং যো মাং ভজত্যেকত্বমাস্থিতঃ।
সর্বথা বর্তমানোঽপি স যোগী ময়ি বর্ততে॥৩১॥

আত্মৌপম্যেন সর্বত্র সমং পশ্যতি যোঽর্জুন।
সুখং বা যদি বা দুঃখং স যোগী পরমো মতঃ॥৩২॥

অর্জুন উবাচ

যোঽয়ং যোগস্ত্বয়া প্রোক্তঃ সাম্যেন মধুসূদন।
এতস্যাহং ন পশ্যামি চঞ্চলত্বাৎ স্থিতিং স্থিরাম্॥৩৩॥

চঞ্চলং হি মনঃ কৃষ্ণ প্রমাথি বলবৎ দৃঢ়ম্।
তস্যাহং নিগ্রহং মন্যে বায়োরিব সুদুষ্করম্॥৩৪॥

শ্রীভগবানুবাচ

অসংশয়ং মহাবাহো মনো দুর্নিগ্রহং চলম্।
অভ্যাসেন তু কৌন্তেয় বৈরাগ্যেণ চ গৃহ্যতে॥৩৫॥

অসংযতাত্মনা যোগো দুষ্প্রাপ ইতি মে মতিঃ।
বশ্যাত্মনা তু যততা শক্যোঽবাপ্তুমুপায়তঃ॥৩৬॥

অর্জুন উবাচ

অযতিঃ শ্রদ্ধয়োপেতো যোগাচ্চলিতমানসঃ।
অপ্রাপ্য যোগসংসিদ্ধিং কাং গতিং কৃষ্ণ গচ্ছতি॥৩৭॥

কচ্চিন্নোভয়বিভ্রষ্টশ্ছিন্নাভ্রমিব নশ্যতি।
অপ্রতিষ্ঠো মহাবাহো বিমূঢ়ো ব্রহ্মণঃ পথি॥৩৮॥

এতন্মে সংশয়ং কৃষ্ণ ছেত্তুমর্হস্যশেষতঃ।
ত্বদন্যঃ সংশয়স্যাস্য ছেত্তা ন হ্যুপপদ্যতে॥৩৯॥

শ্রীভগবানুবাচ

পার্থ নৈবেহ নামুত্র বিনাশস্তস্য বিদ্যতে।
ন হি কল্যাণকৃৎ কশ্চিৎ দুর্গতিং তাত গচ্ছতি॥৪০॥

প্রাপ্য পুণ্যকৃতাং লোকানুষিত্বা শাশ্বতীঃ সমাঃ।
শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে যোগভ্রষ্টোঽভিজায়তে॥৪১॥

অথবা যোগিনামেব কুলে ভবতি ধীমতাম্।
এতদ্ধি দুর্লভতরং লোকে জন্ম যদীদৃশম্॥৪২॥

তত্র তং বুদ্ধিসংযোগং লভতে পৌর্বদেহিকম্।
যততে চ ততো ভূয়ঃ সংসিদ্ধৌ কুরুনন্দন॥৪৩॥

পূর্বাভ্যাসেন তেনৈব হ্রিয়তে হ্যবশোঽপি সঃ।
জিজ্ঞাসুরপি যোগস্য শব্দব্রহ্মাতিবর্ততে॥৪৪॥

প্রযত্নাদ্ যতমানস্তু যোগী সংশুদ্ধকিল্বিষঃ।
অনেকজন্মসংসিদ্ধস্ততো যাতি পরাং গতিম্॥৪৫॥

তপস্বিভ্যোঽধিকো যোগী জ্ঞানিভ্যোঽপি মতোঽধিকঃ।
কর্মিভ্যশ্চাধিকো যোগী তস্মাদ্ যোগী ভবার্জুন॥৪৬॥

যোগিনামপি সর্বেষাং মদ্‌গতেনান্তরাত্মনা।
শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ॥৪৭॥

ওঁ তৎসদিতি শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে আত্মসংযমযোগো নাম ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ ॥

অথ সপ্তমোঽধ্যায়ঃ

শ্রীভগবানুবাচ

ময্যাসক্তমনাঃ পার্থ যোগং যুঞ্জন্ মদাশ্রয়ঃ।
অসংশয়ং সমগ্রং মাং যথা জ্ঞাস্যসি তচ্ছৃণু॥ ১ ॥

জ্ঞানং তেঽহং সবিজ্ঞানমিদং বক্ষ্যাম্যশেষতঃ।
যজ্জ্ঞাত্বা নেহ ভূয়োঽন্যজ্ জ্ঞাতব্যমবশিষ্যতে॥ ২ ॥

মনুষ্যাণাং সহস্রেষু কশ্চিদ্ যততি সিদ্ধয়ে।
যততামপি সিদ্ধানাং কশ্চিন্মাং বেত্তি তত্ত্বতঃ॥ ৩ ॥

ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ।
অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা॥ ৪ ॥

অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্যতে জগৎ॥ ৫ ॥

এতদ্‌যোনীনি ভূতানি সর্বাণীত্যুপধারয়।
অহং কৃৎস্নস্য জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়স্তথা॥ ৬ ॥

মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়।
ময়ি সর্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণা ইব॥ ৭ ॥

রসোঽহমপ্সু কৌন্তেয় প্রভাস্মি শশিসূর্যয়োঃ।
প্রণবঃ সর্ববেদেষু শব্দঃ খে পৌরুষং নৃষু॥ ৮ ॥

পুণ্যো গন্ধঃ পৃথিব্যাং চ তেজশ্চাস্মি বিভাবসৌ।
জীবনং সর্বভূতেষু তপশ্চাস্মি তপস্বিষু॥ ৯ ॥

বীজং মাং সর্বভূতানাং বিদ্ধি পার্থ সনাতনম্।
বুদ্ধির্বুদ্ধিমতামস্মি তেজস্তেজস্বিনামহম্॥১০॥

বলং বলবতাং চাহং কামরাগবিবর্জিতম্।
ধর্মাবিরুদ্ধো ভূতেষু কামোঽস্মি ভরতর্ষভ॥১১॥

যে চৈব সাত্ত্বিকা ভাবা রাজসাস্তামসাশ্চ যে।
মত্ত এবেতি তান্ বিদ্ধি ন ত্বহং তেষু তে ময়ি॥১২॥

ত্রিভির্গুণময়ৈর্ভাবৈরেভিঃ সর্বমিদং জগৎ।
মোহিতং নাভিজানাতি মামেভ্যঃ পরমব্যয়ম্॥১৩॥

দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে॥১৪॥

ন মাং দুষ্কৃতিনো মূঢ়াঃ প্রপদ্যন্তে নরাধমাঃ।
মায়য়াপহৃতজ্ঞানা আসুরং ভাবমাশ্রিতাঃ॥১৫॥

চতুর্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ সুকৃতিনোঽর্জুন।
আর্তো জিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ॥১৬॥

তেষাং জ্ঞানী নিত্যযুক্ত একভক্তির্বিশিষ্যতে।
প্রিয়ো হি জ্ঞানিনোঽত্যর্থমহং স চ মম প্রিয়ঃ॥১৭॥
উদারাঃ সর্ব এবৈতে জ্ঞানী ত্বাত্মৈব মে মতম্।
আস্থিতঃ স হি যুক্তাত্মা মামেবানুত্তমাং গতিম্॥১৮॥
বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে।
বাসুদেবঃ সর্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্লভঃ॥১৯॥
কামৈস্তৈস্তৈর্হৃতজ্ঞানাঃ প্রপদ্যন্তেঽন্যদেবতাঃ।
তং তং নিয়মমাস্থায় প্রকৃত্যা নিয়তাঃ স্বয়া॥২০॥
যো যো যাং যাং তনুং ভক্তঃ শ্রদ্ধয়ার্চিতুমিচ্ছতি।
তস্য তস্যাচলাং শ্রদ্ধাং তামেব বিদধাম্যহম্॥২১॥
স তয়া শ্রদ্ধয়া যুক্তস্তস্যারাধনমীহতে।
লভতে চ ততঃ কামান্ ময়ৈব বিহিতান্ হি তান্॥২২॥
অন্তবত্তু ফলং তেষাং তদ্ভবত্যল্পমেধসাম্।
দেবান্ দেবযজো যান্তি মদ্ভক্তা যান্তি মামপি॥২৩॥
অব্যক্তং ব্যক্তিমাপন্নং মন্যন্তে মামবুদ্ধয়ঃ।
পরং ভাবমজানন্তো মমাব্যয়মনুত্তমম্॥২৪॥
নাহং প্রকাশঃ সর্বস্য যোগমায়াসমাবৃতঃ।
মূঢ়োঽয়ং নাভিজানাতি লোকো মামজমব্যয়ম্॥২৫॥
বেদাহং সমতীতানি বর্তমানানি চার্জুন।
ভবিষ্যাণি চ ভূতানি মাং তু বেদ ন কশ্চন॥২৬॥
ইচ্ছাদ্বেষসমুত্থেন দ্বন্দ্বমোহেন ভারত।
সর্বভূতানি সম্মোহং সর্গে যান্তি পরন্তপ॥২৭॥
যেষাং ত্বন্তগতং পাপং জনানাং পুণ্যকর্মণাম্।
তে দ্বন্দ্বমোহনির্মুক্তা ভজন্তে মাং দৃঢ়ব্রতাঃ॥২৮॥
জরামরণমোক্ষায় মামাশ্রিত্য যতন্তি যে।
তে ব্রহ্ম তদ্বিদুঃ কৃৎস্নমধ্যাত্মং কর্ম চাখিলম্॥২৯॥
সাধিভূতাধিদৈবং মাং সাধিযজ্ঞং চ যে বিদুঃ।

প্রয়াণকালেঽপি চ মাং তে বিদুর্যুক্তচেতসঃ ॥৩০॥

ওঁতৎসদিতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে জ্ঞানবিজ্ঞানযোগো নাম সপ্তমোঽধ্যায়ঃ ॥

অথ অষ্টমোঽধ্যায়ঃ

অর্জুন উবাচ

কিং তদ্ব্রহ্ম কিমধ্যাত্মং কিং কর্ম পুরুষোত্তম।
অধিভূতং চ কিং প্রোক্তমধিদৈবং কিমুচ্যতে॥ ১ ॥

অধিযজ্ঞঃ কথং কোঽত্র দেহেঽস্মিন্ মধুসূদন।
প্রয়াণকালে চ কথং জ্ঞেয়োঽসি নিয়তাত্মভিঃ॥ ২ ॥

শ্রীভগবানুবাচ

অক্ষরং ব্রহ্ম পরমং স্বভাবোঽধ্যাত্মমুচ্যতে।
ভূতভাবোদ্ভবকরো বিসর্গঃ কর্মসংজ্ঞিতঃ॥ ৩ ॥

অধিভূতং ক্ষরো ভাবঃ পুরুষশ্চাধিদৈবতম্।
অধিযজ্ঞোঽহমেবাত্র দেহে দেহভৃতাং বর॥ ৪ ॥

অন্তকালে চ মামেব স্মরন্ মুক্ত্বা কলেবরম্।
যঃ প্রয়াতি স মদ্ভাবং যাতি নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ॥ ৫ ॥

যং যং বাপি স্মরন্ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরম্।
তং তমেবৈতি কৌন্তেয় সদা তদ্ভাবভাবিতঃ॥ ৬ ॥

তস্মাৎ সর্বেষু কালেষু মামনুস্মর যুধ্য চ।
ময্যর্পিতমনোবুদ্ধির্মামেবৈষ্যস্যসংশয়ম্ ॥ ৭ ॥

অভ্যাসযোগযুক্তেন চেতসা নান্যগামিনা।
পরমং পুরুষং দিব্যং যাতি পার্থানুচিন্তয়ন্॥ ৮ ॥

কবিং পুরাণমনুশাসিতার-
মণোরণীয়াংসমনুস্মরেদ্ যঃ।
সর্বস্য ধাতারমচিন্ত্যরূপ-
মাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ॥ ৯ ॥

প্রয়াণকালে মনসাচলেন
ভক্ত্যা যুক্তো যোগবলেন চৈব।
ভ্রুবোর্মধ্যে প্রাণমাবেশ্য সম্যক্
স তং পরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্॥১০॥

যদক্ষরং বেদবিদো বদন্তি
বিশন্তি যদ্ যতয়ো বীতরাগাঃ।
যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্য্যং চরন্তি
তত্তে পদং সংগ্রহেণ প্রবক্ষ্যে॥১১॥

সর্বদ্বারাণি সংযম্য মনো হৃদি নিরুধ্য চ।
মূর্ধ্ন্যাধায়াত্মনঃ প্রাণমাস্থিতো যোগধারণাম্॥১২॥

ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম ব্যাহরন্ মামনুস্মরন্।
যঃ প্রয়াতি ত্যজন্ দেহং স যাতি পরমাং গতিম্॥১৩॥

অনন্যচেতাঃ সততং যো মাং স্মরতি নিত্যশঃ।
তস্যাহং সুলভঃ পার্থ নিত্যযুক্তস্য যোগিনঃ॥১৪॥

মামুপেত্য পুনর্জন্ম দুঃখালয়মশাশ্বতম্।
নাপ্নুবন্তি মহাত্মানঃ সংসিদ্ধিং পরমাং গতাঃ॥১৫॥

আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্তিনোঽর্জুন।
মামুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে॥১৬॥

সহস্রযুগপর্যন্তমহর্যদ্ব্রহ্মণো বিদুঃ।
রাত্রিং যুগসহস্রান্তাং তেঽহোরাত্রবিদো জনাঃ॥১৭॥

অব্যক্তাদ্ব্যক্তয়ঃ সর্বাঃ প্রভবন্ত্যহরাগমে।
রাত্র্যাগমে প্রলীয়ন্তে তত্রৈবাব্যক্তসংজ্ঞকে॥১৮॥

ভূতগ্রামঃ স এবায়ং ভূত্বা ভূত্বা প্রলীয়তে।
রাত্র্যাগমেঽবশঃ পার্থ প্রভবত্যহরাগমে॥১৯॥

পরস্তস্মাৎ তু ভাবোঽন্যোঽব্যক্তোঽব্যক্তাৎ সনাতনঃ।
যঃ স সর্বেষু ভূতেষু নশ্যৎসু ন বিনশ্যতি॥২০॥

অব্যক্তোঽক্ষর ইত্যুক্তস্তমাহুঃ পরমাং গতিম্।

যং প্রাপ্য ন নিবর্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম॥২১॥

পুরুষঃ স পরঃ পার্থ ভক্ত্যা লভ্যস্ত্বনন্যয়া।
যস্যান্তঃস্থানি ভূতানি যেন সর্বমিদং ততম্॥২২॥

যত্র কালে ত্বনাবৃত্তিমাবৃত্তিং চৈব যোগিনঃ।
প্রয়াতা যান্তি তং কালং বক্ষ্যামি ভরতর্ষভ॥২৩॥

অগ্নির্জ্যোতিরহঃ শুক্লঃ ষণ্মাসা উত্তরায়ণম্।
তত্র প্রয়াতা গচ্ছন্তি ব্রহ্ম ব্রহ্মবিদো জনাঃ॥২৪॥

ধূমো রাত্রিস্তথা কৃষ্ণঃ ষণ্মাসা দক্ষিণায়নম্।
তত্র চান্দ্রমসং জ্যোতির্যোগী প্রাপ্য নিবর্ততে॥২৫॥

শুক্লকৃষ্ণে গতী হ্যেতে জগতঃ শাশ্বতে মতে।
একয়া যাত্যনাবৃত্তিমন্যয়াবর্ততে পুনঃ॥২৬॥

নৈতে সৃতী পার্থ জানন্ যোগী মুহ্যতি কশ্চন।
তস্মাৎ সর্বেষু কালেষু যোগযুক্তো ভবার্জুন॥২৭॥

বেদেষু যজ্ঞেষু তপঃসু চৈব
দানেষু যৎ পুণ্যফলং প্রদিষ্টম্।
অত্যেতি তৎ সর্বমিদং বিদিত্বা
যোগী পরং স্থানমুপৈতি চাদ্যম্॥২৮॥

ওঁ তৎসদিতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে
শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে অক্ষরব্রহ্মযোগো নাম অষ্টমোঽধ্যায়ঃ॥

অথ নবমোঽধ্যায়ঃ

শ্রীভগবানুবাচ

ইদং তু তে গুহ্যতমং প্রবক্ষ্যাম্যনসূয়বে।
জ্ঞানং বিজ্ঞানসহিতং যজ্ জ্ঞাত্বা মোক্ষ্যসেঽশুভাৎ॥ ১ ॥

রাজবিদ্যা রাজগুহ্যং পবিত্রমিদমুত্তমম্।
প্রত্যক্ষাবগমং ধর্ম্যং সুসুখং কর্তুমব্যয়ম্॥ ২ ॥

অশ্রদ্দধানাঃ পুরুষা ধর্মস্যাস্য পরন্তপ।

অপ্রাপ্য মাং নিবর্তন্তে মৃত্যুসংসারবর্ত্মনি॥ ৩ ॥
ময়া ততমিদং সর্বং জগদব্যক্তমূর্তিনা।
মৎস্থানি সর্বভূতানি ন চাহং তেষ্ববস্থিতঃ॥ ৪ ॥
ন চ মৎস্থানি ভূতানি পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্‌।
ভূতভৃন্ন চ ভূতস্থো মমাত্মা ভূতভাবনঃ॥ ৫ ॥
যথাকাশস্থিতো নিত্যং বায়ুঃ সর্বত্রগো মহান্‌।
তথা সর্বাণি ভূতানি মৎস্থানীত্যুপধারয়॥ ৬ ॥
সর্বভূতানি কৌন্তেয় প্রকৃতিং যান্তি মামিকাম্‌।
কল্পক্ষয়ে পুনস্তানি কল্পাদৌ বিসৃজাম্যহম্‌॥ ৭ ॥
প্রকৃতিং স্বামবষ্টভ্য বিসৃজামি পুনঃ পুনঃ।
ভূতগ্রামমিমং কৃৎস্নমবশং প্রকৃতের্বশাৎ॥ ৮ ॥
ন চ মাং তানি কর্মাণি নিবধ্নন্তি ধনঞ্জয়।
উদাসীনবদাসীনমসক্তং তেষু কর্মসু॥ ৯ ॥
ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্‌।
হেতুনানেন কৌন্তেয় জগদ্বিপরিবর্ততে॥১০॥
অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্‌।
পরং ভাবমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্‌॥১১॥
মোঘাশা মোঘকর্মাণো মোঘজ্ঞানা বিচেতসঃ।
রাক্ষসীমাসুরীঞ্চৈব প্রকৃতিং মোহিনীং শ্রিতাঃ॥১২॥
মহাত্মানস্তু মাং পার্থ দৈবীং প্রকৃতিমাশ্রিতাঃ।
ভজন্ত্যনন্যমনসো জ্ঞাত্বা ভূতাদিমব্যয়ম্‌॥১৩॥
সততং কীর্তয়ন্তো মাং যতন্তশ্চ দৃঢ়ব্রতাঃ।
নমস্যন্তশ্চ মাং ভক্ত্যা নিত্যযুক্তা উপাসতে॥১৪॥
জ্ঞানযজ্ঞেন চাপ্যন্যে যজন্তো মামুপাসতে।
একত্বেন পৃথক্ত্বেন বহুধা বিশ্বতোমুখম্‌॥১৫॥
অহং ক্রতুরহং যজ্ঞঃ স্বধাহমহমৌষধম্‌।
মন্ত্রোঽহমহমেবাজ্যমহমগ্নিরহং হুতম্‌॥১৬॥

পিতাহমস্য জগতো মাতা ধাতা পিতামহঃ।
বেদ্যং পবিত্রমোঙ্কার ঋক্ সাম যজুরেব চ॥১৭॥
গতির্ভর্তা প্রভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং সুহৃৎ।
প্রভবঃ প্রলয়ঃ স্থানং নিধানং বীজমব্যয়ম্॥১৮॥
তপাম্যহমহং বর্ষং নিগৃহ্ণাম্যুৎসৃজামি চ।
অমৃতং চৈব মৃত্যুশ্চ সদসচ্চাহমর্জুন॥১৯॥
ত্রৈবিদ্যা মাং সোমপাঃ পূতপাপা-
যজ্ঞৈরিষ্ট্বা স্বর্গতিং প্রার্থয়ন্তে।
তে পুণ্যমাসাদ্য সুরেন্দ্রলোক-
মশ্নন্তি দিব্যান্ দিবি দেবভোগান্॥২০॥
তে তং ভুক্ত্বা স্বর্গলোকং বিশালং-
ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্যলোকং বিশন্তি।
এবং ত্রয়ীধর্মমনুপ্রপন্না-
গতাগতং কামকামা লভন্তে॥২১॥
অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্যুপাসতে।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্॥২২॥
যেঽপ্যন্যদেবতা ভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।
তেঽপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্বকম্॥২৩॥
অহং হি সর্বযজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ।
ন তু মামভিজানন্তি তত্ত্বেনাতশ্চ্যবন্তি তে॥২৪॥
যান্তি দেবব্রতা দেবান্ পিতৃন্ যান্তি পিতৃব্রতাঃ।
ভূতানি যান্তি ভূতেজ্যা যান্তি মদ্যাজিনোঽপি মাম্॥২৫॥
পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি।
তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামি প্রযতাত্মনঃ॥২৬॥
যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
যৎ তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্॥২৭॥
শুভাশুভফলৈরেবং মোক্ষ্যসে কর্মবন্ধনৈঃ।

সন্ন্যাসযোগযুক্তাত্মা বিমুক্তো মামুপৈষ্যসি॥২৮॥
সমোঽহং সর্বভূতেষু ন মে দ্বেষ্যোঽস্তি ন প্রিয়ঃ।
যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু চাপ্যহম্॥২৯॥
অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্।
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্ব্যবসিতো হি সঃ॥৩০॥
ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্মাত্মা শশ্বচ্ছান্তিং নিগচ্ছতি।
কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি॥৩১॥
মাং হি পার্থ ব্যপাশ্রিত্য যেঽপি স্যুঃ পাপযোনয়ঃ।
স্ত্রিয়ো বৈশ্যাস্তথা শূদ্রাস্তেঽপি যান্তি পরাং গতিম্॥৩২॥
কিং পুনর্ব্রাহ্মণাঃ পুণ্যা ভক্তা রাজর্ষয়স্তথা।
অনিত্যমসুখং লোকমিমং প্রাপ্য ভজস্ব মাম্॥৩৩॥
মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি যুক্ত্বৈবমাত্মানং মৎপরায়ণঃ॥৩৪॥

ওঁ তৎসদিতি শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে রাজবিদ্যারাজগুহ্যযোগো নাম নবমোঽধ্যায়ঃ ॥

অথ দশমোঽধ্যায়ঃ

শ্রীভগবানুবাচ

ভূয় এব মহাবাহো শৃণু মে পরমং বচঃ।
যত্তেঽহং প্রীয়মাণায় বক্ষ্যামি হিতকাম্যয়া॥ ১ ॥
ন মে বিদুঃ সুরগণাঃ প্রভবং ন মহর্ষয়ঃ।
অহমাদির্হি দেবানাং মহর্ষীণাঞ্চ সর্বশঃ॥ ২ ॥
যো মামজমনাদিঞ্চ বেত্তি লোকমহেশ্বরম্।
অসম্মূঢ়ঃ স মর্ত্যেষু সর্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে॥ ৩ ॥
বুদ্ধির্জ্ঞানমসম্মোহঃ ক্ষমা সত্যং দমঃ শমঃ।
সুখং দুঃখং ভবোঽভাবো ভয়ং চাভয়মেব চ॥ ৪ ॥

অহিংসা সমতা তুষ্টিস্তপো দানং যশোঽযশঃ।
ভবন্তি ভাবা ভূতানাং মত্ত এব পৃথগ্বিধাঃ॥ ৫ ॥

মহর্ষয়ঃ সপ্ত পূর্বে চত্বারো মনবস্তথা।
মদ্ভাবা মানসা জাতা যেষাং লোক ইমাঃ প্রজাঃ॥ ৬ ॥

এতাং বিভূতিং যোগঞ্চ মম যো বেত্তি তত্ত্বতঃ।
সোঽবিকম্পেন যোগেন যুজ্যতে নাত্র সংশয়ঃ॥ ৭ ॥

অহং সর্বস্য প্রভবো মত্তঃ সর্বং প্রবর্ততে।
ইতি মত্বা ভজন্তে মাং বুধা ভাবসমন্বিতাঃ॥ ৮ ॥

মচ্চিত্তা মদ্গতপ্রাণা বোধয়ন্তঃ পরস্পরম্।
কথয়ন্তশ্চ মাং নিত্যং তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ॥ ৯ ॥

তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্বকম্।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে॥১০॥

তেষামেবানুকম্পার্থমহমজ্ঞানজং তমঃ।
নাশয়াম্যাত্মভাবস্থো জ্ঞানদীপেন ভাস্বতা॥১১॥

অর্জুন উবাচ

পরং ব্রহ্ম পরং ধাম পবিত্রং পরমং ভবান্।
পুরুষং শাশ্বতং দিব্যমাদিদেবমজং বিভুম্॥১২॥

আহুস্ত্বামৃষয়ঃ সর্বে দেবর্ষির্নারদস্তথা।
অসিতো দেবলো ব্যাসঃ স্বয়ং চৈব ব্রবীষি মে॥১৩॥

সর্বমেতদৃতং মন্যে যন্মাং বদসি কেশব।
ন হি তে ভগবন্ ব্যক্তিং বিদুর্দেবা ন দানবাঃ॥১৪॥

স্বয়মেবাত্মনাত্মানং বেত্থ ত্বং পুরুষোত্তম।
ভূতভাবন ভূতেশ দেবদেব জগৎপতে॥১৫॥

বক্তুমর্হস্যশেষেণ দিব্যা হ্যাত্মবিভূতয়ঃ।
যাভির্বিভূতিভির্লোকানিমাংস্ত্বং ব্যাপ্য তিষ্ঠসি॥১৬॥

কথং বিদ্যামহং যোগিংস্ত্বাং সদা পরিচিন্তয়ন্।
কেষু কেষু চ ভাবেষু চিন্ত্যোঽসি ভগবন্ময়া॥১৭॥

বিস্তরেণাত্মনো যোগং বিভূতিঞ্চ জনার্দন।
ভূয়ঃ কথয় তৃপ্তির্হি শৃণ্বতো নাস্তি মেঽমৃতম্॥১৮॥

শ্রীভগবানুবাচ

হন্ত তে কথয়িষ্যামি দিব্যা হ্যাত্মবিভূতয়ঃ।
প্রাধান্যতঃ কুরুশ্রেষ্ঠ নাস্ত্যন্তো বিস্তরস্য মে॥১৯॥

অহমাত্মা গুড়াকেশ সর্বভূতাশয়স্থিতঃ।
অহমাদিশ্চ মধ্যঞ্চ ভূতানামন্ত এব চ॥২০॥

আদিত্যানামহং বিষ্ণুর্জ্যোতিষাং রবিরংশুমান্।
মরীচির্মরুতামস্মি নক্ষত্রাণামহং শশী॥২১॥

বেদানাং সামবেদোঽস্মি দেবানামস্মি বাসবঃ।
ইন্দ্রিয়াণাং মনশ্চাস্মি ভূতানামস্মি চেতনা॥২২॥

রুদ্রাণাং শঙ্করশ্চাস্মি বিত্তেশো যক্ষরক্ষসাম্।
বসূনাং পাবকশ্চাস্মি মেরুঃ শিখরিণামহম্॥২৩॥

পুরোধসাঞ্চ মুখ্যং মাং বিদ্ধি পার্থ বৃহস্পতিম্।
সেনানীনামহং স্কন্দঃ সরসামস্মি সাগরঃ॥২৪॥

মহর্ষীণাং ভৃগুরহং গিরামস্ম্যেকমক্ষরম্।
যজ্ঞানাং জপযজ্ঞোঽস্মি স্থাবরাণাং হিমালয়ঃ॥২৫॥

অশ্বত্থঃ সর্ববৃক্ষাণাং দেবর্ষীণাঞ্চ নারদঃ।
গন্ধর্বাণাং চিত্ররথঃ সিদ্ধানাং কপিলো মুনিঃ॥২৬॥

উচ্চৈঃশ্রবসমশ্বানাং বিদ্ধি মামমৃতোদ্ভবম্।
ঐরাবতং গজেন্দ্রাণাং নরাণাঞ্চ নরাধিপম্॥২৭॥

আয়ুধানামহং বজ্রং ধেনূনামস্মি কামধুক্।
প্রজনশ্চাস্মি কন্দর্পঃ সর্পাণামস্মি বাসুকিঃ॥২৮॥

অনন্তশ্চাস্মি নাগানাং বরুণো যাদসামহম্।
পিতৃণামর্যমা চাস্মি যমঃ সংযমতামহম্॥২৯॥

প্রহ্লাদশ্চাস্মি দৈত্যানাং কালঃ কলয়তামহম্।
মৃগাণাঞ্চ মৃগেন্দ্রোঽহং বৈনতেয়শ্চ পক্ষিণাম্॥৩০॥

পবনঃ পবতামস্মি রামঃ শস্ত্রভৃতামহম্।
ঝষাণাং মকরশ্চাস্মি স্রোতসামস্মি জাহ্নবী॥৩১॥

সর্গাণামাদিরন্তশ্চ মধ্যং চৈবাহমর্জুন।
অধ্যাত্মবিদ্যা বিদ্যানাং বাদঃ প্রবদতামহম্॥৩২॥

অক্ষরাণামকারোঽস্মি দ্বন্দ্বঃ সামাসিকস্য চ।
অহমেবাক্ষয়ঃ কালো ধাতাহং বিশ্বতোমুখঃ॥৩৩॥

মৃত্যুঃ সর্বহরশ্চাহমুদ্ভবশ্চ ভবিষ্যতাম্।
কীর্তিঃ শ্রীর্বাক্ চ নারীণাং স্মৃতির্মেধা ধৃতিঃ ক্ষমা॥৩৪॥

বৃহৎসাম তথা সাম্নাং গায়ত্রী ছন্দসামহম্।
মাসানাং মার্গশীর্ষোঽহমৃতূনাং কুসুমাকরঃ॥৩৫॥

দ্যূতং ছলয়তামস্মি তেজস্তেজস্বিনামহম্।
জয়োঽস্মি ব্যবসায়োঽস্মি সত্ত্বং সত্ত্ববতামহম্॥৩৬॥

বৃষ্ণীনাং বাসুদেবোঽস্মি পাণ্ডবানাং ধনঞ্জয়ঃ।
মুনীনামপ্যহং ব্যাসঃ কবীনামুশনা কবিঃ॥৩৭॥

দণ্ডো দময়তামস্মি নীতিরস্মি জিগীষতাম্।
মৌনং চৈবাস্মি গুহ্যানাং জ্ঞানং জ্ঞানবতামহম্॥৩৮॥

যচ্চাপি সর্বভূতানাং বীজং তদহমর্জুন।
ন তদস্তি বিনা যৎ স্যান্ময়া ভূতং চরাচরম্॥৩৯॥

নান্তোঽস্তি মম দিব্যানাং বিভূতীনাং পরন্তপ।
এষ তূদ্দেশতঃ প্রোক্তো বিভূতের্বিস্তরো ময়া॥৪০॥

যদ্ যদ্ বিভূতিমৎ সত্ত্বং শ্রীমদূর্জিতমেব বা।
তত্তদেবাবগচ্ছ ত্বং মম তেজোঽংশসম্ভবম্॥৪১॥

অথবা বহুনৈতেন কিং জ্ঞাতেন তবার্জুন।
বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ॥৪২॥

ওঁ তৎসদিতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে বিভূতিযোগো নাম দশমোঽধ্যায়ঃ॥

———o———

অথৈকাদশোঽধ্যায়ঃ

অর্জুন উবাচ

মদনুগ্রহায় পরমং গুহ্যমধ্যাত্মসংজ্ঞিতম্।
যৎ ত্বয়োক্তং বচস্তেন মোহোঽয়ং বিগতো মম॥ ১ ॥

ভবাপ্যয়ৌ হি ভূতানাং শ্রুতৌ বিস্তরশো ময়া।
ত্বত্তঃ কমলপত্রাক্ষ মাহাত্ম্যমপি চাব্যয়ম্॥ ২ ॥

এবমেতদ্ যথাত্থ ত্বমাত্মানং পরমেশ্বর।
দ্রষ্টুমিচ্ছামি তে রূপমৈশ্বরং পুরুষোত্তম॥ ৩ ॥

মন্যসে যদি তচ্ছক্যং ময়া দ্রষ্টুমিতি প্রভো।
যোগেশ্বর ততো মে ত্বং দর্শয়াত্মানমব্যয়ম্॥ ৪ ॥

শ্রীভগবানুবাচ

পশ্য মে পার্থ রূপাণি শতশোঽথ সহস্রশঃ।
নানাবিধানি দিব্যানি নানাবর্ণাকৃতীনি চ॥ ৫ ॥

পশ্যাদিত্যান্ বসূন্ রুদ্রানশ্বিনৌ মরুতস্তথা।
বহূন্যদৃষ্টপূর্বাণি পশ্যাশ্চর্যাণি ভারত॥ ৬ ॥

ইহৈকস্থং জগৎ কৃৎস্নং পশ্যাদ্য সচরাচরম্।
মম দেহে গুড়াকেশ যচ্চান্যদ্ দ্রষ্টুমিচ্ছসি॥ ৭ ॥

ন তু মাং শক্যসে দ্রষ্টুমনেনৈব স্বচক্ষুষা।
দিব্যং দদামি তে চক্ষুঃ পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্॥ ৮ ॥

সঞ্জয় উবাচ

এবমুক্ত্বা ততো রাজন্ মহাযোগেশ্বরো হরিঃ।
দর্শয়ামাস পার্থায় পরমং রূপমৈশ্বরম্॥ ৯ ॥

অনেকবক্ত্রনয়নমনেকাদ্ভুতদর্শনম্।
অনেকদিব্যাভরণং দিব্যানেকোদ্যতায়ুধম্॥১০॥

দিব্যমাল্যাম্বরধরং দিব্যগন্ধানুলেপনম্।
সর্বাশ্চর্যময়ং দেবমনন্তং বিশ্বতোমুখম্॥১১॥

দিবি সূর্যসহস্রস্য ভবেদ্ যুগপদুত্থিতা।

যদি ভাঃ সদৃশী সা স্যাদ্ ভাসস্তস্য মহাত্মনঃ।।১২।।

তত্রৈকস্থং জগৎ কৃৎস্নং প্রবিভক্তমনেকধা।
অপশ্যদ্দেবদেবস্য শরীরে পাণ্ডবস্তদা।।১৩।।

ততঃ স বিস্ময়াবিষ্টো হৃষ্টরোমা ধনঞ্জয়ঃ।
প্রণম্য শিরসা দেবং কৃতাঞ্জলিরভাষত।।১৪।।

অর্জুন উবাচ

পশ্যামি দেবাংস্তব দেব দেহে
সর্বাংস্তথা ভূতবিশেষসঙ্ঘান্।
ব্রহ্মাণমীশং কমলাসনস্থ-
মৃষীংশ্চ সর্বানুরগাংশ্চ দিব্যান্।।১৫।।

অনেকবাহূদরবক্ত্রনেত্রং
পশ্যামি ত্বাং সর্বতোঽনন্তরূপম্।
নান্তং ন মধ্যং ন পুনস্তবাদিং
পশ্যামি বিশ্বেশ্বর বিশ্বরূপ।।১৬।।

কিরীটিনং গদিনং চক্রিণঞ্চ
তেজোরাশিং সর্বতো দীপ্তিমন্তম্।
পশ্যামি ত্বাং দুর্নিরীক্ষ্যং সমন্তাদ্
দীপ্তানলার্কদ্যুতিমপ্রমেয়ম্ ।।১৭।।

ত্বমক্ষরং পরমং বেদিতব্যং
ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্।
ত্বমব্যয়ঃ শাশ্বতধর্মগোপ্তা
সনাতনস্ত্বং পুরুষো মতো মে।।১৮।।

অনাদিমধ্যান্তমনন্তবীর্য-
মনন্তবাহুং শশিসূর্যনেত্রম্।
পশ্যামি ত্বাং দীপ্তহুতাশবক্ত্রং
স্বতেজসা বিশ্বমিদং তপন্তম্।।১৯।।

দ্যাবাপৃথিব্যোরিদমন্তরং হি
ব্যাপ্তং ত্বয়ৈকেন দিশশ্চ সর্বাঃ।

দৃষ্ট্বাদ্ভুতং রূপমুগ্রং তবেদং
লোকত্রয়ং প্রব্যথিতং মহাত্মন্॥২০॥
অমী হি ত্বাং সুরসঙ্ঘা বিশন্তি
কেচিদ্ভীতাঃ প্রাঞ্জলয়ো গৃণন্তি।
স্বস্তীত্যুক্ত্বা মহর্ষিসিদ্ধসঙ্ঘাঃ
স্তুবন্তি ত্বাং স্তুতিভিঃ পুষ্কলাভিঃ॥২১॥
রুদ্রাদিত্যা বসবো যে চ সাধ্যা
বিশ্বেঽশ্বিনৌ মরুতশ্চোষ্মপাশ্চ।
গন্ধর্বযক্ষাসুরসিদ্ধসঙ্ঘা
বীক্ষন্তে ত্বাং বিস্মিতাশ্চৈব সর্বে॥২২॥
রূপং মহত্তে বহুবক্ত্রনেত্রং
মহাবাহো বহুবাহূরুপাদম্।
বহূদরং বহুদংষ্ট্রাকরালং
দৃষ্ট্বা লোকাঃ প্রব্যথিতাস্তথাহম্॥২৩॥
নভঃস্পৃশং দীপ্তমনেকবর্ণং
ব্যাত্তাননং দীপ্তবিশালনেত্রম্।
দৃষ্ট্বা হি ত্বাং প্রব্যথিতান্তরাত্মা
ধৃতিং ন বিন্দামি শমঞ্চ বিষ্ণো॥২৪॥
দংষ্ট্রাকরালানি চ তে মুখানি
দৃষ্ট্বৈব কালানলসন্নিভানি।
দিশো ন জানে ন লভে চ শর্ম
প্রসীদ দেবেশ জগন্নিবাস॥২৫॥
অমী চ ত্বাং ধৃতরাষ্ট্রস্য পুত্রাঃ
সর্বে সহৈবাবনিপালসঙ্ঘৈঃ।
ভীষ্মো দ্রোণঃ সূতপুত্রস্তথাসৌ
সহাস্মদীয়ৈরপি যোধমুখ্যৈঃ॥২৬॥
বক্ত্রাণি তে ত্বরমাণা বিশন্তি
দংষ্ট্রাকরালানি ভয়ানকানি।
কেচিদ্বিলগ্না দশনান্তরেষু

সংদৃশ্যন্তে চূর্ণিতৈরুত্তমাঙ্গৈঃ ॥২৭॥

যথা নদীনাং বহবোঽম্বুবেগাঃ
সমুদ্রমেবাভিমুখা দ্রবন্তি।
তথা তবামী নরলোকবীরা
বিশন্তি বক্ত্রাণ্যভিবিজ্বলন্তি ॥২৮॥

যথা প্রদীপ্তং জ্বলনং পতঙ্গা
বিশন্তি নাশায় সমৃদ্ধবেগাঃ।
তথৈব নাশায় বিশন্তি লোকা-
স্তবাপি বক্ত্রাণি সমৃদ্ধবেগাঃ ॥২৯॥

লেলিহ্যসে গ্রসমানঃ সমন্তা-
ল্লোকান্ সমগ্রান্ বদনৈর্জ্বলদ্ভিঃ।
তেজোভিরাপূর্য জগৎ সমগ্রং
ভাসস্তবোগ্রাঃ প্রতপন্তি বিষ্ণো ॥৩০॥

আখ্যাহি মে কো ভবানুগ্ররূপো
নমোঽস্তু তে দেববর প্রসীদ।
বিজ্ঞাতুমিচ্ছামি ভবন্তমাদ্যং
ন হি প্রজানামি তব প্রবৃত্তিম্ ॥৩১॥

শ্রীভগবানুবাচ

কালোঽস্মি লোকক্ষয়কৃৎ প্রবৃদ্ধো
লোকান্ সমাহর্তুমিহ প্রবৃত্তঃ।
ঋতেঽপি ত্বাং ন ভবিষ্যন্তি সর্বে
যেঽবস্থিতাঃ প্রত্যনীকেষু যোধাঃ ॥৩২॥

তস্মাত্ত্বমুত্তিষ্ঠ যশো লভস্ব
জিত্বা শত্রূন্ ভুঙ্ক্ষ রাজ্যং সমৃদ্ধম্।
ময়ৈবৈতে নিহতাঃ পূর্বমেব
নিমিত্তমাত্রং ভব সব্যসাচিন্ ॥৩৩॥

দ্রোণঞ্চ ভীষ্মঞ্চ জয়দ্রথঞ্চ
কর্ণং তথান্যানপি যোধবীরান্।
ময়া হতাংস্ত্বং জহি মা ব্যথিষ্ঠা

যুধ্যস্ব জেতাসি রণে সপত্নান্‌॥৩৪॥

সঞ্জয় উবাচ

এতচ্ছ্রুত্বা বচনং কেশবস্য
কৃতাঞ্জলির্বেপমানঃ কিরীটী।
নমস্কৃত্বা ভূয় এবাহ কৃষ্ণং
সগদ্‌গদং ভীতভীতঃ প্রণম্য॥৩৫॥

অর্জুন উবাচ

স্থানে হৃষীকেশ তব প্রকীর্ত্যা
জগৎ প্রহৃষ্যত্যনুরজ্যতে চ।
রক্ষাংসি ভীতানি দিশো দ্রবন্তি
সর্বে নমস্যন্তি চ সিদ্ধসঙ্ঘাঃ॥৩৬॥

কস্মাচ্চ তে ন নমেরন্‌ মহাত্মন্‌
গরীয়সে ব্রহ্মণোঽপ্যাদিকর্ত্রে।
অনন্ত দেবেশ জগন্নিবাস
ত্বমক্ষরং সদসৎ তৎ পরং যৎ॥৩৭॥

ত্বমাদিদেবঃ পুরুষঃ পুরাণ-
স্ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্‌।
বেত্তাসি বেদ্যঞ্চ পরঞ্চ ধাম
ত্বয়া ততং বিশ্বমনন্তরূপ॥৩৮॥

বায়ুর্যমোঽগ্নির্বরুণঃ শশাঙ্কঃ
প্রজাপতিস্ত্বং প্রপিতামহশ্চ।
নমো নমস্তেঽস্তু সহস্রকৃত্বঃ
পুনশ্চ ভূয়োঽপি নমো নমস্তে॥৩৯॥

নমঃ পুরস্তাদথ পৃষ্ঠতস্তে
নমোঽস্তু তে সর্বত এব সর্ব।
অনন্তবীর্যামিতবিক্রমস্ত্বং
সর্বং সমাপ্নোষি ততোঽসি সর্বঃ॥৪০॥

সখেতি মত্বা প্রসভং যদুক্তং
হে কৃষ্ণ হে যাদব হে সখেতি।

অজানতা মহিমানং তবেদং
ময়া প্রমাদাৎ প্রণয়েন বাপি॥৪১॥
যচ্চাবহাসার্থমসৎ কৃতোঽসি
বিহারশয্যাসনভোজনেষু ।
একোঽথবাপ্যচ্যুত তৎ সমক্ষং
তৎ ক্ষাময়ে ত্বামহমপ্রমেয়ম্॥৪২॥

পিতাসি লোকস্য চরাচরস্য
ত্বমস্য পূজ্যশ্চ গুরুর্গরীয়ান্।
ন ত্বৎসমোঽস্ত্যভ্যধিকঃ কুতোঽন্যো
লোকত্রয়েঽপ্যপ্রতিমপ্রভাব ॥৪৩॥

তস্মাৎ প্রণম্য প্রণিধায় কায়ং
প্রসাদয়ে ত্বামহমীশমীড্যম্।
পিতেব পুত্রস্য সখেব সখ্যুঃ
প্রিয়ঃ প্রিয়ায়ার্হসি দেব সোঢ়ুম্॥৪৪॥

অদৃষ্টপূর্বং হৃষিতোঽস্মি দৃষ্ট্বা
ভয়েন চ প্রব্যথিতং মনো মে।
তদেব মে দর্শয় দেবরূপং
প্রসীদ দেবেশ জগন্নিবাস॥৪৫॥

কিরীটিনং গদিনং চক্রহস্ত-
মিচ্ছামি ত্বাং দ্রষ্টুমহং তথৈব।
তেনৈব রূপেণ চতুর্ভুজেন
সহস্রবাহো ভব বিশ্বমূর্তে॥৪৬॥

শ্রীভগবানুবাচ

ময়া প্রসন্নেন তবার্জুনেদং
রূপং পরং দর্শিতমাত্মযোগাৎ।
তেজোময়ং বিশ্বমনন্তমাদ্যং
যন্মে ত্বদন্যেন ন দৃষ্টপূর্বম্॥৪৭॥

ন বেদযজ্ঞাধ্যয়নৈর্ন দানৈ-
র্ন চ ক্রিয়াভির্ন তপোভিরুগ্রৈঃ।

এবংরূপঃ শক্য অহং নৃলোকে
দ্রষ্টুং ত্বদন্যেন কুরুপ্রবীর॥৪৮॥
মা তে ব্যথা মা চ বিমূঢ়ভাবো
দৃষ্ট্বা রূপং ঘোরমীদৃঙ্‌মমেদম্।
ব্যপেতভীঃ প্রীতমনাঃ পুনস্ত্বং
তদেব মে রূপমিদং প্রপশ্য॥৪৯॥

সঞ্জয় উবাচ

ইত্যর্জুনং বাসুদেবস্তথোক্ত্বা
স্বকং রূপং দর্শয়ামাস ভূয়ঃ।
আশ্বাসয়ামাস চ ভীতমেনং
ভূত্বা পুনঃ সৌম্যবপুর্মহাত্মা॥৫০॥

অর্জুন উবাচ

দৃষ্ট্বেদং মানুষং রূপং তব সৌম্যং জনার্দন।
ইদানীমস্মি সংবৃত্তঃ সচেতাঃ প্রকৃতিং গতঃ॥৫১॥

শ্রীভগবানুবাচ

সুদুর্দর্শমিদং রূপং দৃষ্টবানসি যন্মম।
দেবা অপ্যস্য রূপস্য নিত্যং দর্শনকাঙ্ক্ষিণঃ॥৫২॥
নাহং বেদৈর্ন তপসা ন দানেন ন চেজ্যয়া।
শক্য এবংবিধো দ্রষ্টুং দৃষ্টবানসি মাং যথা॥৫৩॥
ভক্ত্যা ত্বনন্যয়া শক্য অহমেবংবিধোঽর্জুন।
জ্ঞাতুং দ্রষ্টুঞ্চ তত্ত্বেন প্রবেষ্টুঞ্চ পরন্তপ॥৫৪॥
মৎকর্মকৃন্মৎপরমো মদ্ভক্তঃ সঙ্গবর্জিতঃ।
নির্বৈরঃ সর্বভূতেষু যঃ স মামেতি পাণ্ডব॥৫৫॥

ওঁ তৎসদিতি শ্রীমদ্‌ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে বিশ্বরূপদর্শনযোগো নাম একাদশোঽধ্যায়ঃ॥

———o———

অথ দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ

অর্জুন উবাচ

এবং সততযুক্তা যে ভক্তাস্ত্বাং পর্যুপাসতে।
যে চাপ্যক্ষরমব্যক্তং তেষাং কে যোগবিত্তমাঃ॥ ১ ॥

শ্রীভগবানুবাচ

ময্যাবেশ্য মনো যে মাং নিত্যযুক্তা উপাসতে।
শ্রদ্ধয়া পরয়োপেতাস্তে মে যুক্ততমা মতাঃ॥ ২ ॥

যে ত্বক্ষরমনির্দেশ্যমব্যক্তং পর্যুপাসতে।
সর্বত্রগমচিন্ত্যঞ্চ কূটস্থমচলং ধ্রুবম্ ॥ ৩ ॥

সন্নিয়ম্যেন্দ্রিয়গ্রামং সর্বত্র সমবুদ্ধয়ঃ।
তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব সর্বভূতহিতে রতাঃ॥ ৪ ॥

ক্লেশোঽধিকতরস্তেষামব্যক্তাসক্তচেতসাম্ ।
অব্যক্তা হি গতির্দুঃখং দেহবদ্ভিরবাপ্যতে॥ ৫ ॥

যে তু সর্বাণি কর্মাণি ময়ি সন্ন্যস্য মৎপরাঃ।
অনন্যেনৈব যোগেন মাং ধ্যায়ন্ত উপাসতে॥ ৬ ॥

তেষামহং সমুদ্ধর্তা মৃত্যুসংসারসাগরাৎ।
ভবামি নচিরাৎ পার্থ ময্যাবেশিতচেতসাম্॥ ৭ ॥

ময্যেব মন আধৎস্ব ময়ি বুদ্ধিং নিবেশয়।
নিবসিষ্যসি ময্যেব অত ঊর্ধ্বং ন সংশয়ঃ॥ ৮ ॥

অথ চিত্তং সমাধাতুং ন শক্নোষি ময়ি স্থিরম্।
অভ্যাসযোগেন ততো মামিচ্ছাপ্তুং ধনঞ্জয়॥ ৯ ॥

অভ্যাসেঽপ্যসমর্থোঽসি মৎকর্মপরমো ভব।
মদর্থমপি কর্মাণি কুর্বন্ সিদ্ধিমবাপ্স্যসি॥১০॥

অথৈতদপ্যশক্তোঽসি কর্তুং মদ্‌যোগমাশ্রিতঃ।
সর্বকর্মফলত্যাগং ততঃ কুরু যতাত্মবান্॥১১॥

শ্রেয়ো হি জ্ঞানমভ্যাসাজ্ জ্ঞানাদ্ধ্যানং বিশিষ্যতে।

ধ্যানাৎ কর্মফলত্যাগস্ত্যাগাচ্ছান্তিরনন্তরম্॥১২॥

অদ্বেষ্টা সর্বভূতানাং মৈত্রঃ করুণ এব চ।
নির্মমো নিরহঙ্কারঃ সমদুঃখসুখঃ ক্ষমী॥১৩॥

সন্তুষ্টঃ সততং যোগী যতাত্মা দৃঢ়নিশ্চয়ঃ।
ময্যর্পিতমনোবুদ্ধির্যো মদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ॥১৪॥

যস্মান্নোদ্বিজতে লোকো লোকান্নোদ্বিজতে চ যঃ।
হর্ষামর্ষভয়োদ্বেগৈর্মুক্তো যঃ স চ মে প্রিয়ঃ॥১৫॥

অনপেক্ষঃ শুচির্দক্ষ উদাসীনো গতব্যথঃ।
সর্বারম্ভপরিত্যাগী যো মদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ॥১৬॥

যো ন হৃষ্যতি ন দ্বেষ্টি ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
শুভাশুভপরিত্যাগী ভক্তিমান্ যঃ স মে প্রিয়ঃ॥১৭॥

সমঃ শত্রৌ চ মিত্রে চ তথা মানাপমানয়োঃ।
শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু সমঃ সঙ্গবিবর্জিতঃ॥১৮॥

তুল্যনিন্দাস্তুতির্মৌনী সন্তুষ্টো যেন কেনচিৎ।
অনিকেতঃ স্থিরমতির্ভক্তিমান্ মে প্রিয়ো নরঃ॥১৯॥

যে তু ধর্ম্যামৃতমিদং যথোক্তং পর্যুপাসতে।
শ্রদ্দধানা মৎপরমা ভক্তাস্তেঽতীব মে প্রিয়াঃ॥২০॥

ওঁ তৎসদিতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে ভক্তিযোগো নাম দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ॥

অথ ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ

শ্রীভগবানুবাচ

ইদং শরীরং কৌন্তেয় ক্ষেত্রমিত্যভিধীয়তে।
এতদ্ যো বেত্তি তং প্রাহুঃ ক্ষেত্রজ্ঞ ইতি তদ্বিদঃ॥ ১ ॥

ক্ষেত্রজ্ঞঞ্চাপি মাং বিদ্ধি সর্বক্ষেত্রেষু ভারত।

ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োর্জ্ঞানং যত্তজ্জ্ঞানং মতং মম॥ ২ ॥

তৎ ক্ষেত্রং যচ্চ যাদৃক্ চ যদ্বিকারি যতশ্চ যৎ।
স চ যো যৎপ্রভাবশ্চ তৎ সমাসেন মে শৃণু॥ ৩ ॥

ঋষিভির্বহুধা গীতং ছন্দোভির্বিবিধৈঃ পৃথক্।
ব্রহ্মসূত্রপদৈশ্চৈব হেতুমদ্ভির্বিনিশ্চিতৈঃ॥ ৪ ॥

মহাভূতান্যহঙ্কারো বুদ্ধিরব্যক্তমেব চ।
ইন্দ্রিয়াণি দশৈকঞ্চ পঞ্চ চেন্দ্রিয়গোচরাঃ॥ ৫ ॥

ইচ্ছা দ্বেষঃ সুখং দুঃখং সঙ্ঘাতশ্চেতনা ধৃতিঃ।
এতৎ ক্ষেত্রং সমাসেন সবিকারমুদাহৃতম্॥ ৬ ॥

অমানিত্বমদম্ভিত্বমহিংসা ক্ষান্তিরার্জবম্।
আচার্যোপাসনং শৌচং স্থৈর্যমাত্মবিনিগ্রহঃ॥ ৭ ॥

ইন্দ্রিয়ার্থেষু বৈরাগ্যমনহঙ্কার এব চ।
জন্মমৃত্যুজরাব্যাধিদুঃখদোষানুদর্শনম্ ॥ ৮ ॥

অসক্তিরনভিষ্বঙ্গঃ পুত্রদারগৃহাদিষু।
নিত্যঞ্চ সমচিত্তত্বমিষ্টানিষ্টোপপত্তিষু॥ ৯ ॥

ময়ি চানন্যযোগেন ভক্তিরব্যভিচারিণী।
বিবিক্তদেশসেবিত্বমরতির্জনসংসদি ॥১০॥

অধ্যাত্মজ্ঞাননিত্যত্বং তত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শনম্।
এতজ্ জ্ঞানমিতি প্রোক্তমজ্ঞানং যদতোঽন্যথা॥১১॥

জ্ঞেয়ং যৎ তৎ প্রবক্ষ্যামি যজ্জ্ঞাত্বামৃতমশ্নুতে।
অনাদিমৎ পরং ব্রহ্ম ন সত্তন্নাসদুচ্যতে॥১২॥

সর্বতঃ পাণিপাদং তৎ সর্বতোঽক্ষিশিরোমুখম্।
সর্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি॥১৩॥

সর্বেন্দ্রিয়গুণাভাসং সর্বেন্দ্রিয়বিবর্জিতম্।
অসক্তং সর্বভৃচ্চৈব নির্গুণং গুণভোক্তৃ চ॥১৪॥

বহিরন্তশ্চ ভূতানামচরং চরমেব চ।
সূক্ষ্মত্বাৎ তদবিজ্ঞেয়ং দূরস্থং চান্তিকে চ তৎ॥১৫॥

অবিভক্তং চ ভূতেষু বিভক্তমিব চ স্থিতম্।
ভূতভর্তৃ চ তজ্জ্ঞেয়ং গ্রসিষ্ণু প্রভবিষ্ণু চ॥১৬॥

জ্যোতিষামপি তজ্জ্যোতিস্তমসঃ পরমুচ্যতে।
জ্ঞানং জ্ঞেয়ং জ্ঞানগম্যং হৃদি সর্বস্য বিষ্ঠিতম্॥১৭॥

ইতি ক্ষেত্রং তথা জ্ঞানং জ্ঞেয়ং চোক্তং সমাসতঃ।
মদ্ভক্ত এতদ্বিজ্ঞায় মদ্ভাবায়োপপদ্যতে॥১৮॥

প্রকৃতিং পুরুষঞ্চৈব বিদ্ধ্যনদী উভাবপি।
বিকারাংশ্চ গুণাংশ্চৈব বিদ্ধি প্রকৃতিসম্ভবান্॥১৯॥

কার্যকরণকর্তৃত্বে হেতুঃ প্রকৃতিরুচ্যতে।
পুরুষঃ সুখদুঃখানাং ভোক্তৃত্বে হেতুরুচ্যতে॥২০॥

পুরুষঃ প্রকৃতিস্থো হি ভুঙ্‌ক্তে প্রকৃতিজান্ গুণান্।
কারণং গুণসঙ্গোঽস্য সদসদ্‌যোনিজন্মসু॥২১॥

উপদ্রষ্টানুমন্তা চ ভর্তা ভোক্তা মহেশ্বরঃ।
পরমাত্মেতি চাপ্যুক্তো দেহেঽস্মিন্ পুরুষঃ পরঃ॥২২॥

য এবং বেত্তি পুরুষং প্রকৃতিং চ গুণৈঃ সহ।
সর্বথা বর্তমানোঽপি ন স ভূয়োঽভিজায়তে॥২৩॥

ধ্যানেনাত্মনি পশ্যন্তি কেচিদাত্মানমাত্মনা।
অন্যে সাংখ্যেন যোগেন কর্মযোগেন চাপরে॥২৪॥

অন্যে ত্বেবমজানন্তঃ শ্রুত্বান্যেভ্য উপাসতে।
তেঽপি চাতিতরন্ত্যেব মৃত্যুং শ্রুতিপরায়ণাঃ॥২৫॥

যাবৎ সঞ্জায়তে কিঞ্চিৎ সত্ত্বং স্থাবরজঙ্গমম্।
ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞসংযোগাৎ তদ্বিদ্ধি ভরতর্ষভ॥২৬॥

সমং সর্বেষু ভূতেষু তিষ্ঠন্তং পরমেশ্বরম্।
বিনশ্যৎস্ববিনশ্যন্তং যঃ পশ্যতি স পশ্যতি॥২৭॥

সমং পশ্যন্ হি সর্বত্র সমবস্থিতমীশ্বরম্।
ন হিনস্ত্যাত্মনাত্মানং ততো যাতি পরাং গতিম্॥২৮॥

প্রকৃত্যৈব চ কর্মাণি ক্রিয়মাণানি সর্বশঃ।
যঃ পশ্যতি তথাত্মানমকর্তারং স পশ্যতি॥২৯॥

যদা ভূতপৃথগ্‌ভাবমেকস্থমনুপশ্যতি।
তত এব চ বিস্তারং ব্রহ্ম সম্পদ্যতে তদা॥৩০॥

অনাদিত্বান্নির্গুণত্বাৎপরমাত্মায়মব্যয়ঃ।
শরীরস্থোঽপি কৌন্তেয় ন করোতি ন লিপ্যতে॥৩১॥

যথা সর্বগতং সৌক্ষ্ম্যাদাকাশং নোপলিপ্যতে।
সর্বত্রাবস্থিতো দেহে তথাত্মা নোপলিপ্যতে॥৩২॥

যথা প্রকাশয়ত্যেকঃ কৃৎস্নং লোকমিমং রবিঃ।
ক্ষেত্রং ক্ষেত্রী তথা কৃৎস্নং প্রকাশয়তি ভারত॥৩৩॥

ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োরেবমন্তরং জ্ঞানচক্ষুষা।
ভূতপ্রকৃতিমোক্ষঞ্চ যে বিদুর্যান্তি তে পরম্॥৩৪॥

ওঁ তৎসদিতি শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞবিভাগযোগো নাম ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ॥

অথ চতুর্দশোঽধ্যায়ঃ

শ্রীভগবানুবাচ

পরং ভূয়ঃ প্রবক্ষ্যামি জ্ঞানানাং জ্ঞানমুত্তমম্।
যজ্‌ জ্ঞাত্বা মুনয়ঃ সর্বে পরাং সিদ্ধিমিতো গতাঃ॥ ১ ॥

ইদং জ্ঞানমুপাশ্রিত্য মম সাধর্ম্যমাগতাঃ।
সর্গেঽপি নোপজায়ন্তে প্রলয়ে ন ব্যথন্তি চ॥ ২ ॥

মম যোনির্মহদ্ব্রহ্ম তস্মিন্ গর্ভং দধাম্যহম্।
সম্ভবঃ সর্বভূতানাং ততো ভবতি ভারত॥ ৩ ॥

সর্বযোনিষু কৌন্তেয় মূর্তয়ঃ সম্ভবন্তি যাঃ।
তাসাং ব্রহ্ম মহদ্‌যোনিরহং বীজপ্রদঃ পিতা॥ ৪ ॥

সত্ত্বং রজস্তম ইতি গুণাঃ প্রকৃতিসম্ভবাঃ।
নিবধ্নন্তি মহাবাহো দেহে দেহিনমব্যয়ম্॥ ৫ ॥

তত্র সত্ত্বং নির্মলত্বাৎ প্রকাশকমনাময়ম্।
সুখসঙ্গেন বধ্নাতি জ্ঞানসঙ্গেন চানঘ॥ ৬ ॥

রজো রাগাত্মকং বিদ্ধি তৃষ্ণাসঙ্গসমুদ্ভবম্।
তন্নিবধ্নাতি কৌন্তেয় কর্মসঙ্গেন দেহিনম্॥ ৭ ॥

তমস্ত্বজ্ঞানজং বিদ্ধি মোহনং সর্বদেহিনাম্।
প্রমাদালস্যনিদ্রাভিস্তন্নিবধ্নাতি ভারত॥ ৮ ॥

সত্ত্বং সুখে সঞ্জয়তি রজঃ কর্মণি ভারত।
জ্ঞানমাবৃত্য তু তমঃ প্রমাদে সঞ্জয়ত্যুত॥ ৯ ॥

রজস্তমশ্চাভিভূয় সত্ত্বং ভবতি ভারত।
রজঃ সত্ত্বং তমশ্চৈব তমঃ সত্ত্বং রজস্তথা॥১০॥

সর্বদ্বারেষু দেহেঽস্মিন্ প্রকাশ উপজায়তে।
জ্ঞানং যদা তদা বিদ্যাদ্বিবৃদ্ধং সত্ত্বমিত্যুত॥১১॥

লোভঃ প্রবৃত্তিরারম্ভঃ কর্মণামশমঃ স্পৃহা।
রজস্যেতানি জায়ন্তে বিবৃদ্ধে ভরতর্ষভ॥১২॥

অপ্রকাশোঽপ্রবৃত্তিশ্চ প্রমাদো মোহ এব চ।
তমস্যেতানি জায়ন্তে বিবৃদ্ধে কুরুনন্দন॥১৩॥

যদা সত্ত্বে প্রবৃদ্ধে তু প্রলয়ং যাতি দেহভৃৎ।
তদোত্তমবিদাং লোকানমলান্ প্রতিপদ্যতে॥১৪॥

রজসি প্রলয়ং গত্বা কর্মসঙ্গিষু জায়তে।
তথা প্রলীনস্তমসি মূঢ়যোনিষু জায়তে॥১৫॥

কর্মণঃ সুকৃতস্যাহুঃ সাত্ত্বিকং নির্মলং ফলম্।
রজসস্তু ফলং দুঃখমজ্ঞানং তমসঃ ফলম্॥১৬॥

সত্ত্বাৎ সঞ্জায়তে জ্ঞানং রজসো লোভ এব চ।
প্রমাদমোহৌ তমসো ভবতোঽজ্ঞানমেব চ॥১৭॥

ঊর্ধ্বং গচ্ছন্তি সত্ত্বস্থা মধ্যে তিষ্ঠন্তি রাজসাঃ।
জঘন্যগুণবৃত্তিস্থা অধো গচ্ছন্তি তামসাঃ॥১৮॥

নান্যং গুণেভ্যঃ কর্তারং যদা দ্রষ্টানুপশ্যতি।
গুণেভ্যশ্চ পরং বেত্তি মদ্ভাবং সোঽধিগচ্ছতি॥১৯॥

গুণানেতানতীত্য ত্রীন্ দেহী দেহসমুদ্ভবান্।
জন্মমৃত্যুজরাদুঃখৈর্বিমুক্তোঽমৃতমশ্নুতে ॥২০॥

অর্জুন উবাচ

কৈর্লিঙ্গৈস্ত্রীন্ গুণানেতানতীতো ভবতি প্রভো।
কিমাচারঃ কথং চৈতাংস্ত্রীন্ গুণানতিবর্ততে॥২১॥

শ্রীভগবানুবাচ

প্রকাশং চ প্রবৃত্তিং চ মোহমেব চ পাণ্ডব।
ন দ্বেষ্টি সম্প্রবৃত্তানি ন নিবৃত্তানি কাঙ্ক্ষতি॥২২॥

উদাসীনবদাসীনো গুণৈর্যো ন বিচাল্যতে।
গুণা বর্তন্ত ইত্যেব যোঽবতিষ্ঠতি নেঙ্গতে॥২৩॥

সমদুঃখসুখঃ স্বস্থঃ সমলোষ্টাশ্মকাঞ্চনঃ।
তুল্যপ্রিয়াপ্রিয়ো ধীরস্তুল্যনিন্দাত্মসংস্তুতিঃ॥২৪॥

মানাপমানয়োস্তুল্যস্তুল্যো মিত্রারিপক্ষয়োঃ।
সর্বারম্ভপরিত্যাগী গুণাতীতঃ স উচ্যতে॥২৫॥

মাঞ্চ যোঽব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবতে।
স গুণান্ সমতীত্যৈতান্ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে॥২৬॥

ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহমমৃতস্যাব্যয়স্য চ।
শাশ্বতস্য চ ধর্মস্য সুখস্যৈকান্তিকস্য চ॥২৭॥

ওঁ তৎসদিতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে গুণত্রয়বিভাগযোগো নাম চতুর্দশোঽধ্যায়ঃ॥

———o———

অথ পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ

শ্রীভগবানুবাচ

ঊর্ধ্বমূলমধঃশাখমশ্বত্থং প্রাহুরব্যয়ম্।
ছন্দাংসি যস্য পর্ণানি যস্তং বেদ স বেদবিৎ॥ ১ ॥

অধশ্চোর্ধ্বং প্রসৃতাস্তস্য শাখা
গুণপ্রবৃদ্ধা বিষয়প্রবালাঃ।
অধশ্চ মূলান্যনুসন্ততানি
কর্মানুবন্ধীনি মনুষ্যলোকে॥ ২ ॥

ন রূপমস্যেহ তথোপলভ্যতে
নান্তো ন চাদির্ন চ সম্প্রতিষ্ঠা।
অশ্বত্থমেনং সুবিরূঢ়মূল-
মসঙ্গশস্ত্রেণ দৃঢ়েন ছিত্ত্বা॥ ৩ ॥

ততঃ পদং তৎ পরিমার্গিতব্যং
যস্মিন্ গতা ন নিবর্তন্তি ভূয়ঃ।
তমেব চাদ্যং পুরুষং প্রপদ্যে
যতঃ প্রবৃত্তিঃ প্রসৃতা পুরাণী॥ ৪ ॥

নির্মানমোহা জিতসঙ্গদোষা
অধ্যাত্মনিত্যা বিনিবৃত্তকামাঃ।
দ্বন্দ্বৈর্বিমুক্তাঃ সুখদুঃখসংজ্ঞৈ-
র্গচ্ছন্ত্যমূঢ়াঃ পদমব্যয়ং তৎ॥ ৫ ॥

ন তদ্ভাসয়তে সূর্যো ন শশাঙ্কো ন পাবকঃ।
যদ্ গত্বা ন নিবর্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম॥ ৬ ॥

মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ।
মনঃষষ্ঠানীন্দ্রিয়াণি প্রকৃতিস্থানি কর্ষতি॥ ৭ ॥

শরীরং যদবাপ্নোতি যচ্চাপ্যুৎক্রামতীশ্বরঃ।
গৃহীত্বৈতানি সংযাতি বায়ুর্গন্ধানিবাশয়াৎ॥ ৮ ॥

শ্রোত্রং চক্ষুঃ স্পর্শনঞ্চ রসনং ঘ্রাণমেব চ।
অধিষ্ঠায় মনশ্চায়ং বিষয়ানুপসেবতে॥ ৯ ॥

উৎক্রামন্তং স্থিতং বাপি ভুঞ্জানং বা গুণান্বিতম্।
বিমূঢ়া নানুপশ্যন্তি পশ্যন্তি জ্ঞানচক্ষুষঃ॥১০॥

যতন্তো যোগিনশ্চৈনং পশ্যন্ত্যাত্মন্যবস্থিতম্।
যতন্তোঽপ্যকৃতাত্মানো নৈনং পশ্যন্ত্যচেতসঃ॥১১॥

যদাদিত্যগতং তেজো জগদ্ভাসয়তেঽখিলম্।
যচ্চন্দ্রমসি যচ্চাগ্নৌ তত্তেজো বিদ্ধি মামকম্॥১২॥

গামাবিশ্য চ ভূতানি ধারয়াম্যহমোজসা।
পুষ্ণামি চৌষধীঃ সর্বাঃ সোমো ভূত্বা রসাত্মকঃ॥১৩॥

অহং বৈশ্বানরো ভূত্বা প্রাণিনাং দেহমাশ্রিতঃ।
প্রাণাপানসমাযুক্তঃ পচাম্যন্নং চতুর্বিধম্॥১৪॥

সর্বস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টো
মত্তঃ স্মৃতির্জ্ঞানমপোহনঞ্চ।
বেদৈশ্চ সর্বৈরহমেব বেদ্যো
বেদান্তকৃদ্বেদবিদেব চাহম্॥১৫॥

দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে ক্ষরশ্চাক্ষর এব চ।
ক্ষরঃ সর্বাণি ভূতানি কূটস্থোঽক্ষর উচ্যতে॥১৬॥

উত্তমঃ পুরুষস্ত্বন্যঃ পরমাত্মেত্যুদাহৃতঃ।
যো লোকত্রয়মাবিশ্য বিভর্ত্যব্যয় ঈশ্বরঃ॥১৭॥

যস্মাৎ ক্ষরমতীতোঽহমক্ষরাদপি চোত্তমঃ।
অতোঽস্মি লোকে বেদে চ প্রথিতঃ পুরুষোত্তমঃ॥১৮॥

যো মামেবমসম্মূঢ়ো জানাতি পুরুষোত্তমম্।
স সর্ববিদ্ভজতি মাং সর্বভাবেন ভারত॥১৯॥

ইতি গুহ্যতমং শাস্ত্রমিদমুক্তং ময়ানঘ।
এতদ্বুদ্ধ্বা বুদ্ধিমান্ স্যাৎ কৃতকৃত্যশ্চ ভারত॥২০॥

ওঁ তৎসদিতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে পুরুষোত্তমযোগো নাম পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ॥

———০———

অথ ষোড়শোঽধ্যায়ঃ

শ্রীভগবানুবাচ

অভয়ং সত্ত্বসংশুদ্ধির্জ্ঞানযোগব্যবস্থিতিঃ।
দানং দমশ্চ যজ্ঞশ্চ স্বাধ্যায়স্তপ আর্জবম্॥ ১ ॥

অহিংসা সত্যমক্রোধস্ত্যাগঃ শান্তিরপৈশুনম্।
দয়া ভূতেস্বলোলুপ্তং মার্দবং হ্রীরচাপলম্॥ ২ ॥

তেজঃ ক্ষমা ধৃতিঃ শৌচমদ্রোহো নাতিমানিতা।
ভবন্তি সম্পদং দৈবীমভিজাতস্য ভারত॥ ৩ ॥

দম্ভো দর্পোঽভিমানশ্চ ক্রোধঃ পারুষ্যমেব চ।
অজ্ঞানং চাভিজাতস্য পার্থ সম্পদমাসুরীম্॥ ৪ ॥

দৈবী সম্পদ্বিমোক্ষায় নিবন্ধায়াসুরী মতা।
মা শুচঃ সম্পদং দৈবীমভিজাতোঽসি পাণ্ডব॥ ৫ ॥

দ্বৌ ভূতসর্গৌ লোকেঽস্মিন্ দৈব আসুর এব চ।
দৈবো বিস্তরশঃ প্রোক্ত আসুরং পার্থ মে শৃণু॥ ৬ ॥

প্রবৃত্তিং চ নিবৃত্তিং চ জনা ন বিদুরাসুরাঃ।
ন শৌচং নাপি চাচারো ন সত্যং তেষু বিদ্যতে॥ ৭ ॥

অসত্যমপ্রতিষ্ঠং তে জগদাহুরনীশ্বরম্।
অপরস্পরসম্ভূতং তং কিমন্যৎ কামহৈতুকম্॥ ৮ ॥

এতাং দৃষ্টিমবষ্টভ্য নষ্টাত্মানোঽল্পবুদ্ধয়ঃ।
প্রভবন্ত্যুগ্রকর্মাণঃ ক্ষয়ায় জগতোঽহিতাঃ॥ ৯ ॥

কামমাশ্রিত্য দুষ্পূরং দম্ভমানমদান্বিতাঃ।
মোহাদ্ গৃহীত্বাসদ্গ্রাহান্ প্রবর্তন্তেঽশুচিব্রতাঃ॥১০॥

চিন্তামপরিমেয়াঞ্চ প্রলয়ান্তামুপাশ্রিতাঃ।
কামোপভোগপরমা এতাবদিতি নিশ্চিতাঃ॥১১॥

আশাপাশশতৈর্বদ্ধাঃ কামক্রোধপরায়ণাঃ।
ঈহন্তে কামভোগার্থমন্যায়েনার্থসঞ্চয়ান্॥১২॥

ইদমদ্য ময়া লব্ধমিমং প্রাপ্স্যে মনোরথম্।

ইদমস্তীদমপি মে ভবিষ্যতি পুনর্ধনম্॥১৩॥
অসৌ ময়া হতঃ শত্রুর্হনিষ্যে চাপরানপি।
ঈশ্বরোঽহমহং ভোগী সিদ্ধোঽহং বলবান্ সুখী॥১৪॥
আঢ্যোঽভিজনবানস্মি কোঽন্যোঽস্তি সদৃশো ময়া।
যক্ষ্যে দাস্যামি মোদিষ্য ইত্যজ্ঞানবিমোহিতাঃ॥১৫॥
অনেকচিত্তবিভ্রান্তা মোহজালসমাবৃতাঃ।
প্রসক্তাঃ কামভোগেষু পতন্তি নরকেঽশুচৌ॥১৬॥
আত্মসম্ভাবিতাঃ স্তব্ধা ধনমানমদান্বিতাঃ।
যজন্তে নামযজ্ঞৈস্তে দম্ভেনাবিধিপূর্বকম্॥১৭॥
অহঙ্কারং বলং দর্পং কামং ক্রোধঞ্চ সংশ্রিতাঃ।
মামাত্মপরদেহেষু প্রদ্বিষন্তোঽভ্যসূয়কাঃ॥১৮॥
তানহং দ্বিষতঃ ক্রূরান্ সংসারেষু নরাধমান্।
ক্ষিপাম্যজস্রমশুভানাসুরীষ্বেব যোনিষু॥১৯॥
আসুরীং যোনিমাপন্না মূঢ়া জন্মনি জন্মনি।
মামপ্রাপ্যৈব কৌন্তেয় ততো যান্ত্যধমাং গতিম্॥২০॥
ত্রিবিধং নরকস্যেদং দ্বারং নাশনমাত্মনঃ।
কামঃ ক্রোধস্তথা লোভস্তস্মাদেতৎ ত্রয়ং ত্যজেৎ॥২১॥
এতৈর্বিমুক্তঃ কৌন্তেয় তমোদ্বারৈস্ত্রিভির্নরঃ।
আচরত্যাত্মনঃ শ্রেয়স্ততো যাতি পরাং গতিম্॥২২॥
যঃ শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য বর্ততে কামকারতঃ।
ন স সিদ্ধিমবাপ্নোতি ন সুখং ন পরাং গতিম্॥২৩॥
তস্মাচ্ছাস্ত্রং প্রমাণং তে কার্যাকার্যব্যবস্থিতৌ।
জ্ঞাত্বা শাস্ত্রবিধানোক্তং কর্ম কর্তুমিহার্হসি॥২৪॥

ওঁ তৎসদিতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে দৈবাসুরসম্পদবিভাগযোগো নাম ষোড়শোঽধ্যায়ঃ॥

———o———

অথ সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ

অর্জুন উবাচ

যে শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।
তেষাং নিষ্ঠা তু কা কৃষ্ণ সত্ত্বমাহো রজস্তমঃ॥ ১ ॥

শ্রীভগবানুবাচ

ত্রিবিধা ভবতি শ্রদ্ধা দেহিনাং সা স্বভাবজা।
সাত্ত্বিকী রাজসী চৈব তামসী চেতি তাং শৃণু॥ ২ ॥

সত্ত্বানুরূপা সর্বস্য শ্রদ্ধা ভবতি ভারত।
শ্রদ্ধাময়োঽয়ং পুরুষো যো যচ্ছ্রদ্ধঃ স এব সঃ॥ ৩ ॥

যজন্তে সাত্ত্বিকা দেবান্ যক্ষরক্ষাংসি রাজসাঃ।
প্রেতান্ ভূতগণাংশ্চান্যে যজন্তে তামসা জনাঃ॥ ৪ ॥

অশাস্ত্রবিহিতং ঘোরং তপ্যন্তে যে তপো জনাঃ।
দম্ভাহঙ্কারসংযুক্তাঃ কামরাগবলান্বিতাঃ॥ ৫ ॥

কর্ষয়ন্তঃ শরীরস্থং ভূতগ্রামমচেতসঃ।
মাং চৈবান্তঃশরীরস্থং তান্ বিদ্ধ্যাসুরনিশ্চয়ান্॥ ৬ ॥

আহারস্ত্বপি সর্বস্য ত্রিবিধো ভবতি প্রিয়ঃ।
যজ্ঞস্তপস্তথা দানং তেষাং ভেদমিমং শৃণু॥ ৭ ॥

আয়ুঃসত্ত্ববলারোগ্যসুখপ্রীতিবিবর্দ্ধনাঃ।
রস্যাঃ স্নিগ্ধাঃ স্থিরা হৃদ্যা আহারাঃ সাত্ত্বিকপ্রিয়াঃ॥ ৮ ॥

কট্বম্ললবণাত্যুষ্ণতীক্ষ্ণরুক্ষবিদাহিনঃ।
আহারা রাজসস্যেষ্টা দুঃখশোকাময়প্রদাঃ॥ ৯ ॥

যাতযামং গতরসং পূতি পর্য্যুষিতঞ্চ যৎ।
উচ্ছিষ্টমপি চামেধ্যং ভোজনং তামসপ্রিয়ম্॥১০॥

অফলাকাঙ্ক্ষিভির্যজ্ঞো বিধিদৃষ্টো য ইজ্যতে।
যষ্টব্যমেবেতি মনঃ সমাধায় স সাত্ত্বিকঃ॥১১॥

অভিসন্ধায় তু ফলং দম্ভার্থমপি চৈব যৎ।
ইজ্যতে ভরতশ্রেষ্ঠ তং যজ্ঞং বিদ্ধি রাজসম্॥১২॥

বিধিহীনমসৃষ্টান্নং মন্ত্রহীনমদক্ষিণম্।
শ্রদ্ধাবিরহিতং যজ্ঞং তামসং পরিচক্ষতে॥১৩॥

দেবদ্বিজগুরুপ্রাজ্ঞপূজনং শৌচমার্জবম্।
ব্রহ্মচর্যমহিংসা চ শারীরং তপ উচ্যতে॥১৪॥

অনুদ্বেকরং বাক্যং সত্যং প্রিয়হিতঞ্চ যৎ।
স্বাধ্যায়াভ্যসনঞ্চৈব বাঙ্ময়ং তপ উচ্যতে॥১৫॥

মনঃপ্রসাদঃ সৌম্যত্বং মৌনমাত্মবিনিগ্রহঃ।
ভাবসংশুদ্ধিরিত্যেতৎ তপো মানসমুচ্যতে॥১৬॥

শ্রদ্ধয়া পরয়া তপ্তং তপস্তৎ ত্রিবিধং নরৈঃ।
অফলাকাঙ্ক্ষিভির্যুক্তৈঃ সাত্ত্বিকং পরিচক্ষতে॥১৭॥

সৎকারমানপূজার্থং তপো দম্ভেন চৈব যৎ।
ক্রিয়তে তদিহ প্রোক্তং রাজসং চলমধ্রুবম্॥১৮॥

মূঢ়গ্রাহেণাত্মনো যৎ পীড়য়া ক্রিয়তে তপঃ।
পরস্যোৎসাদনার্থং বা তত্তামসমুদাহৃতম্॥১৯॥

দাতব্যমিতি যদ্দানং দীয়তেঽনুপকারিণে।
দেশে কালে চ পাত্রে চ তদ্দানং সাত্ত্বিকং স্মৃতম্॥২০॥

যত্তু প্রত্যুপকারার্থং ফলমুদ্দিশ্য বা পুনঃ।
দীয়তে চ পরিক্লিষ্টং তদ্দানং রাজসং স্মৃতম্॥২১॥

অদেশকালে যদ্দানমপাত্রেভ্যশ্চ দীয়তে।
অসৎকৃতমবজ্ঞাতং তত্তামসমুদাহৃতম্॥২২॥

ওঁ তৎসদিতি নির্দেশো ব্রহ্মণস্ত্রিবিধঃ স্মৃতঃ।
ব্রাহ্মণাস্তেন বেদাশ্চ যজ্ঞাশ্চ বিহিতাঃ পুরা॥২৩॥

তস্মাদোমিত্যুদাহৃত্য যজ্ঞদানতপঃক্রিয়াঃ।
প্রবর্তন্তে বিধানোক্তাঃ সততং ব্রহ্মবাদিনাম্॥২৪॥

তদিত্যনভিসন্ধায় ফলং যজ্ঞতপঃক্রিয়াঃ।
দানক্রিয়াশ্চ বিবিধাঃ ক্রিয়ন্তে মোক্ষকাঙ্ক্ষিভিঃ॥২৫॥

সদ্ভাবে সাধুভাবে চ সদিত্যেতৎ প্রযুজ্যতে।

প্রশস্তে কর্মণি তথা সচ্ছব্দঃ পার্থ যুজ্যতে॥২৬॥
যজ্ঞে তপসি দানে চ স্থিতিঃ সদিতি চোচ্যতে।
কর্ম চৈব তদর্থীয়ং সদিত্যেবাভিধীয়তে॥২৭॥
অশ্রদ্ধয়া হুতং দত্তং তপস্তপ্তং কৃতঞ্চ যৎ।
অসদিত্যুচ্যতে পার্থ ন চ তৎ প্রেত্য নো ইহ॥২৮॥

ওঁ তৎসদিতি শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে শ্রদ্ধাত্রয়বিভাগযোগো নাম সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ॥

———o———

অথ অষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ

অর্জুন উবাচ

সন্ন্যাসস্য মহাবাহো তত্ত্বমিচ্ছামি বেদিতুম্।
ত্যাগস্য চ হৃষীকেশ পৃথক্ কেশিনিষূদন॥ ১ ॥

শ্রীভগবানুবাচ

কাম্যানাং কর্মণাং ন্যাসং সন্ন্যাসং কবয়ো বিদুঃ।
সর্বকর্মফলত্যাগং প্রাহুস্ত্যাগং বিচক্ষণাঃ॥ ২ ॥
ত্যাজ্যং দোষবদিত্যেকে কর্ম প্রাহুর্মনীষিণঃ।
যজ্ঞদানতপঃকর্ম ন ত্যাজ্যমিতি চাপরে॥ ৩ ॥
নিশ্চয়ং শৃণু মে তত্র ত্যাগে ভরতসত্তম।
ত্যাগো হি পুরুষব্যাঘ্র ত্রিবিধঃ সম্প্রকীর্তিতঃ॥ ৪ ॥
যজ্ঞদানতপঃকর্ম ন ত্যাজ্যং কার্যমেব তৎ।
যজ্ঞো দানং তপশ্চৈব পাবনানি মনীষিণাম্॥ ৫ ॥
এতান্যপি তু কর্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ফলানি চ।
কর্তব্যানীতি মে পার্থ নিশ্চিতং মতমুত্তমম্॥ ৬ ॥
নিয়তস্য তু সন্ন্যাসঃ কর্মণো নোপপদ্যতে।

মোহাত্তস্য পরিত্যাগস্তামসঃ পরিকীর্তিতঃ॥ ৭ ॥

দুঃখমিত্যেব যৎ কর্ম কায়ক্লেশভয়াৎ ত্যজেৎ।
স কৃত্বা রাজসং ত্যাগং নৈব ত্যাগফলং লভেৎ॥ ৮ ॥

কার্যমিত্যেব যৎ কর্ম নিয়তং ক্রিয়তেঽর্জুন।
সঙ্গং ত্যক্ত্বা ফলঞ্চৈব স ত্যাগঃ সাত্ত্বিকো মতঃ॥ ৯ ॥

ন দ্বেষ্ট্যকুশলং কর্ম কুশলে নানুষজ্জতে।
ত্যাগী সত্ত্বসমাবিষ্টো মেধাবী ছিন্নসংশয়ঃ॥১০॥

ন হি দেহভৃতা শক্যং ত্যক্তুং কর্মাণ্যশেষতঃ।
যস্তু কর্মফলত্যাগী স ত্যাগীত্যভিধীয়তে॥১১॥

অনিষ্টমিষ্টং মিশ্রং চ ত্রিবিধং কর্মণঃ ফলম্।
ভবত্যত্যাগিনাং প্রেত্য ন তু সন্ন্যাসিনাং ক্বচিৎ॥১২॥

পঞ্চৈতানি মহাবাহো কারণানি নিবোধ মে।
সাংখ্যে কৃতান্তে প্রোক্তানি সিদ্ধয়ে সর্বকর্মণাম্॥১৩॥

অধিষ্ঠানং তথা কর্তা করণং চ পৃথগ্বিধম্।
বিবিধাশ্চ পৃথক্ চেষ্টা দৈবং চৈবাত্র পঞ্চমম্॥১৪॥

শরীরবাঙ্মনোভির্যৎ কর্ম প্রারভতে নরঃ।
ন্যায্যং বা বিপরীতং বা পঞ্চৈতে তস্য হেতবঃ॥১৫॥

তত্রৈবং সতি কর্তারমাত্মানং কেবলং তু যঃ।
পশ্যত্যকৃতবুদ্ধিত্বান্ন স পশ্যতি দুর্মতিঃ॥১৬॥

যস্য নাহঙ্কৃতো ভাবো বুদ্ধির্যস্য ন লিপ্যতে।
হত্বাপি স ইমাঁল্লোকান্ ন হন্তি ন নিবধ্যতে॥১৭॥

জ্ঞানং জ্ঞেয়ং পরিজ্ঞাতা ত্রিবিধা কর্মচোদনা।
করণং কর্ম কর্তেতি ত্রিবিধঃ কর্মসংগ্রহঃ॥১৮॥

জ্ঞানং কর্ম চ কর্তা চ ত্রিধৈব গুণভেদতঃ।
প্রোচ্যতে গুণসংখ্যানে যথাবচ্ছৃণু তান্যপি॥১৯॥

সর্বভূতেষু যেনৈকং ভাবমব্যয়মীক্ষতে।

অবিভক্তং বিভক্তেষু তজ্জ্ঞানং বিদ্ধি সাত্ত্বিকম্॥২০॥

পৃথক্ত্বেন তু যজ্জ্ঞানং নানাভাবান্ পৃথগ্‌বিধান্।
বেত্তি সর্বেষু ভূতেষু তজ্জ্ঞানং বিদ্ধি রাজসম্॥২১॥

যত্তু কৃৎস্নবদেকস্মিন্ কার্যে সক্তমহৈতুকম্।
অতত্ত্বার্থবদল্পঞ্চ তৎ তামসমুদাহৃতম্॥২২॥

নিয়তং সঙ্গরহিতমরাগদ্বেষতঃ কৃতম্।
অফলপ্রেপ্সুনা কর্ম যত্তৎ সাত্ত্বিকমুচ্যতে॥২৩॥

যত্তু কামেপ্সুনা কর্ম সাহঙ্কারেণ বা পুনঃ।
ক্রিয়তে বহুলায়াসং তদ্রাজসমুদাহৃতম্॥২৪॥

অনুবন্ধং ক্ষয়ং হিংসামনবেক্ষ্য চ পৌরুষম্।
মোহাদারভ্যতে কর্ম যত্তত্তামসমুচ্যতে॥২৫॥

মুক্তসঙ্গোঽনহংবাদী ধৃত্যুৎসাহসমন্বিতঃ।
সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোর্নির্বিকারঃ কর্তা সাত্ত্বিক উচ্যতে॥২৬॥

রাগী কর্মফলপ্রেপ্সুর্লুব্ধো হিংসাত্মকোঽশুচিঃ।
হর্ষশোকান্বিতঃ কর্তা রাজসঃ পরিকীর্তিতঃ॥২৭॥

অযুক্তঃ প্রাকৃতঃ স্তব্ধঃ শঠোঽনৈষ্কৃতিকোঽলসঃ।
বিষাদী দীর্ঘসূত্রী চ কর্তা তামস উচ্যতে॥২৮॥

বুদ্ধের্ভেদং ধৃতেশ্চৈব গুণতস্ত্রিবিধং শৃণু।
প্রোচ্যমানমশেষেণ পৃথক্ত্বেন ধনঞ্জয়॥২৯॥

প্রবৃত্তিং চ নিবৃত্তিং চ কার্যাকার্যে ভয়াভয়ে।
বন্ধং মোক্ষঞ্চ যা বেত্তি বুদ্ধিঃ সা পার্থ সাত্ত্বিকী॥৩০॥

যয়া ধর্মমধর্মঞ্চ কার্যঞ্চাকার্যমেব চ।
অযথাবৎ প্রজানাতি বুদ্ধিঃ সা পার্থ রাজসী॥৩১॥

অধর্মং ধর্মমিতি যা মন্যতে তমসাবৃতা।
সর্বার্থান্ বিপরীতাংশ্চ বুদ্ধিঃ সা পার্থ তামসী॥৩২॥

ধৃত্যা যয়া ধারয়তে মনঃপ্রাণেন্দ্রিয়ক্রিয়াঃ।

যোগেনাব্যভিচারিণ্যা ধৃতিঃ সা পার্থ সাত্ত্বিকী॥৩৩॥

যয়া তু ধর্মকামার্থান্ ধৃত্যা ধারয়তেঽর্জুন।
প্রসঙ্গেন ফলাকাঙ্ক্ষী ধৃতিঃ সা পার্থ রাজসী॥৩৪॥

যয়া স্বপ্নং ভয়ং শোকং বিষাদং মদমেব চ।
ন বিমুঞ্চতি দুর্মেধা ধৃতিঃ সা পার্থ তামসী॥৩৫॥

সুখং ত্বিদানীং ত্রিবিধং শৃণু মে ভরতর্ষভ।
অভ্যাসাদ্রমতে যত্র দুঃখান্তঞ্চ নিগচ্ছতি॥৩৬॥

যত্তদগ্রে বিষমিব পরিণামেঽমৃতোপমম্।
তৎ সুখং সাত্ত্বিকং প্রোক্তমাত্মবুদ্ধিপ্রসাদজম্॥৩৭॥

বিষয়েন্দ্রিয়সংযোগাদ্ যত্তদগ্রেঽমৃতোপমম্।
পরিণামে বিষমিব তৎ সুখং রাজসং স্মৃতম্॥৩৮॥

যদগ্রে চানুবন্ধে চ সুখং মোহনমাত্মনঃ।
নিদ্রালস্যপ্রমাদোত্থং তত্তামসমুদাহৃতম্॥৩৯॥

ন তদস্তি পৃথিব্যাং বা দিবি দেবেষু বা পুনঃ।
সত্ত্বং প্রকৃতিজৈর্মুক্তং যদেভিঃ স্যাৎ ত্রিভির্গুণৈঃ॥৪০॥

ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশাং শূদ্রাণাঞ্চ পরন্তপ।
কর্মাণি প্রবিভক্তানি স্বভাবপ্রভবৈর্গুণৈঃ॥৪১॥

শমো দমস্তপঃ শৌচং ক্ষান্তিরার্জবমেব চ।
জ্ঞানং বিজ্ঞানমাস্তিক্যং ব্রহ্মকর্ম স্বভাবজম্॥৪২॥

শৌর্যং তেজো ধৃতির্দাক্ষ্যং যুদ্ধে চাপ্যপলায়নম্।
দানমীশ্বরভাবশ্চ ক্ষাত্রং কর্ম স্বভাবজম্॥৪৩॥

কৃষিগৌরক্ষ্যবাণিজ্যম্ বৈশ্যকর্ম স্বভাবজম্।
পরিচর্যাত্মকং কর্ম শূদ্রস্যাপি স্বভাবজম্॥৪৪॥

স্বে স্বে কর্মণ্যভিরতঃ সংসিদ্ধিং লভতে নরঃ।
স্বকর্মনিরতঃ সিদ্ধিং যথা বিন্দতি তচ্ছৃণু॥৪৫॥

যতঃ প্রবৃত্তির্ভূতানাং যেন সর্বমিদং ততম্।

স্বকর্ম্মণা তমভ্যর্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ॥৪৬॥
শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মো বিগুণঃ পরধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।
স্বভাবনিয়তং কর্ম্ম কুর্ব্বন্নাপ্নোতি কিল্বিষম্॥৪৭॥
সহজং কর্ম্ম কৌন্তেয় সদোষমপি ন ত্যজেৎ।
সর্ব্বারম্ভা হি দোষেণ ধূমেনাগ্নিরিবাবৃতাঃ॥৪৮॥
অসক্তবুদ্ধিঃ সর্ব্বত্র জিতাত্মা বিগতস্পৃহঃ।
নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধিং পরমাং সন্ন্যাসেনাধিগচ্ছতি॥৪৯॥
সিদ্ধিং প্রাপ্তো যথা ব্রহ্ম তথাপ্নোতি নিবোধ মে।
সমাসেনৈব কৌন্তেয় নিষ্ঠা জ্ঞানস্য যা পরা॥৫০॥
বুদ্ধ্যা বিশুদ্ধয়া যুক্তো ধৃত্যাত্মানং নিয়ম্য চ।
শব্দাদীন্ বিষয়াংস্ত্যক্ত্বা রাগদ্বেষৌ ব্যুদস্য চ॥৫১॥
বিবিক্তসেবী লঘ্বাশী যতবাক্কায়মানসঃ।
ধ্যানযোগপরো নিত্যং বৈরাগ্যং সমুপাশ্রিতঃ॥৫২॥
অহঙ্কারং বলং দর্পং কামং ক্রোধং পরিগ্রহম্।
বিমুচ্য নির্ম্মমঃ শান্তো ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে॥৫৩॥
ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্॥৫৪॥
ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ।
ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্॥৫৫॥
সর্ব্বকর্ম্মাণ্যপি সদা কুর্ব্বাণো মদ্ব্যপাশ্রয়ঃ।
মৎপ্রসাদাদবাপ্নোতি শাশ্বতং পদমব্যয়ম্॥৫৬॥
চেতসা সর্ব্বকর্ম্মাণি ময়ি সন্ন্যস্য মৎপরঃ।
বুদ্ধিযোগমুপাশ্রিত্য মচ্চিত্তঃ সততং ভব॥৫৭॥
মচ্চিত্তঃ সর্ব্বদুর্গাণি মৎপ্রসাদাত্তরিষ্যসি।
অথ চেত্ত্বমহঙ্কারান্ন শ্রোষ্যসি বিনঙ্ক্ষ্যসি॥৫৮॥
যদহঙ্কারমাশ্রিত্য ন যোৎস্য ইতি মন্যসে।

মিথ্যৈষ ব্যবসায়স্তে প্রকৃতিস্ত্বাং নিয়োক্ষ্যতি॥৫৯॥
স্বভাবজেন কৌন্তেয় নিবদ্ধঃ স্বেন কর্মণা।
কর্ত্তুং নেচ্ছসি যন্মোহাৎ করিষ্যস্যবশোঽপি তৎ॥৬০॥
ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জুন তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ন্ সর্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া॥৬১॥
তমেব শরণং গচ্ছ সর্বভাবেন ভারত।
তৎ প্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্স্যসি শাশ্বতম্॥৬২॥
ইতি তে জ্ঞানমাখ্যাতং গুহ্যাদ্ গুহ্যতরং ময়া।
বিমৃশ্যৈতদশেষেণ যথেচ্ছসি তথা কুরু॥৬৩॥
সর্বগুহ্যতমং ভূয়ঃ শৃণু মে পরমং বচঃ।
ইষ্টোঽসি মে দৃঢ়মিতি ততো বক্ষ্যামি তে হিতম্॥৬৪॥
মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে॥৬৫॥
সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বা সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥৬৬॥
ইদং তে নাতপস্কায় নাভক্তায় কদাচন।
ন চাশুশ্রূষবে বাচ্যং ন চ মাং যোঽভ্যসূয়তি॥৬৭॥
য ইদং পরমং গুহ্যং মদ্ভক্তেষ্বভিধাস্যতি।
ভক্তিং ময়ি পরাং কৃত্বা মামেবৈষ্যত্যসংশয়ঃ॥৬৮॥
ন চ তস্মান্মনুষ্যেষু কশ্চিন্মে প্রিয়কৃত্তমঃ।
ভবিতা ন চ মে তস্মাদন্যঃ প্রিয়তরো ভুবি॥৬৯॥
অধ্যেষ্যতে চ য ইমং ধর্ম্যং সংবাদমাবয়োঃ।
জ্ঞানযজ্ঞেন তেনাহমিষ্টঃ স্যামিতি মে মতিঃ॥৭০॥
শ্রদ্ধাবাননসূয়শ্চ শৃণুয়াদপি যো নরঃ।
সোঽপি মুক্তঃ শুভাঁল্লোকান্ প্রাপ্নুয়াৎ পুণ্যকর্মণাম্॥৭১॥
কচ্চিদেতচ্ছ্রুতং পার্থ ত্বয়ৈকাগ্রেণ চেতসা।

কচ্চিদজ্ঞানসম্মোহঃ প্রনষ্টস্তে ধনঞ্জয়॥৭২॥

অর্জুন উবাচ

নষ্টো মোহঃ স্মৃতির্লব্ধা ত্বৎপ্রসাদান্ময়াচ্যুত।
স্থিতোঽস্মি গতসন্দেহঃ করিষ্যে বচনং তব॥৭৩॥

সঞ্জয় উবাচ

ইত্যহং বাসুদেবস্য পার্থস্য চ মহাত্মনঃ।
সংবাদমিমমশ্রৌষমদ্ভুতং রোমহর্ষণম্॥৭৪॥

ব্যাসপ্রসাদাচ্ছ্রুতবানেতদ্‌ গুহ্যমহং পরম্।
যোগং যোগেশ্বরাৎ কৃষ্ণাৎ সাক্ষাৎ কথয়তঃ স্বয়ম্॥৭৫॥

রাজন্‌ সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য সংবাদমিমমদ্ভুতম্।
কেশবার্জুনয়োঃ পুণ্যং হৃষ্যামি চ মুহুর্মুহুঃ॥৭৬॥

তচ্চ সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য রূপমত্যদ্ভুতং হরেঃ।
বিস্ময়ো মে মহান্‌ রাজন্‌ হৃষ্যামি চ পুনঃ পুনঃ॥৭৭॥

যত্র যোগেশ্বরঃ কৃষ্ণো যত্র পার্থো ধনুর্ধরঃ।
তত্র শ্রীর্বিজয়ো ভূতির্ধ্রুবা নীতির্মতির্মম॥৭৮॥

ওঁ তৎসদিতি শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে মোক্ষসন্ন্যাসযোগো নাম অষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ॥